Biswajit Ganguly '72

শনিবার, ২৬ মাঘ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 9th February, 1974 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ১

সূচীপত্র

অস্বস্তিকর
দিনগুলিতে
আপনি কি গোপনে
অসহায় অবস্থায়
সব কষ্ট
সহ্য করেন?
নারী হিসেবে আপনি তো জানেন, মেয়েদের কি মাসে 'কয়েকটি' দিন কি কষ্ট সহ্য করতে হয়। ঐ সময়ে যন্ত্রণা আর অস্বস্তি শরীর ও মন আচ্ছন্ন ক'রে রাখে।
ভাববেন না।
মাত্র একটি সারিডনই মুহূর্তে আপনার সব অস্বস্তি ও যন্ত্রণা দূর ক'রে দেবে।
একমাত্র সারিডনই এমন বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী যা আপনার অস্বস্তি কাটিয়ে আপনাকে আবার কর্মঠ ও প্রফুল্ল করে তুলবে।
সারিডন নিয়ে দেখুন—মাত্র একটি... মুখে আবার হাসি ফুটে উঠবে।
সারিডন
'রোশ'
রোশ-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

লুকোনো ময়লা আর বাসি মেকআপ আপনার ত্বককে নিষ্প্রভ করে তোলে

আপনার ত্বক থেকে লুকোনো ময়লা আর বাসি মেকআপ সম্পূর্ণভাবে তুলে ফেলুন। অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক ত্বকের গভীর পর্য্যন্ত পৌঁছে

আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে

ত্বকের গভীরে বসে যাওয়া লুকোনো ময়লা সম্পূর্ণভাবে তুলে ফেলতে পারলে তবেই হবে আপনার সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক এমনই তরলভাবে তৈরী যাতে সবচেয়ে তলাকার ত্বকও ভালোভাবে পরিষ্কার করে তোলে। একটু তুলো অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্কে ভিজিয়ে নিয়ে আপনার মুখে ও গলায় আস্তে আস্তে ঘষুন— দেখুন কত ময়লা বেরিয়ে এলো—এত ময়লা ছিল—আপনি তো জানতেনই না!

অ্যান ফ্রেঞ্চ সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, ত্বকপরিচর্য্যায় অদ্বিতীয়

128 DCM-234 Ben

Licensed User of TM : Geoffrey Manners & Co. Lt

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীবিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী

লুকোনো ময়লা আর বাসি মেকআপ আপনার ত্বককে নিষ্প্রভ করে তোলে

আপনার ত্বক থেকে লুকোনো ময়লা আর বাসি মেকআপ সম্পূর্ণভাবে তুলে ফেলুন। অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক ত্বকের গভীর পর্য্যন্ত পৌঁছে

আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে

ত্বকের গভীরে বসে যাওয়া লুকোনো ময়লা সম্পূর্ণভাবে তুলে ফেলতে পারলে তবেই তবে আপনার সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ। অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক এমনই তরলভাবে তৈরী যাতে সবচেয়ে ভেতরের ত্বকও ভালোভাবে পরিষ্কার করে তোলে। একটু তুলো অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্কে ভিজিয়ে নিয়ে আপনার মুখে ও গলায় আস্তে আস্তে ঘষুন— দেখুন কত ময়লা বেরিয়ে এলো—এত ময়লা! ভুল—আপনি তো জানতেনই না!

অ্যান ফ্রেঞ্চ সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, ত্বকপরিচর্য্যায় অদ্বিতীয়

128 DCM-234 Ben

Licensed User of TM : Geoffrey Manners & Co. Lt

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীবিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৫
শনিবার ২৬ মাঘ ১৩৮০
Saturday 9 February 1974

সোলঝেনিত্‌সিন

বুদ্ধিজীবীদের সচেতন এবং ংবেদনশীল মন যে সবসময় কর্মক্ষম কে তা হয়ত নয়. অনেক সময় তাঁদের নসিক জড়তা আসে, অনেক সময় াঁদের নীরব করিয়ে দেওয়া হয়। ম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে জে লাগানোর নজির অনেক। তবু থনও কখনও এমন সাহিত্যিক, শিল্পী, জ্ঞানিককে দেখা যায়, যাঁদের স্বাধীন ন্তা ও সৃষ্টিকর্মকে নিয়ন্ত্রণ অথবা ীরব করানো যায় না। ইদানীং াভিয়েত রাশিয়ায় এই ধরনের বুদ্ধি- ীবীদের নিয়ে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র- বেস্থা বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। জ্ঞানিক সাখারভ, ঔপন্যাসিক সালঝেনিত্‌সিন, রুশ জীববিজ্ঞানী মেদভিয়েদেভ, কবি ভাভারদোভস্কি এবং ারও অনেকে আপাতত রুশ সরকারের াছে দুঃস্বপ্ন-বিশেষ। অবশ্য মেদ- ভিয়েদেভকে বৃটেনে গবেষণা করার ময়ই রুশ নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা য়েছে, কবি ভাভারদোভস্কিকে পাঠানো য়েছে হাসপাতালে। কিন্তু সাখারভ আছেন, আছেন সোলঝেনিত্‌সিনের মতন বিক্ষুব্ধরা। মনে করার হেতু নেই, ডঃ সাখারভ কিংবা সোলঝেনিত্‌সিন পরম নিশ্চিন্তে এবং স্বাধীনভাবে স্বদেশে বসবাস করছেন। সোভিয়েত গুপ্তচর ও পুলিস সর্বক্ষণ এঁদের দিকে নজর রেখেছে। সোভিয়েট সরকার এখনও যে কিঞ্চিৎ সহিষ্ণু হয়ে রয়েছেন তার কারণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। হঠকারিতাবশে কিছু ঘটিয়ে ফেললে বিদেশে যে ধরনের প্রতিবাদের ঝড় উঠবে তাতে পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়া মুশকিল হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় একান্ত বাধ্য হয়েই যেন সোভিয়েত সরকারকে সহ্য করতে হচ্ছে এঁদের। কিন্তু সম্প্রতি সোলঝেনিত্‌সিন-এর শেষতম যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে সরকার সম্ভবত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

সোলঝেনিত্‌সিনের সাম্প্রতিক গ্রন্থটির নাম 'দি গুলাগ আরকিপেলাগো' বা গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ। বইটির নাম-করণের মধ্যে তাৎপর্য রয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমশিবিরের বেদনা-দায়ক বিবরণ এই গ্রন্থ। অথচ এটি কোনো উপন্যাস বা কাহিনী নয়। ১৯১৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে পুলিসী নির্যাতন, বিভীষিকা, স্বৈরাচার চলেছিল এই গ্রন্থটি তার ইতিহাস। সোলঝেনিত্‌সিন নিজে এক যুগ শ্রমশিবিরে কাটিয়েছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতাই এই গ্রন্থের সব নয়, বিভিন্ন শ্রমশিবির এবং নির্বাসনের এলাকা থেকে যাঁরা তাঁকে চিঠি লিখেছেন, যাঁদের সংগে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনা করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথাও আছে। গ্রন্থটি, বলা বাহুল্য, রুশ ভাষায় স্বদেশে প্রকাশিত হয়নি। পাণ্ডুলিপি এসেছে চোরাই পথে প্যারিসে। সেখান থেকে জনৈক প্রকাশক রুশ ভাষায় এটি প্রকাশ করেছেন। নানা ভাষায় এর অনুবাদও হয়ত অচিরে প্রকাশিত হবে।

গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং তার সমাজব্যবস্থার ভয়াবহ প্রতিচ্ছবি। স্ট্যালিন তাঁর সময়ে যে নৃশংসতা চালিয়ে গিয়েছিলেন তার শুরু যে লেনিনের আমল থেকে এই কথাটি সোলঝেনিত্‌সিন বলতে দ্বিধা করেননি। এমন কি লেনিন কিভাবে দলকে শোধন করেছেন, তাঁর আমলে কিভাবে দলে দলে মানুষ হত্যা করা হয়েছে, কিভাবে আটক শিবিরে হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে—সে-সম্পর্কেও প্রমাণ সমেত অনেক তথ্য তিনি হাজির করেছেন। তিনি বলেছেন, স্ট্যালিন আমলে যে হারে রুশ জনসাধারণকে গ্রেপ্তার এবং হত্যা করা হত, জার আমলের তুলনায় তা শতগুণেরও বেশী। স্ট্যালিনের আমলে যে কোনো এক বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষকে বন্দীদশা ভোগ করতে হত।

রুশ একনায়কতন্ত্রের এমন মর্মান্তিক কাহিনী পৃথিবীর মানুষের গোচরে আসুক সোভিয়েট সরকার তা মোটেই চান না। অগত্যা আজ সোলঝেনিত্‌সিন সম্পর্কে সরকারীভাবে নিন্দা করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে তিনি রুশ সমাজব্যবস্থার গায়ে কাদা ছিটোবার কাজ করছেন, তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশের হয়ে গুপ্তচরের মতন ঘৃণ্য কাজ করে চলেছেন।

সোলঝেনিত্‌সিন কিন্তু মনে করেন, লেখক হিসেবে, বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন, মৃত্যুর জন্যে তাঁর দুর্ভাবনা নেই। খুবই স্বাভাবিক, কেননা নিজের সাহিত্য সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, সত্যই তাঁর আরব্ধ।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম ঃ ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশু কুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক —৩৫·৭০ টাকা
ষান্মাসিক—১৮·২০ „
ত্রৈমাসিক — ৯·২০ „

বিমান ডাকে
বার্ষিক —৮৬·৭০ টাকা
ষান্মাসিক—৪৪·২০ „
ত্রৈমাসিক —২২·১০ „

বিদেশে—
জাহাজ ডাকে—
বার্ষিক —৫৮·৬৫ টাকা
ষান্মাসিক—২৯·১০ „

আমাদের লণ্ডন অফিস মারফৎ
বার্ষিক —১৭৪·০০ টাকা
ষান্মাসিক— ৮৭·০০ „
ত্রৈমাসিক — ৪৪·০০ „

গত বারের মত আরেকবার
'ইন্দিরা ছাঁট' লাগাও
ভোটদাতা
কংগ্রেস
উত্তরপ্রদেশ ওড়িশা
প্রভৃতি রাজ্যে
নির্বাচন
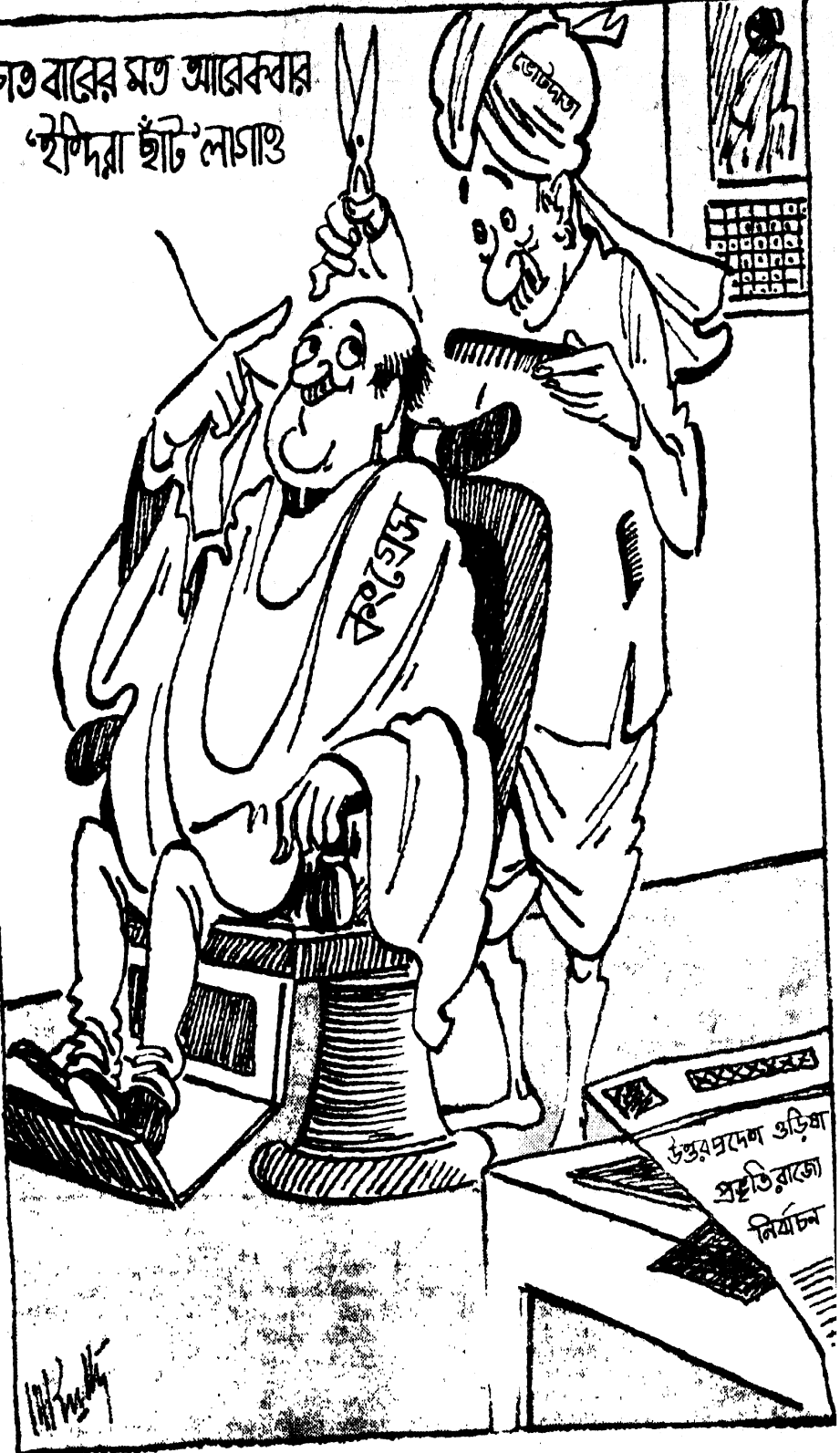
তিনটি উপনির্বাচনের গুরুত্ব

কংগ্রেস নেতারা এবং কংগ্রেস-বিরোধী বিভিন্ন দলের নেতারা সকলেই জানেন, পশ্চিমবঙ্গে যে তিনটে উপনির্বাচন হচ্ছে রাজ্য-রাজনীতির পক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন। কিন্তু তবু তাঁরা সকলেই রাজ্যের এই তিনটে উপনির্বাচনের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চান। কারণ, এই তিনটে উপনির্বাচনের মাধ্যমে তাঁরা রাজ্য-রাজনীতির কতকগুলি জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে চান।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন নিয়ে যে আগ্রহ সেটা অবশ্য প্রধানত সর্বভারতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। উত্তরপ্রদেশে যদি কংগ্রেস জয়ী হয় তাহলে শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতা আরও বাড়বে। দেশের রাজনীতির উপর তাঁর এখন যতটা কর্তৃত্ব রয়েছে তার চেয়ে তখন কর্তৃত্ব অনেকটা বাড়বে। আবার, উত্তরপ্রদেশে যদি কংগ্রেস পরাজিত হয় তাহলে শ্রীমতী গান্ধীর রাজনৈতিক মর্যাদায় ও কর্তৃত্বে প্রচণ্ড আঘাত পড়বে। দলের ভেতরে এবং বাইরে তার বিরাট প্রভাব পড়বে। সেই ধাক্কা সামলাতে সামলাতেই তিনি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

কংগ্রেস দলের ভেতরে কিছু লোক এবং কংগ্রেস-বিরোধী প্রায় সব দল চাইছেন, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস হারুক। কংগ্রেসের ভেতরে ওই সব লোক মনে করছেন, তাহলে তখন তাঁরা দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন আনতে পারবেন। আর কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি মনে করছেন, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস পরাজিত হলে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস এত দুর্বল হয়ে পড়বে এবং রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস দলের ঝগড়াঝাটি এত বেড়ে যাবে যে, তখনই বিরোধীদলগুলির পুরোদমে আসরে নামার সুবর্ণ সুযোগ আসবে।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি অর্থাৎ প্রধান কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীও তাই আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছেন উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের দিকে। তার আগে তাঁরা যে যার সাংগঠনিক পরিস্থিতিটা ঝালিয়ে রাখতে চাইছেন। যেন উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পরই তাঁরা সর্বশক্তি নিয়ে আসরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

সেই জন্যই বলছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের তিনটি উপনির্বাচনের চেয়েও উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন রাজ্য-রাজনীতির পক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে যদি শ্রীমতী গান্ধী জিততে পারেন তাহলে বামপন্থীরা মার্চ-এপ্রিলেও

পুরোদমে আসরে নামতে সাহস পাবেন না।

*

কিন্তু রাজ্যের এই তিনটে নির্বাচনেরও গুরুত্ব একেবারে কম নয়।

প্রথমত, এই তিনটে নির্বাচন দেখে বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের বিরোধটা কত গভীরে। বেলগাছিয়া এবং চুঁচুড়া কেন্দ্রে দলের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে চূড়ান্ত ঝগড়াঝাটি হয়ে গেল। এই ঝগড়াঝাটির ফল কি আরও বেশি দূর গড়াবে? যে গোষ্ঠীর প্রার্থীরা মনোনয়ন পেলেন না তাঁরা কি কংগ্রেস প্রার্থীকে হারাবার জন্যই চেষ্টা করবেন? না তাঁরা বিরোধ ভুলে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য সচেষ্ট হবেন?

এই সব প্রশ্ন কংগ্রেসের পক্ষে যত গুরুত্বপূর্ণ, কংগ্রেস-বিরোধীদের পক্ষেও ততই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যদি দেখা যায় কংগ্রেসীদের ঝগড়াটা এখন এত গভীরে যে একদল কংগ্রেসী আর একদল কংগ্রেসীকে পরাজিত করার জন্যও সচেষ্ট, তাহলে বিরোধীরা অনেকেই ধরে নিতে ভরসা পাবেন যে সেভাবে বিরোধী দলগুলির পুনরাগমন হলেও তাকে প্রতিরোধ করার জন্য কংগ্রেসীরা এক হয়ে মাঠে নামতে সাহস পাবেন না।

দ্বিতীয়ত দেখার, কংগ্রেস কতটা অবাধ ভোট হতে দিতে রাজি। আগে ছিল জাল ভোট দেওয়া। সেই জাল ভোট দেওয়ার পরিমাণ ক্রমে ক্রমেই বাড়ছে। ১৯৬৭, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সনে জাল ভোটের চূড়ান্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। জাল ভোট, অর্থাৎ এক ব্যক্তির ভোট আর এক ব্যক্তি গিয়ে দিয়ে আসা। ১৯৬৮ এবং ১৯৭১ সন থেকে ক্রমে ক্রমে এল আর একটা জিনিস। সেটা হল ছাপমারা ভোট। আসল এবং জাল ভোটের পর স্রেফ পোলিং বুথে বসে ছাপ মেরে কিছু ভোট বাক্সে ফেলে দেওয়া। ১৯৭২ সনে এই জিনিসের চূড়ান্ত হল। কংগ্রেস বহু কেন্দ্রে এই জিনিস করল। বামপন্থীদের তখন ক্ষমতা কম, তাই তাঁরা কংগ্রেসের তুলনায় অনেক কম এলাকায় এ জিনিস করতে পারলেন। যদিও এই প্রথার আবিষ্কর্তা তাঁরাই। ১৯৭২-এর পর বিভিন্ন উপনির্বাচনে কংগ্রেস এর চূড়ান্ত দেখিয়েছে। গত হাওড়া উপনির্বাচনে এমন হয়েছিল যে, বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ কংগ্রেস নেতাদের বুথে বুথে ঘুরে ঘুরে কর্মীদের বলতে হয়েছিল: বাবা, আর নয়, এবার তোরা থাম। বেলগাছিয়া, চুঁচুড়া এবং গাইঘাটার নির্বাচনে দেখার, কংগ্রেস সেই পথেই চলে, না ভোটে জনমতও অনেকটা প্রতিফলিত হতে দেয়।

যদি এই তিনটে উপনির্বাচনে জনমত প্রতিফলিত হতেই পারে তাহলে দেখার ১৯৭৪ সনে জনমতে কতটা হেরফের ঘটেছে। এ ব্যাপারে অবশ্য কিছুটা অসুবিধা আছে। কারণ, বেলগাছিয়া এবং চুঁচুড়ায় বামপন্থীরা কোনও প্রার্থী দিচ্ছেন না। প্রধান লড়াইটা হবে কংগ্রেসের সঙ্গে সংগঠন কংগ্রেসের। বামপন্থীরা শুধু চেষ্টা করবেন কংগ্রেস প্রার্থীদের হারাতে এবং সেজন্য গোপনে গোপনে তাঁরা সংগঠন কংগ্রেস প্রার্থীদের যথাসম্ভব সাহায্য করবেন। তাই, এই উপনির্বাচনগুলিতে বোঝা যাবে না যে, বামপন্থীদের সম্পর্কে জনমতে কোনও পরিবর্তন এসেছে কিনা; শুধু বোঝা যাবে যে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে জনমত এখন কী।

*

এই উপনির্বাচনগুলি, বিশেষ করে বেলগাছিয়া এবং চুঁচুড়ার উপনির্বাচন বিরাট একটা সুযোগ এনে দিয়েছে সংগঠন কংগ্রেসের সামনে। তাঁরা যদি এর একটা উপনির্বাচনেও জিততে পারেন এবং যদি একজন ভাল বক্তাকেও বিধানসভায় নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে তার ফলে দল নানাভাবে লাভবান হবে।

প্রথমত, "কোনদিকে যাই" এই পরিস্থিতিতে পড়া বেশ কিছু ছেলেকে তাঁরা দলের দিকে টানতে পারবেন। এমনিতেই সংগঠন কংগ্রেস ১৯৭২ সনের পর কিছু ছেলে পেয়েছে। এখন একটা উপনির্বাচনে জিততে পারলে দলের দিকে ছেলেদের আকৃষ্ট করার সুযোগ আরও বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, বিধানসভায় একজন ভাল বক্তা পেলে সেই সুযোগে তাঁরা জনতাকে আকৃষ্ট করার সুযোগও পাবেন। প্রফুল্ল সেনও খুব ভাল বক্তা। কিন্তু নানা কারণে তাঁর পক্ষে সব সময় বিধানসভায় উপস্থিত থেকে একজন সদাজাগ্রত বিরোধী নেতার ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, দল একটা কোনও উপনির্বাচনে জিতলে সেই উৎসাহে রাজ্যের বসে-যাওয়া সংগঠন কংগ্রেসী অনেকেই আবার সক্রিয় হয়ে উঠবেন। বিভিন্ন জেলার বহু সংগঠন কংগ্রেসী নেতা এবং কর্মী এখন চুপচাপ বসে আছেন।

২৬-১-৭৪

বরুণ গুপ্ত

কমরেড লালুদা সমীপেষু

পরম পূজনীয় কমরেড লালুদা,

অনেক দিন পরে আজ আপনাকে চিঠি লিখছি। আশা করি আমার মতলব আপনি টের পেয়ে গিয়েছেন।

হ্যাঁ দাদা, ঠিক ধরেছেন। আবার আপনার এই স্নেহের ভাইটি বুর্জোয়া বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। আপনি দয়া করে এই গরিবকে সঠিক লাইনটা বাতলে দিয়ে তার উদ্ধারের উপায় করে দিন।

না দাদা, ভয় নেই, আমি সোলঝেনিতসিন বা সাখারভের কথা তুলে আপনার বদহজম ঘটাতে চাই না। ওদের ব্যাপারে আমি লাইন পেয়ে গিয়েছি। আমাদের পাড়ার কমরেড ভজহরিকে তো জানেন। জানেন না দাদা? কেন, কমরেড ব্রেজনেভের সফরকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর কবিতা তো আমাদের পারটির মুখপত্রে ফুলঝুরি বরডার দিয়ে ছাপা হয়েছিল। তারপর থেকে তাঁকে আমরা আমাদের পাড়ার কালচারাল সেলের কমরেড-ইন-চারজ করে দিয়েছি। সেই কমরেড ভজহরি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, সাখারভ এবং সোলঝেনিতসিন নামে আসলে কোনও লোক নেই। পুঁজিবাদী প্রচার-যন্ত্র ওদের সৃষ্টি করেছে। এর পর, কমরেড লালুদা, আপনি বুঝতেই পারছেন, এ বিষয়ে আমাদের মনে আর কোনও প্রশ্ন থাকতেই পারে না। এবং আপনি শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন যে, আমাদের সেলের কোনও কমরেডের মনেই, পুঁজিবাদী প্রেসের অবিশ্রান্ত প্রোপাগান্ডা সত্ত্বেও আর ঐ বিষয়ে কোনও প্রশ্নই জাগছে না।

আমি, পূজনীয় কমরেড লালুদা, বিভ্রান্ত বোধ করছি অন্য একটা ব্যাপারে। আচ্ছা দাদা, নিতান্ত নাচার হয়েই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। চীনকে ক্যাপিটালিস্ট বললে কি কোনও অন্যায় হয়? আমার মতে চীন ক্যাপিটালিস্ট। কেন বলছি। আমাদের সোভিয়েত রাশিয়াই তো আদি এবং অকৃত্রিম প্রোলেতারিয়েত দেশ। নয় দাদা? এবং আমরা তো জানি, পুঁজিবাদীরাই প্রোলেতারিয়েতের ঘোর শত্রু। অর্থাৎ কিনা, প্রোলেতারিয়েতের শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। অর্থাৎ কিনা আমাদের সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রু মাত্রেই পুঁজিবাদী। এখন চীন যখন আমাদের সোভিয়েত দেশের শত্রুতা করছে তখন চীন নিশ্চয়ই পুঁজিবাদী। নয় দাদা? যদি কিছু ভুল বলে থাকি তবে শুধরে দেবেন। অন্যায় বলছি?

তা আমাদের পাড়ার কালচারাল সেলের নেতা কমরেড ভজহরি, ঐ যে যাঁর ব্রেজনেভ বন্দনা আমাদের পারটি পেপারের ফুলঝুরি বরডার দিয়ে বেরিয়েছিল, দারুণ লেখে কিন্তু দাদা জানেন, দারুণ মেলাতে পারে, ঐ লাইনটা আপনার মনে পড়ছে, ঐ যে—

সর্বহারার তুমিই সর্ব
ব্রেজনেভ,
দক্ষদর্প কে করে খর্ব
মহাদেব?
মহাদেব তুমি ব্রেজনেভ।

মনে পড়েছে তো? হ্যাঁ, ঐ আমাদের কমরেড কবি ভজহরি। হ্যাঁ, যা বলছিলুম দাদা, আমাদের কমরেড ভজহরি বললে, চীন সম্পর্কে আমার লাইনটা সঠিক নয়। কমরেড ভজহরির মতে চীন বলে আসলে কোনও দেশ নেই, কখনো ছিল না। পুঁজিবাদী প্রচার-যন্ত্র ওটা সৃষ্টি করেছে।

এইখানটায়, পরম পূজনীয় কমরেড লালুদা, আমার মনে একটু বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। এটাকে কি বুর্জোয়া বিভ্রান্তি বলা যায়? খটকা যদি শুধু আমার একার মনে লাগত তা হলেও নয় আমি চুপ মেরে যেতাম, যেমন প্রায়ই যাই। এই ধরুন, বোমবাই-এর ইলেকশানের কথাই ধরুন। ওখানে আমাদের পরম প্রিয় কমরেড-দাদা ডাঙ্গের প্রগতিশীল মেয়ে স্বর্গত জবাহরলাল নেহরুর প্রগতিশীল মেয়ের ক্যান্ডিডেটকে লাট খাইয়ে দিলে। ওখানে আমরা যার সঙ্গে লড়লুম, সেই স্বর্গত নেহরুর সেই প্রগতিশীল মেয়ের আঁচল ধরেই আবার আমরা ওড়িশা আর উত্তরপ্রদেশে ইলেকশন বৈতরণী পার হতে চলেছি। এতে কি খটকা লাগছে না? লাগছে। তবে পারটির মুখ চেয়ে চুপ করে আছি। থাকতেই হবে। মনকে দিন-রাত কত বোঝাচ্ছি—বলি মন ময়না, অত ছটফট করছ কেন? ডায়েলেকটিকসের যে কত মহিমা আছে তার তুমি জানোই বা কি আর বোঝই বা কতটুকু! পাখা গুটিয়ে বসে থাকো বাপ। বসে বসে শুধু টিক টিক শুনে যাও। ওতেই উদ্ধার। লাইনটা ঠিক নিইনি, কমরেড লালুদা?

কিন্তু চীনের ব্যাপারটা ঠিক আর ব্যক্তিগত লেভেলে নেই। বাইরে থেকে এমন চাপ পড়ছে না যে চুপ করে থাকাটাও অসম্ভব হয়ে উঠছে। এই তো সেদিন গোটা কয়েক কচি কমরেড এসে শুধুলে, হ্যাঁ দাদা, আমাদের সোভিয়েত স্পাইরা নাকি চীনে গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। আমি গর্ব করে ওদের বুঝিয়ে দিলুম, আমাদের সোভিয়েত স্পাইরা, অত কাঁচা ছেলে নয় যে, ক্যাপিটালিসট দেশে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়বে। ওরা বললে, চীনকে আপনি তা হলে ক্যাপিটালিসট দেশ বলছেন? বুক ফুলিয়ে বললাম, আলবাৎ। দেখছ না আমাদের সোভিয়েত রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ভাবমূর্তি ধসকে দিতে কি সব জঘন্য প্রোপাগানডাই না করে চলেছে!

ওদের একজন ফস করে বলে উঠল ঠিক বলছেন দাদা। সেদিন দেখলুম, চীন বলেছে, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কমরেড ব্রেজনেভদা ইনডিয়ার সঙ্গে যে শান্তি মৈত্রী সহযোগিতা চুক্তি করে গেলেন না, সেই চুক্তি অনুসারে আমাদের সোভিয়েত রুশিয়া যে-সব মাল ইনডিয়াতে চালান দিচ্ছে সে-সব নাকি রদ্দি মাল। আর তার দামও নাকি অন্যান্য দেশ থেকে বেশী করে নিচ্ছে। এমনভাবে বলছে যেন, আমাদের সোভিয়েত রুশিয়া একটা ক্যাপিটালিসট দেশ।

ওদের বললুম, খবরদার খবরদার, এসব কথা আবার যেন বিশ্বাস করে বসো না! ওরা বললে, পাগল হয়েছেন! এসব কথা বিশ্বাস করলে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কমরেড ব্রেজনেভদা যে বড্ড ব্যথা পাবেন, তা কি আমরা বুঝি না ভেবেছেন। কিন্তু চীন ব্যাটা যদি এমনভাবে বলেই যায়, তাহলে অন্যরা তো বিশ্বাস করে যেতে পারে। আমি ওদের বললুম, চীন বরাবর একটা ক্যাপিটালিসট। দুনিয়ার কমিউনিসট আন্দোলন জখম করার জন্য আমেরিকার টাকায় চীনে নকল এক কমিউনিস্ট পারটি গড়ে উঠেছে। বুঝলে।

ওরা প্রায় বুঝে এসেছিল, জানেন লালুদা, বিশেষ করে আমি যখন বললুম না যে, মাও-সে তুঙ সি-আই-এর টাকা খায় তার প্রমাণ আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কমরেড ভূপেশ গুপ্তদার কাছে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি, তখন ওদের মনে প্রায় আর কোনও সন্দেহই ছিল না। কিন্তু কমরেড ভজহরি হঠাৎ এসে বললে, কে বললে মাও-সে তুঙ সি-আইএর টাকা খায়? কথাটা ঠিক নয়। কথাটা ঠিক নয়, কারণ মাও-সে তুঙ বলে কোন লোক ইহসংসারে নেই। আমি বললাম বাঃ, তবে চীনের চেয়ারম্যান কে? কমরেড ভজহরি বললে, চীন বলে কোনও দেশ বাস্তবে নেই। সোলঝেনিতসিন, সাখারভের মতন ওগুলোও বুর্জোয়া প্রেসের কমিউনিসট-বিরোধী অপপ্রচারের সৃষ্টি।

কমরেড লালুদা, আপনি কি বলেন?

নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী

দেবরাজ

মানচিত্র খুললেই দেখা যায়, সাগর-মহাসাগরের গায়ে ছামাচির মতো বিস্তর ফুটকি। সেগুলো সবই ক্ষুদে ক্ষুদে দ্বীপ—তাদের কারুর নাম আছে, কারুর নেই। তাদের কোনও কোনওটাতে মানুষ থাকে, কোনও কোনওটাতে জনপ্রাণীর চিহ্নও চোখে পড়ে না। ডাঙা থেকে অনেক দূরে ভেসে-থাকা ও সব ক্ষুদে দ্বীপ কী দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে কোনও দেশেরই তেমন মাথাব্যথা নেই বিশেষ যখন লড়াই-টড়াই চলে না। দৈবে-সইবে ঝড়টড় এড়াবার জন্যে দুটো একটা জাহাজ হয়তো সে সব দ্বীপে নোঙর করে, হয়তো আসে নৌকো চেপে মাছশিকারী। নইলে সে সব দ্বীপ আছে কী নেই তার খোঁজও দুনিয়ার কেউ রাখে না। তাদের মালিকও যে কে তা সব সময় সঠিক জানা যায় না। অনেক দ্বীপেরই একের বেশী দাবিদার। তবে যে একবার একটা দ্বীপে চেপে বসে তাকে বড় একটা কেউ ঘাঁটায় না। অন্য দাবিদাররা বড় জোর মুখে আপত্তি জানায়—তার বেশী তারা কদাচিৎ এগোয়।

তামাম দুনিয়া তাই হকচকিয়ে গেছে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে পারাসেল দ্বীপপুঞ্জে চীনের দস্তুরমতো সামরিক অভিযান দেখে। ১৩০টা দ্বীপ নিয়ে গড়া এ দ্বীপপুঞ্জটি এতই নগণ্য যে সব মানচিত্রে তার নামও ওঠে নি। কাছাকাছি দেশ বলতে দুশো মাইল তফাতে চীন আর ভিয়েতনাম। ফিলিপিনস্ও পারাসেল থেকে ওই রকম দূরেই হবে। ওখানে মেলে প্রচুর ফসফেট। এখনও যা আছে তার পরিমাণ হবে লাখ পঞ্চাশ টন। পারাসেলের জানা সম্পদের মধ্যে এই একটিমাত্র। মাছ ধরতেও ওর আশেপাশে বিস্তর জেলে নৌকো ঘোরাঘুরি করে। তাদের বেশীর ভাগই খাস চীন থেকে এলেও কাছাকাছি অন্য দেশও বাদ যায় না। ভিয়েতনাম কী ফিলিপিনস্ থেকেও নৌকো নিয়ে পাড়ি দেয় পারাসেল এলাকায় মাছের ব্যাপারীরা। সেখানকার ফসফেটের ব্যবসা কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের একচেটে। জাহাজ বোঝাই ফসফেট তারা দেশে নিয়ে যায় বিদেশেও চালান দেয়। ঘাঁটিও তারা বানিয়েছিল গোটা তিনেক দ্বীপে। তা এখন আর নেই। সে সব দখল করে নিয়েছে চীনে ফৌজ জানুয়ারি মাসে। উনিশে আর বিশে এই দুদিন হানা দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের তারা উৎখাত করেছে পারাসেল থেকে।

চীনের কৈফিয়ত হচ্ছে পারাসেল দ্বীপপুঞ্জ তারই এলাকা—চিরকাল তার ছিল; ওটি বিলিয়ে দেবার ইচ্ছে তার নেই। চীনে ভাষায় পারাসেলের নাম হচ্ছে হুসিশা দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ পশ্চিম বেলা। তেমনই আছে চুংশা দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ মধ্য বেলা, তুংশা অর্থাৎ পূব বেলা আর নানশা অর্থাৎ দক্ষিণ বেলা। দক্ষিণ চীন দরিয়ায় চার দ্বীপপুঞ্জ চীনে এলাকার চৌহদ্দি আর কী। গোল বেধেছে যেমন হুসিশা কিনা পারাসেল নিয়ে তেমনই নানশা কিনা স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ নিয়েও। পারাসেলে যেমন জেঁকে বসেছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা তেমনই আরো দক্ষিণে স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জেও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও অনেক ছোট-বড়-মাঝারি দ্বীপের সঙ্গে পারাসেল আর স্প্রাটলিও কব্জা করেছিল জাপানী ফৌজ। ১৯৫১ সনে সানফ্রানসিসকোতে ৪৮টা দেশ জাপানের বিলিব্যবস্থা করার জন্যে যে চুক্তি করে তাতে শর্ত ছিল তার জবরদখল সব এলাকার ওপর স্বত্ব-স্বামিত্ব ছেড়ে দেবে জাপান। সে ফর্দে পারাসেল আর স্প্রাটলি দ্বীপের নামও ছিল।

সে চুক্তি যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা কিন্তু একটা কাঁচা কাজ করেছিলেন—কোন দেশের ভাগে পারাসেল আর স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ পড়বে তা তাঁরা খুলে বলেন নি। লোকজনের বসতি যদি দুটো দ্বীপপুঞ্জে থাকতো তা হলে না হয় ধরে নেওয়া যেত তারা স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু দুই দ্বীপপুঞ্জই তো ফাঁকা—ওরই মধ্যে গোটা দুয়েক দ্বীপে দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা আড্ডা গেড়েছিল। লোক তাদের ছিল নামমাত্র। পাহারাদার ছিল পাটল দ্বীপে ১৯০ জন। রবার্ট আর মানি দ্বীপে পনেরোজন করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা বলছে পারাসেল দ্বীপ তারা ভোগদখল করছে অনেক দিন থেকে। ১৮১৬ সনে তাদের সম্রাট গিয়া লং নিজের হাতে ভিয়েতনামের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন পারাসেলে। আর একজন সম্রাট সেখানে বানিয়েছিলেন একটা প্যাগোডা। তাদের দেশ যখন ফরাসীরা দখল করে তখন পারাসেল-স্প্রাটলিও যায় তাদের হাতে—লড়াইয়ের সময় ফরাসীদের হটিয়ে সেখানে জেঁকে বসে জাপানীরা। তারা বিদেয় হবার পর নিয়মত তখন পারাসেল স্প্রাটলি তো তাদের হাতেই ফিরে আসার কথা—ফিরে এসেছেও নাকি তা-ই।

অত কচকচানি শুনতে চীন রাজী নয়। তার মতে ইতিহাসের সাক্ষ্য তাঁর দিকে। জাপানীরা চলে যেতে দ্বীপগুলো অর্শেছিল জাতীয়তাবাদী চীন সরকারে, তারপর কম্যুনিস্ট সরকারে—ভিয়েতনামের কথা ওঠে কোথা থেকে? তাইওয়ান জাতচীনের বিরোধী হলেও তারও মত হচ্ছে দ্বীপগুলো চীনেরই অর্থাৎ তারই; কেননা, এখনও তার দাবি গোটা চীনের বৈধ সরকার হচ্ছে চিয়াংকাইশেকের কুওমিনটাং সরকার। চীনেদের ছোট একটা ঘাঁটি কিন্তু ১৯৫০ সন থেকে ক্ষুদে একটা দ্বীপে আছে। জেনে-শুনেও তাতে আপত্তি করে নি ভিয়েতনামীরা সম্ভবত চীনেদের ঘাঁটাতে চায়নি বলে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী চীনের কাছে ও সব ভালোমানুষির কোনও দাম নেই। ১১ জানুয়ারি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামকে কম্যুনিস্টরা। তারপর কথা না বাড়িয়ে আচমকা হানা দিয়ে দখল করে নিয়েছে পারাসেল। রীতিমতো একটা অভিযান চালিয়েছিল চীনেরা। ১৪টা যুদ্ধ জাহাজ, একদঙ্গল বিমান আর বেশ কিছু লোকলস্কর নিয়ে তারা চড়াও হয়েছিল পারাসেলের ওপর। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই কেল্লা ফতে। পুরো দ্বীপপুঞ্জ আজ চীনের দখলে—তাদের কবল থেকে পারাসেল দ্বীপ দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা আরও কোনও দিন উদ্ধার করতে পারবে বলে মনে হয় না।

লড়াই করার সাধ্য তাদের নেই। সে বৃথা চেষ্টা তারা করেও নি। ধরনা দিয়েছিল নিরাপত্তা পরিষদের কাছে, অর্জি পেশ করেছে আন্তর্জাতিক আদালতে। তাদের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেছেন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি কেন্টা, রিকার বিদেশ মন্ত্রী গনজালো দাসিও। আন্তর্জাতিক আদালতেও কিছু কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। চীনেদের চটাতে এখন কেউ আর চাইছে না। বলা হয়েছে দ্বীপগুলোয় জনমানব নেই কারুর বাস্তু হাতছাড়া হয়নি, এ নিয়ে অত খামোখা ঘোট পাকানো কেন? কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড কেন চীন করতে গেল? এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলছেন ও এলাকার জলের তলায় তেলের খোঁজ মিলেছে। স্প্রাটলিকে নিজের দেশের জেলা বানিয়ে চারটে বিদেশী কোম্পানিকে তেল খোঁজার ইজারা দিয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম। আগেভাগে তাই দখল নিয়ে তার মতলব ভণ্ডুল করে দিল চীন। কথাটা একদম মিথ্যে নয়। এখন থেকে দখল না নিলে কালক্রমে গোটা ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট হয়ে গেলে মুশকিলে পড়বে চীন। কারুর মতে আবার চীন চায় সমুদ্রের তীরে দেশগুলোর সীমানা হোক দুশো মাইল পর্যন্ত প্রসারিত। ব্যাপারটা নিয়ে বৈঠক বসছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এ বছরই। তার আগেই চীন কাজ সেরে রাখলো নিজের এলাকার চৌহদ্দি বাড়িয়ে। কেউ আবার বলছেন নিজের গদি বজায় রাখার জন্যে চু এন লাইয়ের এ এক চাল। তিনি দেখাতে চান, চীনের এক টুকরো জমিও তিনি কাউকে ছাড়তে রাজী নন হোক না তা আগাছাভরা রুক্ষ দ্বীপ।

কাম হয় নাম

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তুমিই প্রথমতমা, হে কামেশী, লোল অগ্নিশিখা,
প্রবর্তিকা বেগ-বিধায়িকা
সসাগরা ধরিত্রীর একক নায়িকা।
সমস্ত কর্মের মূলে মহীয়সী তুমি উত্তেজনা
তুমি নেই, কিছু নেই, নেই তবে ঈশ্বর-কামনা।

মনোগুপ্তা, তোমার গোপন গর্ভে দিব্য-প্রেম-ভ্রূণের সঞ্চার
তোমার সূতিকাগারে জন্ম হয় মহা অভীপ্সার
তুমিই প্রেমের ধাত্রী, মাতৃসমা, শুশ্রূষাকারিণী
মুক্তবন্ধ আনন্দের ছন্দ-মন্দাকিনী—
প্রেম ক্রমে বড় হয়ে পূজা হয়, সর্বাস্তিত্বে স্তুতি,
বিস্তারিত করে দেয় দিকে-দিকে আত্মার বিভূতি
বন্দী আর থাকে না শরীরে
ক্ষণতৃপ্ত অনিত্য ইন্দ্রিয়ে,
রম্য হতে নিয়ে যায় পারম্যের তীরে
উত্তরণ করে দেয় উদ্ভাসিত প্রশান্ত তুরীয়ে।

মৃত্তিকা মৃদঙ্গ হয়, মৃদঙ্গার হয় যে হীরক
কাংস্য পায় কাঞ্চনত্ব, কমলতা পায় যে কণ্টক,
লুপ্তবীজ বিস্ববৃক্ষ হয়ে যায় অমৃতবল্লরী
অমাবস্যা কেটে গিয়ে দেখা দেয় শুভ্র কোজাগরী-
উপচিত হতে-হতে ঘনীভূত কাম হয় নাম
প্রকৃষ্ট নামের অর্থ প্রপূর্ণ প্রণাম।
অবিরাম ঊর্ধ্ব-পরিণাম ॥

শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সংকটের একটি দিক

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড়। শিক্ষা শুধু যে ব্যক্তিগত জীবনকেই পূর্ণতা প্রদান করে থাকে তা নয়; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কেও নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রে, বেকার সমস্যার প্রতিবিধান করার ক্ষেত্রে এবং দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করে অনাগত ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলতে শিক্ষাক্ষেত্রের ভূমিকা নতুন করে বিচার করার অবকাশ যথেষ্ট আছে। আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যার যে তীব্রতা দেখতে পাচ্ছি তার মূলে কারণ নিহিত আছে পরিকল্পনা বিহীন শিক্ষা নীতির মধ্যে। পৃথিবীর বহু দেশে বিশেষ করে অনেক উন্নতিশীল দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হয় বটে, কিন্তু সব দেশেই যে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়ে থাকে তা নয়। এক্ষেত্রে নাইজিরিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেদেশে জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশ শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু যে হারে উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা বেড়েছে সে হারে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়নি। ভারতের সমস্যা একটু আলাদা। ভারতে শিক্ষাখাতে যতটা অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত ছিল ততটা এখনও করা হয়নি। আবার যেভাবে শিক্ষাখাতে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রের ভূমিকাও যথোপযুক্ত হয়নি। ভারতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রচুর; আগামী দশ বছরেও শিক্ষিত বেকারদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায় না। অথচ ভারতে সামগ্রিকভাবে ৪০ শতাংশ লোক এখনও শিক্ষিত নয়। জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ যদি শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ করা হয় তবে অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে,—কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা হয়নি। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় শিক্ষাখাতে ১৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দের ছাঁটকাটের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাতে প্রয়োজন মিটবে না,—এই স্বীকৃতি স্বয়ং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে আর্থিক সংকট আমরা দেখতে পাচ্ছি তার অনেক দিক বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই শিক্ষকদের বেতন কাঠামো সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিলেই সমগ্র দেশের অবস্থা অনেক পরিষ্কার হবে। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ বে-সরকারী কলেজে (মিশনারী কলেজ অথবা নতুন স্থাপিত অল্প কয়েকটি কলেজ বাদে) আমরা দেখতে পাই নিদারুণ আর্থিক সংকট। ঘাটতির চাপে বহু কলেজ শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দিতে পারছে না; কলেজ শিক্ষকদের বেতন আসে দুটি উৎস থেকে,—একটি হল কলেজ এবং অপরটি হল সরকার। কলেজের টাকা সব সময় নিয়মিত পাওয়া যায় না,—সরকারের টাকাও নিয়মিত পাওয়া যায় না। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর এস এন সেনের সভাপতিত্বে সেন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের শিক্ষকদের জন্য যে নতুন বেতন হারের সুপারিশ করেছেন তা এখনও কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না সরকারের আর্থিক অভাবের দরুণ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নুরুল হাসান বলেছেন যে, কলেজ শিক্ষকদের বেতন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লাশ ওয়ান

অফিসারদের সমহারেই হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক আছেন,—তাঁদের বেতন-হারও আলাদা, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার এবং কলেজ লেকচারারের বেতন-ক্রম একই পর্যায় রাখা যায় কিনা সে সম্পর্কেও চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু তা-ও করা সম্ভব হচ্ছে না আর্থিক টানাটানির দরুণ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও একই সমস্যা। সমাজে এতকাল ধরে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণই অবহেলিত হয়ে এসেছেন। যখনই তাঁরা বেতন-বৃদ্ধির জন্য ন্যায়সঙ্গত দাবি পেশ করেছেন তখনই তাঁদের আর্থিক টানাটানি ও বাজেট ঘাটতির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারের সব খরচের টাকা জুটতে পারে—সরকারী শিল্প-উদ্যোগে ও অন্যান্য সরকারী সংস্থায় অর্থের অপচয় হতে পারে, সমাজের সর্বস্তরে মজুরি-কাঠামোর পুনর্বিন্যাস হতে পারে, কিন্তু টাকার অভাবের প্রশ্ন আসে শিক্ষকদের বেতন-হার পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে। অথচ দেশ-গঠনের কাজে তাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশি অবহেলিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সংকটের আরেকটি প্রভাব হল শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যর্থতা। বহু কলেজ সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত; কোন কোন কলেজ সরকারী অনুদান পেয়ে থাকে বটে, তবে তা-ও প্রয়োজনানুযায়ী নয়। ভারতের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২১০টি কলেজ আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ছাত্র ও শিক্ষক আছে,—বিশেষকরে স্নাতকোত্তর ক্লাসগুলিতে যত ছাত্র আছে,—সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সবচেয়ে কম মাথাপিছু সাহায্য পেয়ে থাকে। নয়াদিল্লীর জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে সরকার কত টাকা ঢালছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য কত টাকা খরচ করছেন তার তুলনা করলে বিস্মিত হতে হয়। টাকার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বেসরকারী কলেজগুলিতে ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ হচ্ছে না। বহু কলেজে উপযুক্ত পরিমাণে লাইব্রেরীতে বই কেনাও সম্ভব হচ্ছে না। এই আর্থিক সংকটের কি কোন প্রতিকার নেই?

বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নে সম্প্রতি সরকার অর্থ-বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ-নীতি এমন হওয়া উচিত যেন তা বেকারের সংখ্যা না বাড়িয়ে অধিকতর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। মানবিক মূলধনে বিনিয়োগ (Investment in human capital) অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার একটি অপরিহার্য অঙ্গ, এবং এই বিনিয়োগ নির্ভর করে একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা-নীতির উপর। শিক্ষাক্ষেত্রে যে নীতি অনুসৃত হবে তা উন্নয়নমুখী ও কর্ম-সংস্থানের পক্ষে সহায়ক হওয়া চাই,—সে-ভাবেই শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে পারে। সেজন্য এক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দ ছাঁটাই করা কোন সময়েই সমর্থন-যোগ্য নয়।

সুব্রত গুপ্ত

হাতি

সুব্রত সেনগুপ্ত

চারজন লোক শহরে এসে উপস্থিত হলো। তারা কোনো দিন হাতি দেখেনি। হাতি দেখতে চায়। হাতি দেখেছে এমন লোকের সঙ্গে যদিও তাদের কখনও দেখা হয়নি, হাতির কথা তারা অনেক শুনেছে। যেমন হাতি বলে একটা আশ্চর্য প্রাণী আছে। তারা শুনেছে হাতি দেখতে পাওয়া যায় বনে আর শহরে রাজবাড়ির কাছাকাছি। তবে হাতি দেখতে কেমন তা তারা সঠিক জানে না। তবে দেখতে নিশ্চয় খুব ভালো। তারা যাদের কাছে শুনেছে তারা আবার অন্য কারও কাছে শুনেছে। শুনে শুনে হাতি কী রকম—তার স্পষ্ট ধারণা না হলেও, এটা তারা বুঝে গেছে যে, ভগবান যখন চোখ দিয়েছেন, হাত-পা দিয়েছেন, হাতিটা কি ব্যাপার ঠিক ঠিক জানতে হবে। তাই তাদের শহরে আসা, অন্য কোনো কারণে নয়।

হাতি দেখার জন্য তারা পরিশ্রমও কম করেনি। সূর্য ওঠার আগে যে যার বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আর সমস্ত রাস্তা এসেছে পায়ে হেঁটে। আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে গেলো। একেই অচেনা অজানা জায়গা, সন্ধ্যেবেলা আর কোথায় যাবে? সঙ্গে যা খাবার ছিলো খেয়ে তারা একটা গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাত্রিবেলা রাজার লোকেরা তাদের চোর মনে করে ধরে বেঁধে নিয়ে গেলো। ফলে গাছতলার পরিবর্তে তাদের রাজার জেল-খানায় রাত কাটাতে হলো। খুব যে ভালো কাটল, তা বলা যায় না।

ধরা পড়ার আগে একজন স্বপ্ন

দেখছিলো যে, শহরে হাতি দেখে সে গ্রামে ফিরে গেছে। গ্রামের সব লোক বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েরা তার কাছে হাতির গল্প শুনতে এসেছে। আর একজন স্বপ্ন দেখছিলো, গ্রামে ফিরে হাতির ভাবভঙ্গিমা নকল করে, হাতির ডাক ডেকে সে বেশ দু-চার পয়সা রোজগার করছে।

এখন জেলখানায় স্বপ্ন দূরে থাকুক, চৌকিদারের মারগুঁতো খেয়ে, দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় না ঘুমিয়ে কারও গালে হাত দিয়ে, কারও হাঁটুতে মুখ গুঁজে বাকী রাত কাটলো।

সকালবেলা চৌকিদার চারজনকে রাজার সামনে উপস্থিত করে বললো, রাজামশাই, এরা সব চোর। কাল রাতে ধরা পড়েছে। আপনার একান্ত অনুগত, সদা সতর্ক, সদা সজাগ এই চৌকিদারের লোকেরা এদের ধরে এনেছে। অতএব—

চৌকিদারের কথা শেষ হবার আগেই চারজন তারস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, তারা চোর নয়। কোনো দিন চোর ছিলো না এবং ভবিষ্যতেও তাদের চোর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

রাজা তখন একজন মন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন তিনি যাতে এদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

মন্ত্রী উঠে বললেন, এদের যখন চোর হিসেবে ধরা হয়েছে এবং জেলে রাত কাটিয়েছে তখন এরা নিশ্চয় চোর। (চৌকিদার ভাবল, মন্ত্রী তার পক্ষে।) কিন্তু চৌকিদার কি এদের চুরি করতে দেখেছে? (চারজন ভাবল, মন্ত্রী তাদের পক্ষে।) অথবা,

চৌকিদার কি কারও কাছ থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছে যে, এরা চুরি করেছে?

তা না হলে আমাদের জানা দরকার, তাদের কি অবস্থায় ধরা হয়েছে? কখন ধরা হয়েছে? কেন ধরা হয়েছে? চৌকিদারের যখন মনে হয়েছে যে, এরা চোর তখন তার পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে, থাকলে কি, অথবা কি কি? আর চারজনের যখন বক্তব্য, তারা কোনো কালেই চোর ছিলো না, বর্তমানে চোর নয় এবং ভবিষ্যতেও চোর হবে না তার পেছনেও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে, থাকলে কি এবং কি কি?

তাছাড়া আমাদের জানতে হবে উভয় ক্ষেত্রে চোর শব্দের ব্যাপ্তি কতখানি? (চৌকিদার এবং চারজন বুঝতে পারল না, মন্ত্রী কোন পক্ষে।)

চৌকিদার এবং চারজন মিথ্যা না বলে এবং/অথবা সত্য গোপন না করে কারণগুলি ব্যাখ্যা করুক।

তখন চৌকিদার যা যা হয়েছিলো বিস্তারিতভাবে বলল। তারপর চারজন বিস্তারিতভাবে বলল, যা যা হয়েছিলো।

সবার বলা শেষ হলে, মন্ত্রী তাদের জেরা করতে লাগলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের দেখে চৌকিদারের কি কি কারণে তারা চোর নয় মনে হয়নি। তাদের জেলে নিয়ে আসার আগে চৌকিদার ভেবে দেখেছিলো কিনা, ভুল লোকের শাস্তি হলে, রাজার ন্যায়দণ্ড তার জন্য কি শাস্তি বিধান করবে?

এবং ঐ চারজনের কেন হাতি দেখার ইচ্ছে হয়েছিল? তারা কি নিশ্চিত ছিলো যে, এই শহরে হাতি আছে? নিশ্চিত থাকলে, কিভাবে, কোন উপায়ে তারা জানতে পেরেছিলো? এবং কখনও এমন কি স্বপ্নেও, তাদের মনে একটি হাতির অধিকারী হওয়ার বাসনা জন্মেছিলো কিনা?

জেরা শেষ হলে মন্ত্রী রাজাকে বললেন, কোন পক্ষের বক্তব্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অতএব প্রমাণ হলো যে, চৌকিদার যা যা বলেছে তা ঠিক নয়। আরও প্রমাণ হলো যে, চারজন যা যা বলেছে

তাও ঠিক নয়। কাজেকাজেই যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলো, সে সেখানে সে অবস্থায় ফিরে যাক।

তখন একজন আইনজ্ঞ মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে, সমস্ত ঘটনার সূত্রপাত রাত্রিবেলা হয়েছিলো। কাজেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হলে রাত্রির অন্ধকার চাই। এখন রাত না হওয়া পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে এই চারজন এবং চৌকিদার কি করবে?

যে মন্ত্রী এতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন সঠিক প্রশ্নের, সঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন।

এই অবস্থায় রাজা ঐ চারজনকে মুক্ত করে হাতিশালে নিয়ে গিয়ে যে-কোনো একটি হাতি দেখানোর আদেশ দিলেন। হাতি দেখানোর দায়িত্ব পড়ল সেই চৌকিদারের ওপর।

চৌকিদার চারজনকে হাতি দেখাতে নিয়ে গেলো। কিন্তু রাগে তার গা জ্বালা করছিলো। এদের জন্যই আজ তাকে রাজার সামনে অপমানিত হতে হয়েছে। তাই চৌকিদার ওদের হাতি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার সময় চোখ বেঁধে নিয়ে গেলো। এই চোখ বাঁধছ কেন বলে ওরা হইচই শুরু করলে, চৌকিদার তাদের বোঝালো, হাতি দেখার এই নিয়ম। খালি চোখে হাতি দেখা যায় না। চোখ বেঁধে দেখতে হয়। হাত দিয়ে অনুভব করতে হয়, হাতি কি রকম। ওরা ভাবল, কি জানি তাই হবে।

চোখ বেঁধে মনের আনন্দে হাত দিয়ে তারা হাতি দেখতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণ দেখার পর চৌকিদার তাদের হাতিশালা থেকে বার করে আনলো। বাইরে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে চৌকিদার যখন তাদের চোখের বাঁধন খুলেছিল, উত্তেজনায় চারজনই কাঁপছিলো। চারজনেই ভাবার চেষ্টা করছে, তারা হাত দিয়ে কি দেখলো? দেখে তাদের মনে হচ্ছে—কি একটা মনে হচ্ছে। তারা বলাবলি করতে লাগলো, সত্যি আজ তাদের জীবনে একটা দিনের মতো দিন। পাঁচজনকে বলার মতো আজ একটা অভিজ্ঞতা হলো।

ঃ হাতি দেখতে কেমন সরু, লম্বা অদ্ভুত—তবে যে কি রকম শুনেছিলাম!

ঃ ধ্যাত কি বলছিস? লম্বা ঠিকই ব সরু কোথায়। বেশ মোটা, দু' হাত য় ধরতে হয়।

ঃ বলিস কি? তুই বলছিস সরু আ তুই বলছিস দু' হাতে ধরা যায়! তোর না বলছিস তার থেকে আরো অনেক মোটা—এই এত মোটা, ঠিক একটা থামের মতো।

আমি ঠিকই বলেছি। মোটা সন্দেহ নেই, তবে অত মোটা নয়। আমি দু' হাতে ধরে দেখেছি। আর লম্বা হলেও মাঝে মাঝে কেমন বেঁকে ওঠে, বেঁকে ওঠে আবার সোজা হয়ে যায়। কেমন কাঁপে—

ঃ কি যা তা বলছিস! বেঁকে ওঠে, নড়ে—পাগল নাকি! হাতি এত মোটা একটুও নড়ে না। আমি দু হাতে জড়িয়ে ধরে দেখেছি—একটুও নড়াতে পারিনি।

যে তিনজন তর্ক করছিলো তাদের প্রথমজন হাতির শুধু লেজ, আর একজন শুঁড় আর অন্যজন শুধু একটা পা হাত দিয়ে দেখেছে। চতুর্থজন হাত দিয়ে দেখেছে শুধু হাতির একটা কান। সে বাকী তিনজনের বচসা শুনে খুব অবাক হয়ে বলে উঠলো, তোমরা কি চোখ বুজে ছিলি নাকি?

বলেই মনে পড়লো, তাদের তো চোখ বাঁধা ছিলো। তার মানে তো চোখ বুজে থাকাই। কিন্তু হাতি দেখতে কি রকম সে ঠিকই হাতিয়ে হাতিয়ে দেখেছে। হাতি দেখতে চ্যাপ্টা মতো। লম্বা নয়। মোটা না সরু এসব কথাই ওঠে না।

কিন্তু হাতি দেখতে চ্যাপ্টা মতো বলতেই বাকী তিনজন এক সঙ্গে হইচই করে উঠলো, বলে কি হাতি চ্যাপ্টা, হাতি চ্যাপ্টা—তোর মাথাও চ্যাপ্টা। তোর চামড়া মোটা, বুদ্ধিও মোটা তাই হাত দিয়ে হাতি চ্যাপ্টা দেখেছিস।

যে শুধু লেজে হাত দিয়েছিলো সে বলতে লাগলো, বুঝলাম ও ভুল বলছে। কিন্তু তোমরা যে কি করে বলছ হাতি এরকম মোটা, হাতি সেরকম মোটা, তা তো তাই বুঝতে পারছি না।

যে শুধু শুঁড়ে হাত দিয়েছিলো সে ভাবতে লাগলো, সে কি আমি কি এত ভুল করলুম! আমি নিজে হাতে দেখলাম তো, দেখলাম না হাতিটা একটু বেঁকে বেঁকে উঠছে?—একটু কাঁপছে?—কিন্তু বেঁকে ওঠার কথা তো আমি ছাড়া আর কেউ বললো না। সবাই ভুল করলো? সবাই ভুল করবে? না কি আমিই ভুল করলাম?

যে শুধু একটা পায়ে হাত রেখেছিলো, সে ভাবলো, এরা সব বলছে কি। এক হাতে (ধরা যায়, কেঁপে উঠছিলো! আবার এক ব্যাটা বলছে হাতি নাকি চ্যাপ্টা মতো! হলো কি? আমি যে এতক্ষণ ধরে দেখলাম! সত্যি আমি দু' হাতে জড়িয়ে ধরে দেখছি—এত মোটা। একটুও নড়াতে পারিনি। আর একটু চেষ্টা করলে কি পারতাম?

আর একজন ভাবলো, চ্যাপ্টা বললাম ঠিকই কিন্তু অত তাড়াতাড়ি শুধু হাত

ব্ঝিলয়ে চ্যাপ্টা না কি এত বোঝা যায় নাকি? তবে চ্যাপ্টাই মনে হলো। কিন্তু এতগুলো লোক কেউ বলছে মোটা, কেউ বলছে সরু, লম্বা বলছে। আমি ঠিক বলছি আর বাকী সবাই ভুল বলছে, তাই বা কি করে হয়! ধুত্তোরি—দোষ ঐ চৌকিদার ব্যাটার, কেন সবার চোখ বাঁধতে গেলো? কিন্তু ওই তো বলছিলো, হাতি দেখার ওরকম নিয়ম। হয়তো ও ঠিকই বলেছে হয়তো কেন নিশ্চয় তাই। নইলে চোখ বেঁধে ওর কি লাভ?

সেই মন্ত্রী যে সবাইকে জেরা করেছিলো, ওদের হয়ে রাজার কাছে অনেক কথা বলছিলো, ওদের হয়ে বলেছিলো না চৌকিদারের হয়ে বলেছিলো, তা অবশ্য বলা মুশকিল—সেই মন্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করলো, কি গো হাতি দেখলে, কেমন দেখলে?

চারজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। দেখেছে ঠিকই কিন্তু কেমন দেখলে?

ভালো, ভালো, খুব ভালো। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে! চারজন এক সংগে গলা মিলিয়ে বলে উঠলো।

মন্ত্রী তখন বললেন, ভালো কি হে। যাক গে, তোমাদের যখন ভালো লেগেছে, খুবই ভালো কথা। এখন সব ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও আর কি।

হঠাৎ সেই প্রথম লোক যে শুধু লেজে হাত রেখেছিলো সে জিজ্ঞেস করে বসলো, আজ্ঞে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, হাতি দেখতে কি রকম?

সে কি তোমরা এইমাত্র দেখলে দেখেটেখে আবার জিজ্ঞেস করছ, কি রকম?

না, মানে—বলুন না!

বলবো? কি বলবো, হাতি কেমন দেখতে? কেন হাতি দেখতে ইয়ের মতো?

কিসের মতো?

কিসের মতো—এই ধরো মোটা—

মোটা?

পেল্লাই মোটা, আর লম্বা—

লম্বা আঁ!

চওড়া—

চওড়া!

ভারী, নড়ানো যায় না—

নড়ানো যায় না?

শুঁড়টা লম্বা বাঁকানো, কান দুটো চ্যাপ্টা—

আঁ বাঁকানো? আঁ চ্যাপ্টা? বলেন কি?

লেজটা সরু—

সরু? বলেন কি! বলেন কি!

বলেন কি বলেন কি বলতে বলতে চারজন হো হো করে হাসতে লাগলো।

হলো কি, হাসির কি হলো?

আজ্ঞে আপনি চুপি চুপি আমাদের কথা শুনলো শুনেছেন বোধ হয়!

তোমাদের কথা আমি শুনেছি! তোমাদের কোন কথা?

কেন, হাতি নিয়ে আমরা এতক্ষণ যা বলাবলি করছিলাম। আমি বলছিলাম, হাতি দেখতে চ্যাপ্টা মতো, ও বলেছে হাতি সরু আর ওরা বলছে হাতি চ্যাপ্টাও নয় সরুও নয়, মোটা। আপনি বললেন চ্যাপ্টা, আবার বললেন সরু, আবার মোটাও বললেন! মানে আমরা যা যা বলেছি আপনি তার সবগুলোই একসংগে বললেন। তবে কি হলো? হাতি তো একটা প্রাণী। আর একটা প্রাণী দেখতে একসঙ্গে কি করে এতরকম হবে, আপনিই বলুন না?

তোমরা কি বলছ? আমি তোমাদের বানিয়ে বানিয়ে বলছি? এত সাহস তোমাদের?

আজ্ঞে, আমাদের মাপ করুন। আমাদের সাহস কি যে, আপনার মুখের ওপর কথা বলি। কিন্তু কি বিপদ বলুন দেখি! হাতি দেখতে কি রকম আমরাই তাই নিয়ে ঝগড়া করছিলাম। তার মধ্যে আপনি, কিছু মনে করবেন না, ধাঁধাঁ আরও বাড়িয়ে দিলেন। মানছি আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা একবার ভাবুন। আমরা গাঁয়ের লোকদের বলে এসেছি, হাতি দেখতে শহরে যাচ্ছি। ফিরে গেলে সবাই জিজ্ঞেস করবে, হাতি দেখতে কি রকম—তখন আমরা কি জবাব দেবো? যদি বলি দেখিনি—কেউ বিশ্বাস করবে না। তার ওপর মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু ছাই বুঝতেও তো পারছি না সত্যটা কি? আমি যদি গিয়ে বলি যে, হাতি চ্যাপ্টা, তবে ও বলবে যে, না লম্বা। ও যদি বলে, মোটা, তবে এ বলবে, সরু। বিশ্বাস করুন, আমরা সত্যি সত্যি এরকম দেখেছি। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, বানিয়ে বলছি না। কিন্তু গাঁয়ে সত্যি কথা বললে সবাই ভাববে শহরে গিয়ে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নয়তো আমাদের কোনো মতলব আছে। বলুন তো, আপনিই বলে দিন এখন আমরা কি করব?

মন্ত্রী মশাই কি বলবেন ভাবতে লাগলেন। সত্যি এই লোকগুলো তার সংগে রসিকতা করার সাহস পাবে মনে হয় না। কিন্তু এদের সমস্যাটাও অদ্ভুত! কিন্তু এদের এ অবস্থা হলো কেন?

খুব জোর দিয়ে তিনি ওদের বোঝাতে লাগলেন, শোন, শোন, তোমাদের নিশ্চয় কোন ভুল হয়েছে। কিছুতেই বুঝতে পারছি না—যাই হোক, আমি বলছি আমি যেরকম যেরকম বললাম সত্যিকার হাতি দেখতে ঠিক সেরকম—

সত্যিকার হাতি দেখতে ওরকম! তাহলে তারা কি মিথ্যে হাতি দেখেছে? চারজন ভাবলো, মন্ত্রী যখন বলছেন, হয়তো ঠিকই বলছেন কিন্তু কিন্তু তারা যে ওরকম দেখেনি তাও তো ঠিক। একেই তারা চারজন চার রকম দেখেছে। আবার মন্ত্রী এসে যা বলছেন

তাদের কারও সংগে মিলছে না। এখন যদি চৌকিদার এসে বলে, হাতি, সত্যিকার হাতি এসব কিছুই নয়, অন্য রকম। আবার রাজা হয়তো বলবেন, সত্যিকারের হাতি আরো রকম। একটা জিনিস সত্যি সত্যি কতোরকম হবে!—তবে? থাক গে মরুক গে। হাতি দেখতে যেমন খুশি হোক গে। এক শ' রকম হোক। দু' শ রকম হোক। এবার তারা তাদের বাড়ি ফিরে যাবে। গ্রামে ফিরে যাবে। ব্যাস।

এই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো সেই চৌকিদার।

আরে মন্ত্রী মশাই, আজ্ঞে আপনি এখানে? আরে এই বেটা, হাতি দেখেছিস? কি রকম দেখলি? শখ কত হাতি দেখবে!

চারজন তখন ভয়ে ভয়ে চৌকিদারকে বলতে লাগলো, তারা কে কি দেখেছে। কিন্তু তাদের কথা শেষ হওয়ার আগেই চৌকিদার বলে উঠলো, দেখুন মন্ত্রীমশাই, দেখুন। আপনি বললেন তাই—আমি কিন্তু তখনই পেরেছিলাম, ব্যাটারা মিথ্যেবাদী। দেখুন, আবার চালাকি দেখুন, এক একজন এক একরকম বলছে। বাহ্, বাহ্, এখন চল তাদের রাজামশায়ের কাছে নিয়ে যাই। এবার প্রমাণ হয়ে যাবে তোরা চোর কিনা।

মন্ত্রীর কিন্তু তখনও কেমন সন্দেহ হচ্ছিলো। তিনি ওদের বললেন, তোমাদের কি হয়েছে, সত্যি কথা বল তো—

চারজন কেঁদে বললো, হুজুর আমরা, বিশ্বাস করুন, সত্যি কথাই বলেছি।—একজন ভাবলো, চোখ বাঁধার কথাটা জিজ্ঞেস করবে কিনা। কিন্তু জিজ্ঞেস করে কি হবে? তা ছাড়া চৌকিদার যদি আরও ক্ষেপে যায়?

চৌকিদার ধমকে উঠলো, না, তোরা মিথ্যে কথা বলছিস। সব সময় তোরা মিথ্যে কথা বলিস। ভেবেছিস আমার হাত থেকে রেহাই পাবি? বলে কিনা হাতি চ্যাপ্টা, বলে কিনা হাতি সরু—দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা—

চারজন একসংগে হাত পা ছুঁড়ে চেঁচামেচি শুরু করলো। বাড়ির লোকেদের জন্য তাদের মন কেমন করতে লাগলো। কেন যে তাদের হাতি দেখার সাধ হয়েছিলো। কিন্তু ভগবানের দোহাই, তারা মিথ্যে কথা বলছে না। কিন্তু তাদের এখন ছেড়ে দেওয়া হোক। চারজন তারা চার রকম বলেছে ঠিকই—কিন্তু তারা কি করবে? তারা যে ঐ রকমই দেখেছে। এই নিয়ে তারাও তর্কবিতর্ক করছে। কিন্তু সে যাক গে, দোহাই মন্ত্রীমশাই যেন তাদের কথা বিশ্বাস করেন—

ওদের কথা শুনে চৌকিদার একেবারে লাফাতে লাগলো, মিথ্যেবাদী, চোর, তোদের আমি দেখে নেব।

মন্ত্রী ভাবতে লাগলেন, সত্যিই তো, এদের কথা শুনে তো মনে হয় না, এরা মিথ্যে বলছে, বানিয়ে বানিয়ে বলছে—অথচ ওরা যেরকম বলছে সত্যিকার হাতি দেখতে মোটেই সেরকম নয়।

মন্ত্রী ভাবলেন, ওদের ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়া দরকার। নইলে ওরা শুধু ভুল করবে না, ভুল প্রচারও করবে। কিন্তু কিভাবে এদের ভুল শুধরে দেওয়া যায়? আর একবার নিজে ওদের সত্যিকার হাতি দেখাতে নিয়ে যাবেন? একবার চৌকিদারের দিকে, একবার চারজনের দিকে মন্ত্রীমশাই তাকালেন। তারপর ওদের বললেন, চল তো আমার সংগে।

চৌকিদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলো। ওরা কি বলবে ঠিক করে উঠতে না পেরে, কি হতে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে মন্ত্রীর পেছন পেছন চলতে লাগলো।

হাতিশালার দিকে কিছুটা পথ যাওয়ার পর মন্ত্রীর সংগে এক মাহুতের দেখা হলো। সে বললো যে, সে হাতি বার করতে যাচ্ছে।

মন্ত্রী চারজনকে নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন, কারণ মাহুত হাতি নিয়ে এই পথেই আসবে।

কিছুক্ষণ পর ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনে যেদিক থেকে শব্দ আসছে চারজনই তাকালো।

হঠাৎ দৈত্যের মতো বিশাল জন্তুটাকে দুলে দুলে এদিকেই আসতে দেখে ভয়ে বিবর্ণ চারজন যে যেদিকে পারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো।

মন্ত্রী হতভম্ব হয়ে ব্যাপারটা দেখলেন। তারপর তাদের পেছনে ছুটতে ছুটতে হাত তুলে চিৎকার করতে লাগলেন, সত্যিকারের হাতি, সত্যিকারের হাতি—

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

না, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নয়।* বিশ শতকের প্রথমআর্ধে এক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই নামে 'গৃহহারা' বলে একখানি উপন্যাস পাওয়া যাচ্ছে। বইটি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রকাশিত আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ৫৩তম বই। প্রকাশকাল, আষাঢ় ১৩২৭। মানে ইংরেজির ১৯২০-র জুন-জুলাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৶°+১৪৪। মুদ্রক অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল। 'সিদ্ধেশ্বর প্রেস', ১১নং যদুনাথ সেনের লেন, কলকাতা।

'গৃহহারা'-র মুখবন্ধে বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসের প্রতিপাদ্যকে বলেছেন, ক্রম-বিকাশের ফলে মানুষের চরিত্র জটিল হচ্ছে। তার মনের সূক্ষ্মতা বাড়ছে। বাইরের কাজ দিয়ে তাকে অনেক সময় ধরা যায় না। কিন্তু আধুনিক নাটক উপন্যাস মানুষের ভেতরটাকে পাঠকের কাছে উদ্ঘাটিত করছে। এই আধুনিকতার আরও এক বিশেষত্ব—পারি-পার্শ্বিক অবস্থা মানুষকে কত অভিভূত, পরিবর্তিত করছে তারই অভিব্যক্তিতে। এ রচনা আধুনিক মানুষের এত প্রিয় হয়েছে তার আপন জটিলতার, রহস্যের প্রতিচ্ছবিতে। স্টিভেনসন তাঁর গল্পে যেমন একই মানুষের মধ্যে তার পরস্পরবিরোধী সত্তার জটিলতাকে দেখিয়েছেন, তেমনি টমাস হার্ডি দেখিয়েছেন অতি সামান্য ঘটনা মানুষের নিগূঢ় ব্যক্তিত্বে কি নিবিড় বৈষম্য আনছে। আবার রোমা রোলাঁর, এইচ জি ওয়েলসের মত সাহিত্যের আচার্যরা এই সত্তার জটিলতা এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এই দুইয়ের সঙ্গে মানবজাতির বৃহত্তর সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশাকে গ্রথিত করে আর এক বিশিষ্টতাকে রচনা করেছেন।

বাঙলা সাহিত্যেও আধুনিকতার এই আবহাওয়া দেখা দিতে শুরু করেছে। এবং আরও করবে। বর্তমান গ্রন্থে এই আব-হাওয়াকে কতখানি রাখতে পেরেছে পাঠকরা তার বিচার করবেন।

বিভূতিভূষণের কথায়, "ক্রমবিকাশের ফলে মনুষ্যের চরিত্র যেমন জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে, সেইরূপে আবার চরিত্রের উপকরণ মনোবৃত্তিগুলিও ক্রমে সূক্ষ্মতর হইতে চলিয়াছে। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এখন আর বাহিরের সহজ কার্যে ধরা দেয় না; কার্যপ্রণালী হইতে স্বভাবের স্বরূপ নির্ণয় অসাধ্য সাধন হইয়াছে।

উদ্দেশ্যের জটিলতার ব্যূহ ভেদ করিয়া অন্তরের মানুষকে আবিষ্কার ও পাঠকের সহানুভূতিকে সংস্কারের সংকীর্ণ-গণ্ডী হইতে এইরূপে অনভ্যস্ত-ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া আধুনিক নাটক উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। আর একটি বিশেষত্ব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা চরিত্রের উপকরণ মনোবৃত্তি সমুদয়কে কতটা অভিভূত করিতে পারে এবং নির্লিপ্ত ব্যক্তি ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কতটা

গৃহহারা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ়, ১৩২৭
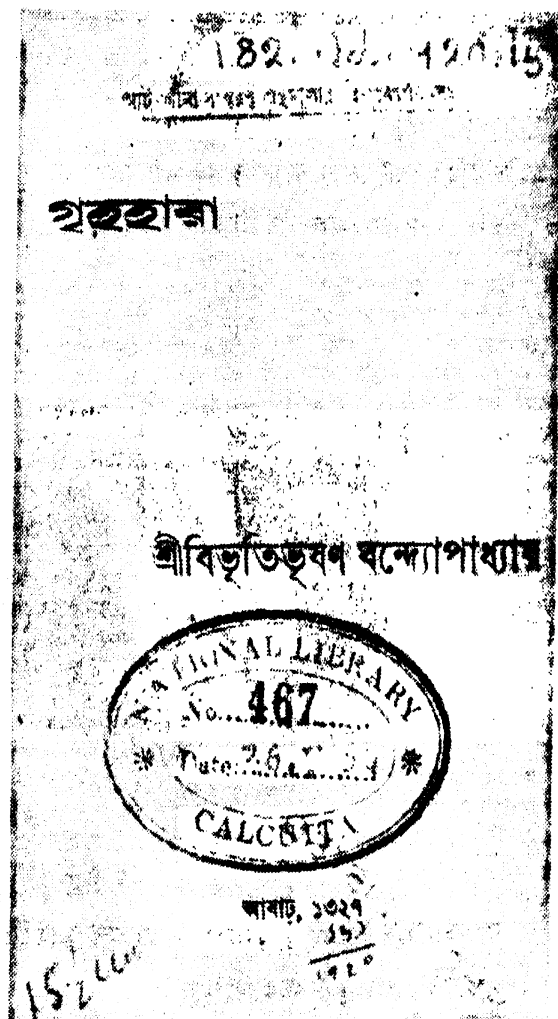
'গৃহহারা'র টাইটেল পৃষ্ঠার ছবি

*[বিষয়টি আমার নজরে প্রথম আনেন অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন। তাঁকে আমার

পরিবর্তিত হইতে পারে—তাহারই অভিব্যক্তিতে। নাটক ও উপন্যাস যে বর্তমান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার হইয়াছে, তাহার কারণ এই দুই বিশিষ্ট ধারা অবলম্বনে তাহারা বর্তমান যুগের জটিল ও প্রসারিত জীবন এবং মানবান্তর রহস্যময় পরিবর্তন পর্যায়কে নিত্য-নবভাবে প্রকাশ ও ব্যক্ত করিতে সমর্থ।

একদিকে যেমন স্টিভেন্সন তাঁহার ডাঃ জেকীল ও হাইড' নামক গল্পে একই দেহের মধ্যে দুই বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া এই জটিলতা ও রহস্যের প্রতিপাদনে উদ্যোগী, সেইরূপ অন্যদিকে থমাস হার্ডি সামান্য সামান্য ঘটনা, মানব-চরিত্রে ও এমন কি নিগূঢ় ব্যক্তিত্বে পর্যন্ত, কত বৈষম্য আনিয়া দেয় তাহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বর্তমান সাহিত্যগুরুগণ, রোমাঁ রোলাঁ, এচ্ জি ওয়েলস্ প্রভৃতি, এই দুই সূত্রের সহিত মানব-জাতির বৃহত্তর 'দুঃখ-সুখ আশা ও নিরাশা' যোজনা করিয়া গল্প সাহিত্যে নিজেদের প্রতিভার মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

বঙ্গদেশেও জীবনে এবং কয়েক বৎসর হইল যেন সাহিত্যেও এই আবহাওয়া আসিয়াছে। এই নূতন উপাদানে এখন বাংলার উপন্যাস গঠিত হইতে চলিবে। বর্তমান গ্রন্থে তাহার কতটা সদ্ব্যবহার হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

'গৃহহারা'র গল্প হচ্ছে, কলকাতার অদূরে এক গ্রাম থেকে প্রতিদিন ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে নরেশ কলকাতার একটা কলেজে অধ্যাপনা করত। তার চেহারার মধ্যে এমন একটা সংযমের ভাব ছিল যে বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করে বলত 'কাঠখোট্টা'। কিন্তু এই নরেশ যখন ক্লাসে কবিতা পড়ত তখন ছেলেরা বুঝত মাস্টারমশাই নতুন বিয়ে করেছেন।

নরেশের স্ত্রী মাধুরীর সমস্ত দুপুরটা একলা একলা কাটত। বাড়ি ফিরেও সে নরেশের একান্ত সহচর্য পেত না। কারণ নরেশ সব সময় বই নিয়েই থাকত। সময় সময় উপভোগ্য কোন কবিতা অনুবাদ করে স্ত্রীকে ডেকে শোনাত। জিজ্ঞাসা করত, কেমন লেগেছে ? মাধুরী সামান্য একটা কথায় 'বেশ' বলে থেমে যেত।

নরেশ মাধুরীর অপছন্দ বুঝতে পেরে প্রেমের কবিতা বেছে বেছে তাকে শোনাবে বলে একদিন ডাকল। রোমিও-জুলিয়েটের সেই অংশ যেখানে জুলিয়েটের সংজ্ঞাহীন দেহের পাশে বসে রোমিও কথা বলছে সেই জায়গা শোনাবে বলে প্রস্তুত। পড়ার আগেই মাধুরী প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা সেক্সপীয়ারের বিয়ে হয়েছিল ? তার স্ত্রী কেমন ছিল ? নরেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এর কোন সদুত্তর নেই। একটু বিরক্ত হয়েই সে বললে, সে শুনে তোমার কী হবে ? তারপর পড়তে শুরু করল। খানিকবাদে সে চোখ তুলে দেখলে, মাধুরী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সামনের কয়েকগাছি চুল ঘামে কপালে আটকে রয়েছে। নরেশ সেগুলো সরিয়ে মাধুরীকে চুম্বন করল। তারপর মনে মনে বলে উঠল, একেবারে পাষাণ, কবিতাতেও গলল না। তবু আমি তাকে ভালবাসি।

অনেকদিন বাইরে থাকার পর নরেশের এক মামাত-ভাই জ্যোতির্ময় গ্রামে ফিরে এল। এবং একদিন নরেশের বাড়ি এল। জ্যোতির্ময়কে দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর সে অভিনয় করে। জ্যোতির্ময় যখন উপস্থিত তখন নরেশ কলেজ যাবে বলে বেরচ্ছে। মাধুরী জ্যোতির্ময়কে জলখাবার দিয়ে গেল। নরেশ হাসলে। কিন্তু মাধুরীর কিরকম বিরক্তি লাগল। মনে হল, ইস, তার স্বামীর দাঁতগুলো কি বড় বড়। নরেশ খেতে বসলে মনে হল, ছ্যাঃ আঙুলগুলো কি মোটা মোটা, নখগুলো কি বড় বড় !

নরেশ কলেজে চলে যেতে মাধুরীর আজ নিজেকে কিরকম হালকা লাগতে লাগল। ইচ্ছে করছিল, সে যেন গান গায় বা কী হয় কিছু করে। অকারণে সে বালিশগুলোকে একবার মেঝেয় ফেললে। তারপর আবার বিছানায় তুললে। এঘর-ওঘর ঘুরে দীর্ঘ দুপুরটা কোনরকমে কাটল। কিন্তু বিকেলটা বড় দুঃসহ লাগে। এমন সময় পথের দিকে তাকাতে সে দেখলে, জ্যোতির্ময় আসছে। দরজা খুলে দিতে জ্যোতির্ময় জিজ্ঞাসা করলে, নরেশদা কলেজ থেকে ফেরেনি ? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই চেয়ার টেনে বসে পড়ল। খানিকবাদে নিজেই বললে, তাহলে বউদি, তোমাকে খুব মুশকিলে পড়তে হয়, ছাই না ? সারাটা দুপুর একলাটি কী কর ? জ্যোতির্ময়ের সহজ কথাবার্তা মাধুরীর খুব ভাল লাগছিল। মাধুরীর ইচ্ছে হল, আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নেয়। এক ফাঁকে সে দেখেও নিলে। সেই সঙ্গে আয়নায় সে দেখল আরও এক জোড়া চোখ তাকে দেখছে। প্রথমটা একটু বিমূঢ় হলেও মাধুরীর মনে হল তার এই নতুন ঠাকুরপোটির কথাবার্তা, চাউনি বেশ সহজ। এরপর নানা বিষয় নিয়ে দুজনে গল্প হতে লাগল। গ্রামের নীরস জীবন, কলকাতার সিনেমা-থিয়েটার। জ্যোতির্ময় জানলে, কোন কোন থিয়েটারে সে অভিনয় করেছে। নরেশ ফিরে আসতে নরেশ-জ্যোতির্ময়ে গল্প হতে লাগল। নরেশেরই জোরাজুরিতে যাবার সময় জ্যো[illegible] একটা গান শুনিয়ে গেল।

এরপর নরেশের উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে জ্যোতির্ময়ের আগমন ঘটতে লাগল। মাধুরীর মনের সেই বিরক্তিময় ভাবটাও নেই। এখন সে নরেশের কবিতার অনুবাদ শোনে। শুনতে শুনতে কী ভাবে। নরেশও খুব খুশি। সে ভেবে ঠিক করতে পারে না, এই উন্নতির বাহাদুরি কার ? সেক্সপীয়রের, শেলির, কীটসের, টেনিসনের না ব্রাউনিংয়ের ? এমনি করে একমাস কেটে গেল।

একদিকে যেমন স্টিভেন্সন তাঁহার 'ডাঃ নরেশকে ডেকে বললেন, নরেশ যদি দিনরাত বই নিয়েই থাকবে তাহলে ঘরে বউ আনবার কী দরকার ছিল? বউমা ছেলেমানুষ একলাটি থাকে। জ্যোতে পাজিটা রোজ রোজ অত যায় কেন? নরেশ জ্যোতির্ময়কে কোনদিনই সন্দেহ করেনি। কিন্তু চক্রবর্তীমশায়ের কথাটা আজ তার মনে লাগল। সেদিন যখন সে বাড়ি ঢুকছে তখন দেখল, জ্যোতির্ময় বেরচ্ছে। খুব গম্ভীরভাবেই নরেশ ঘরে ঢুকল। মাধুরী কিন্তু খুব হাসিখুশি। নরেশ আজ দান্তের ইনফারনো থেকে রিমিনির ফ্রানসেসকা যেখানে কবির কাছে তার অবৈধ প্রেমের কাহিনী বলছে সেই অংশ অনুবাদ করে শোনাল। শুনতে শুনতে মাধুরী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

পরদিন নরেশ কলেজ যাবার নাম করে জ্যোতির্ময়-মাধুরীর ব্যাপারটা পরখ করার জন্য ঠাকুরঘরে লুকিয়ে রইল। মাধুরীর মনে আজ একটা বিমর্ষতার ছায়া। জ্যোতির্ময় এসে উপস্থিত হল। মাধুরীর কিরকম ভয়-ভয় লাগছে, সেই সঙ্গে একটা উত্তেজনাও সে বোধ করছে। জ্যোতির্ময় বললে, বিয়ে সে করবে না কারণ কোন মেয়েকেই তার পছন্দ হয় না। মাধুরী কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলে, তার মানে আমার বিয়ে যদি না হত তাহলে তুমি আমাকেই বিয়ে করতে ? জ্যোতির্ময় বলে উঠল, আমি এখনও তোমাকে বিয়ে করতে রাজি। মুহূর্তের মধ্যে মাধুরীর মনে হল, ছি-ছি, একি বিষাক্ত সাপ নিয়ে সে খেলা করছিল ? অনুশোচনায় তার অন্তরটা জ্বলে যেতে লাগল। নরেশ পেছন থেকে সব কথা শুনলে।

সেদিন রাত্রে খাবার সময় সে মাধুরীকে বললে, গ্রামে বড় অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। চল দিনকয়েকের জন্য কলকাতা ঘুরে আসি। মাধুরী মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

নরেশ মাধুরীকে এনে তুললে কলকাতার এক বারবনিতালয়ে। 'এই একটু ঘুরে আসি' বলে সে বেরিয়ে গেল।

মাধুরীর কাছে গোলাপী বলে একটি মেয়ে উপস্থিত হল। তার মারফত মাধুরী জানল, এটা বাড়ি নয়, বেশ্যালয়। শুনেই

সে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং গোলাপী ইতাবসরে মাধুরীর নেকলেসটা সরিয়ে ফেললে।

এমনি করে দু'দিন কাটল। নেকলেস চুরি করে গোলাপীর মনে শান্তি নেই। এই নিষ্পাপ মেয়েটাকে দেখে তার কিরকম কষ্ট হয়। গোলাপী নেকলেসটা ফেরৎ দিয়ে দিলে এবং বললে, কাল সমস্ত দিন সে খায় নি। গোলাপীর সংগে মাধুরীর ভাব হল। মাধুরী জানতে চাইলে, কেন তুমি এই হলে? গোলাপী বললে, কেন হয়েছিলাম তা বলতে পারি না, তবে কেন হয়ে রয়েছি তা বলতে পারি। তারপর বললে, জগতে নারীর দুই শত্রু। এক সমাজ, অপর নারী নিজে। আমি দুইকেই নষ্ট করছি।

মাধুরী নরেশকে কাতরভাবে চিঠি লিখলে, আমায় ক্ষমা কর। আমি আর পারছি না। চিঠি পেয়ে নরেশের চোখে জল এল। তবু সে ভাবলে, আরও দিন-কয়েক তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজন। তারপর সে এসে নিয়ে যাবে।

মাধুরী নরেশের চিঠির জবাব না পেয়ে আরও ভেঙে পড়তে লাগল। শেষে সে লিখলে, দাসী বোধ হয় আর বাঁচবে না। একবার দেখা দিও। নরেশ যখন সেখানে উপস্থিত হল তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মাধুরীর প্রাণহীন গালের ওপর দিয়ে জলের রেখা গড়িয়ে পড়েছে। সেই জলের সংগে নরেশের চোখের জল মিশ্রিত হল।

বন্ধু প্রফুল্লের সাহায্যে মাধুরীর শেষ-কৃত্য সম্পন্ন করে নরেশ নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে এল। শূন্য চিত্ত, হতভম্ব।

নরেশ মাধুরীকে শেষ উপহার দিয়েছিল রজনীকান্তের একখানি বই। 'বাণী'। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখলে তাতে মাধুরীর হাতের লেখা। 'বাণী ভাল বই; সেক্সপীয়র খুব ভাল বই। সব ভাল বই।' নরেশ অনুভব করলে এই সামান্য সামান্য লেখগুলিতে মাধুরীর অন্তরের কতখানি অনুতাপ, অনুরাগ সঞ্চিত। নরেশ আজ অনুভব করলে, জীবনকে এতদিন সে কবিতার সংসারে দেখেছিল। সত্যি জীবন কত স্বতন্ত্র।

কলকাতা থেকে চলে আসার সময় সে বন্ধু প্রফুল্লকে বলে আসেনি। সেজন্য প্রফুল্ল তার বাড়িতে উপস্থিত হল। বুঝলে এই শ্বাসরোধী পরিবেশ থেকে বন্ধুকে নিয়ে না গেলে কিছু হবে না। নরেশকে সে কলকাতা নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করল। ট্রেন যেতে যেতে নরেশের মাধুরীকে নিয়ে যাবার স্মৃতি মনে পড়তে লাগল। জীবনের অনর্থের মূল বইগুলোর ওপর আজ তার রাগ হতে লাগল।

নরেশ প্রফুল্লকে জানালে, কলেজে সে আর কাজ করবে না। কী করবে তা সে

গৃহহারা

(১)

নরেশকে দেখিলে একটু নীরস বলিয়া স্বভাবতঃ মনে হইত, তাহার উজ্জ্বল চেহারার মধ্যে কেমন একটা তীব্র সংযমের ভাব ছিল, যা'তে তার বন্ধুবর্গ তার নাম দিয়াছিল 'কাঠখোট্টা'। কিন্তু এই মানুষই যখন কলেজের পাঠগৃহে উৎকর্ণ ছাত্রদের নিকট কবিতার ব্যাখ্যা করিত, তখন উপযুক্ত ছাত্রবৃন্দ হাড়ে হাড়ে বুঝিত যে, মাষ্টার মহাশয় নববিবাহিত। নরেশের নিকট আত্মীয় তেমন কেউ ছিল না, কলিকাতার অদূরে এক গ্রামে তার পৈতৃক বাটীখানি—তার মায়া সে ত্যাগ করিতে পারে নাই, আর কলিকাতার অপেক্ষাকৃত সুরুচিপূর্ণ জীবনও তাকে গ্রামের কোল হইতে টানিয়া আনিতে পারে নাই; বহু অসুবিধা-সত্বেও সে পাঠদশার যে "ডেলি-প্যাসেঞ্জার" সেই "ডেলি-প্যাসেঞ্জারই" রহিয়া গেল। এই সমস্ত কারণে দুপুর-বেলাটা প্রফেসার-পত্নী 'মাধুরী' ঘরখানির উপর নিজের একাধিপত্যটা নিরুদ্বেগে ভোগ করিয়া আসিতেছিল। নরেশ প্রায়ই পুস্তক নিয়া ব্যস্ত থাকে, মাঝে মাঝে একটা উপভোগ্য কবিতার অনুবাদ স্ত্রীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন লাগ্‌লো?" মাধুরীর এটা তত ভাল লাগিত না,

'গৃহহারা'র প্রথম পৃষ্ঠার ছাব

জানে না। প্রফুল্ল পরে তো বলে দিক। রাত্রে দুজনে একসংগে খেতে বসল। কিন্তু কেউই কোন কথা বলতে পারছে না। শেষে দুজনে শোবার নাম করে উঠে গেল। নরেশের চোখে ঘুম নেই। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর উপস্থিত হল সেই বাড়িতে যেখানে মাধুরী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। গোলাপী দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নরেশ তাকে চিনতে পারলে না। এই মেয়েটি মাধুরীকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় তার শিয়রে একটা সিঁদুরকৌটো দিয়েছিল। নরেশ এত রাত্রে তাকে দেখে দয়াপরবশ হয়ে টাকা দিয়ে ঘরে যেতে বললে। গোলাপী টাকা নিতে নারাজ। শীতের রাত্রে নরেশ তার গায়ের শালখানা গোলাপীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

তারপর অন্ধকার রাস্তায় ঘুরতে লাগল। তার চোখে ভাসে মাধুরীর মুখ, কুঞ্চিত কেশদাম। বৃষ্টি নামল। নরেশ বুঝতে পারছিল, তার স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। সে আত্মসম্বরণের খুব চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সবটাই তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমন সময় তার হঠাৎ নজরে পড়ল একটা কুকুরের বাচ্চা ভিজছে। সেটাকে সে কোলের ভেতর তুলে নিলে। নরেশের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। নিজেকে তার স্বাভাবিক বোধ হল। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

মনের এমন অবস্থায় দেশভ্রমণই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এই স্থির করে নরেশ বেড়াতে বেরল। প্রফুল্ল তাকে হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে এল।

যে জীবন গোলাপী যাপন করছিল সে জীবনে গোলাপীর ঘৃণা এল। সে স্থির করল না খেয়ে মরা এর চেয়ে ভাল। মাধুরীর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য নরেশের অনুশোচনাকে সে ভুলতে পারল না। মনে

মনে তাকে সে প্রণাম করলে। মৃত্যুকালে এক বারবনিতাও তাকে এই পথ ত্যাগ করার কথা বললে। 'কী করবে সে' জানতে চাইলে মুমূর্ষু মহিলাটি তাকে বললে, থিয়েটারে চাকরি নিতে।

কিন্তু থিয়েটারে তাকে কে চাকরি দেবে? সে অভিনয়, নাচ, গান কিছুই যে জানে না। গোলাপী তবু সাহস করে থিয়েটারের এক ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হল। কিন্তু ম্যানেজার এই নির্গুণ মেয়েকে নিতে রাজি নয়। পরে বললে, ঠিক আছে তুমি কাঞ্চনের অভিনয় দেখ। কাঞ্চন তখন নামকরা অভিনেত্রী। অভিনয় দেখতে দেখতে গোলাপী অভিনয়ের স্বাদ পেলে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে কাঞ্চন একদিন মত্ত থাকায় সেদিন সে কাঞ্চনের জায়গায় অভিনয় করলে। দর্শকরা মহাখুশি। তারা তাকেই চায়। দুশো টাকা মাইনেতে গোলাপীর থিয়েটারে চাকরি ঠিক হল। বাড়িতে একটি ঝি রেখে সে অতি ভদ্র জীবন যাপন করে। কিন্তু তবু তার মন ভরে না। শেষে বৃদ্ধা দাসী একদিন একটি গোপাল মূর্তি নিয়ে এল। মনে হল, গোলাপী যেন এতে খুশি হয়েছে।

মিস্টার বি, সি, রায়, নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন এক স্টেটের ভূতপূর্ব ইঞ্জিনীয়ার। তবে এখন বেকার। ভদ্রলোক বিলেত থেকে দুটি জিনিস সংগ্রহ করে এনেছিলেন। একটি, ভাল চাকরি; অপরটি, পানদোষ। মিস্টার রায়ের মেয়ে কনক গোড়াতে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ত। কিন্তু বাবা সেখানকার খরচ না দিতে পারায় সে লজ্জায় হস্টেল ছেড়ে বাড়ি চলে আসে। এতে মিস্টার রায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং কনককে তিরস্কারও করেন। মাতৃহারা কনক বোঝে এ সংসারে তার জায়গা কোথায়।

মিস্টার রায়ের বাড়িতেই জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কনকের পরিচয় হয়। জ্যোতির্ময় এখন এম এ বি এল। কিন্তু কিছুই সে করে না। কনকরা ছিল ব্রাহ্ম। এ নিয়ে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তার মতের আদান প্রদান হত, তাকে সে ব্রাহ্ম ধর্মের বই পড়তে দিত। এই প্রকাশ্য মেলামেশার মধ্য দিয়ে কনক জ্যোতির্ময়কে ভালবাসতে শুরু করল। মিস্টার রায় একদিন চাকরকে প্রহার করায় জ্যোতির্ময় প্রতিবাদ করে। এবং তার ফলে কনকের বাড়িতে আসা তার বন্ধ হয়। এসব কথা কনককে সে চিঠিতে জানায়। কনক সব শুনে ব্যথিত হয়। নিজের কৃতকর্মের জন্য মিস্টার রায়ের মনের মধ্যে ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। পরাভূত হয়ে তিনি আরও নেশা করতে থাকেন।

এমনিভাবে যখন দিন কাটছিল তখন বিলেত থেকে এক বন্ধু একদিন সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হল। তারপর বললে, চল থিয়েটার দেখে আসি। তিনজনে থিয়েটারে গেলেন। গোলাপী অভিনয় করছে। মুখটা দেখে মিস্টার রায়ের খুব চেনা চেনা লাগল। তারপর বাড়ি ফিরে মনে পড়ল, এই গোলাপী তাঁরই স্ত্রী। বিলেত থেকে ফিরে তাকে তিনি একদিন রাত্রে প্রহার করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন কনক দেড় বছরের শিশু।

মিস্টার রায় গোলাপীকে সব কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন। মিস্টার রায় তখন মৃত্যুশয্যায়। গোলাপী এল। কনকের জন্য মাতৃস্নেহে গোলাপী অস্থির। কিন্তু কী বলে সে কনককে তার পরিচয় দেবে? মিস্টার রায়ই গোলাপীকে এই বিমূঢ় অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন। বললেন, কনক, ইনি তোমার মাসিমা।

মিস্টার রায়ের মৃত্যুর পর কনক মাসিমার কাছে চলে এল। সে ব্রাহ্ম। মাসিমার হিন্দুয়ানী তার ভাল লাগে না। কিন্তু মেয়ের জন্য এসব বিসর্জন দিতে গোলাপীর আর কতটুকু সময় লাগে? কনকের জন্য সে কী না করতে পারে?

গোলাপীর বাড়িতে জ্যোতির্ময় যথারীতি আসতে লাগল। গোলাপীর কিন্তু জ্যোতির্ময়কে পছন্দ হয় না। অথচ কনকের মুখ তাকিয়ে কিছু বলতেও পারে না। শেষে একদিন পুরী যাবার নাম করে সে কনককে জ্যোতির্ময়ের কাছ থেকে আলাদা করতে চাইলে।

গোলাপী কনককে নিয়ে এল পুরীতে। পুরীর সমুদ্র কনকের ভাল লাগে। ভাল লাগে না শুধু মাসিমার খবরদারি। জ্যোতির্ময়কে তাই একটা চিঠিতে সে লিখলে, ওল্ড মেডসদের একটা দোষই হচ্ছে, কম বয়সীদের সুখ তারা সহ্য করতে পারে না।

গোলাপী বুঝতে পারলে, কনক তার ব্যবহার পছন্দ করছে না। তাই নিজে থেকেই সে কলকাতা ফেরার প্রস্তাব করলে। কলকাতায় কনকের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের দেখা সাক্ষাৎ হয়। গোলাপী মনকে বোঝালে, মেয়ে যাতে খুশি হয় তাতে সে কেন খুশি হবে না? জ্যোতির্ময়কে আলাদা করে ডেকে সে নিজেই একদিন কনককে বিয়ে করার কথা বললে। জ্যোতির্ময় 'আমার চাকরি নেই' একথা বললে গোলাপী বললে, সে তার সমস্ত সম্পত্তি তাদের নামে লিখে দেবে। এবার আর জ্যোতির্ময়ের কী আপত্তি থাকতে পারে? কনকও একথা শুনে আনন্দিত হল।

কনক জ্যোতির্ময়কে নিয়ে সমাজে গেল। সমাজে কনকের শিক্ষয়িত্রী মিস্ পাকড়াশীর সঙ্গে দেখা। তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে গাড়ি করে শুধু কনককে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে কনকের সঙ্গে নরেশের পরিচয় হল। মিস্ পাকড়াশীর কাছে শুনল, ভদ্রলোক খুব বিদ্বান, কিন্তু ভীষণ ভবঘুরে। জীবনের এক গভীর ব্যথাকে ভোলার জন্য তিনি এমন করে ঘুরে বেড়ান।

বাড়ি ফিরে সে রাত্রে কনকের ভাল ঘুম হল না। সকাল হতে জ্যোতির্ময়ের কথা, নরেশবাবুর কথা তার মনে পড়তে লাগল।

বিকেলবেলা থিয়েটারের ম্যানেজার এল, গোলাপীকে তার পাওনা টাকা বুঝিয়ে দিতে। কারণ কনকের বিয়ের জন্য টাকার দরকার। ম্যানেজার যখন বেরচ্ছে, জ্যোতির্ময় তখন ঢুকছে। ঢোকার মুখে নতুন

গাড়ির কোচায়নের কাছে সে জানতে পারলে, ম্যানেজার সাহেব যার বাড়িতে এসেছে সে-ই তো আগেকার নামজাদা অভিনেত্রী গোলাপী। জ্যোতির্ময় জানাল, গোলাপী কনকের মাসিমা। কনক'ক কথাটা বলতে সে তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইলে না। তারপর সম্বিৎ ফিরে আস'ত জানালে, সে এইমাত্র এই ঘৃণ্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

গোলাপী তখন বল'ল, আমি তোমার মাসিমা নই। তোমার মায়ের ঝি ছিলাম। ছেলেবেলায় আমিই তোমায় মানুষ করি। তোমার মা মৃত্যুর সময় তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর একদিন তোমার বাবা আমায় মেরে তাড়িয়ে দেন। সেই থেকে আমার অভিনেত্রী জীবন শুরু হয়।

ঝিয়ের এই মায়ের মত মমতায় কনকের বুক ভরে গেল। সে বললে, আমি যেখানেই থাকি না কেন তুমি আমার কাছে থাকবে। কিন্তু একটা কথা। তোমার টাকা আমরা কিন্তু নিতে পারব না।

গোলাপী এইবার শেষ অভিনয় করল। বললে, তোমার বাবা যখন আমায় তাড়িয়ে দেন তখন যাবার সময় আমি রাগ করে তোমার মায়ের গয়না চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। কনক সত্যিই দেখলে, বিদেশ গড়া সোনার বলয়ে বাবার আর মায়ের নাম লেখা। ঝিয়ের মহত্ত্বে সে মুগ্ধ হল।

কনক জ্যোতির্ময়ের মধ্যে তাদের ভাবী সাংসারিক জীবনের কথা হয়। জ্যোতির্ময়ের ইচ্ছে, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা এবং বিবাহ এটা নিয়ে এত তাড়াতাড়ির কী আছে। কারণ সে এখনও চাকরি পায়নি। পরে ও দুটো কাজ একসঙ্গে করলেই হবে। জ্যোতির্ময়ের দ্বিতীয় ইচ্ছে, বিয়ের পরে তারা আর কলকাতায় নয়, বাইরে থাকবে। কিন্তু কনকের তাতে আপত্তি। কারণ এই বাড়িটার ওপর তার মায়া পড়ে গেছে।

এমন সময় গোলাপী তাদের ঘরে এসে ঢুকল। সস্নেহে বললে, কি গো, ঘরকন্নার কথা হচ্ছিল বুঝি? তারপর বললে, যে বন্দোবস্তই কর আমায় কিন্তু তোমরা ফেলতে পারবে না। কনক আদর করে তার পিঠে একটা কিল মারলে।

জ্যোতির্ময় গোলাপীর প্রতি কনকের এতটা ভালবাসা পছন্দ করে না। সে কর্তৃত্বের সুরে বললে, তোমার থাকার ব্যাপারে কী হবে সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে। গোলাপী কাজের অছিলায় সেখান থেকে উঠে গেল। কনক একেবারে স্তম্ভিত। সে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে আর কোন কথা বলতে পারলে না।

গোলাপী কনককে ডেকে বললে, মা আমাকে আর মাসিমা বলে ডেকো না। গোলাপী বলো।

জ্যোতির্ময় ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত। কী. সামান্য একটা ঝি, সে তাদের ভালবাসার পথের কাঁটা হয়ে থাকবে? পরদিন জ্যোতির্ময় এল। গোলাপীকে সে কী বলবে ঠিক করেই এসেছিল। আলাদা করে সে তাকে ডেকে বললে, দেখ, আমাদের সংসারে তোমার থাকা চলবে না। সেদিন সে কনকের সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল।

কনক ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির বোধ করছিল। এমন অবস্থায় সে পড়েছে যার জটিলতা থেকে তার বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। তাই সে স্থির করলে, মিস পাকড়াশীর কাছে গিয়ে সে পরামর্শ নেবে। মাসিমার ভালবাসা তাকে পাকে পাকে বেঁধেছে। তাই সে স্থির করলে, তাকেও সে সঙ্গে নেবে। কিন্তু মাসিমার খোঁজ করতে গিয়ে বাড়িতে কোথাও সে তাকে খুঁজে পেলে না। তার সামান্য জিনিসপত্র যা ছিল, তাও নেই। মাসিমার সহসা অন্তর্ধানে ব্যথিত হয়ে সে জ্যোতির্ময়কে বললে, দেখেছেন, যাবার সময় একবার জানিয়েও গেল না। জ্যোতির্ময় জানাল, গোলাপীকে সে-ই এই সংসার থেকে চলে যেতে বলেছে।

জ্যোতির্ময়ের এই ঔদ্ধত্যে কনক কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গেল। তারপর সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোন অধিকারে তাকে এই বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন? জ্যোতির্ময় যখন নিজেকে তার ভাবী স্বামীর অধিকারের কথা জানালে

তখন কনক বললে, আমি আপনাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

জ্যোতির্ময় চলে গেলে বাড়ির ঝিয়ের কাছে মাসিমার ঠিকানা সংগ্রহ করে কনক তাকে খুঁজতে বেরল।

কনককে দেখে গোলাপী প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলে না। সে স্বপ্ন দেখছে নাকি?

এবার কনকের অনুযোগের পালা। সে বললে, মাসিমা, তুমি যে আমার মায়ের মতন। তুমি না থাকলে আমি তো বাঁচতুম না।

গোলাপী এবার তার যথার্থ আত্ম-পরিচয় দিল। কনক তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, দুঃখিনী মা আমার।

মাকে এবার সে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। মা বললে, কনক আমি যাঁর কাছে সব-চেয়ে ঋণী তাকে যদি আমার মুখ দেখাতে পারতুম তাহলে আনন্দের অন্ত থাকত না। পুরনো বাক্স থেকে তাঁর দেওয়া শালখানা সে বার করে দেখাল।

নরেশ বহু দেশ ঘুরে গ্রামে ফিরেছে। তার বর্তমান ইচ্ছে, এই গ্রামেই সে জীবন কাটাবে। লোকের ভালর যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এদিকে লেখক হিসেবেও নরেশের নাম হয়েছে।

একদিন বাড়ি ফিরে নরেশ গোলাপীর চিঠি পেলে। বন্ধু প্রফুল্লকে নিয়ে সে কল-কাতায় এল গোলাপীর সঙ্গে দেখা করতে। গোলাপীর বাড়িতে তাকে দেখে মিস্ পাকড়াশী এবং কনক দুজনেই বিস্মিত। নরেশ বুঝতে পারলে, কনক গোলাপীরই মেয়ে। তারপর জানালে, সে গোলাপীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কথায় কথায় নানান তর্ক-বিতর্ক আলোচনা হল। নরেশ জানালে, প্রচলিত ধর্মাধর্মে, পাপপুণ্যে সে বিশ্বাস করে না। সমাজের মঙ্গল তার কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কথা শুনে কনকের খুব ভাল লাগল। মনে মনে বললে, লোকটা পেডাণ্ট হলেও ভক্তি করতে ইচ্ছে যায়।

মাসখানেক কেটে গেছে। কনকের মা দিনরাত কী সব লেখে। কনক একদিন জিজ্ঞাসা করলে, মা তুমি কী লেখ? গোলাপী বললে, শেষ হয়ে এসেছে। দেখবি লেখাটা?

কনক পড়ে দেখল, এ যে তাদেরই জীবনকাহিনী।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, এরপর আর কিন্তু এক লাইনও তোমায় লিখতে দেব না।

গোলাপী কনককে আদর করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

গৃহহারার গল্প শেষ হয়ে যাবার পর স্বভাবতই এর লেখককে নিয়ে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে। কে এই বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়? ইনিই কি 'পথের পাঁচালী-অপ-রাজিত-আরণ্যক'-এর আমাদের চিরপরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়? না আর কেউ? কিন্তু কই, আমাদের পরিচিত বিভূতি-ভূষণের গ্রন্থপঞ্জীতে, কি তাঁর কোন দিন-লিপিতেও 'গৃহহারা' নামে কোন উপ-ন্যাসের সন্ধানই তো পাওয়া যায় না।

বাইরের কি ভেতরের কোন প্রমাণ দিয়ে কি সমস্যাটার সমাধান করা যায় না?

আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প লেখার গল্প নিয়ে একাধিক গল্প চালু আছে। একটা গল্প তো প্রায় সবার জানা। উনি যখন ১৯২০ সনের ২১ শে জুন সোনারপুর-হরিনাভিতে শিক্ষকতা করতে যান তখন পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী (আসল নাম যতীন্দ্রমোহন রায়) নামে এক বালক কবির পাল্লায় পড়ে তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' লেখেন, যা ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

এ ব্যাপারে কিন্তু আরও একটি গল্প প্রচলিত আছে। বিভূতিভূষণের কলেজ জীবনের অন্তরঙ্গ সতীর্থ নীরদচন্দ্র চৌধুরী গল্পটি বলেন। গোপাল হালদার ১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার শনি-বারের চিঠিতে 'পথের পাঁচালী' প্রবন্ধে গল্পটির উল্লেখও করেন। সে গল্প হচ্ছে এই, অনেকেরই মতে বিভূতিভূষণ ছেলে-বয়সে লিখতেন, পরে অনেকদিন আর লেখেননি। সেই সময়ে ঐ নামে আরও এক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতেন। আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণ তাঁর এক অতি নিকট আত্মীয়ের কাছে বলেন, ও লেখা তাঁরই। তারপর তাঁর সঙ্গে তর্ক করে লিখলেন তাঁর প্রথম গল্প।

এ গল্প যদি সত্যি হয় তাহলে হয়তো এই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই 'গৃহহারা'র লেখক।

কিন্তু সে তো যদির কথা।

'গৃহহারা'র মুখবন্ধ থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বইটিতে কতখানি খুঁজে পাওয়া যায়?

গৃহহারা'র মুখবন্ধে প্রতিপাদ্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু কই আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের কোন গল্প উপন্যাসেই তো এ ধরনের প্রতিশ্রুতিমূলক প্রতিপাদ্য পাওয়া যায় না। যা আছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বইয়ের অঙ্গের সঙ্গে মিশে আছে। যেমন 'ইছামতী'।

ইছামতী একটা ছোট নদী। অন্ততঃ যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙ্গর-সংকুল বিরাট লোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন্ সুন্দরবনে সুঁদরি গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েচে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোন লোকই রাখে না।

ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েচেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করবেন, যারা অনেকদিন ধরে বাস করচেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী কাকলীতে মুখর।

মড়িঘাটা কি শক্তিপুরের ঘাট থেকে নৌকো করে চা যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত—দেখতে পাবে দুধারে পলতে মাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, টোপাপানার দাম, বুনো তিৎপল্লী লতার হলদে ফুলের শোভা, কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি-বাচড়া-বৈঁচি ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙশালিখের গর্ত, সুকুমার লতাবিতান। গাঙের পাড়ে লোকের বসতি কম, শুধুই দূর্বাঘাসের সবুজ চরভূমি, শুধুই চখা বালির ঘাট, বনকুসুমে ভর্তি ঝোপ, বিহঙ্গ-কাকলী-মুখর বনান্তস্থলী। গ্রামের ঘাটে কোথাও দু'দশখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা রয়েচে। ক্বচিৎ উঁচু শিমুল গাছের আঁকাবাঁকা শুকনো ডালে শকুনি বসে আছে সমাধিস্থ অবস্থায়—ঠিক যেন চীনা চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি। কোনো ঘাটে মেয়েরা নাইচে, কাঁখে কলসী ভরে জল নিয়ে ডাঙায় উঠে, স্নানরতা সঙ্গিনীর সঙ্গে কথাবার্তা কইচে। এক-আধ জায়গায় গাঙের উঁচু পাড়ের কিনারায় মাঠের মধ্যে কোনো গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুল; লম্বা ধরনের চালাঘর, দরমার কিংবা কঞ্চির বেড়ার ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা; আসবাবপত্রের মধ্যে দেখা যাবে ভাঙা নড়-বড়ে একখানা চেয়ার দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, আর খানকতক বেঞ্চি।

সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সম্মুখ জ্যোৎস্না রাত্রির জ্যোৎস্না পড়বে, গ্রীষ্মদিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্তী বন-ঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদী-পথ-যাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরোনো পোড়ো ভিটের ঈষদুচ্চ পোতা, বর্তমানে হয়তো আকন্দঝোপে ঢেকে ফেলেচে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু একটা উইয়ের ঢিপি গজিয়েচে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এই সব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে। জ্যোৎস্না-পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে।

সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়-কাহিনী নয়।'

কোথাও বা ভূমিকায় একটু আলদা করে লেখা, এটি ভ্রামামাণের রোজনামচা বা দিনলিপি নয়, উপন্যাস। যেমন 'আরণ্যক'-এ।

'মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিত পক্ক জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী-তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। 'আরণ্যক' সেই কল্পনালোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে — উপন্যাস। অভিধানে লেখে 'উপন্যাস' মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্য-প্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুরে গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত।'

নয়তো 'চাঁদের পাহাড়'-এর মত লেখায় কোথাও রচনার মৌলিকতার বা ঋণস্বীকারের উল্লেখ।

নরেশের গৃহহারা হওয়াই 'গৃহহারা'র মূল বিষয়বস্তু। প্রতিপাদ্যের প্রতিশ্রুতিমত লেখক দেখিয়েছেন, নরেশের একান্ত সারস্বত প্রকৃতি জ্যোতির্ময়ের উপস্থিতিতে তার স্ত্রী মাধুরীকে কীভাবে গৃহমুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত, অনুশোচনাহত করে মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। আর সেই বেদনার মূল্যে নরেশ জীবনকে চিনল। 'এতদিন সে জীবনকে কবিতার সংসারে দেখেছে, কিন্তু সত্যি জীবন কত স্বতন্ত্র।'

স্বতন্ত্র বলেই লেখক গ্রন্থের শেষে গৃহহারা নরেশের কনকের সঙ্গে নতুন গৃহ-প্রবেশের ইঙ্গিত যেন করলেন।

সবাই জানেন, আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই আত্মকাহিনীমূলক। হয় নিজের, নয় নিজের দেখা। অবশ্য সৎ সাহিত্যের সব লেখকেরই লেখা একপ্রকার তাই। শ্রেয় চরিত্রে আপন শ্রেয়র ছায়া পড়ে।

নইলে লেখকরা লিখতে যাবেন কেন? যদি না নিজের ভাবনা-চিন্তাকে তাতে মেলে দিতে পারেন? সাহিত্য তো ঘটনার ইতিহাস নয়। তা ঘটনার নিখর জলে প্রতিফলিত অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। বিভূতিভূষণ তো দিনলিপির এক জায়গায় লিখেছেন, আন্তরিকতা মানুষকে অমর্ত্যর কিনারায় নিয়ে যায়। যে কিনারা সাহিত্যেরও। জীবনে যদি বড় দুঃখ পাও, দুঃখ লিখে রেখে যেও উত্তরকালের জন্য। Sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে, কিন্তু তা চিরদিন লোকের মনে বল দেবে।'

তবু লেখকদের লেখায় নিজের যা নিজের দেখার কমবেশি থাকে। যেমন আছে বিভূতিভূষণে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রে। এমনকি বিভূতিভূষণের নিজের লেখার মধ্যেও। 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত-আরণ্যক' নয়, তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতির আধারে লেখা। তাই বলে নীলকরদের আমলের গল্প 'ইছামতী', কি বৌদ্ধযুগের কাহিনী 'মেঘমল্লার'র অথবা মধ্য আফ্রিকার সেই রিখটারসভেল্ড পর্বতমালায় হীরের খনির সন্ধানে শঙ্করের অভিযান—এ তো আর তাঁর নিজের নয়।

লেখকরা সাধারণত তাঁদের আত্মকাহিনী নিয়েই সাহিত্যে প্রবেশ করেন। কারণ, প্রথম লেখার বিষয়টা মনকে অনেকখানি জুড়িয়ে রাখে। কী নিয়ে লিখব? তারপর লিখতে বসে তো লেখা আর লেখার রীতি "বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ"—শব্দ আর অর্থের মত নিত্য সম্বন্ধ। যখন লেখার ওপর দখল আসে তখন আর বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে হয় না। যেমন করে ওস্তাদ গাইয়েকে ভাবতে হয় না রাগের তান তৈরি নিয়ে, চিত্রকরকে ভাবতে হয় না রেখা রঙ নিয়ে। তৃতীয় নেত্রে তখন ছায়া-ছায়া ভাবনা গল্পের কায়া ধরে, তান ফুলের তোড়া হয়—সঙ্গীতের ভাষায় 'বল' বাঁধে, যেমন হয়েছে কেশরী বাঈয়ের গানে,—রেখায় রঙে ছবিতে রূপ ধরে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর আগে রবীন্দ্রনাথ একাধিক কাহিনী কবিতা লিখেছেন। কিন্তু 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, সেগুলো ছিল আমার কাঁপবুকের কবিতা। সেই কাঁপবুকের চৌকাট পেরিয়ে প্রথম দেখা দিল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কাঁচা আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটি সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে. রস ধরেনি তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যা সঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়।'

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' নিহিতার্থে সন্ধ্যার অর্থাৎ বিষণ্ণতার চলে যাবারই গান।

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার, শুধু বলিতেছে,
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল, দলে গেল গো।"

*

পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো
মোরে ফেলে গেল
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত—
সাথে না লইল। ('পরিত্যক্ত')

'জীবনস্মৃতি'তে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'একসময়ে (১৮৮১) জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। এই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।'

দেবেন্দ্রনাথ তখন বাইরে। বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ আপনার সারস্বত জগৎ নিয়ে মশগুল। সত্যেন্দ্রনাথ রয়েছেন তাঁর কর্মস্থল বোম্বাইয়ে। হেমেন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকলেও তাঁর সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই। বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করবার মত, প্রশ্রয় দেবার মত আর মানুষ কোথায়? ছিলেন জ্যোতিদাদা আর বউঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী। শুধু দেওর বলে নয়। এই অদ্ভুত স্বভাব দেওরটির ওপর বউঠাকুরাণীর আশার, মমতার, ভালবাসার অন্ত নেই। এই নিবান্ধব পুরী থেকে তাঁদের হঠাৎ চলে যাওয়া! যাওয়া তো নয়। এ যে একেবারে 'বুক শুধু ভেঙে গেল, দলে গেল গো।' সেই চলে যাওয়ার দুঃসহ বেদনার কথা ভেবে মাঝে মাঝে ফুটে উঠল বিষণ্ণতার গান—'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২)।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে আবির্ভাবও তো একেবারে নিজের চোখে দেখা গল্প নিয়ে। কবিতার বই 'ত্রিপত্র'-এর সলজ্জ স্মৃতি, সাপ্তাহিক 'শিশির'এ প্রকাশিত (এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত) প্রথম উপন্যাস 'দীনার দান'-এর আত্মবিস্মৃতি, প্রথম নাটক 'মারহাট্টা তর্পণ'-এর আবৃত্তি বাদ দিয়ে ব্যর্থকাম তারাশঙ্কর যখন সেই কংগ্রেসের কাজে সিউড়ি গিয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যরাত্রে ঘুম না আসা চোখে পড়তে লাগলেন, 'কালি-কলম'......প্রেমেন্দ্র মিত্র... পোনাঘাট পেরিয়ে...শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়...জোহানের বিয়ে...একেবারে নিজের দেশ... বীরভূম...তারই কাহিনী অন্তরঙ্গ ভাষায় লেখা! উঠে বসলেন তিনি। খুঁজে পেলেন তিনি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'খুঁজে পেল সে মাটিকে, মলিন অথচ মহত্ত্বময় মাটি: খুঁজে পেল সে মাটির মানুষকে, উৎপীড়িত অথচ অপরাজিত মানুষ—এ যে তার অন্তরঙ্গ কাহিনী—একেবারে অন্তরের ভাষায় লেখা।'

আবার সেই দুর্মর ইচ্ছে হল। লিখব। গল্প লিখব। জীবদেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বাসনার ধারা চলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে জীবনের ধারা। কোথাও সে জিতছে, কোথাও সে হারছে।

কিন্তু গল্প কোথায়?

দিন কয়েক হলো তারাশঙ্কর তাঁরই মহালের এক গ্রামে এসেছেন। এসে যে বাড়িতে উঠেছেন তার সামনে একটা ছায়া-নিবিড় আখড়া, বৈষ্ণবের কুঞ্জ। গ্রামের লোকে বলে কমলিনীর আখড়া, রসিকজনে রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ। আখড়ায় বৈষ্ণব নেই, আছে শুধু কমলিনী বৈষ্ণবী। তারাশঙ্করের পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পরে একখানি ধোয়া কাপড়খানি পরিপাটি করে পরে শ্যামবর্ণা মেয়েটি হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে ঝকঝকে করে মাজা রেকাবিতে দু'-খিলি পান, পাশে দুটি লবঙ্গ, টুকরো দুয়েক দারুচিনি। একটি ছোট এলাচ। রেকাবি নামিয়ে মেয়েটি হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে, বললে—প্রভুর জয় হোক! ওঠবার সময় তার মাথার কাপড় একটু সরে যেতে তারাশঙ্করের চোখে পড়ল, রাখাল-চূড়া-বাঁধা কেশপ্রসাধন। ঘোমটাটি তুলে কমলিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর বাড়ির কুশলবার্তা নিল। সে যেন কত নিকট আত্মীয়! তারাশঙ্কর কী একটা কাজে উঠে ঘরের মধ্যে গেছেন। শুনলেন তাঁর গোমস্তা বলছে—পানের চেয়ে বৈষ্ণবীর হাসিটি মিষ্টি। ভাবলেন, বৈষ্ণবী খুব লজ্জা পেয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখলেন, কই, না তো। সবিনয়ে বৈষ্ণবী আরও একটু হেসে বললে—বৈষ্ণবের ওই তো সম্বল প্রভু। তারাশঙ্করের মনে হল, এই তো যা তিনি ভাবছিলেন—এই তো সেই জীবনের জন্ম কথা। হাওয়ায় জৈব রসের দীঘিতে ঢেউ উঠল, তাতে ওর জীবন ডুবল না, ডুব দিল না, সে ঢেউয়ের উপরে নাচতে লাগল পদ্মফুলের মত। 'এর পরই এল পাগলা বৈরাগী পুলিন দাস। লোকে বলে — ক্ষ্যাপা। সঙ্গে তার বলাই মোড়ল। ক্ষ্যাপা ফাঁক পাবামাত্র গিয়ে উঠত কমলিনীর আখড়ায়। পুলিন এখানেই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা থাকে। সেদিন রাত্রে শুয়েই শুনলাম—কমলিনী বলছে পুলিনকে — যাও, বাড়ি যাও। — কেন? — রাগ করবে যে। — কে — কে আবার? তোমার বষ্টুমী। কলাই সে হেসে ছড়া কেটে উঠল — পাঁচসিকের বষ্টুমী তোমার গোসা করেছে — হে গোসা করেছে। আমার ঘুম ছুটে গেল। তখুনি কলম খাতা নিয়ে বসে গেলাম। পেয়েছি। 'রসকলি'র পত্তন করলাম।'

১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় 'কল্লোল'-এ 'রসকলি' ছাপা হল। সঙ্গে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানি পত্র, 'এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন?'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো তাই। ১৩৩৫ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্ক অনার্স নিয়ে বি এসসি পড়ছেন। লেখক হবার ইচ্ছে যে একেবারে ছিল না তা নয়। তবে তাঁর ধারণা তিরিশ বছর বয়সের আগে কারও লিখতে যাওয়া উচিত নয়। তিনিও ঐ বয়সে লিখবেন। তার আগে নিজেকে সব দিক থেকে প্রস্তুত করে নেবেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তখন কুড়ি বছর।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড ঘটল। কলেজে যেমন হয়, বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতে হতে সম্পাদকে এসে পৌঁছল। তাদের পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি ইত্যাদি। নামী লেখক ছাড়া তারা আর কারও লেখা ছাপায় না। আলোচনা যারা করছিল তাদের মধ্যে একজনের আবার তিন তিনটে লেখা সম্পাদকের দপ্তর থেকে ফেরত এসেছে। প্রচণ্ড দাহ। বন্ধুটি সম্পাদকদের সম্বন্ধে একটা কুৎসিত গাল দিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাবরই বিতর্কে অনীহা। কিন্তু বন্ধুর অবিবেচনা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, কেন বাজে কথা বকছো? ভালো লেখা কি এত সস্তা যে, হাতে পেয়েও সম্পাদকেরা ফিরিয়ে দেবেন? মাসিকগুলো তো পড়ো, মাসে কটা ভালো গল্প বেরোয় দেখছো? সম্পাদকেরা কি পাগল যে ভালো গল্প ফিরিয়ে দিয়ে বাজে গল্প ছাপবে? ভালো দূরে থাক, চলনসই একটা গল্প পেলে সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই সাগ্রহে সেটা ছাপে দেয়।' বন্ধু বললে, তুমি কী করে এসব জানলে? উনি বলে ফেললেন, আমি জানি। তর্কাতর্কির পর বাজি হল। উনি বললেন, 'আমি গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে দেব।'

কিন্তু কী নিয়ে গল্প লিখবেন?

প্রেম? বাঙলা মাসিকে তো প্রেমের গল্প হামেশাই বেরয়। মন সায় দিল না। মন বললে, হ্যাঁ, প্রেমের গল্পই লেখ। কিন্তু ঐ চটুল কাঁচা গল্প নয়। কেন তুমি কি সত্যি প্রেম সংসারে কখনও দেখনি? যাকে বাস্তবে দেখেছ তাকেই নিয়ে যাও না কেন লেখ। মনে পড়লো পূর্ববঙ্গের এক স্বামী-স্ত্রীর কথা। বস্তুত জীবন নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওদের দেখেই আমি জেনেছিলাম। স্বামী বাঁশি বাজাতেন। বাঁশের বাঁশি নয়, ক্ল্যারিওনেট। প্রায় পায়ে ধরে তাঁকে আসরে বাজাতে নিয়ে যেতে হতো — গিন্নীও খুশি হলে বাজাতেন, নইলে বাজাতেন না। বাড়িতে বাজাতেন — শুধু স্ত্রীকে শ্রোতা রেখে। বছরখানেক আমি শুনেছিলাম। বেশিক্ষণ বাজালে তার গলা দিয়ে রক্ত পড়তো।

এদের অবলম্বন করে এক [illegible] ট্র্যাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম 'অতসী মামী'।

১৩৩৫ সালের পৌষ সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় 'অতসী মামী' বেরুল। সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এক ভদ্রলোক এসেছেন। 'অতসী মামী'র পারিশ্রমিক দিতে। সেই সঙ্গে তাঁর দাবি, আর একটি গল্প চাই। ভদ্রলোক 'বিচিত্রা'রই সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

'গৃহহারা' বেরিয়েছে ১৩২৭ সালের আষাঢ়ে/১৯২০ সনের জুন-জুলাইয়ে। লেখা হয়েছে নিশ্চয়ই তার অন্তত কিছু আগে।

আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের তখন মানসিক অবস্থাই বা কী এবং কোথায়ই বা তিনি?

কলেজে বি এ পড়তে পড়তে ১৩২৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ গৌরী দেবীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের বিয়ে হয়। আর ১৩২৫ সালের ৬ই অগ্রহায়ণ গৌরী দেবী মারা যান। বিভূতিভূষণ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে দর্শনে এম এ আর 'ল' পড়ছিলেন। পাঠাবস্থায় বিয়ে হওয়ায় পাছে লেখাপড়া বিঘ্নিত হয় সেজন্য বিভূতিভূষণের শ্বশুরমশায় বি এ পরীক্ষার আগে পর্যন্ত মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাননি। পরীক্ষা হয়ে গেলে ১৩২৫ সালের ২০শে আষাঢ় বিভূতিভূষণ গৌরীকে নিয়ে বারাকপুরে আসেন। এই প্রথম পরস্পরকে এত কাছে পাওয়া। ট্রেনে সারাদিন একসঙ্গে থাকা। গৌরী গাড়িতে গ্রামোফোন শুনে খুব খুশি। বলেছিলেন, গাড়িতে সেদিন কলের গান হচ্ছিল। উত্তরজীবনে বিভূতিভূষণের মনে পড়েছে, বারাকপুরে আসার পথে সেই বেলেঘাটা ব্রীজ স্টেশনে তাঁদের প্রথম ঘর-বাঁধার কথা, গৌরীর আমার সেই আয়না শেষ করে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায় কপালে ঠেকানোর কথা।' তখন দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রীর দেখা সাক্ষাতের বড় একটা রেওয়াজ ছিল না। তবু তার মধ্যে ঘরের ভেতরে তক্তাপোশে বসে বিভূতিভূষণ হয়ত বই পড়ছেন, সদ্যস্নাতা গৌরী ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে কিছু একটা নিতে এসে লাজুক চোখে একটু হেসে চলে যেতেন। কোন কোন দিন গ্রামের রজনী-দাদার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে বিভূতিভূষণ অধীরভাবে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় থাকতেন। বর্ষা সন্ধ্যা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ত বাঁশবনে। ঘরে মাটির প্রদীপের আলোয় গৌরী আর বিভূতিভূষণ। (পড়তে পড়তে মনে হয় এই সব ছবির সঙ্গে 'অপরাজিত'-এর কি নিবিড় মিল!)

গৌরীকে বারাকপুরে রেখে বিভূতিভূষণ কলকাতায় আসেন। মিত্রদের আগ্রহ,

পুনর্দর্শনের উৎকণ্ঠায় কলকাতা প্রবাসের দিন কাটে। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বারাকপুরে আসার অবকাশ মিলল। ১২ই ভাদ্র, ১৩২৫ সাল। জন্মাষ্টমীর মেঘান্ধকার সন্ধ্যা। বাড়িতে ঢুকে মনে বিভূতিভূষণের ছোট বোন সরস্বতী প্রদীপ দেখাচ্ছিলেন। গৌরী বিভূতিভূষণকে দেখতে পেয়ে কী আগ্রহেই না বলেছিলেন, এসো, এসো।

বিভূতিভূষণ এই প্রণয়দৃশ্যটিকে জীবনে কখনও ভুলতে পারেননি। 'আরণ্যক' একেই উৎসর্গ করা। ঘাটশিলার বাড়িও এরই নামে—'গৌরীকুঞ্জ'। বাইশ বছর বাদে দ্বিতীয়বার বিবাহের পর স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে ডাকতে গিয়ে মনে পড়েছে এই মেয়েটির কথা। লিখেছেন, 'প্রিয়তমাষু, এই সম্বোধনটি কোনো মেয়েকে লিখিনি গৌরী ছাড়া।'

প্রথম প্রেমের সুখও যত অসহ্য, বিরহও তত উদভ্রান্ত। গৌরীর শোককে ভোলার জন্য বিভূতিভূষণের মত মানুষ দাবা খেলে, গল্পগুজব করে সময় কাটিয়েছেন। শেষে কলকাতা ছেড়ে, লেখাপড়া ছেড়ে চলে গেলেন হুগলি জেলার এক অখ্যাত গ্রামে

জাঙিপাড়ায় স্কুল মাস্টারি নিয়ে। ১৯১৯ সনের ৬ ফেব্রুয়ারি। সেখানেও থাকা হল না। ১৯২০ সনের ৩রা মে স্কুল থেকে পদত্যাগ করে চলে এলেন সোনারপুর-হরিনাভি স্কুলের অ্যাসিসটেন্ট টিচার হয়ে এই বছরেরই জুন মাসে। এখানে ছিলেন তিনি ১৯২২ সনের ১৭ই জুলাই পর্যন্ত।

'গৃহহারা' যদি আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের লেখা হয় তাহলে লেখার সময় এই ছিল তাঁর মানসিক অবস্থা। আর থাকার কথা বলতে গেলে থাকা আর কোথায়? এ তো লোকচক্ষুর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। একপ্রকার অজ্ঞাতবাস।

লেখা যদি আরও আগের মানে, ১৯১৯ এরও আগে হয়, অর্থাৎ ১৯১৭-১৮র হয় তাহলে বিভূতিভূষণ তো আছেন কলকাতায়। আর মন তো মিলনের আনন্দে টইটম্বুর। তারও আগের যদি হয় তাহলে তো বিভূতিভূষণের বিয়েই হয়নি।

বিভূতিভূষণের প্রথম বিবাহিত জীবন স্বল্প হলেও গৌরী তাঁর জীবনে কি নিবিড় হয়েই যে ছিল এবং থেকে গিয়েছিল! সেখানে 'গৃহহারা'র সদ্য বিবাহিত অধ্যাপক নরেশের অধ্যয়নের সংসারে তরুণী স্ত্রী মাধুরী তার উদ্ভিন্ন যৌবনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েও উপেক্ষিত। নেহাৎ খেয়াল হলে নরেশ মাধুরীকে খুশি করার জন্য রোমিও জুলিয়েটের কাছ থেকে ভালবাসা ধার করে। কিন্তু ভালবাসা কি ঋণ করে পাওয়া যায়? সে যে নিজেই বড় বড়লোক। তাই পড়ার আগেই মাধবী প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা সেক্সপীয়রের বিয়ে হয়েছিল? তার স্ত্রী কেমন ছিল?

মাধুরীর ব্যর্থ যৌবন বিকশিত হল জ্যোতির্ময়ের স্তুতিতে, নিঃসঙ্গ দুপুরের বেদনা তারই সাহচর্যে কাটল। কিন্তু সে স্তুতি ভক্তের নয়, ভোগীর। সাহচর্য সাথীর নয়, কপট বন্ধুর। মাধবী তখন যৌবনের তাপে ফুটতে শুরু করেছে। নরেশকে তার মনে হয় কি কুৎসিত! আবার কী এক অকারণ পুলকে মেঝেতে সে বালিশগুলো ছুঁড়ে ফেলে, আবার তুলে রাখে। নিজেকে তার অত্যন্ত লঘু লাগে। কিন্তু এই দুপুরে সে যে বড় একা। এমনই এক নিঃসঙ্গ অতিক্রান্ত দুপুরে জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব ঘটে। জ্যোতির্ময় বলে, কাউকেই তার পছন্দ হয় না। তাই সে বিয়ে করবে না। মাধুরী কথাচ্ছলে বলে, তার মানে আমার যদি বিয়ে না হত তাহলে আমাকে তুমি বিয়ে করতে? জ্যোতির্ময় সঙ্গে সঙ্গে বলে, এখনও করতে পারি।

মুহূর্তের মধ্যে অশিব পাপের ঘ্রাণে মাধুরীর নাক ঝাঁঝিয়ে যায়। ছি, ছি, এ কী সে বলল? কিন্তু ঘটনার জল তখন অনেক দূরে গড়িয়েছে। নরেশ আড়াল থেকে সব শুনেছে। এর পর মাধুরীর শাস্তির পালা। নরেশ তাকে কলকাতার এক বেশ্যালয়ে নিয়ে তুলল। উদ্দেশ্য অনুশোচনায় তাকে শুদ্ধ করা। মাধুরী যখন বুঝতে পারলে তখন প্রথমে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে। তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে নরেশকে অনুনয়-বিনয় করে একাধিক চিঠি লিখলে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু নরেশ যখন এল তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

নরেশের নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে উপেক্ষা, মাধুরীর নিষিদ্ধ উত্তেজনার আস্বাদ, তাকে বেশ্যালয়ে তোলা—বিভূতিভূষণের জীবনের সঙ্গে একটুও মেলে? ভাবতে পারা যায়? আর এ যদি বিভূতিভূষণের নিজের না হয়ে, নিজের দেখা বা জানা কোন ঘটনা হয় তাহলে তার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত দিনলিপিতে অধিকাংশ লেখারই নোট আছে। কিন্তু এরকম কোন ঘটনার উল্লেখ কোনটাতেই পাওয়া যায় না।

আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের সাহিত্যের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি। কিন্তু 'গৃহহারা'য় প্রকৃতি বর্ণনা আশ্চর্যরকমের কম। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রীতির একটা বড় অংশ গ্রামকে ঘিরে। কিন্তু 'গৃহহারা'য় গ্রামের প্রকৃতিপ্রীতির পরিচয় তো নেই-ই, বরং যে বর্ণনা আছে তা সুখকর নয়।

'জানলা দিয়া খানিকটা উঁচনীচু মাঠ দেখা যায়, তার পরেই রাস্তা এবং রাস্তার ধারে কতকগুলি গৃহস্থের বাড়ী; চারিদিকে একটা মলিন এবং নিরুৎসাহ ভাব জীবন্ত রহিয়াছে। মাঠে এক জায়গায় খানিকটা স্তূপীকৃত আবর্জনা, তার পাহারাওয়ালা এক অস্থিচর্ম্মসার ঘেয়ো কুকুর; জড়ের পক্ষ হইতে জড় ও প্রাণীর মধ্যের ব্যবধানটা লোপ করিবার একটা চেষ্টা চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইতেছিল।'

'গৃহহারা'য় প্রকৃতির একমাত্র কিছুটা বর্ণনা আছে যেখানে কনক পুরীতে বেড়াতে গেছে। 'অতি প্রত্যূষে কনকের ঘুম ভাঙিল, আগের দিনের ট্রেনের ক্লান্তি, আজ অন্তর্হিত, তাহার ঘরের জানলা দিয়া সমুদ্র দেখা যায়, অস্ফুট আলোকে বড় বড় ধূসরবর্ণের ঢেউগুলি ঠেলাঠেলি করিতে করিতে তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, দুই একটি নুলিয়া বর্ষক শামুক খুঁটিতেছিল; বাহিরের বাতাস একটা স্নিগ্ধ আর্দ্র পরশ দিয়া মন কাড়িয়া লইতেছে, যেন স্নেহের মায়ায় চারিদিকে বাঁধা পড়িয়াছে। .... তরঙ্গমালা যখন প্রথম ভাঙিয়া পড়িতেছে, তখন তাহাদের কেমন উদ্ধত আস্ফালন, কেমন ভীষণ গর্জ্জন, কিন্তু তীরের নিকট আসিতে আসিতে তাহারা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, তখন যেন কত নম্রভাব, আর তাহাদের কুল কুল মৃদু সঙ্গীত কেমন মধুর; দূরে আকাশ সাগরের সঙ্গমরেখা তখনও উপযুক্ত আলোকের অভাবে অস্পষ্ট, আকাশের পূর্ব দিকের অংশটায় একটা কেনও আয়োজনের আভাস, সেইখানে সূর্য্যোদয় হইবে।'

আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের প্রকৃতি বর্ণনার বিষয়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায় বন পাহাড়-নদীর যতখানি স্থান আছে, সমুদ্রের স্থান কিন্তু তার চেয়ে যথেষ্ট কম। এই কম বেশি বিভূতিভূষণের স্বভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির দিক থেকে শান্ত রসের রসিক। সমুদ্রের অক্লান্ত, অশ্রান্ত ঢেউয়ের মাঝখানে তিনি তাঁর মনের প্রশান্তি বোধ হয় খুব বেশি খুঁজে পাননি। যা পেয়েছেন বনে-পাহাড়ে নদীতে।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবর্ণনার একটা বড় পরিচয়, তা প্রকৃতির নিছক বর্ণনা নয়। (একেবারেই নেই যে তা নয়, যেমন 'বনে পাহাড়ে'।) তাতে একটা সুর, বাণী, একটা Message থাকে। 'গৃহহারা'র সমুদ্র বর্ণনার পাশে বিভূতিভূষণের সমুদ্রবর্ণনা পড়লে বুঝতে পারা যায় একটিতে সমুদ্রের ছবি, আর একটিতে সমুদ্রের উদাত্ত সুর। তা বিশ্বরূপের বিরাটত্বের আভাস আনে।

'ডাইনে দূরপ্রসারী ঝাউবন, পাশেই টোটা গোপীনাথের বাগানে অজস্র কাঁঠাল-গাছ, সামনে বিস্তৃত বালুচরের পরে অপার নীলাম্বুরাশি সফেন উর্ম্মিমালা বুকে নিয়ে তটভূমিতে আবার আছড়ে পড়চে। সে দৃশ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে, উঠতে ইচ্ছে হয় না। এই তো বিশ্বরূপের মন্দির, এই আকাশ, এই ঝাউবন, এই অপার নীল সমুদ্র।......

'আজ সমুদ্রের উত্তাল রূপ। ঝড়বৃষ্টি কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, সুনীল সমুদ্র যেন নিজের আনন্দে নিজে মত্ত হয়ে বড় বড় ঢেউ তুলে কূলে আছড়ে আছড়ে পড়চে। দীর্ঘ টানা ঢেউয়ের রাশি মাথায় সাদা ফেনার পুঞ্জ নিয়ে বহুদূর-ব্যাপী একটি রেখার সৃষ্টি করেচে।......... কি বিরাটত্বের আভাস ওই দূর বিসর্পী নীল রূপের মধ্যে, উর্ম্মিমালার সফেন আকৃতিতে, তটরেখার বিলীয়মান শ্যামলিমায়। স্থলভূমি শেষ হয়ে গেল এখানে, দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এই নীলাম্বুরাশির ওপার নেই, আবার এপারে এই এসিয়া মহাদেশের উত্তর প্রান্ত, ইনিসে ও লেনা নদীর মুখ।'

পড়তে পড়তে বিভূতিভূষণের কথায় বলতে ইচ্ছে করে, এ তাঁর সেই দিশেহারা দেশের কথা— vastness of space.
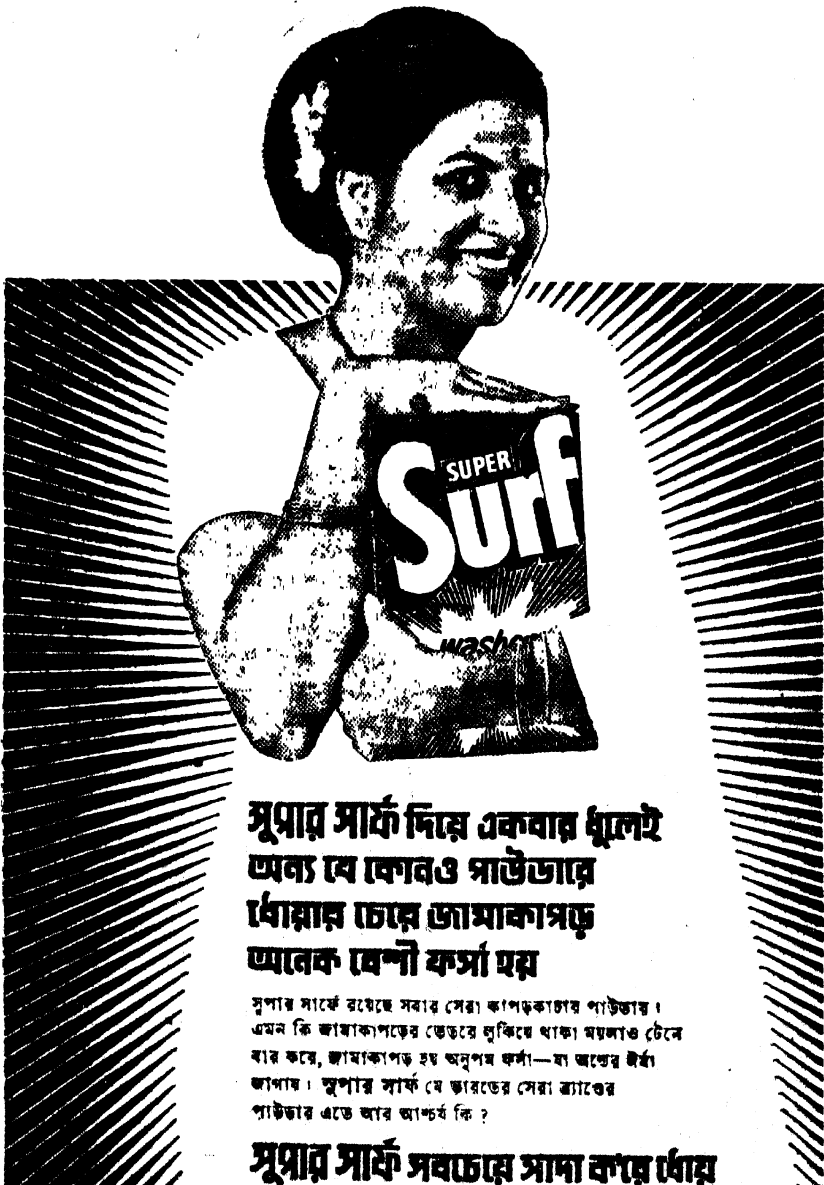
'গৃহহারা'র সমুদ্রবর্ণনা এবং বিভূতিভূষণের সমুদ্রবর্ণনা শুধু বক্তব্যের দিক

থেকেই যে আলাদা তা নয়। বলার রীতির দিক থেকে কত স্বতন্ত্র। 'গৃহহারা'র রীতি বর্ণনাত্মক, অবজেকটিভ। আর বিভূতিভূষণের রীতি অনুভাবাত্মক, সাবজেকটিভ, একেবারে রোমান্টিক।

সহজ কথায় 'গৃহহারা'র প্রকৃতিবর্ণনা আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবর্ণনার সঙ্গে কোথাও মেলে? একবারও মনে হয় এ তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে? কি সেই ছেলেবয়সের 'কাদম্বরী'র ভঙ্গিতে বর্ণনা, 'ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। মুনিগণ যে রক্তচন্দন সংযুক্ত অর্ঘ্য দান করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া যেন সূর্যদেব রক্তিম বর্ণ ধারণ করিলেন।' কি, তাঁর সেই যৌবনে প্রথম প্রকাশিত লেখা 'উপেক্ষিতা'র বর্ণনা, 'আজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে বসে আমার সবুজ-শাড়ী-পরা বাংলা মায়ের কথাই ভাবছিলাম।......ভাবতে ভাবতে প্রথম যৌবনের একটা বিস্মৃতপ্রায় ঝাপসা ছবি বড় স্পষ্ট হয়ে মনে এল। পঁচিশ বছর পূর্বের এমনি এক সন্ধ্যায় দূরে বাংলা দেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শানবাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠছে, আর্দ্রবসনা তরুণী এক পল্লীবধূ!......মাটির

পথের বুকে বুকে লক্ষ্মীর চরণ চিহ্নের মত তার জলসিক্ত পা-দুখানির রেখা আঁকা।... আঁধার সন্ধ্যায় তার পথের ধারের ঝোপ-কুঞ্জে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে। তার স্নেহভরা পবিত্র বুকখানি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তায় ভরা। আম কাঁটালের বনের মাথার ওপরকার নীলাকাশে দু' একটা নক্ষত্র উঠে সরলা স্নেহ-দুর্ব্বলা বধূটির ওপর সস্নেহে কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ......তারপর এক শান্ত আঙিনার তুলসী মঞ্চমূলে স্নেহস্পদের মঙ্গলপ্রার্থিনী সে কোন্ প্রণাম নিরতা মাতৃমূর্ত্তি, করুণামাখা অশ্রু-ছলছল।..........মনে আসছে অনেক দূরের যেন কোন খড়ের ঘর......মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলো......মৌন সন্ধ্যা...... নীরব ব্যথার অশ্রু......শান্ত সৌন্দর্য্য...... স্নেহ-মাখা রাঙা শাড়ীর আঁচল......আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্য্যাস্ত কখনও হয়নি!'

'গৃহহারা'র বর্ণনা কি এর কোনটারই কাছাকাছি?

গৃহহারা'র শুধু প্রকৃতি বর্ণনা নয়, প্রতিপাদ্যকে উপস্থাপিত করার রচনা-রীতিও অন্যরকম। সে রীতি বিশ্লেষণাত্মক, analytical। বক্তব্যকে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে গ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা। বোঝানোর চেষ্টা। কিন্তু বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসের রচনারীতি সম্পূর্ণ আলাদা। সে রীতি সংশ্লেষণাত্মক, synthetical। প্রতিপাদ্যকে আমাদের অনুভবে নিয়ে যাবার চেষ্টা। নেহাৎই বোঝানো নয়, বাজানোর চেষ্টা। 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত-আরণ্যক' কি শুধুই আমাদের কিছু বোঝায়? তা কি আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করে না, সত্তার উত্তরণ ঘটায় না? সহজ কথায়, মন কি সেই রসানুভবের জগতে পোঁছয় না?

মাধুরীর মৃত্যুর পর শূন্যচিত্ত নরেশ তার পড়ার ঘরে বসে আছে। সে এই ঘটনায় স্তম্ভিত, হতভম্ব।

'নরেশ তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছে; ম্লান মুখ, স্তিমিত নয়ন, পারি-পার্শ্বিক জগতে তাহার আগ্রহশূন্যতার পরিচয় দিতেছে। গতকল্য সমস্তদিন নানারূপে গোলমালে কাটিয়া গিয়াছে, মাধুরীর প্রতি শেষকর্তব্য বন্ধু প্রফুল্লর সাহায্য যথাসাধ্য সমাধান করিয়া আজ সে শূন্যমনে আবার এই কয়দিনেই তাহার উপর দিয়া কত বড় এক পরিবর্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, সেইটাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই তাহার মুখের ভাবে, প্রকটিত হইতেছিল; জীবনে এতদিন তাহার এক শান্তশ্রী কবিতারাজ্য গঠনের সাধনায় কাটিয়াছে; ক্ষুদ্র তরণীতে মন্দস্রোতা নদীর বুকে সে ভাসিতেছিল, নদীর কল-সঙ্গীতে তাহার শ্রবণ পরিপূরিত, তাহার দৃষ্টি সম্মুখে চঞ্চল উর্ম্মিশিখার আলোকরশ্মির ক্রীড়ার প্রতি স্থিরবদ্ধ, দুই তীরের কাবিমে জ্বলন্ত বিষাদ দৃশ্য ও শোকসন্তাপের ক্রন্দন তাহার নিকট পোঁছিইতে পারে নাই: সে সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্যদ্বারা নিজের চতুর্দ্দিকে এক দুর্ভেদ্য বর্ম্ম রচনা করিয়াছিল, তাহারই কঠিন স্পর্শে মাধুরী ক্ষতবিক্ষত হইয়া শেষে গভীর নৈরাশ্য ক্লান্ত-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে: আজ কিন্তু তাহারই ক্ষুদ্র নিরানন্দ নৌকার উপর পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা মূর্ত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সে স্তব্ধ ও হতভম্ব।'

এর পাশে অপর্ণার মৃত্যুতে অপুর শূন্যতাবোধ কী করুণভাবে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত।

'পূর্ণিমা তিথিটা...অপর্ণা ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া, এই তো গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে...লক্ষ্মীর মত মহিমময়ী, কি সুন্দর ডাগর চোখ দুটি, কি সুন্দর মুখশ্রী। অপুর মনে হইয়াছিল, ওর ঘাড় ফেরাবার ভঙ্গিটা। যেন রাণীর মত...এক এক সময় সম্ভ্রম আসে মনে। অপর্ণা হাসিয়া বলে—আমার যে লজ্জা করে, নইলে সকালে তোমার খাবার করে দিতে ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোন লুচি ভাজতে জানে না—মেজখুড়ীমা ছেলে সামলে সময় পান না—মা থাকেন ভাঁড়ারে, তোমার খাবার কষ্ট হয়—না? হঠাৎ অপুর মনে হয়—দূর ছাই—কি লিখে যাচ্ছি মিছে—কি হবে আর এসবে?

কি বিরাট শূন্যতা...কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে...কখনও না, কাহারও দ্বারা না...সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই ফুলফল নাই—শুধু এক রুক্ষ ধূসর বালুকাময় বহুবিস্তীর্ণ মরুভূমি।

...ও-বেলা একখানা পুরানো জ্যোতি-বিজ্ঞানের বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—এখানা খুব ভাল বই এ-সম্বন্ধে।... এখানা হইতে অপর্ণাকে কতদিন নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত—ও-বেলা যখন সেখানা লইয়া পড়িতেছিল, তখন তাহার চোখে পড়িল, আতি ক্ষুদ্র, সাদা রংয়ের—খালি চোখের খুব তেজ না থাকিলে দেখা প্রায় অসম্ভব—এরূপ একটা পোকা বইয়ের পাতায় চলিয়া বেড়াইতেছে। ওর সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল—এই বিশাল জগৎ, নক্ষত্রপুঞ্জ, উল্কা, নীহারিকা, কোটি কোটি দৃশ্য-অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব—ও-ও-ত এরই একজন অধিবাসী—এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই তার জীবনানন্দ...কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু?

কিন্তু মানুষেরই বা কতটুকু? ঐ নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি? আজকাল তাহার মনে একটা নৈরাশ্য ও সন্দেহবাদের ছায়া মাঝে মাঝে যেন উঁকি মারে। এই বর্ষাকালে সে দেখিয়াছে ভিজা জুতার উপর এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতা গজায়—কতদিন মনে হইয়াছে মানুষও তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই রকম ছাতার মত জন্মিয়াছে—এখনকার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও তাহার বিভিন্ন গ্যাসগুলি প্রাণপোষণের অনুকূল একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া। এরা নিতান্তই এই পৃথিবীর, এরই সঙ্গে এদের বন্ধন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতই হঠাৎ গজাইয়া উঠে, লাখে লাখে, পাশে পাশে জন্মায়, আবার পৃথিবীর বুকেই যায় মিলাইয়া। এরই মধ্য হইতে সহস্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনার আনন্দ, হাসি-খুশিতে দৈন্য ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিয়া রাখে—গড়ে চাল্লশটা বছর পরে সব শেষ। যেমন ঐ পোকার সব শেষ হইয়া গেল তেমনি।

এই অবোধ জীবগণের সঙ্গে ঐ বিশাল নক্ষত্র-জগতের ঐ গ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু ঐ নিঃসীম নাক্ষত্রিক বিরাট শূন্যের কি সম্পর্ক? সমুদ্রের পিপাসাও যেমন মিথ্যা, অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা—ভিজা জুতার বা পচা বিচালী গাদার ব্যাঙের ছাতার মত যাহাদের উৎপত্তি—এই মহনীয় অনন্তের সঙ্গে তাহাদের কিসের সম্পর্ক?

মৃত্যুপারে কিছু নাই, সব শেষ। মা গিয়াছেন—অপর্ণা গিয়াছে—অনিল গিয়াছে—সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে—পূর্ণচ্ছেদ।'

ভেতর-বার সব জায়গা ক্রমশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এখন কি একথা মনে হয় না, 'গৃহহারা'র বিভূতিভূষণ আর আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণ আলাদা দুই বিভূতিভূষণ।

তবু আমাদের মনে কৌতূহল থেকে যায়, এই দ্বিতীয় বিভূতিভূষণ কে? কী তাঁর পরিচয়? 'গৃহহারা'ই কি তাঁর একমাত্র লেখা?

বসন্ত যখন এলো

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বসন্ত যখন এলো বনে বনে ঝলোমলো
পাতার বাহার। কে কবে কার?
বাঘিনীর ডাক
আলিপুর চিড়িয়াখানার।

যখন বসন্ত এলো
চুল তার এলোমেলো।

শীতকাল ছিলো। শীতকাল গেলো
পুরনো লেপের নীচে স্বপ্নের পাহাড়।

মনে পড়ে সাঁওতালী গ্রাম
দূরে স্বপ্নের মতো পাহাড়ের হাতছানি
কপনি-পরা ছেলেমেয়ে খাপছাড়া ভাবনার মতো।
আর রেল-লাইন আর মালগাড়ির ঝিকঝিক
আর এক-চক্ষু দৈত্যের মতো
সার্চলাইট-জ্বালানো ইঞ্জিন।

শীত কাবার। আজ বসন্তের দিন।
জীবনটা নানা দরজার
ভয়ানক মজার।
অনেক নিষ্ফল তারা, হঠাৎ ধূমকেতু,
মেরুর বরফ, পেঙ্গুইনের দেশ,
এস্কিমোদের দরকার
রেফ্রিজারেটার।

বাঘিনীর ডাক
বসন্ত যখন এলো ॥

কোথায় আমার অঙ্গুরী?

দাউদ হায়দার

রজনীগন্ধার বনে তোমার দেয়া অনামিকার অঙ্গুরী হারিয়ে
আমি চীৎকার করলুম
"কোথায়, কোথায়?"
সন্ধ্যার অমল জ্যোৎস্নায় সে ধ্বনি মিশে গেল
মিশে গেল একলা হাওয়ার গ্রন্থিতে!

কোথায় আমার অঙ্গুরী তোমার দেয়া অঙ্গুরী?—
ঘাসের গভীরে ও মেঝেতে নেই, মৃত্তিকার উদরে নেই;—
তাহলে কোথায়?

রজনীগন্ধার বনের পাশে কোন অশ্রুনির্মিত জলাশয় তো
ছিল না আমার—
তার স্রোতে ভেসে যাবে!
—তাহলে কোথায়?

॥ দুই ॥

আমি বহুবার হাল ভেঙে হারিয়েছি দিশা
আমি বহুবার ওইসব নিবিড় জলাশয়ে ভেসে গেছি;
নিজেই ভেসে গেছি—তবু ডুবিনি
আশ্চর্য ডোবেনি আমার হৃদয় ও কোমল সত্তা!

॥ তিন ॥

তোমার জন্যে রজনীগন্ধা তুলতে যেয়েই হিরণ্ময়ী অঙ্গুরী
আজ হারিয়ে গেল;—হারিয়ে গেল
তুমি আমার সঙ্গে ছিলে।
আমি যখন অঙ্গুরী খুঁজতে যেয়ে চীৎকারে ফেটে পড়লুম
"কোথায়, কোথায়"
তুমি তখন দমকা হাওয়ায় কেশের মেলা উড়িয়ে
হঠাৎ জানান দিলে
"আমার কাছে, আমার কাছে—
এই সন্ধ্যালোকেই পরিয়ে দেব
পরিয়ে দেব অন্য হাতের অনামিকায়!"
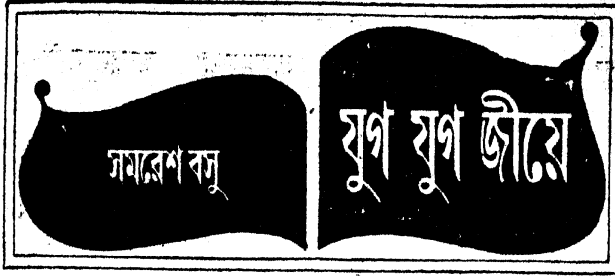
॥ ত্রিশ ॥

সাপ দংশন করে, বিষ ঢালে, দ্রুত অন্তর্ধান করে, কিন্তু প্রাকৃতিক অমোঘ নিয়মেই সে বেশি দূরে যেতে পারে না। কারণ, বিষ তার জীবনের তেজ এবং বিষহীন অবস্থায় সে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তখন তার অনেকটাই নির্জীব অবস্থা। সম্ভবত সেইজন্যই সাপুড়িয়ারা দংশনের ক্ষেত্রে এসে ঝটিতি সাপকে খুঁজতে আরম্ভ করে। দংশন মানেই নির্বিষ নিস্তেজ, এবং মানুষের ক্ষেত্রেও সম্ভবত তা-ই। প্রীতি প্রেম ছাড়াও দুর্জয় ক্রুদ্ধ মানুষেরও কোথাও একটা অসহায়তা আছে, যা যুক্তি, বিপরীত ভাবনা বা বিবেক নামক অনুভূতি ক্রিয়া করে এবং তার নিস্তেজবোধের অর্থ, তীব্র ব্যথা। শিউলী সেই ব্যথা অনুভব করছিল, ব্যথার সংগে যন্ত্রণা, অথচ তীব্র একটা অভিযোগের একেবারে নিরসন হয়ে যায় নি। অপরিণামদর্শী অকপটতার দায়িত্ব সম্পর্কে ও ত্রিদিবেশকে কতোখানি সচেতন করে দিয়েছিল, জীবনে আর হয়তো কোনোদিন বুঝতে পারবে না, কিন্তু অকপটতা যে কতটা মর্মান্তিক হতে পারে, এবং প্রতিক্রিয়া কতো গভীর, তা অনুভব করেছিল শিউলী, ত্রিদিবেশ না। ত্রিদিবেশের বাড়ানো হাতের ওপর আঘাত করতে গিয়ে, মুখে আঘাত করে ও যখন ছুটে চলে গিয়েছিল, তখনো ওর সমস্ত চৈতন্য জুড়ে ছিল ত্রিদিবেশের দুশ্চরিত্রতার প্রতি ধিক্কার। কিন্তু কুয়াতলার ধারে বেলগাছের নিচে ওর সেই নির্বিষ নিস্তেজ অবস্থা হয়েছিল, চোখে জল এসেছিল, এবং তখন একমাত্র অভিযোগ স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল, কেন ও আমাকে বলতে এলো এসব কথা? কেন, কেন বললো? না বললে কী হতো? অপূর্ণতা, সম্পর্কের নিবিড়তায় খাদ থেকে যেতো। অতএব ত্রিদিবেশ অনায়াস হয়েছিল শিউলীর কাছে, আর একমাত্র হয়েছিল মোহনের কাছে। শিউলী স্বাভাবিকভাবেই তখন তা বুঝতে পারেনি, ওর চিন্তার মধ্যে সেই যুক্তি ও বিচার ছিল না, যেমন ছিল না ত্রিদিবেশের মায়েরও, যিনি সব বুঝেও তাঁর নির্দোষ বালক পুত্রকে অসহায় যন্ত্রণায় আঘাত করেছিলেন, যে-আঘাত আসলে হয়তো তিনি করতে চেয়েছিলেন তাঁর যুবতী ভ্রাতৃবধূকে। শিউলী সাজিয়ে গুছিয়ে পূর্বাপর ঘটনাটা ভাবেনি, কিন্তু তীব্র সন্দেহের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে একটা ছবি ভেসে উঠেছিল : স্থান নদীয়া জেলার এক গ্রাম। ত্রিদিবেশের মাতুলালয়, মায়ের সংগে ও সেখানে গিয়েছিল। দিদিমা মাসীমাদের রাজত্বে ত্রিদিবেশ সেখানে অখণ্ড স্বাধীনতা ও স্নেহভোগ করতো। ন'মামী, যাঁর বয়স তখন ছিল প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি, নিঃসন্তান, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং তাঁর পিত্রালয় ছিল কাশীতে। ন'মামা কলকাতায় চাকরি করতেন, মেসে থাকতেন, সপ্তাহান্তে দেশে যেতেন। মানুষটি ছিলেন শান্ত ধর্মভীরু, নির্বিকার ধরনের এবং আহারে নিরামিষাশী। এই পশ্চাদ্‌পটের ওপরে, একটি ছবি, এক তেরো বছর বয়সের ছেলে বড়দের কয়েকজনের সঙ্গে পাশের গ্রামে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল। পালা গয়াসুর বধ এবং গয়াসুরের হত্যা ও বাজনার বিচিত্র ঝংকার ও একটি সখীর নেচে নেচে 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে' গানের সুর ইত্যাদির মূর্ছনা মস্তিষ্কে নিয়ে যখন ভোররাত্রে ফিরে এসেছিল, এবং দিদিমাকে ডাকতে যাচ্ছিল, তখন তার যুবতী ন'মামীমা ওকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান এই যুক্তি দেখিয়ে, সকলেই নিদ্রিত, অতএব কারোকে জাগিয়ে দরকার নেই, ছেলেটি তাঁর কাছেই বাকী রাত্রিটুকু শয়ন করুক, এবং তারপরে...।

'উঁহু! না!' শিউলী ফুঁপিয়ে ওঠার মতো আর্তনাদ করেছিল, এবং সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, ওর সমস্ত জীবনটা যেন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। একটা দুশ্চরিত্র নোংরা ছেলে! এ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিল না, তথাপি ত্রিদিবেশের মার-খাওয়া থমকানো মুখটি চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, এবং মনটা অন্য দিকে মোড় নিতে চাইছিল। কিন্তু সহজে তা মোড় নেয় নি, কারণ ত্রিদিবেশের নিষ্পাপ নির্দোষিতা বিষয়ে মন কিছুতেই সহজ হতে চাইছিল না। ও জানতো, ত্রিদিবেশ কখনোই আর অপেক্ষা করে নেই, যদিচ তৎক্ষণাৎ ত্রিদিবেশের সামনে যাবার কোনো ইচ্ছাই ওর হচ্ছিল না। তারপরেও

কয়েকটা দিন কেটেছিল অদর্শনে এবং বিরহ সম্যক কী, শিউলী তা জানতো না, কেবল প্রাণটা যেন কিসের ভারে ভেঙে পড়তে চাইছিল, যা প্রায় অসহনীয়। তার সঙ্গে ছিল একটা অপার ধন্দবোধ। ও স্পষ্ট মনে করতে পেরেছিল, ওর হাতের আঘাত ত্রিদিবেশের মুখে লেগেছিল এবং আরো এক আশ্চর্য বোধ ওর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। যে কারণে ত্রিদিবেশকে আঘাত, অপমান, সেই ঘটনাই ত্রিদিবেশকে যেন আর এক রূপে ওর মনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ওর বড় দুঃখের মধ্যে ত্রিদিবেশ যেন এক অনন্য পুরুষ রূপে প্রায় মহান হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, জীবনের দুর্লভ অভিজ্ঞতায় ও একক, অথচ ওর মধ্যে এক নিষ্পাপ শিশু অধিষ্ঠান করছে। এ কথা মনে হতেই শিউলী ত্রিদিবেশের সন্ধানে গিয়েছিল, কারণ জানতো, ডেকে না নিয়ে এলে সে কখনোই আসবে না।

এসেছিল ত্রিদিবেশ, শিউলীর চোখে, যুবতীর বুকে নগ্ন বালকের ছবি আবার ভেসে উঠেছিল এবং অনিবার্য ব্যথার মধ্যেই এক অদ্ভুতপূর্ব লজ্জা ও সুখের ঝংকার বেজে উঠেছিল ধমনীতে। আগেও যা বেজেছিল ঠোঁটের রক্ত ফোটা দংশের থেকে, কিন্তু সেই ঝংকারের মধ্যে স্পষ্টতা ছিল না। নগ্ন যুবতীর বুকে নগ্ন বালকের সেই ছবি এক সুখের ঝংকারে বেজে উঠেছিল, একটি আতপ্ত কামনা অনুভূত হয়েছিল প্রতি অঙ্গে, নগ্নতার তৃষ্ণা জেগেছিল সদ্য সপ্তদশীর বুকের ছাতিতে। তখন শিউলীর ছবি এঁকেছিল ত্রিদিবেশ, ওদেরই উঠানে, নিম গাছের ছায়ার বাইরে। শিউলীর একটি নতুন ভাই হয়েছিল, দাদা দীনেশের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, সংসারে একটি আনন্দের সুর বাজছিল। শিউলীর ছবি, তবু যেন শিউলীর না, এমন একটি মিশ্রতা ছিল, কারণ, ত্রিদিবেশের ছবিতে দেখা গিয়েছিল—শিউলী বসে আছে একটি হাসনুহানা গাছের নিচে, যা বাস্তবে ছিল না। এবং দীর্ঘকেশ অবিন্যস্ত খোলা, যা বাস্তবে ছিল না এবং বাঁ চোখের কোণে একটি দীর্ঘ রেখা বাঁকা ছায়া, যা প্রায় ছবির কানের কাছে স্পর্শ করেছিল, যা বাস্তবে ছিল না, এবং হাসনুহানার ঝোপের মধ্যে অস্পষ্ট একটি সাপের শরীরের ইশারা, বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্বই ছিল না, এবং সর্বাপেক্ষা যা সকলের কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য লেগেছিল, ছবির শিউলীকে যেন ওর শরীরের থেকে একটু বড় দেখিয়েছিল।

ত্রিদিবেশ বলেছিল, সব মিলিয়ে শিউলীকে ও যেমন দেখেছে, তেমনই এঁকেছে। জল রঙের সেই ছবি দেখে শিউলীর বাবা বলেছিলেন, 'ছবিটা এঁকেছে ভালোই, তবে ছেলেটার মাথায় পোকা আছে।' বাড়ির আর কেউ স্বীকার করতে চায় নি শিউলীর সেটা যথার্থ ছবি, কিন্তু শিউলীর নিজের মনে হয়েছিল ত্রিদিবেশ কখনো ভুল আঁকতে পারে না। তবু ও যখন ত্রিদিবেশকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাঁ চোখের কোণে আকর্ণ কাজলের মতো রেখাটি টানবার কারণ কী, জবাব পেয়েছিল, ত্রিদিবেশের চোখে শিউলীর চোখ আকর্ণ বিস্তৃত দেখিয়েছিল, আসলে যা চোখের পাতার ছায়ারেখা। এবং কেন শিউলীকে দেখে, হাত পা কোমর বুক সবই একটু বড় দেখিয়েছিল? 'আমি তোমার শরীরটাকে খুলে খুলে দেখেছি, যা দেখেছি তা-ই এঁকেছি', বলেছিল ত্রিদিবেশ এবং সেই খুলে দেখার মধ্যে শিউলীর কংকালের প্রতিটি খণ্ডকে নাকি ও দেখতে পেয়েছিল এবং শিউলী গভীর আবেগে ত্রিদিবেশকে জড়িয়ে ধরেছিল, অগ্রগামিনী হয়ে আগ্রাসী চুমো খেয়েছিল, এবং সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে ছিল আত্মদানের থর থর আকাঙ্ক্ষা। মাকে নিয়ে বাবা তখন ছোট তিন ভাইবোনসহ শীত ও শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজনে সাঁওতাল পরগণায় প্রবাসে, নতুন বউদি গর্ভবতী অতএব পিত্রালয়ে এবং দাদা দীনেশ তখন এক নতুন জগতে বিচরমান। শিউলী ভয়ে, তথাপি নির্ভয়ে, প্রত্যাশায় ও সংশয়ে নিজেকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছিল এবং নিবিড়তর বাস্তবে, সেই প্রথম, আর ব্যর্থতা কী অদ্ভুতপূর্ব! অবিশ্বাস্য, সংশয়ে ভরা। মুগ্ধ অথচ বিচলিত ত্রিদিবেশ যেন স্খলিত শিথিল অসাড়তায় ডুবে গিয়েছিল, এক অস্বাভাবিক উত্তাপ ছিল ওর শরীরে, নিঃশ্বাসের সপ্ততায় ওকে যেন রুগ্ন দেখাচ্ছিল, ওর নিজের হাতে অপসারিত বসনের নগ্নতা দর্শনে ও যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, এবং অলস ভঙ্গিতে শয়ন করেছিল শিউলীর জলাসন্ন বেদীতে, হাত মেলে স্পর্শছিল অতি অনম্র সপ্তদশী বুকে, অস্ফুটে কিছু উচ্চারণ করেছিল, শিউলী বুঝতে পারেনি। অনভিজ্ঞা শিউলী তথাপি অনিবার্য একটি প্রতীক্ষায় ছিল এবং স্থির ছিল না, বুকের ওপর ত্রিদিবেশের দু হাত আঁকড়ে ধরেছিল, আবেগে আকর্ষণ করেছিল। তাকিয়েছিল ত্রিদিবেশের চোখের দিকে। ত্রিদিবেশও তাকিয়েছিল, এবং ঠোঁটের কোণে তার হাসি ছিল, চোখ দুটি ছিল লাল, বলেছিল 'আমি যেন কীরকম হয়ে যাচ্ছি।' শিউলী কোনো প্রশ্ন করেনি, আপনা থেকেই আদরের আবেগে ত্রিদিবেশকে জড়িয়ে ধরেছিল, এবং আবেগের একটা মত্ততায় অসাধারণ সুখ বোধ করছিল। ও কোনো অপূর্ণতাবোধ করেনি, কিন্তু মনে জিজ্ঞাসা জেগেছিল, যার জবাব, কয়েকদিনের অবকাশের পরে, দ্বিতীয় মিলনে সব ব্যর্থতা সংশয় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, শরীরের মহত্তম উৎসবের পূর্ণতায়। একে অপরের শূন্যতা পূরণে, শরীরের প্রতি কোণে যে এতো উল্লাস ও যাতনা থাকতে পারে জানা ছিল না, যা ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের থেকেও দুর্দম আর দুর্বার শক্তিময়ী, কারণ যুগপৎ একটা ব্যথা যেন তীব্রভাবে বিদ্ধ হয়েছিল, অনেকটা বিদ্যুচ্চমকের মতো, জংঘায়, জংঘাকুঞ্চিতে, হেনেছিল উরুপেশিতে, এবং ক্ষতসৃষ্টি-জনিত রক্তপাত হয়েছিল অনিবার্য, অথবা, অনির্বচনীয় মহিমময় সুখের জগতে শিউলী নিজেকে আবিষ্কার করেছিল। আবিষ্কার করেছিল জগতপুরুষকে, যে অনেকটাই অচঞ্চল, বিকারহীন অথচ ক্রিয়াশীল ও মগ্ন, সুখের অভিব্যক্তিহীন, যেন এক অচৈতন্য ঘোরে আচ্ছন্ন। ত্রিদিবেশকে মনে হয়েছিল ও যেন ঈশ্বরের মতোই নির্দয়, অথচ দয়ালু।

আবিষ্কার মানেই, নিত্য দিশা সন্ধান, পুনঃ পুনঃ, বারংবার, অধিকতর পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা। শিউলীর তখন সেইরকমই মনে হয়েছিল, যেন এক নিত্য নিরন্তর আবেগের ঘোরে ছুটে চলেছিল, এবং তা যেন অনেকটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তখন এক আশ্চর্য কথা শুনেছিল ত্রিদিবেশের কাছে এবং সে-কথা বলবার সময় ত্রিদিবেশ যেন শিউরে উঠেছিল, চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'এখন আমি তেরো বছর বয়সের সেই ভোররাত্রের কথা মনে করলে, কেমন যেন হয়ে যাই। মনে হয়, আমার হাতে পায়ে সব ছোট হয়ে যাচ্ছে, আমার ভেতরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে, আমি যেন ধুলোকাদা মাখা গাটাপার্চার একটা পুতুল। তোমার কাছে এসে সে কথা মনে পড়লে আমার কী রকম ভয় করতে থাকে।'

শিউলী ত্রিদিবেশের কথার নিহিত অর্থ বুঝতে পারে নি, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'তা জানি না। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি মামারবাড়ি যাই, নামামীর সঙ্গে দেখা করি।' শিউলী আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'দেখা করবে?' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে করে, নামামীর সঙ্গে সেইরকম ভোররাত্রে তাঁর ঘরে দেখা করি।'

শিউলীর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল, প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?' 'আমি দেখতে চাই নামামী কী করেন।' ত্রিদিবেশ বলেছিল। এবং ওর মুখের কষ্টের ছায়ায় একটা কাঠিন্য নেমে এসেছিল, বলেছিল, 'আমি দেখতে চাই নামামী সেইরকমভাবে তাঁর গায়ের কাপড় চোপড় সব খুলে ফ্যালেন কী না। যদি না খোলেন, তাহলে আমিই জোর করে তাঁর জামাকাপড় টেনে খুলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবো, আমি তাঁকে—তাঁকে—।'

ত্রিদিবেশ কথা শেষ করতে পারে নি, দাঁতে দাঁত চেপে ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল, আর চোখ দুটো জলে ভিজে উঠেছিল। শিউলী যেন একটা সংশয়ভরা ভয়ে, দুহাতে ত্রিদিবেশের গলা জড়িয়ে ধরে

উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, কেন?'

'জানি না।' ত্রিদিবেশ রুদ্ধস্বরে মাথা নেড়েছিল।

শিউলী ত্রিদিবেশের চোখের দিকে অসহায় অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়েছিল, এবং ত্রিদিবেশের সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বুকের মধ্যেও টনটনিয়ে উঠেছিল, ওর চোখও ভিজে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, ত্রিদিবেশ যেন কেমন ক্ষ্যাপা আর উন্মাদ। ওর সেই মূর্তি দেখে শিউলীর ভয় লেগেছিল, অথচ আশ্চর্য এক গভীর অনুরাগও বোধ করেছিল, এবং ত্রিদিবেশকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রাখতে ইচ্ছা হয়েছিল, এবং ধরেও ছিল, যেন অশুভ অমঙ্গলের আক্রমণ থেকে, বুকের মধ্যে আগলে রাখার জন্য। বলেছিল, 'না না, তুমি ওসব করতে যেও না।'

ত্রিদিবেশ শান্তভাবে বলেছিল, 'আমি কোনোদিনই তা করবো না। এক এক সময় আমার যা মনে হয়, তোমাকে ত-ই বললাম। এখন অনেক কম মনে হয়। আমি আস্তে আস্তে ওসব ভুলে যাচ্ছি।'

মগ্নপ্রকৃতি শিউলী, ত্রিদিবেশে লীন, সহসা চকিত হয়েছিল প্রবাস থেকে ফেরার পরে মায়ের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করতে গিয়ে। মা যেন ওর দিকে হতচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন অপরিচিতকে দেখার ভঙ্গিতে। হতচকিত ভাবটা কাটতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি, তার পরিবর্তে মায়ের চোখে ফুটে উঠেছিল একটা তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসা। মায়ের চেহারার পরিবর্তন হয়েছিল, তাঁর মাজা মাজা ফর্সা রঙ কিছুটা রোদপড়া হয়েছিল, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো হয়েছিল, ঈষৎ রক্তাভা লেগেছিল গালের উপরিভাগে, এবং চোখে যে সব সময়েই একটা খোলা ভাব ছিল, সেটা কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, চোখের তারা দুটি যেন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঝকঝক করছিল। মায়ের চোখের উজ্জ্বলতাই যেন শিউলীকে একটু কুঁকড়ে দিয়েছিল। মা তাঁর দৃষ্টির সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসাকে গোপন করার চেষ্টা করেন নি, এবং বলেই ফেলেছিলেন, 'রেখে গেলাম এক মেয়ে, এসে দেখছি যেন অন্য মেয়ে। কী হয়েছে তোর?'

শিউলীর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল, কিন্তু অসম্ভব পটুত্বের সঙ্গে দ্রুত নিজেকে সহজ করার শক্তি সংগ্রহ করেছিল, হেসে বলেছিল, 'সে আবার কী কথা? অন্য মেয়ে মানে? আমার আবার কী হবে?

মা কখনোই খুব উচ্চ ঝংকারে কথা বলেন না, বা তেজের ভঙ্গি করেন না। বাইরে থেকে তাঁকে সব সময়ই ধীর আর শান্ত দেখায়। বলেছিলেন, 'কী আবার হবে তা জানি না, তোকে দেখে যেন কেমন একটু অন্যরকম লাগছে।' বলে, তিনি শিউলীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়েছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে শিউলী ওর ভিতরের অপ্রস্তুত অসংস্কৃত অবস্থাকে সংহত করেছিল, এবং মায়ের সেই সর্বাঙ্গে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাতে মনে মনে কুপিত হয়েছিল। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ না করে, ভ্রূকুটি হেসে মায়ের কোল থেকে কনিষ্ঠতম ভাইটিকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে বলেছিল, 'কী জানি, আমি তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।'

শিউলী মায়ের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল, কিন্তু মায়ের নীরব নিরীক্ষণ কখনো নিশ্চিন্ত বা নির্বিকার হয়নি। শিউলী যখন মাকে তাঁর শরীরের বিষয়ে প্রশংসা করে বলেছিল, 'মা, আগের থেকে তোমাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে।' তখন মা বলেছিলেন, 'তা হতে পারে আমি তো হাওয়া বদলাতে

L

গেছলাম। তুই এমন ছেউটি থেকে হঠাৎ টসটসে হয়ে গেছিস কী করে?'

মায়ের জিজ্ঞাসা এতো আকস্মিক ছিল, শিউলী একেবারেই প্রত্যাশা করেনি এবং করতে পারেনি। মায়ের চোখে সন্দেহ থাকলেও, মুখে একটু হাসি লেগেছিল। কিন্তু তার মধ্যে তিক্ততা ছিল না। শিউলী মুখে বিকীর্ণ রক্তের ছটা কিছুতেই দমন করতে পারেনি। মায়ের চোখে সন্দেহ থাকলেও, মুখে একটু হাসি লেগেছিল, কিন্তু তার মধ্যে তিতা ছিল না। শিউলী লজ্জা পেয়েছিল, অবাকও হয়েছিল মায়ের কথা শুনে। মায়ের 'ছেউটি' আর 'টসটসে' শব্দ দুটির মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিত ছিল, শিউলীর কানে যা প্রায় অশ্লীল লেগে-ছিল। মা যেন সাথীর মতো ঠাট্টার ভঙ্গিতে কথাটা বলেছিলেন। শিউলীর হাসি প্রায় নিবে এসেছিল, ভুরু কুঁচকে মায়ের দিকে তাকিয়েছিল, তারপরে হঠাৎ হেসে উঠে বলে-ছিল, 'টসটসে আবার কী। আমি কি মোটা হয়ে গেছি নাকি?'

মায়ের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল, বলে-ছিলেন, 'মোটা হোসনি। মোটা এক কথা, ঢলঢলে আর এক কথা। একলা বাড়িতে বেশি খাটাখাটনি ছিল না বলে বোধ হয় একটু চেকনাই দিয়েছে। ভালোই, এবার তোর বাবা তাড়াতাড়ি একটি ভালো ছেলে দেখুক, এই ঠিক বিয়ের রূপ ফুটেছে।'

'তুমি বড্ড আজেবাজে কথা বলো।' শিউলী মায়ের সামনে থেকে সরে গিয়েছিল, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর বেশি কথা বাড়াতে চায়নি, কারণ ওর শক্তি এতো অসীম না মায়ের সঙ্গে প্রতিটি চতুরালাপ পাশ কাটাতে পারবে। মায়ের সামনে ও যতোই সহজ থাকার চেষ্টা করুক, ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে উঠতো, উদ্বেগ বোধ করতো, এবং দূরে গেলেই যেন স্বস্তি ও মুক্তির নিঃশ্বাস পড়তো। নিজের মনে ওর কোনো সন্দেহ ছিল না মায়ের সন্দেহ যথার্থ এবং নির্ভুল। নিজেকে দেখ-বার চোখ ওর ছিল না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের প্রতিবিম্ব কও না। ইস্কুলে যাওয়া এক অনির্দিষ্ট নিয়মেই যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গেলে, ইস্কুলের মেয়েদের চোখে ওর চেহারার পরিবর্তন চোখে পড়তো কী না, কে জানে। ওর যে সব বন্ধুরা বাড়িতে আসতো, তারা কখনো কিছু বলেনি। জ্ঞাতি-ভগিনিরা রোজই দেখতো, তারাও কিছু বলেনি, এবং অন্য কোনো প্রতিবেশিনী, মা ছাড়া। মা হাওয়া বদল করে ফিরে, প্রথম দর্শনেই বলেছিলেন তার কারণ বোধ হয় মা বলেই, কারণ শিউলীর ছেউটি থেকে হঠাৎ টসটসে হয়ে ওঠার কোনো যুক্তি তিনি খুঁজে পাননি, এবং অনুচিত জ্ঞান করে-ছিলেন। সেই যুক্তি আর অনুচিত চিন্তা আর কারোর মনে আসেনি। পরিবর্তন কিছু যদিও অন্যদের চোখে পড়ে থাকে, তার মধ্যে কোনো প্রশ্ন ছিল না।

শিউলীর পক্ষে সেটাও একটা সংবিত। ত্রিদিবেশ ওকে এক নতুন রূপ দান করেছে। কিন্তু বাইরে থেকে ফেরার পর, মায়ের চোখে যে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা জেগেছিল, তা আর কখনো মোছেনি, বরং শিউলী লক্ষ করে দেখেছিল, ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে, মায়ের দৃষ্টিতে যুগপৎ অনুসন্ধিৎসা ও অন্য-মনস্কতা। প্রতিপদেই মা নির্ভুল ছিলেন। বউদি কন্যা সন্তান নিয়ে ফিরে এসেছিল। মা বাবাকে প্রায় প্রতিদিনই শিউলীর বিয়ের কথা বলছিলেন, এবং মায়ের সদা জাগ্রত দৃষ্টি-পাত ও অনুসন্ধিৎসা, শিউলীকে ক্রমে শক্ত ও সচেতন ক'রে তুলেছিল। ও ত্রিদিবেশের কাছে জানতে চেয়েছিল, কী ওদের ভবিষ্যৎ। বিবাহ! নির্দ্বিধায় ত্রিদিবেশ ঘোষণা করে-ছিল, এবং সেই সিধান্তে শিউলীও অটল ছিল। সামাজিকভাবে, স্বাভাবিক বিবাহ কোনো রকমেই সম্ভব ছিল না। বাধা, হিন্দু বর্ণ ভেদ, বয়স পরিবেশ এবং সময়। অতএব শিউলী ওর মনের প্রস্তুতি পর্ব শেষ করছিল। জীবন বা মরণ, সব ত্রিদিবেশ। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কী ঘটছিল, কোথায় যুদ্ধের দামামা বাজছিল, কবে থেকে রাস্তায় বা গলিতে ব্যাফেল ওয়াল দাঁড়াতে আরম্ভ করেছিল, সাইরেন বাজতে আরম্ভ করেছিল, রাত্রি নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল, এবং বিভিন্ন বাহিনীর কনভয় দেশান্তর গমন করছিল, শিউলী সচেতন চোখে কিছুই তাকিয়ে দেখেনি। জীবনের একটি মাত্র লীলায় ও আবেগে বিহ্বল হয়ে-ছিল, এবং সেই বিহ্বলতাকে ঘিরেই, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা রচনা করছিল, যাত্রা —নতুন দিগন্তে, ত্রিদিবেশের হাত ধরে।

*

কোথায় ত্রিদিবেশ এখন। নদীর তীর ক্রমে উঁচুতে ওঠে, ভাটায় জল নেমে চলে দক্ষিণে, ছোট ছোট ঢেউয়ে বাজে যেন মৃদু করতালি। সময়ের বাঁক থেকে বাঁকে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ঋতুচক্র স্তব্ধ, বন্দী ত্রিদিবেশ ক্রিয়াশীল শিউলীর গর্ভে। দক্ষিণের দূর বাঁকে, মেঘ-ফাটা রোদ খড়্গের ঝলকে কাঁপে। স্বল্প কয়েকটি আশাবাদী বাছাড়ি নৌকার মাঝি সাংলা জাল ডোবায়। সমুদ্রগামী ইলিশের উদ্দেশে।

'এই নদী তোমার প্রাণের ভালবাসা।' শিউলী প্রায় অস্ফুটে উচ্চারণ ক'রে। ক্রমে নদীর ঢেউ বাড়ে, যেন তার কথা হাসি কর-তালি আরো জোরে বাজে। শিউলী জলে পা দেয়, স্রোতের বিরুদ্ধে সোজা নেমে যায়। ঢেউ ঝাপটা দেয় বুকে, স্রোত টেনে নিয়ে যায় আঁচল। শিউলী নদীর গভীরে যায়।

— ক্রমশ

॥ সাতচল্লিশ ॥

রবীন্দ্রনাথের পর এবং উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের বেশ কিছু আগে আর একজন মানুষ নৃত্যকলালক্ষ্মীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থকও হয়েছিল—এত বেশী সার্থক যে বাংলার রসিকজন আজও তাঁকে ভোলেনি। সেই স্মরণীয় গুণী মানুষের নাম মধু বসু।

তাঁর ব্যালের নাম ছিল সি-এ-পি—ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স। ১৯২৭-২৮ সালে ভদ্রবাড়ির মেয়েদের নিয়ে একটা শৌখিন নৃত্য দল গঠন করা এক রকম অসম্ভব ছিল। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন মধু বসু। এবং তাঁর নৃত্যদলের প্রাণ প্রতিমা ছিলেন সাধনা সেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পুত্র সরল সেনের মেয়ে সাধনা ও নীলিমা। মধু বসু যখন তাঁর নৃত্যদল বড় করবার জন্যে উৎসুক তখন তাঁর এক আত্মীয়া তাঁকে নিয়ে গেলেন সরল সেনের কাছে এবং অনুরোধ করলেন তাঁর দু' মেয়েকেই মধু বসুর ব্যালেতে যোগ দান করবার অনুমতি দিতে।

মধু বসু অভিজাত পরিবারের সন্তান। ব্রহ্মানন্দর পুত্র তাঁর কথা বেশ ভাল করেই জানতেন। তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন। সাধনা ও নীলিমা এল মধু বসুর নৃত্য দলে। সাধনা তখন সবে কৈশোর ছাড়িয়েছে। সি-এ-পির ভারতীয় অর্কেস্ট্রার সম্পূর্ণ ভার ছিল মিহিরকিরণ ভট্টাচার্যের ওপর। তাঁর কাছে মধু বসু অনেকাংশে ঋণী। আর প্রথম-প্রথম সি-এ-পির নৃত্য পরিচালনা করতেন আর একজন নৃত্যশিল্পী—তাঁর নাম শ্রীমতী রেবা রায়।

সেই সময় সম্ভবত এই রকম সম্ভ্রান্ত পরিবারের আরও কিছু-কিছু মহিলাকে নৃত্য চর্চায় উৎসাহী করেছিল রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসী অভিযান। সি-এ-পির নৃত্য পরিচালনা করবার অনেক আগেই প্রকাশ্য মঞ্চে শ্রীমতী রেবা রায় একক নৃত্য এই কলকাতা শহরেই প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর নৃত্যের সঙ্গেও ঐকতান বাদন করতেন শিল্পচর্চায় আজন্ম উৎসাহী মহানুভব মিহিরকিরণ।

সি-এ-পি গড়ে উঠল অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। এবং ভারতবর্ষে উদয়শঙ্করের সদলবলে পদার্পণের অনেক আগেই এই সম্ভ্রান্ত নৃত্য সম্প্রদায় দেশবাসীর চিত্ত জয় করে নিল। আর একটু হলে এই নৃত্য দলও ইউরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর আরও অনেক দেশে হয়তো সে-সময় সাড়া জাগাতে পারত, কিন্তু বাদ সাধল নিয়তি—উদয়শঙ্করের মতন সি-এ-পির প্রতি প্রসন্ন হল না।

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী আনা পাভলোভার নৃত্যের অনুষ্ঠান চলেছে তখন কলকাতায়—এম্পায়ার থিয়েটারে। সম্ভবত ১৯২৭ সাল। প্রেক্ষাগৃহে পাভলোভার মহড়া চলে সকালবেলা। তারপরই শুরু হয় সি-এ-পির মহড়া। একদিন দোতলায় বক্সে বসে পাভলোভা লুকিয়ে-লুকিয়ে এদের রিহার্সাল দেখলেন। দেখে মুগ্ধ হলেন। এবং মধু বসুর সঙ্গে আলাপ না করে পারলেন না।

পাভলোভা মধু বসুকে বললেন, "আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি কারণ অনুমতি না নিয়েই আমি আপনাদের রিহার্স্যাল দেখেছি।"

মধু বসু সবিনয়ে বললেন, "ক্ষমা চাওয়ার কথা কেন বলছেন—আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি রিহার্স্যাল দেখেছেন।"

পাভলোভা একটু ভেবে বললেন, "আপনারা যদি দয়া করে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে খুবই খুশী হব।"

"বলুন, আমরা কী করতে পারি?"

পাভলোভা বললেন, "আমার ইচ্ছে আমার ব্যালেতে ভারতীয় নাচও থাকে। উদয়শঙ্করকে দিয়ে আমি 'রাধাকৃষ্ণ' করিয়েছিলাম। কিন্তু সে এখন আমার দলে নেই। আমি চাই আপনারা বিদেশেও ভারতীয় নাচ দেখান। খরচের সব ভার আমার।"

মধু বসু বললেন, "এ তো খুবই আনন্দের কথা।"

পাভলোভা বললেন, "তাহলে আপনারা তৈরি থাকবেন, আমি ইউরোপে ফিরে

কার্তিকেয় নৃত্যে উদয়শঙ্কর

লোকনৃত্যে মাধবন, সিমকী, উদয়শংকর ও শিশিরশোভন

আপনাদের সকলকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।"

সে-সময় আনা পাভলোভার নির্দেশে সি-এ-পির একটি নৃত্যও পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু এই নৃত্য সম্প্রদায়ের সমুদ্র-পাড়ি দেয়া আর হল না। আনা পাভলোভার মৃত্যু হল। বিদেশ জয়ের সুযোগ না পেলেও রুচিসংগত পরিচ্ছন্ন ভিন্ন স্বাদের নৃত্য-ধারার স্রোত স্বদেশে প্রবাহিত করে চলল সি-এ-পি। তিনটি ইংরেজী অক্ষর ঠিক থাকলেও পরে ভিতরে-ভিতরে এই নাম-করণের একটু পরিবর্তন করা হল। ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্সের বদলে হল, ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স।

১৯৩০ সালে অ্যালিস বোনারের সঙ্গে উদয়শংকর যখন প্রথম আসেন কলকাতায় সেই বছর ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের দৌহিত্রী সাধনার সঙ্গে মধু বসুর বিয়ে হয়। এবং ১৯৩৩ সালে উদয়শংকর যখন এখানে আবার এলেন সে-বছর তাঁর প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস আগে মধু-সাধনার 'দালিয়া' দেখে রবীন্দ্রনাথ খুশী হন।

পেশাদারী রঙ্গালয়গুলি যখন কলকাতার হাজার-হাজার দর্শককে মাতিয়ে রেখেছে রাতের পর রাত তখন অকস্মাৎ নতুন রস পরিবেশন করে তাদের রুচির পরি-বর্তনের চেষ্টা বৃথা যথেষ্ট কৃতিত্বের কথা বই কি। প্রতিভাময়ী সাধনা বসু শুধু তাঁর অভিনব নৃত্যে দর্শক সাধারণের চিত্ত জয় করেননি, স্বচ্ছন্দ অভিনয়েও তাদের মুগ্ধ করেছিলেন।

তাঁর রুচি এত উন্নত ছিল যে সে-সম্পর্কে একটি মজার ছোট গল্প আছে। 'আলিবাবা'র অভিনয় হবে। নৃত্যপটিয়সী সাধনা বসু গ্রহণ করেছেন মর্জিনার ভূমিকা। সুতরাং তাঁকে গানও গাইতে হবে। কিন্তু 'বাজে কাজে মিন্সেকে আর যেতে দেব না—' গানের 'মিন্সে' কথাটি উচ্চারণ করতে সাধনা বসুর রুচিতে বাধল। তিনি কিছুতেই তা বলবেন না।

শব্দটি যে বহুল ব্যবহৃত এবং এ ক্ষেত্রে বেশ জোরদার সে কথা অনেক রকম করে অনেকে বোঝাবার চেষ্টা করল সাধনা বসুকে। কিন্তু চিঁড়ে ভিজল না। তাঁর মুখ দিয়ে কিছুতেই উচ্চারিত হবে না 'মিন্সে'। তখন 'মিন্সেকে' কেটে অগত্যা 'কর্তা' বানাতে হল। এবং সাধনা বসু নেচে-নেচে গাইলেন—"বাজে কাজে কর্তাকে আর যেতে দেব না নিত্যি বনে পাঠিয়ে দেব আনবে কত সোনা দানা।"

নৃত্যমঞ্চে উদয়শংকরকে দর্শককুলের যেমন মনে হয়েছে এই মর্তে পুরাণ বর্ণিত স্বর্গলোকবাসী দেবতার মতন তেমনি সাধনা বসুর নৃত্য দেখতে-দেখতে তাদের তাঁকে মনে হয়েছে প্রকৃত অপ্সরা। উদয়-প্রতিভা যখন মধ্য গগনে সে-সময় অবলীলায় সাধনা বসুও নৃত্য জগতে তাঁর একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছিলেন।

নর্তক কিম্বা নর্তকীর মন যদি হয় রুচিশীল এবং তাদের সৌন্দর্য বোধ হয় সূক্ষ্ম তাহলে প্রতিকূল পরিবেশেও তারা যে তাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে সেকালে উদয়শংকর এবং সাধনা বসুই তার প্রমাণ। আপামর জনসাধারণের মনে তাঁরা দুজনেই সাড়া জাগিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ উদয়শংকরের যেমন প্রশংসা করেছেন তেমনি তাঁর ত্রুটির কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলতে দ্বিধা করেননি। তবুও নর্তক জীবনের শুরু থেকেই উদয়শংকর তাঁর সাধ্যমতন চেষ্টা করেছেন সুন্দরকেই মূর্ত করে তুলতে। সৃষ্টির অধিকাংশ সব শিল্পীরই থাকে এবং সৌন্দর্যের সাধনাই তার কাছে প্রধান। তার মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে ব্যাকরণের প্রাচীন বিধি-নিষেধ কখনো দমন করে রাখতে পারে না।

শংকরণ নাম্বুদ্রি যেমন দেখিয়ে দিলেন, ঠিক সেই রকম করা উদয়শংকরের মতন নর্তকের পক্ষে মোটেই কঠিন হল না। শুধু তিনি তাঁর 'কার্তিকেয়' নৃত্যকে শেষ করলেন মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটে। 'কার্তিকেয়' নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ কথাকলি নৃত্য। কিন্তু নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বেও যেন আর কিছু ছিল। তা উদয়শংকরের নব সৃষ্টির ব্যাকুলতা—তা তার একটা পুরাণ পরিচিত জিনিসকে নতুন করে গড়বার ক্ষমতা।

এই শ্রেণীর আরও একটি নৃত্যের পরিকল্পনা এলগিন রোডের বাড়িতে করে-ছিলেন উদয়শংকর। শিব পার্বতীর নৃত্য দ্বন্দ্ব—নব রস। উদয়শংকর ও সিমকী। শিব ও পার্বতীর নৃত্যের প্রতিযোগিতা চলেছে। নৃত্যদ্বন্দ্বে পার্বতীকে পরাজিত করলেন শিব। কেননা পার্বতী এক সময় লজ্জা পেলেন, তাঁর পদক্ষেপ মন্থর হয়ে এল। কেননা নৃত্যের ঘোরে শিব দ্রুতভঙ্গি করলেন তাঁর বস্ত্র খণ্ড খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলবার।

কথাকলি মণিপুরী কিম্বা অঞ্চল বিশেষের লোকনৃত্য কিম্বা বর্মী নৃত্য—যখন যা দেখেছেন উদয়শংকর, যেখানে যা কিছু সরল সবল, যা কিছু সুন্দর, ইঙ্গিত-ময় তা থেকে সুধা ছেনে নিয়েছেন তিনি। নিয়ে সুদূরপ্রসারী করেছেন তাঁর কল্পনাকে—করেছেন মহত্তর সৃষ্টির প্রয়াস। কার্তিকেয়, নিরাশা কিম্বা হার্ভেস্ট ডান্স ও তাঁর কল্পিত আরও অনেক নৃত্য একান্ত তাঁরই কল্পনার প্রকাশ।

উদয়শংকর এসেছেন তাঁর শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি নসরৎপুরে। বিকেলে চলা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকে এসেছে উদয়শংকরকে দেখতে। নিচু সম্প্রদায়ের বহু লোকও জমা হয়েছে নিচে। তাদের মধ্যে অনেক দেখবে তাদের চেনা সেই দুরন্ত খোকাবাবুকে। কিন্তু তারা উদয়শংকরকে সে-নামে আর ডাকে না। তাদের সেই খোকা-বাবুকে তারা এখন বলে, সাহেব।

বাইরে এসে গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে বলে উঠলেন উদয়-শংকর, "মাতাদিন এসেছে—মাতাদিন?"

এতদিন পর উদয়শংকরের মুখে মাতাদিনের নাম উচ্চারিত হতে শুনে সকলে খুব অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য, খোকাবাবু এখনো তাকে মনে রেখেছে। বয়সের ভারে কুঁজো এক বুড়ো বসেছিল একদিকে। সে তো ভাবতেই পারে না সে তার নাম ধরে ডাকছে খোকাবাবু।

উদয়শংকর আবার বললেন, "কই মাতাদিন?"

বয়সের ভারে কুঁজো সেই বুড়োকে

গৎমাপজো নৃত্যে কনকলতা ও সম্প্রদায়
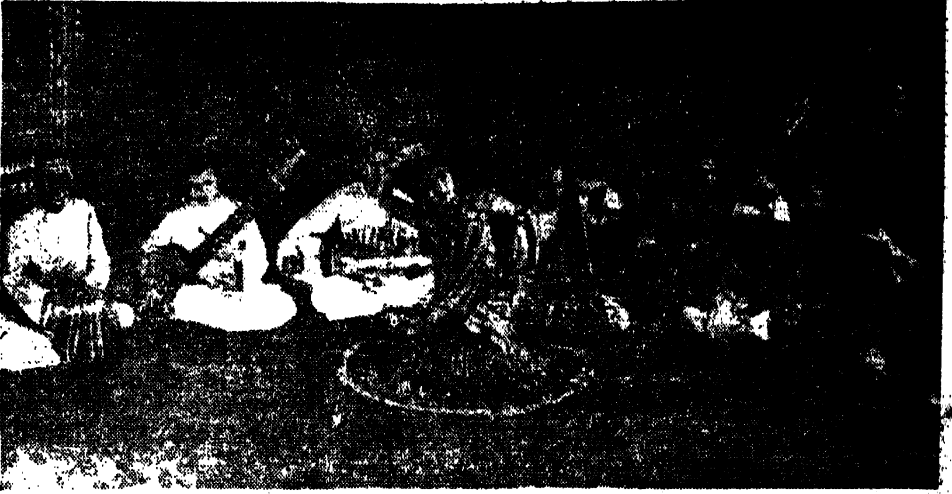
একজন ঠেলা মেরে বলল, "এই মাতাদিন, ওঠ রে জল্লাদ। সাহেব ডাকছে তোকে—"

মাতাদিন উঠে দাঁড়াল। উদয়শংকর এগিয়ে এলেন তার কাছে। এসে এক নাটকীয় কাণ্ড করলেন তিনি। সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠল। ভয়ে আতংকে কেঁদেই ফেলল মাতাদিন। এই মহাপাপের ভার সে লাঘব করবে কেমন করে। ব্রাহ্মণ সন্তান উদয়শংকর প্রনাম করেছেন চামার মাতাদিনকে।

কিন্তু কেন? কেন একজন নগণ্য অস্পৃশ্য মানুষের পদস্পর্শ সকলের সামনে করতে দ্বিধা করলেন না উদয়শংকর? মাতাদিনকে তিনি ভোলেননি ভুলতে পারেননি। শৈশবে তিনি দেখেছিলেন তার নাচ—তা দেখতে লুকিয়ে-লুকিয়ে কতবার তিনি গেছেন চামারদের বস্তিতে। তাই এতদিন পর বাইরের সব বাধা বিস্মৃত হয়ে তিনি তাকে দিলেন গুরুর সম্মান।

এবার বেশ অনেকদিন উদয়শংকর থেকে গেলেন কলকাতায়। তার নৃত্যের অনেক অনুষ্ঠানও হল নানা জায়গায়। তারপর একদিন সময় হল আবার বিদেশে পাড়ি দেয়ার।

শংকরণ নাম্বুদ্রি ফিরে গেছেন কেরালায়। রাজেন্দ্রশংকর দেবেন্দ্রশংকর আর কনকলতা কিছু আগে ছেড়ে গেছে উদয়শংকরের দল। ছিল সিমকী জোহরা মাধবন বিষ্ণুদাস নগেন দে শিশিরশোভন রবিশংকর এবং আরও অনেকে। শেষের দুজন শিল্পী শুধু তবলা আর সেতারই বাজাত না, নিপুণ নর্তকের মতন তারা নৃত্যও করত।

আবার বিদেশে যাবার সময় হল। এবার নিয়ে যেতে হবে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানকে সঙ্গে। উদয়শংকর তিমিরবরণকে বললেন তাঁকে কলকাতায় আনবার ব্যবস্থা করতে। কেননা আর বেশী সময় নেই। ঠিক হল তিমিরবরণ যাবেন মাইহারে তাঁর গুরুজীকে একথা বলতে। উদয়শংকরও সেখানে যাবেন তাঁর সংগে।

এক রাতে ট্রেন ধরলেন দুজনে। কিন্তু মাইহারে যাবেন বলে ট্রেনে উঠলেও শেষ অবধি কী ভেবে সেখানে গেলেন না উদয়শংকর। তিনি চলে গেলেন সোজা বোম্বাই-এ। তিমিরবরণ একাই এলেন মাইহারে। বিদেশ থেকে ফিরে খান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর এই প্রথম নয়, বছর তিনেক আগে তিনি আর একবার এসেছিলেন মাইহারে, সেবার তাঁর সংগে ছিল উদয়শংকরের পরের ভাই রাজেন্দ্রশংকর।

প্রিয় এবং পুরনো ছাত্রকে আবার দেখতে পেয়ে খুবই খুশী হলেন খান সাহেব। অনেক প্রশ্ন করলেন, শুনলেন এবার কী উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর কাছে এসেছেন তিমিরবরণ। হঠাৎ কিছু বললেন না আলাউদ্দীন, সম্ভবত মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন উদয়শংকরের এই প্রস্তাব।

তিমিরবরণ বললেন, "আমি উদয়শংকরকে কথা দিয়েছি। সে আমার কথার ওপর নির্ভর করে আছে। আমার মনে হয় আপনার বিদেশে একবার যাওয়া দরকার—"

তবুও কথা বলেন না আলাউদ্দীন খান। তখনো তিনি কী যেন ভাবছেন। এইবার তাঁর মন গলাবার জন্যে তিমিরবরণ বললেন, "আপনি যদি দয়া করে উদয়শংকরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন তাহলে মক্কা-মদিনা দেখবার সুযোগও আপনার হবে—"

একথা শুনে খুশীর একটা আভা ফুটে উঠল খান সাহেবের মুখে। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ। তিমিরবরণ জানতেন মক্কা-মদিনায় যাবার সাধ তাঁর অনেক দিনের।

এবার উদয়শংকরের সম্প্রদায়ে যোগ দিতে রাজী হয়ে গেলেন খান সাহেব।

তবুও তিনি তিমিরবরণকে বললেন, "রাজার অনুমতি আমাকে নিতে হবে। তাঁকে না জানিয়ে আমি কিছু করতে পারি না।"

"ঠিক—" তিমিরবরণ বললেন, "আমি তাঁকে আপনার কথা বলব উদয়শংকরের হয়ে। চলুন, আমিও রাজার কাছে যাই আপনার সঙ্গে।"

খান সাহেব বললেন, "ভাল কথা। চল।"

মাইহারের রাজা মুখে কোন আপত্তি করলেন না। তিনি খুশীই হলেন। খান সাহেব তাঁকেও বললেন যে মক্কা-মদিনা দেখবার সুযোগ হবে বলেই তিনি উদয়শংকরের সঙ্গে বিদেশে যাচ্ছেন। পরে এক সময় খান সাহেবকে রাজা মশাই বলেছিলেন, "আপনার মক্কা-মদিনা দেখার ব্যবস্থা তো আমিই করে দিতে পারতাম।"

প্রিয় শিষ্য তিমিরবরণের অনুরোধে সব রকম বাদ্যযন্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান কিছুদিনের জন্যে মাইহার ছেড়ে এলেন—যোগ দিলেন উদয়শংকরের নৃত্য সম্প্রদায়ে। উদয়শংকরকে তিনি দেখলেন স্নেহের চোখে, পুত্রের মতন। উদয়শংকরও তাঁকে দেখলেন পরম শ্রদ্ধার চোখে, পিতার মতন। খান সাহেব উদয়শংকরকে ডাকলেন, "বাবা।" উদয়শংকরও তাঁকে ডাকলেন, "বাবা।"

ইউরোপের কোন-কোন জায়গায় নৃত্য প্রদর্শন করে উদয়শংকর এলেন ডার্টিংটন হলে—এলমহার্স্টের আবাস গৃহে। এখানকার শিক্ষা কেন্দ্রর ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সামনে হল তাঁর নৃত্যের অনুষ্ঠান। অধ্যাপক মাইকেল শেখভ তাঁর অধ্যাপনার সময় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে করলেন উদয়শংকরের নৃত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা।

উদয়শংকরকেও আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে মাইকেল শেখভের ক্লাসে। তাঁর সামনেই অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের, "তোমরা সকলেই এখানে শংকরের ব্যালে দেখেছ। এখন ভারতীয় ব্যালে দেখে কী তোমাদের মনে হয়েছে বল। আচ্ছা বল তো, কোন নাচ তোমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে?"

কিছুক্ষণ কোন উত্তর এল না। সকলেই চুপচাপ থাকল। একটু পরে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে একটি ছাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে গজাসুর বধ।"

অধ্যাপক শেখভ আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু কেন তোমার এই নাচ ভাল লেগেছে?"

ছাত্রীটি কিছু সময় ভাবল, অধ্যাপকের এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না। অধ্যাপক তাকে বললেন, "আমারও 'গজাসুর বধ' সবচেয়ে ভাল লেগেছে। কেন জান? প্রথম থেকে এতে একটা অদ্ভুত নাটকীয় ভাব আছে—সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে। পরিবেশও চমৎকার। দেহের এক-এক অংগ, চোখ মুখ, হাত-পা—প্রত্যেকটির যেন একটা আলাদা ভাষা আছে। আর এক-একটি ভারতীয় যন্ত্রও যেন এই নাচের তালে-তালে যেন কথা বলে উঠেছে। শিল্পের দিক থেকে এই নাচ সার্থক।"

মাইকেল শেখভের আলোচনা শুনে খুশী হলেন উদয়শংকর। ঠিক এই রকম কথাই তিনি ভেবেছিলেন এই নৃত্যের পরিকল্পনার সময়। একজন বিদেশীও 'গজাসুর বধে'র মূলে রসের সন্ধান পেয়েছেন।

এই ডার্টিংটন হলেই আর একটি নৃত্যের পরিকল্পনা করেছিলেন উদয়শংকর। সুরারোপ করেছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান। এই নৃত্যের নাম, বিলাস। অনেক দিন আগে প্যারিসে যখন কাটছে উদয়শংকরের সংগ্রাম ও সংকটের দিন সে-সময় তিনি একটি নৃত্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেদিন তাঁর নৃত্যসংগিনী ছিল অ্যাডেলেড। প্রেমিক প্রেমিকার সুখরজনী শেষ হয়ে এসেছে। ফুটে উঠবে দিনের আলো। আসবে বিদায়ক্ষণ। সম্ভোগের ইংগিত নেই নায়ক-নায়িকার অভিব্যক্তিতে। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিদায়কালের করুণ ছায়া।

উদয়শংকর বললেন আলাউদ্দীন খানকে, "বাবা, কিছু বাজান।"

আলাউদ্দীন খান জিজ্ঞেস করলেন, "কী বাজাব বাবা?"

উদয়শংকর তাঁকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন, "রাত শেষ হয়ে এসেছে। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে ছেড়ে যাবে—"

খান সাহেব বললেন, "কতক্ষণ বাজাব বাবা?"

উদয়শংকর বললেন, "এই মিনিট পাঁচ-ছয়—"

আলাউদ্দীন খান উদয়শংকরের কথামতন সরোদে বাজালেন ভৈরবী। এবার উদয়শংকরের নৃত্যসংগিনী জোহরা। তার বোন উজরা বেগমও এসেছে উদয়শংকরের সম্প্রদায়ে।
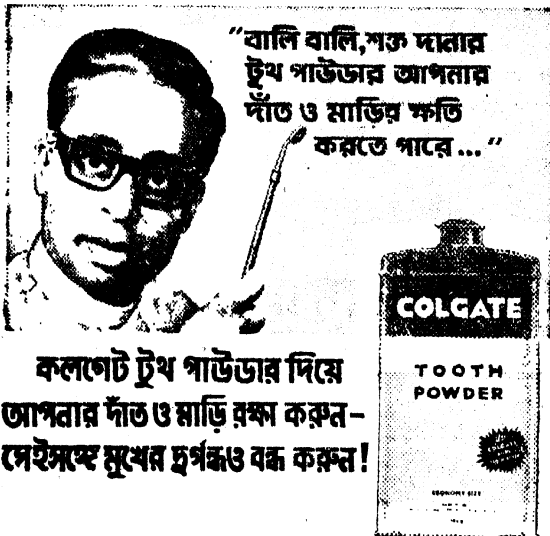
প্যারিসে উদয়শংকর অ্যাডেলেডের সংগে যে-নৃত্যের পরিকল্পনা করেছিলেন 'বিলাসে'র সংগে তার কোনই মিল নেই। এ নাচের ভংগি অভিব্যক্তি এবং প্রয়োগরীতিও অনেক মার্জিত ও উন্নত।

উদয়শংকরের নৃত্য সম্প্রদায়ে আলাউদ্দীন খান ছিলেন প্রায় এক বছর। পরে তিনি আবার ফিরে যান মাইহারে। আরও দু-তিন বছর পর ১৯৩৯ সালে উদয়শংকর তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তাঁর আলমোড়া শিক্ষা কেন্দ্রে।

এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিপুল ব্যয়ভার বহন করেছিলেন ইংরেজ ধনকুবের এলমহার্স্ট। তিনি নিজেও এসেছিলেন আলমোড়ায়। আর এসেছিল ডরোথি এলমহার্স্ট-এর কন্যা লাবণ্যময়ী বিয়াট্রিস স্ট্রেইট।

(ক্রমশ)

সংশয়ের যুগের শিশু

সিঙ্গার সাহেব ব্রিটেনে সাসেকস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর অধ্যাপক। তিনি UNICEF অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে অঙ্গটি শিশু কল্যাণ নিয়ে কাজ করেন তার জন্য একটি পুস্তিকায় নানা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করেছেন। পুস্তিকাটির নাম 'চিলড্রেন ইন দা স্ট্র্যাটেজী অব ডেভলপমেন্ট'। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিমাপ অথবা সাফল্য এবং অসফলতা মাত্র কেবল উৎপাদন বৃদ্ধি দিয়ে বিচার করা চলে না। কোন অগ্রগতিরই আসল উদ্দেশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি মাত্র নয়। এই কথা সিঙ্গার সাহেব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তবে আসল উদ্দেশ্য কি ? আসল উদ্দেশ্যকে মোটামুটি বর্ণনা করেছেন: কোন একটি দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নততর করা হচ্ছে অগ্রগতি।'

কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষ কারা ? তারা আজকের শিশু, হয়তো বা তাদের কেউ কেউ এখনও জন্মগ্রহণও করে নি। কাজেই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হলে প্রথম দেশের শিশুদের সম্বন্ধে উন্নততর পরিকল্পনা সবার আগে দরকার। সবচেয়ে বড় প্রেরণা জীবজগতে সর্বত্রই মাতাপিতার শিশুর কল্যাণ করবার প্রেরণা। মানুষের বেলায় সে প্রেরণা থেকে কর্মধারা নির্ণয় হয়। মানুষের ভবিষ্যৎ শুধু তার আকাশে বাতাসে, স্থাবরে জঙ্গমে বা উর্বরা জমিতে গঠিত হয় তাও নয়। আমাদের বুদ্ধিগত উত্তরাধিকার পরম্পরায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত থাকে সব চেয়ে বেশী। সেখানেই সব জয় পরাজয়।

এই বুদ্ধিগত পরম্পরার হিসাব করতে গেলে দেখা যায় তার অনেকাংশ জন্ম নেয় অপেক্ষাকৃত গরীব পরিবেশে। জগতে যদি শিশু জন্মগ্রহণ করে তবে তার পাঁচটি জন্মায় অগ্রগতির পথে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছে যেসব দেশ সেখানে। সিঙ্গার সাহেব সে জন্য বলছেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ছয়টি শিশুর পাঁচটিই জন্মায় গরীব দেশে। কত আইনস্টাইন বা নিউটন হতে পারতো কিন্তু সুযোগ কম বলে হয় না। কারও বা অকালে মৃত্যু হয়। কারও বা পরিবেশ এমন যে শত প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হবার অবকাশ পায় না।

১৯৫৯ সালে ইউনাইটেড নেশনস্ বা জাতিসঙ্ঘের একটি মূল্যবান ঘোষণায় শিশুর অধিকারের নয়টি ধারা নির্দ্ধারিত হয়। প্রথম হচ্ছে নাম ও জাতীয়তা এবং জন্মের কালে প্রত্যেক শিশুর সমান মর্যাদা। দ্বিতীয় মায়ের সংরক্ষণ ও পরিবারের যত্ন। তৃতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগপ্রতিষেধক

ব্যবস্থা অবলম্বন। চতুর্থ সম্যক পুষ্টি ও সম্যক আশ্রয়। পঞ্চম শিক্ষা, তারপর খেলা ও আমোদ প্রমোদ। সপ্তম জাতি, বর্ণ এবং ভাষা নির্বিশেষে সামাজিক সুরক্ষা। অষ্টম শিশুকে পোষণ করা বা কিশোরকে শোষণ করা থেকে রক্ষা করা। নবম অনাথ, অসহায় বা জড়বুদ্ধি বালক বালিকার বিশেষ যত্ন।

আমাদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অথবা সমাজ যখন প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে বিপর্যস্ত তখন শিশুদের ভবিষ্যৎ-এর ভাবনাও সম্যক করা সম্ভব কিনা বলা কঠিন। শিশুর প্রথম বিকাশ পরিবারে। অপুষ্টি সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে এ শব্দটি হচ্ছে, শিশুদের অর্দ্ধোপবাসের অপর একটি মার্জিত শব্দ। কটা পরিবার এখন পুষ্টি পুরোপুরি সংগ্রহ করতে সক্ষম বলুন? সঙ্গতি ও সংস্থান অতি সামান্য। কাজেই 'বলি' শিশুরা হ'তে বাধ্য। মায়েদের বিশেষ করে ব্যাপারটির ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে। তাতে এইটুকু হতে পারে যে, যা পাওয়া তা' থেকে যথাসাধ্য পুষ্টি সংগ্রহের ব্যবস্থা হবে। অনেক সময় অভাবের উপর নানা অভ্যাস বা সংস্কার খাদ্য অখাদ্য সম্বন্ধে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। হয়তো উপকারিতা ও গুণে সমান অথচ দামে সস্তা বলে কদর হয় না এমন খাদ্য আমরা অবহেলা করি।

আর একটি বিষয় আমরা সচেতন সব সময় থাকি না। তা হচ্ছে শিশুর মানসিক বিকাশ। দুনিয়ার সর্বত্রই জীবন-যাত্রার জটিলতা শিশুর মানসিক বিকাশেও জটিলতা এনেছে। সাদাসিধা নিয়মগুলি মুখস্থ করায় যে বিশ্বাস সারাজীবনের সহায় হ'তো তা এখন শৈশবেও অচল হ'য়েছে। সদা সত্য কথা বলিবে বা চুরি করা মহা পাপ যখন বাস্তব জীবনে অচল ব'লে মনে হয়, শিশু কি সে কথা বই প'ড়ে শিখতে পারে "লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে" কথাটি নিয়ে তামাশা, কৌতুক, মজা আগেই কত হ'য়েছে। লেখা পড়া করলে গাড়ি চড়া যায় না চাপা পড়তে হয় সে সম্বন্ধে সংশয় জন্মাতে এখন আর কারও দেরি হয় না। প্রাচীনতায় নবীনতায় এই দ্বন্দ্ব পাশ্চাত্ত্যকেও সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। He will be King who does right, He who does not right will not be King.

প্রায় ওই লেখাপড়া সম্বন্ধে কথাটির মতই হ'লো। যে ন্যায় করে সে রাজা হয় আর যে ন্যায় করে না, সে হয় না। আজ ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধেই ছককাটা পথ আর নেই। কাজেই শিশুর তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তিও সন্দেহে, দ্বিধায় দোলায়মান হয়।

ছোট শিশু কিছু বোঝে না একথাও আমরা ভুল বিশ্বাসে মনে করতাম। দুই বছর বয়সে শিশুর মস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্কের চার ভাগের তিন ভাগ ওজন হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ বছরের মধ্যে শিশু দ্রুত উন্নতি করে। ভাষা সে ব্যবহার করে, মানে বুঝতে পারে অনেক কথার। পাঁচ বছর বয়সে সে সামাজিকতার অংশ হয়। তখন তার আত্মকেন্দ্রিক আচরণ কমতে থাকে। তার নিজস্ব প্রয়োজনের পরিধি অতিক্রান্ত হয়। সে সময় পরিবেশ প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করে। শত সমস্যা সত্ত্বেও পরিবার এ সময় বিশিষ্ট ভূমিকা অস্বীকার করতে পারে না। এখন থেকে নিয়ে যৌবনারম্ভ পর্যন্ত পরিবারের প্রত্যেকের দায়িত্ব তার মানসিক গঠনে ততটাই যত্ন নেওয়া যতটা তার শারীরিক গঠনের জন্য প্রয়োজন।—বয়ঃসন্ধির যে নানা লক্ষণ দেখে পরিবার চিন্তিত হয় তার প্রক্রিয়া, পরিবর্তন ও ক্রমাগ্রসরণ শুরু হয় অনেক আগে। শৈশব ও কৈশোরের পরিবেশ সুন্দর হ'লে বয়ঃসন্ধির সমস্যাও অনেকটা সহজ হয়। বয়ঃসন্ধিকে সমস্যামূলক সময় সবাই বলে। চরিত্র গঠনে এ সময়ের সমাধানে পরিবেশ সাহায্য করে অনেকটা।

খবরের টুকরো

নায়গ্রা ফলস্ দেখতে গিয়ে দেখলাম লেক ইরি শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। ইরির তীরে অবস্থিত কলকারখানার ফালতু আবর্জনায় বিশ্বের বিস্ময়ের কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে। ইউরোপে রাইন ছিল ঝকঝকে, নির্মল জলের ধারা। এখন রাইন কিন্তু ইউরোপের ময়লা নিষ্কাশনের বৃহত্তম পয়ঃপ্রণালী বা ড্রেন। রাইনের উর্বর দু' কূল ভরে উঠেছে আগাছার মত সব কলকারখানার কলুষিত জঞ্জাল।

আমাদের অজ্ঞাতসারে আধুনিক সভ্যতা আকাশ বাতাশ দারুণ দূষিত করে তুলছে। ধোঁয়া কালি বালি প্রভৃতি পদার্থ আমাদের নিশ্বাসকে বিষে ভরে দিচ্ছে। তরল আবর্জনা বয়ে যাচ্ছে জলে যার আর এক নাম জীবন। ভারতবর্ষে বর্ষার সচল স্ফীত নদীর ধারা অনেক ক্ষেত্রে অন্য সময় দীর্ঘ হয়ে যায়। কলকারখানা কাছে থাকলে ভরে ওঠে আবর্জনায়। কত শত রোগের কারণ

হয়ে জমা পচা পূতিগন্ধময় জল মানুষের নানা আশংকা ও বিপদের সৃষ্টি করে।

অনেক সময় অতি সাধারণ ব্যাপার থেকে আবর্জনা ভীতিপ্রদ হয়ে যায়। খাটাল বা বড় গোমহিষ রাখবার স্থান এখন শহর থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা হয়। খাটালের আবর্জনা সাংঘাতিক ক্ষতিকর। চামড়া পাকা করার কারখানা বা ওই কারখানার আবর্জনার গন্ধ কলকাতার মানুষকে চিনিয়ে দিতে হবে না। এভাবে বহু রকমের কারখানার আবর্জনা নিত্য জনজীবনকে বিব্রত করছে। আমাদের সমস্যা এতরকম যে আবর্জনা সমস্যার যতটা মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত ছিল তা' করেনি। ফলে সাংঘাতিক আকার ধারণ করার হাত থেকে বাঁচতে হলে দেরি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণের মধ্যে সচেতনতা আনা দরকার। এ সচেতনতা সংগ্রামে মায়েরা আগ্রহী হবেন আশা করা যায়। আধুনিক সভ্যতা যে সর্ব-সুখের আকর নয় তা' তাঁরাই হাড়ে হাড়ে বুঝছেন। জীবনযাত্রার মান-এর নাম করে নিষ্ঠুর নব সভ্যতা ফাঁকি দিচ্ছেন তাঁদের সবচেয়ে বেশী।

শ্রীমতী

যাঁরা শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পেলেন : (বাঁদিক থেকে) অধ্যাপক পি টি নরসিংহম, ডঃ জে আর তালওয়ার, ডঃ পি কে আয়েঙ্গার, ডঃ মনোজিৎ মোহন ধর, ডঃ ও ডি গুলাতি, অধ্যাপক এম এস কানুনগো এবং ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য। ডঃ মাইতি এবং অধ্যাপক নায়ার দিল্লিতে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার : ১৯৭০, ১৯৭১

সম্প্রতি নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিল্প-উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণম ভারতের নয়-জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালের শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার অর্পণ করলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, যে সমস্ত বিজ্ঞানী সর্বভারতীয় এই পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন নিজ নিজ গবেষণা এবং উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁরা সবাই অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পুরস্কারের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা। বলতে বাধা নেই, স্বাধীনতার পর এদেশে নানা রকম পুরস্কার, মানপত্র বা পদক দেবার রীতি চালু করা হয়েছে। এই সব পুরস্কার, মানপত্র বা পদক অর্পণ করার ব্যাপারে কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনাও শোনা যায়। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীকে বলতে শুনেছি, ও সব তো মশায়, দলের ব্যাপার। নির্বাচকমণ্ডলীকে খোশামোদ না করলে পদক-টদক মেলা শক্ত। জাতীয় গবেষণাগারের কিছু কিছু বিজ্ঞানী বর্তমান লেখককে এমন কথাও বলতে কুণ্ঠিত হননি, 'পুরস্কার, পদক—এ সব পেতে গেলে ভাল কাজের চেয়ে বেশি দরকার কর্তাদের তুষ্ট করা। তাঁরা খুশী হলে তবেই তো আপনার নাম (বহুবচন অর্থে) নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে যাবে?'

কোন কোন পুরস্কার, পদক বা অভিজ্ঞানপত্র দেবার ব্যাপারে এ সব অভি-যোগ হয়ত আংশিক সত্য। কিন্তু একটা কথা ঠিক, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারের ক্ষেত্রে কেউই এ কথাটা তোলেননি। বিশেষ এই পুরস্কারটির ব্যাপারে বরং অনেকে একটি কথাই বলেছেন : 'যে কোন বিজ্ঞানীর কাছে ভাটনগর পুরস্কার পাওয়াটা একটা বড় রকমের গৌরব। তাঁর কাজের বড় রকমের স্বীকৃতি।

'কথাটা হয়ত অতিশয়োক্তি নয়,' বলে-ছেন জনৈক বিজ্ঞানী। 'কারণ' তাঁর বক্তব্য, 'এ পুরস্কারটি দেবার আগে নির্বাচক-মণ্ডলী যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেন। যে সব বিষয়ের উপর গবেষণা বা উদ্ভাবনার জন্যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়, বিচারকরা তাদের গুণগত মান নির্ধারণের ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক। এবং শুধু মানই নয়, ওই সব কাজকর্মে যিনি পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি কতখানি জড়িত। কতখানি নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে।' এক কথায়, নির্বাচকরা অনেক কিছু বাজিয়ে তবেই পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করে থাকেন।

বস্তুত, ১৯৫৭ সালে বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পর্ষদের রূপকার স্বর্গত শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের স্মৃতির উদ্দেশে বিশেষ এই পুরস্কারটির যখন প্রবর্তন করা হয়, তখন একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল এটাই : যিনি পুরস্কার পাবেন, তিনি এমন একটা কিছু করুন যাতে করে শুধু বিজ্ঞান প্রযুক্তিই নয়, দেশের মানুষও লাভবান হতে পারে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা উদ্ভাবনা কারে থেমে পড়লেই চলবে না, তাঁদের আবিষ্কার এবং সক্রিয় আত্মোৎসর্গ যাতে জন-মানুষের কল্যাণের কাজে লাগে, সেটাও দেখতে হবে।

বিজ্ঞান ভবনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুব্রহ্মণম যা বলেছেন তারও মর্মার্থ করলে এমন কথাই দাঁড়ায়। পুরস্কার প্রাপকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন, 'আপনাদের গবেষণা বা উদ্ভাবনা শুধু ভারতীয় বিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তিই নয়, বিশ্বের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসামান্য সংযোজন। বিশ্বের প্রতিটি মানুষই এ সবের দ্বারা লাভবান হবে।'

বিজ্ঞান এবং শিল্প পর্ষদের ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ ওয়াই নায়ড়ু আম্মার আবেদন, নিজের নিজের গবেষণায় আপনারা আশানু-রূপ নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের আশা, জাতীয় সমস্যার সমাধানে আপনারা সরকারকে সাহায্য করুন। বিজ্ঞানকে আপনারা প্রতিটি মানুষের দরজায় পৌঁছে দিন।

বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ডাইরেকটর জেনারেল যা বলেছেন তা থেকে দুটি সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যায়। এক, যাঁরা পুরস্কৃত হলেন, তাঁদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। দুই, জাতীয় স্বার্থে তাঁদের ভূমিকা বিশিষ্টতম।

কিন্তু প্রশ্ন এই, এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে ব্যবধান কিন্তু দুস্তর। কারণ, অনেকেই হয়ত স্বীকার করবেন, ভাল কাজ করা এবং সেই ভাল কাজকে যথাযথভাবে ভাল কাজে লাগানো এ দুটি কিন্তু এক ব্যাপার নয়। প্রথমটির কৃতিত্ব কারোর ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে ঠিকই। প্রচুর সুযোগ পেলেই যে একজন বড় বিজ্ঞানী হয়ে যাবেন, নিশ্চয় একথা কেউ বলবেন না। আবার
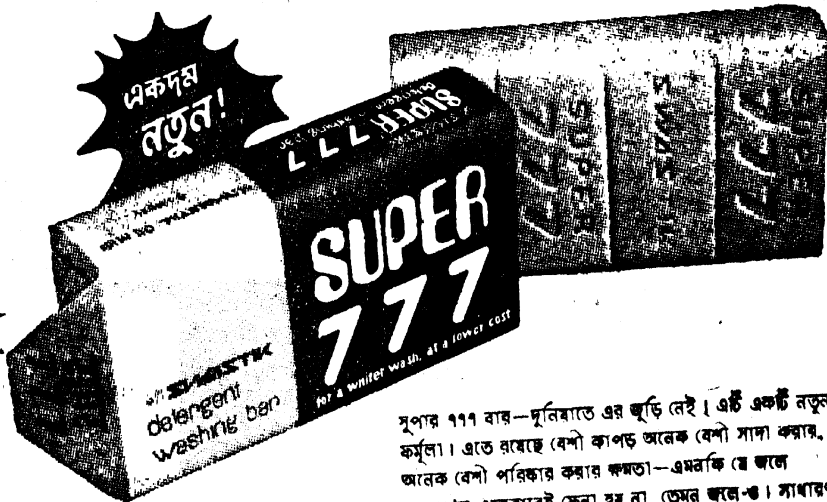
সুযোগও এমন ব্যাপার বা ব্যক্তিগত যোগ্যতায় গড়ে নিতে হয়। জানি, এদেশে অসুবিধে আছে অনেক। সবচাইতে বড় অসুবিধে, মানসিকতার অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পঠন-পাঠন ব্যবস্থা এবং বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষমতাবান বিজ্ঞানীর মানসিক জড়ত্বের দরুন, যে মন তরুণ বিজ্ঞানীদের সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করে, ব্যাপকভাবে সেই মনটি এখনও আমরা তৈরি করতে পারিনি। কতকগুলি স্থলে বৈষয়িক ব্যাপার, যেমন পেশাগত নিরাপত্তা, গবেষণার জন্যে ন্যূনতম যে সব সুযোগ-সুবিধে দরকার, দূরদৃষ্টির অভাবে এবং কখনও কখনও কর্তাদের খামখেয়ালিপনায়, একটা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে গবেষণা এখনও পর্যন্ত পড়ে রয়েছে। যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে, আমি জানি, এই কলকাতারই বেশ কয়েকটি গবেষণাগারে কয়েক ডজন তরুণ পি এইচ ডি-কাল গুনছেন। অথচ ওই সব গবেষণাগারেই কোন কোন ক্ষমতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী অঢেল টাকা-পয়সা খরচ করে যন্ত্রপাতি কিনে মনোহারী দোকান সাজিয়ে বসে আছেন। একই গবেষণাগারে এমন বৈষম্য থাকলে কাজ চলে কী করে?

অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলি সব এখন 'আনপ্রোডাকটিভ'। প্রশ্ন এই, 'প্রোডাকটিভ' করার জন্যে সরকার এ পর্যন্ত কতটা উৎসাহ জুগিয়েছেন? লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জমকাল বাড়ি তৈরি করেছেন সি এস আই আর। অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজেই আসুন? দেখবেন, অধ্যাপকদের বসবার মত একটি রুচিসম্মত ছোট ঘরও নেই। ছোট্ট একটি ঘরে ছাত্রছাত্রীরা গাদাগাদি করে কাজ করছেন। গবেষণার সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা মধ্যযুগীয়।

এ সব অসুবিধের মধ্যে সুশৃঙ্খল কোন কর্মপ্রচেষ্টা গড়ে তোলা চলে, একথা নিশ্চয় কেউ বলবেন না।

তবু এত সব বাধাবিঘ্নের মাঝেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধ্যবসায় এবং যোগ্যতায় কেউ কেউ মাঝে মাঝে অদ্ভুত রকমের ভাল কাজও করছেন। তাঁদের সাফল্যের বেশির ভাগ কৃতিত্ব তাঁদেরই। এবং তার জন্যে কী প্রচণ্ড সংগ্রাম যে তাঁদের করতে হয়, আমাদের বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে এতটুকু খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই জানেন। প্রথমত, কারোর মধ্যে এতটুকু কৃতিত্বের আভাস পেলেই, তাঁর বেশির ভাগ সতীর্থই হন প্রথম শত্রু। এর পর কর্তাদের অনীহা এবং অনেক কিছু। যাঁরা ভাটনগর পুরস্কার পেলেন, এ কথার সত্যতা নিশ্চয় তাঁরাও উপলব্ধি করেছেন। নিজেদের কাজের যাবতীয় সুযোগ কেউ তাঁদের করে দেয়নি। নিজেরাই যোগাড় করেছেন। অতএব তাঁদের সাফল্যের জন্যে আমরা বিশেষভাবে গর্বিত। স্নেহের দেবার ক্ষমতা নিশ্চয় তাঁরা রাখেন।

'যদিও বাস্তব এই', অনৈক ভাটনাগার পুরস্কার প্রাপকের বক্তব্য, 'পুরস্কার পাওয়ার আগেও যে সংগ্রাম, সেই একই সংগ্রাম পুরস্কার পাওয়ার পরও আমাদের চলতে থাকে। আশা করেছিলাম, আমার কাজের স্বীকৃতি যখন পেলাম, এবার বুঝি সরকার এই কাজটাকে যাতে ভালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে ব্যাপারে বাস্তবসম্মতভাবে সাহায্য করবেন। কিছু ছাত্র পাব। যাদের জীবিকাগত নিরাপত্তা থাকবে। তাদের নিয়ে কাজ করব। কিন্তু সে ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা কোথায়?

অভিযোগ আরও আছে। যেই দেখলেন একজন ভাল কাজ করলেন, তাঁর পুরস্কার পেলেন, অমনি তাঁকে নানান কাজে জড়িয়ে নেওয়া হল। প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য, অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক অধ্যাপক, আরও সাত কাজ। এতে করে ব্যক্তিগত গবেষণা চালানর মত সময় এবং মন দুই-ই আর থাকে না?

প্রশ্ন : কেন? জোর করে তো কারোকে আর অত সব কাজ করতে বলা হয় না? যিনি গবেষণা নিয়েই থাকতে চান, থাকুন না?

উত্তর : ঠিক তা নয়। এক, অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে অনেকে পাঁচ ঝামেলার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। দুই, ব্যক্তিগত, ধ্যানে

জীবিকার জন্যেও দরকার। কারণ, পেশাগতভাবে যতই আপনি কৃতিত্ব দেখান, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কখনই আপনি লাভবান হতে পারবেন না, যদি ও-সব আপনি না করেন। নইলে চাকরির ক্ষেত্রে একই জায়গায় আপনাকে পড়ে থাকতে হবে। যেখানে ছিলেন—রীডার,

সিনিয়ার সায়ান্টিস্ট, ইত্যাদি অথবা অধ্যাপক। অথচ ভাবুন ব্যক্তিগত কম যোগ্যতা নিয়ে শুধু দিল্লি-দিল্লি করেই কতজন কর্তা বনে যাচ্ছেন, একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন। অবশ্য, কেউ কেউ ভাবেন ওইভাবে চললে নিজের গবেষণাগারের জন্যে কিছু সরকারী

টাকা যোগাড় করা যাবে। কোন কোন সময় যোগাড় করা যায়ও, কিন্তু ততদিনে তাঁর বিজ্ঞানী মনটি নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন এই, কোন গবেষণাগারে একজন ডাইরেকটরের মূল্য বেশি, না একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীর মূল্য বেশি? যদি দেখা যায় একই গবেষণাগারে কেউ হয়ত

অসামান্য উদ্ভাবনার পরিচয় দিলেন। অথচ দেখলেন, তাতে করে জীবিকার দিক দিয়ে যে সুযোগ পেলেন, তা তাঁর চেয়ে অনেক কম, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ডাইরেক্টরের চেয়ে অনেক কম। তখন তিনি কী করবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, কিছুদিন হয়ত নিজের গবেষণার সঙ্গে সংগ্রাম করবেন। তারপর ও-সব ছেড়ে দিয়ে কী করে ডাইরেক্টর হওয়া যায় সে ব্যাপারে চেষ্টা করবেন।

যার অর্থ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীর মৃত্যু। কারণ যতই আমরা মুখে বলি না কেন, 'টাকাই কি সব?'—তবু টাকাই যে শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্বের আসন অধিকার করে নেয়, সে কথা না বললেও চলে। সত্যিকারের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে এ-দিকটা ভেবে দেখা দরকার।

আসল কথা এই, যাঁরা এবার ভাটনগর পুরস্কার পেলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ যাতে অপচয়ের মধ্যে গিয়ে না পড়ে, একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা যাতে কাজ করতে পারেন—তাঁরা নিজেরা নিজের নিজের বিষয়ের উপর একটি গবেষণার 'স্কুল' তৈরি করে উত্তরসূরীদের সাহায্য করতে পারেন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন নিশ্চয় সে সব ব্যাপার তাঁরা ভেবে দেখবেন।

যাঁরা পুরস্কার পেলেন

- **অধ্যাপক টি নরসিংহন (১৯৭০)।** কানপুরের ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। তাত্ত্বিক রসায়ন এবং ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স বা চৌম্বক-অনুনাদের উপর মৌলিক গবেষণা। পদার্থের আণবিক গঠন সম্পর্কে এই গবেষণা ভৌত-রসায়নে এক অনবদ্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

- **ডঃ পি কে আয়েঙ্গার (১৯৭১)।** নিউট্রন রশ্মি এবং ফাস্ট রিঅ্যাকটার ফিজিকস বা দ্রুত-জ্বলন পারমাণবিক চুল্লির উপর তাঁর গবেষণার দরুন তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ডঃ আয়েঙ্গার ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞান শাখার ডাইরেক্টর। উল্লেখ্য, তাঁরই নেতৃত্বে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা শতকরা একশ ভাগ ভারতীয় উদ্যোগে ভারতের প্রথম দ্রুত-জ্বলন পারমাণবিক চুল্লি পূর্ণিমা তৈরি করেছেন।

- **ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য (১৯৭১)** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক, ইনটারন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব প্রোডাকশন রিসার্চ, প্যারিস-এর নির্বাচিত সদস্য, ইনসটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, ভারত-এর ফেলো এবং গ্রন্থকার। ধাতু অপসারণ এবং জটিল কর্তন বিষয়ক প্রযুক্তির উপর তাঁর অসামান্য গবেষণা শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলেও বিশেষভাবে সমাদর পেয়েছে। তাঁর উদ্ভাবনা জাতীয় প্রযুক্তি জগতে এক বিশিষ্ট সংযোজন। ভাটনগর পুরস্কার তারই স্বীকৃতি।

- **ডঃ মনোজিৎ মোহন ধর (১৯৭১)।** জৈব রসায়ন। ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদের উপর তাঁর সুসম্বদ্ধ গবেষণার স্বীকৃতিতে তিনি পুরস্কার পেলেন। বর্তমানে ইনি লখনৌ-এর সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনসটিটিউটের প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগের প্রধান।

- **ডঃ জে আর তালওয়ার (১৯৭০)।** নতুন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনসটিটিউট অব মেডিকেল সায়ান্সেস-এর হৃদপিণ্ড এবং রক্তসংবহনতন্ত্রের শল্য চিকিৎসা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। পুরস্কারের বিষয় 'শীত-জনিত কোন শারীরিক দুর্ঘটনার উপর চিকিৎসা।

- **ডঃ ও ডি গুলাটি (১৯৭১)।** বরোদা মেডিকেল কলেজের ফারমোকোলজি বা ওষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। ডঃ এ কে মাইতির সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন।

- **[illegible] (১৯৭১)।** বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। কয়েকটি বিশেষ ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক [illegible] এবং যকৃৎ-এর উপর কী কী ভাবে প্রতিক্রিয়া করে, অধ্যাপক [illegible] বিষয়বস্তুতে ছিল সে সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য।

- **ডঃ অজিতকুমার মাইতি (১৯৭১)।** কলকাতার ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিন-এর শারীরবিজ্ঞান শাখার রীডার এবং জীবরসায়ন শাখার প্রধান। ডঃ গুলাটির সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি পুরস্কারটি পেয়েছেন।

- **ডঃ এন বালকৃষ্ণন নায়ার (১৯৭১)।** কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের জল-জীববিদ্যা এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। এই বিষয়ের উপরই তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন।

সমরজিৎ কর

শীতের রুক্ষতার
মধ্যে... আপনার
ত্বকে 'অকাল বসন্তের'
ছোঁয়া লাগুক
বাহার ফুটিয়ে তুলুন। দেখুন,
আপনার ত্বক কত সুন্দর, কত কোমল
হয়ে উঠেছে।
ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে নিভিয়া'র
জুড়ি নেই...তেলতেলে ভাবও কম।
আঠার মত লেগে থাকে না, বা
চকচক করে না। লাগাবার সাথে সাথেই
আপনার ত্বকের সাথে মিশে যায়
উপরন্তু আপনার ত্বকের পুষ্টি যোগায়,
আর্দ্রতা বাড়ায় আর, ত্বক রক্ষাও
করে চমৎকার। এবার, এই শীতে
নিভিয়া ব্যবহার করে আপনার সৌন্দর্য
অম্লান রাখুন।
পরের শীতে এবং ভবিষ্যতেও
নিভিয়া ক্রীমের প্রতি আপনার অনুরাগ
বেড়েই যাবে।
নিভিয়া—সুস্থ, সুন্দর
ত্বকের রহস্য!

চিত্র প্রদর্শনী

যাঁরা গত কয়েক বছর যাবৎ শিল্পী দীপক ব্যানার্জীর গ্রাফিক শিল্পকর্ম দেখে আসছেন তাঁরা ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস গ্যালারীতে সম্প্রতি আয়োজিত প্রদর্শনীতে তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রাফিকপ্রিন্ট নিদর্শন দেখে যে আনন্দিত হয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রাফিক-শিল্প বিভাগে আপন প্রতিভাবলে এই শিল্পী সুনাম অর্জন করেছেন ও ইতিপূর্বে দেশে ও বিদেশে বহুস্থানে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানও করেছেন। প্রদর্শনীতে ২০টি প্রিন্ট নিদর্শন দেখা যায়। সমকালীন গ্রাফিকশিল্প প্রধানত পরীক্ষামূলক, এবং অধিকাংশ শিল্পীই নতুনতর প্রিন্ট পদ্ধতি ও বিভিন্ন রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নানা ইমেজারি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। দীপক ব্যানার্জীও তাই করেছেন, তবে তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর কাজে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দূরদৃষ্টিরও পরিচয় মেলে। এছাড়া তিনি আকারের ওপর প্রাধান্য-দান করেছেন, যেটি অধিকাংশ শিল্পীই করেন না। দ্বিতীয়ত তাঁর সাম্প্রতিক নিদর্শনগুলিতে বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে, অর্থাৎ তিনি এনগ্রেভিং থেকে শুরু করে ইনটাগ্লিও বা গভীর খোদাই, কোলাজ পদ্ধতি, ফয়েল ও প্লাস্টারের ওপর রিলিফ প্রিন্টও করেছেন। তার ওপর একই প্লেট থেকে বিভিন্ন রঙের প্রিন্ট করে তিনি রঙ তথা আকারবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। সরাসরি প্লেটের ওপর বিউরিন (সূক্ষ্ম খোদাই করার যন্ত্র বিশেষ) খোদাই করে নানা রেখাচাতুর্যের মধ্য দিয়ে প্রায় প্রত্যেক প্রিন্টেই বিপুল গতিশীলতার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন (৪ নং)। গভীর খোদাই নিদর্শনগুলিতে রঙ ও আকারের সুন্দর সমন্বয় চোখে পড়ে। অবশ্য সম্পূর্ণ আকারপ্রধান না হওয়ার জন্য এগুলিতে স্বাভাবিক পরীক্ষাপ্রীতি ধরা পড়ে। এগুলির অধিকাংশই অলঙ্কারধর্মী, অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই, গভীর খোদাই ও বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করার ফলে অলংকারিক ইমেজারি জাতীয় রূপ ফুটে উঠেছে (সাপ্স ২)। ফয়েলের ওপর রিলিফ প্রিন্টের নিদর্শনগুলি মুখ্যত অপটিক আর্ট জাতীয়, অর্থাৎ পাশাপাশি একের ওপর অন্য কয়েকটি বৃত্ত ও সেই সঙ্গে ওপরের দিকে দীর্ঘাকার আকার সৃষ্টি করে এগুলিতে শিল্পী অপটিক আর্টের বৈশিষ্ট্য ফোটাবার চেষ্টা করেছেন, যেমন প্রিন্ট একস্-৭৩৫। এগুলির আয়তনিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয় বিশেষ করে ফয়েল ৪-এ। বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কোলাজ প্রিন্ট নিদর্শনগুলি। সম্ভবত কাঁচা প্লাস্টার প্লেটের ওপর বৃত্ত ও চতুর্ভুজ অবলম্বনে রচিত প্লেটগুলিই তিনি অতি সন্তর্পণে প্রিন্ট করেছেন। যেমন কোলাজ-২ (৭২)। বিশেষ করে কোলাজ-৪ (৭২) অনেকের চোখে পড়ে যায়। আলংকারিক বৃত্ত ও সাদা রিলিফ অংশ প্রধান কমপোজিশনটির মধ্য দিয়ে শিল্পীর দূরদৃষ্টির পরিচয় মেলে। প্লাস্টার রিলিফ প্রিন্টগুলির আয়তনিক বৈশিষ্ট্য তথা অভিনব সৌন্দর্য দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। বৃত্ত অবলম্বনে রচিত অধিকাংশ নিদর্শনেই আকারপ্রধান সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্রষ্টব্য।

*

পশ্চিমবঙ্গের অসহায় মহিলারা নানা হস্তশিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করে যাতে আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রকল্প চালু আছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় মহিলাদের শিক্ষা দেবার জন্য ছয় মাসের একটি কোর্সও আছে। চিত্রাংশু শিল্পসংস্থায় যে সব শিক্ষার্থী মহিলা ছয় মাস যাবৎ শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের তৈরী নানাবিধ শিল্প-সামগ্রী ডিজাইন সেন্টারে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনীতে সম্প্রতি দেখা যায়। প্রদর্শনীতে যেসব নিদর্শন দেখা যায় তাদের মধ্যে বাটিকের শাড়ি, ছবি, লুঙ্গি, স্কার্ফ, সাদা পাটের সুদৃশ্য হাতের ও ঝোলা ব্যাগ, ছোট তাঁতে-বোনা থলি ও টেবলম্যাট, পুঁতির মালা অ্যাপ্লিকের কাজ উল্লেখ্য। প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ ছিল কলমকারি শিল্প-নিদর্শন। কলমকারি চিত্র দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শন। অন্ধ্র-প্রদেশের পরিচিত শিল্পী ভেঙ্কটেশ্বরালুর নির্দেশনায় বাঙালী মহিলাদের এই বিশিষ্ট দেশীয় শিল্পরীতির শিক্ষালাভের সুযোগ-দান করে চিত্রাংশু সংস্থা সকলের ধন্যবাদ ভাজন হলেন। এই দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা রচনার পদ্ধতিও অভিনব। ছবি

ইউ ব্রিং আউট দি বেস্ট ইন মি —কুমার্নি শচদেব

কাপড়ের ওপর সরাসরি আঁকতে হয় ও প্রথমেই কাপড়টি দুধে ভিজিয়ে নিতে হয়। পরে বিশেষ প্রথায় তৈরী দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরী লাল, কালো, গেরুয়া ও নীল রঙ সরাসরিভাবে কাপড়ের ওপরে দিয়ে ছবি আঁকতে হয়। আঁকার জন্য তুলি ব্যবহৃত হয় না। একটি ছোট তকলি জাতীয় ছুঁচলো যন্ত্রে সরু পাটের সুতোর গুচ্ছ জড়িয়ে রাখতে হয় ও যে রঙে ছবি আঁকতে হবে সেই রঙেই সেই গুচ্ছটি ভালভাবে ভিজিয়ে নিতে হয়। পরে কাপড়ের ওপরে সরাসরি ছুঁচলো যন্ত্রটি দ্বারা ছবি এঁকে যেতে হয়—সুতোর গুচ্ছটি হাতে ধরে আঁকতে হয়। বলা বাহুল্য, হাতের প্রয়োজনমত চাপে ছুঁচলো অংশের মধ্য দিয়ে রঙ বেরিয়ে এসে রেখা সৃষ্টি করে। বলাই বাহুল্য যে অঙ্কনবিদ্যায় সুপটু না হলে কলমকারি চিত্র আঁকা যায় না। প্রদর্শনীতে ছোট বড় দেবদেবীর অনেক সুন্দর ছবি দেখা যায়। বলা বাহুল্য, কলমকারি শিল্পকলা শিক্ষালাভ করে এ রাজ্যের মহিলাগণ যে একাধারে এই চিত্রকলারীতি প্রসার করবেন ও বিক্রয় করে অর্থও উপার্জন করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, কলমকারি চিত্র গৃহশোভার চমৎকার উপকরণ, বিশেষ করে মার্জিত রুচির দিক থেকে।

*

নেসলস সংস্থা কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, তামিলনাড়ু ও পাঞ্জাবে নিযুক্ত তাঁদের কর্মচারীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি মুক্তাঙ্গন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন শহরের কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের আঁকা নানা ছবির মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটি ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে। ইতিপূর্বে অন্য দু-একটি সংস্থাও এই জাতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, নেসলস সংস্থা সংশ্লিষ্ট ছেলেমেয়েরাও যে এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হয়েছে তা প্রদর্শনীর বিরাট আকার দেখে বোঝা গেল। প্রদর্শনীতে দুই থেকে ১৬ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের নানা বিচিত্র শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এই যে, এখানে মাত্র দুই বছরের শিশুদেরও আঁকা ছবির নিদর্শন চোখে পড়ে। অসিমা ঘোষের পেনসিলে আঁকা মুখমণ্ডল দেখে অনেকেই বিস্মিত হন। এই বিভাগে সকলেই রেখামাধ্যমে নানা আজগুবি বস্তু এঁকেছে। যাদের প্রচেষ্টা চোখে পড়ে তাদের মধ্যে চার বছরের মণিকা গম্ভেড-এর (পাঞ্জাব) অ্যাকশন পেন্টিং জাতীয় নিদর্শন ও নিউদিল্লীর আট বছর বয়স্ক স্মিথ ফেরিরার ক্রাউন উইথ নেসকাফে উল্লেখ্য। আট থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের কাজে অঙ্কন ও বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। মাস্টার মার্ক লেবোর ক্রাউন অনেকের ভাল লাগে। বিশেষ করে পাঞ্জাবের বারবারা রিয়ান (বং ১১) এ ট্রপিক্যাল বিচ-এর জন্য প্রশংসা দাবি করে। ১২ থেকে ১৬ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে দিল্লীর কুমার্নি শচদেব (বং ১৫)-এর দুটি ছোট্ট ছেলেমেয়ে অবলম্বনে আঁকা "ইউ ব্রিং আউট দি বেস্ট ইন মি" সকলেরই চোখে পড়ে। অপরাপর ছবির মধ্যে কলকাতার কুমারী পাপু গুপ্তের ছবিটিও ছিল উল্লেখ্য।

চিত্রপ্রিয়

॥ ১৫ ॥

দর্জিপাড়ার মামারবাড়িতে জন্মে ঈষৎ কলকাতেঘটিত হলেও আসলে পুরো ঘটি আমি নই বোধ হয়। বাড়বাড়ন্তটা পৈতৃক বাস মালদহেই হয়েছিল তো।

র‍্যাডক্লিফ সাহেবের সার্জারিতে মালদার আধখানা পুবে পাকিস্তানের আঁচলে গেলেও আমাদের চাঁচল হয়ত সে-গাটছড়ায় বাঁধা পড়েনি। তা না হলেও বেশ খানিকটা তার বিপাকে পড়েছে নিশ্চয়ই।

তা হলেও আধেক বাংলা মুলুকের অন্তরীণ হয়ে তার ঋণ অস্বীকার করা যায় না। আধ-ঘটি তো বটেই, সেই সঙ্গে নিজেকে হাফ বাঙাল বলেই আমি বোধ করি।

আর, বাঙাল হাইকোর্ট দেখবেই। কেউ না কেউ তাকে দেখাবেই। ঠেকানো যাবে না। কেউ না দেখালেও সে-ই নিজেকে দেখাতে কসুর করবে না।

রক্তগত রোগ এড়ানো শক্ত ব্যাপার। সেই অন্তর্নিহিত হেতুই হয়ত আমায় ওই হাইকোর্টে নিয়ে হাজির করেছিল।

তার সূত্রপাতের গোড়ার থেকেই শুরু করা যাক তাহলে।

প্রদীপ জ্বালার আগে যেমন থাকে তেল আর পলতের প্রয়োজন, তেমনি সেই পলতের আগে লাগে সলতে পাকানো। সেই সলতের কথাতেই আসা যাক গোড়াতে।

চাঁচলের রাজবংশের ছেলেরা প্রায় শিবরাত্রির সলতের মতই শুনি। পাকানো হয়, জ্বালানোও হয়, কিন্তু জ্বলে না বেশিক্ষণ।

শোনা যায়, গোড়ায় ওটা ছিল নাকি কোন নবাবের জমিদারি—সেই মোগলদের আমলে। নবাবের দেওয়ান, এই রাজবংশের পূর্বপুরুষ, শেষ নবাবের তিরোধানে তাঁর বিধবা বেগমকে ঠকিয়ে কৌশল করে তাঁর তালুক মুলুক সব হাত করেছিলেন—সেই বাদশাহী রাজত্বের পড়ন্ত-দশায়।

এই নেমখারামির জন্যে বেগম সেই দেওয়ানকে অভিশাপ দিয়ে গেছেন তাঁর বংশলোপ হবে।

হয়েছিলও।

দেওয়ানের উত্তরপুরুষ, উত্তরোত্তর পুরুষদের ঠিকুজি কুলুজি আমার কাছে নেই বটে, তবে জানি যে প্রত্যেক পুরুষেই তাঁরা নিঃসন্তান, তাঁদের পোষ্যপুত্র নিতে হয়েছে।

শেষ পুরুষ চাঁচলের রাজা স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর ছেলেটিও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে বেশ বেড়ে উঠে আত্মহত্যায় নিজেকে নিঃশেষ করে। তার পরে রাজা বাহাদুরও যথাসময়ে গত হন, তিনি আর কোনো পোষ্যপুত্র নেননি। এককালের সেই বেগমের হৃদয়ক্ষত এইভাবে একালে এসে খতম।

জমিদারিও প্রথালোপের সাথে, সরকারী হাতে চলে গেছে।

শেষ জমিদার রাজা শরৎচন্দ্রের পালক পিতা ঈশ্বরচন্দ্র অপুত্রক মারা যান। তাঁর দুই রানী সিদ্ধেশ্বরী আর ভুতেশ্বরীকে তিনি পরম্পরায় দত্তক গ্রহণের অধিকার দিয়ে গেছলেন।

রানী সিদ্ধেশ্বরীকে আমি দেখিনি, তবে তাঁর সতীন ভুতেশ্বরীর সঙ্গে দৈবাৎ একবার মোলাকাত হয়েছিল—আমার আর রিনির একসঙ্গে—আমাদের চাঁচলের বাড়ির পেছন দিকে উত্তরের পোড়ো বাড়িঘরের ভেতরে—আবছায়ার এক পড়ন্ত বেলায়।

রানী সিদ্ধেশ্বরীর সেই সপত্নী, নাকি সপত্নী-সন্দর্শনের পর সেই রাত্তিরেই নাকি আমার ভূতপূর্ব হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যার হেতু কালীঘাটের মানতে আমার মার হাত বাঁধা পড়ে।

সেই ভুতেশ্বরী তাঁর গলার হীরেমোতির হার দিতে চেয়েছিলেন আমাকে—সেই কাহিনী যথাসময়ে কথিত।

চাঁচলে যাওয়ার আগে আমরা থাকতাম চৌয়ায়। চৌয়া মুর্শিদাবাদের কোনো গ্রাম, কানেই শোনা, চোখে দেখা হয়নি আমার। বাবারা আদিতে সেখানেই থাকতেন।

আমরা সেই চৌয়ার থেকেই চৌয়ানো।

বাবার মা আমার ঠাকুমা আর রানী ঠাকুমা ছিলেন কোলেপিঠের সহোদর বোন।

আমার ঠাকুমার নাম রাজেশ্বরী কি বিশ্বেশ্বরী কিছু একটা হবে হয়ত, মনে পড়ছে না এখন।

এখন রানী সিদ্ধেশ্বরী, মায় পেটের বোনের ছেলে থাকতে কাকে আর পোষ্যপুত্র নেবেন? তাই বাবার ডাক পড়েছিল চাঁচলে; আমার ঠাকুমা বাবাকে নিয়ে রাজবাড়িতে উঠলেন গিয়ে।

বাবার কিন্তু কারো পোষ্যপুত্র হবার কি জমিদারি করার সাধ ছিল না। তৎকালসুলভ তীব্র বিষয়বৈরাগ্য ছিল তাঁর মনে।

তিনিই একটি সুদর্শন সুলক্ষণ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে (এই রাজা শরৎচন্দ্রকে) বেছে নিয়ে আসেন রানীমাসিমার দত্তক নেওয়ার জন্য। এবং তিনিই উৎসাহী হয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন।

তার পরে অনেক পরেই, নিজের মা এবং রানী-মাসিমা মারা গেলে পর হাত পা-

ঝাড়া সন্ন্যাসী হয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন এক সময়।

পরে হিমালয়ের কোন এক মহাযোগীর সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর আদেশে লোকালয়ে ফিরে এসে বে-থা করে সন্ন্যাসীর মন নিয়ে সংসারীর জীবনযাপনে উদ্যোগী হন শেষটায়। ......চাঁচলের গ্রামে ফিরে সংসার পেতে তাঁর নব্য গ্রামোদ্যোগের ফলাফল এই আমরা।

চাঁচলের জমিদারির সবচেয়ে বড় পরগনার নাম হাতীন্দা। মূলত কথাটা হচ্ছে হাতীকান্দা। পরগনার এ-মোড় থেকে ও-মোড় অব্দি একটা হাতীর পায়দল যেতে দিনভর লাগত এবং হাতীটা নাকি কে'দে ফেলত শেষটায়।

হাতীর কান্নাকাটি কল্পনা করা যায় না, যেমন হাতীর ডাক ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যাই হোক, সেই থেকেই নাকি এই হাতীন্দা--শুনেছিলাম।

বরাবর থেকে রাজভোগে মানুষ সহোদর বোনের ছেলেটি তাঁর অবর্তমানে অবশেষে দশচক্রে না ফে'সে যায় এই ভেবে তাঁর রানীমাসিমা নিজের অন্তিমকালে বাবার একটা ব্যবস্থা করে যেতে চেয়েছিলেন। ওই হাতীন্দা পরগনাটা তিনি দিয়ে যান বাবাকে।

এমনি মুখের কথাতেই যদিও, কেননা সেই মুহূর্তে লেখাপড়ার অবকাশ ছিল না, কিন্তু সেই কথাটা যাদের সাক্ষাতে হয়েছিল, আমার বাবা, মা, রাজা, তাঁর তৎকালীন ম্যানেজার পরাণবাবু, এবং শ্যালক সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যে--এ'রা সব সাক্ষী ছিলেন সে-কথার।

রানী সিদ্ধেশ্বরী বাবাকে শুধু ওই পরগনাই নয়, বাবাকে কলকাতায় একটা বাড়ি কিনে দিতেও বলে গেছলেন রাজাকে। রাজী হয়েছিলেন রাজা।

তা ছাড়াও, রানী আমার মাকে নগদ কিছু গহনাপত্তর, তাগা বাজু বালা বউটি বিছে হাঁসুলি মুকুট ইত্যাদি--সবই সেকেলে
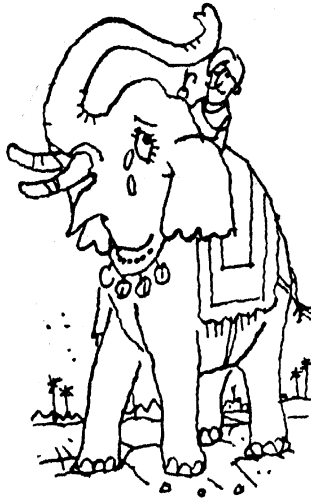
হাতীটা নাকি কে'দে ফেলত শেষটায়

টাইপের সেই সাথে আকবর আর শাহ আলমের আমলের সোনার মোহরও দিয়ে গেছলেন মাকে।

মার স্ত্রীধন বউমাদের জন্য সংরক্ষিত সেই সব সোনাদানা মোহরটোহরের ধ্বংসাবশেষ তাঁর দেহান্তে এখন ব্যাংকের লকারে বেকার।

পঁচিশ ত্রিশ হাজারে বেশ ভালো একখানা বাড়ি হতো তখন কলকাতায়। শহরের মেয়ে মার ইচ্ছা ছিল কলকাতায় বাড়ির। বাবা একেবারে নিস্পৃহ, তাঁর কোনো ইচ্ছাই ছিল না এসব বিষয়ে।

রানীমার স্বর্গপ্রয়াণের পরে বাবাকে রাজা চাঁচলের পুরাতন রাজবাড়িটা থাকার জন্য ছেড়ে দেন, নিজেরা মহানন্দার ওপারে নতুন রাজপ্রাসাদ বানিয়ে সেখানে চলে যান। আর হাতীন্দা পরগনা সম্পর্কে বলেন, দাদা, আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, আপনি কি পারবেন জমিদারির ওই ঝক্কি পোহাতে, খাজনা আদায়পত্র, হিসেব রাখার হাঙ্গাম! ওই ঝামেলায় না গিয়ে আপনি বরং মাস মাস একটা মাসোহারা নিন।

বাবা তক্ষুনি রাজী। সর্বপ্রকার ধকল-বিরোধী সহজ উপায়ের তিনি পক্ষপাতী--আমারই তো বাবা!

এমনি চলে আসছিল বরাবর। মাস মাস মাসোহারা পাচ্ছিলেন, অক্লেশে কাটছিল।

বাদ সাধলো মাঝখানে অসহযোগ। আমি বাড়ি ছেড়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে চলে এলাম কলকাতায়। রাজা-কাকা তার খবর পেয়েছিলেন কি না জানি না। আইন অমান্য করতে গিয়ে খিদিরপুর ডকের জেলে মাসখানেক কাটানো, সে খবরও কিছু কাগজে ওঠেনি, তিনি টের পাননি। কারণ তখন আমি সংখ্যার মধ্যে ছিলাম, সংখ্যাতীতের সঙ্গে। শঙ্কার কোনো কারণ ঘটেনি তাই। কাল হলো নবপর্যায় যুগান্তরের জন্য জেল খাটায়। তার দরুণ নামজাদা হয়ে।

রাজদ্রোহের দায়ে আমি জেলে গেছি, সব কাগজেই বেরিয়েছিল খবরটা, এমন কি স্টেটসম্যানেও। স্টেটসম্যান তিনি নিতেন নিয়মিত। সঙ্গে সঙ্গে চাঁচলে তাঁর হুকুম চলে গেল, অভিযুক্ত এই শিবরাম চক্রবর্তী যদি শিবপ্রসাদ দাদার ছেলে সেই শিবরাম হয় তো অবিলম্বে দাদার মাসোহারা বন্ধ করে দিন। নিজের ছেলেকে তিনি শাসনে রাখতে পারেন না--এ কী রকম!

মাসোহারা বন্ধ হয়ে যথেষ্টই কষ্ট হয়েছিল বাবার বলতে কি! অন্য কোনো আয় বা উপায় তো তাঁর ছিল না। কেবল কলকাতার বাড়ি কেনার জন্য যে হাজার পনের টাকা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তারই কোম্পানির কাগজ আর পোর্ট কমিশনের ডিবেঞ্চার কিনে রেখেছিলেন তার সুদ পেতেন বছরে দুবার করে প্রায় পাঁচ-ছ শো টাকার মতো--তাইতেই চালাতেন কোনো রকমে, যদিও খুব কষ্টেসৃষ্টে নয় বলাই বাহুল্য। কারণ সেকালে মাসিক একশ' টাকাই অঢেল।

তার ওপর বিশেষ কোনো নৈমিত্তিক প্রয়োজনে রূপোর বাসনকোসন বেচতে হত, বড় বড় রূপোর বোগনো ডেকচি, থালা বাটি গেলাস--এই করে সব বিক্রী হয়ে গেল।

বাবার কোনো ক্ষোভ ছিল না তাতে। যুগান্তরকারী জেল খেটে বেরিয়ে আমি আত্মশক্তির সম্পাদকী কাজটা পেয়েছিলাম, ন' মাসে ছ' মাসে দিন কয়েকের জন্য বাড়ি যেতাম, বাবার জন্য আঙুর বেদানা খেজুর কমলা বাদাম পেস্তা নিয়ে আর মা-র জন্য আমসত্ত্ব আমসন্দেশ ইত্যাদি।

বাবা আমার হঠকারিতার জন্য কোনো দিন একটু মৃদু ভর্ৎসনাও করেননি আমায়,

কলকাতার ক্যাবারে

আপনাদের 'বিনোদন' সংখ্যা ১৩৮০তে 'কলকাতার ক্যাবারে' সম্বন্ধে শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার বিষয়ে যা লিখেছেন তা পড়ে আমি বিস্মিত ও মর্মাহত।

সুধীবাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে, তিনি আমার সঙ্গে এক মৌখিক ভদ্রলোকের চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, আমার বিষয়ে তিনি যা লিখবেন তা ছাপাবার আগে তিনি আমাকে পড়ে শোনাবেন, আমার অনুমোদন নেবেন ও আমার স্বাক্ষরের পর সেটি ছাপাতে দেবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোকের এই মৌখিক চুক্তি তিনি ভঙ্গ করেছেন অর্থাৎ আমাকে পড়েও শোনাননি, আমার অনুমোদনও নেননি, সইও নেননি।

আমি আপনার পাঠকদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, তিনি আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে যা যা আমার উক্তি বলে লিখেছেন তা সমস্তই তাঁর কল্পনাপ্রসূত, আমার আর্থিক অবস্থার ভুল খবর দেওয়া হয়েছে। অলীক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। আমার পিতামাতা ও আমার জীবন সম্বন্ধে অসম্মানজনক, ভ্রান্ত উক্তি করা হয়েছে। তাঁর এই ধরনের লেখা আমার শিল্পবৃত্তিতে ও সুনামে আঘাত করেছে। আমি ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত বোধ করছি। ক্যাবারে শিল্পীদের ও তাঁদের সংসার সম্বন্ধেও তাঁর মন্তব্য তথ্যনিষ্ঠ তো নয়ই, বরং অত্যন্ত অসৌজন্যপূর্ণ ও অপমানকর।

আরতি দাস (শেফালি)
কলকাতা

ভারতের নারী

শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতের নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে (দেশ ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৩) ভারতের নারীদের সামাজিক মর্যাদার বিবর্তনের ইতিহাস ও তাঁদের সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে আমি বহুলাংশে একমত। তা সত্ত্বেও, তাঁর কিছু কিছু বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

(১) উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় 'ভারতের নারী' সম্পর্কে যে ভুল ধারণা প্রচলিত, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাকেই ভারতের নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে ধরেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে অনেকে হিন্দু, অনেকে কেবল হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম সংস্কৃতিকে বোঝেন বলেই এই ভুল হয়। "উইমেন ইন ইণ্ডিয়া" ধারণাটি ভারতের সব নারীদের সম্পর্কে কি প্রযোজ্য? যারা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছেন তাঁরা সমস্যাটি ভিন্ন চোখে দেখবেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলে মেঘালয়, মণিপুরে, নাগাভূমিতে সমাজে মেয়েদেরই প্রাধান্য। খাসিদের মধ্যে তো ছোট জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে এসে থাকতে হয়। দক্ষিণ ভারতেও সমাজের নীচের দিকে বাইরের কাজে মেয়েদের দেখা যায়। ১৯৩৭ সালে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন পাস হওয়ার আগে মালাবারের মুসলমান সমাজে সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে মেয়েদেরই প্রাধান্য ছিল। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও পাঞ্জাবেও মেয়েদের অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে। সারা ভারতের আদিবাসী সমাজেও মেয়েদের স্থান উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের মতো নয়। ধর্মগ্রন্থগুলিতে মেয়েদের স্থান খুব নীচুতে থাকলেও বিভিন্ন সংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়, সে-বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। 'ভারতীয় নারী' সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা স্বীকার করে নিলে ভারতের মেয়েদের সমস্যাগুলিকে ঠিকমতো বোঝা যাবে না।

(২) শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সমাজে মেয়েদের হীন অবস্থার জন্য সংগতভাবেই ধর্মগ্রন্থগুলির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই শতাব্দীর প্রথমেই মহীয়সী বাঙালী মহিলা বেগম রোকেয়া লিখেছিলেন, 'যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।' তিনি আরও লেখেন, 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।' তাঁর পরবর্তী মন্তব্য আরও সাংঘাতিক : "পুরাকালে যে-ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনি আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।" (আবদুল হকের 'সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি। পৃঃ ৬৯) ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের আগেই কিছু কিছু ভারতীয় মহিলা এইভাবে ভেবেছিলেন। এদেশে একটা প্রচলিত ভুল ধারণা হচ্ছে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি হবে। হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে কিছুটা ঘটেছে। কিন্তু তার কারণ অন্য। শিক্ষাদীক্ষার জন্য পার্সী, ইহুদী কাথলিক ও খৃষ্টান মেয়েরা সম্প্রদায়ের মেয়েরা অনেক এগিয়ে। কাজকর্মের ক্ষেত্রে পার্সী মেয়েদের সমাজে প্রায় সমানাধিকার। কিন্তু শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সমাজে মেয়েদের আইনগত অধিকার বাড়ে নি। কোন পার্সী মেয়ে অ-পার্সী ছেলেকে বিয়ে করলে সমাজ থেকে বিতাড়িত, সম্পত্তির অধিকারও হারায় না। মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে মেয়েদের অধিকার হারানোর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ১৯৩৭ সালের মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান মেয়েরা অনেক অধিকার হারায়।

(৩) হিন্দু মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সংগত কারণেই গান্ধীজীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব আগেই অন্যত্র এ-ব্যাপারে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বিলেতী কাপড়ের দোকানে, মদের দোকানের সামনে পিকেটিং ছাড়া মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতির জন্য গান্ধীজী আরও অনেক কাজ করেছেন। গান্ধীজীর আন্দোলনের জন্য ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিতে এত বেশী মহিলাদের দেখা যায়। চীনাদের মধ্যে কোথাও কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। ফিলিপিনের মতো আর কোথাও মেয়েরা সরকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে-আসীন নয়। তবুও ওইসব সমাজে রাজনীতিতে মেয়েদের ভূমিকা খুবই কম। তবে, গান্ধীজীর কাজ প্রধানত হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, মুসলমান সমাজের বিরোধিতার কথা ভেবে সামগ্রিকভাবে মুসলমান মেয়েদের অবস্থার উন্নতির কাজে তিনি ব্রতী হননি। জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারাও ধর্মীয় গ্রন্থে মেয়েদের

স্থান এবং মোল্লা-মৌলবী এবং সুবিধাবাদী মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের বিরোধিতার কথা ভেবে মুসলমান সমাজের সংস্কারের কোনও প্রচেষ্টাতেই হাত লাগাননি। ফলে তাঁরা মুসলমান সমাজের সেকুলার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদেরও নিজেদের পাশে পাননি। গান্ধীজীর অনেক আগে মহাত্মা ফুলে মহারাষ্ট্রে এবং পরবর্তীকালে বরোদা, মহীশুর, গোয়ালিয়র, ত্রিবাঙ্কুর, গন্ডাল প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যে হিন্দুদের জন্য বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন, বাল্য-বিবাহ ও পণপ্রথা নিবারণের আইন চালু হয়েছিল। বরোদায় হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন তিরিশ দশকেই চালু হয় (প্রফুল্লকুমার সরকার : ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, পৃঃ ১০৫)। হিন্দু মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে গোঁড়া হিন্দুদের বিরোধিতার সামনে হিন্দু ধর্মের কাছ থেকেই সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। হিন্দু ধর্মগ্রন্থই মেয়েদের 'শক্তি-রূপিণী', দেবতাদের পাশে দেবীর অবস্থান হিন্দু মেয়েদের একই সঙ্গে দাসী ও দেবীর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। খৃষ্টান দেশগুলিতে মেয়েদের 'লিবারেশান' আন্দোলনের জন্য যে দর্শন খাড়া করার দরকার হয়, এদেশে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে তা দরকার হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক ছিল ধর্মগ্রন্থ নয়, জনরুচি। অন্য ধর্মগ্রন্থে এই জাতীয় বক্তব্যের অভাবে ভারতে মুসলমান, পার্সী, ইহুদী ও ক্যাথলিক খৃষ্টানদের মধ্যে পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে আইনগত পার্থক্য দূর করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন যে, "নারীকে একটি যৌনতন্ত্র মনে করবার এই

বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীই তার আজীবন পরাধীন তত্ত্বের অন্যতম উৎস।" গ্রামাঞ্চলে ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর সমাজে এই যৌন-বিকারগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গীই মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

নিরঞ্জন হালদার
কলকাতা—৪২

পাখি পাখি

গত ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ 'দেশে' শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় লিখিত 'পাখি দেখার নেশায়' রচনাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সুন্দর। এই জাতীয় রচনা 'দেশে'র মতো জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত পত্রিকায় অনেক আগেই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কারণ, বার্ড ওয়াচিং শুধুমাত্র একালের জনপ্রিয় হবি নয়, বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এবং মানসিকভাবে তৃপ্তিদায়ক স্বীকৃত ফ্যাশনেবল্ হবি। লেখক, মানুষের অত্যাচার ও অবহেলায় ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর বুক থেকে বহু প্রজাতির পাখির বিলুপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। হরিয়ল বা গ্রীনপিজিয়ন দর্শনের সৌভাগ্য কজনের হয়েছে জানি না, তবে উত্তর বঙ্গ ও আসামের পাহাড়ে জঙ্গলে বহু ঘুরেও কয়েকবার মাত্র একটি-দুটি হরিয়াল দেখতে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।—প্রখ্যাত প্রকৃতি-বিজ্ঞানী শ্রী এম, কৃষ্ণণ অল্প কিছুকাল পূর্বে আশংকা প্রকাশ করেছেন, মনোযোগ সহকারে হরিয়াল বা গ্রীন-পিজিয়নের বংশ রক্ষা করার ব্যবস্থা না করা গেলে হয়তো অচিরেই এদের বিলুপ্তি ঘটবে। এই অবস্থায় গত বছর আমি ও আমার পক্ষী বিষয়ে জ্ঞানী এক বন্ধু কলকাতা থেকে মাত্র একশ মাইল দূরে পলাশীর প্রান্তরে বিস্ময়কর এক হরিয়াল-সাম্রাজ্য আবিষ্কার করে ফেললাম। ভগ্ন রেলিং দ্বারা বেষ্টিত যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতি-স্তম্ভের শীতল বেদিতে বসলে নিকটে একটি বিশাল বটগাছ দৃশ্যপটে জেগে থাকে। এই বনস্পতির শাখায় শাখায় অসংখ্য ছোট ছোট লাল ফল।—সেই শীতের ভোরে সোনালী রোদে গা-ভাসিয়ে পরম আনন্দে তার এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে যাচ্ছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে, ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করছে অসংখ্য হরিয়াল। এরই মাঝে একদিক থেকে শতাধিক সংখ্যক হরিয়ালের একটি ঝাঁককে উড়ে সেখানে বসতেও দেখা গেল। এই দৃশ্য এমনই বিরল সৌন্দর্য-অভিজ্ঞতা যে চোখের সামনে পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয়-পক্ষী বিশেষজ্ঞ শ্রীসালেম আলি বলেছেন, পিপুল গাছের ফল হরিয়ালের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। আমার ধারণা পিপুল এক-জাতীয় বট এবং সম্ভবত এটি সেই পিপুলে গাছ। কিন্তু এর মাস ছয়েক বাদে পলাশী গিয়ে দেখলাম উক্ত গাছটি হরিয়াল-শূন্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সম্প্রতি কিছু বন্দুকধারী লোকের প্রবল আক্রমণে তারা অংশত লুপ্ত ও অংশত পলাতক। উল্লেখ করা প্রয়োজন কচি কলাপাতা-রঙ অসম্ভব লাবণ্যময় পায়রা-সদৃশ এই পাখির মাংস অতি সুস্বাদু।

লেখক অপর এক জায়গায় বলেছেন, 'একবার মিডওয়ে দ্বীপ থেকে কয়েকটি অ্যালবাট্রস ধরে তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকায়, জাপানে হওয়াই ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে। শুধু তাই নয়, তাদের একটিকে পাঠিয়ে দেয়া হয় সুদূর ফিলিপাইনসে। তারপর একই দিনে ছেড়ে দেওয়া হল সেই পাখিগুলিকে। মাস-খানেক বাদে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তারা সকলেই ফিরে এসেছে স্বস্থানে।'

শুধু পাখি কেন, এমনকি কোনো কোনো পাখির ডিমও যদি অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে ফুটিয়ে সেই পক্ষী-শাবককে বড় করে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলেও সে একদিন মূল ভূখণ্ডে ফিরে যাবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই বিস্ময়কর ঘটনাপ্রবাহের উত্তর দিয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রকৃতি-রাজ্যের এই জাতীয় ঘটনাকে ইন্‌স্টিংকট নামক বিদঘুটে শব্দের দ্বারা ভূষিত করা হতো। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে ইন্‌স্টিংকট বলে কোনো কথা নেই। কারণ ইন্‌স্টিংকট হচ্ছে সেই জিনিস যার কোনো নিশ্চিত কার্যকারণ-সূত্র নেই। যদি কোনো কিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে না পাওয়া যায়, বিজ্ঞানীদের মতে, তার মানে এই নয় যে সেক্ষেত্রে যুক্তি নির্ভর কার্যকারণ নেই, তার অর্থ, এখনো তা আবিষ্কৃত হয়নি। পাখি এক দেশ থেকে আর এক দেশে উড়ে যায় দিক চিনে নয়, আপন জৈবিক কারণে, বাধ্য হয়ে, অজ্ঞান্তে। ঠিক যে থিওরীতে পোকা আলোর দিকে ছুটে যায়। আলোর দিকে যে ছুটে যায় তার কারণ এই নয় যে সে আলোর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। আলোর আলোকমালা দেখতে পাওয়া না পাওয়াটা মূল কারণ নয়। দৃষ্টিহীন পোকাও অন্যান্য পোকার মতো সমভাবে আকৃষ্ট হয়ে আলোর দিকে ধাবিত হতে পারে। একে বলা হয়েছে, biological phenomenon অর্থাৎ, এইসব পাখির শরীর, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, উষ্ণতার তারতম্য, বায়ুর চাপ প্রভৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপ করার উপযুক্ত উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রের অনুরূপ। তাই শরীরের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটলেই এরা উক্ত স্থান ত্যাগের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্ট যে কোনো একদিকে উড়তে আরম্ভ করে। তারপর উচ্চাকাশে এদিক ওদিক, ওপরে নিচে উড়ে উড়ে ওরা শরীরের পক্ষে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পরিবেশ খুঁজে নিয়ে চলে। অন্ধ যেমন হাতড়াতে হাতড়াতে যেদিকে দেওয়ালের বাধা পায় সেদিক থেকে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি এইসব পাখিরাও বায়ুমণ্ডলে শরীরের পক্ষে বর্জনযোগ্য অদৃশ্য প্রাচীরে অনবরত ধাক্কা খেয়ে ফিরে ফিরে সঠিক পথে চলতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না একান্ত আকাঙ্ক্ষিত নির্দিষ্ট আবহাওয়াটি খুঁজে পায় ততক্ষণ ওড়া শেষ হয় না। এবং এমনিভাবেই তারা একদিন স্বদেশে পৌঁছে যায়।

চিত্ররথ দত্ত
কলকাতা—২৯

উদয়শংকর

শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "উদয়শংকর" লেখাটিতে গত একটি সংখ্যায় একটি ভুল বিষয়ের অবতারণা হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত গায়িকা গহরজান ৬০ বৎসর বয়সে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গমন করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে যাইবার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। ১৯৩৩ সালে সম্ভবত মিস্ গওহর নাম্নী এক মঞ্চাভিনেত্রী ইন্দ্রপুরীতে যাইয়া থাকিতে পারেন এবং উদয়শংকর ও সিমকীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
কলকাতা-২৫

রামমোহন রায়ের অপ্রকাশিত রচনা

'দেশ' পত্রিকার ৫ই জানুয়ারী ১৯৭৪ সংখ্যায় অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়ের অপ্রকাশিত রচনা' শীর্ষক লেখাটি আগ্রহ সহকারে পড়লাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় প্রদর্শিত রামমোহনের ছ'টি গানের কোনটিই অপ্রকাশিত নয়, পরন্তু বহুল প্রচারিত। সদ্য প্রকাশিত রামমোহন রচনাবলীতে গানগুলি স্থান না পাওয়ায় শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মনে করেছেন গানগুলি বহু পূর্বে 'গীতাবলী' নামক পুস্তিকায় ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় যদি কষ্ট করে অন্যান্য 'রামমোহন রচনাবলী' ও ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গীত বিষয়ক বইগুলি দেখতেন তাহলে এ হেন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হত না। রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত রামমোহন রচনাবলীতে আলোচ্য ছ'টি গানই আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ৫০০, ৫১০, ৪৯৭, ৫০০; ৫০৭ ও ৫০১ (১৭৯৫ শকের সংস্করণ)। মাঘ

১৮১০ শকে আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'রাজা রামমোহন রায়ের সংগীতাবলী' গ্রন্থেও সব গানগুলি চোখে পড়ে। পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ৫০, ৩৩, ৫, ২৫ ৩০ ও ৬। ১৩৬০ বাংলা সালে প্রকাশিত দেবকুমার দত্ত সম্পাদিত ' যুগ গীত পুস্তকেও গানগুলি উল্লেখ রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামমোহন রচনাবলীতে কিন্তু গানগুলি স্থান পায়নি। কারণ আলোচ্য গানগুলি রামমোহনের রচনা নয় 'তদ্বন্ধুগণ' কর্তৃক বিরচিত। রাজনারায়ণ ও আনন্দচন্দ্র সম্পাদিত রচনাবলীতে এর উল্লেখ আছে গানগুলির রচয়িতাগণের নামের আদ্যাক্ষরও তাঁরা মুদ্রিত করেছিলেন। রচয়িতাগণ হলেন গো স, ক র। এবং নী ঘো। এই কারণেই সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে গানগুলি স্থান পায়নি। পাঠভেদ বিষয়ে যে গান দুটির কথা শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন সেগুলি তাঁর প্রদর্শিত রূপেই রাজনারায়ণ বসু সম্পাদিত রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে।

গোরাচাঁদ মিত্র
কলকাতা-৪

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৯৯ ॥

মহীশূরে সুব্রতদাদের বাড়িতে থাকার বদলে আমি যদি কোচিনের কোনো হোটেলে উঠতাম, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনটা অন্যরকম হতো। মায়ের অসুখের খবর কোনোক্রমে আমার কাছে পৌঁছোতো না, আমি বিদেশের পথে পাড়ি জমাতাম। আর কোনোদিন ফিরতাম কিনা কে জানে! কোচিনে কোনোক্রমে আমার কাছে খবর পৌঁছোলেও সেখানে আমি অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, একা হোটেলের ঘরে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারতাম আমি, কিন্তু এখানে সুব্রতদা, সুধাবউদি, যমুনা ও সরস্বতী তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

সুব্রতদা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি করবে? আমার তো মনে হয়, তোমার ফিরে যাওয়াই উচিত।

আমার মুখে কোনো উত্তর এলো না। ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, আমার পা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে এসেছে। একতাল ছানা কাপড়ে জড়িয়ে নিংড়ে নিংড়ে যেমন জল বার করে, সেই রকমভাবে আমার ভেতরটা কেউ নিংড়োচ্ছে। মায়ের অসুখ, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সুব্রতদারা কি মনে করছেন, এই তিনরকমের চিন্তা আমাকে দিশেহারা করে দেয়। আমি এত ভাবতে পারি না এত দ্রুত, এমনকি নিজের সম্পর্কেও, সেবার অভ্যাস নেই আমার।

সুধাবউদি কিংবা যমুনা-সরস্বতী আমার টেলিফোনের বক্তব্য ঠিক জানে না। যমুনা বললো, কি হলো? বাদলদা, আপনার বিলেত যাওয়া হবে না?

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ, আমার আর কিছুই হবে না।

এরপর সকলে মিলে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলো আমাকে। সুধাবউদি যখন জানলেন যে আমি বাড়িতে কারুকে কিছু না জানিয়ে চলে এসেছি, তখন রেগে গেলেন খুব। আমাকে আশ্রয় দেবার জন্য যেন তিনিও অপরাধী। তৎক্ষণাৎ সুব্রতদাকে বললেন, তুমি ট্রেনের খোঁজ করো। ওর এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।

সুব্রতদা একটা উপায়ান্তর খুঁজে বার করলেন। তিনি জাহাজ কোম্পানিকে টেলিফোন করে দেখবেন, টিকিট ক্যানসেল করা যায় কিনা। সেটা সম্ভব হলে তিনি দু' তিনমাস পরে আবার কোনো জাহাজে সীট বুক করে রাখবেন। ইতিমধ্যে আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো এবং মায়ের অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

ট্রেন রাত তিনটেয়। সুব্রতদাদের বাড়ির সকলে মিলে আমাকে তুলে দিতে এলো স্টেশনে। যমুনা আর সরস্বতীর সঙ্গে এই কদিনে আমার বেশ একটা বন্ধুত্বের মতন হয়ে গিয়েছিল। ওদের মুখ দেখে বোঝা যায়, আমার বিদেশ যাওয়া হলো না বলে ওরা খুব দুঃখিত হয়েছে। আন্তরিক দুঃখ। কেউ কোথাও আমার জন্য দুঃখ পেয়েছে—এটা টের পেলেই মনের মধ্যে অসম্ভব একটা মায়া জেগে ওঠে কেন?

ফেরার পথ সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমার চিন্তাশক্তিও যেন অসাড় হয়ে গেছে। বারবার একটা ছবিই ভেসে আসছে চোখের সামনে। আমি ফিরে গিয়ে মাকে আর দেখতে পাবো না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, শ্মশান থেকে ফিরে সবাই নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে সিঁড়ির ওপরে। আমাকে দেখে বাবা বললেন, যদি এত দেরিই করলি, তা হলে আর এলি কেন?

বাঙ্কের ওপর শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একজন সহযাত্রী আমাকে ঠ্যালা দিয়ে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলো, ও ভাই, কি হয়েছে আপনার? অসুখ করেছে?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে আমার কাছে। নানা প্রদেশিক ভাষায় নানা প্রশ্ন। আমি ঘুমের মধ্যে কাঁদছিলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আমার অসম্ভব লজ্জা করতে লাগলো। ইস, এরা কি ভাবছেন—এত বড় একটা ছেলে ঘুমের মধ্যে কাঁদে? অনেকেই অবশ্য ধরে নিয়েছেন, আমি কোনো অসুখের কষ্ট পাচ্ছি। এঁরা কেউ জানেন

মা, আমি সদ্য মাতৃহীন। একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক অতি সহৃদয়ভাবে প্রশ্ন করলেন, আপনার কি পেট ব্যথা করছে? আমার কাছে ভালো ওষুধ আছে।

আমি পেটের ব্যথার কথাই স্বীকার করলাম। মানুষের মনের কষ্টের কথা অন্য কারুকে বোঝানো যায় না, তাই শারীরিক কষ্টের কথাই সকলে জানতে চায়। মাদ্রাজী ভদ্রলোক একটা টিনের কৌটো থেকে কি একটা কালো গুঁড়ো মশলার মতন বার করে দিলেন, খেয়ে ফেললাম বিনা দ্বিধায়। জিনিসটা বেশ সুস্বাদু। হাত বাড়িয়ে বললাম, আর একটু দিন।

দু'দিন ট্রেন জার্নির পর অস্নাত রুক্ষ চেহারায় পৌঁছোলাম কলকাতায়। ট্যাক্সি যখন বাড়ির সামনে থামলো, তখন পর্যন্ত আমার বুকের মধ্যে কাঁপুনি ছিল কিন্তু বাড়ির দিকে একবার তাকিয়েই আমার মনে হলো, এটা শোকের বাড়ি নয়। এখানে মৃত্যুর গন্ধ নেই। যদিও সদর দরজা বন্ধ, বাইরে কেউ নেই, দু' একদিন আগে কোনো ঘটনা ঘটে গেলে বাড়ি এরকমই থাকবে—তবু শোকের বাড়ি দেখলে চেনা যায়। মৃত্যু

যেখানে একবার আসে, সেখানে দরজায় চিহ্ন থাকে।

তখন আমার মনে হলো, মায়ের অসুখের কথাটাই পুরোপুরি মিথ্যে। খবরের কাগজের 'খোকা ফিরে এসো'র বিজ্ঞাপনের মতন! সামান্য মিথ্যে কথায় আমার বিদেশ যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হলো? আমি কাল পরশুই আবার তাহলে ফিরে যাবো।

একটু জোরেই দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। দরজা খুলে দিলেন বাবা। শুধু বললেন, এসেছিস?

—এখানকার সব খবর ভালো তো?

—এই একরকম।

আমি তখনো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। দরজার ওপাশে বাবা। ট্যাক্সির ভাড়া মেটানো হয় নি। আমি আবার ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়বো? এ বাড়ির সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক কি? আমি এ বাড়ির কেউ না— আমি এত কষ্ট করে ফিরে এলাম, বাবা যেন সেটা গ্রাহ্যই করছেন না। শুধু আমার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে আছেন।

ট্যাক্সিওয়ালা হর্ন দিতেই আমি সজাগ হলাম। হঠাৎ নাটকীয় কিছু করে ফেলা আমার ধাতে নেই। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে সুটকেসটা নামিয়ে নিলাম। বাবা দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। একবার শুধু বললেন, সুটকেশটা আমাকে দে।

আমি বললাম, না, ঠিক আছে। আমিই নিচ্ছি।

সিঁড়ি দিয়ে বাবার পেছনে পেছনে ওঠবার সময় আর একটাও কথা হলো না। দোতলায় ওঠার ঠিক আগেই মনে হলো, বাবাকে আমার প্রণাম করা উচিত ছিল। বরাবরই তো এরকম হয়ে এসেছে, বাইরে থেকে ফিরেই বাবাকে-মাকে প্রণাম করেছি। দরজা খোলার পরই বাবা সেইজন্যই বোধহয় আর কোনো কথা না বলে আমার প্রণামের অপেক্ষায় ছিলেন। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এসব আর এখন আমার মনে থাকে না। মাত্র বছর খানেকের মধ্যে বাবার সঙ্গে আমার কতটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। এখনো সুটকেসটা নামিয়ে রেখে প্রণামটা সেরে ফেলা যায়। সুটকেসটা নামিয়েও রাখলাম— কিন্তু বাবা তখন বারান্দা দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। প্রণাম করার জন্য কেউ কি গুরুজনদের ডাকে?

মায়ের ঘরে বড়মামা আর বড়মামীমা বসে আছেন। বিছানার ওপর মা, চোখ বোজা। মার সত্যিই অসুখ। আমি মাথার কাছে বসলাম। মার অসুখের জন্যই বেলেঘাটা থেকে বড় মামীমাদের আনানো হয়েছে। বাইরের লোকের উপস্থিতির জন্যই আবহাওয়া অনেক সহজ হলো। নইলে বাবা বোধহয় আর আমার সঙ্গে কথা বলবেনই না ঠিক করেছিলেন।

বড়মামা বললেন, এসেছিস? ওঃ, যা চিন্তায় ফেলেছিলি। এরকমভাবে কেউ যায়? ইডিয়েট, একফোঁটা বুদ্ধি নেই মাথায়।

বড়মামীমা বললেন, থাক্, ছেলেটাকে এখন বকো না। হিমানীকে ডাকবো?

—এখন ডেকো না। এইমাত্র তো ঘুমোলো।

—একবার ঘুম ভাঙালে কিছু হবে না। সারাক্ষণ ছেলেটের নাম করছিল!

—আস্তে, আস্তে। হঠাৎ না। চমকে ওঠে। চিররঞ্জন নিজে টেলিফোন করেছে, ছেলেটার গলার আওয়াজ শুনেছে—তাও হিমানী বিশ্বাস করে না। মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে এরকমভাবে কেউ যায়?

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বসে রইলাম। ঠিক ভেবে পেলাম না, এ ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়া না কষ্ট পাওয়া, কোনটা অপরাধ?

বড়মামীমা বললেন, যা বাদল, হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে আয়। চেহারার কি

ছিরি হয়েছে তোর?

আমি তবু বসেই রইলাম। বাবা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছেন। যেন এ ঘরের কোনো ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগই নেই।

বড়মামীমা মায়ের গায়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে ডাকলেন, হিমানী, ও হিমানী।

মা চোখ না খুলেই বললেন, উঃ?

—এখনো ব্যথা আছে?

—আছে।

—খুব।

—কি জানি।

—শোনো, বাদল এসেছে।

মা সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, কই? কই?

এর পরের দৃশ্য বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই। মায়ের চোখের জল দেখে আমাকেও আবার কাঁদতে হলো। এরই মধ্যে একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম। আমার ফিরে আসা সঠিক হয়েছে। আমি চলে যাবার পরদিনই মায়ের হার্ট স্ট্রোক হয়েছিল, ডাক্তারের মতে মাইল্ড ধরনের হলেও প্রাণ সংশয় ছিলই। এখন, মায়ের বিছানার পাশে বসে থেকে বুঝতে পারি, মায়ের মৃত্যুর বিনিময়ে আমার কোথাও যাওয়া চলে না। আমার সম্পর্কে আমার মায়ের টানটা সম্পূর্ণ জৈবিক, এখানে যুক্তির কোনো প্রশ্ন নেই।

কান্নাকাটি ও বিষণ্ণ পরিবেশেই রইলো বাড়িতে। বড়মামা চলে গেলেন, বড়মামীমা ক'দিন ধরেই এখানে থাকছেন। আমার মামার বাড়িতে সকলেরই ধারণা, আমার বাবা নিতান্তই অকর্মা এবং অপদার্থ। মাকে ওরা বেলেঘাটায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন মাকে নড়া-চড়া করানো ঠিক নয় এবং মা যেতেও চান নি।

বড়মামীমাই খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে আমাকে জোর করে ঘুমোতে পাঠালেন। একটা লম্বা ঘুম দিলাম। জেগে ওঠার পর আবার মন খারাপ হয়ে গেল। এই মন খারাপের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। চুপচাপ দু'তিনটে সিগারেট শেষ করে আবার এসে বসলাম মায়ের বিছানার পাশে। মা এখন আবার অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন।

রেণু এলো সন্ধের দিকে। আমিই দরজা খুলে দিয়েছিলাম। আমাকে দেখে রেণু চমকে উঠলো না, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না, শুধু জিজ্ঞেস করলো, মাসীমা কেমন আছেন?

আমি অপরাধী। সকলের চোখেই আমি তাই। সকলে মিলে শুধু একজনকে বারবার বিদ্ধ করলে তার ফল কি ভালো হয়? রেণু এরকম না করলেও পারতো।

এরপর আমিও একটা ভুল করলাম। আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, তুমি কেমন আছো? কিংবা, তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছো? কিংবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো না? কিংবা, রেণু, আমার চোখের দিকে তাকাও, আমাকে চিনতে পারছো না?

কিন্তু, এরকম কোনো ব্যক্তিগত কথার বদলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের থিয়েটার কেমন হলো?

রেণুর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ম। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, আমি ওর থিয়েটার করা পছন্দ করিনি। এবং এখনো সেই রাগ পুষে রেখেছি। রেণুও রাগের সঙ্গেই বললো, খুব ভালো হয়েছে।

তারপর আর একটাও কথা না বলে উঠে এলো দোতলায়। বেশ কয়েকদিন পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে গেছি এই খবর পেয়ে থিয়েটারের আসল অভিনয়ের দিন রেণু বলেছিল, ও পার্ট করবে না। সর্বক্ষণ কান্নাকাটি করেছে। শো ভণ্ডুল হয়ে যাবার আশঙ্কায় অনেকে মিলে প্রায় জোর করেই রেণুকে ধরে নিয়ে গিয়ে তুলে দিয়েছিল স্টেজে। কেন জানি না, এই কথাটা শুনেও আমার রাগ হয়েছিল।

রেণু মায়ের ঘরে বসে রইলো। কথা বলতে লাগলো বড় মামীমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে আলাদা কথা বলার কোনো আগ্রহই নেই ওর। আমার দিকে তাকাচ্ছেও না। আমি সিগারেট খাবার ছলে কয়েকবার উঠে গেলাম নিজের ঘরে। সেখানে গিয়ে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, রেণু যেকোনো মুহূর্তে চলে আসবে আমার কাছে। রেণু এলো না। এ কথাও আমার মাথায় আসে না যে, আমি নিজে থেকে না-ডাকলে রেণু আসবে না। বরং আমার অভিমান হয়, আমি এত দূরে গিয়েও আবার ফিরে এলাম, তবু রেণু একবারও আমার হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো না, তোমার কোনো কষ্ট হয়নি তো?

এরপর আরও এক দঙ্গল আত্মীয় স্বজন এসে পড়লেন। প্রতিদিন সন্ধে বেলাতেই এঁরা আসেন। আজ এঁরা দাদামশাইকেও নিয়ে এসেছেন। দাদামশাই প্রায়ই কঠিন অসুখে ভোগেন, আবার সকলকে অবাক করে দিয়ে সুস্থ হয়ে উঠে হাঁটাচলা করতে শুরু করেন। বয়েস হয়ে গেলেও চেহারাটি এখনো সোজা আছে। মামাবাড়ির গ্রামে যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটিকে দেখেছিলাম, এখন আর তাঁর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই, বেলেঘাটার জবর দখল কলোনির সামান্য পরিবেশে এই মানুষটিকে আঁটানো যায় না। প্রায় সারাজীবন যিনি সকলের ওপর হুকুম চালিয়ে এসেছেন আজ তাঁকে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁর বেশ কিছু টাকা তিনি কলকাতার একটি ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, পঞ্চম দশকে একাধিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে সেই ব্যাঙ্কটিও হঠাৎ একদিন গণেশ উল্টেছে।

অন্যদের নিষেধ সত্ত্বেও দাদামশাই আজ দেখতে এসেছেন তাঁর ছোট মেয়েকে। সিঁড়ি দিয়ে তাঁকে ধরে ধরে ওঠানো হলো। মেয়ের কপালে হাত রেখে বললেন, হিমু, কেমন আছিস, মা? সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোথায় গিয়েছিলি?

কী তাঁর সেই চোখের দৃষ্টি, আমি বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারি না। বড় মাসীমাই আমাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য বললেন, ও তো ওর ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল। ও কিছুই জানতো না।

বুঝলাম, দাদামশাইকে সব কথা জানানো হয়নি। দাদামশাই আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আবার বললেন, অনেকদিন তোকে দেখি না কেন?

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ঘুচেই গেছে। কিন্তু দাদামশাইরা যে-কালের মানুষ, তাতে ওঁদের কাছে বয়ঃকনিষ্ঠ আত্মীয় মানেই অনুগত প্রজার মতন, নিয়মিত হাজিরা দেওয়া তাদের কাজ।

এই বৃদ্ধ তাঁর ব্যক্তিত্বে ঘরের সবাইকে চুপ করিয়ে রেখেছেন। রেণুকেও উনি দু' তিনবার দেখলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, তোমার মা এখন একটু ভালো আছেন তো মা?

রেণু একটু অবাক হলো। তারপর ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

রেণু বুঝতে না পারলেও ঘরের অন্য সবাই বুঝতে পেরেছে যে দাদামশাই রেণুকে আমার জ্যাঠামশাইয়ের কোনো মেয়ে বলে ধরে নিয়েছেন। অসুস্থ কারুকে দেখতে এসেও উপস্থিত অন্য সকলের কুশল প্রশ্ন করাও পুরোনো প্রথা।

মা কথা না বলে চুপ করে শুয়ে আছেন। কথা বলতে গেলেই কষ্ট হয়। দাদামশাই আবার তাঁর মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, তোর কোনো চিন্তা নেই, মা। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কোনো ছেলেমেয়ে আমার আগে যাবে না। বুঝলি?

দাদামশাই আমার কাঁধ ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, ভালো করে চিকিৎসা করাবি, বুঝলি? সেরা ডাক্তার দেখাবি। আমার তো এখন আর কিছুই করার সাধ্য নেই। এই দুটো রাখ, এই দুটো বেচে চিকিৎসাপত্তর করাবি।

দাদামশাই তাঁর ফতুয়ার পকেট থেকে বার করলেন দুটি মোহর। আমি দেখলাম, আমার সব মামা-মামীমা ও মাসীদের

বিস্মিত চোখ পড়লো সে দুটোর দিকে। দাদামশাইয়ের এই গুপ্ত সম্পদের কথা ও'রা কেউ জানতেন না, বোঝাই যায়। দাদামশাই কারুকে গ্রাহ্য না করে আমার হাতে সে দুটো তুলে দিয়ে বললেন, নে! সাবধানে রাখবি।

মোহর দুটো বাবাকে দেবার বদলে আমার হাতে দেবার মধ্যে যে একটা তীব্র তাচ্ছিল্য ও অপমান আছে, তা আমিও বুঝতে পারি। আমি তক্ষুণি মোহর দুটো বাবার সামনে টেবিলের ওপরে রাখলাম। বাবা সেদিকে তাকিয়েও দেখলেন না।

আত্মীয়-স্বজনরা চলে যাবার পর আমি রেণুকে বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেবারও সুযোগ পেলাম না। এর মধ্যেই পংকজ এসে গেল। রেণু চলে গেল একা।

দিন দশেকের মধ্যে মায়ের অসুখের সঙ্কট অনেকটা কাটলো বলা যায়। এখন দীর্ঘ চিকিৎসার দরকার। আমার বিদেশে যাবার সম্ভাবনা মুছে গেল একেবারে। তবু মহীশূর পর্যন্ত যাওয়ার একটা উপকারিতা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। সুব্রতদা ওখান থেকে নিয়মিত খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন—এক মাসের মধ্যে আমার জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দিলেন, ও'দের কম্পানির কলকাতা শাখার। সে চাকরি প্রত্যাখান করার কোনো যুক্তিই রইলো না আমার। চাকরিতে জয়েন করার দিন মাকে যেন আরও অনেক সুস্থ মনে হলো। অনেকদিন বাদে বাবা আমার সংগে কয়েকটা কথা বললেন। বাবা-মাকে খুশী করার জন্য সুযোগ্য সন্তানরা যা করে, আমিও শেষপর্যন্ত তাই করলাম বলা যায়।

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় রুটিন বাঁধা হয়ে গেল আমার জীবনটা। সকালবেলা প্রায় ঘুম থেকে উঠেই অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হয়। বিলিতি কম্পানি, সুতরাং সেখানে হাজিরা দিতে যাতে আমার এক মিনিটও দেরি না হয়, সে জন্য বাবা আর মা-ই বেশী ব্যস্ত হয়ে থাকেন। একজন রাঁধুনি রাখা হয়েছে, মা বিছানায় শুয়ে থেকেই তাকে নির্দেশ দেন। দাড়ি কামিয়ে, ফিটফাট জামা-প্যান্ট জুতো পরে আমি গরম গরম ভাত খেয়েই দৌড়াই বাস ধরবার জন্য। বাবা পরামর্শ দিয়েছিলেন, একটু আগে বেরিয়ে আমি যেন উল্টোদিকের ট্রাম ধরে শ্যামবাজার চলে যাই, তা হলে সেখান থেকে বসবার জায়গা পাবো। সে পরামর্শ মানা হয় না, ভিড়ের বাসে কোনক্রমে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ডালহৌসি পৌঁছে যাই। অফিসটাতে অধিকাংশ বাঙালী কর্মচারী হলেও যেহেতু এখনো কয়েকজন ইংরেজ আছে, তাই সব কিছুই চলে সাহেবী কায়দায়। অফিসে ঢোকার মুখে অনাদের সংগে দেখা হলেই গুড মর্নিং বলতে হয়। আমি ট্যই পারি না বলে ইতিমধ্যেই একজন শুভার্থী আমাকে মৃদু ধমক দিয়েছেন।

একটা বড় হলঘরের মধ্যে আমার ডেস্ক। টেবিলে অনেক কাগজপত্র, তবু আমাদের সকালের মতো কাজ, বেল বাজিয়ে কোনো সাহেব ডেকে পাঠালেই অতি দ্রুত তাঁর ঘরে গিয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়ানো। টেবিলে বসে এক এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যাই। বড় বড় নিশ্বাস পড়ে। সাধারণ চাকুরিজীবীদের মতন জীবন কাটাবো—এরকম কখনো ভাবি নি। অথচ সেই জীবনই আমাকে নিতে হল। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি? মাত্র একটি দিনের ব্যবধান। আর একটি দিন খবর পেতে দেরি হলেই আমি সমুদ্রে ভেসে পড়তাম। এতদিনে আমি জার্মানিতে—

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রায় প্রত্যেক দিনই ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তর চেম্বারে যেতে হয়। মায়ের অসুখের রিপোর্ট দেওয়া ও নির্দেশ নেওয়া। অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। বড় ডাক্তারের কাছে ভিড় হবেই, তা ছাড়া ইদানীং উনি পয়সা নিচ্ছেন না।

বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ মায়ের দেখাশুনো করা। কোনো কোনোদিন পংকজ কিংবা অন্য কোনো বন্ধুবান্ধব আসে। কিছুক্ষণ আড্ডা। তারপরই খাবার খেয়ে নিয়ে একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়া। কখনো বা বই মুড়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে আবোলতাবোল চিন্তা।

জীবনটা যখন এই রকম প্রায় ছকে বাঁধা হয়ে এসেছিল সেই সময় হঠাৎ আবার সুর্দার আবির্ভাব। সুর্দা কলকাতায় এসে আবার সব কিছু তছনছ করে দিল।

(ক্রমশ)

সাহিত্য পাঠ

এক মাস আগে আমরা এই বিভাগে একটি সাহিত্য ধাঁধার প্রবর্তন করেছিলাম। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত রচনার অংশ-বিশেষ তুলে দিয়েছিলাম পাঠকদের জন্য, তাঁরা সেগুলি পড়ে চিনতে পারেন কিনা, সেই সব লাইন কোন্ লেখকের রচনা এবং কোন্ পুস্তকের অংশ। তারপরে অনেকেই জানিয়েছেন যে, প্রশ্নগুলি একটু বেশী শক্ত হয়ে গেল। অনেক নিয়মিত পাঠকও চিনতে পারেন নি সব উদ্ধৃতি এবং জানিয়েছেন যে, পড়ামাত্র চিনতে না পারলে মন খারাপ লাগে। এবারে তাই আমি অপেক্ষাকৃত সহজ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। যাঁরা সবকটি চিনতে পারবেন না, তাঁদেরও দুঃখ করার কিছু নেই, তবু তো এই উপলক্ষে কিছু ভালো লাইন পড়া হবে। এলাহাবাদ থেকে শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত সবকটির সঠিক পরিচয় জানিয়েছেন এবং দুর্গাপুরের করবী মুখোপাধ্যায় মাত্র একটি পারেন নি।

আমি উত্তরগুলি জানিয়ে দিচ্ছি।

১। (উত্তরের সারি সারি তিনটি জানলার তলাতে)—এটি পড়লেই অনুমান করা যেতে পারে যে যিনি লিখেছেন, তিনি একজন চিত্রশিল্পী। সেই কারণেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম মনে আসতে পারতো। রচনাটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আপন কথা' থেকে।

২। (সদাশিউ বসে, আসনে সকালে মিলে)—সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' থেকে। এই উপন্যাসে এটি একটি মর্মস্পর্শী অংশ।

৩। (খৃষ্টীয় বাংলা সাহিত্য দাঁড়াতে ঢুকতে না)—এটি ফাদার দাতিয়েন রচিত 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা' থেকে উদ্ধৃত—যা কয়েক বছর আগে এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন, ফাদার দাতিয়েন ইদানীংকালের এক বিশিষ্ট এবং চমকপ্রদ বাংলা গদ্যলেখক। তবে প্রথম লাইনটি পড়লে অনেকেরই কোনো খৃষ্টান পাদ্রীর কথা মনে আসবে না। ঐটুকুই তো সংকলনের কৌশল।

৪। (আমার সুহৃৎকাঙ্ক্ষা যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ)—এই অংশটি অবধারিতভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের। এই বাক্-ভঙ্গি আর কার? আলোচ্য অংশটুকু তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রের' ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত। একালের অনেকেই বোধহয় বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' পড়ে দেখতে চান না—তাঁদের এবং এমনকি মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পাঠকদেরও অনুরোধ করবো, বিষয়ের প্রতি পক্ষপাত না দিয়ে বইটি পড়ে দেখতে, বেশ মজা পাবেন।

৫। (একবার চাহিল রুদ্ধ দরজার দিকে)—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অহিংসা' উপন্যাস থেকে। যাঁরা ঐ উপন্যাসটি পড়েছেন, তাঁদের মনে থাকা উচিত এই বাক্যবন্ধ : "মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ় বয়সী দৈত্যটির "।...

এবারে আমরা কয়েকটি কবিতা অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। গদ্যের চেয়ে কবিতা মানুষের বেশী মনে থাকে—তাই আশা করি, এগুলি পাঠকের পক্ষে চেনা সহজ হবে।

১। রাজার মেয়ে আজ আপিসে খাটে
রাজার ছেলে খোঁজে কাজ,
ভুলেই গেছে তারা রাজাপাটে
কিছুই নয় তারা আজ।
তবুও বয়সের উদার সংকটে
ছেলেটি ভাবে ধাপে ব'সে
মেয়েটি সত্যিই রাজার মেয়ে বটে
রাজার ছেলে নয় তো সে।
পার্কে বেঞ্চিতে অথবা পথে খানে
দুজনে বলে প্রায়ই কথা
বহুরই ভাগ্যে যা বর্তমানে
তাদেরই বেলা অন্যথা।

২। বার-বার তিনবার
এবারে বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না
দেশোদ্ধার
শোন রে শ্রমিক শোন ভাই চাষা
আমাদের বুকে যত ভালবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে
অনিবার।

তোদের দুঃখে হায়
পাষাণ হলেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া
যায়
কারো নাকো ভাই হীন আশংকা
এবার নয়নে ধর্মের ডংকা,
সত্য-সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয়
তোদেরই চায়।

৩। সে-দিনও এমনি ফসল বিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত চিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে
থামিলো কালের চির চঞ্চলা গতি।
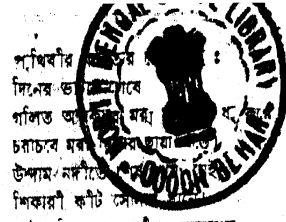
পৃথিবীর [illegible]
দিনের [illegible]
গলিত [illegible] মধ্য [illegible]
চরাচরে [illegible] ছায়া [illegible]
উন্দাম নদীতে [illegible]
শিকারী কীট [illegible]
তাই স্বস্তিকম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস
সময় যখন আসে তখন সকলি মানি
দুর্গম দিন,
নামহীন অশান্তিতে বিচলিত বুদ্ধি
তবু সরল কথাটি এই বলে মানি
ভারি টাক ছাড়া কিছুই টেঁকে না
সবার উপরে আমিই সত্য
তার উপরে নেই

৫। রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধকালো
মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি রাশি
ইলিশের শব
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর
পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে
ঘরে ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ ;
কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা,
ইলিশ-উৎসব।

সনাতন পাঠক

পুস্তক পরিচয়

সংবিধান ও রাজ্যপাল

The Governor in the Indian Constitution—A new perspective. শ্রীশিবরঞ্জন চ্যাটার্জী। ১০১।২১-এ হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের বর্তমান সংবিধান চালু হবার পর থেকে রাজ্যপালের কী ভূমিকা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক কি ধরনের হবে, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন কি না, অথবা বিধানসভায় ক্ষমতাসীন দল পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যপাল রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করতে পারেন কি না, অথবা বিধানসভা উদ্বোধন করার জন্য রাজ্যপাল মন্ত্রিদপ্তর দ্বারা প্রস্তুত যে ভাষণ পাঠ করবেন, তা থেকে কোন অনুচ্ছেদ তিনি বাদ দিতে পারেন কিনা, অথবা মন্ত্রিসভা বা মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করে রাজ্যপাল বিধানসভার অনুমোদিত কোন বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠাতে পারেন কিনা, অথবা রাজ্যপাল কোন মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে পারেন কিনা, —এ ধরনের বহু বিতর্কমূলক পরিস্থিতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আমরা দেখেছি। আলোচ্য বইয়ে লেখক রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এ-ধরনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সংবিধানের বিভিন্ন ধারার সুষ্ঠু বিশ্লেষণের উপর ভিত্তিশীল হওয়া দরকার—আলোচ্য বইয়ের লেখক তা সাফল্যের সঙ্গেই করেছেন। তাঁর আলোচনা শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারাকে শুধু বিশ্লেষণ-ই করেননি—প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক চ্যাটার্জী রাজ্যপালের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে কয়েকটি নিয়মও বেঁধে দিয়েছেন। তাঁর সুপারিশগুলি সম্পর্কে হয়ত সবাই একমত না হতে পারেন, কিন্তু তিনি যেভাবে রাজ্যপালের বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন ও বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে প্রত্যেকটি ঘটনার মূল্যায়ন করেছেন তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাজ্যপালের ভূমিকাও তাঁর আলোচনা থেকে বাদ যায়নি। বইটির প্রধান গুণ হল, সাবলীল ভাষা, বিভিন্ন দলিল, প্রামাণ্য প্রবন্ধ ও বই থেকে সংগৃহীত তথ্যের সুষ্ঠু উপস্থাপনা এবং বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনাকালে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনামূলক উদাহরণ দেওয়া। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই বইটি অবশ্য-পাঠ্য তো বটেই, সাধারণ নাগরিকগণও, যাঁরা রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করেন, এই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন।

হাসির গল্প

মনের মতন গল্প। শিবরাম চক্রবর্তী। এডারেস্ট বুক হাউস, এ-১২/এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

জীবনে যত সহজে আমরা হাস্যকর হয়ে উঠি, উদ্ভটকাণ্ড করে লোক হাসাই, সাহিত্যে ততটাই কঠিন গল্পকে হাসির করে তোলা, এবং কথায় কথায় পাঠকদের হাসানো। শিশুরাজ্যে হাসির রাজা শিবরাম কাহিনীতে এবং কথায় তাঁর তুলনা নেই, জুড়ি নেই। কথার মার প্যাঁচে কথার লোফালুফিতে, কথা কাটাকাটিতে তিনি সিদ্ধবাক এবং সিদ্ধহস্ত। তাই তাঁর গল্পকথা সহজেই কথাশিল্প হয়ে ওঠে, দেখতে দেখতে কথকতার রূপ নেয়। সেই সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বড়গুণ, তিনি বয়সে প্রবীণ হয়েও এখনো শিশুসাহিত্যিকই রয়ে গেছেন। শিশুদের মন মেজাজ মর্জি, কৌতুক এবং কৌতূহল তাঁর মজ্জাগত, রক্তে এবং কালিতে মজানো। তাঁর প্রতিটি গল্পই তাই ছোটদের মনের মতন গল্প। তাঁর পড়া গল্পও পুরোনো হয় না, পুরোনো গল্পও কখনো ফুরোনো যায় না, ফিরে ফিরে নতুন হয়। মনেরমতন গল্পের নটি কাহিনী পুনর্বার পড়তে গিয়ে তাই মনে হল। গল্পগুলি শৈল চক্রবর্তীর চিত্রশৈলীতে সুচিত্রিত। ছোটরা এ বই পড়ে আনন্দ পাবে, বড়রাও।

ভ্রমণ কাহিনী

পদ্মা থেকে চম্বল। সঙ্কর্ষণ রায়। শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬। আট টাকা।

প্রথম দর্শনে পদ্মা থেকে চম্বল গ্রন্থটিকে একটি প্রাথমিক ভ্রমণ কাহিনী মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। কারণ প্রচ্ছদ-চিত্রটিও সেরকম ইঙ্গিতই করে। যদিও মুখবন্ধে লেখক স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, এটি নিছক ভ্রমণ কাহিনী নয়। অর্থাৎ এটি ছকবন্ধ ভ্রমণ কাহিনী; নিছক নয়। ত্রিশটি নাতি দীর্ঘ পরিচ্ছেদে লেখক পদ্মা তীর থেকে সুদূর চম্বল তীরে পৌঁছেছেন, তবে সেটা এক যাত্রায় নয়; এবং নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যেও নয়। এই দুই প্রান্তের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বিস্তর। এক প্রান্তে কিশোর বয়সের রোমান্টিক কৌতূহল, অপর প্রান্তে পরিণত বয়সের জীবিকার তাড়না। ভূতত্ত্ব সমীক্ষণের শিক্ষানবিশী ও চাকুরিসূত্রে রাঢ় বাংলার প্রান্তসীমা, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের দুর্গম পার্বত্য অরণ্যভূমিতে লেখক মুসাফিরের মত অস্থায়ী বসবাস করেছিলেন। এই উপলক্ষে যে আরণ্যক রহস্য-রোমাঞ্চ ও রূপশোভা প্রত্যক্ষ করেছেন, যে বন্যজীবনের স্বাদ পেয়েছেন, মাটি ও মানুষকে যে আস্থি ও অকৃত্রিম মেল বন্ধনে আবিষ্কার করেছেন তারই স্মৃতিবৃত্ত এই গ্রন্থটি। কিন্তু ইতিহাস এবং কিংবদন্তী, কিম্বা ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য তার প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। লেখক জীবিকায় বিজ্ঞানমুখী মানুষ হলেও তাঁর রসদৃষ্টি সমান সজাগ। ভাষা ভঙ্গিও সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। সংক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র রেখায়, সাবলীল আঁচড়ে, বৃহৎ অর্থে যে ল্যান্ডস্কেপ তিনি এঁকেছেন তা পাঠকমাত্রকেই আকর্ষণ করবে। পদ্মা, গঙ্গা অথবা চম্বল—লেখকের মনশ্চক্ষে এরা কেবল স্রোত প্রবাহমাত্র নয়, এরা যেন একই শোণিতবাহী ধমনী, যেন সেই এক এবং অদ্বিতীয় মানবায়ন। পদ্মা থেকে চম্বল কেবল ভূবিজ্ঞানেতিহাসের শুষ্কস্পর্শে আবদ্ধ হয়ে নেই, রীতিমত গল্পরসে সমৃদ্ধ ও নাটকীয় হয়ে উঠেছে। প্রতিটি অধ্যায়েই তিনি যত্নের সঙ্গে ধরে দিয়েছেন মানুষের জীবন-কাহিনী, বিচিত্র নরনারীর বিচিত্রতর প্রণয় কথা। কিন্তু দু একটি গল্পের ক্ষেত্রে অতিনাটকীয়তা এবং অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস দুর্বলতার কারণ হয়ে উঠেছে। এই সস্তা চমক পরিহার করলে গ্রন্থটির গাম্ভীর্য এবং রসমূল্য বৃদ্ধি পেত সন্দেহ নেই।

জীবন

আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক-গ্রন্থ। সম্পাদক : জনার্দন চক্রবর্তী। পরিবেশক : সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা ৯। দাম তিরিশ টাকা।

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গিমার সঙ্গে 'ষোড়শ শতকের বৃন্দাবনীয় প্রজ্ঞা ও প্রেম একস্থ' হয়েছিল, সম্পাদক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীর ভাষায়, যাঁর জীবনে তিনি আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ। বিজ্ঞান ও গণিতের কৃতী ছাত্র রাধাগোবিন্দ কর্ম-জীবনে ছিলেন যশস্বী শিক্ষাবিদ্, মর্ম-জীবনে বৈষ্ণব সাধক। বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে ধর্মসাধনার, মণীষাদীপ্ত জীবনের সঙ্গে ভাগবতভূষিত জীবনের অনন্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাসহ ছ খণ্ড শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকাসহ ছ খণ্ড শ্রীচৈতন্যভাগবত, পাঁচ খণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ইত্যাদি গ্রন্থরাজি তাঁর প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্য ও জীবনচর্যার পরিণত ফল। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুটি স্কন্ধ প্রকাশিত হবার পর ৯২ বছর বয়সে এই মনীষী লোকান্তরিত হন।

আচার্য নাথের জীবনাবসানের পর তাঁর দিব্য জীবনের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-কল্পে অগণিত গুণানুরাগী রচিত এই স্মারক-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজী —উভয় ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থের বিপুল রচনাবলীতে স্বর্গত নাথের বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর জ্ঞান কর্ম ও ভক্তিসাধনার পরিচয়, জীবনবৃত্তান্ত, বৈষ্ণবসাহিত্য, সঙ্গীত, ইতিহাস, ভক্তিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা এবং স্মৃতিতর্পণ জাতীয় কবিতা সংকলিত। এ-রকম সুসম্পাদিত, সুমুদ্রিত মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ কচিৎ চোখে পড়ে। শ্রদ্ধেয় জনার্দন চক্রবর্তীর গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সম্পূর্ণ সার্থক—এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।
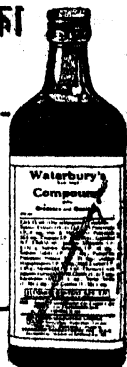
সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের একটি শাখা ধীরে ধীরে বেশ পুষ্ট হয়ে উঠছে। পর্বত অভিযান নিয়ে বছর দশেক আগেও বই লেখার কথা চিন্তা করা যেত না। বাঙালী অভিযাত্রী দল গত দশকে একটির পর একটি বিপদ্‌সঙ্কুল অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে পর্বতারোহণ সম্পর্কে যে-অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে আজ তার অনেক-গুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ভ্রমণ এবং অ্যাডভেঞ্চারে মেশানো এই সত্য অভিজ্ঞতা গল্পগুলির বেশ নিজস্ব একটি স্বাদ রয়েছে। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন সুনীল চৌধুরীর দেওবনের দিগন্তে (সাহিত্য প্রকাশ, আট টাকা)।

উত্তর গাড়োয়াল হিমালয়ের সিংহদুয়ার যোশী মঠ ছাড়িয়ে গম্ভীর দুর্গম পথে দেওবনের দিগন্ত। মানা (২৩,৮৬০ ফুট), কামেট (২৫,৪৪৭ ফুট) ও দেওবন (২২,৪৯০ ফুট) গিরিশিখরের সংলগ্ন একটি অনামী পর্বত শিখর। চেহারায় ত্রিভুজের মতো, সর্বাঙ্গ তুষারে ঢাকা ২১,৩৯০ ফুট উঁচু এই দুরূহ পর্বত জয় করেছিলেন ১৯৬৮ সালে একটি অভিযাত্রী দল। বস্তুত, তাঁরা দুটি অনামী পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেন। অন্য পাহাড়টি ২০,৩৩৬ ফুট উঁচু। লেখক সুনীল চৌধুরী এই সফল অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তাঁদের এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬৮ সালে প্রবর্তিত বোম্বাইয়ের সুরেশ

কুমার মেমোরিয়াল শিল্ডটি সে-বছর তাঁরা জয় করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহীদের পক্ষে এ-কৃতিত্বও বড়ো কম নয়।

'দেওবনের দিগন্ত' গ্রন্থে সুনীলবাবু স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে উত্তর গাড়োয়াল হিমালয় অভিযানের দিনানুদৈনিক বর্ণনা দিয়েছেন। অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক আশ্চর্য উৎকণ্ঠা-বিস্ময় ও রোমাঞ্চের জগৎ। পাঠকও অজান্তে এই জগতের সঙ্গী হয়ে যান। সুনীলবাবুর লেখার ভঙ্গিটি এমনিতেই বেশ তরতরে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বাদ যুক্ত হওয়ায় আরও যেন বেশী ভাল লাগে। বিজিত অনামী পর্বত দুটির নামও এই অভিযাত্রী দলেরই দেওয়া। বিধান পর্বত ও গৌরাঙ্গ পর্বত। বরেণ্য মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের ও নিরুদ্দিষ্ট পর্বতারোহী গৌরাঙ্গসুন্দর চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত এই পরিকল্পনাও চমৎকার।

*

সমরেশ দাশগুপ্তের **সাজঘরের বাইরে** (শুকসারী প্রকাশক, পাঁচ টাকা) ছোট গল্পের সংকলন। ছোট বড় ১৩টি গল্প এই গ্রন্থে সংকলিত। সমরেশবাবুর এই গল্পগ্রন্থটি পড়ে প্রথমে যে-কথা মনে হয় তা হল, তাঁর গল্প লেখায় নিজস্ব ধরনটি এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই সংকলনের 'কোজাগরী' 'ঘরের চাবি' 'শূন্যের খেলা' 'স্মৃতিসৌধ' এবং 'সাজঘরের বাইরে'—এই পাঁচটি গল্পের স্বাদ ও লেখার ভঙ্গির সঙ্গে অবশিষ্ট গল্পগুলির কোনো মিল নেই। একটু পুরনো রীতিতে লেখা হলেও এই গল্পগুলির গল্পত্ব অন্তত বজায় থেকেছে। বিশেষত 'কোজাগরী' ও 'ঘরের চাবি' গল্প দুটিতে বেশ দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু অন্য গল্পগুলিতে সমরেশবাবু আধুনিক হতে গিয়ে মূল লক্ষ্য থেকে প্রায়ই সরে গিয়েছেন। আধুনিকতা নিশ্চিত প্রয়োজন, কিন্তু গল্পের টানও তো বজায় রাখতে হবে!

যেমন, 'রতনের ঘর' গল্পটি। আরম্ভটি চমৎকার। বাবা রতনের ঘরে কয়েকদিন কাটিয়ে ফেরেন। মা-হারানো ছেলের বিষম কৌতূহল। রতনর ঘর কোথায়? কে রতন? শহরে অনেকগুলো রতন থাকে। কেউ হাড়কিপটে ধনী, কেউ নর্তকী, কেউ তালমিছরির ফেরি করা বুড়ি, কেউ বা রতন ডাকাত। ফিরিঙ্গিদা কানে কানে কুমন্ত্রণা জোগায়: 'রতন কি জানিস তো? ইংরেজীতে রটন্ মানে খুব খারাপ।' এইরকম সুন্দরভাবে গল্প আরম্ভ হয়েও শেষ রক্ষা হল না। 'বকুলবৃক্ষের মৃতদেহের ওপর মাথা রেখে বুঝি কফিনের ভেতর শুয়ে প্রচণ্ড খরার জ্বালায় ছটফট' করতে করতে বালক বয়সের মতো কান্নায় ভেঙে পড়া ছেলেটির জন্য কোনো সহানুভূতি যে জাগে না, এর জন্য ছেলেটি দায়ী নয়! আসলে সমরেশবাবু নিজেই খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। গল্পের বক্তব্য একটা অনুমান করে নেওয়া যায়, কিন্তু স্পর্শ করা যায় না।

ভ্রম সংশোধন

২৬ জানুয়ারির (সংখ্যা ১৩) সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয় বিভাগে 'এবং যদিও তথাপি কবিতা' গ্রন্থের সমালোচনায় কবি-সাহিত্যিক **শ্রীসুশীল রায়ের** নাম মুদ্রণ-প্রমাদবশত সুধীন রায় ছাপা হয়েছে।

ইস্পাত নগরী কি উদ্যান নগরী হতে পারে?

জামসেদপুর ভারতের আদর্শ ইস্পাত নগরী হিসেবে পরিকল্পিত হয়।

জামসেদজী টাটা তাঁর পুত্র দোরাব টাটাকে লেখেন : "মনে রেখো রাস্তাঘাট হবে প্রশস্ত। আর দু'ধারে থাকবে ছায়াতরু, তাদের মধ্যে প্রতি দ্বিতীয় বৃক্ষটি হবে তাড়াতাড়ি বাড়ে এমন জাতের। আর মনে রেখো লন্ আর বাগানের জন্য যথেষ্ট খোলা জায়গা থাকা চাই।"

আজকের জামসেদপুর এই রকমেরই এক নগরী—একাধারে ইস্পাত ও উদ্যান নগরী। এমনকি এখন যে বসবাসের কলোনীগুলি পরিকল্পিত হয়েছে সেগুলিতেও অনুসরণ করা হচ্ছে জামসেদজীর প্রায় সত্তর বছর আগে ব্যক্ত ইচ্ছা।

ষোড়শ স্বর্ণপদকী ষোড়শী সাইক্লিস্ট

সর্বভারতীয় সাইকেল রেসে শিখা সেনের ষোলোটি স্বর্ণপদক পূর্ণ হল। তবু এখনো ষোলোকলায় পূর্ণ হয়নি বাংলার এই শ্যামলী কন্যা। এখনো জুনিয়র সাইক্লিস্ট। বয়স ষোলো ছুঁই-ছুঁই—পনেরো বছর সাত মাস।

কটক, কলকাতা, ফৈজাবাদ, হায়দরাবাদ প্রভৃতি শহরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাইকেল রেসের আসর থেকে শিখা আগেই বারটি সোনা সংগ্রহ করেছিল। ত্রিবান্দ্রামে সম্প্রতি সমাপ্ত জাতীয় জুনিয়র ও আন্তঃআঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপে আরও চারটি জয়ের সুবাদে ষোলো সোনায় শিখা এখন আরও শ্রীমণ্ডিত।

সোনা অবশ্য আরও অনেক পেয়েছে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের সাইকেলে ও সাঁতারে। রুপো ব্রোঞ্জের তো কথাই নেই। আন্তক্লাব (সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব) শ্যুটিং-এর পদকও ওর হাতে এসেছে। স্কুল স্পোর্টস থেকে আহরিত পদক এবং প্রশংসাপত্রেরও অভাব নেই। মা (অতীত দিনের অ্যাথলীট) ও মেয়ের কাপ মেডেলে ঠাসা বাড়ির একটি বড় আলমারি, যার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে শিখার ষোলোটি সোনা—সর্বভারতীয় সাইকেল চালনায় শ্রেষ্ঠত্বের ছাপমারা।

সাড়ে পনেরো বছর বয়সী একটি মেয়ের পক্ষে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এতগুলি পদক লাভ অবশ্যই বিরল কৃতিত্বের নজির। তার মধ্যে এবারকার কৃতিত্ব বিশেষভাবেই উল্লেখ্য শিখার সীমিত ক্রীড়াজীবনে। কেননা, ত্রিবান্দ্রামের যে মাঠ থেকে ও এবার চারটি সোনা, দুটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ নিয়ে এসেছে, ওই মাঠেই ১৯৬৮র ডিসেম্বর মাসে জীবনের প্রথম সর্বভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে খালি হাতে ফিরে এসেছিল। সেই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে এবার পূর্ণ সাফল্য। ১৬ পয়েন্ট পেয়ে শিখা শুধু জাতীয় জুনিয়রে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপই লাভ করেনি, পুরোপুরি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১০ পয়েন্ট পেয়ে। চারটির বদলে ত্রিবান্দ্রামে শিখা দুটি সোনাও পেতে পারত, যদি ১৪ বছরের কম বয়সীদের ১০০০ মিটার ম্যাস স্টার্ট দুর্ঘটনায় সাইকেল থেকে পড়ে না যেত, আর দু হাজার মিটার ইন্ডিভিজুয়াল পারস্যুটে দিদি শিপ্রার কাছে একইভাবে না হারত। দু হাজার মিটার পারস্যুটে দিদি পেয়েছে সোনা, শিখা রুপো।

মা-বাবার সূত্রেই শিখা-শিপ্রার সহজাত ক্রীড়াদক্ষতা। মা অমিয়া সেন কুমারী জীবনে অ্যাথলেটিকসের অঙ্গন থেকে দু হাত ভরে কাপ মেডেল কুড়িয়েছেন। নামকরা হার্ডলার ছিলেন, যার কাছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সব নামী মেয়ে এডনা জনসন, ইস্থার লীলা, টি ম্যাকলন প্রভৃতিকে হার স্বীকার করতে হয়েছে চল্লিশের দশকে। শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সদস্যা ছিলেন। তখন সেন্ট জেমস স্কোয়ারের ওই ক্লাবটিই ছিল বাঙালী মেয়ে অ্যাথলীটদের গড়ে-পিঠে তৈরি করার সেরা ক্লাব। নীলিমা ঘোষ, তপতী মিত্র, পদ্মা দত্ত, চিত্রা সেনগুপ্তা প্রভৃতি অ্যাথলেটিক ক্ষেত্রের নামী মেয়েদের ওই ক্লাবেই ক্রীড়াচর্চা শুরু হয়। অমিয়া সেনের (তখন অমিয়া দত্ত) বিয়ে হবার পর হার্ডলার হিসাবে তার শূন্যস্থান পূর্ণ করে নীলিমা ঘোষ, যে ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। শিখার বাবা নবীন সেন ছিলেন ওই শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানেরই সম্পাদক। নিজেও খেলাধুলো করতেন। বাস্কেটবল, ভলিবল, হকি প্রভৃতি। যে অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক আগ্রহ ভাবী বধূ অমিয়া দত্তকে হার্ডলার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন, তপতী, চিত্রা, পদ্মার প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, ততোধিক ঐকান্তিকতা নিয়ে দুই মেয়েকে তৈরি করছেন।

শিখা সেন

শুধু সাঁতার সাইকেল এবং অ্যাথলেটিক্সই নয়, শিপ্রা ও শিখার অন্যান্য খেলাধুলোতেও আগ্রহ রয়েছে। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী (এ বছর বিজ্ঞানে পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছে) শিপ্রা অ্যাথলেটিকসে কলেজের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। প্রাইজ পেয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, পুরুষের স্পোর্টস ফুটবলেও মাঝে দুই বোন মেতে উঠেছিল। ১৯৭০-এ বি ডি চ্যাটার্জি ও রবীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা ময়দানে মেয়েদের ফুটবল খেলার যে রেওয়াজ শুরু হয়েছিল, শিপ্রা ছিল তার সংগঠন সম্পাদিকা। দুই বোনই রোজ সকালে মাঠে গিয়ে ফুটবলের তালিম নিত। কিন্তু উপযুক্ত তালিমের অভাবে মেয়েদের ফুটবল সংগঠন এগিয়ে যেতে পারেনি। শিখা কিন্তু দমবার মেয়ে নয়। দলগত খেলা ফুটবলে সঙ্গীর অভাব—সুতরাং অন্য খেলা চাই যার মধ্যে ঝুঁকি আছে, পৌরুষ আছে। হ্যাঁ, শিখার পোশাক পরিচ্ছদ, মুখের আদল পুরুষেরই মত। পুরুষ না বলে বাড়ন্ত বালকের মতই বলা উচিত। ও প্যান্টশার্ট এবং ট্রাউজার পরতেই অভ্যস্ত। ওই পোশাকে ৫ বছর ও যখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে রেসকোর্সে ছুটেছে তখন কেউ ভাবতে পারেনি সওয়ার পনেরো বছরের একটি মেয়ে।

সুযোগ জুটে যায় ওর সাইকেলের সঙ্গী পাঞ্জাবী মেয়ে তাজ সিংয়ের সঙ্গে সখ্যতার সুবাদে। তাজের বাবা মোহন সিং রেস হর্সের মালিক। তিনি শিখাকে রাইডিংয়ের কলাকৌশল শেখাচ্ছেন। ছুটন্ত ঘোড়ার লাগাম ধরে উড়ে যেতে নতুন থ্রিল অনুভব করে শিখা।

বউবাজার সুইমিং ক্লাবের সদস্যা হিসাবে সাঁতারেই শিখা পটু হয়ে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সাইকেল সংস্থার সম্পাদক রাজকুমার মেহরা প্রায় জল থেকে তুলে শিখাকে টেনে নিয়ে যান সাইকেলের ট্র্যাকে। সেটা ১৯৬৮র কথা। ক্রসকান্ট্রি রেস অনুশীলন করাতে নবীনবাবু শিখাকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যেতেন সোনারপুরে রাজকুমারের বাড়িতে। সাইকেলে প্রায় ১৫ মাইল করে মোট ৩০ মাইল পথ যাতায়াতে শিখারও সাইকেল নেশা ধরে গেল। আরম্ভ হল অনুশীলন। নিজের রেসিং সাইকেল ছিল না। ঘণ্টায় আট আনা হিসাবে সাইকেল ভাড়া করে শিখাকে অনুশীলন করাতেন নবীনবাবু। তারপর বহু প্রয়োজন থেকে মধ্যবিত্ত সংসারকে বঞ্চিত করে ৩৮০ টাকা দিয়ে একখানা পুরনো রেসিং সাইকেল কিনলেন শিখার জন্য। সাইকেল কেনার পর ২২ দিনের মাথায় শিখা ত্রিবান্দ্রাম যাত্রা করল বাংলার পুরুষ ও মহিলা দলের একমাত্র সাইকেল চালিকা হিসাবে।

ত্রিবান্দ্রামের প্রথম প্রতিযোগিতায় শিখার ব্যর্থতার কথা আগেই বলেছি। মাত্র মাস

দুই পর্বে দিল্লিতে বসল জাতীয় সিনিয়র সাইকেল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। বলা বাহুল্য, সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপেও একগ্রুপে জুনিয়র ইভেন্ট আছে ১৪ বছর ও ১৮ বছর বয়সীদের জন্য।

প্রতিযোগিতার একদিন আগে নবীনবাবু মেয়েকে নিয়ে দিল্লি পৌঁছে প্রমাদ গণলেন। ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের ঢাল, ট্র্যাকে রেস করার কোন অভিজ্ঞতা নেই শিখার। সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা। পাগলের মত অভিজ্ঞ সাইকেল চালকদের কাছে ধরনা দিতে আরম্ভ করলেন নবীনবাবু। কেউ যদি ওই ট্র্যাকে সাইকেল চালনার কৌশলটা একটু দেখিয়ে দেয় তা হলে মেয়েটা অন্তত মনের একটু জোর পায় প্রতিযোগিতা করার জন্য। এগিয়ে এসেছিল বাংলার বিখ্যাত সাইকেল চালক জিয়াউর রহমান। তার ফলেই শিখা ১০০০ মিটার মাসড স্টার্টে ব্রোনজ পদক পেয়েছিল। জীবনের প্রথম পদক। সামান্য একটু তালিম নিয়ে ওই অনভ্যস্ত ট্র্যাকে বেশী বয়সী মেয়েদের হারিয়ে দেওয়া এবং শিখার সাইকেল চালনার ভঙ্গি দেখে জিয়াউর রহমান সেদিনই বুঝতে পেরেছিল এ মেয়েটি বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে। তাই কলকাতায় ফিরে এসে জিয়াউরই শিখাকে কোচ করার দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম। রেড রোডে সাইকেল চালনার সময় লরির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জিয়াউরের মৃত্যু ঘটে। এখন শিখাকে কোচিং এবং প্র্যাক্টিস দেয় নিতাই বসাক, সুপ্রভাত চক্রবর্তী প্রভৃতি অতীত দিনের নামকরা সাইক্লিস্টরা।

একখানি সাইকেলে চেপে আর একখানি পাশে রেখে হাতে ধরে একটি মেয়ে রোজ ভোরে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের দিকে যায় বউবাজার অঞ্চল থেকে—এ দৃশ্য হয়তো অনেকেরই চোখে পড়েছে। যানবাহনের মধ্য দিয়ে সাইকেল চালাতে শিপ্রা সাহস পায় না। তাই দিদির অনুশীলনের জন্য তার সাইকেলখানাও শিখা নিয়ে যায় ওইভাবে চালিয়ে। দিদি ট্রামে বাসে গিয়ে একসঙ্গেই অনুশীলন করে। প্রতিদিনের রুটিন। সকাল ৭টা থেকে প্রায় সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ওদের অনুশীলন চলে প্রতিযোগিতার প্রাক্কালে বা স্কুল কলেজ ছুটি থাকলে ঘড়ির কাটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে। ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের ক্লাস ইলেভেনের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী শিখা পড়াশুনারও সময় করে নেয় কঠিন অনুশীলনের মধ্যে।

কথা হচ্ছিল মধ্য কলকাতার ২১বি মহেন্দ্র সরকার লেনে শিখাদের বাড়িতে বসে। আলমারিতে ভর্তি পদক ও প্রশংসা-পত্রগুলি মিলিয়ে যখন দেখলাম শিখার ষোলোটি স্বর্ণপদক পূর্ণ হয়েছে তখন নবীনবাবু জানালেন, পদক আরও পেতে পারত যদি শিখা সব প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সুযোগ পেত। '৭১এ পাতিয়ালার জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা যোগ দেয়নি, '৭২এ জুনিয়রের আসরই বসেনি। তা ছাড়া, '৭৩এ জব্বলপুরে সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের কয়েক দিন আগে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছিল। প্লাস্টার বাঁধা অবস্থায় কিছু দিন কাটাতে হয়েছিল। প্র্যাক্টিসের সুযোগ পায়নি। সোনাও পায়নি জব্বলপুরে।

নবীনবাবু আরও জানালেন, জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হবার ফলে শিখা মাসে ৫০ টাকা করে স্কলারশিপ পাচ্ছে। স্কুলেও ওর মাইনে দিতে হয় না। কিন্তু খেলাধুলায় রেওয়াজ রাখতে গেলে খরচ অসম্ভব। বছরে দুটি করে চ্যাম্পিয়নশিপে যেতে আমাদের প্রায় হাজার দুই টাকা বেরিয়ে যায়। সাইকেলখানা প্রায় ঝরঝরে হয়ে গেছে। একখানা রেসিং সাইকেলের দাম ১২ শো থেকে ১৫ শো টাকার মত। তাও পাওয়া যায় না। আমি ছা-পোষা মানুষ। খেলা-ধুলায় আমাদের নেশা আছে, মেয়েদের আগ্রহ আছে তাই সংসারকে নানাভাবে বঞ্চিত করেও ওদের প্রয়োজন মেটাতে পেছপা হই না। তবে দুঃখকষ্ট এবং পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করি—শিখা যখন সোনা বা রুপো জিতে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে।

সর্বভারতীয় সাইকেল রেসে আশাতীত সাফল্য সত্ত্বেও শিখার মধ্যে আত্মতুষ্টির মনোভাব নেই, অহমিকা নেই। ও আরও এগিয়ে যেতে চায় কঠিন অনুশীলনের মধ্যে। ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে শিখা আনন্দ পায়। ঝুঁকির জীবনই ওর লক্ষ। বাঙালী মেয়েদের প্রথম বিমান চালিকা দুর্বা ব্যানার্জি বা প্রথম প্যারাস্যুট জাম্পার ডাঃ গীতা চন্দর মত শিখাও বৈমানিক হতে চায়। গতানুগতিক নয়, স্বভাব-শান্ত মেয়েটির সহজাত একটা মোহ আছে দুরন্ত গতির প্রতি।

—মুকুল

জয়ন্তী উৎসব এবং কাবাডির কথা

জানুয়ারির ১৯ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত সকালে বিকেলে যারা ট্রামে-বাসে বা পায়ে হেঁটে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীট দিয়ে যাতায়াত করেছে তারাই উৎসুক চোখে দেখেছে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ছাত্র সমিতির প্রাঙ্গণে কাবাডি, বাস্কেটবল ও ভলিবল খেলাকে কেন্দ্র করে জনতার কি ভীড়! সন্ধ্যায় বিজলী আলোয় সাজানো ক্রীড়াঙ্গনের কি অপরূপ দৃশ্য! জনতার জয়োল্লাসে পায়দলের যাত্রীরা সেখানে না দাঁড়িয়ে পারেনি, ট্রাম-বাসের যাত্রীদের সাধ মেটেনি ক্ষণিক দৃষ্টি মেলে। অব মাঠের পাশের আসন এবং দাঁড়ানোর জায়গা তো মানুষের ভিড়ে সরগরম।

উপলক্ষ ছাত্র সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সপ্তাহব্যাপী খেলাধুলা। ইংরাজী ১৯২৩ সালের (বাংলা ১৩২৯ সাল) শুভ দোল পূর্ণিমার দিনে নিয়মশৃংখলার মধ্যে জাতীয় খেলাধুলার প্রসার, প্রচার ও উন্নতির প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে সমিতি যাত্রা শুরু করেছিল, গত মার্চের দোল পূর্ণিমার দিনে সেই সমিতি পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করে। পঞ্চাশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে তখন থেকেই আরম্ভ হয় সুবর্ণ জয়ন্তীর আনুষ্ঠানিক উৎসব। সপ্তাহব্যাপী খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, নাটক ও নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে ২৫ জানুয়ারি সেই উৎসব শেষ হল।

যে-কোন প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ-সমিতির পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের মধ্যে অনেক কথা লুকিয়ে থাকে, জয়ন্তী উৎসব পালনের প্রাক্কালে অনেক স্মৃতি জেগে ওঠে। ছাত্র সমিতির জয়ন্তী উৎসবে যে স্মৃতি ক্রীড়ামোদী মানুষের মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে তা হচ্ছে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য গঠন এবং জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার এক গৌরবময় স্মৃতি।

আজ আমার বহু দিন আগের একটি কথা মনে পড়ছে। বিধানসভায় ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল এবং ওই বিলের মাধ্যমে স্টেডিয়াম তৈরির বিষয় আলোচনার সময় বিরোধী পক্ষের এক সদস্য একটু শ্লেষের সুরে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে উপলক্ষ করে বলেছিলেন, উনি তো আর খেলাধুলো করেন নি, মাঠেও যান না, স্টেডিয়ামের অভাবে ক্রীড়ামোদীদের যে কি লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় সেটা উনি বুঝবেন কিভাবে। বুঝলে এতদিন কলকাতায় স্টেডিয়াম তৈরী হয়ে যেত। ওই শ্লেষের উত্তরে ডাঃ রায় বলেছিলেন, 'মাঠে

না গেলেও খেলাধূলো দেখার সুযোগটা আমি বাড়ির বারান্দা থেকে পেয়ে থাকি। সব খেলাই দেখি, এমন কি মারবেল খেলাও (সদস্যদের হাসি)। তা ছাড়া স্টেডিয়াম ছাড়াও যারা খেলাধূলো করে যাচ্ছে বা খেলাধূলো করার আসর সাজিয়ে রেখেছে বড় বড় ক্লাব থেকেও তাদের ভূমিকা কম না।'

কারো তখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি বাড়ির বারান্দা থেকে খেলাধূলো দেখার সুযোগ পাওয়া এবং খেলাধূলোর আসর সাজানো সম্পর্কে ডাঃ রায় সেদিন কাদের কথা বলেছিলেন। শুধু ছাত্র সমিতিই নয়, তাঁর বাড়ির পূর্বদিকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারেই রয়েছে আরও কয়েকটি ক্লাব—স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার, বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি এবং একটি জিমন্যাসিয়াম। ওদের ভূমিকা সম্পর্কে সেদিন ডাঃ রায় যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ছাত্র সমিতির স্মারক পত্রিকা দেখে তার মর্ম আরও পরিষ্কার হয়ে গেল।

নানা জন এবং নানা মতের ও নানা পথের মানুষকেই নিয়েই এক-একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার প্রতিষ্ঠার মূলেও থাকে নানা জনের অবদান। কিন্তু শুরুতে একজন দুজনকেই মুখ্য ভূমিকা নিতে হয় একটি মহৎ আদর্শ সামনে রেখে। ছাত্র সমিতি গড়ার মূলে যাঁর মুখ্য ভূমিকা তিনি ছিলেন জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত আদর্শব্রতী এক শিক্ষক। নাম নারায়ণচন্দ্র ঘোষ। ছেলেমেয়ে, বিশেষ করে ছাত্রদের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলে 'ছাত্রাচার্য' উপাধি পেয়েছিলেন। কোন সরকারী উপাধি নয়, কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে এ উপাধি বিতরণও করেনি। খেলাধূলোর মধ্য দিয়ে মানুষ গড়ার ব্রত পালনের প্রতিজ্ঞায় প্রাপ্ত সাধারণ মানুষের দেওয়া উপাধি—মুখে মুখে প্রচারিত।

কাবাডি খেলা আজ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কলকাতায় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায়, রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে মানুষের ভিড়ে মাঠ উপচে পড়েছে। আসানসোলে যে জাতীয় কাবাডির আসর বসেছে সেখানে অভূতপূর্ব সাড়া। কিন্তু নারায়ণচন্দ্র ঘোষই একদিন আমাদের এই দেশীয় খেলাটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং চেয়েছিলেন এই খেলার মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত করতে।

নারায়ণবাবুর বাবা চারুচন্দ্র ঘোষও ছিলেন জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত এক স্বাধীনতা-সংগ্রামী। তাঁরই স্মৃতিতে অল ইন্ডিয়া চারুচন্দ্র স্মৃতি ফলক নামে ছাত্র সমিতিতে হাডুডু বা কাবাডি প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন নারায়ণবাবু। সম্ভবত বাংলা দেশে বৃহৎ আকারে সংগঠিত প্রথম কাবাডি প্রতিযোগিতা। তখন অবশ্য নাম ছিল হাডু-ডু খেলা। নারায়ণবাবুই হাডু-ডুর জন্য নিয়মকানুনের একখানি বই লেখেন এবং ত্রিশ দশকের শুরুতে জাতীয় নেতাদের কাছে ওই বই পাঠিয়ে হাডু-ডু আন্দোলনে সমর্থন ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

যাঁরা তখন এই দেশীয় খেলাটির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন স্মারক পুস্তিকায় তাঁদের স্বহস্ত স্বাক্ষরিত নামগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কয়েকখানি চিঠিও। কারও নামই বাদ যায়নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, সি ভি রমন, প্রফুল্লচন্দ্র, কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, নেতাদের মধ্যে ডাঃ বিধান রায়, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষ, ক্রীড়াবিদদের মধ্যে গোবর গুহ, ধ্যানচাঁদ, গোষ্ঠ পাল, পুলিন দাস মহিলাদের অগ্রণী স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং আরও বহু সাংবাদিক ও চিন্তা-নায়ক হাডু-ডু খেলার প্রসার প্রচার ও উন্নতি কামনা করে সমর্থন জানিয়েছিলেন তখন নারায়ণবাবুকে।

স্মারক পুস্তিকায় পুনর্মুদ্রিত চিঠিতে দেখছি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছেন—

"বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন "হাড়ুডুডু" বইখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এই খেলা পুনর্বার আমাদের দেশে প্রচার করিবার জন্য আপনারা যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ সফল হউক এই প্রার্থনা করি। আমাদের এখানকার ছাত্রদের মধ্যে এ খেলার যথেষ্ট আদর আছে। ইতি ২৬ মাঘ ১৩৩৪।'

চিঠির শিরোনামে শ্রীশ্রীশিবপূজো কে স্মরণ করে রসরাজ অমৃতলাল লিখেছিলেন—"আজ ১৪ই ফাল্গুন, বুধবার ১৩৩৩ সাল শিবরাত্রি। এই পুণ্যদিনে শ্রীমান নারায়ণচন্দ্র ঘোষ যে আমার নির্বাসিত বাল্যসখা "হাডু-ডু-ডু"-কে আবার নতুন কাপড়চোপড় পরিয়ে স্বগৃহে এনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছেন তার জন্য প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি।"

কাঁদে মুক্তাক্ষরে ছাপা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের চিঠিতে রয়েছে—

"এই হাডু-ডু-ডু খেলার উপর আমার গভীর অনুরাগ। ছেলেবেলায় এই খেলা লইয়া আমার বহুদিন কাটিয়াছে একথা আজও আমি সেই ছেলেবেলার মত স্মরণ করিতে পারি। ছাত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণবাবুর ঐকান্তিক উদ্যমে ভারতের এই অত্যন্ত পুরাতন খেলাটি যদি আর একবার ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেদিন দেশের সুদিন।"

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"হাডুডুডু খেলাটা সম্পূর্ণ দেশীয় এটাকে দেশের মধ্যে চালিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। ও ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি বিজাতীয় খেলারই আদর হবে আর দেশীয় খেলার কৌশলগুলো ক্রমে লোপ পাবে এটা না হতে দেওয়াই ঠিক।"

[ফটোস্ট্যাট করা চিঠিগুলিতে যে বানান ও চিহ্ন আছে সেইভাবে ছাপা হল।]

চিঠিগুলিতে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র ও অমৃতলাল ছেলেবেলায় হাডু-ডু খেলার মধ্যে আনন্দ পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে ওই খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছাত্র সমিতির হাডু-ডু আন্দোলনে দেশের বরেণ্যদের সমর্থন চাওয়ার পেছনেও একটু ইতিহাস আছে। শুরুতে সমিতিতে যখন হাডু-ডু প্রতিযোগিতা জেঁকে বসেছে এবং ওই খেলার মাধ্যমে ছেলেরা জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে, তখন ব্রিটিশ সরকার ওর মধ্যে জুজুর ভয় দেখল। সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সব উর্বর মস্তিষ্ক সর্বদা চিন্তাশীল ছিল তারা পরামর্শ দিল—ওটা তো খেলা নয় ছাত্র সমিতির চত্বর স্বদেশীদের আড্ডা, ওখানে খেলার নামে সন্ত্রাসের বীজ উপ্ত হচ্ছে। ফলে এক ফতোয়ায় সরকার ছাত্র সমিতির হাডু-ডু প্রতিযোগিতা 'ব্যান' করে দিল। মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযানের প্রাক্কালে। তিন বছর সমিতির কাজকর্ম এবং প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকার পর আবার ১৯৩৩-এ সমিতি প্রাঙ্গণে হাডু-ডু প্রতিযোগিতা শুরু হল তৎকালীন ফিজিক্যাল এডুকেশনের ডিরেক্টর জেমস বুকানন-এর প্রচেষ্টায়। নতুন করে ওই প্রতিযোগিতা আরম্ভের মুখে নারায়ণবাবু দেশের গুণী-জ্ঞানীর সমর্থন চেয়েছিলেন।

হাডু-ডু বা কাবাডির আজকের জনপ্রিয়তার মূলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও অবদান আছে। কিন্তু আমাদের দেশের এই প্রাচীন খেলাটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার মূলে ছাত্র সমিতি এবং নারায়ণবাবু যে পথিকৃৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ছাত্রাচার্য নারায়ণ ঘোষ আজ বেঁচে নেই। কাবাডি খেলাকে সর্বভারতীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পঞ্চাশ বছর আগে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, আজকের কাবাডি খেলার জনপ্রিয়তা সেই আন্দোলনের সুফল পরিণতি বলা যেত পারে। সমিতির সদস্যরা নারায়ণবাবুর মর্মরমূর্তি গড়ে এবং তাঁর আদর্শ সামনে রেখে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করল।

—একলব্য

অরণ্যদেব লী ফক

সমুদ্রের উপর দিয়ে··· চিঠি উড়ে যাচ্ছে ···

মিঃ ওয়াকারের চিঠি আছে?
হুম! মিঃ ওয়াকারের ঠিকানায় রাজা নামে একটি ছেলের চিঠি আছে!
কিন্তু এই ওয়াকারটি কে?

জঙ্গলের প্রান্ত থেকে ফ্রাকা খবর নিয়ে উড়ে যাচ্ছে গভীর অরণ্যে।

এই ভীষণ, অদ্ভুত পাখিটিকে আকাশে কেউই ঘাঁটায় না। ঈগলও তাকে সমঝে চলে।
ওয়াকারবাবার চিঠি··· আমি জানতাম আসবে।

6/17

যা-তা গল্প বলে ওদের ঘুম শিখিও না, মজু!
যা-তা গল্প? খুদে মানুষ তো সত্যিই আছে!

গাঁজাখুরি!
যোদ্ধা!

এই··· গাঁজাখুরি··· ঐ যে পাখিটা···ফ্রাকা··· ও সেই পাখিগুলোর একটা·· অরণ্যদেবকে খুদে মানুষেরা এটা উপহার দিয়েছিল!
!
!
৩

মতামতের মন্তাজ

পর পর দুটি ফিল্‌ম অ্যাওয়ারড সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। '৭৩ সনে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে 'অশনি-সংকেত'-এর স্থান একটিতে তৃতীয়, অপরটিতে পঞ্চম। রাজ্য সরকারের অ্যাওয়ারড কমিটি অশনি সংকেত-কে তৃতীয় স্থান দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সত্যজিৎ রায়কে, অর্থাৎ তৃতীয় স্থান-অধিকারী ছবির পরিচালককে আবার শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার দিয়েছেন। এইখানেই সঙ্গতির অভাব। বি-এফ-জে-এ যেহেতু সারা ভারতের ছবির বিচার করেন, তাই বোধহয় অশনি সংকেত-

রঙ্গজগৎ

এর স্থান পঞ্চম। সমালোচকদের বিচারে প্রথম দশটি চিত্রের বেশির ভাগ হিন্দি চিত্র। দু-একটি এক্সপেরিমেন্টাল ছবি ছাড়া হিন্দি চিত্র ভাল হলেও কতখানি ভাল হতে পারে সে-বিষয়ে দর্শকদের ধারণা আছে। ফিল্‌ম বিচারের নামে এইখানেই প্রহসন।

* * * *

সব অ্যাওয়ারডই সকলকে সমানভাবে খুশি করতে পারে না। ফিল্‌ম বিচারে ঐকমত্যও সম্ভব নয় জানি। তবে এবারকার বিচারের অন্তর্গত ছবিগুলি সবই দর্শকদের দেখা। ফিল্‌ম সেনস যাঁদের আছে, তাঁরা অন্ততঃ অশনি সংকেত-এর জন্য তৃতীয় বা পঞ্চম স্থানের কথা ভাবতে পারেন না। অবশ্য এই বিচারই শেষ বিচার নয়। তা ছাড়া, অশনি সংকেত এর আগেই আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত। বর্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে কিংবা পিকে গেছে আরও ভাল ছবি নিশ্চয়ই পাঠানো হয়েছিল। এবং আশা করা যায়, '৭৩ সনে কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির চাইতে সে-সব ছবির গুণগত মান খুব নীচে নয়।

* * * *

এই তো গেল শ্রেষ্ঠ ছবি বিচারের কথা। অন্যান্য বিভাগেও বিচারের নমুনা আশ্বস্ত করতে পারেনি। সেটা ক্যামেরার কাজের বিচারই হোক অথবা সঙ্গীত পরিচালনার। একটি যুক্তি এই হতে পারে,

রাজ্য সরকারের বাংলা চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে বছরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে পুরস্কার নিচ্ছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়—পাশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় ও সামনে শ্রীমতী কানন দেবী ফটো-দেশ

মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মাধবী চক্রবর্তী এবং শ্রেষ্ঠ ছবি স্ত্রীর পত্র-র পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী (বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার ও শিল্প নির্দেশক) ফটো-দেশ

একই ছবি যাতে বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার না পায়, সে বিষয়ে সরকারের অ্যাওয়ারড কমিটি যত্নবান ছিলেন। কমিটির কাজ শ্রেষ্ঠ কাজ খুঁজে বার করা। কোন বিশেষ পলিসি অনুসরণ নয়। সারা বছরে সব বিভাগে দুটি-তিনটি ছবিই উৎকৃষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠদেরই বিচার করতে হবে। ফিল্মের বিচার গণতন্ত্রে চলে না, অন্য কোন উদার নীতিও নয়। শিল্পের বিচার একটু নির্মম হওয়াই স্বাভাবিক। একই ছবি যে বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার পায়নি তাও নয়। তবে সুখের কথা, মূক-বধির নায়ক-নায়িকা নিয়ে তোলা কোশিশ ছবি শ্রেষ্ঠ সংলাপের জন্য সমালোচকদের পুরস্কার পায়নি।

* * * *

সিনেমা-অনুরাগীরা, অর্থাৎ যাঁরা সিনেমাকে সিনেমা হিসাবেই দেখেন নিছক আমোদ-চিত্র নয়, বেশি মর্মাহত হবেন

এবারের বি-এফ-জে-এ পুরস্কার দেখে। সমালোচকদের অ্যাওয়ারড আগে এত নিম্ন মানের হয়নি। শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে কার পুরস্কার পাওয়া উচিত, সে-বিষয়ে তাঁর মতভেদ থাকতেই পারে। তবে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বাইরের গ্ল্যামার শিল্পী আমার প্রয়োজনটাই যদি সমালোচকদের কাছে জরুরি হয়ে থাকে, তবে খুবই আশঙ্কার কথা। পপুলারিটি-কে গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব বলে ধরে নেওয়ার প্রবণতা বি-এফ-জে-এ অ্যাওয়ারডে আগেও দেখা গেছে। এবারেও দেখা গেল, যে সংগীত-পরিচালক অধিক মাত্রায় হিট গান পরিবেশন করেছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। যাঁর গাওয়া গান হিট তিনিই শ্রেষ্ঠ নেপথ্য-গায়ক। যে চিত্রনাট্য অবান্তর ও প্রক্ষিপ্ত বিষয়ে ভারাক্রান্ত, তা-ই শ্রেষ্ঠ। যিনি বেশি হাসিয়েছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা।

* * * *

ফিলম সমালোচকদের বিচারকে সব চাইতে বেশি মূল্যবান মনে করা যেতে পারত। সরকার নিযুক্ত অ্যাওয়ারড কমিটির বিচারে অন্য বিবেচনাও স্থান পেতে পারে। কারণ সেখানে নগদ টাকার পুরস্কার, ফিলম ইনডাস্ট্রিকে সাহায্যদানই সে-পুরস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য। অর্থ-সাহায্য যাতে বিশেষ কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, যথাসম্ভব বেশির ভাগ প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী বা কলাকুশলী যাতে টাকা পান, সে-বিষয়ে অ্যাওয়ারড কমিটিকে সচেতন থাকতে হয়। বছরের পর বছর

জাতীয় পুরস্কার কমিটির বিচারের ধরনে সেটাই স্পষ্ট। তাঁদের দাক্ষিণ্য আর একটু বেশি। ঘুরে-ফিরে যাতে সব রাজ্যেই পুরস্কার যায়, সেদিকেই কমিটির কিছুটা লক্ষ্য রাখতে হয়। এই প্রথম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের পুরস্কারের প্রবর্তন হল। এই কমিটিরও লক্ষ্য থাকবে যাতে বেশি জনকে অর্থ সাহায্য করা যায়। এবারে নাকি এমন প্রস্তাবও হয়েছিল যে, সত্যজিৎ রায়কে তাঁর ছবির জন্য আলাদা সম্মান জানিয়ে অন্য ছবিগুলিকেই শুধু পুরস্কারের আওতায় আনা হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। তাতে এটাই বোঝা যাচ্ছে, ছবির গুণাগুণ বিচারের বাইরেও সরকারের অ্যাওয়ারড কমিটির বিবেচ্য বিষয় আরও কিছু থাকতে পারে। কিন্তু সমালোচকদের তো এমন কোন দায়-দায়িত্ব থাকবার কথা নয়। সাধারণ দর্শকের ভাল-লাগা-না-লাগার ভিত্তিতে ফিলম অ্যাওয়ারড হয় না। দুঃখের বিষয়, এবারের বি-এফ-জে-এ অ্যাওয়ারডে ওই ভাল লাগা-না-লাগাই প্রতিফলিত। সমালোচকরা ফিলম ফ্যানদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই যেন শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করেছেন। সমালোচকের বৈদগ্ধ্য বা আপসহীন বিচারের লক্ষণ এই অ্যাওয়ারডে নেই।

চেক শিশু-চিত্রের উৎসব

পৃথিবীর সব দেশের শিশুদের মানসিকতা বোধ হয় একই ধরনের। চেকোশ্লোভাকিয়ায় তোলা যে ছয়টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের শিশু-চিত্র এখানে দেখানো হল তার সবগুলি ছবিতেই এখানকার শিশুরা মজার উপকরণ খুঁজে পেয়েছে। যে বারটি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হল তার মধ্যেও মজা কম নয়। শিক্ষণীয় ব্যাপারও আছে অনেক। মোট কথা ওই দেশের অনেক কিছুই জানা হয়ে রইল আমাদের দেশের শিশুদের। এই উৎসবের সেটা একটা মস্ত বড় লাভ।

যে ছটি কাহিনী-চিত্র এবারে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে তিনটি ছবি (দ্য গার্ল অন দ্য ব্রুমস্টিক, অন দ্য কমেট এবং প্রিন্স বাইয়াইয়া) এর আগে এদেশে দেখানো হয়েছে। নতুন তিনটি ছবির নাম : স্নো-হোয়াইট (পরিচালক : ভেরা পিলভোভা-সিমকোভা), ফক্সেস, মাইস অ্যান্ড রোগস এবং ফ্যাটি (পরিচালনা : জোসেফ পিনকাভা)। তিনটি ছবিই নানা কারণে দর্শনীয় এবং উপভোগ্য। প্রথম দুটি ছবিতেই শিশুদের মানসিকতার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন পরিচালক। প্রথম ছবিতে মজার ঘটনা কিছু বেশি। দ্বিতীয় ছবিতে মজার ভাগ কিছু কম, কিন্তু ছবি হিসেবে আরও উঁচু মানের। ছেলেদের দুটি দল, দুই দলের দুই অধিনায়ক। একজন পশু-প্রেমিক আর অপরজন পক্ষী-প্রেমিক। সব রেষারেষির অবসান ঘটল একটি অশ্বশাবকের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে। মানবিক আবেদনে ছবিটি পূর্ণ। তৃতীয় ছবি ফ্যাটি ঠিক শিশু-চিত্র নয়। টিন-এজারদের মানসিকতা নিয়ে ছবি। অনেক সূক্ষ্ম কাজ এ ছবিতে খুঁজে পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে ছবিটিকে এবারের উৎসবের সেরা ছবি বলা যেতে পারে।

[ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং চিলড্রেনস ফিলম সোসাইটির (ইন্ডিয়া) সহায়তায় চেক শিশু-চিত্রের সাতদিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ২১ জানুয়ারি জ্যোতি প্রেক্ষাগৃহে। উৎসবের উদ্বোধন করেন ডঃ রমা চৌধুরী।]

রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন

রবীন্দ্রসদনে গত ৪ঠা জানুয়ারী থেকে পর-পর তিনটি সন্ধ্যায় দক্ষিণীর রজত-জয়ন্তী উৎসব-পর্ব উপলক্ষে আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে প্রায় একশত শিল্পী, প্রত্যেকেই একটি করে প্রায় শতাধিক গান শোনালেন। যাঁদের গান সাধারণত এই শহরে শোনা যায় না, সেই সব শিল্পী অবশ্য একাধিক অধিবেশনে গান গেয়েছেন। দক্ষিণী একসময়ে এই ধরনের ত্রৈবার্ষিক রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের আয়োজন নিয়মিতভাবেই করতেন। আয়োজনের পারিপাট্য, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা, গান এবং শিল্পীর বিপুল বৈচিত্র্য এবারকার সম্মেলনকে নানাভাবে রবীন্দ্র-সংগীতানুরাগীদের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিল। এ-ধরনের অনুষ্ঠান এর পর থেকে পুনরায় যদি নিয়মিত ব্যবধানে আয়োজিত হয় তাহলে দক্ষিণীর কাছে নিঃসন্দেহে সংগীত-রসিকেরা কৃতজ্ঞ থাকবে।

সম্মেলনের গানগুলি একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের সমগ্র সৃষ্টিধারাকে ষোলটি পর্যায়ে বিভক্ত করে এক-এক দিন প্রায় পাঁচটি পর্যায়ের গান বিভিন্ন শিল্পীরা পরিবেষণ করেছেন। এ-ধরনের একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি যে-কোনো সম্মেলনেরই থাকা উচিত। 'দক্ষিণী'র কর্তৃপক্ষ যে এ সম্পর্কে সচেতন, সেটা সুখের কথা। কিন্তু, তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রসংগীতের স্বরূপ এবং বৈচিত্র্যের সন্ধান দেওয়াই যদি এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে বোধহয় তা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে

পারল না প্রধানত দু'টি কারণে। প্রথমত কোন নীতি অনুসারে রবীন্দ্রসংগীতের পর্যায়-বিভাগ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। ধর্মসংগীত ধ্রুপদ বা ধামারে রচিত হতে বাধা কোথায়, কিংবা প্রেমসংগীত আর টপপা যখন ঋতুসংগীত এবং নূতন তালের গানের মধ্যে কী দুর্ভেদ্য প্রাচীর আছে, তা ঠিক বোধগম্য হল না। গানগুলি হয় সুরভিত্তিক, নয় ভাবানুগ—এইভাবে বিভক্ত হলে বোধহয় এই বিভ্রান্তি থাকত না। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রসংগীতের যথাযথ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে কেবলমাত্র যথার্থ গুণী এবং সুদক্ষ শিল্পীদের দ্বারাই তা সম্ভব। ভালমন্দ নির্বিচারে প্রত্যেককে একটি ক'রে গানের সুযোগ দিয়ে এই ক'দিন যা অনুষ্ঠিত হল তা সংগীতসম্মেলন না হ'য়ে বস্তুত রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পীমেলা বা ওই ধরনের কোনো আনন্দানুষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। রসোৎকর্ষের কথা বাদ দিলে অবশ্য এ-ধরনের আয়োজনেরও একটা মূল্য আছে, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

এবারকার সম্মেলনের সর্বোত্তম আসর রসের বিচারে, নিঃসন্দেহে টপপার পর্যায়ের শিল্পীদের সমাবেশে গড়ে উঠেছিল। তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত এই আসরে উপস্থিত ছিলেন গীতা ঘটক, বাংলাদেশের ফাহমিদা খাতুন সুশীল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা, নীলিমা সেন ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে অপূর্ব গেয়েছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় 'তোমায় নতুন করে পাব বলে।' সূক্ষ্ম কাজগুলি যে শুধু তাঁর কণ্ঠে অনুপম তা নয়, সমগ্র চেতনাকে গানের মধ্যে ঢেলে দিয়ে যে অসামান্য সংবেদনশীল রসে গানের প্রতিটি পদ ভরে দিলেন, তারও বুঝি কোনো তুলনা নেই। এই পর্যায়ের পরবর্তী ঋতুসংগীত সেই জন্যই বেশ কিছু সুগীত গান সত্ত্বেও যেন তেমন রেখাপাত করতে পারল না। এখানেও তাই মনে হয়েছে, অনুষ্ঠানের রসগত মানের দিকে উদ্যোক্তারা কিছু পরিমাণে উদাসীন ছিলেন। নতুবা শেষ দিবসের টপপার পর্যায়ের শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েই কি সম্মেলনের শেষ হতে পারত না ?

টপপা পর্যায়ে বাংলাদেশের ফাহমিদা খাতুনও স্বচ্ছন্দে গেয়েছেন 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না।' মঞ্জুলা গুহঠাকুরতার 'কখন দিলে পরায়ে'ও উল্লেখযোগ্য পরিবেষণা। এর আগে ভাঙাগানের শেষ গানটি (বাসন্তী হে) সুন্দর গেয়েছেন ঋতু গুহ তবে সেদিন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতার যেন একটু অভাব ছিল। এই পর্যায়ের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মীরা বসু, সর্বাণী সেন, প্রতিমা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা। শিশু-

"সব্যসাচী" (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী ফটো-দেশ

সংগীত' নামে কোনো পর্যায়-বিভাগ সম্ভব কিনা কিংবা 'ওগো দখিন হাওয়া' গানটিকে শিশুসংগীত বলা সমীচীন কিনা, সে প্রশ্ন স্থগিত রেখে বলতে বাধা নেই গানটি অতি চমৎকার গেয়েছেন শর্মিলা বসু। এর পূর্ববর্তী পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক সংগীতে উৎপলা দাশগুপ্তের 'যিনি সকল কাজের কাজী' শিল্পোৎসবের গান হিসেবে কতদূর যথাযথ, অথবা এ-ক্ষেত্রে 'মুক্তধারা' নাটকে এর চেয়ে যথোপযুক্ত গান ছিল কিনা, এই প্রশ্ন উঠতে পারে। এইদিন, এবং সম্মেলনের সর্বশেষ পর্যায় 'ঋতুসংগীতে' শরতের গান নিপুণ ভঙ্গিতে মনে রাখবার মতন করে গেয়ে শোনালেন শর্মিলা রায়। এই পর্যায়ে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে দিলেন মুখোপাধ্যায় (একটুকু ছোঁয়া লাগে) এবং গোরা সর্বাধিকারী (নাই রস নাই) নিষ্ঠার সঙ্গে গেয়েছেন। সাগর সেনের 'আমার দিন ফুরালো'তে ভাবের চেয়ে ভঙ্গিই বেশি। ওঁর সঙ্গে অবশ্য ভাল হারমোনিয়ম বাজিয়েছেন অর্ঘ্য সেন।

সম্মেলনের প্রথম দিনের শিল্পীদের মধ্যে 'ধর্মসংগীত' পর্যায়ে গভীর দরদ দিয়ে 'শুনেছে তোমার নাম' গানটি গেয়েছেন তাড়িৎ চৌধুরী। এই পর্যায়ে শুচিতা রায়, কৃষ্ণা গুহঠাকুরতাও উল্লেখযোগ্য। হতাশ করেছেন বিশেষত পূরবী মুখোপাধ্যায়। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হৃদয় বেদনায় বহিয়া'ও আরও স্বচ্ছন্দ হতে পারত। এইদিন 'উদ্দীপক' পর্যায়ে অর্ঘ্য সেন ধ্রুপদ ও ধামারে অমল নাগ, প্রসাদ সেন এবং গীতা সেন খুব সুন্দর গেয়েছেন। সুবিনয় রায়ের কাছ থেকে কিন্তু আর একটু বেশি প্রত্যাশা ছিল। আর সেদিন সকালের প্রাণ উড়িয়ে দিয়েছেন সুচিত্রা মিত্র। লোকসংগীত পর্যায়ে 'কৃষ্ণকলি'র

কাজগুলি নতুন করে যেন উন্মোচিত হল তাঁর দরদী কন্ঠের স্পর্শে। এই পর্যায়ে বাণী ঠাকুরও ভাল গেয়েছেন। জ্ঞানদ সিংহের পদাবলী পর্যায়ে সুমিত্রা সেনের গান উপভোগ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিবসে নূতন তালের গানে সুপূর্ণা চৌধুরী, সংঘমিত্রা গুপ্ত এবং প্রসূন দাশগুপ্তের তিনটি গান, 'খেয়াল ও ঠুংরী' পর্যায়ে তাড়িৎ চৌধুরীর 'খেলার সাথী' এবং কাব্যসংগীত পর্যায়ে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পূর্বা দামের নাম প্রধানত উল্লেখযোগ্য। খুবই সুন্দর গেয়েছেন এ'রা। এ ছাড়া সেদিন অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অদিতি সেনগুপ্ত, অরবিন্দ বিশ্বাস, সন্তোষ সেনগুপ্ত, চিত্রলেখা চৌধুরী। কিন্তু এ'দের কারো গানেই যেন ঠিক প্রাণের স্পর্শটুকু পাওয়া গেল না, যেটি রবীন্দ্রসংগীতের রসনির্মিতিতে অপরিহার্য।

তিনদিনই 'বেদগান' গেয়ে অধিবেশনের শুরু করেছেন ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তনের শিল্পীগোষ্ঠী। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনা, আগেই বলা হয়েছে, সুন্দর। এক-একটি পর্যায়ের আসরের প্রত্যেক শিল্পীর সর্বক্ষণ মঞ্চ উপস্থিতি, দুটি দিলরুবা এবং একটি বেহালা-সহ সুপরিমিত যন্ত্রানুষংগ—এই সবই সুষ্ঠু আয়োজনের প্রশংসনীয় নিদর্শন। শিল্পীদের হারমনিয়ম বাজানো নিষিদ্ধ ছিল—এ-ও এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এর সংগে যদি হাতে স্বরলিপি বা গানের বই রাখাও নিষিদ্ধ হোতো, তাহলে বোধহয় ও'দের গান আরও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারত। অনেক প্রতিষ্ঠিত নামী শিল্পীও রবীন্দ্রনাথের একখানা গানও মর্মে গেঁথে নিতে পারেন নি, এটা দুঃখজনক নয় কি?

—আনন্দবর্ধন

ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তনের অনুষ্ঠান

এ-দেশের সংগীতরসজ্ঞদের কাছে, বিশেষত যারা রবীন্দ্র সংগীতানুরাগী তাঁদের কাছে, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয়া। তাঁরই অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ও উৎসাহে রবীন্দ্র সংগীতের ভাণ্ডার একদা কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল, এ-কথা কারো অবিদিত থাকবার কথা নয়। অথচ আশ্চর্য, গত ২৯শে ডিসেম্বর, '৭৩ তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি দিবসটি কী অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে চলে যেতো, যদি সেদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়াম মঞ্চে ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন একটি অনাড়ম্বর, অথচ আন্তরিকতায় উজ্জ্বল, সংক্ষিপ্ত অথচ নিবিড় রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ অনুষ্ঠানটির আয়োজন না করতেন।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী নিজেও সারা-জীবন এমনভাবে সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ডের আড়ালেই অবস্থান করতেন। নিঃশব্দে, নীরবে তাঁর কর্মস্রোত প্রবাহিত হ'ত। তাঁর চরিত্রের নানা দিকের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটির কথা বিশেষত বললেন সেদিনকার তিনজন বক্তার অন্যতম প্রবীণ বক্তা পবিত্রকুমার গংগোপাধ্যায়। অপর দুই বক্তা, হিরণকুমার সান্যাল এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদার স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে ইন্দিরা দেবীর মহত্বের কয়েকটি দিক উদ্ভাসিত করে তুললেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তনের শিল্পিগোষ্ঠী ইন্দিরা দেবী রচিত ও সুরারোপিত কয়েকটি গান একক কণ্ঠে এবং সম্মেলকভাবে পরিবেষণ করলেন। তিনটি সম্মেলক-গান, 'জীবন বহে যায়', 'আজি স্মরণে' এবং 'আয় বীণা কোলে আয় আমার', ইন্দিরা দেবীর অসামান্য সুরগ্রন্থনার পরিচয় বহন করে। গানগুলি শিল্পীদের সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অভিব্যক্তিময় পরিবেষণার গুণেও বিশেষ-ভাবে মনোজ্ঞ হয়েছিল। তবে সেদিন পুরুষদের কণ্ঠে যে পরিচ্ছন্ন সংগীত ছিল, স্ত্রী-কণ্ঠ তেমন পরিশীলিত মনে হল না। 'তাঁরে রেখো রেখো তব পায়'—গানটি এই জন্যই প্রার্থিত মানে পৌঁছতে পারেনি। চারটি একক গানের মধ্যে প্রসূন দাশগুপ্তের 'এই তো জীবন' এবং সুপূর্ণা চৌধুরীর 'বুঝিতে পারি নে প্রভু' সু-গীত। সংগীতানুষংগও যথাযথ।

—আনন্দবর্ধন

রবীন্দ্রসদনে শিশু উৎসব

রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত তিনদিনের শিশু উৎসব তিনটি মধুর সন্ধ্যার স্মৃতি হয়ে থাকবার মত। তিনদিনের অনুষ্ঠান সূচীতে ছিল নাট্যায়নের 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', মল্লারের 'আবোল তাবোল' ও শিশুরঙ্গনের 'আমার নাম টায়রা'। ওই তিনটি অনুষ্ঠানের আগে চারজন শিশু শিল্পীর নাচের ও গানের ব্যবস্থাও চমৎকার। কুমারী মিতা বালসুব্রহ্মনিয়ম, কুমারী শুভ্রা ঘোষ ও শুক্লা ঘোষ এবং কুমারী বুলা ভট্টাচার্যের অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে।

'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর কাহিনী সকলেরই জানা। নাট্যায়ন-এর প্রযোজনাও সকলকে খুশি করবার মতো। মূল রচনার স্বাদ ও মজা অনেকখানিই এই প্রযোজনায় পাওয়া গেছে।

মল্লারের 'আবোল তাবোল' সম্পর্কে ইতিপূর্বে এই বিভাগে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এবার দেখে খুশি হলাম যে, পূর্বেকার কিছু ত্রুটি তাঁরা সংশোধন করে নিয়েছেন। বিশেষ করে দাদুর দল যে ঘন ঘন মঞ্চে আসেনি এটাই রসবিস্তারের পক্ষে বেশি সহায়ক হয়েছে। গংগারামের প্রসঙ্গটা নতুন সংযোজন। উপস্থাপনা মন্দ নয়।

ছোটদের উপযোগী নাচ ও নাটক প্রযোজনায় শিশুরঙ্গনের খ্যাতি অনেক-দিনের। তাঁদের নতুন প্রযোজনা 'আমার নাম টায়রা' শৈলেন ঘোষের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হল। ছোটদের সংগে সংগে বড়রাও সবিস্ময়ে উপভোগ করেছেন এই কাহিনী ও তার উপস্থাপনাকে। অভিনয়, সংগীত এবং খুদে খুদে শিল্পীদের দলবদ্ধ অভিনয় সংহতি সব মিলে এটি একটি চমৎকার প্রযোজনা।

নাট্য সমালোচক

কেদার রায়

দেবসনসে রিক্রিয়েশন ইউনিটের ষষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা 'কেদার রায়' দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, ইতিপূর্বে তাঁরা পাঁচবার মঞ্চ নেমেছেন। সরলা রায় মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহের মাঝামাঝি জায়গায় বসেও অধিকাংশ পুরুষ শিল্পীর সংলাপ কেন যে শ্রুত হল না, (কাল্লু সর্দার, শ্রীমন্ত ও কেদার রায় ব্যতিক্রম) কেনই বা স্মারকের উচ্চকণ্ঠ আগাগোড়া আমাদের শুনতে হল সে সব প্রশ্ন বোধ করি অবান্তর। অভিনয়ের প্রাথমিক শর্ত সংলাপ মুখস্থ রাখা, এ ব্যাপারে শিল্পীর অবহেলা কষ্টদায়ক নয় কি?

সামগ্রিক অভিনয় নিতান্তই সাধারণ পর্যায়ের। সুখেন্দু রায় (কেদার রায়), অনিল সিংহ (চাঁদ রায়), সুজিত সেন (শ্রীমন্ত) ও বিজয় ভট্টাচার্য (কাল্লু সর্দার) চেষ্টা করেছেন নাটকে গতি সঞ্চারের। দু একটি নাট্য মুহূর্তও গড়ে তুলতে পেরেছেন। কিন্তু অন্য শিল্পীদের কেউই তেমন উল্লেখযোগ্য অভিনয় করতে পারেন নি। ব্যক্তিত্বহীন ঈশা খাঁ এবং মানসিংহকে দেখে বরং করুণাই হয়। কার্ভালো বেশে সৌরেন নাগকে মানিয়েছিল চমৎকার, ভঙ্গিমাও মন্দ নয়, তবুও চেহারা আর ভঙ্গি দিয়ে তিনি কার্ভালোকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। প্রথম দর্শনেই তিনি নিজের নাম বলবার আগে পাঁচবার ও পরে তিনবার একইভাবে হাঃ হাঃ হাঃ করে কেন যে হাসলেন কে জানে! মহিলা শিল্পীরা সকলেই চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণী অধিকারী, হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চক্রবর্তী। নির্দেশনা: সত্যেন গংগোপাধ্যায়ের।

নাট্য সমালোচক

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। জাতির উদ্দেশে তিনি বলেন : মজুতদার, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়াই সরকারের কর্তব্য। দেশের সকল অঞ্চলে এই কাজে সরকারকে সাহায্য করার জন্য তিনি 'সজাগ জনমতের নির্ভরযোগ্য সংস্থা' গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যখন আমরা দেখি দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ লোক এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে, তখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের কাজ ও সাফল্য পর্যাপ্ত নয়। এই সংগে রাষ্ট্রপতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শৃংখলাবদ্ধ আচরণ। আন্দোলন, অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তুলবে। শ্রীগিরি বলেন : ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির ফলে দুঃখ-দুর্দশা চরমে উঠেছে। এর মোকাবিলার জন্য তিনি সকল রাজ্য একই ধরনের সংগ্রহনীতি গ্রহণের এবং দক্ষ বণ্টন ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। উৎপাদন বাড়াতে ও শিল্পকে সচল রাখতে তিনি পুনরায় আপনা থেকেই এক বছরের জন্য ধর্মঘট ও লক-আউট স্থগিত রাখার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি দেশের সম্পদশালীদের প্রতি আবেদন জানান, তাঁরা যেন হৃদয়ংগম করেন যে, তাঁদের যা আছে অন্যদের সংগে ভাগ করে তা ভোগ করা উচিত। তিনি বলেন যে, শান্তির ক্ষেত্রে ভারতের অবদান ও রাজনৈতিক বিজ্ঞতার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন ভারতকে শ্রদ্ধা করে। আমাদের জনগণ দেখিয়েছেন যে, জরুরী প্রয়োজনে আমরা সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এক জাতি এক প্রাণ হয়ে দাঁড়াতে পারি। আজকের এই সংকটেও চাই সেই ঐক্য, সেই সংকল্প। আসুন আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই ভারত গঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করি। রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার পর ভারত যে বৈষয়িক উন্নতি করেছে বিশ্বের অনেক দেশ তার প্রশংসা করেছে।

দেশী সংবাদ

২১ জানুয়ারি—জীবনবীমা করপোরেশনের পলিসি হোলডারদের প্রতি কর্তব্য তথা দায়দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। এল আই সি এমন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান যেখানে পলিসি ম্যাচিওর হওয়ার পর জুতার সুকতলি ক্ষয় করেও অনেকের পক্ষে দাবির টাকা দীর্ঘকাল ধরে আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

অবশেষে পোড়া ব্যাংক বাড়ির ধ্বংসস্তূপে দুটি মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া গিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় একটি গলিত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আর একটিও উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। মনে করা হচ্ছে, নিখোঁজ সেই দুটি অফিসারেরই মৃতদেহ এ দুটি।

২২ জানুয়ারি—কেন্দ্রীয় যোজনা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া পশ্চিমবংগের একজন এম পি-কে সম্প্রতি লিখেছেন : সুন্দরবনের মোহনা এলাকায় মাছ ধরার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলাম। আপনাদের রাইটার্স বিল্ডিং দেড় লক্ষ টাকা খরচ করতে পেরেছেন। বাকি টাকা ফেরত যাবে। গয়ং গচ্ছ ভাব কাটিয়ে উঠে রাজ্য সরকারকে একটু দ্রুত কাজকর্ম করতে বলুন।

আনন্দবাজার পরিচালিত 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত আজ (২২ জানুয়ারি) রাত্রে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। তিনি দীর্ঘকাল ধরে হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। তিনি বৃদ্ধা মাতা ও একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেখে গিয়েছেন।

২৩ জানুয়ারি—কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবংগ সরকার কর্তৃক চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের [illegible] পরিচালনা ভার গ্রহণের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন এবং একমা এককালীন ও বার্ষিক খাতে যে এক কোটি টাকার প্রয়োজন হবে তাও রাজ্য সরকারকে দিতে রাজি হয়েছেন।

২৪ জানুয়ারি—আগামী ২৬ জানুয়ারিতে উদ্বাস্তুদের বাস্তু জমির স্বত্বাধিকার দান সম্পর্কে পশ্চিমবাংলা সরকারের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র অনুমোদন করেছেন। জানা গিয়েছে, এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়কে কেন্দ্র তার সবুজ সংকেত জানিয়েছেন। দেশ বিভাগের পর থেকে কলকাতা শহরতলি এলাকায় প্রায় ১৪৩টি কলোনীতে উদ্বাস্তুরা বাড়িঘর করে বসবাস করছেন।

কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তর এখন পুরো পুলিশের জিম্মায়। আজ বিকাল পৌনে পাঁচটায় পুরবাড়ির সব দরজা জানালা গেট খোলা ও অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে বেয়ারা পিওন জমাদাররা চাবি নিয়ে চলে গিয়েছেন। একজন ইউনিয়ন নেতাকে সাসপেনড ও আর একজন নেতাকে 'শো-কজ' নোটিশ জারির সংগে সংগেই এই প্রতিক্রিয়া। নিরুপায় পুর কর্তারা শেষে পুর সদর দফতর রক্ষার ভার তুলে দিয়েছেন পুলিশের হাতে।

২৫ জানুয়ারি—আজ গুজরাট বনধ-এর দিন আমেদাবাদ শহর কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। স্থানে স্থানে মারমুখী জনতার সংগে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়। আমেদাবাদ, দেহগাম, লুনাওয়াদ ও গোধরায় পুলিশের গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত ও ১০ জন আহত হন। এই নিয়ে গুজরাটের খাদ্য দাঙ্গায় ৩০ জন মারা গেলেন গুজরাট বনধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে হিংসাজর্জরিত সারা গুজরাটে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় বোমবাইয়ের বুকে কোর্ট এলাকায় শিবসেনার তাণ্ডবে ত্রাসের সঞ্চার হয়। শিবসেনারা দোকান লুট করে, গাড়ি ভাংগে, পাথর ছোড়ে এবং মারদাংগা করে। ছুরিকাঘাতে একজন মারা গিয়েছে এবং বারোজন আহত হয়েছে। শিবসেনারা এক সমাবেশ থেকে ফিরছিল। ওই সমাবেশে দাবি জানান হয় যে, রাষ্ট্রীকৃত একটি ব্যাংকে করনিকের চাকরিতে শতকরা ৮০ জন মারাঠাভাষী নিতে হবে।

২৬ জানুয়ারি—ভেঙে পড়া আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতিকে সামাল দিতে আজ গভীর রাতে আমেদাবাদের রাস্তায় সৈন্য নামান হয়েছে। এর আগেই শহরে আবার তাণ্ডব দেখা দেয়। পুলিস গুলি চালায়। মারা যায় ১০ বছরের একটি ছেলে। আহত হয় আরও একজন। আজ ব্রোচ জেলার রাজ পিপলাতেও একজন মারা গেছে। সেখানে আহতের সংখ্যা চার।

বিদেশী সংবাদ

২১ জানুয়ারি—আজ লনডন বাজারে সোনার বাজার হঠাৎ আগুন হয়ে যায়। প্রতি আউনসের দাম ১১ ডলার ৭৫ সেনট (প্রায় ৮৮ টাকা) বেড়ে দাঁড়ায় ১৪১ ডলার ৭৫ সেনটে। (প্রায় ১০৬৩ টাকা)। এর মূলে কারণ—লোকে আর কাগজের টাকার উপর আস্থা রাখতে পারছে না। সোনার ব্যবসায়ীরা একথা বলেন।

২২ জানুয়ারি—গত শনিবার পিকিং-এ ৫ জন রুশ কূটনীতিকদের বহিষ্কারের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সোভিয়েট পুলিশ গতকাল সাইবেরিয়ার ইকুটসক শহরে একজন চীনা কূটনীতিককে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' ঘোষণা করে বহিষ্কার করা হয়েছে।

২৩ জানুয়ারি—গত সপ্তাহে পিকিংয়ের রুশ দূতাবাসের তিনজন কূটনীতিককে বহিষ্কারের যে ঘটনা তা আজ চীনের সিনহুয়া সংবাদ সংস্থা প্রকাশ করেছে। তা বিশদ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। এ ব্যাপারে যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের একজন চীনা এজেন্ট। নাম লি হুং শু। অপরজন এরই বন্ধু, নাম জানা যায়নি।

২৪ জানুয়ারি—১৮৪০ সালে ইংল্যানডের রাণী ভিকটোরিয়ার বিয়ে উপলক্ষে একটি কেক তৈরি হয়েছিল, তারই এক টুকরো লনডনে বিক্রি হলো প্রায় ১৯২৫ টাকায়। কেক অবশ্য এখন আর খাওয়ার মত অবস্থায় নেই। যে বাকসে কেকটি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, সে বাকসটি এখনও অক্ষত। তার উপর লেখা রাণীর বিয়ের কেক—বাকিংহাম প্যালেস, ১০ ফেবরুআরি ১৮৪০। তাসমানিয়ার একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এই কেকটি কিনেছেন।

২৫ জানুয়ারি—মসকোর প্রধান রাস্তায় সোলঝেনিৎসিনকে দেশদ্রোহী হিসাবে দেখিয়ে একটি পোসটার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে সোভিয়েট বিরোধীরা সোলঝেনিৎসিনের রচনাগুলি দিয়ে একটি পতাকা তৈরি করেছে। এই পোসটারটি তিন মিটার উঁচু এবং দু মিটার চওড়া। গোর্কি স্ট্রীটে এই পোসটারটি টাঙান হয়েছে।

২৬ জানুয়ারি—গত পরশুদিন ময়মনসিং জেলার শান্তিপুরে যাত্রী বোঝাই একটি বাস রাস্তা থেকে পিছলে খানায় পড়ে আগুনে ধরে যায়। তাতে অন্তত ২৫ জন পুড়ে মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন ৭ জন। বাস চালক পালিয়ে গিয়েছে। একজন মহিলা যাত্রী ও তার দুটি সন্তান বেঁচে গিয়েছে। মৃতদের সনাক্ত করা যাচ্ছে না।

মিনাডেক্স সুস্থ রক্ত, মজবুত হাড়, ও ভালো দৃষ্টির জন্যে!

দেশ

॥ উপন্যাস ও গল্প ॥

- **অগ্নিপরীক্ষা**—আশাপূর্ণা দেবী ৪্
- **অজানা**—মহাশ্বেতা দেবী ৪||০
- **অনুবর্তন**—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬্
- **অনেক আগে অনেক দূরে**—প্রমথনাথ বিশী ৪||০
- **অন্নপূর্ণার মন্দির**—নিরুপমা দেবী ৪||০
- **অপরাজিত**—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২্
- **অভিযান**—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭্
- **অমৃত কন্যা**—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪্
- **অরণ্য**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬||০
- **অলকাতিলকা**—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৫্
- **অশান্ত ঘূর্ণি**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৮্
- **অস্তি ভাগীরথী তীরে**— ঐ ৭||০
- **আঁকাবাঁকা**—প্রবোধকুমার সান্যাল ৫||০
- **আঁধার মানিক**—মহাশ্বেতা দেবী ১২||০
- **আঁধি**—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮্
- **আগ্নেয়গিরি**—প্রবোধকুমার সান্যাল ২||০
- **আদর্শ হিন্দু হোটেল**—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬্
- **আবছায়া**—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৪্
- **আমি কান পেতে রই**—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ১৪্
- **আর কোনোখানে**—লীলা মজুমদার ৫||০
- **আরণ্যক**—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭||০
- **আর এক সাবিত্রী**—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৫্
- **আলোর অরণ্য**—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭্
- **আসামী হাজির (১ম)**—বিমল মিত্র ১৫্
- **আসামী হাজির (২য়)**— ঐ ১৫্
- **ইছামতী**—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯্
- **ইন্দ্রাণী**—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩্
- **ঈশ্বরের আবাস**—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৬্
- **উত্তরকাল**—প্রবোধকুমার সান্যাল ৫্
- **উত্তরফাল্গুনী**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৭্
- **উত্তরায়ণ**—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ৫||০
- **উদ্ধারণপুরের** [illegible] বধূত ৬্
- **উনিশশো একাত্তর**—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬||০
- **উপকণ্ঠে**—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ১০্
- **উপকূল**—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৩্
- **উপচ্ছায়া**—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৫্
- **উড়োপাখি**—আশাপূর্ণা দেবী ৬্
- **একই পথের দুই প্রান্তে**—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৪্
- **একক দশক শতক**—বিমল মিত্র ১৮্
- **এক চামচ গঙ্গা**—প্রবোধকুমার সান্যাল ৪্
- **একদা কী করিয়া**—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ১৩্
- **এক প্রহরের খেলা**—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৫্
- **এবার ফেরাও**—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৫্
- **একাঘ্নী**—অবধূত ৪||০

॥ উপন্যাস ও গল্প ॥

- **ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা**—সুমথনাথ ঘোষ ৫্
- **ওরা বড় হয়ে গেল**—আশাপূর্ণা দেবী ৫্
- **কন্যাকুমারী**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬||০
- **কবি**—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬||০
- **কড়ি দিয়ে কিনলাম (১ম)**—বিমল মিত্র ২০্
- **কড়ি দিয়ে কিনলাম (২য়)**— ঐ ১৮্
- **কলকাতার কাছেই**—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৯্
- **কলঙ্ক কথা**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬||০
- **কলকাতা থেকে বলছি**—বিমল মিত্র ৬||০
- **কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৮্
- **কাজললতা**— ঐ ৬||০
- **কান পেতে শুনি**—প্রশান্ত চৌধুরী ৫্
- **কাল, তুমি আলেয়া**—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১১||০
- **কান্নাহীনের কাহিনী**—নবেন্দু ঘোষ ৫্
- **কালিন্দী**—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০্
- **কালো হাত**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬||০
- **কালো ভ্রমর (১।২)**—ঐ ৭||০
- **কালো ভ্রমর (৩।৪)**—ঐ ৬||০
- **ক্লান্ত বিহঙ্গী**—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১১্
- **কিন্নর দল**—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]
- **কিন্নরী**—প্রফুল্ল রায় [illegible]
- **কুমারী ব্রত**—বিমল মিত্র ৫্
- **কুশল পাহাড়ী**—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫্
- **কেরীসাহেবের মুন্সী**—প্রমথনাথ বিশী ১২্
- **কোমল গান্ধার (১ম)**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৮্
- **কোমল গান্ধার (২য়)**— ঐ ৭্
- **গন্নাবেগম**—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৯্
- **গল্প পঞ্চাশৎ**—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৯্
- **গল্প পঞ্চাশৎ**—মনোজ বসু ১০্
- **গোধূলি রঙীন**—প্রশান্ত চৌধুরী ৫্
- **ঘুম নেই**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৫||০
- **চন্দনবাঈ**—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৫||০
- **চলাচল**—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৭্
- **চিরকুমারী সভা**—নকুল চট্টোপাধ্যায় ৪্
- **ছবি** — জরাসন্ধ ৪্
- **ছায়াতীর**— ঐ ৫||০
- **ছায়ামিছিল**—দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য্য ৬্
- **ছিন্নপত্র**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৫||০
- **জলকল্লোল**—প্রবোধকুমার সান্যাল ৫||০
- **জায়া ও জননী**—সুমথনাথ ঘোষ ৫্
- **জটিলতা**— ঐ ২৸০
- **জন্মেছি এই দেশে**—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৪||০
- **জ্যোতিঃহারা**—অনুরূপা দেবী ৭্
- **জ্যোতিষী**—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৩||০

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ ; ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

সূচীপত্র

এ শুধু শ্যাম্পু নয়, এ এক সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রসাধন—
আরো নির্মল, আরো সুস্থ, আরো ঝলমলে চুলের জন্যে।

হেলীন কার্টিস. কেশ পরিচর্য্যায় জগতে সবার আগে; তৈরী করেছেন—বিশুদ্ধ শিকাকাই. বিশেষ বিশেষ ভেষজাদি. আমলা আর আমীর নির্য্যাস মিশিয়ে—এক অতি সফেন সুগন্ধিত শ্যাম্পু।

পুরোনো ধারণা আর আধুনিক সুবিধের সংমিশ্রণে টিয়ারা শিকাকাই হার্ব শ্যাম্পু

হয়ে উঠেছে এক অভূতপূর্ব হেয়ার কণ্ডিশনার। আপনার চুলের স্বাভাবিক তেলাভাব নষ্ট করে না। এক বারেই এর প্রচুর ফেনা সব ধুয়ে ফেলে চুলে আনে উজ্জ্বল স্বাস্থ্য!

আজই কিনুন-উপভোগ করুন এই সমৃদ্ধ নতুন টিয়ারা শিকাকাই হার্ব শ্যাম্পু।

ভারতে প্রস্তুতকারী : জে. কে. হেলীন কার্টিস লি., বোম্বাই-১

ARMS-HC-049-144 BEN

সূচীপত্র

আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর...
বিনাকা কোল্ড ক্রীম তখন
সেই স্বপ্নকে সত্যি করে
তোলার জন্যে আপনার ত্বকের
গভীরে কাজে ব্যস্ত!
CIBA
CIBA
রোজকার মত সে রাতেও বিনাকা কোল্ড ক্রীম দিয়ে আমার মুখ পরিষ্কার করলাম, কারণ এ ত্বকের গভীরে পৌঁছে লুকোনো ময়লা বার করে আনে। ঘুমোনোর আগে আরেকটু মাখলাম।
মুখখানা এমন স্নিগ্ধ আর পরিষ্কার অনুভব করলাম যে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো— গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম।
স্বপ্ন দেখলাম এক অন্তহীন কালো সাগরের ওপর দিয়ে চলেছি আমি... তুষার শুভ্র চাঁদ আমার দিকে এগিয়ে এলো...কাছে থেকে আরো কাছে...
তারপর সে চাঁদ—হয়ে গেল এক মহাকাশযান। দরজা খুলে আমার দিকে এগিয়ে এলো এক দেবকান্তি পুরুষ...
আমাকে সে টেনে নিলো তার যানে। আমার মুখখানা দুহাতে ধরে বললে, "আজ পর্যন্ত বহু সুন্দরী দেখেছি... তুমি তার মধ্যে সেরা সুন্দরী।"
ঘুম ভেঙে নিজেই দেখলাম— আমার ত্বক সত্যিই শিশির-কোমল মোলায়েম হয়ে উঠেছে। শুধু স্বপ্ন নয়— আমি সত্যিই সুন্দরী।

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীর দত্তগুপ্ত

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৬

শনিবার ৪ ফাল্গুন ১৩৮০

Saturday 16 February 1974

বাক্-স্বাধীনতা

গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যতটা মূল্য সাধারণের বাক-স্বাধীনতারও মূল্য ততটা। একটাকে স্বীকার এবং অন্যটাকে অস্বীকার করা যায় না; বরং প্রথমটাকে মেনে নিলে দ্বিতীয়টা তার পরিপূরক হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে অনেক সময় এই সাধারণ নিয়মটিকে অগ্রাহ্য করা হয়। বলে রাখা ভাল, পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে পুরোপুরি বাক-স্বাধীনতা রয়েছে তাও হয়ত নয়. সেনসর ও আইনের খড়্গ সর্বত্রই- তবু এ-দেশে আমরা কখনও সরকারী, কখনও আদালতের কখনও জনসাধারণের উষ্মার কাছে যে ধরনের লিখিত ও অলিখিত বিধি-নিষেধের কবলে পড়ি অন্যত্র তা কদাচিৎ দেখা যায়। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নিক্সনকে নিয়ে যত সমালোচনা, কেচ্ছা এমনকি তাঁকে উপলক্ষ করে প্রায় তাঁরই ছবি মলাটে ছেপে যে ধরনের তীব্র আক্রমণাত্মক বই লেখা হয়েছে—যেমন ফিলিপ রথ-এর 'আওআর গ্যাঙ্'—তার জন্যে সেখানকার কোনো সাংবাদিক বা লেখককে অভিযুক্ত হতে হয় নি। এখানের দৃষ্টান্ত অন্যরকম। যেমন সম্প্রতি শ্রীবলরাজ পুরির ঘটনা। শ্রীপুরির একটি প্রবন্ধের জন্যে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। লেখাটি জম্মু ও কাশ্মীর প্রসঙ্গে। শ্রীপুরি একা এই রচনাটির লেখক নন, তাঁর সহযোগী লেখক হিসেবে রয়েছেন শ্রীশামিন আহ্-মেদ শামিন। রচনাটি পড়লে বোঝা যায় জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাসকে বিকৃত করা অথবা সেখানকার জনসাধারণের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কিছু উদ্ধৃতি—যা বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে নানাভাবে, নানাজনের মুখে বা লেখায় —সেই উদ্ধৃতিই কি অপরাধযোগ্য বলে বিবেচিত হল? কেন এই গ্রেপ্তার? শ্রীপুরি নিজে বলেছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করার তিনটি কারণের কথা তিনি শুনেছেন। প্রথম কারণ, এই লেখার মধ্যে তিনি নাকি জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের এমনই সম্মানহানিকর বিবরণাদি দিয়েছেন যাতে সাধারণ মানুষ ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর লেখা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করার প্ররোচনা জোগাচ্ছে। তৃতীয় কারণ, ক্রুদ্ধ জনসাধারণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সরকার শ্রীপুরিকে গ্রেপ্তার করে আগলে রেখেছেন। এই তিনটি কারণের মধ্যে দ্বিতীয়টি পুলিসের আনীত অভিযোগ। ভারতীয় পেনাল কোডের ১৫৩ ক ধারা অনুযায়ী তিনি অভিযুক্ত। আইনসঙ্গতভাবে এই অভিযোগেই শ্রীপুরির বিচার হতে বাধ্য; অন্য অভিযোগ দুটির কোনো আইনত ভিত্তি নেই। আশ্চর্যের কথা, শ্রীপুরি অর্বাচীন সাংবাদিক বা অখ্যাত-নাম ব্যক্তি নন, তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চিন্তা বা মতামত সরকারের কাছে গোপন থাকার কথা নয়। সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির প্ররোচনা দেবার যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে—তিনি যে সে অভিযোগের ঊর্ধ্বে একথা অনেকেরই জানা। বরং সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্যে এবং জম্মু কাশ্মীরের উন্নতির জন্যে তিনি দীর্ঘকাল আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। খুবই দুঃখের কথা, যিনি নিজে ডোগরা, যিনি জম্মু কাশ্মীরের জনসাধারণের জন্যে অক্লান্ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, আজ কিছু অসহিষ্ণু লোকের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে তিনি রাজদ্বারে বিচারের জন্যে অভিযুক্ত।

ভারতীয় পেনাল কোডের ১৫৩ ক ধারাটি ভয়াবহ। এই ধারার সবিস্তার ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই, তবে এই ধারার সঙ্কোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা অসীম। সন্দেহ হয়, এই ধারাতে, বোধ হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন পর্যন্ত পান না। অন্তত শ্রীপুরিকে জামিন দেবার ব্যাপারে পুলিস ঘোরতর আপত্তি তুলেছে।

শ্রীপুরি যে-অভিযোগে অভিযুক্ত, এখনও তার বিচার হয় নি। বিচারাধীন বিষয়ে কোনো মন্তব্য আইনগতভাবে আপত্তিকর। স্বভাবতই প্রসঙ্গটির আলোচনা আপাতত নিষিদ্ধ। কিন্তু যেভাবে এই ধারাটি শ্রীপুরির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে আশঙ্কার কারণ রয়েছে। ভারতীয় জনসাধারণ যে যথেষ্ট সহিষ্ণু তার প্রমাণ বিশেষ পাওয়া যায় না। ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে গোঁড়ামি, এলাকা হিসেবে নিজের নিজের অঞ্চলের ঐতিহাসিক কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি যুক্তিহীন শ্রদ্ধা বীর-পূজা এবং আরও বহুবিধ কারণে আমাদের মাত্রাতিরিক্ত অসহিষ্ণু হতে দেখা যায়। শিক্ষা এবং চিন্তাশক্তির দীনতার জন্যে সাধারণের গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা হয়ত থেকে গেছে এ-দেশে। তবু অসহিষ্ণুতা কোনো মতেই সমর্থনীয় নয়। যদি সরকার মনে করেন, কিছু অসহিষ্ণু লোক উৎপাত করছে বলেই কোনো সৎ সমালোচনা গ্রাহ্য হবে না—তবে তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না। সমালোচনা যদি বিদ্বেষপ্রসূত না হয়, তবে তা সহ্য করার স্বাভাবিক উদারতা সাধারণের কেন থাকবে না? আশঙ্কা হয়, স্বাধীন চিন্তার মূল্য যদি খর্ব করার ছল সরকার খুঁজতে শুরু করেন তবে অচিরেই আমরা এক দুঃসময়ের মধ্যে গিয়ে পড়ব, যা যে কোনো সুস্থ বুদ্ধির মানুষকে শ্বাসরুদ্ধ করে তুলবে। সমালোচনা যদি শাস্তির কারণ হয় তবে মূর্খের স্বর্গে বসবাসই হবে আমাদের অদৃষ্ট।

ঠেলো, হে, ঠেলো!
তেল সঙ্কটের কথা
তুমি কিছু শোনো নি?
পঞ্চম যোজনা
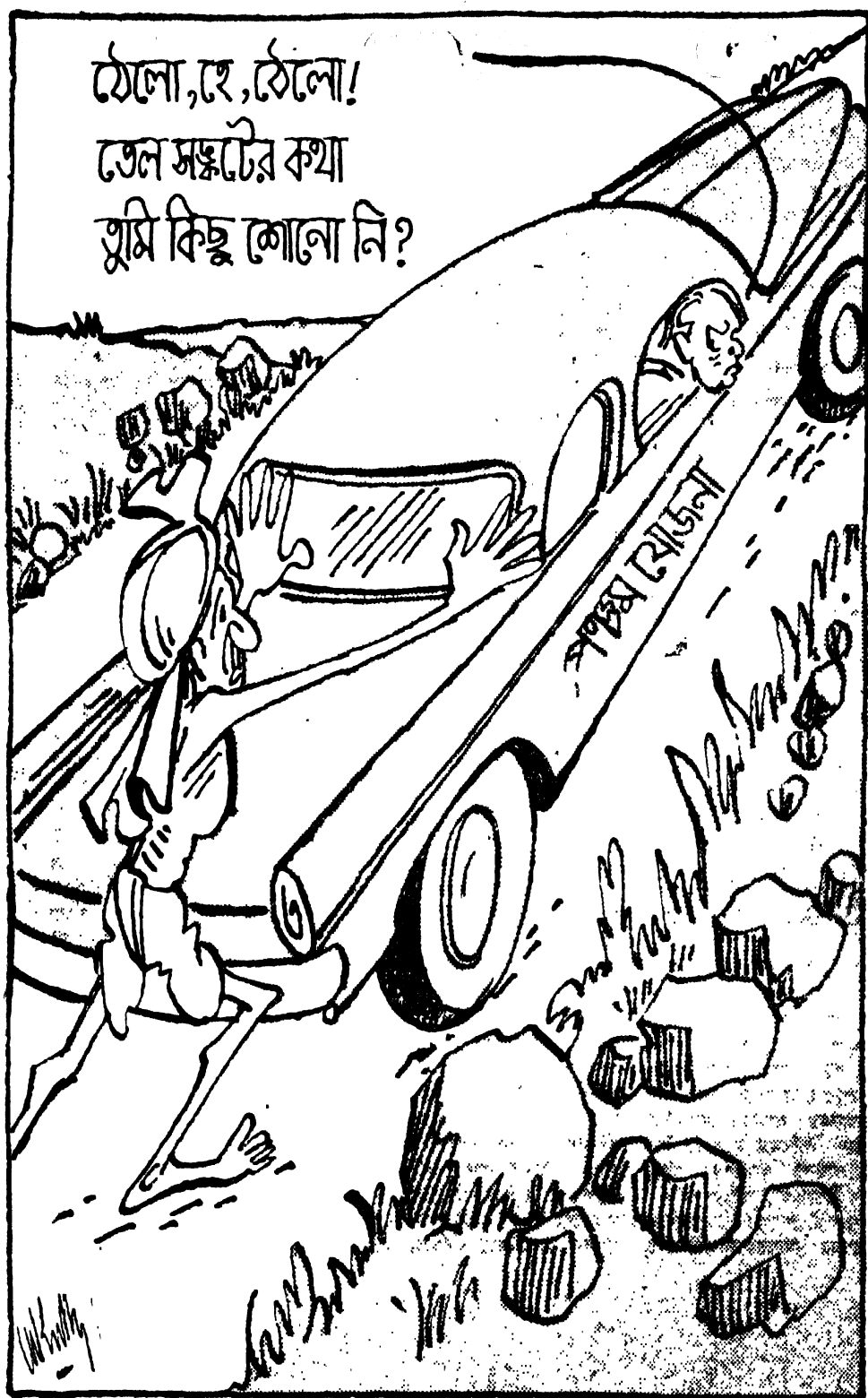
পি ডি এ কি টিঁকবে?

বিশ্বনাথ মুখার্জি কংগ্রেস-সি পি আই জোট প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোরচা বা পি ডি এ-র উপনেতা-পদ ছেড়ে দিয়েছেন। নির্বাচনের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে এই দুই দলের সম্পর্ক খুব ভাল যাচ্ছিল না। বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে মোরচার দুই শরিকের তিক্ততা ক্রমেই বাড়ছিল। সরকারী বা রাজনৈতিক কোনও কাজকর্মেই পি ডি এ-র তেমন কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কখনও বন্ধ্ করা নিয়ে, কখনও বা ধানচাল সংগ্রহ নিয়ে দুই দলের ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছিল। বিশ্বনাথবাবু পি ডি এ-র উপনেতা-পদ ছেড়ে দেবেন এমন কথাও বেশ কিছু দিন যাবৎই শোনা যাচ্ছিল।

চূড়ান্ত ঘটনা চটকল ধর্মঘট নিয়ে।

চটকল ধর্মঘটে সি পি আই রাজ্যের অন্যান্য বামপন্থীর সঙ্গে। আর, কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার ঠিক তার বিরুদ্ধে। ৭২ সালের নির্বাচনের পর আর কোনও ঘটনা নিয়ে পি ডি এ-এর দুই শরিক ঠিক এভাবে দুই শিবিরে গিয়ে দাঁড়াননি। ৭২ সালের পর এই প্রথম একটা বড় আন্দোলনে সি পি আই পুরোপুরি সরকার-বিরোধী জোটের সঙ্গে। সি পি আই-ও এই ব্যাপারে সি পি এম, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি বা এস ইউ সি-র মতই সরকার-বিরোধী। ওদেরই মত সি পি আই-এরও বক্তব্যঃ রাজ্য সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থে চটকল মজদুরদের ধর্মঘট ভাঙবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। " রাজ্য সরকারের ভূমিকা ন্যক্কারজনক।

সি পি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ বলেছেনঃ সরকারের এই শ্রমিক-বিরোধী এবং মালিক-ঘেঁষা নীতির প্রতিবাদেই বিশ্বনাথবাবুর পদত্যাগ।

বিশ্বনাথবাবু পি ডি এ-র উপনেতা-পদ ছেড়েছেন মানে অবশ্য এই নয় যে, সি পি আই পি ডি এ থেকে বেরিয়ে এসেছে। যেদিন বিশ্বনাথবাবুর পদত্যাগের খবর প্রকাশ করা হয়েছে, সেইদিনই পার্টির অন্যতম নেতা ভূপেশ গুপ্ত বলেছেনঃ পি ডি এ অটুটই রইল। ওই দিনই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্রও তাই বলেছেন। তিনিও মনে করেন, বিশ্বনাথবাবুর পদত্যাগ মানেই পি ডি এ-র অবসান নয়।

❊

বিশ্বনাথবাবুর পদত্যাগের পরও পি ডি এ রইল ঠিকই, কিন্তু এভাবে পি ডি এ-কে সত্যিকারের বাঁচিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। বিশ্বনাথবাবু যখন পি ডি এ-র উপনেতা এবং যখন পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই ও কংগ্রেসের সম্পর্ক এত তিক্ত নয়, তখনই রাজ্য বিধানসভা বসলেই কংগ্রেস ও সি পি আই-এর সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে উঠত। পি ডি এ-র উপনেতা বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে পি ডি এ-র নেতা সিদ্ধার্থবাবুর বিধানসভার ভিতরেই বেশ কয়েকবার গরম কথা-কাটাকাটি হয়ে গিয়েছে। দু পক্ষেরই এম এল এ-রা এক অপরের তীব্র সমালোচনাও করেছেন অনেক দিন।

এবার বিধানসভা খুললে সেই অবস্থা আরও খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, বিশ্বনাথবাবুর নেতৃত্বে সি পি আই-এর যে গোষ্ঠী বর্তমান কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে চলার বিরোধী তাঁরা এবার বিধানসভায় আরও জোরালোভাবে কংগ্রেস সরকার-বিরোধী আক্রমণ চালাবেনই। আবার, কংগ্রেসের ভিতরের যে গোষ্ঠী কোনও দিনই সি পি আই-কে দেখতে পারেন না তাঁরাও বিধানসভাতেই নানাভাবে সি পি আই-কে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করবেনই। ফলে, পি ডি এ থাকলেও এবার বিধানসভায় প্রধান লড়াইটা হবে পি ডি এ-র দুই শরিক দলের মধ্যে।

বিশ্বনাথবাবুর পদত্যাগের পর সরকারী পর্যায়েও পি ডি এ-র দুই শরিকে বিরোধ বাড়তে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অধিকাংশই ঘোরতর কমিউনিস্ট-বিরোধী। তাঁরা সবাই সেই মনোভাব প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন না প্রধানত দলের নেতৃত্বের ভয়ে। দু' একজন, যেমন গফুর সাহেব আবেদিন, যাঁরা নেতৃত্বকে কম ভয় করেন, তাঁরা খোলাখুলিভাবেই কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করেন।

এবার এই নেতৃত্ব-ভীত গোষ্ঠীরও অনেকে আস্তে আস্তে প্রকাশ্য সি পি আই-বিরোধী ভূমিকা নেবেন। সরকারী কাজকর্মে সি পি আই-কে যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা দিয়ে চলার নীতি এঁরা এখন আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবেন।

এই ব্যাপারটা অর্থাৎ সরকারী পর্যায়ে কংগ্রেস-সি পি আই সম্পর্কটা অতঃপর আরও বেশী খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আর একটা কারণে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে সি পি আই এবার এ রাজ্যের কংগ্রেসী ও সরকারী নেতাদের মধ্যে তাঁদের প্রধান টার্গেট হিসাবে বেছে নিয়েছেন সিদ্ধার্থবাবুকে। বিশ্বনাথবাবুর পদত্যাগের প্রস্তাবে সি পি আই রাজ্য পরিষদ চটকল ধর্মঘটে 'রাজ্য সরকারের, বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রীর 'পুরোপুরি শ্রমিক-বিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থে' পরিচালিত ন্যক্কারজনক ভূমিকার' তীব্র নিন্দা করেছেন।

সি পি আই নেতারা খুব ভালভাবেই জানেন, চটকল ধর্মঘটে যে অনমনীয় সরকারী মনোভাব সেটা যতটা না সিদ্ধার্থবাবুর জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী প্রধানমন্ত্রীর জন্য। তবু তাঁরা সিদ্ধার্থবাবুকেই প্রধানত দায়ী করেছেন। এর প্রধান কারণ এই যে, সিদ্ধার্থবাবুর কাজকর্ম ও রাজনৈতিক কলা-কৌশল সি পি আই-এর তেমন পছন্দ নয়। তাঁদের বোধ হয় আরও ধারণা, কংগ্রেসের ভিতরে যেটা প্রগতিশীল অংশ সেটাকেও সিদ্ধার্থবাবুই তেমন বিকাশের সুযোগ দিচ্ছেন না।

কিন্তু সি পি আই-এর ধারণা যাই হোক, এখনও পর্যন্ত এ রাজ্যে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের অবিসংবাদী নেতা হলেন সিদ্ধার্থবাবু। প্রধানমন্ত্রী রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের এবং স্বয়ং সিদ্ধার্থবাবুকে বারংবার জানিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে নেতা পরিবর্তনের কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই।

এই অবস্থায় সি পি আই যত 'সিদ্ধার্থ রায়-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করবেন, রাজ্য সরকার এবং রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই-এর সম্পর্ক ততই তিক্ত হতে বাধ্য। কাশীকান্ত মৈত্রকে টার্গেট করা আর সিদ্ধার্থবাবুকে টার্গেট করা এক জিনিস নয়।

❊

যে রাজনৈতিক পটভূমিকায় পি ডি এ গঠিত হয়েছিল সে পরিস্থিতিও আজ নেই। ৭২ সালের নির্বাচনের আগে দু পার্টিরই ভয় ছিল যে, সি পি এম আবার ক্ষমতায় আসতে পারে। জাতীয় পর্যায়েও তখন দু পার্টির সম্পর্ক ভাল ছিল।

নির্বাচনের পর যখন কংগ্রেস রাজ্য বিধানসভায় বিরাট নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেল, তখন কংগ্রেস পার্টির লোকজনের কাছে পি ডি এ জোট অর্থাৎ সি পি আই-এর সঙ্গে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা একেবারে শূন্যে গিয়ে দাঁড়াল।

অন্যদিকে সি পি আই-এর বহু কর্মী এবং নেতাও মনে করলেন যে, সি পি এম-বিরোধী কংগ্রেসী ঐক্যের আর কোনও প্রয়োজন নেই; বরং শাসক দলের সঙ্গে থাকলে এবং কংগ্রেসের মত শাসক দলের কাজকর্ম সমর্থন করতে হলে পার্টি নানা অসুবিধায় পড়বে ও রাজ্যের মূল সরকার-বিরোধী জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই, তাঁরাও চাপ দিতে আরম্ভ করলেন।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পি ডি এ-কে বাঁচিয়ে রাখা দুই দলের ঐক্য-পন্থী নেতৃত্বের পক্ষেই কঠিন। কারণ, ঘটনা-প্রবাহই তাঁদের পথ ও মতের শক্তি কমিয়ে দিচ্ছে।

৩-২-৭৪

নবারুণ গুপ্ত

রপ্তানিযোগ্য বিপ্লবের অভাব

বিশ্বের বাজারে রপ্তানিযোগ্য বিপ্লবের অভাব ঘটায় এশিয়া, আফরিকা এবং লাতিন আমেরিকার উন্নতিশীল দেশগুলিতে গুরুতর বিপ্লবসংকট দেখা দিয়েছে। ফলে ঐসব দেশে যে-সব রাজনৈতিক দল বিপ্লব আমদানি-রপ্তানির কারবারে দীর্ঘদিন ধরে লিপ্ত ছিল আজ তাদের মাথায় হাত পড়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, বিশ্বে তেল এবং খাদ্যের যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা বিপ্লবসংকটের মত এত গভীর নয়। কারণ তেল এবং খাদ্যের সংকট হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কাটিয়ে ওঠা যাবে, কিন্তু রপ্তানিযোগ্য বিপ্লবের ঘাটতির জন্য যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠা শক্ত।

আন্তর্জাতিক বাজারে বিপ্লবসংকট দেখা দিল কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইনটারন্যাশন্যাল বিপ্লব একসপোরট এজেনসির জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, বিপ্লব রপ্তানির কারবার থেকে সোভিয়েত রুশিয়া হাত গুটিয়ে নেবার ফলেই বিপ্লব রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাজারে নিদারুণ মন্দার সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি এক হিসাব দাখিল করে দেখান যে, সোভিয়েত রুশিয়া আগে যে-সব দেশে বিপ্লব রপ্তানির ব্যাপারে উৎসাহ দেখাত, বর্তমানে সেই সব দেশে 'সাহায্য' ও 'সহযোগিতা' রপ্তানি করে অনেক বেশী লাভবান হচ্ছে। তাই বিপ্লব রপ্তানির ব্যাপারে তার আর তেমন উৎসাহ নেই।

উদাহরণস্বরূপ ইনটারন্যাশনাল বিপ্লব একসপোরট এজেনসির মুখপাত্র রুশ-ভারত সহযোগিতা চুক্তির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তিরিশের দশকে সোভিয়েত সরকার তাঁর অথরাইজড ডিলারদের মারফত ভারতে একটি মাত্র জিনিস রপ্তানিরই চেষ্টা করেছে এবং তা হচ্ছে বিপ্লব। কিন্তু সত্তরের দশকে সোভিয়েত সরকার এই লোকসানের কারবার গুটিয়ে ফেলেছেন। বিপ্লব রপ্তানির পরিবর্তে সোভিয়েত সরকার এখন ভারতে অধিকতর লাভজনক বস্তুসমূহ রপ্তানি করতে শুরু করেছেন।

কিউবায় সোভিয়েত নেতা কমরেড ব্রেজনেভ সম্প্রতি যে ভাষণ দিয়েছেন তাতেই সোভিয়েত সরকারের সাম্প্রতিক রপ্তানি নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। কমরেড ব্রেজনেভ বলেছেন, তাঁরা আর বিপ্লব রপ্তানির নীতি সমর্থন করেন না।

সেই তিরিশের দশকের বিপ্লব রপ্তানির নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সোভিয়েত সরকার এখন ভারতে সার, গম, কেরোসিন তেল, পেট্রল, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, ইস্পাত কারখানা প্রভৃতি স্থাপনের উপযোগী মাল-মসলা এবং কারিগর রপ্তানি করতে শুরু করেছেন।
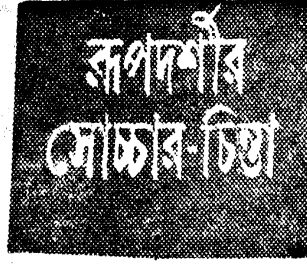
পিকিং থেকে প্রকাশিত কমিউনিসট পত্রিকা পিকিং রিভিউ (নভেম্বর ৩০, ১৯৭৩) বিভিন্ন সূত্র থেকে হিসাব সংগ্রহ করে জানাচ্ছেন : সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন ধরনের সাহায্যের মাধ্যমে ভারতের লোহা ও ইস্পাত শিল্পের শতকরা ৩০ ভাগ, তৈলশোধন শিল্পের শতকরা ৩৫ ভাগ, বিদ্যুৎশক্তি শিল্পের শতকরা ২০ ভাগ এবং ভারী যন্ত্র শিল্পের শতকরা ৮৫ ভাগ নিজের কব্জায় এনে ফেলেছে। সোভিয়েত 'সাহায্যে' যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার নকশা থেকে নির্মাণ, মূলধন থেকে কাঁচামাল সরবরাহ এবং পরিচালনা সবই নিয়ন্ত্রণ করছেন সোভিয়েত যন্ত্রবিদরা। ভিলাই এবং বোকারোর ইস্পাত কারখানা দুটিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ভিলাই কারখানা ক্রুশ্চভের আমলে ১৯৫৫ সাল আরম্ভ হয় এবং তার নির্মাণ সমাপ্ত হবার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও এখনও সেখানকার কারখানায় ষাটটি সোভিয়েত রয়ে গিয়েছে। কারখানা যদিও ভারতীয়রা চালাচ্ছেন বলে মনে হয় তবু সেখানে এক 'সমান্তরাল সোভিয়েত প্রশাসনের' অস্তিত্ব এখনও রয়ে গিয়েছে। সিনিয়র ভারতীয় প্রশাসকদের অন্তরালে লুকিয়ে আছেন তাঁদের সোভিয়েত পথপ্রদর্শকেরা।

বোকারো ইস্পাত কারখানায় সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ আরও প্রকট। যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্প নির্মাণের নকশা তৈরি করেছিল, সোভিয়েত সেনট্রাল ডিজাইনিং ইনসটিটিউট অব মেটালারজিকাল এনটারপ্রাইজের কাছে ধাক্কা খেয়ে তাকে সরে যেতে হয়। বোকারো প্রকল্পের নির্মাণ ব্যাপারে সব কিছু সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নিয়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাতিল যন্ত্রপাতি এবং পুরনো আমলের কারিগরি ভারতকে গছিয়ে দেয়। কারিগরি সাহায্য দেবার নামে তিন শতাধিক রুশ নাগরিককে বোকারোতে পাঠানো হয় এবং আরও শতাধিক রুশ কারিগর আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। বোকারোর বিরাট ইস্পাত নগরী সোভিয়েত কলোনীতে পরিণত হয়েছে বলেও পিকিং রিভিউতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইনটারন্যাশনাল বিপ্লব একসপোরট এজেনসির মুখপাত্রও এ কথা স্বীকার করেন যে, সোভিয়েত রুশিয়া এখন অধিকতর লাভজনক জিনিস রপ্তানিতে মনোনিবেশ করার ফলেই বিশ্বের বিপ্লব রপ্তানির বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু সোভিয়েত মার্কা বিপ্লবের যাঁরা গুণগ্রাহী তাঁরা মনে করেন, সোভিয়েত রুশিয়া বিপ্লব রপ্তানি না করলেও বিপ্লবের বাজারে মন্দা পড়তে দেবেন না। ভরতুকি ইত্যাদির সাহায্যে তাঁরা দেশে দেশে কুটির শিল্পের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিপ্লবকে মদত যোগাতে পারেন। তাঁদের ধারণা, বিপ্লব রপ্তানির ব্যাপারে কমিউনিসট চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। চীনে প্রস্তুত পোরটেবল বিপ্লবের ফিনিশ অনেক ভাল, দামেও সস্তা। যারা সমঝদার নয়, তারা সহজেই বিপ্লব মেড-ইন-চায়না দেখেই আকৃষ্ট হয় এবং কিছু দিন পরে, সস্তার তিন অবস্থা, পস্তায়। যেমন চারুবাবু অ্যানড কোং। চীনা মার্কা বিপ্লব আমদানি করেছিলেন বলেই আর শেষ রক্ষা করতে পারলেন না।

এর জবাবে চীনা বিপ্লব আমদানিকারক কোম্পানীর জনৈক ডিরেক্টার বলেন, সোভিয়েত বিপ্লবের নামে এতদিন বাজারে যা চালিয়েছে তা গিল্টি করা সংশোধনবাদ। এখন ধরা পড়ে কারবার গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

এদিকে কমরেড ব্রেজনেভ বিপ্লব আর রপ্তানি করবেন না বলে ঘোষণা করায়, ভারতের রুশ বিপ্লব আমদানির এজেনসি খুবই বিপাকে পড়ে গিয়েছেন। তাঁরা আশংকা করছেন, এর ফলে তাঁদের কিছু লোককে লে-অফ করতে হতে পারে।

বিপ্লব আমদানি এজেনসির দু' একজন ডিরেকটার, লে-অফে পড়ে এই বৃদ্ধ বয়েসে যাতে পথে বসতে না হয় সেই কারণে, ভারত সরকারের কাছে প্রাক্তন বিপ্লবীদের জন্য নির্ধারিত পেনসন চেয়ে গুপ্তভাবে আবেদন করেছেন, এমন সংবাদ আমাদের জানা আছে।

গুপ্ত আবেদনকারীদের নাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রীরও জানা আছে। তাঁকে না ঘাঁটালে তিনি তা ফাঁস করবেন না বলে ভদ্রলোকের চুক্তি করেছেন।

শ্মশানের শান্তি

দেবরাজ

এক বছরের ওপর হয়ে গেল ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সই হয়েছে প্যারিসে। সে চুক্তির শর্ত মেনে চাটিবাটি গুটিয়ে দেশে ফিরে গেছে মার্কিন ফৌজ। একজন মার্কিন সেনাও আজ আর ভিয়েতনামে নেই। উত্তর ভিয়েতনামে আমেরিকান বিমানে আর হানা দিচ্ছে না। সেখানকার বন্দরে আমেরিকানরা যে মাইন পেতেছিল তাও তারা তুলে নিয়েছে। উত্তর ভিয়েতনামকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার যে কড়ার আমেরিকা করেছে তা কী করে পূরণ করা যায় সে সব ঠিক করার জন্যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে যদিও কাজ বিশেষ এগোয়নি। উত্তর ভিয়েতনাম আর ভিয়েতকংও তাদের কথা রেখেছে। তারা সমস্ত আটক আমেরিকানদের ছেড়ে দিয়েছে। ৫৮৮ জন মার্কিনী ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরে গেছে। কেবল মার্কিনী নয় বিস্তর বন্দী ভিয়েতনামীও ছাড়া পেয়েছে। ভিয়েতকং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের ৯৫০১৬ জন ফৌজী বন্দীকে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারও মুক্তি দিয়েছে ২৬৬০৮ জন ভিয়েতকং বাহিনীর লোককে। দু পক্ষেরই কিন্তু কয়েদকরা সবাই ছাড়া পায়নি।

মার্কিনীরা বিদেয় নেবার পর ভিয়েতনামকে নিয়ে অন্য দেশের লোকেদের আর মাথাব্যথা নেই। যে ভিয়েতনাম নিয়ে এই সেদিন পর্যন্ত সারা দুনিয়া তোলপাড় হচ্ছিল তার কথা লোকে বেমালুম ভুলে গেছে বললেই হয়। সেখানে কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না তার খোঁজও বড় একটা কেউ রাখে না। নয়া উপনিবেশবাদী ইয়াংকীদের খপ্পর থেকে ভিয়েতনাম যে ছাড়া পেয়েছে এতেই লোকে খুশী। তাই সেখানে দক্ষিণ এলাকার কারুর যে দিনে স্বস্তি নেই রাতে ঘুম নেই দেশের বাইরে বিশেষ কেউ জানে না। ১১৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম ভিয়েতনামের কোনও এলাকা বিদেশী ফৌজের দখলে নেই। তবুও কিন্তু লড়াই থামেনি ও দুর্ভাগা দেশে। শান্তির পয়লা বছরে ভিয়েতনামে যুদ্ধের বলি হয়েছে ৫৯৮৪৫ জন। জোয়ান, বুড়ো, বাচ্চা, কেউ বাদ যায়নি, পুরুষও আছে মেয়েও আছে। আহত হয়েছে আরও প্রায় ৪০,০০০ জন। ভিটে ছাড়া হয়ে পথে দাঁড়িয়েছে লাখ তেরো লোক। যারা মারা গেছে তাদের ১২৭৬৮ জন দক্ষিণ-ভিয়েতনামী ফৌজ, ৪৪৯২৭ জন ভিয়েতকং আর উত্তর ভিয়েতনামী সেনা। বাকীরা নিরীহ গাঁয়ের চাষী। গোটা ভিয়েতনামের যুদ্ধে কিন্তু মার্কিন ফৌজ মারা গিয়েছিল ৪৬০০০।

বোঝা যাচ্ছে ভিয়েতনামে শান্তির আড়ালে চলছে একটা বিরাট ট্রাজেডি। তা থামাবার জন্যে কেউ এগিয়ে আসছে না, কোথাও কেউ আন্দোলন করছে না। হানাহানি কাটাকাটি অবশ্য গোটা ভিয়েতনামে হচ্ছে না। উত্তরে সবই ঠাণ্ডা। তাদের বাইরের শত্রু গেছে, ঘরের শত্রু বলতে কিছু নেই। অবস্থাটা ঘোরালো দক্ষিণে। সেখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে সায়গনের থিউ সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের। নিজের গোঁ ছাড়তে কোনও তরফই রাজী নয়। অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে মদত দিতে কসুর করছে না উত্তর ভিয়েতনাম। একবার সে সরকার জেঁকে বসতে পারলে অকমুনিস্ট দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের টেঁকা দায় হবে—শেষ পর্যন্ত গোটা ভিয়েতনামটা এসে যাবে কমুনিস্টদের দখলে—হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মতো দেশ ভাগাভাগি সেখানে আর হবে না। এমন যে ঘটতে পারে তা, দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি থিউ বিলক্ষণ জানেন। মরিয়া হয়ে তাই তিনি রোখবার চেষ্টা করছেন ভিয়েতকংকে দক্ষিণে। হাজার হাজার ছোট বড় মাঝারি সংঘর্ষ তাঁর হয়েছে এক বছরে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের ফৌজের সঙ্গে। সে সংঘর্ষে লোক মারা যাচ্ছে হপ্তায় গড়ে এক হাজার, আহত হচ্ছে অগুন্তি লোক।

ভিয়েতকংকে সামাল দিতে হচ্ছে থিউকে নিজের জোরে। বাইরের কোনও সাহায্য পাওয়ার উপায় তাঁর নেই। প্যারিস চুক্তি সে পথ মেরে দিয়েছে। আমেরিকানরা বিস্তর লড়ায়ের সরঞ্জাম দিয়ে গেছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারকে। উত্তর ভিয়েতনামের তরফ থেকে বলা হয়েছে রোজ ৭০০ টনের মতো লড়ায়ের মাল সায়গনে এনে দিয়েছে আমেরিকানরা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই হবার আগে মাসখানেক ধরে। আপাতত অস্ত্রশস্ত্র কিংবা জঙ্গী বিমানের অভাব নেই দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের। চীন কিংবা রুশিয়া অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দিলেও সরাসরি মালমশলা কিছু দিচ্ছে না। তেমন নালিশ দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারও করেন নি। কিন্তু অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পেছনে রয়েছে উত্তর ভিয়েতনাম। তার নিজের লড়াইয়ের বালাই চুকেছে। সে এখন মদত দিচ্ছে দাক্ষিণী ভিয়েতকংদের। তারাও ভিয়েতনামী—বিদেশী নয়। একবার ভিয়েতকংদের দলে ভিড়ে যেতে পারলে তারা উত্তুরী কী দাক্ষিণী তা প্রমাণ করা শক্ত। তাদের নাকি দু লাখ ফৌজ রয়েছে দক্ষিণে।

প্যারিস চুক্তি ফাঁপরে ফেলেছে রাষ্ট্রপতি থিউকে। দক্ষিণে তাঁর সরকারই একমাত্র বৈধ সরকার তাঁর এ দাবি সে চুক্তিতে মেনে নেওয়া হয়নি। ধরতে গেলে ভিয়েতনামকে তিন টুকরো করার বিধানই দেওয়া হয়েছে প্যারিসে। হতোও তাই যদি ভিয়েতকংয়ের দখলে একটানা একটা এলাকা থাকতো। তাদের এলাকা আর দক্ষিণে সরকারী এলাকা এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে আছে। রাজধানী পর্যন্ত তারা একটা খাড়া করে উঠতে পারছে না। তবে তাদের ধৈর্য আছে, আছে অটল বিশ্বাস। তাদের ধারণা সবুরে মেওয়া ফলবে। মনে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি থিউয়ের ভয়ও তাই। সেই জন্যেই তাদের দানা বাঁধবার সুযোগ না দিয়ে তিনি অঙ্কুরেই শেষ করে দিতে চান। প্যারিস চুক্তিতে যে বলা হয়েছে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার আর থিউ সরকার আলাপ আলোচনা করে শান্তি বজায় রাখবেন, আপাতত ভাগাভাগি করে দক্ষিণ ভিয়েতনাম শাসন করবেন, তারপর ব্যবস্থা করবেন নির্বাচনের পাকা সরকার গড়ে তোলার জন্যে সে সব শর্ত মানার কোনও ইচ্ছে থিউ দেখাননি। আমেরিকানরা চলে গেলেও তিনি দমে যাননি, খানিকটা কৌশলে খানিকটা গায়ের জোরেই কেল্লা ফতে করার মতলবে আছেন।

তা কি তিনি পারবেন? তাঁর শত্রু কেবল কমুনিস্ট ভিয়েতকং নয়। অকমুনিস্টরাও তো সবাই তাঁর দিকে নয়। কমুনিস্টরা মসনদে বসুক এ তারাও চায় না। কিন্তু থিউ যে দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছেন এতে তারা তাঁর উপর ক্রমশই খাপ্পা হয়ে উঠছে। তারা চায় শান্তি, চায় গণতন্ত্র। দুটোর কোনওটাই তো থিউ বজায় রাখতে পারছেন না। দেশের আইনসভা তাঁর হাতের মুঠোয়। যা খুশী প্রস্তাব তাকে দিয়ে তিনি পাস করিয়ে নিচ্ছেন। থিউ রাষ্ট্রপতি হয়েছেন দুবার। দেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আর দাঁড়াবার অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু তাঁর হুকুম জাতীয় পরিষদে সংবিধান পালটে তিনি ১৯৭৫-এর নির্বাচনে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। যদি তিনি লোকের সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা করতে পারতেন তা হলে হয়তো লোকের ভক্তি তাঁর ওপর চটে যেত না। কিন্তু লড়াই নিয়ে তিনি ব্যস্ত, অর্থনীতির জটিল প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁর কই? এখনও আমেরিকা তাঁকে সাহায্য বাবদ কম টাকা দিচ্ছে না। সে সবই তিনি ঢালছেন ফৌজের পেছনে। শিল্পে লগ্নী করার জন্যে টাকা বাইরে থেকেও বিশেষ আসছে না। মার্কিন টাকার জোয়ারে ভাসতো এতদিন দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা। তাতে ভাটা পড়াতে তারা এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছে, অসন্তোষও তাদের মধ্যে বাড়ছে।

এমনি ক'রে সে আমার

শান্তি লাহিড়ী

এমনি করে সে আমার কাছে এসেছিল, এমনি ক'রে ফু' দিয়ে
গ্যাসের সমস্ত আলো নেবাল।
এমনি ক'রে রণপায়ে স্থবির ঘণ্টাঘরের সামনে গিয়ে
পেণ্ডুলামটাকে ডাইনে বাঁয়ে দুবার দোলাল।
এমনি ক'রে পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে
থরথর কাঁপাতে লাগল আতঙ্কে,
সেখানে যেমন খুশি সহস্র কুমকুমের রঙে
মরামাছিদের রক্ত খুঁজতে খুঁজতে
হায়, সে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল
চালকবিহীন গাড়ির পাদানিতে চেপে।
সড়ক জ্বলজ্বল করছিল তোমার করতলে তার ঠিক
মধ্যরেখায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম
তুমি অসংলগ্ন কথা বলতে বলতে এলে রাত একটায়,
তখন তোমার গলায় সাদা ফুলের মালা—
চৌকিদারের মত আমি সেই থেকে জেগে,
পাকা বাঁশের লাঠিতে আমার মাথা ঠেকানো।

আমাকে কতক্ষণ জ্বালাবে হে রজনী, সে তোমার কফিনে
ঢুকেপড়া পর্যন্ত? তারপর?
তারপর তোমারই মুখোশে আমি নাচতে নাচতে
ঘাগরা-কাঁচুলি-বেণীর রেশমী খুলে ফেলে
তোমাদের দিকে পিছন ফিরে নৌরী বাগানের দিকে
চলে যাব—
আর,
আর তুমি তখনো চৌকিদার হাতে কালো লণ্ঠনের
আলোছায়ায় নিজেকেই নিজে পাহারা দিচ্ছ।

আনন্দময়ী

সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

শরতের মেঘ দেখে
দেখি সাতরঙা রামধনু
মনের দরজাগুলো একে একে সব খোলা হাট
এমন সময় শুনি মিণ্টুর মাসীর গলা
মিণ্টু, লাল্টু তোরা এলি—
মিণ্টুর মাসীর কণ্ঠে যাদু আছে
সে যখন গুনগুন করে আলোর কান্না ভোলায়
তার রসগ্রাহী সুরে ভেসে ওঠে আকাশের বিভাস
সে আমার কেউ নয়,
তবু প্রথম যৌনচেতনা তাকে ঘিরে
তখন তার বয়স সাঁইত্রিশ, আমার ষোল
মাসী ছিল আনন্দের প্রতিমূর্তি
তবু তার মসৃণ শরীরের খাঁজে খাঁজে মৃত্যুর ইশারায়
আমার মৃত্যু ঘটে গেছে।
অথচ সে এখনো মোসাহেব নিয়েই মশগুল
আমরা সবাই ভালোবাসি
তার কথার উৎস
এখন আমার তিরিশ তার পঞ্চাশ
সময় সবই বোঝে
সে কেমন সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়
পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা কি
তবু আজও একা ঘরে তাকে দেখে বুক কাঁপে
সে কেমন করুণ চোখে বলে, ওরে তোরা আমার সন্তান
আশ্চর্য মাসীর প্রাণ
এই অসুখের একাএকা নিজের আনন্দে নিজেই মগ্ন
কোনদিকে দৃক্‌পাত নেই।

অভিমান

মৃণাল বসু চৌধুরী

কলকাতার জঞ্জালের মতো রাশীকৃত অভিমান জমে উঠছে বুকে
শব্দের অভাবে আমি
একদিন শব্দহীন তোমার শরীরে
মিশে যাবো
ছেড়ে দেবো
রাজাপাট
সাতাশ ঘোড়ার রথ
নির্মেঘ আকাশ
আমি খুব স্পষ্টভাবে একদিন বিদ্রোহ জানাবো
শিরা উপশিরা ছিঁড়ে
রক্তের ভেতরে
খুঁজে নেবো অনুষঙ্গ
অশ্রুপাতে
পরিভ্রমী জলের উপমা

আমার আর পাশ ফেরা হয় না

বেলাল চৌধুরী

মাঝরাতে আমার আর পাশ ফেরা হয় না
কুঁকড়ে ওঠে সমস্ত শরীর, একলা আমি
জেগে উঠি, দীর্ঘ রাতের রোদন শুনি—
ঘোর কেটে যায়, চোখের সামনে
নেচে ওঠে বন্য ধুঁদুল, কণ্টকরী ঝোপ,
আমার সজল তেষ্টা কেমন সুগভীর।

দুঃস্বপ্ন নয়, আমার নিজের ভঙ্গুরতায়
আমি ভাঙতে থাকি, ভাঙতে থাকি,
—সঙ্গী-সাথী কেউ কি অপেক্ষা চায় দুয়ারে?
দুয়ার নয় দুয়ারে আঁটা খিল;
উড়ে গেছে বনের পাখি শূন্য পিঞ্জরা,
বসন্ত নয়, বসন্ত কোথায় উদোম মাঠ,
পড়ে আছি এই তো আমি, একলা আমি—
আমার আর পাশ ফেরা হয় না।

তেল সংকট এবং পঞ্চম যোজনার সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাস

বর্তমানে তেল নিয়ে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার উপর বিশেষভাবে অনুভূত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রতি বছর প্রায় ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের তেল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে। আমাদের বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার যে রিজার্ভ আছে তার একটি বিরাট অংশ তেল আমদানি করতেই খরচ হয়ে যাবে। অথচ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একান্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা এভাবে খরচ হয়ে গেলে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রচুর ঘাটতি দেখা দেবে। বিদেশ থেকে যে সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে তা ব্যবহার করতে হবে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার ঘাটতি মেটাবার জন্য। এই অবস্থায় সরকারের পক্ষে ঘাটতি অর্থসংস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার প্রথম দুই বছর ঘাটতি অর্থসংস্থান পরিহার করার যে সুপারিশ পরিকল্পনা কমিশনের দিক থেকে এসেছে তা কার্যকর করা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে বলে মনে হয়। যতদূর অনুমিত হচ্ছে, পঞ্চম যোজনায় ঘাটতি অর্থসংস্থান পরিহার করা তো দূরের কথা, বরং বর্তমান বছরে যে হারে সরকারের বাজেট ঘাটতি হয়েছে আসছে বছর তা এড়ানোই কঠিন হবে। ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ সালে সরকারের ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৭১০ কোটি টাকা এবং ৮৪৮ কোটি টাকা। ১৯৭৩-৭৪ সালেও ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকার বেশি হবে বলে অনুমিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে টাকার বর্ধিত হারে সরবরাহের দরুণ মূল্যস্ফীতির তীব্রতা বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে জিনিসপত্রের গড় মূল্যস্তর ২০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যে হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারকে ঋণ দিয়েছে তার নজির নেই। বিদেশ থেকে বছরে ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের তেল আমদানি করতে হলে সরকারের বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার তহবিলের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। সুতরাং, শুধু যে পঞ্চম যোজনার নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির কাজ চালিয়ে যাবার জন্য বাজেটের উপর চাপ পড়বে তা-ই নয় বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা আরও বেশি করে অর্জন করার জন্য সরকারকে রপ্তানি বাণিজ্যের উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ১৯৭৩-৭৪ সালে রপ্তানি-আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২১০০ কোটি টাকা; ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানি-আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৬২ কোটি টাকা। রপ্তানি-আয়ের ক্ষেত্রে সরকার লক্ষমাত্রা অতিক্রম করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই উপার্জিত দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রার একটি বড় অংশ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হত যদি তেল সংকট এত নিদারুণ না হত। বর্তমানে অপরিশোধিত তেলের আমদানি মূল্য হল ব্যারেল প্রতি ১০ ডলার; আশংকা করা হচ্ছে যে, আমদানি মূল্য শীঘ্র বেড়ে ব্যারেল প্রতি ১১·৬০ ডলার হতে পারে। ভারত সরকার অপরিশোধিত তেলের আমদানি কমাতে ইচ্ছুক নন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার পুনর্বিন্যাস করা হয়তো প্রয়োজন হতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, তেল সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে তেল ব্যবহারে কাটছাঁট করা যেতে পারে। তেলের ব্যবহার কমাতে হলে ডিজেল ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার বাড়ানো দরকার। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনেও আমরা ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি। দূরপাল্লায় মাল যাতায়াতের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এখন থেকে রেলওয়ের উপর বেশি নির্ভর করে মোটর-লরির অথবা বাসের উপর নির্ভরতা কোন কোন ক্ষেত্রে কমানো যায় কিনা তা দেখতে হবে। তেলের বিকল্প হিসেবে কয়লার উপর যদি নির্ভর করতে হয়, তবে কয়লার উৎপাদন বাড়াতে হবে। অথচ কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অবস্থা খুব শোচনীয়। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় কয়লা, বৈদ্যুতিকশক্তি, সার ও গ্যাসের উৎপাদন বাড়াবার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাও অন্তত ১০ শতাংশ করা উচিত; এই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রপ্তানি বাড়ানো কঠিন হবে না যদি সরকার চিরাচরিত জিনিসের বাইরে অন্যান্য জিনিস (non-traditional goods) আরও বেশি করে রপ্তানি করার চেষ্টা করেন। এজন্য রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে হবে। শুধু তা-ই নয়, আমদানির বিকল্প জিনিসের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টাও করতে হবে। আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এমন জিনিস উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যা রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বাড়াবার পক্ষে সহায়ক হয়। এই নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার কিছু কাটছাঁট করার প্রয়োজন হতে পারে। দরকার হলে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়ানো হতে পারে।

তেল আমদানির ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন সরকারকে হতে হবে সেজন্য শুধু উপার্জিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা অথবা প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যই যে সরকারকে খরচ করতে হবে তা নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক ফাঁক দূর করার জন্য সরকারকে করের পরিমাণও বাড়াতে হবে। আমরা আশা করতে পারি, ১৯৭৪-৭৫ সালের রেল বাজেটে যাত্রীভাড়া ও মাশুল বাড়বে—

সাধারণ বাজেটেও করের পরিমাণ বাড়বে। সুতরাং, শুধু যে উৎপাদন-লক্ষ নির্ধারণ, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পঞ্চম যোজনার পরিবর্তন করা দরকার হতে পারে তা নয়, যোজনার অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রও আমরা কিছু পরিবর্তন আশা করতে পারি।

বর্তমানে জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে তার পরিপ্রেক্ষিতেও পঞ্চম যোজনার চূড়ান্ত রূপায়ণে কিছু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। প্রথম খসড়া পঞ্চম পাঁচসালা যোজনা তৈরি করা হয়েছিল তখনকার তুলনায় জিনিসপত্রের দাম এখন ২০ শতাংশ বেড়ে গেছে। যে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রেই অনুমিত ব্যয়ের পরিমাণ এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা এখন ক্রমাবনতির পথে। সামগ্রিক উন্নয়ন হার ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার এখন লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। উৎপাদন খরচও এখন অনেক বেশি। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার চূড়ান্ত রূপায়ণে এগুলি নিশ্চয়ই বিশেষভাবে বিচার্য।

সুব্রত গুপ্ত

গর্ব-সুখ

চিত্ররথ দত্ত

শনিবারের মেসের দুপুর, দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে অফিস; অপারেটর শেষ মুহূর্তের লাইন দেওয়া-নেওয়ার জন্য ছাড়াচ্ছে প্রাণপণ। বারণ করে দিয়ে সৌগতর নম্বরটা নিজেই ধরব বলে নিচতলায় পোস্টঅফিসে নেমে এলাম।

ফোন রেখে বেরোচ্ছিলাম, দেখি গায়ত্রী। তখনো অবশ্য নামধাম জানিনি। এক টুকরো কাগজ এগিয়ে ধরে বলল, "এই লাইনটা একটু ধরে দেবেন?—পাচ্ছি না।"

রিং হয়েই যাচ্ছিল। বললাম, "এটা কি অফিস?"

মাথা নাড়ল।

"তবে তো ছুটি হয়ে গেছে, ধরার কেউ নেই।—একটু আগে করলে পারতেন।" মুখটা কাচুমাচু করল। মাঠের দেরি হয়ে যাচ্ছিল, কথা না বাড়িয়ে সৌগতর অফিসের উদ্দেশে দৌড় লাগালাম।

সেই প্রথম লক্ষ করেছিলাম। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই লিফটে বা গেটের মুখে দেখা হতো। একই বিল্ডিং কিনা।

একদিন বাস থেকে নামতে নামতে দেখলাম গায়ত্রীও ওই বাসে। একটুখানি হাঁটা-রাস্তার সুযোগে ভালো করে কথা বললাম, "কী খবর—অনেক দিন আপনাকে দেখিনি, শরীর-টরীর খারাপ হয়েছিল নাকি?"

বলল, "না তো।"

চট করে বলে ফেললাম, "আপনার নামটা কী বলুন তো? দেখা হলে কথা-বার্তা বলি অথচ নামটা জানা নেই।"

নির্বিবাদে নিজেরটা বলে আমার জিজ্ঞেস করল।

ততক্ষণে অফিস-গেটের কাছাকাছি। এক ঝলক তাকিয়ে স্বরটা নিচু করে বলল, "অফিসে কথা বলতে আসবেন না।" তারপর আমাকে ছাড়িয়ে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল।

ঠিক বুঝলাম না কী বলতে চায়। তবে এ সবই তাৎক্ষণিক। আবার কিছুদিন অদর্শনের পর যথানিয়মে বোধ হয় ভুলতে বসেছিলাম। কিন্তু একদিন হঠাৎ গড়িয়াহাট মোড়ে, দোতলার জানলায় বসে সেই বাসেরই একতলা থেকে নামতে দেখে ফেললাম গায়ত্রীকে। কী উদ্দেশে কোথা থেকে এখানে এসে নামল ভাবতে ভাবতে এক ধরনের চাপা উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে নিজেই নেমে পড়লাম। বললাম, "কী ব্যাপার, কোনদিকে?"

বলল, "বাড়ি।"

বললাম, "এখন বাড়ি গিয়ে কী করবেন, সবে তো সাড়ে এগারো।—তাছাড়া সেকেন্ড-স্যাটারডে।"

চোখে চোখ রেখে ও বলল, "স্বামীর কোলে মাথা রেখে শোবা।" একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। সামলাতে একটু সময় লাগল।— বললাম, "অতি সৎ উদ্দেশ্য।—তাঁরও বুঝি সেকেন্ড-স্যাটারডে? আর তা যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই অফিস-কাছারি বা অন্যান্য কাজকর্ম আছে, আপনাকে কোলে নেবার জন্য তাঁকে এখন পাবেন কি? তার চেয়ে চলুন কোথাও বসে চা খেতে খেতে খানিকটা আড্ডা দেওয়া যাক।'

মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী আসল কথাটা এড়িয়ে গিয়ে উল্টে বিচ্ছিন্ন ও রহস্যজনক প্রশ্ন চাপিয়ে দেওয়ার মতো করে বলল, "আপনি বিয়ে করেননি?"

ভাবলাম, বেশি ঝুঁকির মধ্যে না যাওয়াই ভালো।

"বাচ্চা-কাচ্চা আছে?"

তাতেও মাথা নাড়লাম, "নেই আবার—একটা ছেলে একটা মেয়ে।—আপনার?"

ঠোঁট ওলটাল, "আমার বাচ্চা-কাচ্চা নেই।"

বললাম, "বাঃ, তবে তো ঝাড়া হাত-পা।"

তির্যক একটা চোখ দিয়ে বলল, "আমাকে দেখলে মনে হয় আমার বিয়ে হয়েছে?"

বললাম, "মনে তো হয় না। আমাদের হিন্দু মেয়েদের বিয়ের কতগুলো চিহ্ন-টিহ্ন আছে, আপনার যখন সেসব কিছুই নেই তখন আর জোর করে কিছু বলি কী করে। তবে খ্রীশ্চান-ট্রিশ্চান হলে অবশ্য আলাদা কথা, বিশেষত যখন বলছেন স্বামীর কোলে শুতে যাচ্ছেন।—কিন্তু বাজে কথা থাক, চা চলবে নাকি?"

বলল, "আজ নয়, সামনের বুধবার বিকেল বেলা।"

মাথা নাড়লাম, "তাহলে থাক। অমুক দিন অমুক সময়ে, অমুক জায়গায়—আমার পোষাবে না।"

কিন্তু বুধবার সকালে, বেলার দিকে ফোন এল: অপরিচিত গলা, নামধাম কিছু না জানিয়ে সরাসরি বলল, "আমি গায়ত্রীর বন্ধু কথা বলছি, আপনার যে আজ ওর সঙ্গে চা খাবার কথা ছিল..."

বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি ভুল করছেন, এরকম কোনো কথা ওনার সঙ্গে আমার হয়নি।—মানে, একটা কথা উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গড়ায়নি।"

সে কথার একটুও পাত্তা না দিয়ে বলল, "সে যাই হোক, গায়ত্রী বলেছে আপনি ওর জন্যে দাঁড়াবেন না, ওর একটা কাজ পড়ে গেছে, ও যেতে পারবে না।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কী আপদ!" কিন্তু কথাটা শেষ করার আগেই ফোনটা কেটে গেল।

পরদিন প্রায় একই সময়ে আবার ফোন।—"আমি গায়ত্রী বলছি।"

গলাটা একটু কেমন যেন চেনা লাগল।

বলল, "কালকে আমার বন্ধু আপনাকে জানিয়েছিল?"

বললাম, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি।"

খুব নম্র গলায় বলল, "না, তবে আমি বলেছিলাম তো। ভাবলাম যদি আপনি তার ভিত্তিতে আশা করেন আমি আসব এবং অপেক্ষা করেন তাহলে খুব খারাপ হবে।"

একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, "কিন্তু অপেক্ষাটা করব কোথায়! আপনার সঙ্গে তো আমার সে বিষয়ে কোনো কথাই হয়নি।"

তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল, "যাক গিয়ে, যা হয়ে গেছে গেছে, ও-নিয়ে আর হিসেব করে লাভ নেই।—আজকে আসুন, আমি ফ্রি।"

বললাম, "মাফ করবেন, আজকে পারব না।"

অবাক হবার ভঙ্গিতে বলল, "কেন!"

বললাম, "কেনর কী আছে, সেদিন আপনি পারেননি আজ আমি পারব না।"

গলার স্বর কোমল করে বলল, "আপনি রাগ করছেন, চেষ্টা করলে ঠিক পারবেন আসতে।"

শেষ পর্যন্ত অফিস কাটতে হলো। বেলা চারটে। বাস থেকে নেমে হেসে এগিয়ে গেলাম, "অনেকক্ষণ এসেছেন?"

"কিছুক্ষণ।" নির্লিপ্ত ভঙ্গি।

দু-পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "সিনেমা, রেস্টুরেন্ট বা পার্ক এসব কোথাও বসব না।"

আচমকা ধাক্কা খেলাম। বললাম, "সিনেমার তো এটা সময় নয় সুতরাং সে প্রশ্নই আসছে না। আর এই গরমে দুপুরে চারটের সময় পার্কে গিয়ে বসার কথা কারো মাথায় আসতে পারে বলে আমার জানা নেই।—একমাত্র আছে রেস্টুরেন্ট। তা বলছেন যখন সেখানে যাবেন না—যদিও মূলে সেই কথাটাই ছিল—তখন এই রাস্তাতেই ভিড়ই; তবে দয়া করে এদিকে ছায়ায় এসে দাঁড়ান, কথা বলতে কিছুটা সুবিধে হবে। এ ছাড়া অন্য বিকল্প হচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে ফাঁড়ির দিকে যাওয়া—মিনিট দশ-পনেরো কেটে যাবে—ওখান থেকে আমি বাসে উঠে পড়ব, আর আপনার যেখানে যাবার আছে চলে যাবেন।"

খানিকটা দূরে এগোবার পথে একটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ পড়ল; পেরিয়ে একটু এসেই চট করে উল্টো মুখে ঘুরে বলল, 'আচ্ছা চলুন, ওখানে গিয়েই বসা যাক।"

কতক্ষণ বসেছিলাম খেয়াল নেই। কব্জিটা ঝাপসা আলোর দিকে ঘুরিয়ে মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ করে গায়ত্রী উঠে দাঁড়াল, "চলুন, আমাকে আবার অনেক দূরে ফিরতে হবে, বাসে যা ভিড়।—দেরি হলে মা-বাবা খুব চিন্তা করেন।"

গড়িয়াহাট মোড়ের বাসস্টপে আবার এসে দাঁড়ালাম। গায়ত্রী বাবে বারে বলতে

লাগল, "আপনি আবার দাঁড়ালেন কেন, আমি ঠিক চলে যেতে পারব।"

বললাম, "ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।"

চাপা হাসির খেলায় চোখ ভরে গেল, "মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে খুব ভালো লাগে, না?"

বললাম, "তা লাগাই তো একটি স্বাস্থ্যবান সপ্রতিভ যুবককে মানায়।—না দাঁড়িয়ে উল্টোমুখো চলে গেলে আপনি খুশি হবেন?"

চোখ বড় বড় করে বলল, "বাবা, খুব অহংকার তো!" তারপর চট করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, "সেদিন আপনি আমার বন্ধুর ওপর খুব রাগ করেছিলেন? ও বলছিল।'

তীব্র প্রতিবাদ করলাম, "মোটেই না, অযথা একজন অপরিচিতা মহিলার ওপর রাগ করতে যাব কেন!"

"পরিচিতা হলে করতেন?"

অধৈর্য হয়ে বললাম, "আপনি অবান্তর প্রশ্ন করছেন; পরিচিতা-অপরিচিতা যাই হোক, সব কিছুই একটা যথার্থ কার্যকরণের ওপর নির্ভর করে।"

"আচ্ছা আমার বন্ধুর গলাটা কী রকম লাগল?"

"ভালোই, যেমন একজন অল্পবয়সী তরুণী মেয়ের হয়ে থাকে।"

"গলা শুনে চেহারাটা কেমন দেখতে ইচ্ছে করল না?"

"না।"

"ছেলেদের তো তা-ই করে।—লজ্জার কী, বলুন না?"

প্রশ্নবাণে কোণঠাসা হয়ে রেগে যাচ্ছিলাম। বললাম, "হবে হয়তো, আমি জানি না।—আপনার বাস এসে গেছে।"

"আমিই আমার সেই বন্ধু; দেখছিলাম মেয়েদের গলার স্বর কী রকম চিনতে পারেন।" বলেই আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাসের ভিড়ে ঢুকে পড়ল।

পরে একদিন সৌগতর ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম—আমাকে বসিয়ে সৌগত গেছে স্নানে—হঠাৎ দেখলাম গায়ত্রী। বালিগঞ্জ প্লেস পাড়াটা এমনিতেই নির্জন, সন্ধ্যের পর আরও শান্ত হয়ে পড়ে। ঘড়িতে চোখ ফেরালাম, আটটা। স্পষ্ট দেখলাম, পথের পাশের ঘোলাটে আলোয় ছায়া ফেলে ফেলে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। আমি বারান্দায় ঝুঁকে পড়লাম—সামনে দিয়ে গিয়ে এক, দুই, তিন, চার, পঞ্চম বাড়িটার ঝাপসা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরে কথাটা তুলতেই চমকে উঠে বলল, "কোথায়?—আপনি কোথায় ছিলেন?"

বন্ধুর বাড়ির কথাটা বললাম।

কিছুটা সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে বলল, "ডাকলেন না কেন?"

বললাম, "তিনতলার বারান্দা থেকে কি ডাকা যায়। দেখলাম রাস্তার শেষ বাড়িটায় ঢুকে গেলেন।"

একটু থতমত খেয়ে বলল, "হ্যাঁ, ওই হস্টেলটায় গিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু থাকে; ভাবছি প্রাইভেটে এম-এটা দেব, তাই নোটস্-টোটসের খোঁজে গিয়েছিলাম।"

এতদিন সৌগতদের বাড়ি যাচ্ছি, কোনোদিন জানতাম না ওখানে ছোটখাটো একটা মেয়েদের হস্টেল আছে। কিছু না বলে চুপ করে রইলাম।

অফিসে পাশের টেবিল থেকে মিত্তির প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে একদিন বলল, "ওই মেয়েটির ব্যাপারটা কী বলুন তো?"

"কী ব্যাপার?"

"আপনি বলেন গড়িয়ায় নিজেদের বাড়ি, অথচ অফিসের কয়েকটা ছোঁড়া ক'দিন পেছন পেছন গিয়ে দেখেছে আপনাদের বালিগঞ্জের ওদিকে একটা ছোট্ট হস্টেলে থাকে। অবশ্য কথা বলতে সাহস করেনি, যা দেমাক!—অল্প বয়স, সুন্দর চেহারা নিশ্চয়ই বাবা-মা আছে, অথচ হস্টেলে একা একা থাকে, অফিসে চাকরি করে—ব্যাপার-স্যাপার বুঝিও না।"

কথা শুনে রাগে গা জ্বলে গেল। গম্ভীর মুখে শুধু বললাম, "ওখানে বন্ধু থাকে, পড়াশুনোর ব্যাপারে তার কাছে যায়।"

বললাম বটে, কিন্তু খটকা রয়েই গেল। দেখা হলে হেসে বললাম, "আপনিও ওই হস্টেলটায় থাকতে আরম্ভ করেছেন নাকি? প্রায়ই আপনাকে দেখা যায় ওদিকে।"

ভাবল বোধ হয় খোঁজ খবর নিয়ে গোয়েন্দাদের মতো ন্যাকা সাজছি। যেন কোনো ব্যাপারই নয়, এই ভাবে বলল, "হ্যাঁ, আমি তো ওখানেই থাকি।"

অবাক হয়ে বললাম, "তবে যে গড়িয়াহাট থেকে বাস ধরে গড়িয়া যেতেন!"

বলল, "যেতাম না তো; আপনি যদি সঙ্গ না ছাড়েন, আস্তানা জানার জন্যে পিছু নেন, সেই জন্যে দশ পয়সার টিকিট কেটে গোলপার্কে নেমে হাঁটিতে হাঁটিতে আবার ফিরে আসতাম।"

সেই রেস্তোরাঁর শেষ-টেবিলটা ক্রমশ চেনা হয়ে উঠছিল। সেদিনও সেখানে বসলাম। সোফার মতো দুজনের বসার আসনের একপাশে সরে গিয়ে গায়ত্রী বলল, "আপনি ওখানে বসলেন কেন, আমার পাশে তো কত জায়গা।"

সামনে ফুলদানি থেকে মাঝারি মাপের একটা সূর্যমুখী কানের পাশে, চুলের ক্লিপে আটকে নিল। মতামত চাইবে ভেবে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু নিরাশ হতে হলো।

'পুল' লেখা ভারি দরজাটা টেনে বেরোবার মুখে গায়ত্রী খুব ঘন হয়ে এল, তারপরেই বাহুমূলের কাছে বুকের নরম গভীর চাপ অনুভব করলাম। না তাকিয়ে সহজ ভঙ্গিতে রাস্তায় নামতে নামতে

ভাবলাম, দরজা পেরোবার সময় কার ভূমিকা কী রকম হবে, বা কে কার পরে যাবে এই হিসেবের গোলমালই প্রায়ই একটু জটিলতার সৃষ্টি করে, সে রকম অনিচ্ছাকৃত একটা কিছু হবে। কিন্তু এই আশ্বাস-কথায় মন সায় দিল না। এ যেন শরীর দিয়ে শরীরকে কিছু বলার সচেষ্ট দ্বিধাহীন প্রয়াস। সেই থেকে দেহের মধ্যে এক ধরনের আবছা শিরশিরে উষ্ণতা সাবধানে খেলা করতে লাগল।

কী করে যেন ছেলেবেলার ছবির কথা উঠেছিল। কতগুলো নিয়ে গড়িয়াহাট মোড়ে প্রতীক্ষায় থেকে থেকে যখন ক্লান্ত, গায়ত্রী এল। কালো জামা আর বড় বড় দাঁত বসানো সোনালি-কালো পাড়ের উজ্জ্বল মেরুন একটা তাঁতের শাড়ি পরেছিল। ঠোঁটে লিপস্টিক, ভুরুতে পেনসিল এবং আই-লাইনারের সরু টান ছাড়াও ভেসলিন জাতীয় কিছু বুলিয়ে চোখের বড় বড় পাতায় চকচকে ভেজাভেজা একটা মদির ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ব্যাগ ও অলংকার-হীন হাতের মুঠোয় ধরা শুধু একটি সুগন্ধি রুমাল।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি—বোধ হয় ভাদ্র। দিন ছোট, কিন্তু মাঝে মাঝে চাড়া দিচ্ছে

ভ্যাপসা গরম। প্রথম বার লেকে। অপেক্ষাকৃত আলোর নির্জনতায় বসলাম। সবে বর্ষা গেছে, গাঢ় সবুজ পাতায় পাতায় ঠাসা গাছের বন।

অনেকক্ষণ চোখ ডুবিয়ে ছবি দেখা শেষ করে ভিজে ভিজে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "কোত্থেকে একটা বিচ্ছিরি খাম নিয়ে এসেছেন!" তারপর ছবিগুলো ঢুকিয়ে রাখল ব্লাউজের ভেতর।

ব্যস্ত হয়ে বললাম, "দিতে পারব না। ছবি হিসেবে কিছুই নয়, আমার কাছেও ওসবের বিশেষ কোনোই মূল্য নেই, কিন্তু মা-দিদিমাদের কাছে দারুণ সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু। পারিবারিক অ্যালবাম থেকে খুলে এনেছি, আবার লাগিয়ে দিতে হবে, কারণ বাড়ির সম্পত্তি, আমার কোনোই অধিকার নেই ওতে।"

তির্যক চাহনিতে আমাকে বিদ্ধ করে রহস্যময় হাসির রেখা টেনে গায়ত্রী বলল, "বেশ তো, নিয়ে নিন।"

বললাম, "না দিলে কেমন করে নেব!"

বলল, "কেন, হাত-পা নেই?"

বললাম, "হাত-পা থাকলেই কি তা দিয়ে সব কাজ সব সময় হয়?"

বলল, "অতশত জানি না; হাতে ধরে ফিরিয়ে দিতে পারব না, যদি চান আপনাকেই নিতে হবে।—নিতে না জানলে কেউ এসে হাত তুলে কিছু দেয় না।"

বললাম, "দেখুন, ওসব কথার খেলায় কাজ নেই। যেখানে রেখেছেন সেখান থেকে আমার পক্ষে ছবিগুলো বের করে আনা সম্ভব নয়, আমি পারব না।—আপনি হয়তো খানিকক্ষণ পরে এমনিই দিয়ে দেবেন, কিন্তু ততক্ষণে ঘামে ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে—একেই মেটমেটে লাল-হয়ে-আসা পুরোনো।"

হেসে বলল, "ঘাম গন্ধ কিছু নেই; বিকেলবেলা ভালো সাবান মেখে গা ধুয়ে বিদেশী কোলোন মেখেছি, বিশ্বাস না হয় দেখুন।"

বললাম, "দেখতে হবে না, বিশ্বাস করেছি, তবু ছবিগুলো বের করে দিন।"

গায়ত্রী আমার বাঁ-পাশে বসেছিল। হঠাৎ বুকের ওপর ঝুঁকে এসে ডান হাতে ঘাড়টা কোমল অথচ দৃঢ় হাতে আকর্ষণ করে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রেখে পরিপূর্ণ আশ্লেষে সংগে নাতিদীর্ঘ একটা চুমু খেয়ে বলল, "এবার পারবেন তো?—কিছুই পারেন না, তবু সব সময় বুক ফুলিয়ে থাকেন কেন।"

ক্রমশ বুঝতে পারলাম আর মুক্তি নেই; ঘুমের বাড়ির তীব্রতা যেমন উপলব্ধিকে জাগিয়ে রেখেও নিশ্চিত অবলুপ্তির মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি আমি রহস্যের সেই বিশাল সুড়ঙ্গ দিয়ে ভয় ও ভালোলাগা, আশংকা ও মোহ, উল্লাস ও সন্দেহে বিক্ষত ও আলোড়িত হতে হতে মোহনার দিকে ভেসে চললাম।

একদিন সামনে গাড়ির ভিড়ে ধীরগতি ট্যাক্সির জানলা থেকে গায়ত্রী আমাকে লাল শার্ট পরা উজ্জ্বল চেহারার ছিপছিপে একটি ছেলেকে দেখাল। বাসস্টপের ধার-ঘেঁষে-যাওয়া ট্যাক্সির ভেতর স্পষ্ট কিন্তু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চোখে চোখ রেখে তপন সান্যাল আমাদের দেখল। চোখাচোখি হতেই আমি অপরাধবোধে কুঁকড়ে গেলাম। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আর একবার পেছন ফিরে দেখার, কিন্তু ভয়-ভয় ভাবটা কাটিয়ে তাকাতে পারলাম না। গায়ত্রী আরো কাছে সরে এসে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, "ওদিকে দেখতে হবে না; তোমার কাছে থাকলে মনেই পড়ে না আমার কখনো বিয়ে হয়েছিল। তুমিই আমার সব—কী সুন্দর রূপকথার মতো চেহারা, তোমার সংগে কারো তুলনা হয়।—কী হলো, মন খারাপ নাকি? আমি তো তোমার হয়েই গেছি।"

আমাদের দেখা হতো গড়িয়াহাট মোড়ে। দুজনের পক্ষে ওটাই ছিল সবচেয়ে সুবিধেজনক জায়গা। কারণ, ততদিনে আমি জেনে ফেলেছি, স্বামী ছাড়াও সংগে সংগে ও বাড়িও ছেড়েছে। থাকে কাছেই একটা ছোট হস্টেলে। সাজে, ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে; মোড়ে মোড়ে উৎসাহী ছেলেদের প্রতি সাবধানী, কিন্তু সন্ত্রস্ত নয়—বদলে যে-কোনো মুহূর্তে ফণা বিস্তারে পটু।

প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে গোলপার্কের পাশ দিয়ে লেকে চলে যেতাম। একদিন রাস্তা পার হতে হতে পানের দোকানের সামনে গোল একদল ছেলের মাঝখানে ঝুঁকে দাঁড়ানো সুদীর্ঘ একজনকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, "ওই যে তপন, দেখছো।"

ওদের সামনে রাস্তা থেকে ফুটপাথ

উঠলাম। গড়িয়াহাটের ওই ধরনের আড্ডা-বাজারা যেমন ভাবে মেয়ে বা যুগল তরুণ-তরুণীকে দেখে, তেমনি ভাবে এক-সংগে তাকাল সবাই। ঠিক বুঝতে পারলাম না, সেদিন ট্যাক্সির জানলা থেকে সন্ধ্যের অন্ধকারে একেই দেখেছিলাম কিনা। দলটাকে পেরিয়ে এসে ভাবলাম, তপন সান্যালের নিশ্চই পুরনো স্ত্রীকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে করবে; কিন্তু সাহস করে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, দীর্ঘ ছেলেটি পেছন ফিরে বন্ধুদের সংগে পুরোপুরি গল্পে নিবিষ্ট। ছেড়ে আসা তরুণী স্ত্রীর এই নতুন ভূমিকায় এতটা কম কৌতূহলী আমাকে আশ্চর্য ও আশাহত করল। গায়ত্রীর দিকে তাকালাম, সামনে দোকানটার মস্ত ঝলমলে কাচের জানলায় ও তখন মিশে গেছে। কাছে যেতেই বলল, "আবার তুমি তপনকে দেখে মন খারাপ করছ। দেখো, ওই লাল গেঞ্জিটায় তোমাকে দারুণ মানাবে।" তারপর হাত ধরে টেনে ভেতরে ঢুকে গায়ের মাপ দিইয়ে গেঞ্জিটা কিনে হাতে দিতে দিতে বলল, "কী সব হালকা রঙের ফ্যাসকা ফ্যাসকা জামা পর, ভালো লাগে না। সব সময় ঘোর রঙ পরবে —এত সুন্দর ফরসা রঙ তোমার।" তারপর অন্তরংগ রহস্যময়তায় সুর পালটাল, "রবিবার জামাটা পরে সুন্দর করে সেজে এস, এক জায়গায় নিয়ে যাব।"

একটু সন্দিগ্ধ গলায় বললাম, "কোথায়?"

চাপা হাসিতে চোখ ভরিয়ে বলল, "আগে থেকেই অত ভয় কেন?—ভালো জায়গাতেই নিয়ে যাব।"

লাল গেঞ্জির অস্বস্তি নিয়ে গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে এক ধরনের চাপা উত্তেজনায় সময় গুণছিলাম। হঠাৎ দৃষ্টির রাস্তাটা আড়াল করার ভঙ্গিতে সামনে এসে গায়ত্রী বলল, "ওদিকে কী দেখছ, মেয়ে? আমি যখন থাকব না তখন যত ইচ্ছে দেখো। তার চেয়েও ভয় তোমার ওপর আবার কারো নজর পড়ে কিনা, যা সুন্দর দেখতে—একটা মাদুলি দেব, পরে থাকবে, কেমন? তোমাকে কেউ নিয়ে গেলে আমি বাঁচবই না।" বলে হাসল। তারপর চিবুক নামিয়ে মাসকারা চর্চিত পক্ষ-জাল ভেদ করে ওপর মুখো কোণচে দৃষ্টি দিয়ে বলল, "আমাকে কেমন দেখাচ্ছে গো?"

প্রায় দু-কাঁধ খোলা, মাঝপিঠ অবধি অর্ধচন্দ্রাকারে কাটা মস্ত বড় গলার উজ্জ্বল গাঢ় নীল জামা আর একই রকম নীলের অসম্ভব চওড়া ঢালা-পাড় সাদা সিল্কের শাড়ি; গোটা গোটা নীল-কালো পুঁথির মালা গলায়, কানে কালো, বড় গোল পাথরের টেপা দুল।

হাঁটতে হাঁটতে ত্রিকোণ পার্কের পেছন দিয়ে এদিক-ওদিক দু-তিনটে বাঁক নিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন ফুটপাথের অপরিসর নির্জন রাস্তায় এসে পড়লাম। দু-পাশে বকুল গাছ; রেলিং দেওয়া পাঁচিলে ঘেরা ছোট ছোট বাগান-যুক্ত বাড়ি। একটা গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে গায়ত্রী বলল, "ছোটোপিসির বাড়ি, তোমায় দেখাতে চেয়েছি।"

সুবেশা ঝি দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানাল। ভেতরে ঢুকে সোফার ওপর ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে ক্লান্ত ভঙ্গি করল গায়ত্রী। তারপর ডাইনিং স্পেসের এক পাশে হালকা অরেঞ্জ রঙের ফ্রিজ খুলে বোতল থেকে জল খেয়ে সুদৃশ্য গেলাসে খানিকটা ঢেলে আমাকে দিয়ে বলল, "খাও।"

বললাম, "তেষ্টা পায়নি।"

ঠোঁটের কাছে গেলাসটা এগিয়ে ধরে বলল, "হ্যাঁ পেয়েছে, খাও।"

আমি সোফায় গিয়ে বসলাম, পাখাটা খুলে দিয়ে গায়ত্রী দরজার কাছে অপেক্ষায় দাঁড়ানো ঝিকে আদেশের সুরে বলল, "তুই যা, তোকে আর দরকার নেই, আমি এখন আছি।—পুষ্পার সংগে দ্যাখা করে যাব।"

ঝপ করে ঘিরে ফেলল নিস্তব্ধতা। তাকিয়ে দেখলাম, শোবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে জানলার গ্রিলের ওপাশে অন্ধকার ছাওয়া মৃদু-আন্দোলিত দেবদারুর মাথা দেখা যাচ্ছে।

বিছানার পাশের সুদৃশ্য আলোটা জ্বালিয়ে নরম করে শুয়ে পড়ল গায়ত্রী। ম্লান আলোর প্রলেপ ওর বুকের ওপর দিয়ে ছাপিয়ে বিছানাটার রঙ পালটে দিল। চোখ ফেরালাম সেদিক থেকে।

একটু পরে যেন জেগে উঠে গায়ত্রী বলল, "তুমি কি এখানে ম্যাগাজিন পড়তে এসেছ!—আমাকে একা একা ফেলে রেখে আরাম করে বসে আছ, বেশ।"

উঠে গিয়ে পাশে বসলাম। বুকের ভেতরটা ধক ধক করছিল। বলল, "লাল জামাটা পরে তোমাকে ঠিক রাজপুত্রের মতো লাগছে। —আমাকে তোমার পাশে ঝিয়ের মতন।"

লজ্জা পেয়ে বললাম, "কী যা-তা বলছ! তোমাকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে।"

বলল, "সত্যি,—তোমার অন্য সব সুন্দরী বান্ধবীদের থেকে ভালো?"

প্রতিবাদ করলাম, "আমার কোনো বান্ধবীই নেই।"

আবার বলল, "সত্যি! শুধু আমি একাই তোমার? তবে ভালো করে কাছে এসে বস। এসো।"

একটু ঝুঁকতেই টেনে নিল আমাকে। ঝাপটে ধরে চিত করে শুইয়ে বুকের ওপর উপুড় হয়ে সমস্ত চোখমুখ চুমুতে ভরে দিল; জামার বোতামগুলো খুলে হাত ঢুকিয়ে বুকের লোমে বিলি কাটতে কাটতে বলল, "খুলে ফ্যালো, খোলো।"

বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, "ভয় নেই, কেউ আসবে না।" তারপর হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিল।

এক সময় দেখলাম গায়ত্রীর অবারিত বুকের ওপর উপুড় হয়ে ঘাড়ের মসৃণ খাঁজে মুখ গুঁজে রয়েছি। এক হাতে আমায় জড়িয়ে থেকে অন্য হাতে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে পিঠের ওপর আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বলল, "ঠিক হয়েছে, এবার ওঠো।"

আমার স্বাভাবিক ভাব-ভঙ্গিগুলো আবার একটু একটু করে ফিরছিল। আবার একদিন রাস্তার মাঝখানে সোহাগ করে এক হাতে আমায় জড়িয়ে বলল, "ওই দেখো, যাকে দেখলেই তুমি ভয় পাও সে আসছে।"

অবাক হয়ে বললাম, "কে?"

ট্রাম রাস্তার ধারে অপেক্ষাকৃত শ্যামলা রঙের একটু পুরুষ্ট যুবক চেহারার এক-জনকে দেখাল।

বিস্মিত ও দ্বিধান্বিত প্রশ্ন করলাম, "আরো ফর্সা আর ছিপছিপে তো!"

বলল, "গোপালপুর গিয়েছিল, কালো আর মোটা হয়ে এসেছে।"

থমকে গিয়ে ভাবলাম, গোপালপুরে গিয়েছিল কিনা কেমন করে জানা গেল। ছেড়ে আসা তরুণী স্ত্রীর প্রতি ওর উদাসীনতায় একদিন যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, বাতিল করা স্বামীর প্রতি গায়ত্রীর এই মনোযোগ-গুলোও আমাকে কৌতূহলী করল। একটু রাগ এবং ঈর্ষা মিশ্রিত হতাশার সুর বাজতে লাগল তাতে সন্দেহ নেই।

ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী বলল, "আজকাল কায়দা মারা একটা মেয়েকে নিয়ে ঘুরছে, সাজ দেখলে হাসি পায়,—আমাকে দেখাবার জন্যে; আমার যে তুমি আছ সেটা যদি জানত খুব জব্দ হতো—দেখতে পায়নি।"

তার মানে আগের দুজন তপন সান্যাল ছিল না! কে তাহলে? তাদের দেখিয়ে পরিত্যক্ত স্বামী বলে পরিচয় দিয়েছিল কেন? অথবা এ-ও নয়, তপন সান্যাল আর
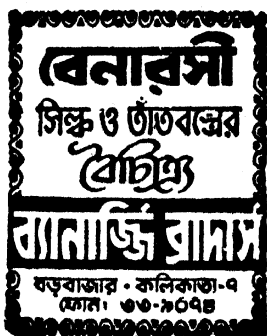
কেউ। মনে হলো যে ঘটনাটা আমাকে ঘিরে রয়েছে তা আমার আয়ত্তে নেই। প্রবল অস্বস্তি নিয়ে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, সঠিক তপনকে আবিষ্কার করতে হবে। জানতে হবে। প্রশ্ন করলাম, "সত্যি করে বল তো ছাড়াছাড়ি হলো কেন?"

বলল, "ওসব আজেবাজে কথা ছাড়ো। —তপনের ভূত তোমার মাথায় ঢুকেছে।"

বললাম, "বলই না।"

বলল, "বলেছি তো কতবার, প্রথম দেখে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল, বাচ্চা ছিলাম তো। তারপর দেখলাম একদম ক্যাবলা, ভালো করে রাস্তা পর্যন্ত পার হতে পারে না।"

অবাক হয়ে বললাম, "অতদিন যখন প্রেম করলে তখন বুঝতে পারনি!"

বলল, "তখন কি ছাই ওসব দেখতে গেছি। বোকা ছিলাম তো। —তখন যদি তোমার সঙ্গে দেখা হতো কী ভালো হতো।"

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে এসে আমি অসহায় ভাবে ওর হাত চেপে ধরলাম। গায়ত্রী বলল, "আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? —তার মানে আমাকে আর ভালোবাস না।"

প্রতিবাদ করে বললাম, "ভীষণ ভালো-বাসি, তোমাকে আমি রোজ চাই।"

"তাহলে বাড়িতে বলেছ?"

"কী?"

"বিয়ের কথাটা। দেখবে বউ করে ফেললে ওই বিচ্ছিরি তপন আর ভয় দেখাতে আসবে না।"

তপনের বদলে ওই কথাটাতেই ভয় পেলাম বেশি। বললাম, "বাড়িতে কিছুতেই মানবে না, বাবা কী রকম কড়া লোক জানো না। ভাবছি আগে একদিন এমনি বাড়িতে নিয়ে যাব। আলাপ সালাপ কর, আস্তে আস্তে পছন্দ হয়ে গেলে ওই ব্যাপারগুলো চেপে গিয়ে বিয়ে করে ফেলব।"

বলল, "না, ওরকম চোরের মতো আমি বউ হতে পারব না। আমার বিয়ে হয়েছিল তো কী হয়েছে; কত মেয়ে যে বিয়ে না করে কুমারী অবস্থায় কত লোকের বউয়ের মতো হয়ে কাটিয়ে তারপরে আর একজনকে বিয়ে করছে?"

যুক্তির দৃঢ়তায় অধৈর্য হয়ে বললাম, "সে সব কথা তো কেউ জানতে যাচ্ছে না, এখানেও ওসব জানালে চলবে না।"

রেগে জবাব দিল, "তপন যে মেয়েটার সঙ্গে ঘুরেছে, যাকে বিয়ে করবে, তার বাড়িতে কি জানবে না ভেবেছ ওর একটা বউ ছিল।"

অবাক হয়ে তীব্র স্বরে বললাম, "তপন কি করবে না করবে তা দিয়ে আমাদের দরকার কী!"

গায়ত্রী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সহজ ভাবে বলল, "আলাপ-পরিচয় করে সকলকে খুশি করার মতো অতদিন অপেক্ষা করতে হলে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে, আর কারো মনেই থাকবে না। —আমি কথা দিচ্ছি, বিয়ের পর সেসব আমি প্রাণপণে করার চেষ্টা করব। —আমি জানি তা আমি পারব।"

বললাম, "তুমি অবুঝের মতো করছ। নিজেদের সুবিধে ছাড়া তোমরা কিছুই বুঝতে চাও না। বলেছি তো বিয়ে করব, একটু সময় দাও।"

এরপরেই হঠাৎ অফিসের নাটক নিয়ে গায়ত্রী এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে দেখা পাওয়াই ভার। অনেক সাধ্যসাধনার পর এক শনিবার সারাদিন কাবার করে সাড়ে সাতটার পর এল। বলল, "বসব না কোথাও, নাটকের জন্যে কিছু টুকিটাকি কেনার আছে, এখুনি না কিনলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। কাল আবার রোববার। —আসবে নাকি?"

বাধ্য হয়ে একদিন হস্টেলে খোঁজ করতে গিয়ে বুকটা ধক করে উঠল—ছেড়ে দিয়েছে। অফিসে ফোন করে শুনলাম, দীর্ঘ ছুটিতে। কেটে গেল কতগুলো অসহ্য দিন। কৌতূহলী হয়ে ওদের নাটকের একটা সুভেনির জোগাড় করে দেখলাম, উজ্জ্বল চেহারার এক তরুণ অফিসার পরিচালক, নায়িকা গায়ত্রী।

এর ক'দিন পরেই গড়িয়াহাটা মোড়ে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ধরলাম। প্রশ্নের উত্তরে সহজ ভাবে বলল, "বিয়ের পর একই অফিসে স্বামীর পাশে কেরানী হয়ে থাকা সম্মানজনক নয় বলে ছেড়ে দিয়েছি।"

সিঁথির দিকে অবিশ্বাসে তাকালাম, "বিয়ে হয়ে গেছে তোমার!" গলার স্বরটা কেঁপে গেল।

বলল, "রেজিস্ট্রি—অনুষ্ঠানটা এখনো হয়নি বলে সিঁদুর দিইনি। ওরকম লুকিয়ে-চুরিয়ে সিঁদুর পরা আমার পছন্দ নয়। সবাই দেখবে না, তা কি হয়।" বলে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসল।

॥ একত্রিশ ॥

মহিষ-কালো আকাশ, বাজ-ডাকা বিজলী হানাহানি নেই, বহে মাটি উপড়ানো বাতাস, দাপানো দাপানো ঝাপটানো কেবল বড় বড় গাছপালার মুণ্ড না, ঘাসের গোড়া পর্যন্ত উপড়ে ফেলতে চায়, এমন দুরন্ত রোষ শন্‌শন্ অবিরত ঝটিকা গতিতে আসে পূব সাগরের বুক থেকে। সঙ্গী বৃষ্টি, কখনো মুষলধারে বা কখনো কিঞ্চিৎ মৃদু, নিবিড় ধারালো। ঝোড়ো বাতাস সঙ্গী বৃষ্টিকে যেন নাচায় কাঁপায় হাতে হাত ধরে মাতামাতি করে, ঝাঁপায়, ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাঙ্গেয় উপকূলে, গাছের মুণ্ড ধরে উপড়ায় কুটিরের ঝিঁটকি টেনে ছুঁড়ে দেয়, আমন ধানের শিষ শুইয়ে দেয় মাটিতে ঝাপটায় ঝাপটায়, ধসিয়ে দিয়ে যায় জীর্ণ ইমারত। গাঙ্গেয় উপকূল—পশ্চিম, পূবে দক্ষিণে, এক মাস আগে বিধ্বংসী ঝড়ের ঘায়ে সর্বহারা মেদিনীপুর আর একবার মার খায়, আর গাঙ্গেয় উপকূল ধরে কলকাতা, সমগ্র চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, রূপনারায়ণের কূল ধরে হাওড়া, পূব দক্ষিণের যশোহর খুলনা, অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ, পদ্মার কূলের সঙ্গে হাত মেলায় সামুদ্রিক ঝড়, ধ্বংসের তাণ্ডবে মাতে, শাসায়, এমন কি ধাওয়া করে যায় আরো উত্তরে পশ্চিমে।

নাই কুড় কুড়, ট্যাম কুড় কুড়, ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং দুর্গতিনাশিনীর পূজার ঢাকের বোল ঝড়ের গ্রাসে, বিসর্জনের তাল লেগে যায় আলোহীন অন্ধকারে, ঠাকুর থাকবে কতোক্ষণ? ঠাকুর যাবে বিসজ্জন। এই ছড়ার তালে তালে নৃত্যকৃত্য যাদের আনন্দ, সেই বালক-বালিকারা গৃহবন্দী। বিসর্জন, বিজয়ার সব উল্লাস খুশি ঝড়ের থাবড়ায় আহত, বৃষ্টির ধারাপাত ওদের চোখে। বারোয়ারি পূজামণ্ডপ অধিকাংশ ছিন্নভিন্ন, দশভুজা সন্তান-সন্ততিসহ ঝড়ে কাঁপে, জলে গলে, এবং বিদায় বরণে উপস্থিত পুরস্ত্রীগণের চোখে শঙ্কা গলিত প্রতিমা দর্শনে। তথাপি পুণ্যের আশা, দেবী-দেবগণের মুখে স্পর্শ করে মিষ্টি, ফলমূল, গ্রাসে সিঁদুর, যে ভাবে দেবী-দেবগণের বৃষ্টির ছাটে ভেজা মুখে মিষ্টি ও ফলের স্পর্শে মুখগহ্বর দেখায় কিম্ভূত—যেন হা মুখ ব্যাদান করে গ্রাসে উন্মুখ এবং পুরস্ত্রীগণ একে অপরের কপালে সীমান্ত ও শাঁখায় স্পর্শ করে সিঁদুর, আর চুপি চুপি বলে, 'দুর্গার কী দুর্গতি! বড় দুর্দিন!'... তবু কাতর প্রাণে জপে, 'মাগো দুর্গতি-নাশিনী, ভালো রাখো আমাদের, ভালোয় ভালোয় এসো এবারের মতো।'...কিন্তু শৈলীবুড়ির অতি জয়াল শানানো স্বরে চিৎকার বাজে, 'দেখিস, দশ হাতে লুটেপুটে খাবে। ঝ্যাতো হারামজাদা হারামজাদি আছে কাটনাকুটনি আছে, শেয়রের বাচ্চারা আছে আমার পেছুতে লাগে, দুগ্গা দশ হাতে তাদের চেটেপুটে খাবে।' যেন অমোঘ দৈববাণী বাজে দুর্মুখ বুড়ির মুখে। বাতাসের শ্বাস নিতে সেই অশুভ সংকেত, কিন্তু ডাগর যুবকরা হিংস্র হয়ে উঠে বুড়ির শনুনুড়ি চুল টেনে ছপটি দিয়ে মারে। অশক্ত-শরীর বুড়ি কাদায় পড়ে কাতরায় আর্তস্বরে। শুনে, বৃষ্টিভেজা মিলন-মরশুমের হন্যে কুকুরেরা প্রতিধ্বনি করে বিকট টানা সুরে, প্রাণে প্রাণে অমঙ্গল সূচিত হয়ে ওঠে, আর ঝড়ের ঝাপটায় মণ্ডপের বাঁশের বাঁধন মচমচ মড়মড় করে, ছন্নবাঁধা ত্রিপল ঝাপটা খায় ঠাসঠাস।

উনপঞ্চাশের এই শারদোৎসবে পাখিরা বাসা ছাড়া, ছিন্নভিন্ন বাসা ধুলোয় গড়াগড়ি যায়, ঝোড়ো বাতাসে চারদিকে কেবল কুকুরদের চিৎকার, উৎসব বৃষ্টিতে ভেজা, অন্ধকারে ঢাকা, মানুষেরা কাকভেজা এবং অনেকের কানে বেজেছে দিনের বেলা শেয়ালের ডাক, ভেঙে যাওয়া বস্তিবাসীরা অনেকে গৃহহারা, পাঁকে কাদায় চারদিক থকথকে, ঝড়ে বৃষ্টিতে পৌর শ্রমিকেরা কাজে অক্ষম, সবখানে ময়লার ডাঁই, বাতাসে দুর্গন্ধ, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—ঘরে ঘরে অসুখ-জ্বর সর্দি কাশি আমাশা এবং ঢাকিরা ঝড়বৃষ্টিতে কাতর, অশক্ত, আগুনে সেঁকেও ঢাকের চামড়ায় টান ধরে না। দিনের বেলা অন্ধকার, রাত্রে নিষ্প্রদীপ, আলো নিষিদ্ধ, অন্ধকার গাঢ়তর এবং ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবকে দ্বিগুণতর মনে হয়, তথাপি ছাপিয়ে ওঠে তারি মোটর ট্রাকের সুদীর্ঘ কনভয়ের শব্দ, কুকুরদের চিৎকার, শহরের আশেপাশে দলবদ্ধ শেয়ালের ডাক, বেড়ালের কান্না, আর বোমানহানার তরঙ্গায়িত সংকেত, আর পি ওয়ার্ডেনদের হুইসল, ছুটে চলা টর খটখট। সম্পন্ন গৃহস্থদের ঠাকুর-দালানের দুর্গতিনাশিনী প্রতিমাগণ, বিসর্জনে যাবার আগে পর্যন্ত অটুট, কিন্তু বিসর্জনের যাত্রায় বাইরে আগমনমাত্র গলে যায়, খসে পড়ে, সেবকদের স্বরে দুর্গার জয়ধ্বনি বাজে না, চালচিত্র বৃষ্টির ছাটে কাদা হয়ে গলে, বাহকেরা পর্যুদস্ত, প্রায় অন্ধ—কারণ বৃষ্টির ছাট চোখে সূঁচের মতো বেঁধে।

'কী অমঙ্গল! কী দুর্বৎসর!' সকলে বলাবলি করে, 'কী একটা সর্বনাশ যে ঘটবে!' এবং পুজার মণ্ডপে মণ্ডপে দালানে দালানে পূর্ণঘটের পাশে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ অনির্বাণ রাখা যায় না, যা অনিবার্য নিয়মানুযায়ী কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত পালনীয় এবং যেখানে দুর্গতিনাশিনীর পূজা হয় সেখানে শুক্লা দশমীর পরে পূর্ণিমায় লক্ষ্মী অবশ্য পূজ্যা। অবিরত বৃষ্টিপাতে কিছু বিরতি দেখা যায় এবং ঝড় কিঞ্চিৎ প্রশমিত, কিন্তু অন্ধকার ঘোচে না, পূর্ণিমা আসে। পূর্ণ শরতচন্দ্র অদৃশ্য, অন্ধকার

কাঁসর ঘণ্টা বাজে, শঙ্খধ্বনি হয়। কোঃ জাগর। কে জাগে। প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষ্মীঠাকরুণ এই পূর্ণিমার রাত্রে নিজে ঘরে ঘরে চাক্ষুষ করেন, তাঁর ভক্তরা কে জাগে। এই নিয়ম, আজ রাত্রে তাঁর পূজা করে, স্বামী স্ত্রী জেগে থাকে, এবং সারা রাত্রি দুজনে গোলকধাম ও কড়ি চালাচালি করে নানা খেলা খেলে, লক্ষ্মীনারায়ণ যেরূপ করেন এবং লক্ষ্মীর নানা উপাখ্যান ও পুণ্যকীর্তন করে, সেই স্বামী-স্ত্রী পুণ্যবান পুণ্যবতী, লক্ষ্মীঠাকরুণ তাদের ঘরে অচলা হয়ে থাকেন। কিন্তু থেকে থেকে বৃষ্টিপাত ঝোড়ো বাতাস, অন্ধকার, কুকুর আর শেয়াল-দের চিৎকারে কাঁসর ঘণ্টার শব্দে যেন মঙ্গল ধ্বনিত হয় না, পুণ্যবান পুণ্যবতীদের চোখে নেমে আসে অকাল নিদ্রা। তাদের বিশ্বাস হয়তো লক্ষ্মীঠাকরুণ তাঁর বাহন প্যাঁচাকে নিয়ে কি ভ্রমণ করেন গৃহস্থের দরজায় দরজায়, রুষ্ট হোন এবং প্যাঁচার অপলক ভ্রূকুটি চোখে কি সকলই বৃশ্চিক আর পতঙ্গবৎ?

তথাপি কোঃ জাগর? ওস্তাগার গলির রমণীরা তাদেরও লক্ষ্মীর ধ্যান এবং নাগাই ও জিতফত ও সুরেশের জুয়ার আড্ডা, গোলকধাম বা কড়ি চালাচালি না, তাসের খেলায়। কালু হালদার জাগে পণ্টু ফিটারের বউ তারার সঙ্গে—এক অতি পুরনো খেলায়, রমণী পুরুষের একান্ত খেলা, যা লজ্জা ও উল্লাসে ভরা, পাশেই পণ্টু ফিটার আকণ্ঠ নেশায় অঘোরে ঘুমায়, কারণ পণ্টু *কারখানার যে সেকশনে ফিটারের কাজ করে কালু হালদার সেই সেকশনের ফোরম্যান—যাকে সর্বেসর্বা বলা যায়—সে পণ্টুকে নেক-নজরে দেখে থাকে এবং পণ্টু এই শহরের এক প্রান্তে বালি তালাওয়ের ধারে কালু হালদারেরই একটুকরো জমিতে কুটিরে বাস করে। এই সব ব্যবস্থা পূর্বপরিকল্পিত ছিল* না, অনেকটাই ঘটনাচক্র, বছর দেড়েক আগে, তারপরে একটি পরিকল্পনার রূপ নেয়, যেন কিছুটা অনিবার্যভাবে। তার মধ্যে একজনের অবিশ্যি প্ররোচনা ছিল—সে পণ্টু ফিটারের মা মতি। সমগ্র শহর এলাকায় এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে, বয়সকালে মতি স্বেচ্ছাচারিণী ছিল, পরবর্তীকালে শিকারী। শিকারী—ডাক পাখির। ডাক-ডাহুক যার নাম, তাকে শিকার করবার জন্য অবিশ্যি শিকারী একটি ডাহুকিকে ব্যবহার করে যে খাঁচার ফাঁদের মধ্যে বসে বিরহিণীর মতো ডাকে এবং ডাহুক কামনাব্যাকুল হয়ে বিরহ ঘোচাতে খাঁচার ফাঁদে প্রবেশ করে, ফাঁদের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মতির ফাঁদ তার একমাত্র ছেলে পণ্টু, যে চটকলে পিন বয়ের কাজে প্রথ ঢুকেছিল। শক্ত সমর্থ পেশীবহুল ডাগরা পণ্টু, কালো, থ্যাবড়া নাক, মোটা ঠোঁট, ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ানো ঘন চুল। মতি দেখেশুনে গায়ে-গতরে ঠাস যৌবন মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। পণ্টুকে দেখলে মনে হয়, লড়াকু মোরগা, গোঁয়ার গোবিন্দ, কিন্তু আসলে ঠান্ডা সাদাসিধা, বুদ্ধিসুদ্ধি কম, মায়ের অতি বাধ্য, মন্ত্রমুগ্ধ বলা যায়। থাকতো টিন্ডাল রোডের এক গলির বস্তিতে। পণ্টু যে বড় মিস্তিরির সাকরেদি করতো, বিয়ের পরে ঘরে প্রথম আগমন তার। পণ্টুর বউ অবাধ্যতা করেছিল, বাধ্য করার সকল রকম অস্ত্র ছিল মতির হাতে, অতএব সিদ্ধিলাভে বেগ পেতে হয় নি। পণ্টু ফিটার হয়েছিল এবং পণ্টু ফিটারের ঘরে বাছাই করা লোকদের আনাগোনা ছিল, অবিশ্যি পছন্দ অপছন্দ বাছাবাছি সবই ছিল মতির, কারণ কার ভাণ্ডে কতো গুড়, সেটা যাচাইয়ের ক্ষমতা ছিল তারই। পণ্টু মদ খেতে

শিখেছিল, সেই এক রসেই সে তৃপ্ত ছিল। কিন্তু বছর তিনেকের মাথায় বউটির চিন্তা ভাবনা স্বাবলম্বী হয়েছিল। শ্বাশুড়ির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, পঞ্চুকে চেতিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং নিজের মূল্য বুঝতে পেরে নিজেকে আর বঞ্চনা না করে চলে গিয়ে একলা স্বাধীন জীবনযাপন শুরু করেছিল। মতি জানতো, সেক্ষেত্রে সে আজ-সজ্জি লড়াই অচল, পঞ্চুকে পাঠিয়েছিল বউকে সোহাগ করে ডেকে আনতে। বউ প্রস্তাব দিয়েছিল, পঞ্চু বরং তার মাকে ছেড়ে বউয়ের কাছে থাকুক। দুই স্বেচ্ছাচারিণীর মাঝখানে পঞ্চু। হামাহানি মার আর বউয়ের, তার পক্ষে তাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। মাঝখান থেকে কারখানায় নানা রকম বিদ্রূপ আর টিকাটিপ্পনিতে ক্ষেপে মিস্তিরকে একদিন মেরে বসেছিল যা একেবারে অভাবিত ছিল এবং পরিণতি, হাজিরার বোর্ডে টিকেট গায়েব, যার অর্থ কারখানা থেকে পঞ্চুর অস্তিত্বও গায়েব। তার জন্য মতি খুব চিন্তিত ছিল না, একটা বিষয় ছাড়া পঞ্চু ক্ষেপে গেলে যে কোনো লোকের গায়ে হাত তুলতে পারে। ছ' মাস বসে খাবার মতো রসদ মতির হাতে ছিল। তা ছাড়া, চটকলগুলোতে ইতিমধ্যে তিন শিফট চালু হতে আরম্ভ করেছিল, কারণ, যুদ্ধের প্রয়োজনে চটের থলি যাকে বলে গানি ব্যাগ, চাহিদা ছিল লক্ষ লক্ষ গাঁটের যদিও যুদ্ধের শুরুতে কয়লার অপ্রতুলতার আশংকায় কিছু চটকল বন্ধ হতে আরম্ভ করেছিল। যুদ্ধ শুরুর আগে কলকাতার পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা সমস্ত পৃথিবীর বাজারে এত কমে গিয়েছিল যে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল অনেকগুলো কোম্পানি, পাট-চাষীদের সমস্ত জমি জুড়ে ধান চাষ ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ সমস্ত কিছুর মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল চটকলের ইতিহাসে। এই প্রথম তিন শিফট—অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা উৎপাদন চালু হয়েছিল। পঞ্চুকে মোটামুটি দক্ষ শ্রমিকের পর্যায়ে ফেলা যায় অতএব ভিন্ন চটকলে কাজ পেতে অসুবিধা হয় নি এবং মতিরও দেরি বা অসুবিধা হয় নি পঞ্চুর আর একটি বউ যোগাড় করতে। কিন্তু মতির একটু ভুল হয়েছিল। বউ বলে যাকে যোগাড় করেছিল সে দেখতে শুনতে খারাপ না, রঙ ফরসা, চোখে মুখে চটক ছিল, গায়েগতরে ধন্দ ধরানো ঢল ছিল তবে বয়সটা একটু বেশি, প্রায় পঞ্চুকে ছাড়িয়ে যাবার মতো এবং বিয়ে আগেই হয়েছিল। স্বামীর ঘরে মন টিকছিল না, মনের মতো একটা ঘরের খোঁজে ছিল। এসেছিল পুরুলিয়া থেকে স্বামীর সঙ্গে এই কারখানার বাজারে। মতির সঙ্গে চেনাশোনা থেকে একটু ভাব ভালবাসা হয়েছিল, দুজনে দুজনের মনের দুঃখ অনুভব করেছিল। পঞ্চাশোর্ধ মতি, আহত বাঘের মতো বা

গাছপালা তৃণহীন অঞ্চলের শকুন হতো, যারা মানুষের মাংস এবং বিষ্ঠায় ভোগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। একবার সে যে-জীবনের স্বাদ ভোগ করেছে, সহজে তা ছাড়া সম্ভব না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও নিয়তি, সংযত লেগেছিল। আগের বিবাহিতা পুত্রবধূ নিজের ভাগ পুরোপুরি বুঝে নিতে বিবাদ বিসম্বাদ না করে চলে গিয়েছিল, পুরুলিয়ার যোগাড় করা বউ মতিকেই চুলের মুঠি ধরে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়েছিল, চেপে ধরেছিল পঞ্চুকে। রকমফেরে আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। পঞ্চুর একটাই অসুবিধা—রমণী দুই বিবাদের মাঝখানে সে বড় অসহায় বোধ করে, যদিও মায়ের দিকেই ওর টানটা বেশি, কিন্তু গত্যন্তর না দেখে পালিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করেছিল, ঘরে ফেরাই বন্ধ করে দিয়েছিল। মতি সেই সুযোগটি নিজে নিজেও ঘর ছেড়েছিল, চলে গিয়েছিল গঙ্গার পশ্চিম পারে। পুরুলিয়ার যোগাড় করা বউয়ের কারোর কাছে অভিযোগ করার কিছু ছিল না, সকলেই যে যার ইচ্ছানুযায়ী রীতি বিধি তৈরি করেছিল, ভোগেছিল, অতএব পুরুলিয়ার বউ নিশ্চিন্তে অনেক স্বৈরিণীর মতো নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সেই সময়টা পঞ্চু কয়েক মাস মায়ের সঙ্গে নদীর পশ্চিম কূলে কাটিয়েছিল এবং মতির হাতযশের দিয়ে কেউ ফাঁক কাটতে পারবে না, সে ছেলের আর একটি বিয়ে দিয়েছিল। অনস্বীকার্য মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে, মতিরও বেড়েছিল। সে ডাগর বউ ঘরে আনে নি। ভাঁটার শেষ জোয়ারের প্রত্যাশায় নদী যেমন থমকে থাকে কলকল্লোলে ভরে উঠবে বলে, তেমনি একটি ছোট্টটি বউ ঘরে এনেছিল। কাদামাটি দিয়ে মনের মতো প্রতিমা গড়া যায়। গরীব দুলে ঘরের তেমনি একটি মেয়ে সে যোগাড় করেছিল। মায়ের জমানো টাকা ভেঙে যথার্থ বিয়ে দিয়েছিল, লোকজন খাইয়েছিল।

সেই বউ এই তারা, যে কালু হালদারের সঙ্গে জাগে, প্রথম জোয়ারের ঢল যার গায়ে। জোয়ারের কাল পূর্ণ হতে এখনো অনেক বাকি, তখন পূর্ণ ঢলে ঐ মেয়েকে ধরে রাখতে পারলে হয়। সবে সতেরোয় ঝমকায়, চুয়ান্নর কালু হালদার নবজীবনের সঞ্জীবনী সুধা পান করে। তারাকে বাইরে থেকে দেখলে দেখায় যেন লাজুক লাজুক বউটি, ঘোমটার ফাঁকে হাসে হীরা জোঁটে ঝলক দেয়, নাকছাবির ঝুটো পাথরে ঝিলিক হানে, চোখে নরম ধর ছুরি, কিন্তু দপদপানো না, ডাগর কালো চোখের দিকে তাকালে মরতে ইচ্ছা করে যাকে বলে মিছরির ছুরি না কি হাঙরের দাঁত? কাটলে জানা যায় না, অঙ্গ হার বার পরে জানা যায় মরণ হয়েছে। একহারা ডগডগে কাঁচা শরীর কিন্তু আলতা পরা পায়ের গোছায় হাড় শির দেখা যায় না, মাজা মাজা রঙের সুঠাম উন্নত, সবে

নামা ঢল মাজায়, বুক দেখলে মনে হয় ডাঁসা পেয়ারা জোড়া, তবু অনম্র উদ্ধত। ভুরুভঙ্গি দেখলে মনে হয়, আঠারো কলায় কলাবতী, সুখ-সন্ধিসন্ধি সব জানা। এ ক্ষেত্রেও মতির হাতযশ জাগে। কোনো দিনের তরে সংযম লাগে নি, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তৈরি করেছে। কালু হালদারের যোগাযোগ কেমন করে?

সম্পন্ন বাবু কালু হালদার, এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ফোরম্যান স্বভাবতই একটু বাম-মুখো মানুষ। নদীর এ-কূল, ও-কূল দু কূলে সমান যাওয়া-আসা, খোঁজ-খবর উঁকিঝুঁকি ছিল। ঘরের বউয়ের আকর্ষণ আজকাল গত। সাতটি সন্তান বেঁচেবর্তে থাকলেও ঐ যাবত তেরোবার বাড়ির পিছনের উঠোনে অস্থায়ী আঁতুড়ঘর বানিয়েছে ঘরামিরা। না বানালেও কথা ছিল না, ধর্মে মতিগতি ঠিক রেখে দুবেলা জপতপ করে গৃহ-পরিবারকে বাইরের অনাচারের হাওয়া থেকে আড়াল রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে এমন কি পনেরো বছরের মেয়ে মল্লিকাকে নিজে সঙ্গে করে বালিকা বিদ্যালয়ে পৌঁছিয়ে দিয়েও উঁকিঝুঁকি খোপে কোপ, বরাবরের একটা অভ্যাস। পাড়াপড়শীর বা শহরের ছিটছাট মহলে যে জানা-জানি ছিল না তা না। স্বৈরিণী কুলে কালু হালদার কুলপতি বাক্তি। নদীর এ কূলে মেলামেশার গলি একটু অসুবিধার জায়গা, বড় বেশি জানাজানির ভয়, অতএব ঘনিষ্ঠের সঙ্গে ঘোরাফেরাটি ভাল মেলে, কিন্তু নদীর ও-কূলে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। বিশেষ
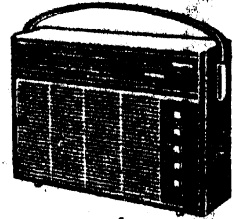
করে ফ্রেঞ্চ চন্দননগর। সেই রকম এক গু-ন্ডাদলের সফরে বছর দেড়েক আগে একদিন মতির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। কেউ কারোর অচেনা অজানা না, কাঁচা বয়সের বন্ধুত্ব। মতি কালু হালদারকে ডেকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। কালু হালদার সব দেখেশুনে মনস্থির করেছিল। পণ্টুকে চটকল থেকে নিয়ে গিয়েছিল এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরিতে নিজের সেকশনে। বালি তালাওয়ের নিরালায় নিজের জমিতে মাটি লেপা ছোট বড়ার ঘর তুলে দিয়েছিল। সেই থেকে শুরু। সমস্যা যে ছিল না তা না। সমস্যা মতির। কালু হালদার বয়স্ক লোক আর দশদিকে ছুটে বেড়াতে পারে না, পণ্টুর ঘরে সে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। খরচে হাত টান নেই। সবই ভালো কিন্তু মতির মন মানে না। ছেলের বউকে সে কারোর কাছে বাঁধা রাখতে চায় নি, দশজনকে নিয়ে ঘর জমাতে চেয়েছিল। আরো দশজনের নজর আছে তো, তাদের বঞ্চিত করতে মতির প্রাণ চাটায়। কিন্তু কালু হালদারের সঙ্গে বিবাদ করা কঠিন। তা ছাড়া, গটিকয় ডাগরা ছোঁড়া কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে অসময়ে দরজা কামড়ে বসে থাকে, বিড়ি ফোঁকে, গান গায়,

আবার জল চায়। তারা হেসে জল ভরে ঘটি এগিয়ে দেয়। মতির প্রাণে সুখ নেই। পঞ্চু এ সবের সাতে-পাঁচে নেই। কাজ করে, মদ খায়, বউ যদি নিজের থেকে একটু কাছ ঘেঁষে বসে তবে দু'একটা কথা হয়। বউ যদি টানাটানি করে তবে একটু নেশার ঘোরে মাতামাতি করে। এখন মতি ভাবে, পঞ্চুটাও যদি নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেয় ভালো হয়। কালু হালদারের কাছে বউকে অমন করে সঁপে দেবার কী আছে? হালদারকে বুঝতে দিক, বউ ওর নিজের। বুড়ো হালদারের রোজকার রস খাওয়া ক্ষমতার যোগানদার না। কিন্তু কে বলবে। পাশের আগলবদ্ধ রান্নাঘরের স্যাঁতায় চটের ওপর কাঁথা পাতা বিছানায় শুয়ে শুয়ে মতিও জাগে আর ভাবে। রেড়ুর ফুটো দিয়ে হ্যারিকেনের আলোয় উলঙ্গ বুড়ো আর ছুঁড়ির খেলা দেখবার কিছু নেই। কেষ্ট, ছেলটা পাশের ঘরেই এক পাশে মদ খেয়ে ঘুমায়। বাইরে কদবেল গাছে বাতাসের ঝাপটায় সাঁই সাঁই শব্দ ওঠে। বালি-তালাওয়ের পুবের জঙ্গলে শেয়ালের পাল ডেকে যায়, দূরে কুকুরের চিৎকার এবং মাঝে মাঝে ডাগরা ছোঁড়াগুলোর খলখল হাসি ভেসে আসে অলৌকিক দানোর হাসির মতো।

প্রবচন ও বিশ্বাস মতো লক্ষ্মীঠাকরুণ কি চাক্ষুষ করেন এবং বাহন পেঁচক অপলক ভ্রূকুটি চোখে কোঃ জাগর? সারা পৃথিবী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় না, অন্ধকারে এবং দরজাবন্ধ ঘরে কালু হালদারের বালক পুত্র ছোটন জাগে, বাতির সামনে বকুলতলা থেকে নিয়ে আসা নগ্ন বিদেশিনী সুন্দরীদের ছবি রেখে ওর অনাগত যৌন গর্জিত তেজে ফোঁসে। মল্লিকা অন্ধকার ঘরের খোলা জানলায় জাগে, রাস্তায় প্রেত-মূর্তির মতো নরেশ। মোহন জাগে ওর অন্ধকার ঘরের বিছানায়, শিয়রে নিয়ে শিউলীর চিঠি ত্রিদিবেশকে লেখা এবং অতি কষ্টে সংগৃহীত গর্ভপাতের ওষুধ। চন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে জাগেন, সিঁড়ির মুখে দোতলার অন্ধকার বারান্দায়, উত্তরের দূরে ক্ষীণ-রেখা আলোয় একটি নারীমূর্তি।...... মাঝে মাঝে বিরতির পরে বৃষ্টিপাত ও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়। বহু জাগে, বহু রূপে, পশু কোনো কোনো পক্ষী, পতঙ্গ মানুষ এবং জাগে প্রতাপ মজুমদারের পরিবার। একটি চিরকুটকে বাতির সামনে রেখে, 'তোমরা আমাকে অভিশাপ দিও না। আমার আর থাকা চলে না। আমার নিজের জায়গাতেই আমি যাচ্ছি। জানি না, কী করলাম, আমার কী হবে। যদি ঘৃণা কর সবাইকে বলো, আমি মরে গেছি। ইতি ফুলি।'... ..

প্রতিটি দেওয়াল ও ছাদ বাইরে ভিতরে ভিজে যাওয়া প্রাচীন মজুমদার বাড়ি ঝড়ের ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। দরজায় জানালায় যেন করাঘাত এবং নখে আঁচড়ানোর শব্দ বাজে। প্রতাপ মজুমদারের দুই চোখ টলটল করে, গোঙানো স্বরে বলেন, 'কোথায় মরতে গেল ফুলি, ও যে আমার জগদ্ধাত্রী মেয়ে!'...

ক্রমশ

সরস্বতী পূজোর উৎসব

একালকার ছাত্রসমাজে সরস্বতী পূজোর উৎসব সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট নয়,—না হবারই কথা;—তবে বুঝতে পারি আমাদের যুগের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেকখানি। আজকাল সরস্বতী পূজো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে; নিশ্চয়ই কলেজে, হস্টেলেও পূজো হয়ে থাকে,—কিন্তু আগেকার যুগের মত বিকেলে গানের জলসা তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কিনা জানি না। পলিটিকস আজকাল সমস্ত ছাত্র-মানসকে এমন বিভ্রান্ত করেছে যে কোনও অনুষ্ঠানই বোধহয় নিছক আনন্দের প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয় না। আমাদের যুগেও পলিটিকস ছিল, কিন্তু তা ছাত্র-মানসকে এমন স্থৈর্য থেকে বিচ্যুত করেনি। সেই বিশ, তিরিশ দশকের স্মৃতি স্বভাবতই এখনও আমাদের মনে বেশ স্পষ্ট। বাল্য-কালের বহু ঘটনাও মনে আছে। আজকের যুব সমাজের কাছে তার একটা চিত্র বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাল্যকালের প্রসঙ্গ তুলছি বিশেষ কারণে, যেহেতু আমার সৌভাগ্য হয়েছে এমন একটি স্থানে মানুষ হবার যেখানে বাংলার সংস্কৃতি ছিল সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত; যেটা ব্রিটিশশাসিত এলাকার প্রায় ধারণাই করা যেত না। সেই স্থানটি হচ্ছে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। আজকের ত্রিপুরা আর সেদিনের ত্রিপুরার ব্যবধান অনেক। তখন সেটা ছিল সত্যিই দুর্গম পাহাড়। ত্রিপুরা আগরতলার চেহারায় যেটা ছিল—সেটা একটা শহরের ছায়া মাত্র। বঙ্গদেশের এক সুদূর সীমান্ত সেই শহরে আমাদের জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ হিন্দু আচার সমন্বিত বাঙালীয়ানায়। বর্তমান ত্রিপুরায় যাঁরা বাইরে থেকে এসে বসবাস শুরু করেছেন তাঁরা হয়ত জানেন না সেকালে ত্রিপুরার সরকারী, এমনকি আদালতের ভাষাও ছিল বাংলা; চালচলন ছিল সম্পূর্ণ বাঙালী। নিঃসংশয়েই অবিভক্ত বাংলায় এইটিই ছিল একমাত্র রাজ্য যেখানে আবহমানকাল থেকে কোনওদিন বাংলা ছাড়া আর কোনও ভাষা সরকারি সমাদর পায়নি এবং বাঙালী পূজো-পার্বণ উৎসবাদি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। সবার উপরে রবীন্দ্র-নাথের পুণ্যপ্রভাব এই রাজ্যকে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর একান্তভাবে আস্থাবান করেছিল। হিন্দু মুসলমান উভয়ের নিবিড় সহযোগিতায় এই বঙ্গ সংস্কৃতি সেখানে অটুট ছিল।

সরস্বতী পূজোয় সেখানকার পোশাক

ছিল বাসন্তী রঙে রাঙানো ধুতি চাদর এবং পাঞ্জাবি। এক সময় বসন্ত উৎসবও এই শহরে অনুষ্ঠিত হত খুব ধুমধাম করে। পূজোর আগের দিন ছেলেরা যেত পাহাড়ে "উদাল ফুল" সংগ্রহ করতে। জানি না এখন আর সেই পাহাড়ী ফুল পাওয়া যায় কিনা। পূজো হত নৈষ্ঠিক নিয়মে।

সারাদিন ধুমধাম হত। সন্ধ্যায় আজকের মত আলোর ব্যবস্থা ছিল না। ছোটখাটো আসর বসত এখানে সেখানে। অনেকেই সুন্দর এসরাজ বাজাতেন। এখন এ যন্ত্রটি উঠে যাবার দাখিল হয়েছে। চর্চা যা হত তা সবই রাগসঙ্গীতে। উচ্চ মার্গের সঙ্গীত বোঝবার এবং উপভোগ করার মত লোকের অভাব ছিল না এই শহরে। বাংলার পূর্বাঞ্চলে তখন যাঁরা আসতেন তাঁরা প্রধানত আসতেন ত্রিপুরার দরবারেই। যখন দীর্ঘ নদীপথ পেরিয়ে এখানে আসা কঠিন ছিল তখন এই শহরে এসেছিলেন কাসেম আলী রবাবী, যদুভট্ট এবং কালে খাঁ। কালে খাঁ যে আগরতলায় গিয়েছিলেন তা আমার জানা ছিল না; কিন্তু ১৯৩৭।১৯৩৮ সালে ওখানকার পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বিপিন ঠাকুর আমাকে নিজে বলেছিলেন সেই কথা। তিনি বলতেন—"দেখো অনেক বাইরের ওস্তাদের গান শুনেছি, কিন্তু কালে খাঁ বলে একটা লোকের গান আমি কোনওদিন ভুলতে পারিনি, লোকটা ছিল আধ পাগলা। একদিন কাউকে না জানিয়ে সে কোথায় চলে গেল কেউ জানতে পারল না।" এই কালে খাঁ-ই যে ভারত বিশ্রুত কালে খাঁ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

১৯২৪-২৫ সাল থেকেই ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-নাথের গান শেখাতেন ইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। স্বনামধন্য শিল্পী পরলোকগত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের ইনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল তাঁর। অনেক গান সংগ্রহ করে আনতেন শান্তিনিকেতন থেকে ছুটিছাটার সময়। তবে [illegible] সুর [illegible] এমন নয়; কিন্তু [illegible] ত [illegible] রি, বিকৃতি [illegible]। [illegible] সেই [illegible] রসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে [illegible] পরিচয়—এও কি কম সৌভাগ্যের কথা! [illegible] নাথের একটি গান ছিল—

"রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা।
ত্রিপুরপুর-লক্ষ্মী বহে তব বরণডালা।"

এই গানটি বলতে গেলে ত্রিপুরার জাতীয় সঙ্গীত বিবেচিত হত। খাম্বাজের ওপর ঝাঁপতালে রচিত এই গানের চমৎকার সুরটি আমার স্পষ্ট মনে আছে আজও। এ যুগে এ গানটি কাউকে গাইতে শুনি না। বর্তমান ত্রিপুরায় কজন এ গান জানেন তাও বলতে পারি না, তবে, আমার বিশ্বাস, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন যুগের ছাত্র পরিণত বয়স্ক শ্রীনরেন দেববর্মণ মহাশয় নিশ্চয়ই এই গানটির সুর আজও ধরে রেখেছেন তাঁর স্মৃতিতে।

কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে
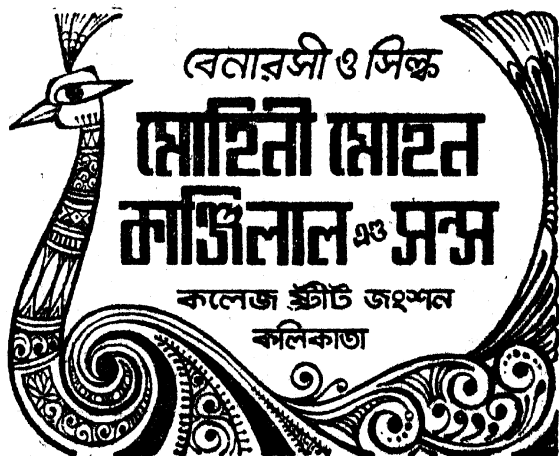
দেখলুম সরস্বতী পুজোর নতুন জৌলুস। কলকাতা তখন গানে মুখর;—সেটা বাংলা গানের একটা স্বর্ণ যুগ বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তখন খ্যাতির শিখরে। ওদিকে পঙ্কজকুমার মল্লিক, পাহাড়ী সান্যাল, শচীন দেববর্মণ, কুন্দনলাল সাইগল, অনুপম ঘটক—এঁরাও বিশেষ খ্যাতিমান। এ ছাড়া বহু ভাল গায়কই তখন সংগীত জগতে বিরাজমান; তাঁদের অনেকেই ছাত্রদের আহ্বানে সাড়া দিতেন। অতিরিক্ত ছিল কমিক, আবৃত্তি প্রভৃতি বিচিত্রানুষ্ঠান। বড় বড় কলেজে এবং হস্টেলে বিকেল থেকে এঁদের নিয়ে আসর বসত; আর কী আগ্রহ নিয়েই না শুনত সবাই। বড় বড় শিল্পীদের সঙ্গে তখন বহু তরুণ শ্রোতাই এক কলেজ থেকে আর এক কলেজে ক্রমান্বয়ে পরিভ্রমণ করত বিকেল থেকে অনেক রাত অবধি।

আমাদের হস্টেল—মেছোবাজারের ওয়াই এম সি এ-তে পুজো নিষিদ্ধ ছিল। আমাদের পুজো যে তা বলে হত না এমন নয়; সেটা হত পাশেই ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন মশায়ের বাড়িতে। একটি বেশ বড় ঘর ছিল সেন মশায়ের অধিকৃত এলাকার নীচের তলায়। আমরা যখন অনুমতি নিতে যেতুম তখন দেখতুম ঘরটা একদম ফাঁকা; কিন্তু প্রতিমা নিয়ে আসার পর দেখা যেত দেয়ালগুলিতে বিভিন্ন মানপত্র এবং সম্বর্ধনাপত্র শোভমান। সেন মশাই নিজে এসে দু-একবার দাঁড়াতেনও। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতুম একটি চুরুট মুখে দিয়ে রিকশা করে আমাদের হস্টেলের সামনে দিয়ে বাড়ি আসছেন।

হস্টেলে যেহেতু কোনও উৎসবের বন্দোবস্ত নেই, সেহেতু বড় বড় কলেজ পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গানবাজনা শোনাটাই ছিল আমাদের বিশেষ আকর্ষণ। বাজনাটা অবশ্য তখন কমই হত। খগেন দে, নগেন দে-র ম্যান্ডোলিন আর বাঁশীর কথা মনে পড়ে। খুব অল্পক্ষণই বাজাতেন কিন্তু একেবারে জমিয়ে দিতেন। গীটারের প্রচলন তখন ছিল না। কেউ কেউ ক্লারিওনেট বাজাতেন; ভাল লাগত শুনতে। এই বাজনাটি আজ বিলুপ্ত। ওরিয়েন্টাল নৃত্য নামক একরকম ভাবব্যঞ্জক নৃত্য ছিল তখনকার দিনে। প্রায়ই ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে সেগুলি অনুষ্ঠিত হত। গায়িকারা এ সব উৎসবে কমই অংশ গ্রহণ করতেন, যদিচ বহু গায়িকাই তখন খুব খ্যাতিলাভ করেছেন। ঋষিকানন্দ কোনও কোনও অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতেন। অবস্থা বিপর্যয় না ঘটলে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আনা হত। কমিক অনুষ্ঠানগুলি ছিল খুবই উপভোগ্য।

হিন্দু হস্টেল, বিদ্যাসাগর কলেজ, রিপন কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ প্রভৃতিতে ধুমধাম হত বেশী। বহু শিল্পীর অনুষ্ঠান এই সব আসরে শুনেছি, কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলতে দেখেছি অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়কে। তিনি প্রায় কোনও প্রতিষ্ঠানকেই নিরাশ করতেন না। ছাত্রদের জন্য তাঁর রেট ছিল অর্ধেক। বোধ করি সব অনুষ্ঠান সেরে ফিরতে তাঁর রাত শেষ হয়ে যেত। আর একটি ব্যক্তিত্ব আমার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। তিনি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। তিনি সর্বত্র আহ্বান পেতেন না, কারণ ওস্তাদী গান অনেক প্রতিষ্ঠান এড়িয়ে যেতেন; কিন্তু রিপন কলেজে তিনি বিশেষ সমাদৃত হতেন। কিঞ্চিৎ মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও তিনি আসরে নিবিড় রসসঞ্চার করতেন। একটা বিরাট গুণীর সান্নিধ্য সকলেই অনুভব করতেন।

কেষ্টবাবুর বেশভূষা ছিল পরিপাটি—তার ওপর তাঁর দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান উজ্জ্বল চেহারাও ছিল চিত্তাকর্ষক। একজনের কাঁধে হাত রেখে যখন ঢুকতেন তখনই অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে আমরা তাকিয়ে থাকতুম। তারপর সেই গম্ভীর অনুপম কণ্ঠে গান ধরতেন। নিজে হারমোনিয়ম বাজাতেন, চমৎকার—সেও ছিল এক শোনবার বস্তু। কখনও তাঁর গলা উঠে যেত একেবারে তার সপ্তকের মধ্যমে পঞ্চমে আবার ঝটিতে চাপা মিষ্টি গলায় তাকে নামিয়ে আনতেন একেবারে খাদে। তাঁর গানে আমরা যেন বিচিত্র অভিনয়ের পরিচয় পেতুম। অথচ অধিকাংশ গানই ছিল দাদরা, কাহারবা, কিন্তু তাতেই কত মুন্সিয়ানা ছিল তাঁর। কোনও আসরেই তাঁর সহজ নিষ্কৃতি ছিল না। 'বঁধু চরণ ধরে বারণ করি', 'মাতাল যেমন মদ পিয়াসী', 'চোখের জলে মন ভিজিয়ে', 'ফিরে চল আপন ঘরে'—এ সব গান তাঁকে একাধিকবার গাইতে হত। কিন্তু থিয়েটারে যে সব গানে তিনি নাম করেছিলেন সেগুলি গাইতে ছেলেরা তেমন অনুরোধ করত না। সংগীত গানেই তাদের আকর্ষণ ছিল বেশী। ছেলেদের কথা তিনি রাখতেন, যতটা পারতেন তাদের পরিতৃপ্ত করে আসর ছাড়তেন। আর—যখন চলে যেতেন তখন যেন একটা শূন্যতা নেমে আসত।

জ্ঞানবাবুও ছিলেন প্রিয়দর্শন উজ্জ্বল কান্তিসম্পন্ন পুরুষ। কিন্তু তিনি ছিলে ওস্তাদ মানুষ। ভরাট, গম্ভীর, অতি চিত্তাকর্ষক সুরেলা গলা ছিল তাঁ একতাল, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, এমন সুরফাকতালেও গেয়ে যেতেন স্বচ্ছন্দে বাংলা গান গাইতেন আদর্শ হিসাবে সুন্দর সংগঠন রেখে বিস্তার করতেন তি এবং তাতে কী আকুতি, কী আবেদ বাংলা গানে প্রভূত ওস্তাদি করেও যে তিনি পরিবেশন করতেন তা যেন বাঙাল চিত্তকে আকৃষ্ট করবার জন্যই উৎসারিত হ মাঝে মাঝে তাঁর সাপট তান যেন অন্ত একটা আলোড়ন তুলে দিত। ভজনও তি গাইতেন চমৎকার। তাঁর মেরে 'গিরিধা গোপাল' ছিল একটি শোনবার বস্তু।

একবার এই রকম একটি আসরে ত কণ্ঠে ধ্রুপদ শোনার সৌভাগ্য হয়েছি ধ্রুপদ যে এত মধুর হতে পারে এর আ আমার ধারণা ছিল না। তখন মনে হয়েছি এ কণ্ঠে ধ্রুপদই যেন মানায়। আর—অ দরবারী কানাড়া, মিয়ামল্লার, তিলক কামো বেহাগ আর যেন কোথাও শুনলুম ন এ সব সুরে তাঁর কী কমনীয়তা, ব রমণীয়তা যে ফুটে উঠত তা যাঁরা শুনেছে তাঁরাই জানেন। আমার মনে হয় জ্ঞানবা ঝাঁপতাল গাইতে খুব পছন্দ করতেন। এ 'বিষম ছন্দটি তিনি নিপুণ খেলোয়াড়ের ম বিচিত্র ভঙ্গীতে পরিবেশন করে শ্রোতাদে অন্তরে অপূর্ব পুলক সঞ্চার করতেন।

এখন অনেক নব্যরীতি, কলা-কৌশ প্রযুক্ত হচ্ছে। গানবাজনার দৃষ্টিভঙ্গ অনেকখানি বদলে গেছে। সংগীতচিন্তা ধারাটাই যেন বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তথাপি সে যুগ আজও আমাদের ম রেখাপাত করে তার কতকগুলি নিজস্ব সৌন্দর্য এবং সৌকর্য নিয়ে। সঙ্গীতশিল্পী অনেক আছেন এবং হবেন কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র বা জ্ঞান গোঁসাই ঐতিহাসিক স্থান অধিকার করে থাকবেন বাংলার সঙ্গীতে।

পদ্মশ্রী

এবারে পদ্মশ্রী পেলেন সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্তা সুচিত্রা মিত্র। আমরা আনন্দিত এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। এই উপাধিতে এঁদের গৌরব যে এক ডিগ্রী বাড়ল এমন নয়, কিন্তু দেশের দুজন স্বনামধন্য শিল্পী সম্বর্ধনা লাভ করলেন, আনন্দের বিষয় ঐইটিই।

আমরা এও জানি যে সুযোগ্য ব্যক্তি আরও আছেন যাঁদের জাতীয় সম্মান লাভ করবার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে; এই সঙ্গে তাঁদের স্থান ও তাঁদের গৌরব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি।

শার্ঙ্গদেব

॥ আটচল্লিশ ॥

এই নিয়ে তৃতীয়বার উদয়শংকরের সংগে ইউরোপে এল রবিশংকর। ১৯৩০-এর শেষে প্রথম সে যখন আসে তখন তার বয়েস মোটে দশ বছর। দ্বিতীয়বার যখন আসে ১৯৩৩ সালে তখন সে তেরো বছরের। আর এখন তার কৈশোর অতিক্রান্ত, তার জীবনে রিনরিন করে উঠছে আসন্ন অস্ফুট যৌবনের প্রথম পদধ্বনি। রবিশংকরের বয়েস এখন ঠিক ষোল।

এর মধ্যেই শোকের একটা বড় আঘাত লেগেছে তার। এবার ইউরোপে আসবার আগেই পণ্ডিত শ্যামশংকর ইহলোক ছেড়ে গেছেন। উদয়শংকরের নৃত্যের অনুষ্ঠান চলছিল তখন সিংগাপুরে, সেখানেই এল এই দুঃসংবাদ। দেশে নয়, পণ্ডিত শ্যামশংকরের মৃত্যু হয়েছে বিদেশে। বরোদার মহারাজার দেওয়ানের পদ গ্রহণ করে তাঁর সসম্মানে ভারতবর্ষে ফেরবার কথা, কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হল।

এবার রাজেন্দ্রশংকর নেই, দেবেন্দ্রশংকর নেই, কনকলতাও আসেনি। তাদের কথা মাঝে মাঝে রবিশংকরের মনে পড়ে যায়। আর তার প্রায় সমবয়েসী আর একজনের কথাও মনে পড়ে। সে হল আলাউদ্দীন খান সাহেবের ছেলে আলি আকবর। তার বয়েস চোদ্দ। খান সাহেব আলি আকবরকেও সংগে নেবেন বলে নিয়ে এসেছিলেন বোম্বাই-এর হোটেলে। কিন্তু শেষ অবধি জাহাজে ওঠা হল না আলি আকবরের।

বোম্বাই-এর হোটেলে সে স্বপ্ন দেখল তার মাকে। তিনি তাকে ছেড়ে দিতে চান না। স্বপ্ন দেখে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল আলি আকবরের। কথাটা খানসাহেবকে বলতেও তার হঠাৎ সাহস হল না। তাকে বললেন, উদয়শংকরের মামা ব্রজবিহারী। আলি আকবরের সেবার বিলেত যাওয়া হল না।

উদয়শংকরের সম্প্রদায়ে রবিশংকর নর্তক হিসেবে পরিচিত হলেও ভিতরে ভিতরে তার একটা আন্তরিক ঝোঁক ছিল সংগীতের প্রতি, বাদ্যযন্ত্রের প্রতি। সুতরাং আলাউদ্দীন খান-এর মতন মহান শিল্পীকে দেখে তার শরীরে রোমাঞ্চ [illegible]।

[illegible] রবিশংকর [illegible] আপন মনে। সে রোজ [illegible] করছে [illegible] কি হবে [illegible]—নর্তক না যন্ত্রশিল্পী? উদয়শংকর চান সে হোক নৃত্যশিল্পী, কিন্তু রবিশংকরের মনে খটকা লাগে। যা হোক, আলাউদ্দীন খানকে দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় রবিশংকরের মন ভরে উঠল।

কিন্তু খান সাহেবের মেজাজ বোঝা ভার। তিনি তামাক খান। তাঁর দিকে তাকিয়ে কী যেন মনে হল রবিশংকরের—সে ভাবল বিলেতে তো খান সাহেবের তামাক খাওয়ার এই সব সরঞ্জাম পাওয়া যাবে না এবং সেখানে তাঁর খুব কষ্ট হবে। এই রকম ভেবে রবিশংকর তাঁর জন্যে কিনল এক প্যাকেট ভাল টোবাকো আর একটা বেশ দামী পাইপ। কিনে এসে দাঁড়াল খান সাহেবের সামনে।

আলাউদ্দীন বললেন, "এ সব কী?"

রবিশংকর

রবিশংকর ও আলি আকবর

"তামাক আর পাইপ। আপনার জন্যে—"

কিন্তু রবিশংকরের কথা শেষ হল না, খান সাহেব জ্বলে উঠলেন। তাম্রকূট সেবনের সেই সব সরঞ্জাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "কী! একেবারে প্রথমেই আমার মুখাপিন্ন করতে চাও? দূর হও, বেরিয়ে যাও—"

তবু আলাউদ্দীন পরের মতন স্নেহ করতেন রবিশংকরকে। এবার সকলকে বিদায় দিতে বোম্বাই-এ এসেছিলেন হেমাঙ্গিনী দেবী। শীর্ণ বিষণ্ণ চেহারা তাঁর। মা-র করুণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে রবিশংকরের বুকের ভিতর কী রকম করে ওঠে—অনেক একটা আশংকায় তাঁরও বড় মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, মা-র সঙ্গে তার আর যেন দেখা হবে না।

এ কবছর রবিশংকর থেকেছে মা-র কাছ থেকে দূরে দূরে—বিলেতে, আমেরিকায়—ভ্রমণ করে বেড়িয়েছে সারা ভারতবর্ষ। বেশ ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে রবিশংকর। হেমাঙ্গিনী দেবীর কথা ভেবে তার চোখ ছলছল করে ওঠে। জাহাজে ওঠবার আগে হেমাঙ্গিনী দেবী এগিয়ে এলেন খান সাহেবের কাছে। রবিশংকরকে ডাকলেন।

হেমাঙ্গিনী দেবীর দু চোখ ভিজে উঠল। তিনি রবিশংকরের একটা হাত নিয়ে খান সাহেবের হাতের ওপর রাখলেন। রেখে আর্দ্রস্বরে তাঁকে বললেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি যাচ্ছি না। আমি জানি না আমার এই সন্তানকে আমি আর দেখতে পাব কি না। রবুকে আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম। একে আপনি নিজের সন্তান বলে মনে করবেন।"

বাদ্যযন্ত্রের প্রতি রবিশংকরের ঝোঁক, এবং খান সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার তার প্রবল ইচ্ছা—সবই খুব অল্প সময়ের মধ্যে বুঝে নিয়েছিলেন আলাউদ্দীন। কিন্তু এ কথাও তাঁর মনে হয়েছিল চঞ্চল ইউরোপ যেন সাধনার যোগ্য স্থান নয়। এখানকার আড়ম্বর, কোলাহল, দাহ ও দীপ্তি মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। সাধনা ব্যাহত হবে বারবার। উদয়শংকরের সম্প্রদায়ে বেশী দিন থাকবার ইচ্ছে তাঁর নিজেরও ছিল না।

রবিশংকরের সাধনায় "সিদ্ধি সম্পর্কে" সম্ভবত প্রথম থেকেই নিশ্চিন্ত ছিলেন খান সাহেব। এবং তিনি তাকে বলেছিলেন, "তুমি যেমনভাবে এখানে দিন কাটাচ্ছ তার মধ্যে শিক্ষাদান কিংবা শিক্ষা গ্রহণ কোনটাই সম্ভব নয়। এসব তোমাকে ছাড়তে হবে।"

নৃত্য নয়, এসরাজ নয়, সরোদও নয়—এর মধ্যে এতটা সময় আলাউদ্দীন খান সাহেবের সঙ্গে একত্র বাস করে রবিশংকর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল যে, সে তাঁর কাছে শিক্ষা করবে সেতার। এবং একাগ্র সাধনায় ঐকান্তিক আগ্রহ তার মনকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল স্থির ও নির্জন কোন সাধনক্ষেত্রে।

খান সাহেব একদিন রবিশংকরকে স্পষ্টই বললেন, "এমন হইচই ছেড়ে, জাঁকজমকে জীবনকে ভুলে যদি কোন দিন মাইহারে আসতে পার তা হলে সেখানে আমি তোমাকে শিক্ষা দেব।"

রবিশংকর বলেছিল, "বাবা, আমি মাইহারেই যাব।"

উদয়শংকরের সম্প্রদায় ছেড়ে খান সাহেব চলে গেলেন। রবিশংকর ঠিক করল দেশে ফিরে সে যাবে তাঁর কাছে মাইহারে। এদিকে আলমোড়ায় উদয়শংকরের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু প্যারিসে দেশ থেকে এল আর এক শোক সংবাদ। হেমাঙ্গিনী দেবী আর ইহলোকে নেই।

উদয়শংকর আপাতত তাঁর নৃত্যদল আবার ভেঙে দিলেন। রবিশংকর দেশে ফিরল ১৯৩৮ সালে। ফিরেই তার ক্লান্ত মন নিয়ে সে ছুটে গেল নসরৎপুরে। এখানেই হেমাঙ্গিনী দেবী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চার ভাই-এর বসবাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে গেছেন।

মাইহার সবক্ষণ ডাকছে রবিশংকরকে। কোথাও সে আর স্থির হয়ে থাকতে পারছে না। উদয়শংকরের অজ্ঞাতে খান সাহেবকে চিঠিপত্র লেখালেখি করে সে মাইহারে যাবার ব্যবস্থা একরকম পাকা করে ফেলেছে। ১৯৩৮ সালে আঠার বছর বয়সে রবিশংকরের পৈতে হল। এবং সে বছরই উপনয়নের মাস দু-এক পরে রবিশংকর এল মাইহারে।

সেখানে যাবার আগে বেশ কিছু সময় ইতস্তত করে রবিশংকর উদয়শংকরকে বলেছিল, "দাদা, মাসে মাসে তুমি আমাকে ষাটটা টাকা দেবে?"

উদয়শংকর অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন রবিশংকরের মুখের দিকে, পরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, "কী ব্যাপার রবু, তুই ইউরোপ ঘুরে এলি, আমেরিকা ঘুরে এলি—দুশো নয়, পাঁচশো নয়, আমার কাছে মোটে ষাট টাকা চাইছিস কেন?"

রবিশংকর বলল, "তুমি যখন বোম্বাই-এর জে জে স্কুল অব আর্টস-এ পড়তে তখন বাবা মাঝে মাঝে তোমাকে ষাট টাকা পাঠাতেন—"

সম্ভবত হেমাঙ্গিনী দেবী এ কথা বলেছেন রবিশংকরকে। কথাটা ঠিক। একটু হেসে উদয়শংকর জিজ্ঞেস করলেন, "কী করবি তুই ষাট টাকা দিয়ে?"

রবিশংকর বলল, "আমি মাইহারে গিয়ে থাকব।"

উদয়শংকর এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন তখন বাবা মাসে মাসে তোমাকে ষাট টাকা পাঠাতে। তিনি ভেবেছিলেন বেশ দেখবে খুব বেশী দিন থাকবে না রবিশংকর—নর্তক হয়েই সে থাকবে তার সম্প্রদায়ে।

মুণ্ডিত মস্তক রবিশংকরের। পৈতে হওয়ার পর তার চুল বড় হয়ে ওঠেনি

—প্রস্তুত হয়েছে সাধনার জন্যে। তার বেশ-বাসও খুব সাধারণ। ইউরোপের চাকচিকাময় জীবনের কোন স্পর্শ এখন নেই তার দেহের কোথাও। এমন অবস্থায় রবিশংকর এসে পৌঁছল মাইহারে। তার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হলেন খান সাহেব—খুশীও হলেন।

আলমোড়া পাহাড়ে হবে উদয়শঙ্করের শিক্ষাকেন্দ্র। দেশবাসী উৎসাহী হয়ে উঠছে তাঁর এই নতুন উদ্যমের কথা শুনে। এই শিক্ষাকেন্দ্র হবে আবাসিক। এলমহার্স্ট প্রথমে দেবেন, কুড়ি হাজার পাউন্ড। তিনি নিজে এসে আলমোড়া ঘুরে গেলেন। ডরোথি এলমহার্স্ট-এর মেয়ে বিয়াট্রিসও এসেছিল ভারতবর্ষে।

একটা ব্যাপক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করবার আগ্রহ উদয়শঙ্করের কম ছিল না। কারণ এত দিনের অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নৃত্য যতই সুন্দর হোক না কেন, নৃত্যের ব্যাখ্যাতা বা প্রবক্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার নৃত্যপদ্ধতিরও বিলোপ ঘটে। সুতরাং উদয়শংকর এমন একটা নতুন নৃত্যপদ্ধতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যা পৃথিবীর সব নৃত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের নর্তক করে না তুলেও ইস্কুল-কলেজে সহজেই এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হতে পারে। এ হবে এক নতুন নৃত্যরীতি এবং উদয়শংকরের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল এই পদ্ধতি হয়তো টিঁকে থাকতে পারে।

আলমোড়ায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সময় প্রায় হয়ে এল। উদয়শংকরের দায়িত্ব অনেক। তাঁর মাথায় খেলে নানা পরিকল্পনা। তাঁর মনে হয় ভারতীয় নৃত্যপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ধ্যানধারণা থেকে অনেক প্রকৃত সত্য বিলুপ্ত হয়েছে এবং এই পদ্ধতির ব্যাখ্যাও যান্ত্রিক ধরনের হয়ে পড়েছে। উদয়শংকরের ধারণা সে তাঁর নতুন নৃত্যপদ্ধতিকে শুধু একটি নাটকীয় ভঙ্গি কিংবা আবেগ প্রদর্শন করলেই চলবে না, নর্তকের প্রত্যেকটি ভঙ্গিকে একটি জীবন্ত ভাবধারায় সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। সমস্ত শিল্পকলার অন্তর্নিহিত ভাবধারার মতন নৃত্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারাই হবে প্রত্যেকটি নৃত্যভঙ্গির ভিত্তি।

যে নতুন নৃত্যরীতি প্রবর্তন করার ইচ্ছা উদয়শংকরের তাতে সম্পূর্ণ নতুন কলাকৌশলও প্রয়োগ করা হবে এবং প্রাচীন নৃত্যশিল্পের কলাকৌশল থেকে এর গুরুত্ব কোন মতেই হয়তো কম হবে না। এই কথাই প্রমাণ করবার ইচ্ছা উদয়শংকরের সে সৌন্দর্যলিপ্সার ক্ষণিক তৃপ্তির চেয়ে জীবনে আরও অনেক কিছু বেশী আছে।

আলমোড়ায় যেমন আসবেন ভারতের স্বনামধন্য নৃত্যগুরুরা তেমনি আসবেন গুণী বস্ত্রশিল্পীরা, আসবে কত ছাত্রছাত্রী।

বিলাসনৃত্যে উদয়শঙ্কর ও জোহরা

একটা পাঠক্রমও তৈরি করতে হবে। উদয়-শংকর বড় ব্যস্ত এখন। আলাউদ্দীন খান সাহেবকে নিয়ে আসতে হবে আলমোড়ায়। উদয়শংকর তাঁকে চিঠি লিখেছেন।

রবিশংকর আছে মাইহারে। উদয়শংকর দেখে এসেছেন তাকে। খান সাহেবের বাড়ির পাশে একটা ছোট ঘরে থাকে রবিশংকর। ঘরে পাখা নেই। দড়ির একটা খাটিয়া আছে তার শোবার জন্যে। খান সাহেব তাকে বড় যত্ন করে শিক্ষা দেন। জাহাজে ওঠবার আগে রবিশংকরের সম্বন্ধে যে কথা তাঁকে বলেছিলেন হেমাঙ্গিনী দেবী সে কথা তিনি ভোলেন নি।

এর মধ্যে খান সাহেবের ওপর অভিমান করে তাঁকে কিছু না জানিয়ে মাইহার ছেড়ে আসবার ইচ্ছায় একদিন ভোরবেলা মালপত্র গুটিয়ে সোজা স্টেশনে চলে এসেছিল রবি-শংকর। খান সাহেব তাকে খুব বকেছেন। তিনি যেমন দেখাচ্ছেন তেমন কিছুতেই তুলতে পারছে না রবিশংকর।

"ডা-ডা-ডা—" মহাবিরক্ত হয়ে রবি-শংকরের হাতে প্রবলভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে আলাউদ্দীন বললেন, "কব্জিতে জোর নেই? বাজার থেকে চুড়ি কিনে পর—যাও!"

আলাউদ্দীনের এই রকম কর্কশ স্বর শুনে রবিশংকরের চোখে জল ভরে উঠল। এমনভাবে কেউ কখনো তার সঙ্গে কথা বলে নি। সে বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে—সকলের আদরের ধন। খান সাহেবের কড়া ধমক খাবার পরই রবিশংকর ঠিক করে যে, সে মাইহারে আর থাকবে না। এবং পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ে স্টেশনের দিকে।

একটুর জন্যে ট্রেনটা ধরতে পারল না রবিশংকর। কিন্তু পরে তো আরও ট্রেন আছে, সে অপেক্ষা করবে স্টেশনেই।

কিছুক্ষণ পর তাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এল আলি আকবর। রবিশঙ্করকে জিনিসপত্র নিয়ে বসে থাকতে দেখে সে খুব অবাক হয়ে গেল—জানতে চাইল কী হয়েছে তার—কাউকে কিছু না বলে সে যাচ্ছে কোথায়।

রবিশঙ্কর তখন আলি আকবরকে সব কথা খুলে বলল। শুনে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল আলি আকবর। পরে বলল, "এই জন্যে তুমি মাইহার ছেড়ে চলে যাচ্ছ? আমরা অবাক হয়ে গেছি যে বাবা কখনো তোমার গায়ে হাত তোলেন নি। আমাকে কীভাবে উনি মারেন তুমি জান না?" আলি আকবর বলল, "একদিন উনি আমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন সারা দিন। কিছু খেতে-টেতেও দেন নি। বেদম প্রহার করেছিলেন।"

স্টেশন থেকে রবিশঙ্করকে আবার তার আস্তানায় ফিরিয়ে নিয়ে এল আলি আকবর। সব কথা শুনলেন আলাউদ্দীন। রবিশঙ্করকে ডাকলেন। তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। রবিশঙ্কর দেখল বিষণ্ণ একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে খান সাহেবের মুখে।

ধীর গম্ভীর স্বরে আলাউদ্দীন বললেন, "বেশ। তুমি আমার ওপর রাগ করে এখান থেকে চলে যাচ্ছিলে—" একটু থেমে ছলো-ছলো চোখে তিনি আবার বললেন, "তোমার মনে নেই জাহাজে ওঠবার আগে তোমার মা কী বলেছিলেন আমাকে?"

সে কথা স্পষ্ট মনে আছে রবিশঙ্করের। কিন্তু এই মুহূর্তে খান সাহেবের প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে পারল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

উদয়শঙ্কর আর বিয়াট্রিস ইতালীতে দেখেছে বিশ্ববিখ্যাত ভাস্করের নির্মিত এক-একটি অপরূপ মর্মর মূর্তি। এখন তারা দুজনেই ভারতবর্ষে। বিয়াট্রিস দেখছে এ দেশের সৌন্দর্য, তার শিল্পকলা। উদয়শঙ্কর আর বিয়াট্রিস ঘুরে ঘুরে দেখছে ইলোরার অপূর্ব শিল্পকর্ম।

বেলা বারোটা বেজেছে। কোথা থেকে আলোর একটি রেখা এসে পড়েছে বুদ্ধ মূর্তির ওপর। বুদ্ধের দু চোখ বন্ধ। বিয়াট্রিস অপলক চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনের মধ্যে অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ধপ করে বসে পড়ল।

একটা ঘোর আচ্ছন্ন হয়ে বিয়াট্রিস বলল উদয়শঙ্করকে, "ইতালীতে দেখেছি নিখুঁত এক-একটি মূর্তি। এ তো তেমন নয় দাদা। হাতগুলো কেমন গোল গোল, দেখ। তবু দেখতে দেখতে আমার বুকের ভেতর কী রকম করে উঠছে—মনে হচ্ছে বুদ্ধ যেন এখুনি চোখ খুলবে—"

এতদিন যা ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, উদয়শঙ্করের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা, তা তিনি মূর্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন কোথাও স্থির হয়ে বসে। এবং একান্তে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভিতর দিয়ে নৃত্যের বিশেষ বিশেষ কিছু রীতিও তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আলমোড়ায় শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হল ১৯৩৯ সালে। পাহাড়ের কোলে নির্জন এই পরিবেশ সৃষ্টি ও সাধনার পক্ষে উদয়শংকরের উপযুক্ত মনে হয়েছিল।

নৃত্যশিক্ষার একটা ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন উদয়শঙ্কর আলমোড়া শিক্ষাকেন্দ্রে। শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিক্ষকদের তিনি আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন সেখানে। শংকরণ নাম্বুদ্রি ছিলেন। ছিলেন ভরত নাট্যমের গুরু কান্দাপ্পা পিল্লাই, মণিপুরীর আম্বুবি সিং এবং আলাউদ্দীন খানও যোগ দিয়েছিলেন আলমোড়া শিক্ষাকেন্দ্রে। গুরু দত্ত ও মোহন সাইগলও ছিলেন। সিমকী জোহরা অমলা—এরাও ছিল। আস্তে আস্তে এই আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্রে আরও অনেক ছাত্রছাত্রী আসতে লাগল। (ক্রমশ)

বিশ্ববিজ্ঞান

সামনে বৃহস্পতি। দূরে নক্ষত্রখচিত আকাশে সূর্যোদয়। পাইওনিয়ার-১০ পর্যবেক্ষণের কাজ শেষ করে শনিগ্রহের দিকে এগিয়ে চলেছে। ছবিটি শিল্পীর তুলিতে আঁকা

পাইওনিয়ার-১০

এবার লক্ষ্য : শনি

বৃহস্পতিবার পরিমণ্ডলে পর্যবেক্ষণের কাজ শেষ করে মারকিন দেশের মানব-আরোহীহীন মহাকাশ যান পাইওনিয়ার-১০ সম্প্রতি শনি গ্রহের দিকে যাত্রা করেছে। যদি কোন অঘটন না ঘটে, ১৯৭৭ সালে এই যান শনির কক্ষপথের মধ্যে প্রবেশ করবে। সেখান থেকে ইউরেনাসের পরিমণ্ডলে গিয়ে পেঁছবে ১৯৮০ সালে। অতঃপর প্লুটোর সান্নিধ্যে ১৯৮৭ সালে।

মারকিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'র প্রতিবেদন : পাইওনিয়ার-১০-কে নিয়মিত পৃথিবীর মানমন্দির থেকে বেতার সংকেতের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছিল। তার প্রতিটি সৌর-কোষ যেমনটি আশা করা গিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই সূর্যরশ্মি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করেছে এবং তার সহায্যে তার সমস্ত রকমের যন্ত্রপাতি সচল রেখেছে। পৃথিবী এবং বৃহস্পতির মাঝপথে চলার সময় পাইওনিয়ার-১০এর ইনফ্রা রেড বা অবলোহিত রশ্মি ক্যামেরা উল্কাণুদের ছবি তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতির পরিমণ্ডলে উপস্থিত হয়ে পাইওনিয়ার-১০ খুব কাছ থেকে ওই গ্রহের মোট বারোটি উপগ্রহের যে কয়টি ছবি তুলতে সমর্থ হয়, তার সব ক'টিই টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব হয়েছে। এক কথায়, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য!- পৃথিবীর মত একটি নয়, একটি গ্রহকে ঘিরে একাধিক চাঁদের পরিক্রমণের সেই দৃশ্য সত্যিই রোমাঞ্চকর।

'নাসা'র বক্তব্য, পাইওনিয়ার-১০-এর দীর্ঘ যাত্রাপথের সব চাইতে বিপজ্জনক মুহূর্তটি অতিক্রান্ত হয়েছে ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৩। ওই দিন ৫৭০ পাউন্ড ওজনের এই যানটি সরাসরি বৃহস্পতির কাছাকাছি তীব্র বিকিরণ বলয়ের মধ্যে গিয়ে পেঁছলে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, এবার বুঝি সব গেল।

পর্যবেক্ষকরা অবশ্য সজাগ ছিলেন। তাঁরা জানতেন, পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে যেমন বিকিরণ বলয় রয়েছে—অনেকেই হয়ত জানেন, তার নাম ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট— বৃহস্পতির ঊর্ধ্বাকাশেও অনুরূপ বিকিরণ বলয় বিদ্যমান। এই বলয় পৃথিবীর মাথার ওপর যেন একটি চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে তৈরি একটি ছাদ। দূর মহাকাশ থেকে বিপজ্জনক যেসব রশ্মি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে, এই ছাদ তাদের বড় রকমের একটি অংশকে প্রতিহত করে বলেই, অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে আমরা রক্ষা পাই।

কিন্তু প্রশ্ন এই, বৃহস্পতির পরিমণ্ডলের সেই বিকিরণ বলয়টির সঠিক চরিত্রটি তো তখনও অজ্ঞাত। তখন বলতে অবশ্য পাইওনিয়ার-১০-এর বৃহস্পতির কাছাকাছি হওয়ার আগের মুহূর্তের কথাই বলা হচ্ছে।

আসলে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, তেমন আর কী হবে? বৃহস্পতির বিকিরণ বলয় হয়ত পৃথিবীর বিকরণ বলয়ের মতই হবে।

কিন্তু প্রমাদ গুণলেন 'নাসার বিজ্ঞানীরা যখন সত্যিই পাইওনিয়ার-১০ তার লক্ষ্য বৃহস্পতির বিকিরণ বলয়ের কাছে গিয়ে হাজির হল। পাইওনিয়-১০ থেকে প্রথম সংকেত-বার্তা এল ৩ ডিসেম্বর। বিকিরণ বলয় সম্পর্কিত বার্তা।

বিজ্ঞানীরা সংকেত বার্তা বিশ্লেষণ করে সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। দেখা গেল, ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের চেয়ে বৃহস্পতির ওই বিকিরণ বলয় প্রায় এক কোটি গুণ বেশি শক্তিশালী। বলয়টির পরিমণ্ডলে চলেছে প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন ইলেকট্রন এবং প্রোটনের অবাধ বর্ষণ। যার মাত্রা প্রায় ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ইলেকট্রোন ভোল্ট। এ ছাড়া এ খবরও পাওয়া গেল, পাইওনিয়ার-১০ যে পথ দিয়ে সেখানে এগিয়ে চলেছে, সেই পরিবেশে প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার জায়গায় শুধু প্রোটন কণাই ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় ৪০ লক্ষের মত। যা এক ইঞ্চি পুরু ইসপাতের চাদর অনায়াসেই ভেদ করার ক্ষমতা রাখে।

কী মারাত্মক পরিস্থিতি, একবার চিন্তা করুন! বৃহস্পতির বিকিরণ বলয় যে এমন মারাত্মক রকমের বিপজ্জনক, সেটা আগে থেকে কারোর জানা ছিল না। অথচ তারই মধ্যে গিয়ে হাজির হল পাইওনিয়ার-১০।

মুহূর্তে এই যানটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন এবং প্রোটন কণার বর্ষণ। বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন, এই বর্ষণের হাত থেকে পাইওনিয়ার-১০-কে রক্ষা করা অসম্ভব হবে।

'কিন্তু', বলেছেন মারকিন দেশের জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান এবং মহাকাশ গবেষণা সংস্থার অন্যতম বিশেষজ্ঞ ডঃ ইসতিয়াক রসুল, 'প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন প্রোটন অধ্যুষিত ওই অঞ্চল ধরে পাইওনিয়ার-১০ উড়ে গিয়েছিল খুব কম সময়ের জন্যেই। মাত্র ঘণ্টা দুয়েক। শক্তিশালী কণার আঘাত তাই তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

প্রঃ : বৃহস্পতির ঠিক কোন্ অঞ্চল,

জুড়ে অত বেশি শক্তিসম্পন্ন এবং অত বেশি সংখ্যায় ইলেকট্রন প্রোটন আনাগোনা করছে বলে আপনারা মনে করছেন?

উত্তর : মনে হয় ওই অঞ্চলটি বৃহস্পতির বিষুব রেখা বরাবর ঊর্ধ্বাকাশে অবস্থান করছে।

প্রঃ : পাইওনিয়ার-১০ বৃহস্পতি-সংক্রান্ত আর কী কী নতুন তথ্য জানাতে এপর্যন্ত সমর্থ হয়েছে?

উত্তর : এক, পাইওনিয়ার-১০-এর মধ্যে বসানো অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যে বৃহস্পতির চৌম্বক ক্ষেত্র, সেখানকার আকাশে ভাসমান মেঘমালার তাপমাত্রা এবং তার কয়েকটি উপগ্রহ সংক্রান্ত বেশ কিছু নতুন তথ্য জানাতে সমর্থ হয়েছে। দুই, আগে আমাদের ধারণা ছিল বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৩০০ গুণ বড়। কিন্তু পাইওনিয়ার-১০ প্রমাণ করেছে, বৃহস্পতি তার চেয়ে অনেক বেশি বড়। তিন, পাইওনিয়ার-১০ বৃহস্পতির বুকে কোন কঠিন ভূ-স্তরের সন্ধান পায়নি। চার, পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এর আগে ওই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে হিলিয়াম গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণে অসমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রথম পাইওনিয়ার-১০ প্রমাণ করল, সেখানেও হিলিয়াম গ্যাস বিরাজ করছে।

*

হ্যাঁ, বৃহস্পতির পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে আরও অনেক বিস্ময়কর তথ্যের সন্ধান জুগিয়েছে পাইওনিয়ার-১০।

ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক ডঃ জি মাঞ্চ পাইওনিয়ার-১০ পাঠানো তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে বলেছেন, বৃহস্পতি তার দুই মেরু অঞ্চলের তুলনায় বিষুব অঞ্চল থেকে অনেক বেশি উত্তাপ বিকিরণ করে। এবং আরও চমকপ্রদ আবিষ্কার, বৃহস্পতির যে-দিকটিতে সূর্যের আলো গিয়ে পড়ে সে-দিকটির তুলনায় যে-দিকটি অন্ধকার থাকে সেখানকার তাপমাত্রা মোটেই কম নয়। অর্থাৎ আরও পরিষ্কার করলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় কতকটা এই রকম: গড়ে প্রতি দশ ঘণ্টায় বৃহস্পতি তার অক্ষের চার পাশে একবার করে আবর্তন করে। যার অর্থ, সেখানে কোন অঞ্চলে যদি পাঁচ ঘণ্টায় দিন হয়। তাহলে রাতের দীর্ঘতা দাঁড়াবে পাঁচ ঘণ্টার মত। অথচ সেখানে রাত এবং দিনের মধ্যে তাপমাত্রার কোন পার্থক্য নেই। এ থেকে কেউ কেউ অনুমান করছেন, বৃহস্পতির গ্রহ-জাগতিক পরিবেশে বিস্তৃত মেঘমালার নিচে যতটা উত্তাপ এসে জমে, তার তুলনায় উত্তাপের বিকরণ ঘটে অনেক কম। বিজ্ঞানীরা এর নাম রেখেছেন 'গ্রীনহাউস এফেক্ট'।

বৃহস্পতির চৌম্বক ক্ষেত্রটির স্বরূপটিও পৃথিবীর তুলনায় ভিন্নতর। বৃহস্পতির চৌম্বক ক্ষেত্র গ্রহটির পৃষ্ঠদেশ ছাড়িয়ে মহাকাশে প্রায় ৫৫ লক্ষ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের তুলনায় সাত গুণ বেশি শক্তিশালী। সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্রের চেহারাটা যেন একটু লম্বাটে অশ্রুবিন্দুর মত। তার চৌম্বক অক্ষ ভৌগোলিক অক্ষের সঙ্গে দশ থেকে পনের ডিগ্রি কোণ করে হেলানো অবস্থায় রয়েছে বলেই মনে হয়েছে। পৃথিবীর একটি কম্পাস বৃহস্পতিতে নিয়ে গেলে দেখা যাবে, ওই কম্পাস শলাকার উত্তর মেরু সেখানে দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে,

পঁচিশ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে বৃহস্পতির এই ছবিটি তুলে পাইওনিয়ার-১০ বেতার সংকেতের মাধ্যমে সযত্নে পৃথিবীর মানমন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাঁ পাশে কালো অংশটি সেই বিখ্যাত রক্ত-তিলক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে যার রহস্য এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। ডান দিকে ছোট্ট কালো-বিন্দু বৃহস্পতির ১২টি চাঁদের একটি চাঁদ 'আইও' (IO)

আমাদের সৌরমণ্ডলে একমাত্র পৃথিবী এবং বৃহস্পতি ছাড়া আর কোন গ্রহে চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞানীরা এখন স্থিরনিশ্চয়, সৌরমণ্ডলের অতিকায় এই গ্রহটির পরিবেশ এক আবর্তনশীল গ্যাসীয় মাধ্যম দিয়ে ঢাকা। এই মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং সম্ভবত জল। কিন্তু ওই সব বস্তু কোন্‌টি কোন্‌ অবস্থায় রয়েছে, তাদের পারস্পরিক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াই বা কী, সে সম্পর্কে

সঠিক কোন সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন : এই পুরু গ্যাসীয় আবরণীর নিচে বৃহস্পতির চেহারাটি কী ধরনের হওয়া সম্ভব? পৃথিবীর মত সেখানেও কি কঠিন ভূ-ভাগ থাকা সম্ভব? পৃথিবীর মত সেখানেও কি সাগর, মহাসাগর, অথবা নদী-মালা আছে? অথবা, বৃহস্পতির পরি-মণ্ডলে যে বিস্তৃত চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যমান, তার মূল উৎসটি কী? বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎস পৃথিবী নিজেই। পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছে গলিত এবং তপ্ত বস্তুসামগ্রী। ওই সামগ্রীর মধ্যে চলছে নিয়ত আবর্তন। প্রচণ্ড তাপমাত্রার দরুন ওই সব আগ্নেয় সামগ্রী থেকে ইলেক-ট্রন কণা বেরিয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রনের প্রবাহ সৃষ্টি করে। ইলেকট্রনের এই প্রবাহই সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র।

এ-ধরনের মতবাদ যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হয় তাহলে বলতেই হয়, পৃথিবীর মত বৃহস্পতিরও অভ্যন্তরে তপ্ত এবং গলিত পদার্থের আলোড়ন চলছে। আর ওই আলোড়নই সৃষ্টি করেছে তার শক্তি-

শালী চৌম্বক ক্ষেত্র। বলা বাহুল্য, বৃহস্পতির মূল অবয়ব কঠিন ভূস্তর দিয়ে তৈরি কি না, এখনও পর্যন্ত তা জানা যায়নি। তার গভীরে সত্যিই আগ্নেয় কাণ্ড চলছে কি না, পৃথিবীর মত গলিত সেই আগ্নেয় স্তরের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ ঘটছে কি না, সে সব ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোন আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি। নাসা'র বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, পাইওনিয়ার-১০-এর পাঠানো তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করার পর হয়ত নতুন খবরাখবর জানা যাবে।
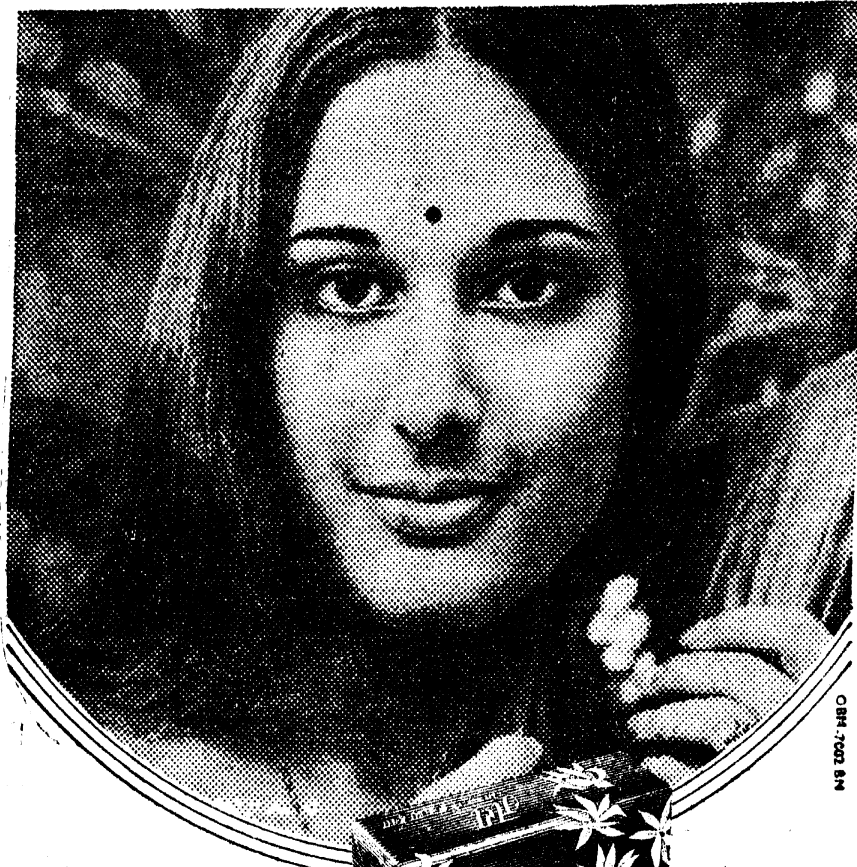
*

বৃহস্পতির আরও একটি রহস্য তার অতিকায় রক্ত-তিলক বা 'রেড-স্পট'। এটি প্রথম ধরা পড়েছিল ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে। প্রথম দর্শক রবার্ট হুক। ওই বছরেই গিওভান্নি কাসিনি ওই রক্তিম অঞ্চলটির একটি ছক তৈরি করে গ্রহটির চার পাশে ঘুরে আসতে তার কতটা সময় লাগে সেটা নথিভুক্ত করতে শুরু করেন। এটা করতে গিয়েই প্রথম গরমিলটি চোখে পড়ল। দেখা গেল ১৬৬৪ সালে একবার ঘুরে আসতে যেখানে সময় লাগল নয় ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট চুয়াল্ল সেকেন্ড, ১৬৭২ সালে সেই সময় গিয়ে দাঁড়াল আরও পাঁচ সেকেন্ড বেশি।

অতএব সেই প্রথম প্রশ্ন উঠল : এই রক্তিম অঞ্চলটি কি তাহলে মূল গ্রহটির গায়ে জুড়ে নেই? যদি থাকত, তাহলে গ্রহটির সঙ্গেই তো সে পাক খেত? সেক্ষেত্রে মূল গ্রহ এবং ওই রক্ত-তিলকের আবর্তনকাল তো একই হওয়ার কথা? প্রথম আবিষ্কারক হুকের নাম অনুসারে এই অঞ্চলটির নাম রাখা হয় 'হুকের কলঙ্ক'।

পরে এই রক্ত-কলঙ্ক নিয়ে অনেকেই পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এটি এত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল যে সাধারণ মানুষও এ-ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৮৮২ সাল থেকে কলঙ্কটি আবার ফিকে হতে শুরু করে। এবং এমনভাবে ফিকে হতে থাকে যে কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ধরেই নিয়েছিলেন, ১৮৯০ সালের পর হয়ত সেটি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। বরং ১৮৯০ সাল থেকে আবার এটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। এর পর থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিয়মিত ওই অঞ্চলটির উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আসছেন। এর মধ্যে কখনও এটি অস্পষ্ট হয়েছে, কখনও বা স্পষ্টতর। কিন্তু কখনই অদৃশ্য হয়ে যায় নি।

ইতিমধ্যে এই কলঙ্কটি সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তাতে দেখা যায়: এক, উপবৃত্তীয় এই কলঙ্ক লম্বায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার, চওড়ায় তের হাজার কিলোমিটার। অবস্থান, গ্রহটির নিরক্ষ রেখা থেকে বাইশ ডিগ্রি দক্ষিণে। এর বাইরের তলের ক্ষেত্রফল পৃথিবীর মোট তলের ক্ষেত্রফলের প্রায় সমান। দুই, বৃহস্পতির অক্ষের চারপাশে আবর্তন করার সময় এর আবর্তন কাল দশ সেকেন্ডের বেশী এদিক ওদিক হয়ে থাকে। তিন, কলঙ্কটির দক্ষিণ প্রান্তের কাছাকাছি একটি গর্তের মত জায়গা দেখা যায়। এই গর্তটি কখনই অদৃশ্য হয় নি। চার, কলঙ্কটি রঙ পালটায়। অত্যন্ত ফিকে হয়ে এলে এর রঙ দাঁড়ায় ধূসর অথবা ফ্যাকাসে লাল। পাঁচ, বৃহস্পতির বুকে এটি ছাড়া এমন দ্বিতীয় কোন কলঙ্ক আর চোখে পড়ে নি। বলা বাহুল্য, এই রক্ততিলক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও পর্যন্ত একটি বড় রকমের রহস্যই থেকে গেছে। দেখা যাক, পাইওনিয়ার-১০ এর পাঠান ছবি এবং তথ্যাবলী থেকে নতুন কোন সূত্র সংগ্রহ করা যায় কী না।

*

৫ মার্চ, ১৯৭২ মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' মানব আরোহীহীন মহাকাশযান পাইওনিয়ার-১০কে যখন দূর মহাকাশ যাত্রার উদ্দেশে উৎক্ষেপ করেছিলেন, কেউ কেউ তখন মন্তব্য করেন, এটা এক অবাস্তব অতিকল্পনা। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, ৫৭০ পাউন্ড ওজনের এই যানটি মহাকাশে পাড়ি দেবার পথে মঙ্গল গ্রহের খপ্পরে পড়ে যদি ভেঙেচুরে নাও যায়, তার ওপারে বড় বড় পাথরের চাঁই বা উল্কাণুদের বলয় ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া এর পক্ষে কখনই সম্ভবপর হবে না। এলোপাথাড়ি ছুটে চলা উল্কাণুর কোন না কোনটির সঙ্গে ঠোক্কর লাগবেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয় নি। মহাকাশ প্রযুক্তি বিজ্ঞানে নিশ্চয় এটি এক অসামান্য সাফল্য। বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা পাইওনিয়ার-১০কে শনিগ্রহের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। সংবাদ : নির্দিষ্ট পথ ধরে মহাকাশযানটি এখন এগিয়ে চলেছে।

পাইওনিয়ার-১০এর পর দূর মহাকাশ যাত্রায় পাঠান হয়েছে আরও একটি মহাকাশযান পাইওনিয়ার-১১। ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে এটি বৃহস্পতির আবহাওয়ামণ্ডলে প্রবেশ করার কথা। বৃহস্পতি সম্পর্কিত আরও পরিপূরক তথ্যাবলী তখন সংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না বলেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

—সমরজিৎ কর

প্রশ্ন উঠেছে, হয়ত পৃথিবীর মোট উচ্চ মার্গের কোন প্রাণী বৃহস্পতিতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রাণের কোন চিহ্নই কি সেখানে নেই? কিছু কিছু পর্যবেক্ষণের ফলাফল দেখে বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, বৃহস্পতির পরিমণ্ডলে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কেউ কেউ বলছেন, সেখানে প্রোটিন এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বৃহস্পতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যামেরিকান গবেষণা কেন্দ্রে দুজন বিজ্ঞানী দুষ্প্রাপ্য এক ধরনের জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। ওঁরা দেখেছেন, ওই পরিবেশে ওই জীবাণুগুলি শুধু বেঁচেই থাকে না, বংশ বৃদ্ধিও করতে পারে। ওঁদের বিশ্বাস, বৃহস্পতির পরিমণ্ডলে এ ধরনের জীবাণুর সন্ধান পাওয়া হয়ত অসম্ভব হবে না

॥ ১৬ ॥

সেকালের বউবাজার এলাকার বিখ্যাত গগনচাঁদ বড়াল এম এ মশাই ল পাস করে উকীল হয়েও কখনো আইন ব্যবসায়ের ধার ঘেঁষেন নি, বড় বড় বাড়ি কেনা-বেচার কী যেন তাঁর কাজ ছিল। ক্লাইভ স্ট্রীটের কমার্সিয়াল বিলডিংস-এ বড়াল অ্যান্ড কোম্পানির নিজস্ব আপিসে বসে তাই করতেন তিনি।

তাঁদের সঙ্গে আমাদের বহুকালের পারিবারিক বন্ধুত্ব। তাঁর বাবা মহাতাপচাঁদ বড়াল ছিলেন বিশেষ বন্ধু আমার বাবার, তাঁর ছিল সোনা-রুপোর কারবার, বাবার সোনাদানা তাঁর হাত দিয়েই বিক্রি করা হত, কাউকে উপহার দেবার চুনিপান্না বসানো আংটি ইত্যাদির দরকার হলে তাঁকে দিয়েই করাতেন বাবা। তাঁদের হিদারাম বাঁড়ুয্যের গলির বাড়িতে অনেকবার আমরা উঠেচি কলকাতায় এসে।

সেই হিদারাম ব্যানার্জী লেনের আধেকটার নাম হয়ে গেছে গোকুলচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। একদা প্রসিদ্ধ এই গোকুলবাবু ছিলেন কর্পোরেশনের কাউন্সলর। গগনবাবুর কাকা, এখানকার বাসিন্দা।

গগনবাবু আমাদের চাঁচল রাজার সম্পর্কিত পারিবারিক বিষয় সব কিছুই জানতেন। গোড়ায় তাঁর কাছে গিয়েই পাড়লাম কথাটা। বাবার সঙ্গে এহেন দুর্ব্যবহার করার নিমিত্ত রাজকাকাকে সমুচিত একটা শিক্ষা দেবার জন্যেও বটে, আর আমাদের পাওনাটা আদায় করার জন্যেও—মামলা-টামলা কিছু করা যায় কিনা?

যায় ত। তবে আগে করলে ভালো হোতো আরো। উনি বললেন, 'তোমার বাবারই এটা করা উচিত ছিল। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে করা হলে বেশ জোরালো হোতো কেসটা...যাক গে, তোমার মার মত আছে ত?'

'তা ঠিক নেই। তিনি বলছেন, তোর বাবা যা নিজের থেকে ছেড়ে দিয়েছেন তুই ফের তা দাবি করছিস কী হিসেবে? ওসব করিসনে, অন্যায্য উপায়ের কথা মনেও ঠাঁই দিসনে, একটা কিছু কাজকর্ম খেটেখুটে রোজগার কর—সেই পথই ভালো। এসব ঝঞ্ঝাটের ভেতর যাওয়া কেন?'

'ভালো কথাই বলেছেন উনি। সত্যি বলতে মামলা মোকদ্দমা করে কোনো পক্ষেরই কিছু লাভ হয় না—মাঝ থেকে নাহক হয়রানি। এইজন্যেই আমি আর ওই ওকালতিতে যাইনি, অন্য ব্যবসা নিয়ে রয়েছি। না, মামলায় কারোরই কোনো লাভ হয় না ভাই, না বাদী না বিবাদীর।'

'কারোরই লাভ হয় না?'

'উকীল মোক্তারের হয়।' গগনবাবু জানান: 'ঐ অ্যাটর্নি ব্যারিস্টারের হয়ে থাকে।'

'তবে মানুষ এত এত মামলা করে কেন? করে মরে কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ওই মরবার জন্যেই। কিছুই যে ওতে হয় না হাড়ে হাড়ে এই শিক্ষেটা পাবার জন্যেই।' গগনবাবু বললেন: 'তবে এক্ষেত্রে ওছাড়া আর উপায়ও নেই...রাজাবাহাদুর তো শুনেছি কারো সঙ্গে দেখা করেন না নাকি? তাই না?'

'হ্যাঁ। হ্যারিংটনের প্রকাণ্ড বাড়ির একটা ঘরে একলাটি পড়ে থাকেন শোনা যায়। কখনো সখনো তাঁর ম্যানেজার আসে, শুনেছি, তাঁর সঙ্গেই যা এক আধটা বৈষয়িক কথা কন...।'

'বদ্ধ পাগল নাকি উনি? ওই রকমের একটা গুজব রয়েছে বাজারে...।'

'কি করে জানব। তবে মনে হয় তা নয়। কারো সঙ্গে মিশতে চান না—মিশতে ওঁর ভালো লাগে না—তাই বোধ হয়।'

'তা না হলে দেখা করে মামলাটা না তুলে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তা যখন হবার নয় তখন বাধ্য হয়েই করতে হবে আমাদের...। এখন যা আমাদের করণীয়...প্রথমে তোমার মার একটা স্টেটমেণ্ট নেওয়া, রানীর মৃত্যু-শয্যায় যা যা হয়েছিল তার...তার পরে যারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেই কালের ম্যানেজার প্রভৃতির আর আত্মীয়-স্বজনের তাঁদের স্টেটমেন্টগুলি নিতে হবে মোটামুটি, তার পরে তাই নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে মামলার কাগজপত্র তৈরি করতে হবে। সে সব আমিই করে দেব।'

'তার পরে?'

'তার পরে কোনো অ্যাটর্নিকে সেই সব কাগজপত্র দিয়ে মামলা রুজু করে দেওয়া হাইকোর্টের অরিজিন্যাল সাইডে...'

'অ্যাটর্নি ব্যারিস্টারদের তো টাকা দিতে লাগে। সে টাকা আমি পাব কোথায়?'

'তার জন্য তোমার ভাবনা নেই। তার কিছুই এখন লাগবে না। যে মামলা জেতে

সে দাবির টাকার ওপরেও সেই সংগে তার খরচার ডিক্রিও পায়, আর যে হেরে যায় তাকে দুপক্ষেরই মোট খরচাটা দিতে হয়—জজসাহেব সেই রকমের ডিক্রিই দেন। তবে সে কথা এখন কেন?' তিনি বললেন, 'কিন্তু তোমাকেও কিছু কিঞ্চিৎ খর্চা করতে হবে বইকি। বেশি নয়, এই সাক্ষী সাবুদ নিয়ে আসার, তাদের খাওয়াদাওয়া, যাতায়াতের খরচটা তোমাকে দিতে হবে বটে তবে সে এখন কেন—যখন মামলা উঠবে তখনকার কথা।'

'ধরুন যদি আমরা হেরে যাই তখন তো দুপক্ষের অ্যাটর্নি ব্যারিস্টারের সব খরচের দায়ই আমার ঘাড়ে এসে পড়বে আদালতের ডিক্রিতে?'

'তা ত পড়বে। দেবার কথা তখনই।'

'কিন্তু সে আমি দেব কোথ থেকে?'

'কোর্টের পেয়াদা গিয়ে তোমার বিষয় সম্পত্তি যা পাবে সব ক্রোক করে আনবে।'

'বিষয় সম্পত্তি বলতে তো বাসার আমার নড়বড়ে চৌকিটা। ফিনাইল লাঞ্ছিত কম্বল দিয়ে ঢাকা—ছারপোকায় ভর্তি। তাছাড়া কিছু নেই।'

'কিছু না পেলে রাজা বাহাদুর ইচ্ছে করলে তোমায় জেলে পাঠাতে পারেন তখন নালিশ করে।'

'ও বাবা! আবার জেল!' শুনেই আমি আঁতকাই। আইন অমান্য আর যুগান্তরে রাজদ্রোহের দায়ে দু দুবার জেল খাটার কথাটা আমার মনে পড়ে যায়।

'না কোনো ভয় নেই। ক্রিমিনাল জেল হবে না তো। সিভিল জেল। পাথর ভাঙা ঘানি টানার দায় নেই। তোমাকে জেলে রাখার খর্চা দিতে হবে রাজাকে। তা, তুমি এখন কাগজের সম্পাদক যেকালে, তোমার স্ট্যাটাস্ মতন মাস মাস পাঁচশো টাকার কম হবে না। সেই টাকায়—'

'বেশ আরামে থাকা যাবে জেলখানায়। কাকার দৌলতে রাজার হালে কাটানো যাবে কিছুদিন। কয়েক দিস্তা কাগজ নিয়ে যাব না হয়, সেই ফাঁকে জেলখানায়

ইচ্ছে করলে তোমাকে জেলে পাঠাতে পারেন

বসে লেখা যাবে বেশ আয়েসে।' আমি উৎসাহিত হই; 'তবে আমার স্থির বিশ্বাস রাজাকাকা আমায় জেলে দেবেন না। কখনো না।'

'তাহলে আর ভয় কিসের! আমাদের তরফের অ্যাটর্নি ব্যারিস্টার সব আমার বন্ধুজন। তাঁরাও তোমাকে টাকার দায়ে জেলে ঠেলবেন না।'

'তবে আর আমায় পায় কে!' আমি লাফিয়ে উঠি।

'এখন তোমার করবার হচ্ছে—তোমার মা এই ব্যাপারের যা জানেন, রানীর অন্তিমকালে যা তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে, তিনি দেখেছেন, তিনি শুনেছেন নিজের কানে সে সবের একটা ফিরিস্তি নিয়ে আসা। আর সেই সময় উপস্থিত যে সব সাক্ষী ছিলেন—রাজার ম্যানেজার রাজ-কর্মচারী আত্মীয়জন তাঁদের স্টেটমেন্টও সেই সঙ্গে সমস্ত লিখে তাঁদের দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে এনে দাও আমায়। তার ওপর ভিত্তি করে আমি মোটামুটি একটা অর্জির খসড়া খাড়া করব—করে দেব আমার অ্যাটর্নি বন্ধুকে। তিনি তার থেকে প্লেইন্ট তৈরি করে হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইডে পেশ করবেন। ব্যারিস্টার ইত্যাদিও তিনিই ঠিক করবেন। তারপর মামলার তারিখ পড়বে। মামলা হবে। তারপরে ডিক্রি ডিসমিস্। সে পরের কথা।'

পরের কথা পরে। এখনকার কাজ সাক্ষী সংগ্রহ, সাক্ষ্য সংগ্রহ।

গোড়াতেই গেলাম মার কাছে—ঘাটশিলায়। বাবার মৃত্যুর পর আমরা ঘাটশিলায় চলে যাই। সেখানে আমার ভাই মাকে নিয়ে থাকত তারপর থেকে। ধলভূমগড়রাজ ইস্কুলে মাস্টারি নিয়েছিল সে।

মামলা তুলতে যাচ্ছি শুনে মা আমায় মানা করলেন আবার। বললেন, 'যে দাবি তোর বাবার ছিল না, স্বেচ্ছায় তিনি ছেড়ে দিয়ে গেছেন সে-টাকায় তুই লোভ করতে যাচ্ছিস কেন? তোর নিজের কাজ কর না, তাতেই তোর অনেক টাকা হবে।'

'তা তো করছিই। করবও। কিন্তু বাবার প্রতি কি আমার কোনো কর্তব্য নেই? যিনি তাঁর শেষ বয়সে বিনাদোষে এত কষ্টের কারণ তাঁকে আমি অমনি ছেড়ে দেব? একটুও শিক্ষা দেব না? তুমি বল কি মা? জিতি না জিতি, টাকা পাই না পাই—আমার কিছুটা তার শোধ নেয়া হবে তো। বাবার প্রতি দুর্ব্যবহারের—রাজার ঐ কাজের আমি প্রতিশোধ নিতে চাই।'

'কিছু করতে পারবি নে রাজার। দেখে নিস।...রাজা পুণ্যাত্মা, অনেক দানধর্ম তার। ইংরেজের হুকুমে কি ভয়ে পড়ে ঘাবড়ে গিয়ে তোর বাবার প্রতি যদি কিছু অন্যায় করেও থাকেন, তোর বাবা তা গায় মাখেন নি...সেখানে তোর এত মাথা ব্যথা কেন রে!'

'রাজাকে অন্তত আমি আদালতের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করাবোই। তুমি দেখো।'

'সে হবে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন। যা তুই ভালো বুঝিস কর গে। আমাকে যদি সাক্ষী দিতে হয়, কোর্টে যেতেই হয়, যাব। তুই বলছিস এত করে—যাচ্ছি তাই। কিন্তু আমার মন এতে এতটুকুও সায় দেয় না। যা জানি, বা যা যা ঘটেছিল, যা সত্যি—তাই বলব গিয়ে। ঠাকুরপোর বিরুদ্ধে একটি কথাও আমি বলব না কিন্তু।'

'তাহলেই হবে মা, তাহলেই হবে। দু চারটা কথা তো তোমার, বলবে চলে আসবে। তাই যথেষ্ট। মামলা ওঠার কদিন আগে আমি এসে নিয়ে যাব তোমাকে। আমার বাসায় আমার ঘরে থাকবে দিন কয়েক, কোনো কষ্ট হবে না তোমার। তারপরেই তুমি চলে আসতে পারবে ঘাটশিলায়।'

'তোর ভালো হোক। কিন্তু তোর এই অনর্জিত অর্থে লোভ আমার ভালো লাগছে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা রোজগার করা যায় সেই টাকাই নিজের—তাই কাজ দেয়। অন্য টাকায়, অন্যের টাকায় লোভ করতে যাওয়া কিছু নয়। স্বধর্মাচরণে যা উপায় হয় তাই। অন্য আয় অন্যায়।'

'গায়ে জোর কই আমার যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করি? বুড়ো বয়সে তোমরা আমার জন্ম দিলে কেন? এই ল্যাকপেকে শরীর নিয়ে বলো আমি রিকশা টানতে পারি? টানতে তো আমি রাজি ছিলুম। কতো সুন্দর সুন্দর মেয়েকে টেনে নিয়ে যেতাম রিকশায়। শক্তি থাকলে তাহলে না হয় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপায় করা যেত। কমজোরি দেহ নিয়ে তো রিকশা টানতে পারি না, কলম টানি সেইজন্যে। মাথায় ঘাম হাতে ফেলে কাগজের ওপরই, করব কী?'

মার কাছ থেকে ফিরে গেলাম এক মামার কাছে। পরস্মৈপদী মামা। সিদ্ধেশ্বর মামা, রাজার শালা, বিডন স্ট্রীটে থাকতেন তখন। রানীর অন্তিমকালে উপস্থিতদের একজন, সাক্ষ্য দিতে তিনি রাজি ছিলেন। তাঁর স্টেটমেন্টটা নিয়ে গেলাম তখনকার যাঁরা রাজকর্মচারী ছিলেন, এস্টেটের ম্যানেজার ইত্যাদি—তাঁদের কাছে। তাঁরা সবাই ছিটিয়ে আছেন সারা বাংলায়।

তাঁদের কেউ থাকেন কাঁকিনাড়ায়, কেউ ডায়মণ্ডহারবারে, কেউ বা আবার গরল-গাছায়।

মার মতে, কোর্টকাচারি আর মামলা-মোকদ্দমা আসলে এক একটি বিষবৃক্ষই। এর ফল ফুল কুঁড়ি, লতাপাতা গুঁড়ি—সব বিষাক্ত। এদের ধারেকাছে ঘেঁষতে নেই।

তাই গরলগাছার থেকেই আমার পরিক্রমা, আমার পরাক্রম গড়ালো।

সেকালের ম্যানেজার সেরেস্তাদার রাজার শ্যালক সবাই তখন বেশ বুড়িয়েছেন। সকলেই প্রায় অথর্বদশায়। তাড়াতাড়ি মামলাটা হওয়া দরকার বললেন তাঁরা প্রত্যেকেই। ধর্মাত্মা শিবপ্রসাদবাবুর ছেলেদের প্রতি ন্যায়বিচার হোক সকলেই তাঁরা চান। সেকালের লোকেরা দেখা গেল একালের চেয়ে ঢের বেশি ন্যায়পরায়ণ নিঃস্বার্থপর ছিলেন।

যাই হোক, তাঁদের বক্তব্য মোটামুটি নিয়ে এসে গগনবাবুর হাতে দিলাম। তিনি তারপর আমায় নিয়ে আলিপুর জেলার সদরে রেজিস্ট্রারের দপ্তরে গেলেন—হাতীন্দা পরগণার বিষয়ে সবিশেষ ওয়াকিবহাল হতে। সেখান থেকে ফিরে এসে সব কিছুর একটা খসড়া বানিয়ে তাঁর বন্ধু পাল অ্যান্ড রায়ের ক্ষিতীশবাবুর হাতে দিলেন গিয়ে।

শুরু হলো মামলা।

কত সুন্দর সুন্দর মেয়েকে টেনে নিয়ে যেতাম রিকশায়

স্টেটমেন্ট-এর একটা কপি আমাকেও দেওয়া হয়েছিল।

আমি সেই কপিটা নিয়ে জানাশোনা বিশিষ্ট লোকদের দেখিয়েছি। যুগান্তর আনন্দবাজার ইত্যাদির সম্পাদকতাসূত্রে কলকাতার মাথা মাথা লোকদের সঙ্গে আমার গলায় গলায় ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল।

দেখালাম খ্যাতনামা অ্যাটর্নি যতীন বসুকে।

তাঁর মতন মহাশয় ব্যক্তি অথচ হয় না। তিনি আমায় সমর্থন তো করলেনই, উপরন্তু তাঁর ভাই তখনকার কলকাতার সিনিয়র ব্যারিস্টারদের অন্যতম ডি এন বসুকে অনুরোধ করলেন কোনো ফী না নিয়ে আমার কেসটা হাতে নিতে।

তিনি আরেকজন জুনিয়র ব্যারিস্টারকে নিয়ে (দুঃখের বিষয় তাঁর নামটা আমার মনে আসছে না কিছুতেই, ইন্দ্র রায় রোডে থাকতেন তিনি) দাঁড়িয়েছিলেন আমার মামলায়।

শরৎ বোসকেও দেখিয়েছিলাম, কাগজ-পত্র চোখ বুলিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, চলতে পারে এ মামলা।

চললোও মামলাটা।

এমন চলা চললো যে, সে চলা যেন কখনো আর শেষ হবার নয়। বছরের পর বছর ধরে চললো। গড়াতে গড়াতে চললো।

অবশেষে হাইকোর্টের কজলিস্টে উঠলো একদিন মামলাটা—জাস্টিস্ আমীর আলির এজলাসে পড়েছে। হপ্তার পর হপ্তা ছাপা হতে লাগলো কজলিস্টে, জজ আমীর আলির ঘরে, কাগজে কাগজে খবরটা চাউর হতে লাগলো প্রতিদিন।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

আমরা ভাবলাম মামলাটা উঠবে বুঝি এবার, হেস্তনেস্ত যা হবার হয়ে যাবে।

কিন্তু ওমা! কোথায় কী! এই দেখি, আমাদের মামলাটা লিস্টের তিন নম্বরে এসেছে, গোড়ার দুটোর ফয়সালা হলেই ডাক পড়বে আমাদের। তার পরে দেখি একদিন কখন ফেরতা হুস করে নেমে গেছে লিস্টের তলার দিকে। কখনো বা দিন ...কের জন্যে তালিকার থেকেই উধাও ...র।

...টের মাথায় উঠলে জরুরি ডাকে আমাদের বুড়োসুড়ো সাক্ষীরা সব দিগ্বিদিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন ...য়। দিনকতক কষ্ট করে থাকেন ...সে, খরচপত্তর যা হবার হয়। আমারই হয়; তারপর কেসটা তালিকার তলায় নেমে গেলে তাঁরাও তলিয়ে যান যথাস্থানে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে চলে যান যে যার জায়গায়।

এমনি করে করে মামলাটা যেন অতলান্তের গর্তেই তলাতে থাকলো তলায় তলায়।

'উঠেও উঠছে না—এমনটা কেন হচ্ছে রে?' শুধিয়েছিলাম আমি একবার গোরাকে।

ওর মামা সতীকান্তবাবু আমার প্রথম বইটার (বাড়ি থেকে পালিয়ে) প্রকাশক হওয়ার পর থেকে ওঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়েছিল। গোরাচাঁদ আমার আবাল্য বন্ধু। তার সেই বাল্যকালের থেকেই আমাদের সৌহার্দ্য অটুট রয়েছে—যেমনটা কিনা প্রেমেনের সঙ্গেও—তবে কি না, প্রেমেনের বেলায় তার বাল্যকালের থেকে নয় অবশ্যই।

সব ব্যাপারেই আমি গোরার সঙ্গে পরামর্শ করি। তখন তার বয়স আমার অর্ধেকের কম হলেও সব কিছুতেই সে পারঙ্গম। গোড়াগুড়িই সে সাবালক, আমি দেখে আসছি বরাবর। অনেক কিছু জানে বোঝে—এক নম্বরের সমঝদার।

তা ছাড়া, তার বাবা মামারা প্রায় সবাই আইনজ্ঞ, আইনব্যবসায়ী—এই সব রহস্যের ব্যাপারে সে ওয়াকিবহাল হতে পারে। তাই তার কাছেই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

'এর মানে, তোমার সাক্ষীরা যে সব বুড়োথুড়ো অপর পক্ষের ওরা তার খবর রাখে। তাই পেশকারকে ঘুষ দিয়ে, যে কিনা হাইকোর্টের এই কজলিস্ট তৈরি করে, মামলাটা উপরে উঠে এলেই সরকেট হয়ে নামিয়ে দিচ্ছে বারবার।.....'

'এমনি হলে তো আমার সাক্ষীটাক্ষী সব মরে ভূত হয়ে যাবে। আর তাদের সাথে সাথে আমার মামলাটাও অতলে তলিয়ে যাবে শেষটায়।'

'তাই তো হয় মশাই। যখন ওরা দেখবে তোমার বাহাদুরের সাক্ষীরা সবাই ফেঁসে গেছে তখন দেখবে হুট করে তোমার কেসটা উঠে পড়েছে কখন হঠাৎ। তাই তো হয় হাইকোর্টে। তাই-ই হয়ে থাকে।'

'তাই নাকি?'

... জেনে রাখি যে, হাইকোর্টে যখন

দিদির বাড়ী থেকে
ঘুরে আসার পর
এই মহিলা
অনিন্দ্যসুন্দর
হয়ে উঠছেন।
Lakmé
SATIN GLOW
LIQUID
MAKE-UP
ল্যাকমে
সাটিন গ্লো
লিকুইড মেকআপ
সাটিন গ্লো মেকআপ লাগালে অঙ্গে
ছন্দ মধুর রূপ খেলে যায় সাথে সাথে

মামলা গেছে তখন আর ভাবনা নেই। একেবারে নিশ্চিন্তি। এক্ষেত্রে আর তার ফয়সালা হচ্ছে না। প্রথম পুরুষে মামলা দায়ের করে, যেমন আমি করলাম, মধ্যম পুরুষে মানে আমার ছেলেপুলেরা নাহক তার দায় পোহায়। আর ফয়সালা হয় তার পর পুরুষে গিয়ে।'

'সেই উত্তরপুরুষ অবধি উত্তরোত্তর গড়িয়ে চলবে আমার মামলা? বলো কী হে?'

'তাই তো হয়ে থাকে হাইকোর্টে। হাইকোর্ট বলেছে কেন? এখানে এসে বসে বসে হাই তুলতে হয় খালি।'

'আর হাই তুলতে তুলতে হয়রান হয়ে হায় হায় করতে করতে মারা যেতে হয় শেষটায়।'

'তাই-ই তো হয় মশাই!'

ফরিদপুরের আদি নিবাসী গোরা তিন পুরুষ ধরে কলকাতায়—আমার মতই প্রায় হাফ বাঙাল। সে আমায় নতুন করে যের হাইকোর্ট দেখলো।

কিন্তু ন্যায়াধিকরণে এমনধারা হওয়াটা তো ন্যায় নয়। এমনি মনে হয় আমার। ওদের পক্ষে এটা একটা খেলা হতে পারে, পেশাদারদের এক রকমের পেশাই হয়ত, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটাকে পেষণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। হোয়াট ইজ স্পোর্টস টু ইউ, ইজ ডেথ টু আস—ঈশপের কথামালার কোন ব্যাঙরা বলেছিল না সেই দিলদার বালকের তোর ঢিলবাজির জন্যে? তেমনি আমার প্রতিও এটা নিতান্তই এক রাহাজানি বলে কেবলই বোধ হতে থাকে আমার।

ঠিকই বলেছিল গোরা। বয়স বেড়ে বেড়ে আমার নড়বড়ে সাক্ষীরা সব একে একে কালগ্রাসে পড়লে পরে তারপরেই একদিন হঠাৎ হুপ করে উঠে পড়লো আমাদের মামলা।

গগনবাবুকে গিয়ে বললুম—'কী হবে এবার? আমার সাক্ষীরা তো কেউ বেঁচে নেইকো আর? কী করা যাবে এখন?'

'উঠুক না মামলা। হয়েছে কী! মা একা এসে সাক্ষী দিলেই যথেষ্ট। অবশ্যি ও'র সাক্ষ্যের ঐ করোবোরেটাররা থাকলে আমাদের কেসটা আরো জোরদার হতো নিঃসন্দেহই। তা নেই যখন, কী করা যাবে? অগত্যা আমাদের মামলাটা দাঁড়ালো এখন ওথ্ এগেন্স্ট ওথ্—উনি শপথ করে বলবেন, এই-এই হয়েছিল আর রাজাকে কোর্টে এসে নিজের মুখে সে সব অস্বীকার করতে হবে। না এ সব হয়নি—বলতে হবে এই কথা। তাঁর সম্বন্ধে যে রকমটা শোনা গেছে তাতে মনে হয় তা তিনি করবেন না, করতেই পারবেন না। অসম্ভবই না হয়তো আদালতে। একতরফা ডিগ্রী হবে আমাদের। এই মনে হয়।'

তাই হলো। মা কোর্টে গিয়ে যথারীতি নিজের সাক্ষ্য দিলেন। অপর পক্ষ তাঁকে জেরা করে জেরবার করবার কোনো চেষ্টাই করল না। সেজন্য অরুণ গুপ্ত প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সেদিনের রাতের গাড়িতেই সন্তার সাথে তিনি ফিরে গেলেন ফের ঘাটশিলায়।

কিন্তু রাজাও সাক্ষ্য দিতে এলেন আদালতে তার পরদিন।

সেটা আমার ধারণার বাইরেই ছিল সত্যিই। এলেও তিনি সত্য ঘটনা অস্বীকার করবেন না, মিথ্যা কথন কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—আমার এই অপার্থিব ধারণা বদলে গেল সেদিন। পার্থিব জগতে সব সময় যে সব মেলে না সেটা দেখলাম। তিনি অকাতরে বলে গেলেন আমার ধাত্রীর সাথে, তাঁর বা তাঁর রানীমার কোনো সম্পর্কই ছিল না, আমাদের এস্টেট থেকে সচরাচর যেমন দানটান করা হয়ে থাকে তেমনি এক দাতব্য খাতেই ওই টাকাটা বাবাকে দেওয়া হয়েছিল, আর মাসোহারাটাও এইভাবেই দেওয়া হত তাঁকে। ইত্যাদি ইত্যাদি। পঞ্চভূতের দুনিয়ায় দশচক্রে পড়ে দেবতার মত মানুষও কিম্ভুত কিমাকার হয়ে যায়, দেখা গেল।

তাঁর ঐ এক কথাতেই ডিসমিস হয়ে গেল আমার মামলা।

রায়দানের সাথে সাথেই আমি সেখান থেকে বেরিয়ে সটান চলে যাই গোরার—গোরাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে।

সেখানে সেদিন চার্লিচ্যাপলিনের গোল্ড রাশ ছবিটি দেখানো হচ্ছিল। এক গোল্ড রাশের ফোল্ড ক্রাশ থেকে উঠে আরেক গোল্ড রাশের অট্টহাসে।

(ক্রমশ)

সোয়ান মিলস -এর কাপড়

ব্রেজিলের নোনতা আর মিষ্টি

ব্রেজিল থেকে দেবিকা বসুর পাঠানো রান্নাবান্নার কিছু কিছু আমরা আগেও দিয়েছি। 'ঘরে বাইরের' প্রতি তাঁর আগ্রহ আমাদের উৎসাহ দেয়। পুজোর সময় কিছু রান্নার প্রণালী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাজারের অবস্থা দেখে পাকপ্রণালিগুলি পেশ করতে সাহস হয়নি। অনেকদিন কেটে গেল, বাজার আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তবে আমাদের সাহস হয়তো বেড়েছে। সংকটের মুখোমুখি বসেও মাঝে মাঝে পরিবেশনে নূতনত্ব আনবার ইচ্ছা হয়।

দেবিকা দেবীর রান্নার দু'একটি তাই আজ উল্লেখ করছি। দেবিকা বসুর ইচ্ছা রান্না কেমন হলো তিনি যেন জানতে পারেন। আপনাদের মধ্যে যাঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন তাঁদের কেউ কেউ আমাকে জানাবেন কেমন উৎরালো ব্রেজিলের রন্ধন বাঙালীর রান্না ঘরে।

শ্রীমতী বসু বলেন ব্রেজিলের মানুষ নাকি মিষ্টির পরম ভক্ত। এ ব্যাপারে তাঁরা আমাদেরই মত নয় কি? চা বা কফিতেও ও'রা গাদা গাদা চিনি চান। পথে ঘাটে প্রচুর মিষ্টির দোকান। মিষ্টির মধ্যে আমাদের দেশের ধাঁচও বেশ রয়েছে। নারকেল নাড়ু ও'দের ঘরোয়া খাবার, সস্তা ও সুস্বাদু। তবে ও'রা কুমড়ো মিলিয়ে নাড়ু করেন।

নারকেল নাড়ুর উপকরণ ও পরিমাণ

ভালো কুমড়া এক ফালি
আধখানা নারকেল
চিনি আন্দাজমত
দারচিনি একটুকরো, লবঙ্গ গোটা সাতেক

প্রণালী : ১। কুমড়ো খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট করে কেটে ধুয়ে নিন।
২। নারকেল কুরিয়ে কুমড়োতে দিন ও চিনি দিন
৩। এবার পাকপাত্র চড়িয়ে দিন চুলায়। দারচিনি গুঁড়া ও লবঙ্গ দিন
৪। কুমড়োর জল আর নারকেলের দুধে নরম হয়ে যবে দুইই
৫। মিনিট কুড়ি পরে সবটা বেশ অঠালো হয়ে আসবে
৬। তখন সবটা নামিয়ে ছড়ানো পাত্রে রাখুন
৭। একটু ঠাণ্ডা হলে গড়ে নিন উপাদেয় নারকেল নাড়ু

ভাজা বিস্কুট (মিষ্টি)

উপকরণ ও পরিমাণ :
এক পেয়ালা ময়দা
২টি ডিমের কুসুম
১ চিমটে নুন
৩ চামচ দুধের সর
বড় চামচের এক চামচ লেবুর রস,
ভাজবার জন্য গন্ধহীন খাদ্য তেল,
এক কাপ চিনি
ছোট চামচের এক চামচ Yeast অর্থাৎ খমীর

প্রণালী : ১। একটি পাত্রে ময়দা রেখে তার মধ্যে গর্ত করুন
২। সেই গর্তে ডিমের কুসুম, নুন, সর, লেবুর রস দিয়ে মাখুন

চপ ইত্যাদিতে যদি রুটির গুঁড়ো বা ডিম বাদ দিতে চান তবে আলুতে পাউরুটি মিশিয়ে দিন। বেশ মুচমুচে হবে এবং ডিম ও রুটির অভাব বুঝবেন না। নিরামিষ আলুর চপেও রুটি মিশিয়ে নিলে খেতে ভাল হবে। খুলে যাবে না, রুটিতে বাঁধ আনবে।

ইডলি খাদ্য হিসাবে অতি প্রশস্ত। যদি ঘরে ইডলি নাও করেন দু-চারটি ইডলি কিনে এনে টুকরো করে কেটে ভেজে চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করে দেখুন কেমন হয়। একটু দক্ষিণী নারকেলের চাটনি বাটি করে পাশে রাখলে তো কথাই নেই।

৩। এবার Yeast দিয়ে মিশিয়ে নিন
৪। মাখা তালটি বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিন যাতে খমীর কাজ করতে সময় পায়।
৫। এবার তিন মিলিমিটার পুরু করে বেলে চৌকো বিস্কুটের আকারে কাটুন
৬। প্রত্যেক বিস্কুটে ছুরি দিয়ে তিনটি Y-এর মত দাগ কেটে নিন
৭। গরম খদতেলে ভেজে উপরে চিনি ছড়িয়ে খেতে দিন।

মুরগীর একটি পোশাকী রান্না পাঠিয়েছেন শ্রীমতী দেবিকা বসু। বেশ বয়সাধ্য ব্যাপার কিন্তু খেতে বোধহয় ভাল। ব্রেজিলীয় নাম এর Coxinhas-de-galina সংক্ষেপে Coxinha বা কুসিনা। রোমাঞ্চকর খাদ্য তালিকায় দেবার মত।

উপকরণ ও পরিমাণ :
একটি মুরগী
দুটি বড় পেঁয়াজের কুচি
৪টে টোম্যাটো, এক কোয়া রসুন
২।৩টি তেজপাতা
লঙ্কা ও গোলমরিচের গুঁড়ো
কয়েকটি পেঁয়াজকলির কুচি
৪টি ডিমের কুসুম
½ লিটার দুধ
বড় চামচের ২।৩ চামচ মাখন
অল্প ময়দা, নুন, ভাজবার জন্য খদা তেল
এবং বিস্কুটের গুঁড়ো

প্রণালী : ১। অল্প মাখনে তেজপাতা, পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে নাড়তে থাকুন
২। টমেটো টুকরো করে কেটে ও মুরগী টুকরো করে তাতে দিন
৩। আন্দাজ করে নুন দিন ও লঙ্কা, গোলমরিচ ও পেঁয়াজকলি দিন
৪। এক কাপ জল দিন
৫। পাক পাত্রে চড়িয়ে মাংস সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রাখুন
৬। নামিয়ে ঝোল থেকে মাংস আলাদা করুন।
৭। মাংস থেকে হাড় বেছে ফেলে দিন
৮। যে ঝোলটা আলাদা রইল সেটা পাকপাত্রে আঁচে চড়িয়ে তাতে দুধ, আন্দাজমত ময়দা, ডিমের কুসুম চারটে ও অল্প মাখন দিয়ে ঘন করতে থাকুন
৯। যখন বেশ থকথকে হবে তখন নামিয়ে ঠাণ্ডা করতে দিন
১০। ঠাণ্ডা হলে বড় চামচের এক চামচ করে নিয়ে তাতে অল্প ওই মাংসের পুর দিয়ে পটলের আকারে গড়ে নিন। ডিম ও রুটি বা বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে গরম গরম ভেজে নিন। খেতে অতি চমৎকার হবে।

খবরের টুকরো

পাশ্চাত্ত্য পাক প্রণালীতে roast অর্থাৎ আগুনে ঝলসিয়ে বা পুড়িয়ে রান্না করার পদ্ধতি আদি কালের কৃষ্টির ধারাবহ। আমরা roast এখন অন্যান্য ভাবের রান্নাকেও বলে থাকি। আসল roast সাক্ষাৎ আগুনের সামনে ধরে হয়। এক সময় মাংসখণ্ড, এমনকি আস্ত একটি জানোয়ার আগুনের উপর ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রোস্ট করা হতো। উৎসবে বা ভোজে এই রোস্ট করার ব্যাপারটিও জমজমাট কথার জন্য
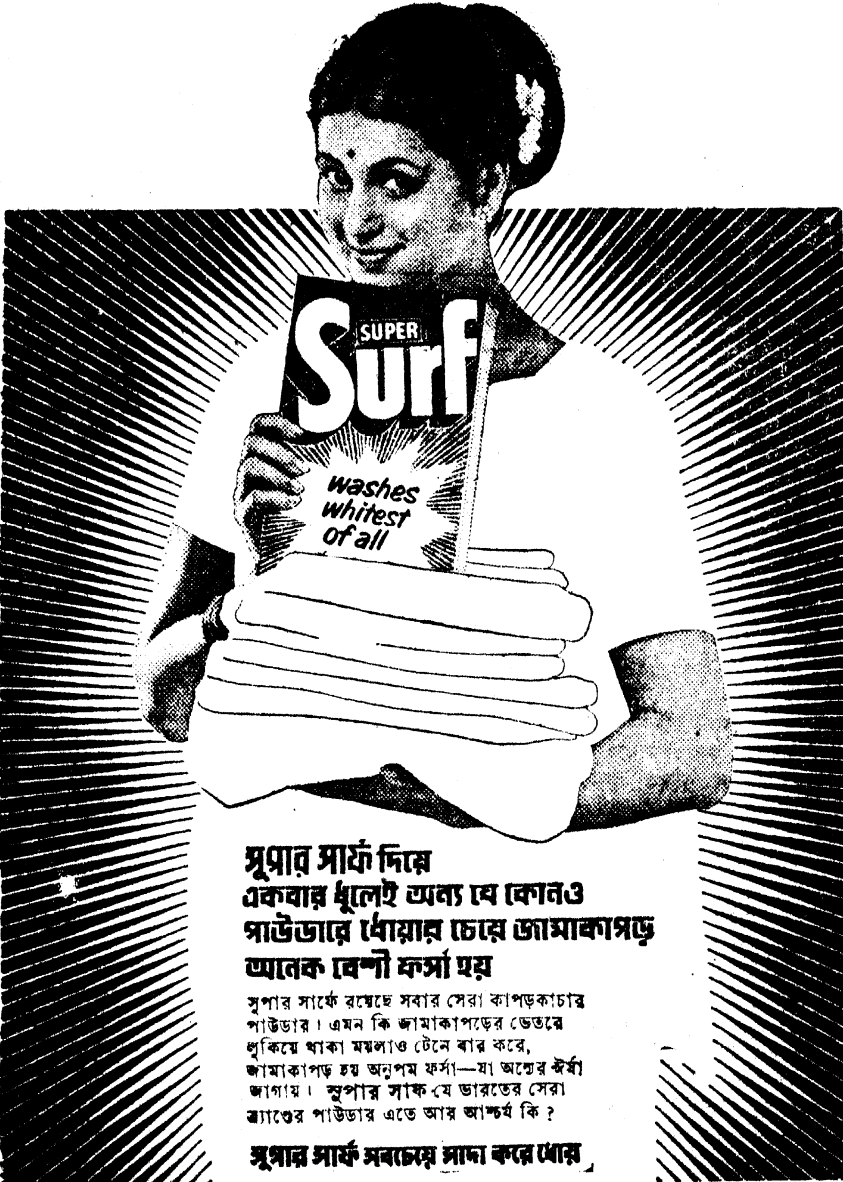
ছিল। শিকে বেঁধে মাংস ঘোরাবার কাজ সাধারণত একটি অল্পবয়সী ছেলের দায়িত্ব হতো। তাকে বলা হতো turnspit অর্থাৎ যে শিক ঘোরায়। মাঝে মাঝে উপর থেকে তৈলাদি বা চর্বি ঢেলে পুড়ে যাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া রোধ করা হতো। খুব বড় বড় রান্নাঘরে নাকি শিকটি একটি চাকায় বেঁধে দেয়া হতো। একটি কুকুর ওই চাকার ভিতরে দৌড়োতে থাকতো যাতে চাকায় বাঁধা শিকটি আগুনের উপর ঘুরতে থাকে। কথিত আছে রাজা আর্থারের রাউন্ড টেবিলের একজন নাইট, নাম গ্যারেথ, তিনি নাকি কিছুকাল ওই সারমেয় শাবকের দায়িত্বটি নিয়েছিলেন।

সেকালে 'বেকিং'-এর ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার। মাটিতে গর্ত করে চারপাশে পাথর সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতো। আগুন নিবে গেলে গরম গর্তের ছাই পরিষ্কার করে তাতে বেক করার জিনিস পাতায় ঢেকে রেখে উপরে পাতা ও মাটি চাপা দেওয়া হতো। তাতে যে স্বাদ হতো তা আজকাল বিজলী ওভেনে হয় না।

শ্রীমতী

চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলকাতায় যতগুলি যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়েছে, তাদের মধ্যে বিড়লা অ্যাকাডেমি আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক প্রদর্শনীটি নানা কারণে উল্লেখ্য। প্রথমত দু একটি দুর্বল নিদর্শন ছাড়া এটি সুনির্বাচিত। দ্বিতীয়ত প্রদর্শনীতে কয়েকজন তরুণ শিল্পীর প্রশংসনীয় সমকালীন শিল্প-দর্শন চোখে পড়ে। তৃতীয়ত, ভাস্কর্য বিভাগে আধুনিক গঠনরীতির কয়েকটি চমৎকার নমুনাও দেখা যায়। তবে দু-একজন বহির্বঙ্গের শিল্পীর সাক্ষাত মিললেও প্রদর্শনীটি এখনও বৃহত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ সম্ভবত কর্তৃপক্ষ এখনও প্রয়োজন মত যোগ্য প্রচারকার্য চালাতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও প্রদর্শনীটি প্রধানত নির্বাচন গুণে উপভোগ্য হয়েছিল। প্রথমেই চোখে পড়ে শ্যামল দত্ত রায়ের দি বিউটি কুইন। কয়েকটি অলংকারপ্রধান প্যানেলের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে হলুদ রঙের ইঙ্গিতপ্রধান রূপবতী নারীর অবতারণা করে

ইটারন্যাল কাপল —সনৎ কর

আউল (পোড়ামাটি) —ফুলচাঁদ পাইন

শিল্পী সুন্দরভাবে বক্তব্য পেশ করেছেন। কালি ও ওয়াশ মাধ্যমে প্রচিত্ত যোগেন চৌধুরীর সাররিয়্যালিস্টিক কম্পোজিশন রেমিনিসেন্সেস অব ড্রিম নং ৬৩ অনেকের ভাল লাগে। স্বচ্ছ রঙ ও সূক্ষ্ম সরল রেখা ব্যবহার করে গণেশ পাইন শিল্প-জগতে নিজস্ব স্থান অধিকার করে নিয়েছেন এবং নিছক সরলতার প্রতীক হিসাবে দি রিলাকট্যান্ট পেডলার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুনীল দাসের সুনীল ৭৩।৭৪ একটি বলিষ্ঠ প্রতীকপ্রধান কম্পোজিশন—ইতিপূর্বে অনেকেই দেখে থাকবেন। পরিকল্পনা ও রচনারীতির দিক থেকে অমিতাভ ব্যানার্জী পি বার্ড-এ নতুন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। সলিল ভট্টাচার্যের কম্পোজিশন-এ (২৬) আয়তন প্রধান রচনারীতির আভাস মেলে। কোলাজ রচনার দুটি উল্লেখ্য নমুনা অনেকের ভাল লাগে—সব্যসাচি চ্যাটার্জীর মব ও ডি আর পানেসারের কোলাজ ২। হেমন্ত মিশ্রর থট্‌স্‌ আপন দি সাইলেন্ট এয়ার পরিকল্পনা ও কম্পোজিশন হিসাবে বলিষ্ঠ নিদর্শন। ধ্বংসাবশেষ ও রুক্ষ, পাতাহীন গাছের প্রতীকের মধ্য দিয়ে শিল্পী এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মী ধরের জলরঙে আঁকা দি লোন স্কেলিটনরও নাম করা যায়, বিশেষ করে গ্রাফিক জাতীয় রচনারীতি অনেকের চোখে পড়ে। আর একটি ছবিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মৈত্রেয়ী ব্যানার্জীর টয় মেকার। নিছক সরল

আকারপ্রধান মূর্তিগুলি বিভিন্ন হালকা রঙের সুপারইমপোজিশনের ফলে নতুনতর রূপে ফুটে উঠেছে। অন্যান্য ছবির মধ্যে রামনাথ পাশারিচার ল্যান্ডস্কেপ, মানু পারেখের বলিষ্ঠ প্রতীকমূলক বিমূর্ত কমপোজিশন গ্রোথ, রঙ ব্যবহার-রীতির জন্য বসন্ত পণ্ডিতের হোয়েন স্কাইজ আর কোল্ড অ্যান্ড মিস্টি, সুবল পালের অ্যাবসট্র্যাক্ট, স্বপ্নেশ চৌধুরীর নীল রঙ স্তরভেদ প্রধান কমপোজিশন-৫, নির্মল দত্তর ওয়াইল্ড রক, মানব দেবের ডমরুপানি, সন্তোষ রোহাতগীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, রবীন মণ্ডলের আদিম জাতীয় উওম্যান, শুভাপ্রসন্নর ফলন, অনিলবরণ সাহার প্রিমিটিভ ডিজাইন, শৈলেন মিত্রের কালি-কলমের ড্রয়িং ও বিশেষ করে অশেষ মিত্রের ইনফ্যানটাইল মুড-এর নাম করা যায়। গ্রাফিকের কয়েকটি উল্লেখ্য প্রিন্ট নিদর্শন অনেকের চোখে পড়ে। বিশেষ করে দীপক ব্যানার্জীর এনগ্রেভিং, হরেকৃষ্ণ বাগ-এর কোলাজ জাতীয় লিথোগ্রাফ ফ্রিডম অব এ নেশন, শান্তনু ভট্টাচার্যের সিল্কস্ক্রীন দি জু, সনত করের আলঙ্কারিক এচিং ইটারনাল কাপল, অপূর্ব সাউ-র আকারপ্রধান লিথোগ্রাফ ভেরিয়েশন অব ইমেজ, আকার বৈচিত্র্যের জন্য লালু শা-র এচিং গ্রাফিক ফোর বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সরলতার দিক থেকে করুণা সাহার স্কেচও অনেকের নজরে পড়ে। প্রদর্শনীতে সমকালীন ভাস্কর্য কলার কয়েকটি প্রশংসনীয় নিদর্শন প্রায় সকলেরই চোখে পড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ফুলচাঁদ পাইনের দি আউল (পোড়ামাটি) ও নিরঞ্জন প্রধানের সিটেড ফর্ম-এর (সিমেন্ট) নাম করা চলে। অতি বলিষ্ঠ স্বাভাবিক আকার ও শিল্পসম্মত কারুকার্যের মধ্য দিয়ে প্রথমজন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং ইঙ্গিতপ্রধান সাবলীল আকার তথা গঠনপদ্ধতির মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়জন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। পজিটিভ ও নেগেটিভ ফর্মের সুন্দর সমন্বয়ের জন্য দ্বিতীয়জনের রিপোজও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রতীকমূলক আকার ও গতিশীলতার পরিচায়ক হিসাবে মানিক তালুকদারের এভিয়েটর (রঞ্জ)-এর নাম করা যায়। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে দিলীপ সাহার কনস্ট্রাকশন (প্লাস্টিক), সেলিম মুন্সির দি ইগো (সিমেন্ট) ও বিশেষ করে মাধব ভট্টাচার্যের কনস্ট্রাকশন (কাঠ ও লোহার পাত) উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনা, আকারবৈচিত্র্য তথা সুকৌশল নেগেটিভ ফর্মের ওপর প্রাধান্যদান ও দুটি পৃথক মাধ্যম সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে ভাস্করশিল্পী সমকালীন ভাস্কর্য-ধারার একটি সুন্দর নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। বিড়লা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ এখন থেকে যদি যোগ্য প্রচার ব্যবস্থার চেষ্টা করেন তাহলে ভবিষ্যতে এই বার্ষিক প্রদর্শনীটি যে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করবে ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু শিল্পীই এতে যোগদান করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

*

রিজ হোটেল সংযুক্ত শান্তিনিকেতন গ্যালারীতে শিল্পী দিলীপ চৌধুরী একটি একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে নিউজপ্রিন্ট কাগজে আঁকা কয়েকটি ছবি দেখা যায়। দিলীপ চৌধুরী সাংবাদিক, একটি সুপরিচিত সিনেমা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছেন। ছবি আঁকা ঠিক তাঁর পেশা নয়, যদিও কয়েক বছর আগে তিনি একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। শিল্পীর কাজ মিশ্র জাতীয়, অর্থাৎ নানা রীতি অবলম্বনে তিনি বিভিন্ন ধরনের ছবি এঁকেছেন। বলা বাহুল্য, সবগুলিই পরীক্ষামূলক, যদিও রঙ ও রেখা বৈচিত্র্যের জন্য দুএকটি মন্দ লাগে নি। অধিকাংশ স্থলেই ছবিগুলি ইঙ্গিতমূলক, অর্থাৎ রঙ ও রেখার মধ্য দিয়ে তিনি বিষয়বস্তুটির আভাসমাত্র দেবার চেষ্টা করেছেন। দুএকটি নাড মন্দ লাগেনি—যেমন টাইগ্রেস। ড্রয়িং ও প্রকাশভঙ্গীর জন্য এটি অনেকের চোখে পড়ে। শিল্পীর অ্যাকশন পেন্টিং জাতীয় নিদর্শনগুলি অনেকের ভাল লাগে, বিশেষ করে নিউজপ্রিন্টের ওপর নানা রঙের সূক্ষ্ম কারুকার্য সৃষ্টি করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আফটার বাথও কয়েকজনের চোখে পড়ে, বিশেষত পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। তবে টর্সোর জন্য শিল্পী প্রশংসা দাবী করতে পারেন—সূক্ষ্ম কারুকার্যপ্রধান ছবিটির ভাস্কর্য জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনেকের চোখে পড়ে। আর একটি ছবিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ—অন দি ক্রস। লাল ও নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে মূর্তির অবতারণা ও সমান্তরালভাবে হলুদ ও সবুজ রঙ ব্যবহার করে শিল্পী এটিকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করেছেন। আগেই বলেছি ছবিগুলি পরীক্ষামূলক, তাছাড়া ছবি আঁকা তাঁর পেশা নয়। সুতরাং প্রদর্শনীর অধিকাংশ অন্যান্য ছবিই দুর্বল। প্রচেষ্টা হিসাবে প্রশংসনীয় হলেও নির্বাচন ব্যাপারে শিল্পী অধিকতর সচেতন হলে ভাল হত।

*

পাশ্চাত্ত্য দেশের বহু স্বনামধন্য শিল্পীর মৌলিক রচনা নিদর্শন দেখার সুযোগ এ দেশের অনেকেরই ভাগ্যে মেলে না। সুতরাং বিভিন্ন মিউজিয়াম ও সুপরিচিত সংগ্রাহক বা সংগ্রাহলয়ে রক্ষিত ছবির প্রতিলিপি দেখেই আমাদের রস-পিপাসা মেটাতে হয়। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে খ্যাতনামা ডাচ শিল্পী রেমব্র্যান্টের (১৬০৬-৬৯) উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবির সুন্দর প্রতিলিপি আছে। সম্প্রতি যাদুঘর কর্তৃপক্ষ রেমব্র্যান্টের সুপরিচিত কয়েকটি ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে এই স্বনামধন্য শিল্পীর নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে আঁকা কয়েকটি ছবির অনন্য প্রতিলিপি দেখা যায়। লেডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পী সোয়ানেনবার্গের কাছে কিছুকাল শিক্ষানবিশী করার পরে রেমব্র্যান্ট আমস্টারডামে

মোমবাতি দিয়ে তৈরী কারুশিল্পের নিদর্শন

চলে যান ও শিল্পী পিটার লাস্টম্যানের সংস্পর্শে আসেন। ২২ বছর বয়সেই রেমব্র্যান্ট শিল্পী হিসবে খ্যাতিলাভ করেন। ২০ বছর বয়সে আঁকা ক্রিমেনস অব টাইটাস তাঁর প্রথম যুগে আঁকা ছবির মধ্যে অনতম, যদিও এটিতে লাস্টম্যানের প্রভাব দেখা যায়। আলোছায়ার অপরূপে সমাবেশই রেমব্র্যান্টের অঙ্কনরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং লেডেনে থাকাকালীন রচিত শিল্পসম্ভারে তাঁর এই নিজস্ব গুণটি ধরা পড়ে। অ্যামসটারডামে [illegible]ত আনাটমি লেসনস্ অব ডাঃ [illegible] শিল্পীকে খ্যাতির উচ্চতর শিখরে পৌঁছে দেয় ও রেমব্রান্ট পরে প্রতিকৃতি এঁকে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই প্রসঙ্গে মোরিবন ডেঁয় অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ, ওয়াইফ অ্যান্ড ডটার, দি উওম্যান উইথ এ ফ্যান-এর উল্লেখ করা চলে। ১৬৩৫ সালে তিনি কয়েকটি প্রতিকৃতিপ্রধান একটি বৃহদাকার ছবি আঁকেন—কম্পানি অব ক্যাপ্টেন ফ্রান্স ব্যানিং কক, যেটি পরে নাইট ওয়াচ নামে খ্যাত হয়। ইতিহাস, পুরাণ অবলম্বনে আঁকা ছবি থেকে শুরু করে প্রতিকৃতি, নিসর্গ দৃশ্য ও বাইবেলের কাহিনীমূলক বহু ছবির প্রতিলিপি প্রদর্শনীতে দেখা যায়। পরিকল্পনা, নিখুঁত অঙ্কনরীতি, সুনির্বাচিত গভীর রঙের স্তরভেদ ও বিশেষত আলোছায়ার অননুকরণীয় সমাবেশ দেখে সত্যিই সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হন। এই প্রসঙ্গে স্টর্মি ল্যান্ডস্কেপ উইথ গুড সমারিটান, প্রতিকৃতমালার মধ্যে শিল্পীপত্নী সাসকিয়া, পুত্র টাইটাস ও বিভিন্ন কালের (১৬৫৯, ১৬৪০ ও ১৬৬৩) আঁকা নিজ প্রতিকৃতির রচনা বৈচিত্র্য দ্রষ্টব্য। বাইবেল অবলম্বনে রচিত ছবির মধ্যে বাথসেবা অ্যাট হার টয়লেট ও বিশেষত ক্রাইস্ট অ্যাট দি কলাম-এর মর্মান্তিক করুণ রূপ অবিস্মরণীয়। প্রদর্শনীতে বহু ছবির রঙীন পোস্টকার্ডও দেখা যায়। বলাই বাহুল্য যে, জনসাধারণকে মনীষী শিল্পীর অনবদ্য শিল্পকর্মের প্রতিলিপি দেখার সুযোগদান করে ভারতীয় যাদুঘর কর্তৃপক্ষ রসিকজনের ধন্যবাদভাজন হলেন।

চিত্রপ্রিয়

মোমের কারুশিল্প

গত ২০ ও ২১ জানুয়ারি ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টারে একজিবিশন হল শ্রীমতী মৃদুলা চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বকীয় অনবদ্য সৃষ্টি—মোম ও হস্তশিল্পের যে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তা বহু শিল্পীমানুষের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। মোম যে এত সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় ইতিপূর্বে অনেকেরই সে-ধারণা ছিল না। শ্রীমতীর এই চমৎকার সৃষ্টি দর্শকদের চোখ ও মন উভয়কেই পরিতৃপ্ত করেছে। কয়েকজন কলাবিদ ব্যক্তি শ্রীমতী মৃদুলার মোমশিল্পকে "মোমবাতি বিপ্লব" আখ্যা দিয়েছেন।

মাত্র ১ পয়সায় ১টি শাড়ী বা ৩টি শার্ট ধবধবে সাদা করার জন্যে

সব রকম কাপড়ের পক্ষেই নিরাপদ হোয়াইটনার

কত লাভদায়ক !

যে কোনও কাপড় আবার নতুনের মত সাদা করতে গড়পড়তায় ১ কৌটা ম্যাক্সিমই যথেষ্ট। আর জেনে রাখুন যে, প্রতি বোতলে প্রায় ১২০০ কৌটা ম্যাক্সিম থাকে। এ থেকেই বোঝা যায় যে ম্যাক্সিমই সবচেয়ে লাভদায়ক ঘনীভূত নীল তরল হোয়াইটনার। তা ছাড়া এই প্লাস্টিক বোতলের মুখে 'ড্রপার' লাগানো থাকে বলে, আপনার ঠিক যত কৌটার প্রয়োজন ততটাই ম্যাক্সিম ঢালতে পারবেন। কোনও অপচয় নেই, আর কাপড়ও বেশী নীল হয় না।

- 'টেরিন' ✓
- 'টেরিন'/'কটন' ✓
- নায়লন ✓
- পশম ✓
- রেশম ✓
- সুতী ✓

সবরকম কাপড়ের পক্ষেই উপযোগী

সবরকম কাপড়েই আপনি নিশ্চিন্তে ম্যাক্সিম ব্যবহার করতে পারেন। 'টেরিন', 'টেরিন'/'কটন' নায়লন, পশম এবং রেশম বা সুতী সব কাপড়কেই ম্যাক্সিম এত সাদা বানিয়ে দেয় যে নতুনের মত দেখায়। তাছাড়া, সবচেয়ে সুবিধা হ'ল যে ম্যাক্সিম ব্যবহারে কাপড়ে কোনও ছোপ ধরে না।

অতি সহজ ব্যবহার বিধি

ম্যাক্সিম ব্যবহার করা খুবই সহজ প্রথমে সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড়গুলি খুব ভাল করে ধুয়ে নিন। তারপর এক বালতি (৫ লিটার) পরিষ্কার জলে ১০।১৫ কৌটা ম্যাক্সিম মেশান। (সাদা কাপড় বেশী ময়লা হলে বা ধবধবে না থাকলে ম্যাক্সিম কয়েক কৌটা বেশী মেশাবেন)। সেইজলে কাপড়গুলি ১০/১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। তারপর, না নিংড়িয়ে ঐ জল থেকে উঠিয়ে কাপড়গুলি টাঙ্গিয়ে শুখোতে দিন।
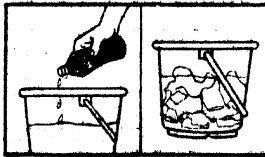
ম্যাক্সিম ব্যবহারে প্রতিটি পয়সায় খরচ সার্থক হয়।

*Regd. T.M. Geoffrey Manners & Co. Ltd.

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১০০ ॥

সূর্য কলকাতায় এসে পৌঁছোলো রাত দুপুরে। পরনে চোস্ত আর শেরওয়ানি, বেশ ময়লা, গলায় মোটা মাফলার, এক মুখ দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সঙ্গে আরও দুজন কাঠখোট্টা চেহারার লোক, ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলো বাড়িতে। বাদলরা সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দরজার শব্দ শুনে জেগে উঠলো সকলে। বাদল ছাড়া আর কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না। চিররঞ্জন খানিকটা ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, একটা কোনো খোঁজ খবর নেই। বহুদিন কোনো চিঠিপত্র নেই, কোথায় ছিলে?

সূর্য প্রশ্নটাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে উত্তর দিল, এই ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম নানা জায়গায়। আপনারা সবাই কেমন আছেন?

বাদলের মায়ের অসুখের কথা শুনেও সূর্য বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য দেখালো না। দুচার কথার পরেই জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে কিছু খাবার দাবার আছে? আমার সঙ্গে দুজন লোক এসেছে, তারা আজ রাত্রে এখানেই থাকবে।

এত রাত্রে তিনজন লোকের মতন খাবার আর কি করে থাকবে? কিছুই নেই। চিররঞ্জন একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। একজন রাঁধুনি রাখা হয়েছে, তাকে ডেকে তুলে কিছু তৈরি করাতে বললেও অনেক রাত হয়ে যাবে।

বাদল বললো, আমি খাবার কিনে আনবো? পাঞ্জাবীদের দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

সূর্য পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বললো, যা তো, কিছু রুটি আর মাংস নিয়ে আয় তো চট করে। ট্যাক্সি নিয়ে চলে যা।

বাদল একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। নিঝুম নিস্তব্ধ রাস্তা, দুপাশের আলোগুলো ঝকমক করছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েও বাদল কোনো ট্যাক্সি পেল না। শ্যামবাজারের মোড়ের মাথায় একটা দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, সেখানে গেলে কিছু পাওয়া যাবেই।

বাদল আর দেরি না করে হনহন করে হাঁটতে লাগলো। সে একটুও কষ্ট বা বিরক্তি বোধ করছে না। সূর্যদাকে দেখলেই তার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আসে। সূর্যদার জন্য সে কিছু একটা করতে পারছে—এইটাই যেন ধন্য হয়ে যাবার মতন ব্যাপার। সূর্যদা ফিরে এসেছে, আবার সব কিছু বদলে যাবে—এই চিন্তা তাকে একটা চাপা উত্তেজনা দেয়। তবু, এক একবার মনের কোণে আর একটা কথাও উঁকি মারে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে সে ভুলতে চায়, আবার মনে আসে। সূর্যদা যেন খানিকটা দেরি করে ফেলেছে। ফিরলোই যখন—।

শ্যামবাজারের কাছে বাদল যখন এসে পৌঁছোলো, তখন সে রীতিমতন ঘামছে। মাংসের দোকানটা তখন ঝাঁপ ফেলার উপক্রম করেছে। নতুন করে কিছু রুটি বানাতে হলো, মাংস খানিকটা ছিলই। একটা ট্যাক্সিও পাওয়া গেল সেখান থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসতে আসতে তার মনে হলো, সূর্যদার প্রত্যাবর্তনের সংবাদটা যেন এক্ষুনি সারা কলকাতায় জানিয়ে দেওয়া দরকার। যেখানে বাদলের যত চেনাশুনো মানুষ আছে, সকলকে এই সময়েই জানিয়ে এলে কেমন হয়! এবং রেণুকে?

বাড়িতে ফিরে বাদল দেখলো, চিররঞ্জন ইতিমধ্যেই আবার শুয়ে পড়েছেন। অনেক আলোই আবার নেবানো। তিনতলা থেকে সূর্যদাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে কয়েকটা প্লেট নিয়ে বাদল খাবারগুলো সমেত উঠে এলো ওপরে।

তিনতলায় বড়বাবুর ঘর অনেকদিন খোলা হয়নি। আসবাবপত্র ধুলোয় ধূসর। বাদল সেখানে এসে দেখলো, সেই ধুলোর মধ্যেই মেঝেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে ওরা তিন-জন বসে গেছে, সামনে গেলাস ও মদের বোতল।

সূর্য বললো, খাবার পেয়েছিস? আয়, বোস এখানে।

বাদলের সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও আঘাত লুকোতে পারছে না। সূর্যর সঙ্গী দুজন দু'বাধা

হিন্দীতে কিছু প্রশ্ন করলো, বাদল ঠিক বুঝলো না, সূর্য উত্তর দিল সেই রকম ভাষায়। ওদের মধ্যে একজন, যার চেহারা অনেকটা সিনেমার অমর মল্লিকের মতন, নিজের পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে চাপড়ে বললো, বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে, ইধার বৈঠিয়ে।

বাদল হাঁটু মুড়ে বসে প্লেট কখানাতে মাংস তেল রুটি সাজিয়ে দিল। সূর্য এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে বললো, বাঃ বেশ।

গলা থেকে মাফলারটা খুলে সূর্য তাতে হাত মুছলো। তারপর মদের বোতলটা ধরে বাদলকে জিজ্ঞেস করলো, তুই একটু খাবি, তাহলে গেলাস নিয়ে আয়!

বাদল শুকনো গলায় বললো, না, না, দরকার নেই।

—তুই খাস না?

—না।

—সিগারেট টিগারেট খাস তো। এই নে, নিতে পারিস।

সূর্য একটা সিগারেটের টিন এগিয়ে দিয়েছে। ঠিক ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় নয়, যান্ত্রিক ভাবে হাত বাড়িয়ে বাদল একটা সিগারেট তুলে নিল। দেশলাই জ্বেলে ধরাতে গিয়ে সে টের পেল, তার হাত কাঁপছে। সূর্যদাকে সে অনেক রকম অবস্থায় দেখেছে, কিন্তু এই রকম অবস্থায় দেখবার কথা সে কল্পনাও করে নি। মদ খাওয়া সম্পর্কে যে তার খুব একটা ভীতি আছে তা নয়। অনেক বিদেশী গল্প-উপন্যাস পড়ার পর সে এ সম্পর্কে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু নীচে বাবা-মা রয়েছেন, এতদিন পরে বাড়িতে ফিরেই সূর্যদা, বিশেষত বড়বাবুর ঘরে এ রকম আসর জাঁকিয়ে বসেছে—এ ব্যাপারটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সূর্যদার আগেকার সেই গাম্ভীর্যও আর নেই, লোক গুলোর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল।

এক সময় সূর্য বাদলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তারপর তোদের খবরটবর কি বল?

বাদল বললো, নতুন খবর কিছু নেই। বড়দিরা অনেকদিন কলকাতায় আসে নি। আমি কিছুদিন আগে খড়্গপুরে বড়দিদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—

প্রথমে শ্রীলেখার কথাই মনে এলো বাদলের। তাই সে সবিস্তারে শ্রীলেখার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সূর্য কোনো আগ্রহই দেখালো না। হঠাৎ মাঝ পথে বাদলকে জিজ্ঞেস করলো, তুই এখন কি করছিস পড়ছিস?

লজ্জায় অবনত মুখে বাদল বললো, না, চাকরি করছি।

বাদল ভেবেছিল, সাধারণ ছেলের মতন সেও যে শেষ পর্যন্ত চাকুরিজীবী হয়ে গেছে, একথা শুনে সূর্য নিশ্চয়ই উপহাস করবে। কিন্তু সূর্য এ ব্যাপারেও কোনো মন্তব্য করলো না। যেন নিছক প্রশ্ন করে যাচ্ছে, উত্তরগুলি সম্পর্কে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

বাদল এবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে সূর্যদা?

—অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। গোয়ালিয়র, গাজিয়াবাদ, সিমলা—এদিকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্তও গিয়েছিলাম।

—এখন থেকে কলকাতাতেই থাকবে তো?

—কি জানি!

—কতদিন আর ঘুরে বেড়াবে। তোমাকেও একটা কিছু করতে হবে তো!

সূর্য এবার হাসলো বেশ উঁচু গলায়। তারপর বললো, একটা কিছু করতে হবে, তাই না। দেখা যাক!

সূর্যর সঙ্গীরা গপাগপ করে মাংস রুটি খাচ্ছে। মাংসের ঝোল পড়ছে জামা-কাপড়ে, তাতে কোনো হুঁস নেই। সিগারেটের টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে ঘরের যেদিকে সেদিকে। একজন তার লম্বা পা ছড়িয়ে দিয়েছে দেয়ালের দিকে, সেখানে গাদা করা বইতে যে তার পা লাগছে, তাতে হুঁস নেই। বাদল সজ্ঞানে কখনো বইতে পা ছোঁওয়ানোর কথা চিন্তাই করতে পারে না। তার বারবার মনে হচ্ছে, বড়বাবুর ঘরটাকে যেন অপবিত্র করা হচ্ছে। এ ঘরে এলে বড়বাবুর কথা বড় বেশি মনে পড়ে—যেন বড়বাবুর প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি ভেসে আছে সর্বত্র। সূর্যদার কি একবারও মনে পড়ছে না সে সব কথা!

পরদিন সকাল নটার মধ্যেও সূর্য আর সঙ্গীদের ঘুম ভাঙলো না। বাদল দু'তিনবার ওপরে এসে দেখে গেল। ওদের জন্য তৈরি করা চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল দুবার। ওরা কাল কত রাত্রে ঘুমিয়েছে কে জানে, তাই বাদল ডাকতে সাহস করলো না।

এদিকে বাদলের অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। একবার সে মনে মনে ভেবেছিল, আজ আর অফিসে যাবে না। কিন্তু সে কথা উত্থাপনেরই সুযোগ পেল না। তার বাবা-মাই বারবার তাড়া দিতে লাগলেন। নতুন চাকরি, এরই মধ্যে কামাই করা চলে নাকি? বিলিতি কম্পানি—ওদের নিয়মকানুন খুব কঠোর। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বাদল অফিসে গেল। এতদিন পরে সূর্যদা এসেছে, কত কি গল্প করার আছে।

অফিস ছুটির পর একটুও দেরি না করে বাড়ি ফিরে এলো বাদল। তখন সূর্য বেরিয়ে গেছে। দুপুরে খেয়ে দেয়েই সে বেরিয়েছে, কখন ফিরবে বলে যায় নি। সারা সন্ধে সে অপেক্ষা করে রইলো।

সূর্য ফিরলো প্রায় রাত বারোটার সময়, সঙ্গীদের নিয়ে হল্লা করতে করতে। ওরা যে যথেষ্ট মাতাল হয়ে এসেছে, তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। গোপন করারও কোনো চেষ্টা নেই ওদের। ওপর-তলায় উঠে গিয়ে গান বাজনা জুড়ে দিল।

দু'তিনদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে সূর্য কলকাতায় ফিরে এসেছে শুধু উপদ্রব করতে। বাদলের বাবা-মাকে গুরুজন হিসেবে ও সামান্য সমীহও করে না। ওঁদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলারও সময় নেই তার। অধিকাংশ সময়েই সে বাড়িতে থাকে না, আবার নিতান্ত অসময়ে অজানা-অচেনা লোকদের বাড়িতে ডেকে আনে। সূর্য চিরকালই এক-রোখা ছেলে, যখন যেটাকে ধরে সেটাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে। এখন ও বেলেল্লা-পনাতেই শুধু আনন্দ পাচ্ছে।

হিমানী ও চিররঞ্জন আবার দারুণ অশান্তিতে পড়লেন। এখন সব সময় একটা কথা কাঁটার মতন বেঁধে, সূর্যই এই বাড়ির মালিক। তাকে জোর করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু বাড়ির মালিক হলেই যে সে যা খুশি তাই করবে, এটাই বা সহ্য করা যায় কি করে? ভদ্র সমাজে সম্মানরক্ষা করে বাঁচতে হবে তো!

হিমানী হঠাৎ একদিন জেদ ধরে বসলেন, তিনি আর এ বাড়িতে থাকবেন না। বিয়ের পর থেকে এতগুলো বছর তাঁকে কত রকম অপমান সহ্য করতে হয়েছে, এখন মরার আগে তিনি একটু শান্তি পেতে চান। চিররঞ্জনকে তিনি বললেন, আমার ছেলে এখন চাকরি করে, সে কি এখন আলাদা

একটা বাড়ি ভাড়া করে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। কেন আমরা অপমান সহ্য করে এখানে থাকবো। যতসব ম্লেচ্ছদের উৎপাত শুরু হয়েছে।

বাদলের দিকে ফিরে তিনি বললেন, কিরে, তুই পারবি না? তোর বাবা তো সারাজীবন আমাদের জন্য একটা বাসা জোগাড় করতে পারলো না! পাঁচজনকে আমি বলতে পারবো তবু আমার ছেলে আমার জন্য......

পুত্রগর্বে হিমানী তাঁর স্বামীকেও অপমান করতে দ্বিধা করেন না। চিররঞ্জন প্রতিবাদ করে বললেন, কেন, আমরা এ বাড়ি ছাড়বো কেন? এতদিন রইলাম, দেখাশুনো করলাম—এখন এখানে থাকার একটা রাইট আছে আমাদের। কাগজপত্তরও সব আমার কাছে। আমরা না থাকলে তো এ বাড়ি এতদিনে বেওয়ারিশ হয়ে যেত!

হিমানী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, লাথি ঝাঁটা খেয়েও তুমি এখানে থাকতে চাও! বেশ তো, তুমি থাকো। ছেলেকে নিয়ে আমি আলাদা থাকবো।

—বাড়ি ভাড়া করে আলাদা সংসার করা কি কম খরচের কথা। বাদল কতই বা মাইনে পায়। এর ওপর তোমার চিকিৎসার খরচ আছে।

—দরকার নেই আমার চিকিৎসার। না হয় আধপেটা খেয়ে থাকবো—তবু কুলাঙ্গারের সঙ্গে এক বাড়িতে......

মা বাবার বচসার সময় বাদল কোনো কথা বলে না। তার মনটা বিস্বাদ হয়ে যায়। আজকাল যখন তখন হঠাৎ টাকা পয়সার প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয়। টাকা পয়সাকে কেন্দ্র করেই যা কিছু অশান্তির চিন্তা। যে-চাকরিটাকে সে একেবারেই পছন্দ করে না, সেই চাকরির কয়েক শো টাকা মাইনের ওপরেই নির্ভর করছে তাদের পারিবারিক নিরাপত্তা। যতদিন বাবা-মা বেঁচে থাকবেন, ততদিন তাকে এই চাকরি থেকে উপার্জন করে যেতে হবে। এর নাম দায়িত্ব। সে নিজের ইচ্ছে মতন বাঁচতে পারবে না। যাদের টাকা আছে, শুধু তারাই নিজের ইচ্ছে মতন বাঁচবে। বাদল নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে।

সব অশান্তির মূলে যে, সেই সূর্যদার ওপরে বাদল তবুও রাগ করতে পারে না। সেই ছেলেবেলা থেকেই তার ধারণা, সূর্যদা একদিন না একদিন বড় কিছু একটা করবে। এখনো সেই ধারণাটা ছাড়তে পারে না। সূর্যদা এ পর্যন্ত একবারও সুস্থির হতে পারলো না। একটু সুস্থির হলেই সূর্যদা অনেক কিছু করতে পারে।

অফিস থেকে দুপুর বেলা বেরিয়ে এসে বাদল প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। রেণুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। অনেকদিন দেখা না হলেও রেণু কি বুঝতে পারে যে ওকে দেখার জন্য সে সব সময় ছটফট করছে? কম বয়েসে সন্দেহ কিংবা ঈর্ষা—এসব কিছুই থাকে না। কয়েক বছর আগেও পরস্পরের ওপর যে নির্ভরতা ছিল, তা কি করে চলে গেল? এখন কয়েকদিন চোখের আড়াল হলেই বাদলের মনে হয়, রেণু বুঝি তাকে ভুলে গেছে। কিংবা, অন্য কোনো রূপবান, গুণবান যুবকের সঙ্গে কথা বলছে হেসে হেসে। দেবুদার পর্বটা অনেকটা চুকেছে। মহীশূর থেকে ফেরার কয়েকদিন পর বাদল নিজেই রেণুর সঙ্গে দেখা করে তার মান ভেঙেছিল। তখন সব মিলিয়ে বাদলের অপরাধবোধ খুব প্রবল ছিল।

অফিসে চাকরি নেবার পর রেণুর সঙ্গে আর নিয়মিত দেখা হয় না। রেণু কখনো কখনো বাড়িতে আসে। আজ সকাল থেকে নানারকম পারিবারিক ঝামেলার [illegible] চিন্তা করতে করতে বাদলের এক সময়ে মনে হয়েছে, রেণুকে আমার চাই। রেণুকে আরও বেশি সময় খুব কাছাকাছি না পেলে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না।

ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে, গেটের কাছে রেণুকে দেখতেও পেল বাদল। কিন্তু রেণু রাস্তা পার হবার আগেই একটা মিছিল এসে পড়লো। পরপর তিনটি গাড়ি আসছে ধীর গতিতে, তার সামনে পেছনে এক দল ছেলে লাফালাফি করছে মহা উৎসাহে। বিরাট বড় কংগ্রেসের পতাকা, গান্ধীজীর ছবি, সেই

সঙ্গে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি। মাঝখানের জিপ গাড়িতে ফুলের মালা গলায় এক ব্যক্তি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। বাদল চিনতে পারলো। শংকর বোস। কাশীপুরে বাই ইলেকশনের ফলাফল বেরিয়েছে আজ, শংকর বোস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। উনি যে জিতবেনই সবাই জানতো—তবু এই আনন্দ উৎসবের মিছিল।

বাদল ঐ মিছিলের সব মানুষ এবং গাড়ি ক্ষিনটের মধ্যে দ্রুত চোখ বোলালো একবার। শংকর বোসের গাড়িতেই সে দেখতে পেল দীপ্তিদিকে। মৃদু হাসিমাখা মুখে দীপ্তিদি আরও দুতিনজন মহিলার সঙ্গে বসে আছেন পেছনের সীটে। বাদলের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। এই জন্যই তার মনে হয়েছিল সূর্যদা যখন ফিরলোই, এত দেরি করে ফিরলো কেন?

উল্লাস-মিছিলটা এইটুকু পথ পেরিয়ে যাবার জন্য যতটুকু সময় লাগা উচিত ছিল, তার চেয়েও বেশি সময় লাগছে। সামনের দিকটা থেমে পড়েছে হঠাৎ, তরুণ ভলন্টিয়াররা নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। সাধারণত বিপক্ষ দলের শক্ত ঘাঁটিগুলোর সামনেই জয়ের আনন্দ বেশি করে দেখাবার নিয়ম। কলেজ পাড়ার ইউনিয়নগুলো অধিকাংশই এখন এস এফ-এর দখলে, তাই কংগ্রেসের ছেলেরা এখানে বীরত্ব দেখাতে চায়। বাদল যদিও আবার তার পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে, তবু রক্তের মধ্যে তার রেশ রয়ে গেছে এখনো। সে নির্বিকার থাকতে পারে না, ভোটে-জেতা কংগ্রেসীদের এই আস্ফালন দেখে তার রাগ হয়, দাঁতে দাঁত চেপে সে চোয়াল শক্ত করে।

জিপের ওপর দাঁড়িয়ে শংকর বোস হাত জোড় করে, এদিকে ওদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। তবে সাধারণত এইসব পরিস্থিতিতে এইসব লোকের মুখে যে একটা বিগলিত হাসি থাকে, ওর মুখে সে রকম হাসিটা নেই। বরং বেশ খানিকটা ক্লান্ত ভাব। দেখলেই মনে হয় মানুষটি তাঁর জীবনে বহুপথ ও বহু সংঘর্ষ পার হয়ে এসেছেন। এখন যেন তাঁর খানিকটা বিশ্রাম ও আরামের প্রয়োজন। খবরের কাগজগুলো আগে থেকেই ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছে, ভোটে জিতলেই শংকর বোস অন্তত রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হবেনই। অর্থাৎ ক্লান্ত বিপ্লবীর জন্য এবার আরামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

মিছিলটা পার হতে হয়তো সময় লেগেছিল দশ বা বারো মিনিট। কিন্তু বাদলের মনে হলো ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে। সে অধীর হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, এই মিছিলটা একটা অজগর সাপের মতন তার আর রেণুর মাঝখানে পড়ে আছে—কিছুতেই দুজনকে কাছাকাছি আসতে দিচ্ছে না। ভিড়ের আড়ালে রেণুকে আর দেখা যাচ্ছে না এখন। এরপর কি আর রেণুকে সে খুঁজে পাবে? মনশ্চক্ষে সে একটা অজগর সাপই দেখতে পাচ্ছিল, ঘোর ভেঙে সে নিজেকে ভর্ৎসনা করলো। মনে মনে বললো, আমি বড় বেশী রোমান্টিক, তাই আমার এতদিনেও একটুও বাস্তব বুদ্ধি হলো না। শুধু শুধু মনগড়া দুঃখে আমি কষ্ট পাই। মিছিল আর কতক্ষণ থাকবে, এক্ষুনি চলে যাবে, রেণুকে আমি খুঁজে পাবো। ঐ তো, মিছিল নড়তে শুরু করেছে, অজগর নয়, মিছিলই। সে আবার তাকালো দীপ্তিদির দিকে। দীপ্তিদি বড় সুন্দর। যেন দীপ্তিদি বাদলেরই প্রেমিকা, এই ভাবে বাদল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বস্তুত বাদলের দীর্ঘশ্বাসের কারণ এত সরল নয়, আরও অনেক জটিল।

বাদল রেণুকে আগেই দেখেছিল, কিন্তু রেণু তো তাকে দেখেনি। রেণু তার দুজন বান্ধবীর সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল বাস স্টপের দিকে, বাদল দ্রুত হেঁটে তার আগেই সেখানে দাঁড়ালো। রেণুর চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করলো। রেণু কি একটা গল্পে মত্ত। অন্যদিন হলে বাদল অন্য মেয়ের সামনে রেণুর সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেত, কিন্তু আজ সে কিছুতেই রেণুকে চোখের আড়াল হতে দিতে পারে না। সে কাছে গিয়ে ডাকলো, ইন্দ্রানী!

রেণু মুখ ফিরিয়ে বাদলকে দেখলো, তারপর বান্ধবীদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই এগিয়ে এলো বাদলের দিকে। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে? কি?

বাদল হকচকিয়ে গিয়ে বললো, কিছু হয়নি তো? কেন?

—তুমি হঠাৎ দুপুরে বেলা—

—এমনিই। মানে—

—কিছু হয়নি তাহলে? বাবাঃ!

রেণু হেসে ফেললো। মেয়েদের এরকম আকস্মিক হাসির অর্থ ছেলেরা আবার কবে বুঝতে পেরেছে! বাদল বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলো।

রেণু মুখ তুলে তার সঙ্গিনীদের উদ্দেশ্যে বললো, তোরা যা, আমি একটু পরে যাবো।

তারপর আবার বাদলের দিকে ফিরে বললো, মুখ চোখের কি রকম চেহারা হয়েছে তোমার, গলার আওয়াজ অন্যরকম—আমি ভয় পেয়ে ভাবলাম কিছু একটা বিপদ হয়েছে বুঝি!

—মুখ চোখের চেহারা কি রকম?

—জানো না? ঐ পানের দোকানের আয়নায় মুখটা দেখে নাও। মাসীমা কেমন আছেন?

বাদল এর মধ্যে একদিনও অফিস কামাই করেনি, দুপুরে পালায় নি, সুতরাং হঠাৎ তাকে দেখে রেণু ধরে নিয়েছে অন্য কিছু। কিন্তু মুখ চোখের চেহারা পাল্টালো কেন? বাদল জানে না। রেণু কি ভেবেছে, বাদল আর কখনো হঠাৎ যে-কোনো সময়ে রেণুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে না?

রেণু খবর জানতে চেয়েছিল বলেই বাদল বললো, জানো, সূর্যদা ফিরে এসেছে।

রেণু উৎসাহিত হয়ে বললো, তাই নাকি? কোথায় ছিলেন এতদিন? কি রকম চেহারা হয়েছে?

—মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ।

—আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো না!

—খুব ব্যস্ত। তুমি এসো আমাদের বাড়িতে। এখন চলো না।

—এখন? এখন যে আমাকে একবার বাড়িতে ফিরতেই হবে।

—প্লিজ রেণু, আজ একটু থাক আমার সঙ্গে। আমি তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

কয়েকটা কথা মানে আগে থেকে ঠিক করা বিশেষ কোনো কথা নয়। বাদল চাইছে রেণুর সঙ্গ। শরীরের যে একটা দুরন্ত পিপাসা আছে, তা কিছুক্ষণের সান্নিধ্য ও কথাবার্তাতেও অনেকখানি মেটে। আজ সকালেই বাদল ঠিক করেছে, রেণুকে অনেকক্ষণের জন্য কাছাকাছি না পেলে তার চলবে না, সে বিদেশে পালাতে পারেনি, এবার রেণুর বুকের কাছে আশ্রয় নেবে। আর দু বছরের মধ্যে বিয়ে করবে সে, ততদিনে রেণুর পরীক্ষা হয়ে যাবে। এ কথাটা রেণুকে এখন জানাবার দরকার নেই।

রেণু বললো, কিন্তু আমার যে বাড়ি ফেরা বিষম দরকার এখন?

—কেন, কেউ আসবে বুঝি?

বাদলের এই প্রশ্নের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল, রেণু তা পছন্দ করলো না। সে দৃষ্টিতে সামান্য ছিঃ দিয়ে তাকালো বাদলের দিকে। তারপর বললো, তুমিও চলো আমার সঙ্গে।

বাদল দুঃখিত ভাবে বললো, তোমার কাজ থাকলে আমি আর গিয়ে কি করবো?

—আমি শাড়িতে বাটিকের কাজ করছি। রং টং সব ভিজিয়ে রেখে এসেছি। এখন না গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমি রং করবো তুমি তুমি পাশে বসে গল্প করবে।

বাদলের মনের মেঘ কেটে গেল। এটা একটা ভালো আহ্বান। মেয়েদের কোনো রকম মেয়েলি কাজ করতে দেখলে বাদলের সেই সময়টা বেশ ভালো লাগে। যেমন রান্না ঘরে কুটনো কুটতে বসা কিংবা স্নান করার পর চুল ঝাড়ার সময়, কিংবা মেয়েরা যখন কাচের চুড়ি পরে, তখন বাদলের চোখে তাদের অন্য রকম একটা রূপ ভেসে ওঠে,

হাতে অন্যরকম মোহ। রেণুর বাটিক রচনার দৃশ্যও সে উপভোগ করবে।

উৎসাহে দরাজ হয়ে বাদল একটা ট্যাক্সি ডেকে বসলো। রেণুর আপত্তি শুনলো না। ট্যাক্সিতে উঠে সে রেণুকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তোমার দুজন বন্ধুর সঙ্গে বাসে উঠতে যাচ্ছিলে—তারপর আমার সঙ্গে চলে এলে, ওরা কিছু ভাবলো না?

রেণু বললো, ভাবুক না! তুমি একদিন বলেছিলে, অন্যলোকের সামনে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি না। আসলে তা নয়। তুমিই অন্যলোকের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পাও! তোমার মনের মধ্যে সব সময় থাকে, অন্য কে কি ভাবছে। আমি তা গ্রাহ্য করি না।

এটা তর্ক করার বিষয় নয়। বাদল সন্ধি করার কার্যক্রম হিসেবে রেণুর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। কি পরিচ্ছন্ন নরম হাত। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে রং লেগে আছে, না, মেহেদি নয়, সকালবেলা বাটিকের রং গুলেছিল। অনেকদিন পর বাদলের মাথায় দু' লাইন কবিতা জেগে উঠলো অকস্মাৎ! প্রথম শ্লোক উচ্চারণের পর বাল্মীকি যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, ততটা না হলেও বাদল রীতিমতন অবাক হয়ে মনে মনে বলেছিল, একি! আবার কবিতার উৎপাত কেন? পরে বাদলের সেই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর মতন বিদগ্ধ সমালোচক দু' একজনকে বলেছিলেন, ছেলেটি কে? বেশ লিখছে তো!

কবিতার সৌরভ অবশ্য বেশীক্ষণ রইলো না। রেণুদের বাড়ির গেটে ওর ছোট কাকা দাঁড়িয়েছিলেন। রেণু ও বাদলকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে তিনি সরু চোখে তাকালেন। তারপর তাঁর অর্ধশশী মুখে অনাবশ্যক হাসি ফুটিয়ে বললেন, এই যে, বাদলকুমার যে, অনেকদিন দেখিনি! কোথায় ছিলে?

ছোটকাকা সম্পর্কে বাদলের মনোভাব রেণু জানে। তাই সে তাড়াতাড়ি বাদলকে বললো, চলো, ওপরে চলো—।

কিন্তু ছোটকাকা বাদলের হাত ধরে বললেন, আরে বসো বসো। এখানে একটু বসো, তোমার সঙ্গে গল্প করি। চাকরি-বাকরি পেয়েছো?

বাদলকে ফেলেই রেণু তরতর করে ওপরে উঠে গেল। দু' তিন মিনিটের মধ্যেই আবার নেমে এসে বললো, এই ওপরে এসো। মা তোমাকে খাবার দিয়েছেন!

ছোটকাকার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাদল রেণুর সঙ্গে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। মনটা আবার একটু বিস্বাদ হয়ে গেছে। মামলাবাজ ছোটকাকাটি অতি পাজী, হাসতে হাসতে অনেকখানি বিষ ঢেলে দিয়েছে বাদলের কানে।

সিঁড়ির বাঁক ঘুরে রেণু থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললো, এই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রথম স্বাধীনতার দিনে আমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মনে আছে?

বাদলের মনে ছিল না। মনে পড়লো। সে ঘাড় নাড়লো।

রেণু বললো, তুমি আমার জন্য অন্তত আমাদের বাড়ির কারুর ওপরে কখনো রাগ করবে না। পারবে?

—পারবো।

মুড়ি, চিঁড়েভাজার সঙ্গে নারকোল-কোরা আর চিনি মিশিয়ে এক বাটি দেওয়া হলো বাদলকে। রেণুদের বাড়িতে এই সুখাদ্যটি বাদল আগে অনেকবার খেয়েছে। আজ অবশ্য অনেকদিন পরে ওপরে এসেছে। কিন্তু রেণুকে আর নিরিবিলি পাওয়া গেল না। সে বাটিকের রং করতে বসতেই তার কাকীমা, পিসীমা এবং অন্য ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে রইলো।

একটু বাদে সেখানে এসে দাঁড়ালেন রেণুর মা। মুখখানার গাম্ভীর্য ও দুঃখ মাখা। ছেলেবেলায় বাদল সব সময় রেণুর মাকে হাসিখুশী দেখেছে। দেখলেই মনে হতো, খুব সরল ধরনের ভালোমানুষ। পরপর কয়েকটা নিদারুণ শোক পেয়ে ওঁর আর মাথার ঠিক নেই এখন।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি বাদলের দিকে তাকালেন। বাদল তাড়াতাড়ি হাতের বাটিটা নামিয়ে রেখে ওঁকে প্রণাম করলো। রেণুর মা বললেন, বাদল, আমার সঙ্গে একটু এসো তো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে। (ক্রমশ)

পংকজকুমারের আত্মজীবনী প্রসঙ্গে

আপনাদের বিশিষ্ট পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায় বন্ধুবর শ্রীপংকজকুমার মল্লিক সম্প্রতি তাঁর আত্মজীবনী প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেছেন যেগুলি বাধ্য হয়ে আলোচনা করতে আমি যথেষ্ট বিব্রত বোধ করছি। কিন্তু উভয়ের বন্ধুমহলে কথাগুলি না জানা থাকলে এ বিষয়ে কখনও আলোচনা করার প্রয়োজনই হত না।

পংকজকুমার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। একই সঙ্গে আমাদের আত্মপ্রকাশ ও দীর্ঘকাল পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে কাজ করেছি বটে, কিন্তু তিনি আমাদের সকলকে ছাপিয়ে আপন শক্তিবলে যেমন ঐশ্বর্য ও খ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমন স্বকীয় প্রতিভায় শিল্পী-সমাজের রত্ন বলে গৃহীত হয়েছেন। আমরা তাঁকে বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম বলে গর্ব অনুভব করে এসেছি, আজও করি।

বর্তমান আলোচনায় কেন প্রবৃত্ত হলাম তার কারণ বলছি। সম্প্রতি পত্রান্তরে রবীন্দ্রনাথের 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' কবিতাটির সুরারোপ নিয়ে আমার নামটি জড়িত হয়ে কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হবার পর পংকজকুমার স্বয়ং আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে যে কথাগুলি লিখেছেন তারই সূত্র ধরে এই পত্রের অবতারণা। এই প্রসঙ্গে তথ্যগত কয়েকটি ভুল রয়েছে। এ ভুল হওয়াও হয়তো স্বাভাবিক। তার কারণ পুরাতন দীর্ঘকালের স্মৃতি অনেক সময় ভ্রমাত্মক হয়ে পড়ে।

আমি সংক্ষেপে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। তার আগে একটা প্রশ্ন থেকে যায়— কেন আজ দীর্ঘকাল পরে এ কথা উঠল ? এর কারণ জানতে হলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। প্রায় বছর সাত-আট পূর্বে একটি মাসিক পত্রে 'জাতিস্মরের' জীবনকথা প্রকাশিত হয় এবং জাতিস্মর ছদ্মনামে এই জীবনকথা পরে যখন পুস্তকাকারে বন্ধুবর গায়ক ও চিত্রপরিচালক হীরেন্দ্রকুমার বসু প্রকাশ করেন তখন তার এক জায়গায় তিনি লিখে দেন, 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটি মূলে সুরকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তারপর থেকেই বহুজনের মুখে মুখে কথাটি প্রচারিত হয়ে পড়ে। কয়েকজন আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আমি প্রকৃত ঘটনাটি বলি এবং অতি সংগত কারণেই কবিতাটির সুরারোপের ব্যাপারে আমার চেয়ে পংকজকুমারের ভূমিকাকেই বরাবর মুখ্য আসন দিয়ে এসেছি। মুখে মুখে দু-চারজনের কাছে প্রচারিত হবার পর এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার যে সংবাদপত্রের পাতায় কোন দিন উঠতে পারে এ আমার কল্পনাতীত ছিল। শুধু তাই নয়, হীরেন্দ্রকুমার তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গটার উল্লেখ করায়, বিশ্বাস করুন, আমিও অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। আজ আরও বেশী করছি।

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য প্রকাশ করলেই মনে হয় বিষয়টি পরিষ্কৃত হবে। পংকজকুমারকেও কোন অপবাদের অংশীদার হতে হবে না।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর কিংবা তার বছরখানেক পূর্বের কথা।

১২নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনে সুবিখ্যাত আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের একটি ঘরে আমরা কয়েকটি বন্ধু 'চিত্রা-সংসদ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তুলি। সেখানে আমাদের সাহিত্য-চর্চা, নাট্য-চর্চা, গানবাজনা-চর্চা সবই হত। ওখানকার একটি লম্বা হলে আমরা নিজেরাই গান গাইতাম, সাহিত্য-চর্চা করতাম অথবা বিনা মেক-আপে একটি তক্তাপোশে উঠে অভিনয় করতাম। নিজেদের দলের লোকেরাই দর্শক বা শ্রোতা হয়ে উপস্থিত থাকতেন।

একটি অর্গ্যান ছিল ঘরে। প্রায় সন্ধ্যেবেলা সেই অর্গ্যানটি বাজিয়ে আপন মনে যা-তা সুর লাগিয়ে আমি গান গাইতাম। পংকজকুমারও আমাদের সদস্য ছিলেন— তিনি এলে আর কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা আমাকে ছেড়ে পংকজকুমারকে বলতেন, 'ভাই, বীরেনের হাত থেকে বাঁচাও। ও আপন মনে বেতালা, যা-তা সুর দিয়ে গান গাইছে; এইবার তুমি মাতিয়ে তোল।' পংকজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনিয়ে সকলকে বিমুগ্ধ করে দিতেন।

একদিন সংসদে কয়েকটি বন্ধু বৈকালে বসে আছি। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা, বাণীকুমার, চিত্রপরিচালক ও সাংবাদিক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত) ও স্বর্গীয় সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। হঠাৎ এমনি আড্ডা দিতে দিতে বন্ধুরা বলে উঠলেন, 'বীরেন, শুধু কথা আর ভাল লাগছে না, একটা গান-টান ধর।' তাঁরা গান-টান কেউ জানতেন না; আমি তবু কিছু জানতাম। তাই মধু অভাবে গুড়ের মর্যাদা যেমন বাড়ে, তেমনি পংকজকুমার না এলে গায়ক হিসেবে তাঁদের কাছে আমার খাতির ছিল।

কিন্তু আমার পুঁজি ছিল অল্প। রবীন্দ্রনাথের, রজনীকান্তের কয়েকটি গান গায়কদের মুখ থেকে শুনে শুনে শিখে ছিলাম। অনেক সময় পুরো সুরটাও সব গানের সঙ্গে মিলত না, নিজে বানিয়ে সুর করে গেয়ে দিতাম। বেতালা তো হতই— তাতে কি। আমি তো আর জলসায় গাইছি না বা কোন সভায় গায়ক হয়ে যাচ্ছি না। আপন খেয়ালে গান গাই; আমার মনে যে সুর ওঠে তাই লাগাই; ও'রা শোনেন।

সেদিন ওঁরা আমায় গান গাইতে বলায় আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম। কারণ, আমার পুঁজি অল্প; আর, কাঁহাতক এক গান শোনানো যায়। একটা নতুন গান গাওয়া যাক বলে ভাবলাম। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ বা রজনীকান্তের কোন গানের বই ওখানে ছিল না।

হঠাৎ দেখলাম একটা টেবিলে পড়ে থাকা সেকালের ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য-পুস্তকের সংকলনে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' কবিতাটি রয়েছে। আমার কবিতাটি পড়ে খুব ভাল লেগে গেল এবং আমার যা স্বভাব নিজের খেয়ালখুশিমত সুর লাগালো—তাই লাগালাম। ওঁরা সবাই বসে।

সুরটা লাগিয়ে গান গাইতে ওঁরা খুব তারিফ করলেন।

তারপর একদিন বেতারের স্টুডিওতে বসে সুরকার ও গায়ক অনিলকুমার বাগচি, হীরেন্দ্রকুমার বসু, বেতারের ভূতপূর্ব ঘোষক বন্ধুবর অনিলকুমার দাসের সামনে ঐ গানটি গাইলাম। পঙ্কজও কিছু পরে এসে পড়লেন ও সুরটি শুনে তাঁর ভাল লাগল। তিনি নিজে অর্গানে বসে তৎক্ষণাৎ ঐটি গলায় তুলে নিয়ে গাইলেন। ওঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে সুরটি নব রূপ পেলে।

তারপর কয়েক বৎসর কেটে গেছে। ব্যাপারটি শেষই হয়ে গিয়েছিল। পরে 'মুক্তি' ছায়াচিত্রে পঙ্কজকুমার এই গানটি গাইলেন। বন্ধুরা বললেন 'আরে, পঙ্কজ যে তোর সুর দেওয়া গানটা গেয়েছে রে।' আমি বললাম, 'ভালই করেছে। পঙ্কজ যে আমার দেওয়া সুরকে মর্যাদা দিয়েছে এতেই আমি খুশী।'

এ নিয়ে কখনও উচ্চবাচ্যও করি নি; এমন কি, পঙ্কজকেও বলিনি। 'মুক্তি'র পর গ্রামোফোন রেকর্ডে গানটি বিশেষ আদৃত হল। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পঙ্কজ অনুমতি নিয়ে গানটি গেয়েছে শুনেছিলাম। তাতেও আমার কিছু মনে হয় নি, আজও হয় না।

যদি বলেন, এত দিন পরে তবে এই কথা বলছেন কেন? তার কারণ নিশ্চয়ই কোন দাবি জানাবার উদ্দেশ্য নয়। সুরের স্বত্ব তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সুরটি সুরকার স্বরলিপি করে প্রকাশ করেন বা স্বয়ং গান গেয়ে পূর্বে রেকর্ড রাখেন ইত্যাদি। তাও যদি রাখতাম বা হলেও পঙ্কজকুমার গাইলে আমি সে দাবীদার হতাম না বা আজও হই না। প্রথমতঃ, জীবনে আমি কোথাও গায়ক বা সুরকার হিসেবে প্রচারিত হই নি, কারণ আমি সত্যিই এর কোনটাই নই। সুর দেওয়া আমার একটা খেয়াল মাত্র। বেতারে বসে বসে কত রকম সুরই করেছি, তা সবই হারিয়ে গেছে। একসময়ে পিয়ানোও বাজাতাম বেতারে। কিন্তু কয়েকটি গৎ মাত্র জানা ছিল। সে বাজনা লোকে দু'চারবার শুনে আমায় রেহাই দিয়েছিল; কিন্তু এ যুগে ঐ কটি গৎ বারবার বাজালে লোকে তাড়াত—এটা বিশ্বাস করি।

এখন কথা উঠতে পারে, পঙ্কজকুমার কি তা হলে ঐ বিষয়টির উল্লেখ করেন নি ইচ্ছা করে? আমি মনে করি, মোটেই নয়। প্রথমতঃ, এ নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে কখনও আলোচনাও হয়নি। আমি সুরকার হলেও বা কথা ছিল, তাঁর আমার কথা হয়তো বা মনে পড়ত। তা নয় বলে হয়তো বিস্মৃত হয়ে গেছেন। এরকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বরাবর তিনিই সুরটি গেয়ে এসেছেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নইলে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' বহু পূর্বেই স্টুডিওর চত্বরে সমাধিস্থ হয়ে যেত। একটা খেয়ালী লোকের খেয়ালের বশে সুর দেওয়া জিনিসকে তিনি বিশেষ করে তুলেছেন কণ্ঠস্বরের সাহায্যে। সুরটা এখানে বড় কথা নয়—সুরের ব্যঞ্জনা, গায়কী ঢংটাই বড় কথা—সে হিসেবে পঙ্কজকুমারকে এর প্রাণময় পুরুষ বললে ভুল করা হয় না।

এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে কোন অপ্রীতির সঞ্চার হোক, এ আমি চাই না। আমি বিশ্বাস করি, পঙ্কজ মূল সুরটির উৎসটি প্রকৃতই হয়তো ভুলে গিয়েছেন—আজ যদি তিনি স্বয়ং এর প্রতিবাদ করেন এবং জনসাধারণ আমাকেই মিথ্যাভাষণের জন্য অপরাধী করেন তাও আমি মেনে নেব। তবু লোকের কাছে সঙ্গীতজ্ঞানহীন হিসেবে চিরকাল থেকে সহসা প্রতিভাবান সুরকার বলে নিজেকে প্রচারিত করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। পঙ্কজকুমারকে সত্যই বড় গায়ক ও সুরকার বলে স্বীকার করে এসেছি। চিরকাল করবোও।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
কলকাতা-৪

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

দেশ পত্রিকার গত ১৯শে জানুয়ারীর (১৩শ) সংখ্যায় বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে আমরাও হতাশা অনুভব করছি—হতাশা অবশ্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নয়। সমরজিৎবাবু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে কথা বলতে চেয়েছেন তা নতুন কথা নয়। গত বছর চণ্ডীগড়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তীর উৎসব-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে অনেকেই একই ধরনের কথা বলেছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রশস্ত শামিয়ানার নীচে সমবেত বিজ্ঞানীদের বিরাট সংখ্যার বিষয়ে মন্তব্য করে ভাবা পরমাণু সংস্থার অধ্যক্ষ ডঃ রমান্না একে আখ্যাত করেছিলেন Annual Chimney-sweep Conference বলে (Illustrated Weekly of India-তে তাঁর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। চণ্ডীগড়েই কথা উঠেছিল, বিজ্ঞান কংগ্রেসকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাশ্রয়ী আলোচনা-সভায় টুকরো টুকরো করে বছরের বিভিন্ন সময়ে ছড়িয়ে দেবার সপক্ষে।

বস্তুত আমাদের ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন প্রায় সম্পূর্ণভাবে "ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স"-এর অনুকরণে গড়া। ইংলণ্ডে বিজ্ঞানের বিভিন্ন "ডিসিপ্লিনের" ওপর "স্পেশালাইজড" সংস্থার অভাব নেই। তাদের বিভিন্ন অধিবেশনও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তবুও ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনকে অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করা হয়নি। আমাদের দেশ থেকেও দু-একজন বিজ্ঞানী বছরে বছরে ঐ অধিবেশনে যোগদান করতে যান। Exeter, Brighton প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর জায়গায় অধিবেশনের সীমানার মধ্যে ঘোরাফেরা করে তাঁরা অনুপ্রেরণা নিয়ে আসেন। কোন কিছুর অনুকরণ ভাল কি মন্দ সে প্রসঙ্গে না গিয়েও এটুকু বলা যায় যে, সমরজিৎবাবু যে সব বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁরাই ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ করে দিতে কখনও রাজী হবেন না, যেমন ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনকে অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করতে রাজী হবেন না ও দেশের বিজ্ঞানীরা।

সমরজিৎবাবু বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রবীণ "স্যার"দের যে ধরনের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন তার বেশির ভাগই সত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন অধ্যাপকদের মধ্যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদাধিকার ইত্যাদি নিয়ে সূক্ষ্ম একটি পলিটিকসও কাজ করে চলেছে, সে উল্লেখও তিনি করতে পারতেন। কিন্তু বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিজ্ঞান-অংশটুকুর বিষয়ে তিনি যে হতাশার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা বোধ হয় সবটুকু সত্য নয়। বিভাগীয় আলোচনা প্রায়ই উঁচু দরের হয় না। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানী প্রভৃতি 'ডিসিপ্লিন' এখন বহুধা-বিভক্ত বিশিষ্ট 'স্পেশালাইজড' বিষয়সমূহের সমাহার মাত্র। অস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এরকম জেনারেল, ফিজিক্স প্রভৃতি সাধারণ নামের ছত্রতলে বিভাগীয় আলোচনা উঁচু দরের হওয়া সম্ভব নয়। আমি ফিজিক্সের ব্যাপারটাই জানি। আমি দেখছি যে, প্রেসিডেণ্ট যে বিষয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন প্রায়শই সে বিষয়েই বেশী পেপার থাকে, আলোচনাও ন্যায্যভাবেই সে বিষয়েই বেশী ব্যবস্থা করা হয়। এ বছরে ডঃ লক্ষ্মণ কোঠারি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ফলে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় যে ধরনের

গবেষণায় উৎসাহী সেই সব বিষয়ের ওপর আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে ও সেই সব বিষয়ের পেপারই বেশী। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের একটি মাত্র পেপার 'বিবিধ' বিভাগে স্থান পেয়েছে। সভায় একজনও প্রকৃত নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষক উপস্থিত নেই। তা হলে chimney sweep conference একে কেন বলবো? এও তো স্পেশালাইজ্‌ড্‌ আলোচনাচক্রই! প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, এই বিভাগে বসু সংখ্যায়নের ওপর একটি আলোচনার ব্যবস্থা ছিল (Recent Advances in Statistical Physics); সেটি উঁচুদরের মনোজ্ঞ সভায় পরিণত হয় ডঃ ডি এস কোঠারির বক্তৃতায় ও অন্যান্য গবেষকদের পেপারে। এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে, গবেষকরা তাঁদের উঁচু মানের গবেষণাফল নিয়ে সায়েন্স কংগ্রেসে হাজির হন না। কারণ খুব সোজা। সায়েন্স কংগ্রেসের পেপার একটা Publication হিসেবে স্বীকৃত হয় না, আলোচনার পূর্ণ Proceedings ছাপা হয় না বলে। Proceedings ছাপা হয় না বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক Abstract-এ পেপারের উল্লেখ থাকে না। DAE-র Symposiumগুলির মত পূর্ণাঙ্গ Proceedings বার করা গেলে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পেপারের মান নিশ্চয়ই উন্নততর করা যেত।

সমরজিৎবাবু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনায় এই অভিমত সংগ্রহ করেছেন যে, জাতীয় স্বার্থে, যথেষ্ট আড়ম্বরে ভরা এই অধিবেশন কোন কাজে লাগে না। মনে হয় সমরজিৎবাবুর উচিত ছিল বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক-সঙ্গ না করে নাগপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কিছু-সংখ্যকের সঙ্গে আলোচনা করা যে, তারা বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে সামান্য প্রেরণাও পেয়েছে কিনা। বিজ্ঞান কংগ্রেসের আরও একটি সার্থকতা থাকে। এই অধিবেশনকে উপলক্ষ্য করে ভারতে তৈরী যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী বসে এবং সেই প্রদর্শনীতে ঘুরে ব্যবহারিক বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট উপকৃত হন। এবারের এই প্রদর্শনী অবশ্য খুবই দরিদ্র ছিল। কিন্তু যিনি নাগপুর বিজ্ঞান কংগ্রেস সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখতে বসে জনপ্রিয় বক্তৃতার ওপর এত জোর দিয়েছেন, তিনি কেন জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রদর্শনীগুলির কথা উল্লেখ করবেন না? নাগপুরে 'রমন হল', ন্যাশনাল কয়লা অথরিটির কয়লাখনি সংক্রান্ত প্রদর্শনী বা ম্যাঙ্গানিজ খনি সংক্রান্ত প্রদর্শনী প্রভৃতি কি প্রচুর পরিমাণে জন-কৌতূহল জাগিয়েছিল তা কি তিনি দেখেন নি?

পরিশেষে, গভর্নমেন্ট লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করছে বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলাম। যে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কমিটিকে আমন্ত্রণ জানায় সেখানে একটি লোক্যাল কমিটি গড়া হয়। এই স্থানীয় কমিটি নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা পায়, তা ছাড়া তারা কমিটি মেম্বারদের কাছ থেকে মোটা চাঁদা তোলে, প্রদর্শনীর স্টল ভাড়া থেকে প্রচুর টাকা আসে, স্মারক-গ্রন্থ (Souvenir) বিজ্ঞাপনদাতারা চাঁদা যোগায় এবং রেজিস্ট্রেশন ফী বাবদ বিজ্ঞানীদের কাছ থেকেই ৪০-৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় (এবারে হয়তো কম হয়েছে)। সদস্যদের দেয় বার্ষিক চাঁদা বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রকাশনার কাজে লাগে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের ব্যাপারে উপর্যুক্ত গোষ্ঠী কেউ যদি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন তবে অর্থাভাবে অধিবেশন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যাবে। প্রকৃত কথা হচ্ছে যে, এঁরা কিন্তু সকলেই প্রতিটি অধিবেশনেই কিছু না কিছু উৎসাহ পান বলেই পরবর্তী অধিবেশনের জন্যে এগিয়ে আসেন। বিজ্ঞানীরাও।

(ডঃ) বিমলেন্দু মিত্র
রীডার, বসু বিজ্ঞান মন্দির
কলিকাতা-৯

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

গত ২৮ পৌষ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "দেশ" (৪১ বর্ষ, সংখ্যা ১১)-এ বারিদবরণ ঘোষের লিখিত "ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানী" শীর্ষক প্রবন্ধটির সাধারণভাবে ইন্দিরা দেবীর জীবনের নানান দিক নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুখপাঠ্য হয়েছে। তবে প্রবন্ধটির কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়ে গিয়েছে।

শান্তিনিকেতন তথা রবীন্দ্র সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচকদের কাছে "বিবিদি" নামের আড়ালে ইন্দিরা দেবী নামটি কিছুটা হারিয়ে গিয়েছে। হয়তো এই নামে ডাকার মধ্য-দিয়ে ইন্দিরা দেবী তাঁর শৈশব যৌবনের অমূল্য দিনগুলিতে ফিরে যেতেন। রোমন্থন করতে ভালবাসতেন তাঁর সঙ্গে "রবিকার" দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ইতিহাসকে। কিন্তু এই "বিবি" নামের উৎপত্তি তাঁর বাবা বা কাকার নামকরণের মধ্য দিয়ে হয়নি। বারিদবাবু তাঁর প্রবন্ধে এটি নিয়ে আলোচনায় বিরত থেকেছেন। কিভাবে "বিবি" নাম তাঁর হলো তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ "আমার শিশুকাল কেটেছে বাবার কর্মস্থল দাক্ষিণাত্যের কারোয়ারে। সেখানকার দাস-দাসী আমায় 'বিবি' নাম দেয়। তারপর সবাই তা গ্রহণ করে। কেবল রবিকাকা আমাকে মাঝে মাঝে ডাকতেন 'বব্' বলে।"

"বাল্মিকী প্রতিভা"র একটি অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে বারিদবাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঘরোয়া" বই থেকে সে অভিনয়ের বিবরণ তুলে দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় "বিবি"র অভিনয়ের সুখ্যাতি করেছেন। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'গানের স্মৃতিতে' ওই অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনা করে লিখেছেন, "তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) অভিনয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী যে কত মেয়েকে সাজতে হয়েছিল। প্রতিভা দেবী একদিন সাজলেন সরস্বতী। তাঁকে আখ্যা দেওয়া হল সরস্বতী সাহেব। আমি একদিন সাজলুম লক্ষ্মী। একটা গান গাইলুম। তাতে সমালোচনা হল—ওরকম গেয়ো না। মনে হচ্ছে যে, পেট কামড়াচ্ছে।"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার বাড়িতে শুধু "মায়ার খেলা"র অভিনয়ই হয়নি। বস্তুত বির্জিতলার বাড়ি ইন্দিরা দেবীর স্মৃতির মণিকোঠায় স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছে, যদিও বারিদবাবু এদিকটাতে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ইন্দিরা দেবী নিজেই বলেছেন, "বাড়িটি জীর্ণ হলেও তার সঙ্গে আমাদের সেকালের অনেক সুখস্মৃতি জড়িত। তারই একতলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে প্রথম 'রাজা ও রাণী'র অভিনয় হয়। তার পাত্রপাত্রী ছিল এই রকমঃ

বিক্রম—রবিকাকা

সুমিত্রা—মা (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী)

দেবদত্ত—বাবা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নারায়ণী—কাকিমা (মৃণালিনী দেবী)"।

আরেক স্থানে ইন্দিরা দেবী এই বির্জিতলার বাড়ি সম্বন্ধে লিখেছেন, "বাড়ির মনে হয় জন্মজন্মান্তরও আছে। আমাদের সেই নড়বড়ে তিনকালগত পুরনো বির্জিতলার বাড়ির ইঁটকাঠ কিছুই আর এখন অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সেই ভিত্তির উপর আপাতত মহামহিমান্বিত ক্যালকাটা ক্লাব বিরাজ করছে, যতদূর জানি।" আরও বিস্তারিতভাবে ওই বাড়ির বর্ণনা দিয়ে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, "বির্জিতলাওয়ের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমরা সেই সুখ শান্তি-পূর্ণ গৃহস্থালী পেতে বসেছিলুম। সামনের বড় গির্জার তলায় একটা পুকুর ছিল, তার নাম বির্জিতলাও—তাই থেকে বাড়ির ওই নাম চলতি হয়েছিল। পুকুরটা এখনো আছে, নামটা আছে কিনা জানিনে। কিন্তু অমন যে আকাশচুম্বী গির্জার চূড়া, সেটার ক'য় বৎসর হল (ভূমিকম্পে?) স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন, আবার নব কলেবর ধারণও হয়েছে। বাড়িটা ছিল আসামের বিজনী এস্টেটের হাতে এবং অবস্থা কাহিল তা আগেই বলেছি। কিন্তু তাতেই আমরা বেশ সুখে ছিলুম। সময়টা বোধহয় ১৮৮৮-৯০-র মধ্যে—ঠিক মনে নেই। সুরেনের ও আমার আই এ, বি এ, পরীক্ষার মাঝামাঝি কাল হবে। আমাদের নগণ্য পড়াশুনোর আর কি বর্ণনা করবো। যে ঘরে বসে পড়তুম তার লাগাও একটা বস্তি ছিল, তাতে খুব

তারস্বরে মেয়েলী ঝগড়াঝাঁটি হত, আবার আজকের ঝগড়াটা ধামা-চাপা দিয়ে রেখে কাল সেখান থেকেই ক্রমশ প্রকাশ্যভাবে চলতে থাকত মনে আছে। কিন্তু এত চেঁচামেচিতেও আমাদের পড়াশুনোর বিশেষ ব্যাঘাত হত বলে ত মনে পড়ে না। একজন মাস্টার আসতেন যাঁর বয়স বা মুদ্রাদোষবশত অনবরত ঘাড় কাঁপত, যেমন কাগজের তৈরি বুড়োমানুষ পুতুলের হয়। তিনি বলবেনই যে tiny শব্দের উচ্চারণ teeny, যদিও আমরা তাতে ঘোরতর আপত্তি-প্রকাশ করতুম। মাস্টার ছাড়াবার দরকার হলেই জ্যোৎস্নাদার ডাক পড়ত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গিয়ে অবলীলাক্রমে বলে দিতেন—কাল থেকে আর আপনাকে আসতে হবে না। আমাদের চক্ষুলজ্জাও রক্ষা হত। স্বনামধন্য পারিবারিক বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী আমাদের ভাইবোনকে শখ করে শেক্সপীয়র পড়াতেন। 'ওথেলো' পড়াতে গিয়ে নিজেই চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিতেন ত আর পড়াবেন কি। গানের সঙ্গে যে কোন বড় বই হাতের কাছে পেতেন তাই টেনে নিয়ে তার উপর টোকা মেরে তবলার ঠেকা দিতেন—দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, চোখ বুজে। সবই করতেন, কেবল নিজের পেশা আর্টর্নিগিরি যে কখন করতেন তা এখন পর্যন্ত বুঝতে পারিনে।" এই বাড়িতেই নাটক অভিনয়ের উল্লেখ করে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : "নাটকের কথা যদি উঠলই ত এই বাড়িতে কত যে নাটক অভিনয় হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। কখন যে আমরা পড়াশুনো করতুম তা কে জানে। কারণ প্রতি নাটকের পিছনে যে কতদিন ধরে মহড়াহাঙ্গাম চলে তা ত জানতে কারো বাকি নেই। রূপসজ্জা, অভিনয় সব আপনার লোকের দ্বারাই করা হত। 'রাজা-রাণী' প্রথম যেবার হল, মনে আছে তার পরদিনই 'বঙ্গবাসী' কাগজে 'ঠাকুর বাড়ির নতুনঠাট' নামে এক লেখা বেরল। তাতে প্রত্যেক ভূমিকায় অবতীর্ণ পাত্রের নাম পাশে পাশে দেওয়া আছে। তার অর্থ এই যে কোন কোন নিষিদ্ধ সম্পর্কে স্বামীস্ত্রী সেজেছিলেন, সেইটে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া—যথা ভাসুর ভ্রাতৃবধূ। স্বীকার করি যে সেটা আমাদের সমাজে একটু দৃষ্টিকটু লাগতে পারে—বিশেষত সেকালে—কিন্তু বাবা ওঁদের ত অত হ্যাতক্যাত ছিল না।"

প্রসঙ্গত আরো কিছু কথা এর সঙ্গে এসে পড়ে, যেগুলি বারিদবাবুর লেখায় অনুল্লেখিত থেকে গিয়েছে। যেমন, 'কাল মৃগয়া'র মতো সুন্দর নাটকটিকে অনেকদিনের অবহেলিত, অনাদৃত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আবার নাট্যমঞ্চে প্রচলিত করেছিলেন এই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তিনিই "ভানুসিংহের পদাবলী"র গানগুলিকে একত্রে একটি নাটকরূপে গ্রথিত করে পুনঃপ্রকাশ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন 'আমার মনে হয় তিনি (রবীন্দ্রনাথ) না থাকলেও তাঁর গান ও নৃত্যকে নিয়ে আরও কালচার করা উচিত—এটা শিল্পরসিকদের একটা গুরুদায়িত্ব। তাঁর গানের কথাগুলোর ভাব অতি শক্ত। তাঁর গানে দুই-ই—কথা ও সুর প্রধান। দুটো নিয়ে একটা তৃতীয় রসের সৃষ্টি হলো। বড়ো ছোট এর মধ্যে নেই। তাঁর গানের মতো এরকম শুভ সম্মেলন খুব কমই ছিল। অবশ্য সুর কি কথা কোনটি তৈরি করতেন বলা শক্ত। সে গীতরস একটি অপূর্ব সৃষ্টি। একটি তৃতীয় জিনিস।" সাধারণভাবে গান সম্বন্ধে বলেছেন "তানের দিকে পরীক্ষা করবার দিন এসেছে আজ। খুব সাধারণ নিয়ম আমার মনে হয়—এটা শুরু করা উচিত কথাকে অবলম্বন করে। তাতে একটু বৈচিত্র্য হয়। দুনটা একটা জিনিস যা প্রচলন করা যেতে পারে। তবে দেখতে হবে সেটা যেন মেলডিকে খর্ব করে গানকে ভারাক্রান্ত না করে। 'তোমার হল শুরু' ইত্যাদি গানে হার্মনি দিলে খুব ভাল হয়।" মেয়েদের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন "কেউ যদি সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য অনুসন্ধান করে মেয়েদের সম্বন্ধে কোথায় কি তিনি লিখেছেন তা একত্র করে প্রকাশ করতে পারেন—তবে মস্ত একটা কাজ হয়।" এদিক দিয়ে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী বীরবল-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্যই করেননি, বোধ হয় তাঁর মতো নারীর পক্ষেই এ জিনিস সম্ভব।

একটা কথা আজও কেউ চিন্তা করে উঠতে পারলেন না কেন সেটাই আশ্চর্য লাগছে। বারিদবাবুও এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি। আমরা ইন্দিরা দেবী চৌরাণীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি ওই ইন্দিরা দেবীর কর্মতৎপরতার ফলেই বস্তুত পেয়েছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ইন্দিরা দেবীর চিঠিগুলি থেকে আমরা কেন বঞ্চিত হব? বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী সকলেরই এদিকে নজর দেওয়া দরকার। এ চিঠিগুলিও যে রবীন্দ্র সাহিত্যেরই একটি অঙ্গ।

তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য
কলকাতা-২৯

একতারা ঝরনার পথে পাখি

'একতারা ঝরনার পথে পাখি'র মত সুখপাঠ্য রচনা অথবা 'পাখি দেখার নেশায়' শীর্ষক কিছুটা তাত্ত্বিক রচনা পড়ে মনে হয়, যেন আমরা পক্ষিরাজ্যে বাস করছি। ওরাই যেন প্রকৃতির সৃষ্ট জীবের মধ্যে সুন্দরতম। আমরা গ্রাম-বাংলায় নানা ধরনের পাখি দেখতে পাই। তাদের অধিকাংশেরই 'নাম জানিনে', হয়তো, 'সুর জানি'। অথবা বলা যায়, অল্প কিছুর দেশীয় নাম জানি। যদিও ঐ দেশীয় নামগুলি সুধাবর্ষী, জানি না পক্ষিবিজ্ঞানের কোন সাধারণ নামের সঙ্গে ওদের সঙ্গতি আছে। যেমন, আমাদের মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে এক ধরনের উজ্জ্বল হলুদ বরণের ছোট পাখি দেখা যায়। বসন্তের প্রাক্কালে তাদের ডাক শুনতে পাই। ওদের আমরা 'হরেকৃষ্ণ' পাখি বলে উল্লেখ করি। কারণ, ঐ পাখির সুরেলা ডাক শুনলে মনে হয়, যেন 'হরেকৃষ্ণ' নাম করছে। ঐ পাখির উজ্জ্বল হলুদ রং, উচ্চ সুরেলা গলায় মিষ্ট সুখস্রাবী হরেকৃষ্ণ নাম এবং ক্ষুদ্র আকার খুবই আকর্ষণীয়। আর এক ধরনের পাখি একসঙ্গে প্রায় গোটা সাতেক মিলে-মিশে থাকে, গায়ের রং ছাই, বৃষ্টি-বাদলে ভিজতে ভিজতে মাটিতে চরে বেড়ায়, চেঁচামেচি করে। একসঙ্গে প্রায় সাতটি মিলেমিশে থাকে বলে আমরা বলি 'সাত-ভায়া'। ওদের কি ছাতার বলে? জানি না। আর এক ধরনের পাখি— শ্রবণতৃপ্তিকর 'ফিঙে' যার নাম—পৌষের ফসল কাটা মাঠে যে শিস দিয়ে ফিরে—কখনো পাখার সঞ্চালনে বাতাসের প্রতিকূলে অনুচ্চ গতিতে উড়ে যায়, তারপর শুধুমাত্র পাখা মেলে বসন্তের প্রথম দখিনা বাতাসে ভর করে ঘুড়ির মত নিশ্চিন্তভাবে কিছুক্ষণ ভেসে থাকে, তারপর শূন্যে পাখা গুটিয়ে এক অনুপম নৃত্যের ভঙ্গীতে নীচে নেমে আসে—যেন পাহাড়ী চড়াই উৎরাই ভাঙ্গার ভঙ্গি—তার দেশীয় প্রিয় নাম 'কাজলপাতি'। কারণ, ঘনকৃষ্ণ রং আর লেজ-ঝোলা দৈহিক গঠন চোখে কাজল পাড়া কাজলপাতার মতই। আর এক ধরনের ক্ষুদ্রাকার পাখি—গায়ের রং অনুজ্জ্বল সবুজ, ডানার নীচের রং হালকা খয়েরী, স্বল্প দীর্ঘ লেজ কিন্তু লেজের অপেক্ষাকৃত চওড়া অংশের নীচে একটি সরু অংশ সূচের মত বেরিয়ে থাকে—যার ডাক শুনতে 'টিটির টিটির'—ওড়ার ভঙ্গী ফিঙের মত অনুপম, নাম কি? জানি না। এ ছাড়া দেখছি খালে বিলে জলায় নানা ধরনের জলচর পাখি। দেখছি অর্ধমগ্ন জাহাজের মত এক ধরনের কালো পাখি—জলে ডুবুরির মত ডুব দিয়ে কিছু দূরে হঠাৎ ভেসে উঠে, মাঝে মাঝে জল থেকে বরাবর শূন্যে উড়ে যায়, উড়ে যাওয়ার সময় পাগুলো ঝুলে থাকে পা-ভাঙা খোঁড়া কুকুরের মত, আর গলার ভঙ্গী যেন গাড়ি টানা মহিষের মত নত ও প্রসারিত। নাম কি? জানি না। এই সমস্ত দেশীয় পাখির লৌকিক অথবা বিজ্ঞানসম্মত সাধারণ নাম কি, উৎসাহী অনুসন্ধানী দল আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের অবগত করাতে থাকুন, 'মুদিয়া নয়ান শুনি, সেই গান আমরা খাঁচার পাখি'।

শৈলেন্দ্রনাথ মাইতি
কাঁথি

বাংলাদেশের গদ্য

হাসান আজিজুল হকের নতুন গল্প গ্রন্থ "জীবন ঘষে আগুন" বইটি পড়লাম কয়েকদিন আগে। শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না এমন বই। বইটি সম্পর্কে কিছু লেখার ইচ্ছেতে নিয়ে এসেছিলাম আমাদের দপ্তরে। টেবিলের ওপর বইখানা রেখে একটু বাইরে গেছি, ফিরে এসে দেখি বইটি আর নেই। বইটি আর ফিরে এলো না। বইয়ের ডানা নেই, কেন তারা উধাও হয়, সবাই জানেন। আমার দপ্তর থেকে বইপত্র সচরাচর উধাও হয় না, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বইটি বেপাত্তা হওয়ায় বোঝা যায়, অপহরণকারীর বিশেষ আগ্রহ ছিল ওই বই কিংবা লেখক সম্পর্কে। অন্য কিছু সে নেয়নি।

(ভাই চোর, পড়া হয়ে গেলে বইটি আবার অজান্তে আমার টেবিলে রেখে যেও।)

হাসান আজিজুল হক এ বঙ্গের উৎসাহী পাঠকদের কাছে বিশেষ পরিচিত। পূর্ব আমলে, তাঁর "আত্মজা ও একটি করবী গাছ" এখানে অনেকেই পাঠ করেছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর কিছু কিছু রচনা পুনর্মুদ্রিতও হয়েছে এখানে।

তাঁর "জীবন ঘষে আগুন" একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। গোটা বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিককালে যদি তিন চারজন ছোট গল্প লেখকের উল্লেখ করতে হয়, তাহলে এই লেখকের স্থান তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী।

এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তিনটি গল্প। গল্পগুলি সাধারণ ছোট গল্পের চেয়ে আয়তনে বড়, আবার উপন্যাসিকাও বলা যায় না। এর লেখা পড়লেই বোঝা যায় কত যত্ন ও সাবধানে ইনি ভাষা ব্যবহার করেন। সাহিত্য যে ভাষারই শিল্প, শুধুমাত্র বক্তব্যের নয়, তা ইনি কখনো বিস্মৃত হতে দেন না।

প্রথম গল্পটির সঙ্গে বাকি দুটি গল্পের কোনো বিষয়গত মিল নেই। প্রথম গল্পটি একটি পরিবার কেন্দ্রিক। পূর্ব পাকিস্তানের আমলে ওদিককার মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের মধ্যে দেশত্যাগের একটি নিরন্তর প্রবাহ ছিল। ইনি এমন একটি পরিবারের কথা লিখেছেন, যারা পঁচিশ বছর ধরে শুধু ছেড়ে আসার কথা ভেবেছে—অচেনা ভারত-বর্ষের অদেখা নতুন বাসস্থানের স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু পুরোপুরি ভরসা পায়নি। ইতিমধ্যে তাদের বাড়িতে জন্মেছে আগাছা, ঘরের দেয়াল ও মূল্যবোধে ধরেছে ভাঙন, তবু যাওয়া হয়নি। গল্পটি বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক নয়, পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক, সেইদিক থেকে এর 'খাঁচা' নামকরণ খুবই সার্থক হয়েছে।

দ্বিতীয় গল্পটি শুরু হয়েছে এক গ্রামের মধ্যে দুটি ষাঁড়ের লড়াই দিয়ে, তৃতীয় গল্পটির শুরুতে এক বিগত-গৌরব মেলার দিকে আগুয়ান হাতি। এই পশুদের কেন্দ্র করে মানুষ। এই দুটি গল্পতেই কোনো ব্যক্তি বা পরিবার প্রাধান্য পায়নি—তিনি দেশের বা সমাজের এক একটি খণ্ডকে তুলে ধরেছেন এবং অত্যন্ত তীব্র আলো ফেলেছেন শোষণ ও শাসনের বীভৎস ছবিতে। এখানে বোঝা যায়, হাসান আজিজুল হক কোনো নায়ক-নায়িকার মনোবেদনার কথা গ্রাহ্য করেন না—তিনি শোষিত ও অবহেলিত মানুষদের প্রত্যাঘাতের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া দেখতে চান। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ফোটাতে যে সার্থক হয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত, অনেকদিন পরে এমন একজন লেখকের লেখা পড়লাম, যার রচনার বক্তব্য অত্যন্ত সরল—কিন্তু রচনাটি তিনি সাহিত্যে উত্তীর্ণ করার শক্তি রাখেন।

তাঁর ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও গল্পের ভাষার পক্ষে ঠিক উপযোগী কিনা, সে সম্পর্কে অবশ্য আমার একটু সন্দেহ রয়ে গেল। যেখানে সংলাপ এসেছে, সেখানে তিনি অত্যন্ত যথাযথ এবং বাস্তববাদী, অবিকল বর্ণিত নারী-পুরুষের মুখের ভাষাই বসিয়েছেন। কিন্তু বর্ণনার অংশে একটু যেন কঠিন ভাষার দিকে তাঁর ঝোঁক—খুব লম্বা লম্বা বাক্য কিংবা পৃষ্ঠাব্যাপী অনুচ্ছেদ—চোখকে যেন খানিকটা বাধা দেয়। অনেক সময় কমলকুমার মজুমদারের কথা আকস্মিকভাবে মনে পড়ে। কিন্তু দুজনের বিষয়বস্তু যে সম্পূর্ণ আলাদা।

আশা করি উৎসাহী পাঠকরা এই গল্প গ্রন্থটি সংগ্রহ করে পড়বেন।

গল্প বিচিত্রা

ইদানীং অনেকেই বাংলা ছোট গল্প সম্পর্কে চিন্তিত। বাংলা ভাষায় যত উন্নতমানের ছোট গল্প রচিত হয়েছে—সেই তুলনায় উপন্যাস বা নাটক যে এখনো যথেষ্ট দুর্বল, এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। তবুও পত্র-পত্রিকায় উপন্যাসের সমাদর দিন দিন বাড়ছে, ছোট গল্পের সঙ্গে ব্যবহার সতীন-পুত্রের মতন। বৃহদাকার পত্রিকাগুলিতে ছোট গল্পের উপযোগিতা শুধু উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে স্থান ভরাবার জন্য।

প্রকাশকরাও ছোট গল্পের সংগ্রহ প্রকাশ করতে তেমন উৎসাহী নন। গ্রন্থাগারগুলিতে ছোট গল্পের চাহিদা নাকি কম। এই অবহেলার ফলে ছোট গল্প রচনা সম্পর্কেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের উৎসাহ দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। লিটল ম্যাগাজিন ও তরুণ লেখকরা এখনো ছোট গল্পকে টিঁকিয়ে রেখেছেন বটে কিন্তু তাঁরাও সাহিত্যের এই শাখাটির প্রতি অনাদরে ক্ষুব্ধ।

লিটল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে কবিতা পত্রিকাই সংখ্যায় অবিশ্বাস্যভাবে বেশী—তাতে কবিতার কতটা উপকার হয়েছে, তা জানি না, তবে গল্প-পত্রিকার স্বল্পতা সত্যিই পীড়াদায়ক। তা সত্ত্বেও যে কয়েকটি ছোট গল্পের পত্রিকা এখনো বেরুচ্ছে, সেটাই আশার কথা।

সম্প্রতি একটি পত্রিকা শুধু ছোট গল্পের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। দুই বিখ্যাত গল্পকার—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত এই

পত্রিকাটির নাম 'গল্প বিচিত্রা'। এ পর্যন্ত এর তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলি পড়লেই বোঝা যায়, এ'রা কোনো গোষ্ঠী বা বিশেষ মতবাদের পক্ষপাতিত্ব করছেন না। দলমত নির্বিশেষে নানান লেখকের রচনা এতে স্থান পেয়েছে। মনে হয়, সম্পাদকদের উদ্দেশ্য একটিই, সার্থক ছোট গল্প।

এই পত্রিকার আর একটি অভিনবত্ব, প্রাচীন, বিস্মৃত প্রায় অথচ সার্থক ছোট গল্পের উদ্ধার। প্রতি সংখ্যায় এরকম একটি করে গল্প থাকছে। এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'নাগিনী।' এই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সমবয়েসী এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রথম দিকের অনুবাদক। এ ছাড়া, এককালে ইনি করাচী থেকে সম্পাদনা করতেন বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ফিনিক্স', পরে লাহোর থেকে ট্রিবিউন। এ ছাড়া বাংলাতে কয়েকটি উপন্যাস এবং প্রায় একশো ছোট গল্প।

সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

'দেশ' পত্রিকায় আপনার 'জাগরণের কাহিনী' পড়লাম। আমার 'গো-খাটুনির' জন্য যতটা সুনাম প্রাপ্য তার অনেক বেশী হয়ে গেছে।

আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত আপনার প্রশ্ন কয়টির উত্তর দিচ্ছি। প্রকৃত ঘটনার সংগে মিল না-ও থাকতে পারে, কারণ আমি সর্বজ্ঞ নই।

পণ্ডিচেরীতে টাকা পাঠাবার ব্যাপারে, প্রীতিলাল রায়ের নামটি পাওয়া যায়, আর কারো নামের বিশেষ উল্লেখ নেই। দেশবন্ধু কিছু পাঠাতেন; বলা হত অরবিন্দর রচনার বিনিময়ে। 'সাহায্য' হিসাবে তার পরিচয় নেই।

অরবিন্দর ফিরে আসা সহকর্মী প্রত্যেকেরই অভীপ্সিত ছিল। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ বিপ্লবী নেতৃত্ব হঠাৎ বিরাট আঘাত খেল। বারীনের দল গেলেন কারান্তরালে; পি মিত্রের হল লোকান্তর, পুলিনবাবুর নির্বাসন, ইত্যাদি। তথাপি সকলেই জানতো অরবিন্দ এলেই কারারুদ্ধ হবেন। কাজেই এসে নেতৃত্ব গ্রহণের কথা তখনকার রাজনীতিতে ওয়াকেফমহল চাইতেন না।

বারীনের সংগে নরেন গোঁসাইয়ের ব্যক্তিগত বিরোধের কথা কোথাও প্রকাশ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। বরং কোনো কোনো ব্যাপারে যেমন চন্দননগরে মেয়রের বাসায় বোমা ফেলাতে নরেনের নাম পাওয়া যায়। হয়ত নারায়ণগড়ে রেল-লাইনের নীচে বোমা পোতার কাজে নরেন ছিল। আমি সঠিক জানি না। দলের অর্থ অপচয় করার জন্য বারীনের কাছে কড়া কথা শুনতে হয়েছে। তবে বারীনের উদ্ধত ও কলহপ্রিয় স্বভাব অনেকেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন নিরালম্ব স্বামী। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো বেশ কড়া ভাষায় বারীন সম্বন্ধে লিখে গেছেন। নরেনকে হত্যার ব্যাপারে গোপনীয়তার মধ্যে বারীনকে গ্রহণ করা হয়নি। এ নিয়ে বারীন রাগারাগি করেছিলেন। যদি কোনো কারণে নরেনের বিদ্বেষ জন্মে থাকে তা হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে তার স্বীকারোক্তির পিছনে রামসদয় ভট্টাচার্যের বিশেষ হাত ছিল।

প্রীতিলতার আত্মহত্যার কারণ মনে হয়—যাঁদের সঙ্গে 'কাজ' করছিলেন তাঁরা গ্রেপ্তার অথবা নিহত হলেন। প্রীতির ওপর যে ভার ছিল সেটি শেষ হওয়ার তাঁর বেঁচে থাকার আর প্রয়োজন বোধ করলেন না; শীঘ্র ধরা পড়ার সম্ভাবনা; আর নতুন আশ্রয় পাওয়া বিষম কণ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। এ সকল ছাড়া যে অন্য কারণ থাকতে পারে না, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

অজস্র লোক জেল থেকে ফিরে বারে বারে কারারুদ্ধ হয়েছেন। এ ব্যাপারে নিরস্ত্র অপেক্ষা সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংখ্যা অনেক বেশী।

কালীচরণ ঘোষ, কলিকাতা-২৬।

॥ ২ ॥

বাংলা বইয়ের বাজার সম্পর্কে (সংখ্যা ১১) আলোচনাটি খুবই সময়ানুগ। বাংলা ভাষার পাঠক বেড়েছে অথচ প্রচার বা ব্যবসাকেন্দ্র বাড়েনি খুবই দুঃখের ব্যাপার। কলেজ স্ট্রীট-রাসবিহারী মোড়-শ্যামবাজার ছাড়া কেন ধর্মতলা-বালীগঞ্জ-লালদীঘি-গড়িয়াহাটের মোড় বা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্বাস্থ্যবান বুকক্লাব বা বুক সেণ্টার গড়ে উঠছে না? কেন অফিসপাড়ায়, সিনেমা-থিয়েটার হলগুলির পাশে বা অন্যত্র বইপত্র পাওয়া যায় না? যা পাওয়া যায় তা সিনেমা-সেক্স বা ফ্যাশন পত্রিকা।

সনাতন পাঠক মহাশয়, শুধু শহরে কেন, গ্রামের লোক কি পড়াশুনা করে না? গ্রামের ঘরে ঘরে আজকাল শিক্ষিতা পাঠিকাও (ডিগ্রী ছাড়া মেয়েদের কতজন বিয়ে করছেন?) বেড়ে গেছে। তাজা বইয়ের অভাবে তাদের প্রচুর বাজে বই ও পুরানো বই পড়তে হচ্ছে। আমার কাছে নিত্যনতুন বই পড়ার জন্য বহু পাঠক পাঠিকা ভিড় করেন। এদের দেখে মনে হয় গ্রামেও বুক ক্লাব বা বুক সেণ্টার খোলা উচিত। অথবা মাসের প্রথমে (৪০% জন চাকুরীজীবী) পণ্যদ্রব্যের প্রতিনিধিদের মত বুক ক্লাব বা সেণ্টারের বা প্রকাশকদের প্রতিনিধিদের গ্রামে পাঠালে মোটা টাকাই তুলে নিতে পারবেন। আমরা গ্রামের লোকেরাও নিত্য-নতুন বইপত্র পড়তে পারব। সনাতন পাঠক মহাশয়ের শুভ প্রস্তাব আশু কার্যকর হোক।

সত্যানন্দ গুহ, ২৪ পরগণা।

॥ ৩ ॥

ভারতের রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াবার সময় লক্ষ্য করেছি বাংলার বাইরের বাঙালীরা ক্রমশ বাংলা ভুলে যাচ্ছেন। প্রথম পুরুষেরা এজন্য লজ্জিত, যাঁদের দুপুরুষ হয়ে গেছে দুঃখিত—তৃতীয় পুরুষ ক্ষুব্ধ। অনেককে হিন্দী হরফে নজরুল রবীন্দ্রনাথ পড়তে দেখেছি। কারণ প্রত্যেকটি রাজ্যেই 'রাজ্য ভাষা' বাধ্যতামূলক বা শিক্ষার মাধ্যম রাজ্যের ভাষা (হায় বাংলা)। যারা অত্যন্ত আগ্রহী তারাও বাংলা বই সংগ্রহ করতে বিব্রত। সম্প্রতি বাংলা বই বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দিল্লি এবং বোম্বাইয়ে—কিছু ব্যবস্থা হয়েছে শুনেছি। কিন্তু বাঙালী অধ্যুষিত অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধে আমার ধারণা, কিছুই হয়নি। এ সম্বন্ধে দায়দায়িত্ব নিতে পারেন— (১) বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, (২) নিখিল ভারত বাঙ্গলা ভাষা সমিতি এবং বিশেষ করে বঙ্গীয় প্রকাশক সংস্থা। ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রচারে পুনর্মুদ্রণে, সুগ্রন্থনে এবং সুলভে বিক্রয় ব্যাপারে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সৎসাহসের পরিচয় সম্প্রতি দিয়েছেন। আমরা আশা করি তারা আরেকটু এবিষয়ে অগ্রসর হবেন।—প্রথমে বই পাঠিয়ে "কিস্তিবন্দিতে" টাকাটা সংগ্রহ করবেন। কোন বিদেশী প্রকাশক সংস্থার প্রতিনিধির সংগে এবিষয়ে আলোচনা করে জেনেছি—তারা প্রথম বইয়ের সামগ্রিকমূল্য মধ্যবিত্ত আয়ের ধরাছোঁয়ার মধ্যে হয় এমন টাকার মধ্যে সমান কিস্তিতে ভাগ করে নেন (যেমন ৩০০ টাকার বই ১৫×২০) তারপর— প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে 'অর্ডার' বুক করেন, দ্বিতীয় কিস্তির ভি পি-তে বই সম্পূর্ণ দিয়ে দেন। পরে প্রতি মাসে ভি পি-তে "হিসাবের" একটি কপি পাঠিয়ে বাকি কিস্তির টাকাটা আদায় করেন। আইন-কানুন খুবই সহজ—পর পর তিন কিস্তির টাকা বাকি পড়লে "গ্রাহকের" বইয়ের ওপর কোন দাবি থাকবে না—কোম্পানীর সিদ্ধান্ত সেখানে একতরফা তবে গ্রাহকের দিকেই তাদের সহানুভূতি থাকে। বই পাঠাবার এবং টাকা আদায়ের খরচ কোম্পানীর। নগদ কিনলে শতকরা ২০ কমিশন—যিনি অর্ডার সংগ্রহ করেন তিনি পান শতকরা ১০ ভাগ। বই কেনেন—সরকারী চাকুরে, স্কুল, লাইব্রেরী।

বিধু চক্রবর্তী, বর্ধমান।

বাংলা সাহিত্যে 'প্যারডি' সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, 'প্যারডি' কাকে বলে? কাব্য-সাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? এর উত্তরে বলা যায়, 'প্যারডি' হল সেই সাহিত্যিক বা সাংগীতিক রূপকর্ম যেখানে কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন লেখা বা লেখকের রচনাশৈলীর নিখুঁত অনুকরণ করা হয়। প্রসঙ্গত আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত, যে কবিতার বা কবির যে বিশেষ ভঙ্গিমার 'প্যারডি' রচিত হবে তা পাঠকসাধারণের কাছে একেবারে অপরিচিত না হোক—পরিচিত হওয়া চাই।—যেন প্যারডিটি পড়েই পাঠকরা বুঝে নিতে পারে, সেটি কোন বিশেষ কবি বা কবিতার অনুকরণ। প্যারডি রচয়িতার কৌতুক সৃষ্টির প্রয়াস সার্থকতা লাভ করবে একমাত্র সেখানেই।

দ্বিতীয়ত কবিরা সাধারণত গম্ভীর রসের কারবারী হন। মনোলোকে অনুভূতির গভীর প্রদেশে আনন্দ-বেদনার যে নিত্য জোয়ার-ভাঁটা—তারই বাক্-প্রতিমা নির্মাণে নিত্য নিয়োজিত তাঁরা; সেদিক থেকে কবি মাত্র সকলেই প্রায় কম বেশি 'সিরিয়াস'। প্যারডি রচয়িতার স্বভাব হবে কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। অর্থাৎ যে কবিতার প্যারডি তিনি লিখতে যাচ্ছেন, তার বিষয় যত গভীর বা গম্ভীর, প্যারডির বিষয়টি হবে ঠিক সেই পরিমাণে তুচ্ছ এবং হাল্কা; এবং এই দুই ব্যবধান যত বেশী প্রকট হবে, হাস্যরসের উৎসারও ঘটবে তত বেশী।

তৃতীয়ত, প্রকৃতি অনুযায়ী সাহিত্যে হাস্যরসের যে প্রধান তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়, সেই 'হিউমার', 'উইট' এবং 'স্যাটায়ার'—প্রত্যেককেই অল্পবিস্তর ছুঁয়ে যাওয়া যায় প্যারডি রচনার সূত্রে। যদিও 'হিউমার' বা বিশুদ্ধ কৌতুকই প্যারডির রসপ্রেরণার প্রধান উৎস। সংশ্লিষ্ট কবি বা সংশ্লিষ্ট বিশেষ ভঙ্গিমাকে নিছক ব্যঙ্গ কটাক্ষ হানবার অভিপ্রায়ে প্যারডির সৃষ্টি হয়েছে—কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্তও কিন্তু বিরল নয়। এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। সেটি হল, প্যারডিও এক রকমের সাহিত্যকর্ম। কাজেই শ্লেষ কটাক্ষ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খাতিরে রসিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে প্যারডি-রচয়িতা যদি সাহিত্যের ধর্ম থেকেই বিচ্যুত হন, তা হলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

বাংলা প্যারডির বয়স খুব বেশী নয়। মাত্র উনিশ শতকে এর জন্ম। তা হলেও বিভিন্ন শক্তিশালী কবির প্রতিভার স্পর্শে এর যে সামগ্রিক রূপটি গড়ে উঠেছে—তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। স্বাদে বৈচিত্র্যে উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বলতায় বাংলা সাহিত্যকুঞ্জে তা যেন এক ঝলক দখিন হাওয়ার গুঞ্জরণ বয়ে এনেছে!

প্রথম আবির্ভাবেই বাংলা প্যারডি রসিক সমাজে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্যারডিটি হল 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য'—রচয়িতা জগদ্বন্ধু ভদ্র। মাইকেল মধুসূদনের অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য' কাব্য-সাহিত্যের প্রথাগত কলাবিধি ও রীতি পদ্ধতিতে অভ্যস্ত সমসাময়িক রসিক সমাজে ছিল এক বজ্রপাতস্বরূপ শুধু শব্দ-নির্বাচন বা ছন্দপ্রয়োগেই নয়, ভাবের দিক থেকেও মাইকেল যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তাতে আহত বোধ করেছিল তথাকথিত সাহিত্যের ধ্বজাধারী এই সমস্ত রক্ষণশীল কূপমণ্ডূকদের রসবোধ। সেই বিস্ময় প্রতিক্রিয়ারই ফল 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য'—

> দক্ষিণ বাহন সাধু, অনুগ্রহ দিয়া
> প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিরিবারে
> কিম্বিধ কৌশল বলে সকণ্ড—মার্জ্জার—
> পললাগী বক্রনখ—আগুগতি আসি
> পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল?
> কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর প্রহারে
> যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।

সেদিন এবং পরবর্তী কালেও জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজের কাছে বারম্বার নিন্দিত হয়েছেন—মাইকেল এবং তাঁর অনন্য সৃষ্টির যথাযথ মূল্যায়ন না করার জন্যে; তা হলেও একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, মাইকেলের ছন্দোভঙ্গিমা ও শব্দ প্রয়োগের রীতি সঠিক আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন জগদ্বন্ধু—যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তা ছাড়া 'ছুচ্ছুন্দরী' বধের মত সামান্য ঘটনাকে কবিতার বিষয় করে যে হাস্যরসের উৎসার ঘটিয়েছিলেন তিনি—তাতে একজন শক্তিশালী প্যারডি-কার হিসেবে তাঁর আসন যে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, একথা নিঃসংশয়েই বলা চলে। এই কারণেই স্বয়ং মধুসূদনও তাঁর প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি।

জগদ্বন্ধু ভদ্র ছাড়াও মাইকেলের মেঘনাদবধ তথা অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে অনেকেই প্যারডি রচনা করেছিলেন সে যুগে এবং পরবর্তী কালেও। এই সব প্যারডির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'অম্বল সম্বরা কাব্য'—

> অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
> ওড্র কুলোদ্ভব মহামতি; বঙ্গধামে
> নিম্বসিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন সময়ে আহা!...
> কহ দেবী তম্বুরা বাদিনী!
> কোন জাম্বুবান্ নৈল মুখ তার ঘ্রাণে
> আচম্বিতে?

বলা বাহুল্য, শব্দের যাদুকর সত্যেন দত্ত মাইকেলের দীর্ঘকাল পরে আবির্ভূত হয়ে এই যে সুন্দর প্যারডিটি রচনা করেছেন, —এর প্রেরণা কোন শ্লেষ কটাক্ষ নয়—নিছকই আমোদ বা কৌতুক সৃষ্টি!

এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় মধুসূদনের আর একটি বিখ্যাত রচনা 'আত্মবিলাপ'-এর প্যারডির কথা। এটি রচনা করেছিলেন সে-যুগের বিখ্যাত ব্যঙ্গ রচনাকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

> আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
> তাই ভাবি মনে!
> লভিয়া সাগর শুধু, লাভ মাত্র পোড়ামুখ
> দেখাব কেমনে?...
> (স্যার রিচার্ড টেম্পল—পার্লামেন্টের মেম্বর হইতে না পারিয়া—একাকী)

ইন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যেমন শ্লেষ-ব্যঙ্গের কটাক্ষ হেনেছেন একাধিক জনকে—এ প্যারডিটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এখানে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য কবি অর্থাৎ মধুসূদন নন—'স্যার রিচার্ড টেম্পল'—কবিতার নাম থেকেই সে-কথা বোঝা যায়।

মধুসূদনের পর বাংলা সাহিত্যে যার রচনা বিভিন্ন শক্তিশালী কবিকে প্যারডি রচনায় সবচেয়ে বেশি প্রেরণা যুগিয়েছে—তিনি হলেন কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের রচিত কবিতা সংখ্যা ও অভিনবত্বের বিচারে যেমন অনন্য, অসাধারণ, পূর্বের সমস্ত নজির ভংগকারী—ঠিক তেমনি তাঁর কবিতার প্যারডির সংখ্যাও সুপ্রচুর। এই সমস্ত প্যারডির মধ্যে নিছক কৌতুক বা আমোদ সৃষ্টির চেষ্টা যেমন আছে তেমনি আছে শ্লেষ বা ব্যঙ্গের প্রবণতা। রবীন্দ্র কবিতার প্যারডিকার হিসেবে প্রথমেই উল্লেখ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা।

প্রথিতযশা নাট্যকার এবং 'হাসির গানের রাজা' হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক সময় সাহিত্যে নীতিরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে বড় বেশী মাতামাতি করেছিলেন, একথা সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথের সমকালে প্রকাশিত অনেক কবিতায় তিনি তখন অশ্লীলতা ও রুচিহীনতার গন্ধ পেয়েছিলেন এবং সর্বশক্তি নিয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে। 'আনন্দ-বিদায়' নাটক এই বিরুদ্ধবাদিতার সবচেয়ে বড়ো ফসল। এই নাটকেই রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গানের প্যারডি রয়েছে। যেমন—'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি'র প্যারডি—

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি Leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে বসে আছি
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারা নিশি তব লাগিয়া
রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া।
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে দাঁত বের
করে হাসিও।

অথবা, 'এখনো তারে চোখে দেখিনি'র প্যারডি—

এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু কাবা পড়েছি
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি।
শুনেছি তার বরণ কালো কিন্তু তার
চেহারা ভালো,
ওগো বল, আমি তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে
যাব কি?...

দ্বিজেন্দ্রলাল যে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে রবীন্দ্র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা যে কত অকিঞ্চিৎকর ছিল, কালের বিচারেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে; রবীন্দ্রনাথ চিরকালের কবির সশ্রদ্ধ মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন দেশে বিদেশে। সেদিক থেকে সামান্য অভিনবত্ব ছাড়া এসব প্যারডির বিশেষ কোন মূল্য নেই একালের সাধারণ পাঠকের কাছে। 'হাসির গানের রাজা' হিসেবে যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তার মান বজায় রাখতে পারেননি তিনি তাঁর এই পর্যায়ের রচনায়, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রমথ চৌধুরী একটা খুব মর্মস্পর্শী কথা বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে, তাঁর 'সাহিত্যে চাবুক' প্রবন্ধে : 'হাসতে হলেই আমরা অপরিমিত দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হই। কিন্তু দন্তবিকাশ করলেই যে সে ব্যাপারটা হাসি হয়ে ওঠে তা নয়—দাঁত খিঁচুনি বলেও পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে।' বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি প্যারডি নির্ভেজাল দাঁত খিঁচুনির দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্র-বিরোধিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ পরবর্তী কালে আরও একজন অনুসরণ করেছিলেন; তিনি হলেন সজনীকান্ত দাস। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গদ্য ও রোমান্টিক ভাবের কবিতাকে কেন্দ্র করে শ্লেষ বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করেছেন তিনি কয়েকটি প্যারডিতে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো
ফুল ফুটবে
মধুর লোভে অন্ধ ব্যাকুল মধুপকুল
জুটবে গো—!
বলাই বলাই, বেশ তো তুমি—
করছ আলো কানন ভূমি
ফণীমনসা নামটি আমার টুটবে গো.
আজ টুটবে।
(ফণীমনসার স্বপ্ন)

অথবা রবীন্দ্রনাথের 'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা'র প্যারডি—ওরে হুতোম ওরে আমার প্যাঁচা/ভর সাঁঝেতে শাওড়া ডালে/প্রাণ খুলে তুই চাঁচারে আজ চ্যাঁচা!

তবে এসব ছাড়াও সজনীকান্তের আরও কতকগুলি প্যারডি রয়েছে, যেগুলি রসোৎকর্ষ ও চমৎকারিত্বে বেশ উজ্জ্বল। স্বচ্ছ সরল হাস্য-কৌতুকের হীরকদ্যুতি দিয়ে এরা বাংলা প্যারডির গৌরব বৃদ্ধি করেছে বলা যায়। এমন একটি সফল সুন্দর রচনার দৃষ্টান্ত 'মানের তরী'—রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র প্যারডি—

ভবনে গরজে প্রিয়া নাহি ভরসা—
কখন বাহির জানি মান বরষা—
করে বুঝি করে তাড়া
রাশি রাশি ভারা ভারা
বর্জন গর্জন খর পরশা।
জ্বালিতে ভুলিতে প্রাণে নাহি ভরসা।

অথবা অজুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি'-এর প্যারডি—বছরের আয়োজন/বহুদিন ছিল মনে/হাসি মুখে গেল চলে চিবাইয়া পান।/.....
ল্যাচি ও বেগুনে ভাজা/ভাজা মসলাদী খাজা/ইলিশের ডিম—/কপির ডালনা আছে,/হয়েছে ও দায়ে মাছে এতক্ষণ হিম!/.....

রবীন্দ্র-কবিতার প্যারডি রচনায় আর যে সব কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—দেবেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কালিদাস রায়। এঁদের সকলেরই রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। কাজেই এঁরা যে সব প্যারডি রচনা করেছেন, তার অধিকাংশেরই প্রধান প্রেরণা ছিল নিছক কৌতুক এবং আমোদ সৃষ্টি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে—

"বেলা যে চের হোল (ওগো ও) খেতে চল"
পুরনো সেই সুরে, কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে পান্তা ভাত? কোথা অম্বল?
...ছিলাম আনমনে একলা গৃহকোণে
কে যেন ডাকিল রে "খেতে চল"।
('বধূ'র প্যারডি—দেবেন্দ্রনাথ সেন-কৃত)

আজি কি তোমার বিধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি গেছে খানা ডোবাতে।
পারে না বাঁচিতে লোকে জ্বরজ্বার
পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর;
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী সভাতে।
('শরৎ'-এর প্যারডি—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-কৃত)

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক কবির কবিতার প্যারডি রচিত হয়েছে—যেগুলির অন্তত দু-চারটির উল্লেখ না করলে প্যারডি সম্বন্ধীয় এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কবিতার প্যারডি 'বঙ্গালীর ছেলে' লিখেছিলেন ভুবনমোহিনী দেবী : কে যায় কে যায় অই আপন কে হেলে?/হাফ মোজা জুতো পায় আঙুটি আঙ্গুলে/চারু অঙ্গে চীনা কোট চলে দুলে দুলে।/

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতার প্যারডি রচিত হয়েছে। যেমন, যতীন্দ্রনাথের 'গঙ্গাস্তোত্র' : চির ক্রন্দনময়ী গঙ্গে!/কুলকুল কলকল প্রবাহিত আঁখিজল/দেব মানবের একসঙ্গে/ ('পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে'র প্যারডি); সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কেরানীস্থানের জাতীয় সঙ্গীত' : ধাও ধাও চাকরী ক্ষেত্রে/খাও—অর্থাৎ গিলে নাও যা তা/রক্ষা করিতে পৈতৃক কর্ম্মে/শোনো ওই ডাক service দাতা।/ ('ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে'র প্যারডি) এবং সর্বোপরি কালিদাস রায়ের : যখন সঘন গৃহিণী গরজে বরষি বকুনি ধরা/সভয়ে অমনি আবরি নয়ন, লুপ্ত সংজ্ঞা সাড়া (দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানের প্যারডি)। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য রজনীকান্ত সেনের 'কেন বঞ্চিত হব চরণে'-র একটি সুন্দর প্যারডি কালিদাস রায়-কৃত : কেন বঞ্চিত হব ভোজনে?/মোরা কত আশা করে/নিজ বাসা ছেড়ে/খেতে এসেছি এখানে কজনে।/...

উপসংহারে বলা যায়, বিভিন্ন শক্তিশালী কবির প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্যে প্যারডির যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তার আর নতুন কোন ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নেই। বাংলা দেশে কবিতার অভাব কোনদিনই ঘটবে না—একথা সত্য হলেও মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ইত্যাদি কাব্যের বিবিধ রূপকল্প আজ যেমন পরিত্যক্ত, ঠিক তেমনি প্যারডিও এ যুগে অতীতের সামগ্রী হতে চলেছে। কারণ, বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষায় সদাসর্বদা নিবিষ্ট এ-কালের কবির হৃদয়ে হাস্যরস-নিবিড় কবিতার এই ধরনটি আর বিশেষ কোন আবেদনই জাগায় না।

স্নিগ্ধরসের অসামান্য লেখক প্রভাতকুমার

প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য। ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য : বারো টাকা।

আজকের পাঠক প্রভাতকুমারকে প্রায় ভুলেই গেছেন। তাঁর 'আদরিণী' এবং 'মাস্টার মশায়' গল্প দুটি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত, ওই দুটি বাধ্য হয়ে পড়তে হয়। আর; কিছু লোক তাঁকে ছায়াচিত্রের দৌলতে জানেন 'দেবী' ও 'রত্নদীপ' ছবির কাহিনীকার হিসেবে। ব্যস, তারপর অতল বিস্মৃতি। তথাকথিত শিক্ষিত লোকও তাঁকে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। অথচ এক সময় প্রভাতকুমার জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছেছিলেন। এবং সেই জনপ্রিয়তার মূলে কোন সস্তার সাময়িক আবেদন ছিল না। ছোট গল্পের প্রকৃত জনক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর নাম প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। আজ তাঁকে ভুলে যাওয়ার অথবা ভুলে থাকার অন্যতম কারণ হয়তো তিনি নিজে; তিনি নিজেকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারেন নি। অবশ্যই তাঁর প্রতিভা ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিভার একটি স্পষ্ট সীমাও টানা ছিল। প্রভাতকুমারের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হয়তো এত সহজে তাঁকে বিস্মৃত হওয়া যেত না যদি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য আরো উন্নত, আরো কতবলিষ্ঠ হত। পৃথিবীতে খুব কম লেখকই আছেন যাঁরা কেবল লেখার গুণেই চিরকাল বেঁচে আছেন। সমালোচকের দায়িত্ব হল লেখককে বারবার উলটে-পালটে পরীক্ষা করা, প্রতি যুগের, প্রতি কালের নতুন পাঠকের কাছে তাঁকে পৌঁছে দেওয়া এবং গত যুগের ভগ্ন, ছিন্ন স্মৃতিকে উসকে দেওয়া। কিন্তু কি আশ্চর্য, প্রভাতকুমারের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর কেটে গেছে, তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে তবু তাঁর পূর্ণাঙ্গ একখানি জীবনী বা আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক হয়েও এমন একটি গুরুতর কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হননি। জনপ্রিয়তায় যিনি একদা রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়েছিলেন, ছোট গল্পের শিল্পশৈলীতে যাঁর অবিসংবাদী দক্ষতা ছিল, অধুনা বিস্মৃতপ্রায় সেই প্রভাতকুমারের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার করেছেন।

প্রভাতকুমারের জীবন খুব অসুখে ছিল না। প্রথম জীবনে পত্নীবিয়োগের পর সরলা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হয়। শোনা যায়, সরলা দেবী তাঁর গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরিবারের যোগ্য করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে খরচ করে বিলেত পাঠান। বাংলার সাহিত্য সমাজ এই রোমান্সের খবরে সরগরম হয়ে ওঠে। প্রভাতকুমার ব্যারিস্টার হয়ে ফেরেন কিন্তু সরলা দেবীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিয়ে হয় নি। অনিচ্ছুক মন নিয়ে ব্যারিস্টারী শুরু করেন তিনি; এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি আইন পড়তে গিয়েছিলেন সেটি সিদ্ধ না

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

হওয়ায় আইন ব্যবসায় তাঁর প্রতিষ্ঠালাভ করা হয়নি। তিনি 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সম্পাদক হন এবং জীবিকার জন্য আইন কলেজে অধ্যাপনা করতে থাকেন। গয়ায় থাকাকালে তাঁর কয়েকটি গল্প-উপন্যাস বেরিয়েছিল। সাহিত্যে তাঁর আকৈশোর সাধ। সেই সাহিত্যে অতঃপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। 'মাতৃ ভাষার সেবা করিবার জন্য প্রাণপণ করিব, কিছু করিতে পারিব এমন আশা নাই, তবে চেষ্টা করিয়া জীবন-সার্থক করিব।' এই ছিল তাঁর আশা। আলোচ্য গ্রন্থে জীবনী-অংশ অবশ্য খুবই কম।

তবু প্রয়োজনীয় সব আলোচনাই এ বইতে রয়েছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে প্রভাতকুমার কিভাবে কবিতা-লেখা ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর গল্পে বহু অবাঙালী এবং অভারতীয় চরিত্র স্থান লাভ করলেও তিনি যে মূলত বাঙালী জীবনের রচয়িতা—এ সব তথ্য গ্রন্থকার নতুন করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রভাতকুমারের সমকালীন সাধারণ বাঙালী জীবন অনেকাংশে সরল, সঙ্কীর্ণ ও নিস্তরঙ্গ ছিল বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রভাতকুমার বাঙালী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীকে তাঁর ছোট গল্পে উপস্থিত করেছেন, তাদের বিশ্লেষণ করেছেন, অর্থ ও তাৎপর্য দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী একদা তাঁকে মোপাসাঁর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সমালোচকরা আজও সেই মন্তব্যের জের টেনে চলেন। যদিও বিষয়বৈচিত্র্যে তিনি ও'হেনরীর সঙ্গেই তুলনীয়। ও'হেনরীর মত তাঁরও দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক এবং সেই রকম বহুতর চরিত্রের সমাবেশও তিনি ঘটাতে পেরেছেন। অবশ্য সব সময় তিনি প্রয়োজন-মাফিক গভীর হয়ে উঠতে পারেন নি। বাংলা প্রবাদে যাকে বলে, 'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো' দেওয়া—প্রভাতকুমারের বেলায় বহুক্ষেত্রে সেই রকম ঘটনা ঘটেছে।

গ্রন্থকার প্রভাতকুমারের গল্পগুলিকে বোধ হয় সমালোচনার সুবিধার্থে প্রেম, প্রীতি, ভক্তি ও বাৎসল্য, ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামি, স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি ইত্যাদি দশটি বিভাগে ভাগ করেছেন। ঐতিহ্যবাদী, রক্ষণশীল ও রোমান্টিক প্রভাতকুমারের দৃষ্টি সমকালীন সমাজে নিবদ্ধ ছিল, এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি তিনি ছিলেন 'রক্ষণশীল আধুনিক'—আলোচ্য গ্রন্থকারের এ মীমাংসাও যথার্থ। 'দেবী' ও 'ভুলভাঙা' গল্প দুটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক, আরো কৌতূহল জাগায় গ্রন্থকারের একটি মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতি' কবিতাটিতে প্রভাতকুমারের 'যুগলসাহিত্যিক' গল্পটির প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। প্রভাতকুমারের গল্পে যদি রবীন্দ্রনাথের পদপাত ঘটে থাকে তবে উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর বিলক্ষণ পক্ষপাত আছে। বৃহত্তর অর্থে না হোক, দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং উপন্যাসের গঠনরীতিতে তিনি অনেকাংশ

ঋত্বিক-অনুরাগী। গ্রন্থকার শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের ব্যবহৃত ভাষায় শব্দ-বৈচিত্র্যের এক তালিকা তুলে ধরেছেন, প্রয়োজনীয় পাদটীকা দিয়েছেন এমনকি তাঁর ইংরেজী-ভাঙা বাংলার নমুনাও সংগ্রহ করেছেন। শুধু, গ্রন্থকার যদি বইটি চলিত ভাষায় লিখতেন তা হলে হয়তো নতুনকালের পাঠকদের তিনি আরো কাছাকাছি আসতে পারতেন এবং তাঁর পরিশ্রম আরো সার্থক হত। প্রভাতকুমারের গল্প প্রসঙ্গে আলোচনায় বারংবার বনফুলের বহু গল্পের তুলনা খুঁজেছেন। এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রভাতকুমারের আবেদন ফুরোয় নি। সাহিত্য ও সাহিত্যের আলোচনা এইভাবেই কাল থেকে কালে উত্তীর্ণ হয়ে চলে।

উপন্যাস

শঙ্খমালা। মিহির মুখোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০ টাকা।

মিহির মুখোপাধ্যায় খুবই কম লেখেন। তবু এর আগেও তাঁর একখানি উপন্যাস বেরিয়েছিল। আলোচ্য উপন্যাসটি 'দেশ' পত্রিকার এক শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ওই উপন্যাসে গল্পাংশ সামান্যই, বিস্তৃত কল্পনার অবকাশ নেই। লেখকের তেমন অভিলাষও বোধ হয় ছিল না। প্রথম তারুণ্যের এক অস্ফুট প্রেম এবং তার পারিপার্শ্বিক তিনি সাজিয়ে তুলতে চেয়েছেন পরিণত স্মৃতিতে। বইটি প্রথম পুরুষে আত্মকাহিনীর ভঙ্গীতে লেখা, ফলে ঘটনায়, চরিত্রে এবং স্থানিক পরিবেশে ঘনিষ্ঠতার আভাস মেলে। মুসৌরির লাল টিব্বা থেকে নামবার পথে নায়ক তপুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা আঁখির বোন পাখির। বাংলা গল্প-উপন্যাসের সনাতন পদ্ধতি অনুযায়ী ওইভাবে কাহিনী শুরু হয়েছে এবং বাইশ বছর আগেকার স্মৃতির যবনিকা অকস্মাৎ সরে গেছে। ষোলো বছরের কিশোরী আঁখিই সেই অস্ফুট স্মৃতি, সেই শঙ্খমালা যাকে জীবনে একবারই পাওয়া যায়। শুধু মানুষ নয়—মানুষ, দেশ, প্রকৃতি এইভাবে এক সমার্থক বিন্দুতে দাঁড়াতে পারে উচ্চতর বোধে।

লেখক একবার করে ফিরে গেছেন সেই শঙ্খমালার দেশে আবার ফিরে এসেছেন মুসৌরিতে—সিনেমার ফ্ল্যাস-ব্যাকের মতো। তারই ফাঁকে ফাঁকে এসেছে জমিদার রজবপুর—গাড়োয়ান নবাব আলি, যোগীরাজবাবুর গান ও মদের আসর, গ্রাম, খেয়াঘাট, স্টীমার আরও সব কিছু, ঘিরে নীরব চাহনির মতো লেগে আছে আঁখি। কিন্তু কাহিনী দু জায়গায় বিভক্ত হওয়ায় হয়তো বাস্তব-রক্ষা হয়েছে, তবে গল্পের গতি তাতে বাধা পেয়েছে। এর চেয়ে লেখক সোজাসুজি তপু আঁখির কাহিনী বর্ণনা করলে বোধ হয় ভালো করতেন; বস্তুত মুসৌরির ভূমিকা যখন নগণ্য। লেখক আঁখির রহস্যটুকু রেখে দিয়েছেন, পাখিও কোন জবাব দেয়নি। তবু চরিত্রগুলির আচরণ, কথাবার্তা স্বাভাবিক; পাঠকের কাছে অচেনা ঠেকবে না। লেখকের ভাষা ব্যবহার পরিমিত, ঘটনার বর্ণনা উচ্চগ্রামে পৌঁছোয় নি। সব কিছু ছাপিয়ে রয়েছে এক আচ্ছন্ন স্মৃতি।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কলকাতার ঘোড়দৌড়ের মাঠে 'রাজ্যপালের কাপের' খেলা। বিরতির সময় রাজ্যপালের টেবিলে স্তূপীকৃত খাবার দেখে তিনি বিস্মিত কৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত খাবার কি ঘোড়াদের জন্য! আমি এ-সময় কিছুই খাই না। তবে একটু কফি খেতে পারি।' পাশে বসা এক ভদ্রমহিলা নিজের হাতে এক কাপ পানীয় ঢেলে বললেন, 'আমি নিজেই জানি না এটা টি না কফি।' কাপে ঠোঁট লাগিয়ে রাজ্যপাল বললেন, 'ফ্লেভারটা টির মতো নয়, কফির মতোও ঠিক নয়। তবে চা'য়ের মতো একটু গন্ধ আছে।'

আরেক দিন, ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি নিয়ে রাজ্যপাল গিয়েছেন চিড়িয়াখানায়। আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা হয় নি, কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয় নি—রাজ্যপালেরই ইচ্ছে অনুসারে। তবু খবর পেয়ে পরিচালক কর্তৃপক্ষ যখন ছুটে এলেন,
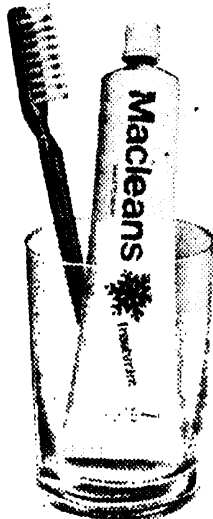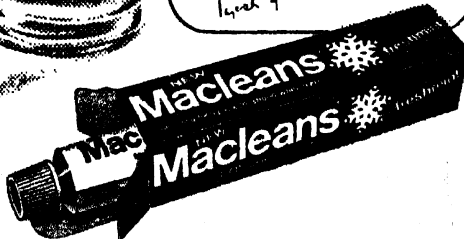
রাজ্যপাল একটু হেসে বললেন, 'আমি আজ এখানে ভি আই পি হয়ে আসিনি। আমি এসেছি ভেতরে যেসব ভি আই সি আছে তাদের দেখতে। আপনারা হাসবেন না, ঐ সব জীব দেখতে দিনের পর দিন কত শত লোক কত দূরে থেকে আসে।' ভি আই সি মানে ভেরি ইমপরট্যানট ক্রিচারস্‌!

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী সম্বন্ধে এখন বহু একান্ত ও কৌতুকদীপ্ত গল্প শুনিয়েছেন বিমানেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর **কালো চশমার আড়ালে** বা রাজাজীর সঙ্গে হাজার দিন (রূপা, ছ টাকা পঁচাত্তর পয়সা) গ্রন্থে। রাজাজী যখন স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল এবং পরে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল—এই সময়ে লেখক বিমানেশবাবু ছিলেন তাঁর সামরিক সচিব এবং উপরন্তু তাঁর চিকিৎসক। এই কাজের সূত্রে, বিমানেশবাবুর ভাষায়, রাজাজীর শুধু নাড়ীর খবর নয়, হাঁড়ির খবরও রাখতে হয়েছিল তাঁকে। কাছ থেকে দেখা এই মানুষটির বিরাট ও বহুমুখী ব্যক্তিত্বের কিছু টুকরো পরিচয় তিনি বর্ণনা করেছেন এই রম্য নিবন্ধগ্রন্থে।

পৃথিবীর প্রায় প্রবীণতম রাজনীতিবিদ রাজাজীর প্রাত্যহিক জীবন ছিল আশ্চর্য অভ্যাস-শৃঙ্খলিত, নিয়ম ও সময়ের তীক্ষ্ন অনুবর্তী, নিরলস কর্মে মুখর। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসীম প্রজ্ঞা, নির্ভীক মতামত, উদার ধর্মচারিতা, শৃঙ্খলাময় ব্যক্তিত্ব ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখেছে। বিমানেশবাবুর এই বইতে সব ছাপিয়ে রাজাজীর যে-বৈশিষ্ট্য বারবার উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে, তা হল রাজাজীর অসামান্য সেনস অফ হিউমার। স্বাধীন ভারতের অন্যতম প্রশাসনিক কর্ণধাররূপে রাজাজীর সঙ্গে হাজার দিনের এই অভিজ্ঞতার কাহিনী বিমানেশবাবু পরিবেশন করেছেন অতি সহজ সুন্দর প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে। বইটির সাহিত্যমূল্যও অনস্বীকার্য।

*

কবিতার আকারে রচিত হলেও প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর কে আমি (পি আর কুণ্ডু এজেনটস, এক টাকা) সংকলন গ্রন্থটির বেশীর ভাগ রচনা সংগীতধর্মী। গানের মতোই প্রথম ছত্রের সূচী দিয়ে রচনাগুলির পরিচয় সূচিত, কোনো রচনারই আলাদা নাম নেই। শেষ রচনাটি থেকে অনুমান, লেখক স্বাধীনতাপূর্ব যুগে নিরাপত্তাবন্দী হিসেবে কারাবরণ করেছিলেন। সহবন্দীদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেছেন: 'ছোট্ট কারাগারে আমি তুমি আসি:/সে বা তারা ধরে আনে।/কার জনৎকারবন্দের কে টেনে আনে এবং কেন?/তার কেউ বা ভুলে নিয়ে যায় এবং কেন?' জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অকপট সরল এই জিজ্ঞাসার সুরেই অবশিষ্ট রচনাগুলি রচিত।

Lakmé
ছয়
ঋতু
আর
এক ক্রীম
L
Lakmé
COLD CREAM
ল্যাকমে কোল্ড ক্রীম প্রত্যেক ঋতুতেই আপনার
ত্বকের যত্ন করে। মেকআপ আর ময়লা দূর
করে আপনার ত্বককে করে রাখে সম্পূর্ণ পরিষ্কার।
যোগায় কোমলতা, আর্দ্রতা আর পুষ্টি!
বাঁচায় গ্রীষ্মের নীরসতা আর
শীতের ঠাণ্ডা থেকে। ল্যাক্মে কোল্ড ক্রীম
মাখুন—সারা বছর ধরে আপনার ত্বক
হয়ে থাকবে কোমল, সুন্দর, সুকুমার।
ল্যাক্মে
ত্বককে বোঝে যে।
ল্যাক্মে কোল্ড ক্রীম

L-102

ক্রাইস্টচারচের কমনওয়েলথ গেমস থেকে ভারত পনেরোটি পদক নিয়ে এসেছে। অংশগ্রহণকারী ৩১টি দেশের মধ্যে পদক তালিকায় পেয়েছে ষষ্ঠ স্থান। কুড়িজন ক্রীড়াবিদ নিয়ে গড়া ভারতীয় দলের পনেরো জনের পনেরোটি পদক লাভ নিঃসন্দেহে সাফল্যের পরিচয়। সাফল্য শতকরা পঁচাত্তর ভাগ। নিশ্চয়ই সন্তোষ প্রকাশের কারণ আছে। বিশেষ করে আমাদের কুস্তিগীরদের সাফল্যে। আমাদের কোন কুস্তিগীরই ক্রাইস্টচার্চ থেকে খালি হাতে ফেরেনি। দশজনই পেয়েছে দশটি পদক। খেলাধুলার ইতিহাসে ভারতের এ এক নতুন গৌরব। গৌরবময় ভূমিকা আরও উজ্জ্বল হতে পারত যদি কুস্তিতে বিচার বিভ্রাট না ঘটত। শুধু কুস্তি কেন, অ্যাথলেটিকসেও বিচার বিভ্রাটে আমরা একটি সোনা হারিয়েছি, কুস্তিতে আরও দুটি। যদি বিচার বিভ্রাট না ঘটত তবে চারটির বদলে আমরা কুস্তিতে অন্তত ছটি সোনা পেতাম। আর হপ স্টেপ ও জাম্প আমাদের মহীন্দার সিং গিলের সোনা তো বাঁধাই ছিল।

হপ স্টেপ ও জাম্প ইভেন্টের দুদিন আগে আমাদের মহীন্দার সিং গিল আমেরিকা থেকে ক্রাইস্টচার্চে উড়ে এসেছিল। আত্মবিশ্বাসে ছিল ভরপুর। প্রতিযোগিতার দিন ছয়টি লাফের মধ্যে তিনবার ফাউল করলেও চতুর্থ লাফে ওর ১৬.৪৪ মিটার অতিক্রম করার মত আর কোন প্রতিযোগী ছিল না। কিন্তু ঘানার প্রতিযোগী যোসয়া ওউসু তার শেষ লাফে ফাউল করে গিলকে ৬ সেন্টিমিটার পেছনে ফেলে সোনা জেতে। ওউসুর ফাউলের ঘটনাটি তখন কারো নজরে পড়ে না। পরে নিউজিল্যান্ড ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের তোলা ফিলমে দেখা যায় ওউসুর ১৫.৫৫ মিটারের শেষ লাফটি ফাউল হয়েছে। গেমসের নিয়মানুযায়ী ইভেন্ট শেষ হবার পর ৩০ মিনিটের মধ্যে প্রতিবাদ পেশ করতে হয়। ভারতের শেফ দ্য মিশন শ্রীকালী গাঙ্গুলী অনেক দেরীতে প্রতিবাদ পেশ করায় সে প্রতিবাদপত্র প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে একটি হক স্বর্ণপদক থেকে ভারত বঞ্চিত হয়।

কুস্তিতে সৎপাল এবং নেত্রপালও স্বর্ণপদক থেকে বঞ্চিত হয়েছে বিচারকদের পক্ষপাতমূলক বিচারের ফলে। আমাদের কুস্তির দলের ম্যানেজার দেওয়ান প্রতাপচাঁদ রেফারি ও বিচারকদের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন তীব্র ভাষায়। নিউজিল্যান্ডে ভারতের হাইকমিশনার, যিনি কুস্তি দেখার জন্য ওয়েলিংটন থেকে ক্রাইস্টচার্চে উড়ে এসেছিলেন, তিনি বিচার দেখে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শুধু ভারতীয় দলের ম্যানেজার এবং হাই-

কমিশনারই নন, কুস্তির সময় খেয়ালখুশি মত ভারতীয় মল্লবীরদের পেনাল্টি পয়েন্ট দেওয়ায় রেফারিদের চেয়ারম্যান বহুবার রেফারি ও বিচারকদের ঠিকভাবে চলার নির্দেশ দেন। বিচার প্রহসনের সঙ্গে আবার একটু দুর্ভাগ্যও জড়িত আছে। ভারতের ১৬ বছর বয়সী কুস্তিগীর রাধেশ্যাম সেমিফাইনালে উঠে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়ার সুযোগ পায়নি দেহের ওজন (ফ্লাই ওয়েটের প্রতিযোগী) মাত্র ১০ গ্রাম বেশী হওয়ায়। ভারতের বলকবীর, জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন রাধেশ্যাম তাড়াতাড়ি তার চুল ছেঁটে ফেলে দ্বিতীয়বার ওজনের জন্য দাঁড়ায়। তখন দেখা যায় ফ্লাইওয়েটের নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে তার ওজন দুই গ্রাম বেশী। জুরিদের চেয়ারম্যান অবশ্য রাধেশ্যামকে লড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যানেজারের আপত্তিতে রাধেশ্যাম লড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

ভারতের পদক খতিয়ান

	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
অ্যাথলেটিক			
মহীন্দার সিং (হপ স্টেপ)	×	১	×
ভারোত্তোলন			
অনিল মণ্ডল (ফ্লাই)	×	১	×
ডেলাইস্বামী (ব্যান্টাম)	×	×	১
বক্সিং			
চন্দ্রনারায়ণ (ফ্লাই)	×	১	×
মুনুস্বামী (লাইট)	×	×	১
কুস্তি			
সুদেশ কুমার (ফ্লাই)	১	×	×
প্রেমনাথ (ব্যান্টাম)	১	×	×
জগরূপ সিং (লাইট)	১	×	×
রঘুনাথ পাওয়ার (ওয়েল্টার)	১	×	×
শিবাজী চিংলে (ফেদার)	×	১	×
সৎপাল (মিডল)	×	১	×
নেত্রপাল (লাইট হেভি)	×	১	×
দাদু চোগলে (হেভি)	×	১	×
বিশ্বনাথ (সুপার হেভি)	×	১	×
রাধেশ্যাম (ফ্লাই)	×	×	১
	৪	৮	৩

পদক জয়ী পনেরো জন ছাড়া ভারত দলে ছিল ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোন, দেবীন্দার আহুজা ও আসিফ পারপিয়া, বক্সার এস সুটোর ও ভারোত্তোলক দলোল লোধচৌধুরী। দলের শেফ দ্য মিশন ছিলেন শ্রীকালী গাঙ্গুলী।

গেমসের পদক খতিয়ান

	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
অস্ট্রেলিয়া	২৯	২৮	২৫
ইংলণ্ড	২৮	৩১	২১
কানাডা	২৫	১৯	১৮
নিউজিল্যান্ড	৯	৮	১৮
কিনিয়া	৭	২	৮
ভারত	৪	৮	৩
স্কটল্যান্ড	৩	৫	১১
নাইজেরিয়া	৩	৩	৪
উঃ আয়ার্ল্যান্ড	৩	১	২
উগান্ডা	২	৪	২
জামাইকা	২	১	০
ওয়েলস	১	৫	৪
ঘানা	১	৩	৫
জাম্বিয়া	১	১	১
মালয়েশিয়া	১	০	৩
তাঞ্জানিয়া	১	০	১
সেণ্ট ভিনসেণ্ট	১	০	০
ত্রিনিদাদ ও টোবাকো	০	১	১
পশ্চিম সামোয়া	০	১	১
লেসোথো	০	০	১
সিঙ্গাপুর	০	০	১
সোয়াজিল্যান্ড	০	০	১

দশ গ্রাম ওজন কতটুকু? এক চুমুকে চা বা দুধ খাবার পর ওজন নিলে দশ গ্রামের হেরফের হতে পারে। রাধেশ্যাম ফ্লাই ওয়েটের নির্দিষ্ট ওজনেই ক্রাইস্টচার্চে প্রতিযোগিতা করেছে। সেমিফাইনালের লড়াইয়ে আগে ওজন নেবার সময় দেখা যায় দশ গ্রাম বেশী। রাধেশ্যাম নিশ্চয়ই আগের রাত্রে কিংবা কিছু আগে এমন পরিমাণে খাদ্য বা পানীয় (দুধ বা অন্য কিছু) গ্রহণ করেছিল যার ফলে তার দেহের ওজন বেড়ে যায়। তাকে কি পরামর্শ দেবার কেউ ছিল না? ১৬ বছর বয়সী সম্ভাবনাময় একটি ছেলে একটু অভিজ্ঞতার অভাবে জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক কুস্তির আসরে সোনা রুপো থেকে বঞ্চিত হল।

ক্রাইস্টচার্চে অবশ্যই বিচারের পক্ষপাতিত্ব হয়েছে। কিন্তু লড়ার সুযোগ থেকে রাধেশ্যামের বঞ্চিত হওয়া কর্তাব্যক্তিদের উদাসীনতার ফল। একই কারণে মহীন্দার সিং গিলকেও সোনা হারাতে হয়েছে। লাফের সময় ঘানার প্রতিযোগী ওউসুর ফাউল কিভাবে ভারতীয় কর্মকর্তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল? কেনই বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ পেশ করা হল না? কোনো কর্মকর্তা কি ইভেন্টের সময় উপস্থিত ছিলেন না?

ডেকাথলনের জন্য মনোনীত প্রতিযোগী বিজয় চৌহান ক্রাইস্টচার্চ না যাওয়ায় অ্যাথলেটিক কোচকে পাঠানো হয়নি। কিন্তু ইভেন্টের সময় ওয়াকিবহাল কোন কর্মকর্তার মহীন্দার সিং গিলের পাশে থাকা উচিত ছিল।

'সোনা বা রুপো জয়ের মধ্যে হয়তো নামমাত্রই পার্থক্য, ৬ সেন্টিমিটার বেশী লাফানো বা দেহের ওজন দশ গ্রাম বেশী-কমেরই মত। কিন্তু সম্মানের ক্ষেত্রে পার্থক্য সোনা ও রুপোর মধ্যে পার্থক্যের মত। একটু দূরদর্শিতার অভাবেই আমরা আরও দু'তিনটি স্বর্ণপদক থেকে বঞ্চিত হলাম।

চার বছর আগে এডিনবরার দশম কমনওয়েলথ গেমসে আমাদের কুস্তিগীররা পাঁচটি সোনা, চারটি রুপো, একটি ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। পাকিস্তান পেয়েছিল চারটি সোনা। কমনওয়েলথ ত্যাগ করায় পাকিস্তান এবার ক্রাইস্টচার্চে যায়নি। কানাডা পেয়েছে কুস্তিতে পাঁচটি সোনা। তবে পয়েন্টের হিসাবে কুস্তিতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে বিচার বিভ্রাট সত্ত্বেও। আমরা পেয়েছি ২৩ পয়েন্ট, কানাডা পেয়েছে ১৯।

এই সঙ্গে প্রকাশিত পদক খতিয়ান থেকে আমাদের প্রতিযোগীদের ভূমিকা লক্ষ করা যাবে। যারা পদক পায়নি তাদের মধ্যে বক্সার সুভারকে প্রথম রাউণ্ডে হার স্বীকার করতে হয়, ভারোত্তোলক দুলাল সোধ চৌধুরী পঞ্চম স্থান দখল করে। ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় আসিফ পারপিয়া প্রথম রাউণ্ডে, দেবীন্দার আহুজা দ্বিতীয় রাউণ্ডে এবং প্রকাশ পাড়ুকোন কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হয়।

বিজয় চৌহানের না যাবার কথা আগেই বলা হয়েছে। অসুস্থ থাকায় চৌহান ক্রাইস্টচার্চ যায়নি। নির্বাচিত হয়েও ট্র্যাপ শ্যুটিংয়ের দুই প্রতিযোগী কার্ণী সিং এবং কোটার ভুবনেশ্বরী কুমারী যাননি ব্যক্তিগত কারণে। ভারোত্তোলক অনিল মণ্ডল প্রথমে দলে স্থান পায়নি। কিন্তু অনিলই জিতেছে ভারত দলের পক্ষে প্রথম পদক।

৩৯টি দেশের প্রায় ১৮০০ প্রতিযোগী দশদিনব্যাপী কমনওয়েলথ গেমসের খেলাধুলায় নানা কৃতিত্বের নজির সৃষ্টি করলেও বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারেনি অ্যাথলেটিকসের একটি ইভেণ্টে ছাড়া। রেকর্ডটি হয়েছে ১৫০০ মিটার দৌড়ে। তাঞ্জানিয়ার ২০ বছর বয়সী সেনাবাহিনীর কারিগর ফিলবার্ট বেয়ি ১৫০০ মিটার দৌড়েছে ৩ মিনিট ৩২·২ সেকেণ্ড সময়ে। এই সময় ৭ বছর আগে করা যুক্তরাষ্ট্রের জিম রুয়ানের বিশ্ব রেকর্ড সময় থেকে ০·৯ সেকেণ্ড কম।

অ্যাথলেটিকসের অন্যান্য বিষয়ে এবং সাঁতারে অবশ্য অনেকগুলি গেমস রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। চমকপ্রদ আর একটি দৌড় দেখা গেছে ম্যারাথনে। ম্যারাথন রেসের পাকাপথের দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। সব দেশের পথ এক ধরনের নয় বলে ম্যারাথনে বিশ্ব রেকর্ডের স্বীকৃতি নেই। তবে শ্রেষ্ঠ সময়ের স্বীকৃতি আছে। শ্রেষ্ঠ সময়ের অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার ডেরেক ক্লেটন (২ ঘণ্টা ৮ মিনিট ৩৩·০৬ সেকেণ্ড)। সেই ক্লেটনকে এবং স্বর্ণ সন্ধানকারী বহু প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে ম্যারাথনের সোনা জিতেছে ইংলণ্ডের ইয়ান টমসন ২ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১২ সেকেণ্ড সময়ে। অর্থাৎ টমসন হল ম্যারাথনে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সময়ের অধিকারী।

এবার সাঁতারে অস্ট্রেলিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে কানাডার ছেলেমেয়েরা। ব্যাডমিণ্টনে মালয়েশিয়ার প্রাধান্য খর্ব করেছে ইংলণ্ড ৫টি সোনার মধ্যে ৪টি জয় করে।

চার বছর পর দ্বাদশ কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসবে ১৯৭৮ সালে কানাডার এডমণ্টন শহরে। ১৯৮২-র কমনওয়েলথ গেমসের দায়িত্ব চেয়েছে ভারত, নাইজিরিয়া, কেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং মালয়েশিয়া।

জাতীয় কাবাডি

আসানসোল মহকুমা শহরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা দেখিয়ে দিল আগ্রহ, আন্তরিকতা এবং উদ্যম থাকলে কিভাবে একটি বড় প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে শেষ করা যায়। ২৩টি রাজ্য থেকে পুরুষ, মেয়ে ও বালক দল নিয়ে মোট ৫৪টি দলের খেলোয়াড়। কোচ, ম্যানেজার, রেফারি, আম্পায়ার ও কর্মকর্তা প্রভৃতি নিয়ে কয়েকশো—সব মিলিয়ে প্রায় ১১০০ মানুষকে এক সপ্তাহ ধরে আতিথ্য দিয়েছে ওই ছোট্ট শহর। তার উপর দুই দফায় খেলার আয়োজন এবং আনুষঙ্গিক বন্দোবস্তাদি করা কম দায়িত্বপূর্ণ কাজ নয়। এসব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনরকমের সাহায্য না পেয়ে।

কিন্তু পরিচালনা ও ব্যবস্থাদির কথা বাদ দিলে আসানসোলে আয়োজিত এই জাতীয় কাবাডির আসর বোধ হয় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে আরও দেখিয়ে দিল—চোখধাঁধানো খেলা ফুটবল ক্রিকেটের চেয়ে আমাদের এই দেশীয় খেলাটির আকর্ষণ খুব কম নয়। এবং বড় মাঠের অভাবে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করার সুযোগ পাচ্ছে না—এই অভিযোগও বুঝি অসার। ছোট্ট একফালি জমিতেই কাবাডি খেলা হতে পারে এবং পরিকল্পনা মত খেলার ব্যবস্থা করলে সে খেলা যথেষ্ট আকর্ষণীয় হতে পারে। আসানসোলে তো প্রতিদিন বিপুল দর্শক সমাগম হয়েছে।

খেলোয়াড়রাও কি তাদের বুদ্ধি শক্তি ও চাতুর্যের কম পরিচয় দিয়েছে। অন্যান্য খেলার মতই কাবাডিতে চটুলতা, দৈহিক পটুতা, স্কিল ও স্ট্যামিনার প্রয়োজন। এবং আর পাঁচ রকমের খেলার মত কাবাডি খেলাতেও আছে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। অনেক খেলাতেই এবার তার প্রমাণ মিলেছে। মিলেছে জয়ে প্রমাণ মিলেছে বাংলা ও বিদর্ভের সেমিফাইনাল খেলায়। এবার, পুরুষ ও মেয়ে বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহারাষ্ট্র ফাইনালে বাংলার পুরুষ ও মেয়ে দলকে পরাজিত করে। বালক বিভাগের ফাইনালে পাঞ্জাব জিতেছে কর্ণাটককে হারিয়ে। মহারাষ্ট্রের পুরুষ দল এবার নিয়ে আটবার বিজয়ী হল। কাবাডির মেয়েরা ক্রিকেটের ছেলেদের মতই আধিপত্য দেখাল টানা কুড়িবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে।

দল বদলের উত্তেজনা

ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলকে কেন্দ্র করে আই এফ এ অফিসের সামনে এখন ক্রীড়ামোদীদের জটলা, প্রবল উত্তেজনা। নতুন নিয়মে ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখ থেকে দলবদল শুরু হয়েছে, চলবে মার্চের ৫ তারিখ পর্যন্ত। সে পর্যন্ত উত্তেজনা জাগিয়ে থাকবে।

নামী খেলোয়াড়দের নিখোঁজ হবার সংবাদ আগে থেকেই কানে আসছিল। তাদের হদিস না পাওয়ায় কয়েকজন অভিভাবক থানায় ডাইরি পর্যন্ত করেছিলেন। খেলোয়াড়দের ধরে এনে আটকে রাখার জন্য দুই তিনটি নামী ক্লাবের কর্মকর্তারা ভিন্ন রাজ্যেও ছোটাছুটি কম করেননি। খেলোয়াড়দের কালোবাজারী দামও চড়চড় করে বেড়ে গিয়েছে। কারো কারো দাম নাকি উঠেছে চল্লিশ হাজারে। ক্লাবগুলিকেও বাজেটের অঙ্ক বাড়াতে হয়েছে। হবেই বা না কেন। সব জিনিসেরই দাম যখন বেড়ে গেছে খেলোয়াড়দেরও দাম বেশী দিতে হবে বইকি।

আমাদের ফুটবলে কিন্তু এখনো পেশাদার প্রথা প্রবর্তন হয়নি। অ্যামেচারের কাঠামোর মধ্যেই আস্তে আস্তে প্রোফেশনালিজম ঢুকে গেছে বেআইনীভাবে। খেলোয়াড়রাও হয়ে উঠেছে বাজারের পণ্য। না হলে তাদের নিয়ে এমন কেনাবেচা হবে কেন? কেনই বা তাদের বাজারের পণ্যের মত ক্লাবের গোপন গুদামে লুকিয়ে রাখতে হবে?

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ছোট ছোট ক্লাবের অস্তিত্ব বজায় রাখা শক্ত। ফুটবলে যারা একটু ভালভাবে লাথি মারতে শিখেছে তাদের দামই যদি পাঁচ সাত হাজার টাকা হয় ছোট ক্লাবগুলি টিকবে কিভাবে? অ্যামেচার ফুটবলের মধ্যে এই ধরনের প্রোফেশনালিজম খেলার উন্নতিরও পরিপন্থী। অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খেলার উন্নতি হয় না। অগ্রগতি আটকে থাকে। আমাদের ফুটবল কর্তৃপক্ষ সেটা না বোঝেন, এমন নয়। কিন্তু তারা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে আছেন। কিন্তু আর কতদিন? আমাদের দেশেও ফুটবলে পুরোপুরি পেশাদার প্রথা প্রবর্তনের সময় এসেছে। এখন অ্যামেচারের ঠাট বজায় রাখার অর্থ দুর্নীতির প্রশ্রয় এবং খেলার অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া।

একলব্য

'ছেঁড়া তমসুক' (পরিচালনা : পূর্ণেন্দু পত্রী) ছবিতে রঞ্জিৎ মল্লিক, নিমু ভৌমিক, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল সেন

মতামতের মন্তাজ

বাংলা ছবি যে আজ আর ততটা আকর্ষণ করে না তার একটি কারণ নবাগতদের আগমন প্রায় বন্ধ, নতুন নতুন চেহারার অভাব। হিন্দীচিত্রে এখন একের পর এক নতুন শিল্পীর দেখা মিলছে। সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বড় স্টাররাও যেন হঠাৎ কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। বোমবাইয়ে এখন নতুনের রাজত্ব। ফিলম ইনডাসট্রিতে তার সুফলও দেখা যাচ্ছে। অন্তত সাময়িক ভাবেও স্টার সিসটেম-এর দাপট কমছে। নতুন শিল্পী যাঁরা আসছেন তাঁরাও অচিরেই হয়ত স্টার হয়ে যাচ্ছেন। তাতেও আশংকার কারণ নেই। নতুন শিল্পীরা একের পর এক আসছেন। স্টারের মোটা পারিশ্রমিকের কথা ভেবে প্রযোজককে এখন আর ততটা বিচলিত হতে হয় না। প্রয়োজন একটি সুশ্রী সুন্দর চেহারা তিনি পাবেনই। এবং নতুন যাঁরা অনবরত ছবিতে নামছেন অভিনয়েও তাঁদের দক্ষতা সন্দেহাতীত। অভিনয় শিখেই তাঁরা ফিলমে নামছেন। আধুনিক ফিলম-অভিনয়ই তাঁরা জানেন। ছবির পক্ষে সেটা আরও কল্যাণজনক।

* * *

পুণা ইনসটিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা বোমবাই-চিত্রের আকর্ষণ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিরাট অংকের দক্ষিণা দিয়েও দিয়েও তাঁদের ছবিতে নামাতে হয় না, অথচ অভিনয়ের গুণে ও চেহারার সৌন্দর্যে তাঁরা ছবিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। বাংলা চিত্রের দর্শককে বছরের পর বছর একই গ্ল্যামার দেখে তুষ্ট থাকতে হয়, ঘুরে-ফিরে একই চেহারা দেখতে হয়। ছবির আকর্ষণও তাই অনেকটা কমে আসে। বোমবাই সুফল পাচ্ছে পুণা ইনসটিটিউটের দৌলতে। কলকাতায় বা পূর্বাঞ্চলে এ-ধরনের কোন ফিলম ইনসটিটিউট নেই। ফিলম ইনসটিটিউটের প্রয়োজন সব চাইতে বেশি ছিল পূর্বাঞ্চলেই। এখানে সীরিয়স ধরনের ছবি হয়। বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। তাই এখানেই অভিনয়ে এবং ফিলমের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী ও কলাকুশলীর প্রয়োজন সর্বাধিক। যেহেতু পূর্বাঞ্চলে ইনসটিটিউট বা ইনসটিটিউটের ছেলে-মেয়ে নেই তাই এখানে জনপ্রিয় একজন বা দুজন শিল্পীর কথা ভেবেই গল্প নির্বাচন করতে হয়। ছবিতে গতানুগতিক নিয়মগুলিও ঘুরে ফিরে আসে। রুটিনমাফিক ছবিই বেশির ভাগ তৈরি করতে হয়।

* * *

ইনসটিটিউটের অভাবে বাংলা ছবির ক্ষতি হচ্ছে নানাভাবেই। ব্যবসার ক্ষতি, শিল্পের বা চারুকলার ক্ষতি। একজন আপসহীন পরিচালক হয়ত নতুন বলিষ্ঠ বিষয়ের ছবি করতে চান। অতি চেনা মুখ দিয়ে চরিত্রটিকে স্বাভাবিক বা বাস্তব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 'ফ্যামিলিয়র ফেস' এক্ষেত্রে সত্যিই ক্ষতিকারক। বড় পরিচালকেরা একারণেই নতুন শিল্পী খোঁজেন। তাঁরা জানেন যে চেহারা দর্শকদের শতরূপে শতকবার দেখানো দিয়ে চরিত্রপ্রতিষ্ঠা হয় না। চলচ্চিত্রকলার ক্ষতিসাধন এড়াবার জন্যই নতুন মুখের প্রতি চলচ্চিত্রকারদের পক্ষপাতিত্ব। এমনও দেখা গেছে, কোন বিশিষ্ট পরিচালক পছন্দমতো শিল্পী খুঁজে পাননি বলে বিশেষ ছবি তৈরির পরিকল্পনাই বন্ধ রেখেছেন। এভাবে বাংলা ছবির অপকার হচ্ছে অনেক। তা-ছাড়া নতুন শিল্পী খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ইনসটিটিউটে যাঁরা ভর্তি হবেন তাঁরা ফিলমেই নামবেন। কেউ আসবেন শিল্পকে ভালবেসে, কেউ জীবিকার জন্য। ইনসটিটিউট থাকলে পরিচালকদের শিল্পী আবিষ্কারের জন্য নাজেহাল হতে হয় না। ইনসটিটিউটের উপকারিতা যে কত বেশি তাও পুণা ইনসটিটিউট প্রমাণ করে দিয়েছে। পূর্বাঞ্চলে এমন একটি ইনসটিটিউট থাকলে আঞ্চলিক চিত্রের অশেষ উপকার হত। বাংলা ছবি বেঁচে যেত। রাজ্য সরকার বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাবার জন্য অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, অনেক টাকা খরচ করছেন। সরকার এবার একটি ইনসটিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা নিন। তাতে বাংলা ছবির সমূহ কল্যাণ হবে।

ছন্দপতন

(নবযুগ)

ছন্দপতন-এর মত কিছু দেবার হয়ত নেই, সেরকম কোন ভণিতাও নয় ছবিটির। ছন্দপতন-এর যা দেয়—কিছুক্ষণের জন্য নাট্যসুখ—তাই বোধ হয় দর্শকের বেশি কাম্য। ছবির সুসংবদ্ধ চিত্রনাট্যে (অমিয় মুখোপাধ্যায়-কৃত) বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের কিছু পরিচিত মুহূর্ত আছে—তার কোনটা হাসির, কোনটা দুঃখের। কাহিনীর (মূল রচনা : পুলক মজুমদার) প্রধান চরিত্র অবশ্য সতী যার চাপা কষ্ট নিয়েই মূল নাট্যাবেগ। মন্দিরাকে এই চরিত্রে মানিয়েছে চমৎকার, সব সময় সে অজানা দুঃখের বোঝা

'ছন্দপতন'/লিলি চক্রবর্তী: অনুভা ঘোষ, সমিত ভঞ্জ

বয়ে বেড়াচ্ছে। পিতার মৃত্যুর পর যে বাড়িতে সে আশ্রিতা সেখানকার ছোটখাটো ঘটনার মধ্যে বাস্তবতার পরিচয় আছে। মানুষের মহৎ মূল্যবোধগুলিকে এই ছবিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে সততা ও সরলতা আজকের দিনে লোপ পেতে বসেছে ছবিতে তা দেখতে পেয়ে দর্শকরা আরও খুশি হবেন। ছবিতে এই আদর্শবাদের মুখ্য প্রতিনিধি হলেন গ্রামের ডাক্তার (অসিতবরণ) এবং তার ভাই বিশু (অনিল চট্টোপাধ্যায়)। ওরাই তাদের শিক্ষকের কন্যা সতীকে আপন বোনের জায়গায় স্থান দিয়েছে।

চরিত্রের সংখ্যা ছবিতে খুব কম নয়। নাটকে অবশ্য কাউকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়নি। দুষ্ট চরিত্র অদ্বৈত (আনন্দ মুখার্জি) চিত্রনাট্যে প্রয়োজনের বেশি জায়গা নেয়নি। সতীর উপর অদ্বৈতের বলাৎকার হয়ত আকস্মিক, অদ্বৈতের হাতে বিশু খুন হয়েছে হঠাৎ। একটি ঘরোয়া জীবনের গল্পের ছন্দোপতনও বোধহয় এই-খানে। নাটকে যদিও তার দরকার ছিল। এই সব ঘটনার ভিত্তিতে দর্শকদের রোমাঞ্চের আস্বাদ হয়ত দেওয়া যেত। পরিচালক গুরুদাস বাগচি ও চিত্রনাট্যকার তার চাইতেও বড় কিছু দর্শকদের দিয়েছেন। ছবিতে দুটি মৃত্যু—সতীর বাবার ও বিশুর। এই দুই মৃত্যুকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটির দুবার যে-রকম পরিবেশে ব্যবহার করা হয়েছে তা দর্শক-দের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওই দুটি মুহূর্ত দর্শকদের স্তব্ধ করে রাখে। একই গান দুই পরিস্থিতিতে, গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন। ও'রা গেয়ে-ছেন অতি সুন্দর। সংগীতের একটি বিশেষ ভূমিকা ছবিতে আছে—যে কৃতিত্ব সংগীত পরিচালক শৈলেশ রায়ের প্রাপ্য। তাঁর দেওয়া অন্য গানের সুরও সুন্দর।

সতীকে ভালবেসে গ্রহণ করেছে রজত (সমিত ভঞ্জ)। রজতের চরিত্রটিও স্বভাবিক। চরিত্রে স্বাভাবিকতা এসেছে শিল্পীদের অভিনয়ের গুণে। অসিতবরণ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুভা ঘোষ (বাড়ির বড় বউ), লিলি চক্রবর্তী (ছোট বউ), সমিত ভঞ্জ—এ'রা সকলেই মনোজ্ঞ অভিনয় করে-ছেন। পাশের বড় চরিত্রগুলিতেও শিবানী বসু (ডাক্তারের বোন), অরিন্দম ও শর্মিলা (ডাক্তারের ছেলে-মেয়ে), জহর রায় (কমপা-উনডার) আনন্দ মুখার্জি প্রমুখ শিল্পীরা একটি নাটককে যথাসম্ভব উপভোগ্য করে তুলেছেন। সব কিছু মিলিয়ে ছন্দপতন সুখভোগ্য—প্রয়োগে বা গল্পের বিস্তারে ছন্দের পতন যদি কিছুটা ঘটেও থাকে তার জন্য দর্শক অখুশি হবেন না মোটেই। কারণ তাঁদের খুশি করার মতো অনেক বস্তুই ছবিতে রয়েছে।

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

কালীমাতা প্রোডাকশনস

বাংলা ছবির সেকাল-একাল একসঙ্গে দেখতে হলে "শ্রাবণ-সন্ধ্যা" দর্শনীয়। ছবিতে অহীন্দ্র চৌধুরীর বড় রোল। বেশ আবেগ-পূর্ণ তাঁর অভিনয়, যেমনটি তিনি করতেন আগের দিনের ছবিতে। আজকের দিনের দর্শকের কাছে এটা কম আকর্ষণ নয়। গল্পের ধরনটিও (মূল রচনা : গৌতম সরকার) সে-যুগের। শয়তানের কারসাজিতে রোমানটিক নায়ক-নায়িকার মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ। নায়কের বিলেত-গমন এবং প্রবাসী

"শ্রাবণ-সন্ধ্যা" / সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ

প্রেমিককে নায়িকার ভুল বোঝার অতীত নিয়মটি ছবিতে রাখা হয়েছে। বিরহী নায়ক অঙ্কনশিল্পী অমর (সুনীলকুমার) তখন মদ্যপান আরম্ভ করেছে, হাতে রিভলবার নিয়ে আত্মহত্যার জন্য উদ্যত। তখনই নায়িকা শীলা (সুচিত্রা সেন) নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছুটে এসেছে প্রেমাস্পদের কাছে। এই প্রেমকাহিনী অবশ্যই বিয়োগান্ত। ছবিটি ট্র্যাজেডি না হলেও পারত, তবে অতীতে একটি সময়ে বাংলা ছবিতে ট্র্যাজেডিরই প্রচলন ছিল বেশি।

শ্রাবণ-সন্ধ্যার অন্য প্রেমকাহিনী, যা একালের, মিলনান্ত। এই কাহিনীতে রাজীব-জুলি (সমিত ভঞ্জ ও সুমিত্রা মুখার্জি) সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির পর মিলিত। ছবির যে-অংশ ইদানীং তোলা হয়েছে তাতে একালের ছবির প্রায় সব লক্ষণই বিদ্যমান। ফিলমি গানের সুরও (নচিকেতা ঘোষ-কৃত) বর্তমান কালের। দুই যুগের মাঝখানে অনেকখানি সময় পার হয়ে গেছে। তাই গল্পটি তেমন জমাট বাঁধেনি হয়ত, অসঙ্গতিও কিছু রয়ে গেছে। একজন পাকা ভিলেনও (শেখর চট্টোপাধ্যায়) ছিল। কিন্তু সে প্রায় নিষ্ক্রিয়ই থেকে গেল। তবে ছবিতে যেখানে নাটকের ভাগ সেখানে উপভোগ্য অনেক বস্তুই দর্শকরা পাবেন। তা-ছাড়া শিল্পীরাও আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শ্রাবণ-সন্ধ্যা সুচিত্রা সেনের প্রথম অভিনীত ছবি। তাঁর প্রথম অভিনয় দেখাও এক আনন্দজনক অভিজ্ঞতা। ছবির দ্বিতীয় প্রেম-গল্পে সমিত ভঞ্জ ও সুমিত্রা মুখার্জি একালের ছেলে-মেয়ের মতোই অভিনয় করেছেন। স্বর্গত গঙ্গাপদ বসুর অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দেবে। অন্যান্যদের মধ্যে শংকর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, সন্তোষ সিংহ, সাধনা রায়চৌধুরী, উৎপল দত্ত বনানী চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা অভিনয়ের কুশলতায় নাট্য-কাহিনীকে যথাসম্ভব আকর্ষক করেছেন। ছবিতে স্বভাবতই চরিত্র অনেক। প্রেমোপাখ্যানও দুটি। তা-সত্ত্বেও পরিচালক বীরেশ্বর বসু যতখানি সম্ভব বাহুল্য বর্জন করে গোটা বিষয়টি বিন্যস্ত করেছেন। শ্রাবণ-সন্ধ্যায় দর্শকের মন কখনও বিষণ্ণ হয়, কখনও উৎফুল্ল থাকে।

বোম্বাই বিচিত্রা

হঠাৎ নতুন কেউ নাম করলে পুরনোরা কেন যেন চটপট প্রাচীন, প্রাক্তন হয়ে যায়। গতকাল অবধি যে নায়ক নারীচিত্তের চিদানন্দ হিসেবে রাজত্ব করেছিলেন, 'সিক্স টু সিক্সটির হার্ট থ্রব' ছিলেন, তিনি যখন হঠাৎ কোনো কুপ্রভাতে প্রৌঢ় হয়ে যান তখন পোক্ত ব্যবসায়ী প্রচণ্ড আহত হন, প্রতিষ্ঠিত আচার্যদের আচরণ পাল্টে যায়, বক্স অফিসের বিধাতারা বিব্রত হন, প্রচলিত প্রথা পরিবর্তনের পথ খোঁজে। এই পরিবর্তনের পথে হঠাৎ নতুন কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, আসর জাঁকিয়ে বসে, পুরনো রাজ্যে নতুন রাজারানীর আবির্ভাব ঘটে—কিন্তু রাজ্যের আইন কানুন সেই পুরোনো ঢঙেই চলতে থাকে, রাজা বদলায়, রানী বদলায়, পারিষদ বদলায়, কিন্তু প্রজা বদলায় না, আচার বদলায় কিন্তু অনাচার বদলায় না, পদ বদলায় কিন্তু বদ বদলায় না। আজকের নতুন মুখ আগামীকাল 'তারকা' হয়ে যায়; তারপর তারকার সুরে সুর মেলাতে মলাতে যখন তারকা তারকাসুর হয়ে যায় তখন আবার হয় তারকাসুর বধের আয়োজন। রাবণ যথার্থে বনবাস, লঙ্কাকাণ্ড, কিন্তু রামকে নিয়েও আরাম নেই, সৃষ্টিতে গর্ভযন্ত্রণা, ধ্বংসে মৃত্যুযন্ত্রণা—যাই করো যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা নেই।

ফিলিম লাইনে পর্দার পিছনে যাঁরা তাঁরা সাধারণত হঠাৎ বুড়িয়ে যান না; যাদের চেহারা নেই তাদের চর্চা কম, তাদের আয়ু বেশী। হঠাৎ বুড়িয়ে যাওয়া এক নায়ক বললেন, "এ সত্য আমি অনেকদিন আগেই উপলব্ধি করেছিলাম, তাই পর্দার নাচ শেষ হবার আগেই, বিফলতার আঁচ আঁচল পোড়াবার আগেই ক্যামেরার পেছন থেকে স্টার্ট আর কাট বলার অভ্যেস আরম্ভ করে দিয়েছি।" প্রায় বিগত তবু বেঁধেরাখা-যৌবন সম্পন্না নায়িকা বললেন, "আপনার তো বেশ সুবিধে, আমরা কি করব; গত বছরও আপনার কথায় তিন তিনটে নতুন নায়ককে রিফিউজ করেছি, আজ তারা সবাই নামকরা, আর আমার নাম শুনলেই বাঁকা হাসি হাসে, বলে, তাহলে ওকে নিয়েই করুন, আমরা নেই। প্রৌঢ় নায়ক বিজ্ঞের সুরে বললেন, "দেখ তোমরা মেয়েরা একটা কথা বোঝো না, সে কথাটা হলো 'রিয়্যালিটি', বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা পালটাতে হয়, বিবেক বদলাতে হয়; দেহ যখন দরিদ্র হয়ে যায় তখন অহংকারের অলংকার খুলে ফেলতে হয়, মনকে তখন মননশীল করতে হয়, সমাজ-সেবা, রাজনীতি, ধর্ম, এসব দিকে নজর দিতে হয়; এককালের 'কিক অ্যান্ড কিস্'-এর অভ্যাসকে 'বি কিক্‌ড অ্যান্ড কিসড্'-এ বদলাতে হয়, নইলে একজিট্-এর বদলে উবে যেতে হয়; জীবনের নাটমঞ্চে এন্ট্রিটা যেমন ইমপরটান্ট, একজিটটাও তাই—নিজে চেষ্টা করে যেমন এন্ট্রি—একজিটটাও তেমনি স্বেচ্ছাধীন হওয়া চাই, তুমি বেরিয়ে যাবার আগে দেখো তোমাকে কেউ বার করে দেয় না যেন।" একজিট উইংগে দাঁড়ানো নায়িকা মৃদু হাসলেন, বললেন, "এত জ্ঞান এমন হঠাৎ হলো কি করে? দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে আপনাকে দেখছি।!" প্রৌঢ় নায়ক হাসলেন, "জ্ঞানটা হলো, নিজের বিচার বুদ্ধির আয়নায় নিজেকে দেখে, আর এই জ্ঞানটা হবার পর থেকেই ভীষণ কষ্ট হচ্ছে —শুধু নিজের জন্য নয়—পুরো দেশটার জন্য—আজ প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমি অনন্তযৌবন হিট হিরো। ভাবছিলাম আমার মত এমন অপদার্থকে এতদিন ধরে এত লোক সইলো কি করে—তুমি ভাবতে পারবে না আমি কি নিদারুণ অসহ্য।" নির্গতা নায়িকা গম্ভীর হয়ে বললেন, "এমন করে সত্য কথা বলতে নেই, আমাদের দেশবাসীর সহন ক্ষমতা সত্যিই অসীম, তারা কি কেবল আমাকে আপনাকেই সহ্য করছে—ভাবুন তো কি সহ্য করছে না?"

সরল শর্মা

স্থানীয় সংবাদ
(শৌভনিক)

যদি আমায় কেউ প্রশ্ন করেন, হাল-ফিলের কোন্ নতুন নাট্যাভিনয় দেখার যোগ্য? আমি তাকে শৌভনিকের "স্থানীয় সংবাদ"ই (কাহিনী : শংকর) দেখতে বলব। কারণ, যে যে কারণে নাটক করা, তার সবগুলো স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ হয়তো নয়, অথবা নয় বলিষ্ঠ রেখায় অংকিত—এমন কি খুঁটিয়ে বিচার করলে সর্বঅংশের নির্ভুল রূপও হয়তো ধরা পড়বে না, কিন্তু আনন্দের কথা—এ নাটক অভিনয়ের সকল শর্তগুলিকে আলতো-ভাবে হলেও স্পর্শ করে গেছে ঠিক। এবং ওই স্পর্শের স্পন্দন আমি নিজেও হৃদয় দিয়ে অনুভব না করে পারি নি। বিচার যদিও ক্ষমাহীন, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্র যেহেতু 'মন' আর 'রস' প্রধান সেহেতু লক্ষ্য করেছি আবেগের 'বান' বা ভাললাগার 'বন্যা' ছোটখাট ত্রুটির কুটোকে কী অবহেলায় না ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে! আর শেষ কথা যে 'রস' তা যদি ঘনত্ব পায় তো ক্যানভাসের কোথায় তুলির টান হালকা হলো কি হলো না সে বিচার করার কি অবকাশ থাকে?

ধরা যাক সময়-সীমার কথাই। পৌণে দু ঘণ্টা এখানে মনে হবে যেন ঝড়ের বেগে পার হয়ে গেল। তার মানে কি নাটকে ছিল ক্ষিপ্র গতি? এই দুরন্ত গতি কিন্তু সব সময় আশীর্বাদের পবিত্রতা আনে না। অনেক সময় এই প্রচণ্ডতা মনকে বিভ্রান্ত করে। শৌভনিকের স্থানীয় সংবাদ-এর গতি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত যে-ভাবেই হোক না কেন মাঝে মাঝে পিছুটানে কিছু স্তিমিত হয়ে এসেছে, তাই বলা যায়, এখানে একটি সুন্দর ছন্দ সৃষ্ট। এই ছন্দোময় গতিবেগ নিশ্চয় প্রয়োগের প্রধান সম্পদ। আসা যাক কাহিনীর গ্রন্থিমোচন বা নাট্যরূপের অগ্রগতি ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি প্রসঙ্গে। এখানেও পরিচালক কৃষ্ণ কুণ্ডু এবং নাট্যরূপদাতা অসিত ঘোষ দৃষ্টান্ত-যোগ্য এক নজির তুলে ধরেছেন। একটি উপন্যাসের কাহিনীকে মঞ্চের ভাষায় রূপান্তরিত করা কঠিন। কারণ লেখা গল্প, বলা গল্প এবং দেখানো গল্প রচনার মধ্যে ফারাকটা আশমান-জমিনের। আলো আবহ দৃশ্য কথা ধ্বনি রূপসজ্জার মশলায় রান্না হবার কথা দৃশ্যকাব্য। সবটায় অবশ্যই থাকা দরকার পরিমিতিবোধ। স্থানীয় সংবাদে এই বোধ সকল অংশে যদিও যুক্তিনির্ভর নয়, তবু সব মিলিয়ে দারুণ একটা কিছু যেন হয়ে গেছে বিস্ময়করভাবে। ধরা যাক, গোল-টেবিল বৈঠকের কথাই। এই অংশ নাটকে কি এতই জরুরী! আমরা জানি সংলাপ নাটকের প্রাণ, কিন্তু কেবল সংলাপ কি

'স্থানীয় সংবাদ'/নিমু ভৌমিক, কাজল মুখার্জি

নাটক? এবং একথাও তো ঠিক, যা—নাটক নয়, তা রঙের বন্যায় ডুবে গেলেও ক্লান্তির কাঠিন্য নিয়ে সর্বদা বিশিষ্ট হয়ে থাকতে চায় সেই বস্তুটি। এই অংশটি যদি না থাকে তবে সুপ্রকাশ চরিত্রের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে মনে হতে পারে কি? বোধ হয় নয়। এইটুকু অঙ্গচ্যুত হলে স্থানীয় সংবাদ আরও বুঝি সুঠাম হতে পারত। অবশ্য নাটকে সমসাময়িক কালের যে পরিচয় আছে তা ভুল করবার নয়। পরিচালকের বাস্তববোধও লক্ষণীয়। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানীয় সংবাদ পাঠ (তাঁর কণ্ঠস্বরের আকর্ষণের আলাদা উল্লেখের প্রয়োজন নেই) নাটকটিতে রিয়ালিটির বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। নাটকে অসঙ্গতিও কিছু আছে। ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে যে বাবাকে খুন করাতে পারে সে কি অন্যের কাছ থেকে বাকি টাকা নেবার কথা গুণ্ডাকে বলবে? এত কাঁচা কাজ? তা-ছাড়া বাবাকে খুন করার ব্যাপারটাও কেমন যেন অবিশ্বাস্য।

সুচিন্তিত, সুরচিত নাট্যরূপের সঙ্গে আবহ কাজ করে গেছে ম্যাজিকের মতন। যেখানে যতটুকু চাই ঠিক ততটুকু সংগীত প্রেশ, ছন্দ ও সুর সংমিশ্রিত (সংগীত পরিচালনা : ভাস্কর মিত্র)। সুমিত্রা সেনের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীত এবং অতুলপ্রসাদের গান নাটকে এনেছে আশ্চর্য এক মাধুর্য এবং মাত্রা।

নাট্যাভিনয়ের আসল তুলির নাম অভিনয় অর্থাৎ অ্যাকটিং। কি গ্রুপ কি ইনডিভিজুয়াল উভয় অংশই এখানে সপ্রাণ। নাট্যাভিনয় দেখতে বসে মনে হয়েছে, যে-সংলাপের টান মানুষ অর্থাৎ চরিত্র সৃষ্টি করে সেই সংলাপই সর্বৎ রচিত। এবং ওই সম্পদ নিয়েই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে পনেরোটি চরিত্র। এদের মধ্যে অবশ্য প্রধান তিনজন। হরবিলাস কাঞ্জিলাল, সুপ্রকাশ আর মাধুরী। তিনের দ্বন্দ্বভাগই প্রায় সমান। যে হরবিলাস রিফ্যুজি মাধুরীকে একদা আশ্রয় দিয়ে, স্নেহ দিয়ে বড় করে তুলেছিল, ওই দুর্বলতা ভালবাসায় রূপান্তরিত হওয়াতে তার দ্বন্দ্ব। ভালবাসা বুঝি পরিণতি চায়। হরবিলাসও অবশেষে তাই চেয়ে নিজের ছেলের হাতে মৃত্যুর শাস্তি নিল। মাধুরী আশ্রয়দাতাকে মন দিয়েছিল নিজের অজ্ঞান্তেই। নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার নামে এই প্রেমের অভ্যুদয়। সে কারণে যখন সে জানল যে আইনসংগতভাবে সে হরবিলাসের ঘরনী হতে চলেছে, তখন চাপা আবেগ তির তির করে তাঁর চক্ষে, ওষ্ঠে, গণ্ডে কম্পন তোলে কেবল। সে জানে না, কী সে করবে—এই তার দ্বন্দ্ব। এবং সুপ্রকাশ বিলেত থেকে যশস্বী হয়ে ফিরে আসার পরও দেখি সংস্কারকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। তার মানে কি রক্ত তার সংস্কারের সম্পর্কে খুব কাছের? এই তিন দ্বন্দ্ব গোটা নাটকে অসম্ভব উপভোগ্যতা এনেছে।

হরবিলাস এবং সুপ্রকাশকে সমান গুরুত্ব দেব? বলা কঠিন। কোথাও মনে হয়েছে হরবিলাস এত সংযমী, এত শিল্প-বোধসঞ্জাত সৃষ্টি যে তার বুঝি কোনো তুলনা নেই। কোথাও ওই ভাবমূর্তি ধুলিসাৎ করে এগিয়ে এসেছে সুপ্রকাশ। 'দিদি, তুই কী রে.........!' বলে সুপ্রকাশ যখন মাধুরীর কাছ থেকে পা পা করে সরে যায়, মনে হয় এ-কথা নয়, সংলাপ সংগীত। এমনি হাজারো বহুমূল্য রত্নাভরণে স্থানীয় সংবাদ সজ্জিত। চরিত্র তিনটির স্রষ্টা যথাক্রমে গোপেন মুখার্জি, নিমু ভৌমিক আর কাজল মুখার্জি। কাজলের অভিনয়ে দরদ আছে সীমাহীন কিন্তু অভিব্যক্তির দৈন্য তাকে সম্পদে পর্যবসিত করে না। অসিত ঘোষের উদয়ন, সুধাংশু মণ্ডলের অমলেন্দু, ননী দাসের নকুল, চমৎকার। ঘোষাল চরিত্রটি এখানে রিলিফের কাজ করেছে। এবং প্রদীপ ভট্টাচার্য সত্যি রুদ্ধশ্বাসী নাটকের ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের সত্যিকারের রিলিফ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কমিক অভিনয়ে খ্যাতনামা ফিলম অভিনেতার এত প্রভাব কেন? অলকা বসুর মণিমালা'কে কিছু কমজোরী মনে হবে। কাহিলও। মানুষের মনোকষ্ট সব সময় তাকে রোগীতে পরিণত করে কি? শিবু মজুমদার, চিনু দাস, বীরেশ্বর মিত্র, গোপাল মুখার্জি, বিমলেন্দু মজুমদার অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্র-ব-জ

অরণ্যদেব

লী ফক

গভীর অরণ্যে জীবনযাত্রায় মতানৈক্য—
আমি ওদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চাই; জঙ্গলে গাঁজাখুরি গল্প শুনিয়ে তুমি ওদের মাথা খেও না বুড়ো।
গাঁজাখুরি? দু'কলম লিখতে শিখে খুব মাতব্বর হয়েছ দেখছি।

এইবার মানে-মানে সরে না পড়লে তোমার কপালে বিপদ আছে বাছা।

গভীর অরণ্যে।
মজুবুড়ো, তুমি কিন্তু গল্পটা বলছ না।
আগে ও বেটি কেটে পড়ুক।
টম, রাজা, এগুলো কিন্তু সত্যি নয়, রূপকথা!

অনেক অনেক দিন আগে অরণ্যদেব...না, তাঁর বাবা...না না, তাঁর ঠাকুর্দা...
আরে সে যেই হোক, তুমি গল্পটা বল তো!

'জঙ্গলের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন অরণ্যদেব... হঠাৎ একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল।'
বাঁচাও-বাঁচাও

'অরণ্যদেব অবাক হয়ে দেখলেন কি-একটা বাঘ এক ক্ষুদে মানুষকে কামড়ে ধরেছে।'
বাঁচাও

'একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই গুলিতে ক্ষুদে মানুষটি মারা পড়তে পারত... অরণ্যদেবের লক্ষ্য ছিল নির্ভুল।'

তবু দাঁতের কামড়ে ক্ষুদে মানুষটি আহত হয়েছিল...অরণ্যদেব তাকে সুস্থ করে তুললেন।
সত্যিকারের ক্ষুদে মানুষ! কী হল তারপর?!
8/24
৪

দেশী সংবাদ

২৯ জানুয়ারি—বাড়িতে ব্যবহার্য বিদ্যুতের দাম সব স্তরেই বাড়ছে। তবে নিম্ন-আয়ের ব্যক্তিরা যাদের বিদ্যুৎ হার কম ওঠে, তাঁদের ক্ষেত্রে যাতে ওই মূল্যবৃদ্ধির হার খুব বেশি না হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার জন্য একটা মাত্রাভিত্তিক মূল্যহার চালু করার পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুতের এই বর্ধিত মূল্য খুব সম্ভব আগামী ১ এপ্রিল থেকে চালু করা হবে। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপলাই করপোরেশন ওই জন্য আইন অনুযায়ী দেয় দু মাসের নোটিশ ১ ফেব্রুয়ারি থেকে জারি করবেন বলে স্থির হয়েছে।

কলকাতার মেডিক্যাল কলেজগুলির কিছু নামী ডাক্তারকে সম্প্রতি সরকার বদলি করায় 'বিরক্ত' ডাক্তারেরা হাউস স্টাফদের উসকানি দিচ্ছেন বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা আজ সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন। তাঁর মতে, হাউস স্টাফদের অভিযোগগুলি অসত্য।

৩০ জানুয়ারি—নেতাজীর মৃত্যু ঘটেছে—জাপান সরকারের এই ঘোষণা যে সত্য নয়, তার বড় প্রমাণ হল, ১৯৪৫ সালের সেপটেম্বরে নেতাজীকে গ্রেফতার করার জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের একটি দলকে দূর প্রাচ্যে পাঠান হয়েছিল। এ কথা বলেছেন নেতাজী তদন্ত কমিশনের সঙ্গে সাহায্যকারী জাতীয় কমিটির কৌঁসুলী শ্রীগোবিন্দ মুখোটি। তিনি প্রশ্ন করেন, দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটেছে বলে সরকার যদি স্থিরনিশ্চিতই ছিলেন, তাহলে কেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ শ্রী ডেভিসের নেতৃত্বে অফিসারদের একটি দলকে দূরপ্রাচ্যে পাঠালেন?

দেশের প্রথম বিদ্যুৎচালিত সাইকেল রিকশা আজ নয়াদিল্লিতে আত্মপ্রকাশ করল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের লনে। এই রিকশার নকশা করেন দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট। তৈরি করেছেন স্কুটারস ইনডিয়া লিমিটেড। তিন চাকার রিকশাটি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীমতী গান্ধীকে উপহার দেওয়া হয়।

৩১ জানুয়ারি—কলকাতা পুরসভা এলাকায় পার্কগুলি সংস্কার ও সজ্জিত করার জন্য রাজ্য সরকার প্রায় ৯ লাখ টাকার এক পরিকল্পনা নিয়েছেন। আজ পূর্ত দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাকরণে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়ে বলেন যে, প্রতিটি পার্কের জন্য রাজ্য সরকার ৫ হাজার টাকা হিসাবে খরচ করবেন। পুরসভা এলাকায় ছোট-বড় মিলিয়ে মোট পার্কের সংখ্যা ১৮০। শীঘ্রই পার্ক সাজানোর কাজ শুরু হবে বলে তিনি জানান।

কেরলের রাজ্যপাল শ্রী এন এন ওয়াচু আজ সন্ধ্যায় বিধানসভা ভবনে বিরোধী দলের সদস্যদের দ্বারা ঘেরাও হয়েছিলেন। শ্রী ওয়াচু বিধানসভার অধিবেশনে ভাষণ দিতে আসার সময় এই ঘটনা ঘটে। ঘেরাও করেছিলেন সি পি এম, সমাজতন্ত্রী দল ও কে টি পি'র সদস্যরা। তাঁরা চিৎকার করে বলতে থাকেন, যে রাজ্যপাল জনসাধারণকে চাল দিতে পারেন না, তাঁর বক্তৃতা আমরা শুনতে রাজি নই।

১ ফেব্রুয়ারি—জীবন বীমা ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ধর্মঘটীদের মাইনে দেবেন না। শিল্পে সাধারণ ধর্মঘট উপলক্ষে ৩১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার যেসব কর্মী অফিসে হাজিরা দেননি, উপযুক্ত কারণ দেখাতে না পারলে তাঁদের একদিনের বেতন কাটা হবে।

শুক্রবার থেকে পূর্ব রেলের সমস্ত ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণী পুরোপুরি উঠে গেল। এখন থেকে এই রেলপথে কোন ট্রেনেই আর দ্বিতীয় শ্রেণী থাকবে না। এদিন হাওড়া স্টেশন সহ সব কাউন্টার থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত অবিক্রীত টিকিট তুলে নেওয়া হল।

২ ফেব্রুয়ারি—সরকার আজ নয়াদিল্লির ধর্মঘটী ডাক্তারদের ওপর মোক্ষম আঘাত হেনেছেন। চরমপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই রাজধানীর পাঁচটি হাসপাতালের ২৬ জন রেজিসট্রার ও ৮ জন হাউস সারজনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বণ্ডের টাকা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের ডেয়ারি ডেভেলপমেনট বিভাগ অভ্যন্তরীণ দুধ সংগ্রহ বাড়াবার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সপ্তাহে দেড় দিন সব মিষ্টির দোকান বন্ধ রাখার ও দুধের সংগ্রহ মূল্য বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছেন। সরকার ওই প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখছেন।

৩ ফেব্রুয়ারি — চলতি বছরের পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ব রেলপথে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা পুরোপুরিভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ আমলে সারা ভারতে সমস্ত রেলপথেও মোট চারটি শ্রেণী ছিল — প্রথম, দ্বিতীয়, ইন্টার ও তৃতীয় শ্রেণী। রেল কর্তৃপক্ষের আসল লক্ষ্য সমস্ত রেলপথের তৃতীয় শ্রেণীকেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোরচার সহনেতার পদ ত্যাগ এবং এ ব্যাপারে সি পি আই-এর রাজ্য পরিষদের সিদ্ধান্তকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি বিস্ময়কর এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র আশা করেন সি পি আই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন।

বিদেশী সংবাদ

২৯ জানুয়ারি—লস এনজেলেস-এর সুপিরিয়র কোর্টের একজন বিচারপতি আজ এক ঐতিহাসিক নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশে প্রেসিডেনট নিকসনকে এলারিচম্যানের মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে। এলারিচম্যান প্রেসিডেনট নিকসনের স্বরাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।

৩০ জানুয়ারি—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন বলে ঢাকার পররাষ্ট্র অফিসের সূত্রে জানা যায়। তিনি শ্রীসুবিমল দত্তের স্থলাভিষিক্ত হবেন। তিনি শীঘ্রই তাঁর কর্মভার নেবেন বলে জানা যায়।

৩১ জানুয়ারি—একটি ব্রিটিশ বন্দীশালার এক ইহুদী বন্দী ৮০০ দিন ধরে অনশন করছেন। তাঁকে অবশ্য জোর করে নলের সাহায্যে খাওয়ান হচ্ছে। এঁর দাবি ছিল তাঁকে ইহুদীদের ধর্ম অনুযায়ী বিশেষভাবে তৈরি খাদ্য দিতে হবে। ইনি এখন সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধে ১৫ বছরের মেয়াদে জেলে রয়েছেন।

২ ফেব্রুয়ারি—কাল ওয়াশিংটনে একটি অনুষ্ঠানে বিখ্যাত পারসিক মনীষী আল্ বেরুনী এবং কবি মৌলানা রুমির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। অনুষ্ঠানে ভারত, ইরান এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলেন।

৩ ফেব্রুয়ারি—গতকাল পাকিস্তান বিমান বাহিনীর চরজন অফিসারকে পাঁচ থেকে চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অপরাধ : রাষ্ট্রদ্রোহিতা। প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সরকারকে উচ্ছেদের জন্য তাঁরা ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাঁদের চারজনকে চাকরি থেকেও বরখাস্ত করা হয়েছে।

৩ ফেব্রুয়ারি—গত শুক্রবার ঢাকার ৬৪ কিলোমিটার দূরে মানিকগঞ্জের কাছে পদ্মানদীর উপর সশস্ত্র জলদস্যুরা ১১টি মোটরলঞ্চের উপর চড়াও হয়। লঞ্চগুলিতে প্রায় ৩ হাজার যাত্রী ছিলেন। ডাকাতেরা তাঁদের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং প্রচুর গয়না লুঠ করে নেয়।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
দাম : ৬০ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাসুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
শ্রীপবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীঅধীপ সরকার কর্তৃক
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক —৩৫·৭০ টাকা
ষান্মাসিক—১৮·২০ „
ত্রৈমাসিক — ৯·২০ „

বিমান ডাকে
বার্ষিক —৮৬·৭০ টাকা
ষান্মাসিক—৪৪·২০ „
ত্রৈমাসিক —২২·১০ „

বিদেশে—
জাহাজ ডাকে—
বার্ষিক —৫৪·৬৫ টাকা
ষান্মাসিক—২৯·৯০ „

আমাদের লনডন অফিস মারফৎ
বার্ষিক —১৭৮·০০ টাকা
ষান্মাসিক— ৮৭·০০ „
ত্রৈমাসিক — ৪৪·০০ „

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়

ওঁরা কি তা যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছেন ?

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। অবসাদ, সর্দি, ক্ষুধালোপ, স্বাস্থ্যহানি, চর্মরোগ ও দাঁতের যন্ত্রণা—এসব সাধারণতঃ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব থেকেই ঘটে।

তবু ও ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সম্পর্কে প্রায়ই শৈথিল্য দেখা দেয়, এমনকি বহু যত্নের সঙ্গে পরিকল্পিত আহার্য্যেও। সব পুষ্টিকর খাদ্যই সুসমন্বিত খাদ্য নয় এবং বহু প্রকারের আহার্য্যের মধ্যেই ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের ঘাটতি থাকতে পারে। তাহলে আপনি কেমন করে নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনার পরিবারের সবাই একান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ঠিকমত এবং ঠিক-ঠিক অনুপাতে পাচ্ছেন ?

আপনার পরিবারের প্রত্যেকেই যাতে তাঁদের প্রয়োজনের অনুপাতে এইসব একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টিকারক পদার্থ নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন, সেইজন্তেই ওঁদের খেতে দিন **ভিমগ্র্যান**—স্কুইবের বিবিধ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থযুক্ত বড়ি—প্রতিদিন একটি ক'রে। এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসটি আজ থেকেই সুরু ক'রে দিন না কেন ?

ভিমগ্র্যানে এগারটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও আটটি খনিজ পদার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। লাল রক্ত কোষ গড়ে তোলবার জন্ত এ শক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবার জন্য **লৌহ**—হাড় ও দাঁত শক্ত রাখবার জন্ত **ক্যালসিয়াম**—সর্দি প্রতিরোধ করবার ক্ষমতার জন্ত **ভিটামিন সি**—ভাল দৃষ্টিশক্তি ও সুস্থ চর্মের জন্ত **ভিটামিন এ**—ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বলসঞ্চারের জন্ত **ভিটামিন বি ১২**—এছাড়াও আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় অন্যান্ত পুষ্টিকারক পদার্থ আছে।

ভিমগ্র্যান®

অপরিহার্য ভিটামিন ও খনিজপদার্থযুক্ত বড়ি

১১টি ভিটামিন এবং ৮টি খনিজ পদার্থসহ

মাত্র একটি ভিমগ্র্যান আপনাকে সারাদিন কর্মক্ষম রাখে

® ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিনিধি করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড।

® SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS

Shilpi HPMA-23A/73 Ben

REGD. NO.— WB|CC—184
DESH WEEKLY, 16th February, 1974

ভাল টুথপেস্ট করে আধা কাজ।

ভীটা টুথব্রাশ সে কাজ করে সম্পূর্ণ!

সাধারণত অনেকে মনে করেন মুখ পরিষ্কার রাখার জন্যে ভাল টুথপেস্ট হলেই যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্যি নয়। কারণ, দাঁতের হলদে ছোপ আর ছাতা দূর করার সাথে সাথে অল্প সময়ের জন্যে এবং কতক অংশে মুখের রোগজীবাণু বিনাশ করা ছাড়া কোন টুথপেস্ট আর কিছু করে বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। মুখের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য হাতিয়ার ভাল টুথব্রাশ। টুথব্রাশই আপনার দাঁতের ফোকরের মধ্যে খাবারের সব টুকরো বার ক'রে দিয়ে রোগজীবাণু জন্মাতে দেয় না আর দাঁত ঘষার সময় মালিশ ক'রে মাড়িকে সুস্থসবল রাখে।

নরম বা শক্ত মাড়ি, কি টনটন করছে, ছাতা পড়েছে, ফাঁক-ফাঁক, বাঁকা, কিম্বা একটার ওপর আরেকটা...আপনার যে ধরনের দাঁতই হোক 'না কেন তার জন্যে আজই ব্যবহার করতে শুরু করুন ভাল টুথব্রাশ—ভীটা। আপনার দাঁত মাজার সুবিধার জন্যে ভীটা কোম্পানী নানান ধরনের টুথব্রাশ বানিয়েছে। ভীটা টুথব্রাশের 'ভীটাটোন' কুঁচিগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষিত আর আজ ২৩ বছর ধরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
এবার টুথব্রাশ কেনার সময় বেছে নিন আপনার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী ভীটা টুথব্রাশ।
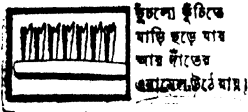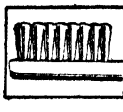
ছুঁচলো কুঁচিতে মাড়ি ছড়ে যায় আর দাঁতের এনামেল উঠে যায়।

ভীটা জুনিয়ার: বাচ্চাদের মুখের জন্যে—শুধু সাইজেই নয়, সযত্নে বিশেষভাবে তৈরী।

ভীটা গোল্ড: এনামেল না উঠিয়ে বা মাড়ি না ছড়ে সুখে মুখ জোরে পরিষ্কার করার জন্যে।
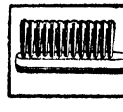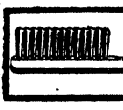
ভীটা টুথব্রাশের কুঁচির গোল ডগা আপনার দাঁত আগাপাছতলা পরিষ্কার করে—রেশমের মত নরমভাবে।

ভীটা কন্টিনেন্টাল: এই ঘন গোছার টুথব্রাশ দাঁত ঘষে ঝকঝকে করার আর মাড়ি মালিশ করার পক্ষে আদর্শ।

ভীটা ডীপ-ক্লীন: সরু মুখে দাঁতের ফোকরের ভেতর অবধি পৌঁছবার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী।

সব ধরনের দাঁতের জন্যে রকমারি টুথব্রাশ

টুথব্রাশ

ভীটা ব্রাশ কোম্পানী, বম্বে-৪০০০১১

AIYARS-VT I BN

সূচীপত্র

শেভার স্যুইশের
বহুলোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি…
শিগগিরই কিছু করা চাই :
আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠলো যাত্রীরা—
দুম!
স্যুইশ দিয়ে যে দাড়ি কামায়—তাকে কেউ হারাতে পারে না!
তুমি বাঁচালে
mcm/ci/25a ben

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৯
শনিবার ২৫ ফাল্গুন ১৩৮০

কাগজ ও পুস্তক প্রকাশের সমস্যা

প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের মতন কাগজও এখন দুষ্প্রাপ্য, তার বাজার-দর বা কালোবাজারি-দর প্রায় দ্বিগুণ, কখনও কখনও তারও বেশী। এই অবস্থাটা একেবারে আচমকা ঘটেনি। গত এক বছর ধরেই কাগজের টানাটানির কথা শোনা যাচ্ছিল. কিন্তু পুজোর সময় থেকেই রাতারাতি দর চড়তে লাগল. স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির নিয়ম মেনে নয়, একেবারে অস্বাভাবিক, অযৌক্তিকভাবে। তখন শোনা যেত, সামনে স্কুল সেসান, নতুন নতুন বই ছাপার কাজ চলছে, বাজারে কাগজের তাই এত ঘাটতি। কথাটা তখনকার অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না; বোধ হয় ওই যুক্তিটা ঠিকও নয়। পশ্চিম বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার যাঁরা খোঁজ রাখেন তাঁরা জানেন, এ বছরের স্কুলের শিক্ষা মরসুমে পাঠ্য-বই নিয়ে যে ধরনের অরাজকতা চলেছে তেমন অরাজকতা আর দেখা যায়নি। প্রকাশকরা প্রয়োজন মতন বই ছাপতে পারছেন না. বইয়ের দোকানে বই আসছে না. ছেলেমেয়েরা নিত্য ধরনা দিচ্ছে দোকানে, বই পাবে কিনা তারও ভরসা নেই। দু দুটো মাস চলে যাবার পরও নতুন সিলেবাস অনুযায়ী রচিত সপ্তম এবং নবম শ্রেণীর পাঠ্য বই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যাচ্ছে না। এটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য। শুধু সাধারণ প্রকাশক কেন, ডি পি আই কিংবা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যেসব পাঠ্য বই প্রকাশ এবং সরবরাহের দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন তাঁরাও কোনো বই ছেপে উঠতে পারছেন না। এই ধরনের বইয়ের সংখ্যা কম নয়। সাধারণ প্রকাশক, সরকার এবং বোর্ড সকলেই যদি কাগজের অভাবের কথা বলেন তাহলে বলতে হয়, স্কুলের বই ছাপার জন্যে কাগজের ঘাটতি চলেছে—এটা ঠিক কথা নয়।

স্কুলের বইয়ের প্রসঙ্গই প্রথমে ধরা যাক। নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার পর তার সিলেবাস অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতেই শিক্ষা পর্ষদের বছর প্রায় শেষ হয়ে গেল। প্রকাশকরা সময়াভাব এবং কাগজের সমস্যার ধুয়ো তুললেন। কিন্তু বাড়তি সময় নিয়েও এতোদিনে যখন প্রয়োজনীয় বই বাজারে সরবরাহ করা যাচ্ছে না তখন অধিকাংশ প্রকাশকই কাগজের অভাব এবং অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির কথা বলছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে পর্ষদের হাতে নেওয়া পাঠ্য বইগুলির কথা তুলছেন। এই যদি অবস্থা হয় তবে এ-বছরের শিক্ষা মরসুমের মতন শোচনীয় অবস্থা আর কখনও দেখা যায় নি। ছুটিছাটা বাদ দিয়ে সাত আট মাসের যে স্কুল-সেসন তারও দু দুটো মাস কেটে গেল, আরও ক' মাস যাব কে জানে!

কাগজের এমন অভাব ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। মিলের উৎপাদন কমেছে বলে শোনা যায় নি; বরং মিল সমস্ত রকম কাগজের দাম ইতিমধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই দামের ওপর অনেক বেশী দাম দিয়ে বাজারে কাগজ কিনতে হয়। আমাদের কাগজের চাহিদা রাতারাতি বেড়ে গেছে এটা ঠিক নয়; উৎপাদনও অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে তাও নয়। উৎপাদন এবং চাহিদার মধ্যে যথারীতি মজুত এবং কালোবাজারির খেলা চলছে। ফলে আজকের এই অবস্থা। যে কোনো ধরনের কাগজ ইদানীং কী পরিমাণে কালো দামে বিকী হচ্ছে আশা করি তা ক্রেতারা জানেন।

কাগজের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অভাব আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার জন্যে কারও বোধ হয় মাথা ঘামানোর গরজ নেই। অন্ততঃ এমন চেষ্টা হয় নি যাতে পাঠ্য পুস্তক ছাপার জন্যে প্রকাশকদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ দেবার ব্যবস্থা করা যায়। প্রকাশকদের প্রতিষ্ঠান থেকে নাকি কাগজের মিলের কাছে এই ধরনের একটা সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। যদি সে রকম কোনো সাহায্য চাওয়া হয়েও থাকে তার ফলাফল কী হয়েছে, ক'জন প্রকাশক তার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন আমাদের জানা নেই।

পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য পুস্তক প্রকাশ আমাদের পুস্তক ব্যবসার একটা বড় অংশ। ছোট, মাঝারি, বড় নানা রকম পুস্তক প্রকাশক এখানে আছেন। এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থেকে অনেকেই রুজি রোজগার করে থাকেন। সেই ব্যবসার অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে চলেছে। বাংলা বইয়ের সাধারণ বাজার খুবই সীমিত, সেই সীমিত অবস্থার মধ্যেও যদি কাগজের অভাব এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্যে বই ছাপা আরও কমে আসতে থাকে তবে তার চাপ পুস্তক ব্যবসাকে অচল করে ফেলবে; ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের যে আর্থিক দুরবস্থায় পড়তে হবে তা কিন্তু সামান্য নয়। ইতিমধ্যেই ছোট ব্যবসায়ীরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। কিছু কিছু কর্মী তাঁদের রুজি রোজগারের অবলম্বনটিকে চলে যায় এই ভয়ে ভীত। মাঝারি এবং বড় প্রকাশকরাও এখন দামী বই ছাপার সংখ্যা কমাচ্ছেন, বইয়ের দাম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন এবং বিক্রী সম্বন্ধেও কোনো ভরসা পাচ্ছেন না।

এই অবস্থা চলতে থাকলে বাংলা পুস্তক ব্যবসা কী অবস্থায় গিয়ে পড়বে এখনই তা বলা যায় না। তবে পুস্তক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট যেসব ব্যবসা রয়েছে তারও দুর্দশা ঘটবে। ভুলে গেলে চলবে না এই ব্যবসাকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার মানুষের পেট চলে।

কাগজের অভাব এবং মূল্য-বৃদ্ধির সমস্যাটিকে লঘু করে দেখার কোনো কারণ নেই। সরকারের উচিত, এই সমস্যাটিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সর্বাগ্রে দেখা দরকার চাহিদা কেন মেটানো যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন কম হচ্ছে কি না—[illegible] বা কম হচ্ছে। মিলের কাগজ কোথায় যাচ্ছে যেটা বা [illegible] চার পাঁচ মাসের মধ্যে মূল্য দ্বিগুণ হয়ে গেল। কাগজে [illegible] এবং কালোবাজারি এখনো যে অবাধে [illegible] ছেড়ে দিলে [illegible] সরকারের [illegible] বন্ধ হবে এমন আশা আমরা করি না, কিন্তু কোনো একটা ব্যবস্থা [illegible] যাতে পুস্তক প্রকাশকরা [illegible] মূল্যে [illegible] মতন কাগজ সংগ্রহ করতে পারেন।

হাঙরের লড়াই
ভারত মহাসাগর
সোভিয়েট রাশিয়া
যুক্তরাষ্ট্র

দেবরাজ

বিদায় গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের ঠাট আর অসামরিক প্রশাসনের পাট বর্মা তুলে দিয়েছে একযুগ আগে। ইংরেজদের কবল থেকে মুক্তি-পাওয়া দেশগুলোর মধ্যে সেই প্রথম কমনওয়েলথের মায়া কাটিয়ে পুরোপুরি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায়। গণতন্ত্রী ধাঁচেই তার সংবিধান তৈরি হয়েছিল। দেশ শাসনের ব্যবস্থাও হয়েছিল আরও পাঁচটা গণতন্ত্রী দেশের কায়দায়। সঙ্গে সঙ্গে শান্তি অবশ্য দেশে আসেনি। স্বাধীন বর্মার গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হয়নি কম্যুনিস্টরা। তাদেরও অনেকগুলো উপদল। তারা প্রায় সবাই সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল—চেষ্টা করেছিল সরকারকে উচ্ছেদ করতে—যদিও এককাট্টা হয়ে বিদ্রোহ তারা করেনি। সরকারকে তারা বিব্রত করে তুললেও তাকে হটিয়ে লাল জমানার পত্তন করতে পারেনি। কম্যুনিস্টরা তাদের মতলব হাসিল করতে না পারলেও গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা কিন্তু বর্মায় টিকলো না। সব ভণ্ডুল করে দিলেন জেনারেল নে উইন আচমকা ক্ষমতা দখল করে ১৯৬২ সনে।

জেনারেল নে উইন গদিতে বসেই বাতিল করে দিলেন বর্মার গণতন্ত্রী সংবিধান। সেটা অবশ্য মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ফৌজীতন্ত্র আর গণতন্ত্র তো আর একসঙ্গে চলতে পারে না। গণতন্ত্রী হুঁকোর সঙ্গে ফৌজীতন্ত্রের তামাক খাবার চেষ্টা কেউ যে করেননি তা নয়। কিন্তু জেনারেল নে উইন অন্য ধাতের মানুষ। দেশের লোককে ধাঁওতা না দিয়ে তিনি সোজাসুজি নির্ভেজাল ফৌজীতন্ত্রই চালু করলেন। তাঁর নতুন ব্যবস্থা সবাই অবশ্য বিনা আপত্তিতে মেনে নেয়নি। কী কম্যুনিস্টরা কী গণতন্ত্রীরা কেউই জেনারেল নে উইনের সঙ্গে হাত মেলায়নি। কম্যুনিস্টদের বিদ্রোহ আজও থামেনি—তারা আজও লড়ে যাচ্ছে, একেবারে খতম না হওয়া পর্যন্ত লড়েও যাবে। গণতন্ত্রীরা যদিও বিদ্রোহের ধ্বজা ওড়ায়নি রণেভঙ্গ তারাও দেয়নি। জেনারেল নে উইন ক্ষমতা কব্জা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী উ নুকে হটিয়ে। ফৌজী জমানার গোড়ায় তাঁকে বন্দী করা হলেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উ নু এখন বিদেশে। দেশের বাইরে থেকেই তিনি চেষ্টা চালিয়েছেন জেনারেল নে উইনকে গদিছাড়া করতে।

সে চেষ্টা কিন্তু সফল হয়নি, হবে যে তার কোনও লক্ষণ নেই। দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছেন রেঙ্গুনে জেনারেল নে উইন। বারো বছর তিনি একটানা বর্মা শাসন করছেন তাঁর ফৌজী সাকরেদদের নিয়ে। সে বড় কড়া শাসন। কম্যুনিস্ট দেশের বাইরে, এত কড়াকড়ি কোনও দেশেই নেই। তার আশেপাশের দেশের সঙ্গেও বর্মার সম্বন্ধ এখন নামমাত্র। কূটনৈতিক সম্পর্ক অবশ্য আছে, কিন্তু তা নেহাতই পোষাকী ব্যাপার। ঘনিষ্ঠতা আদৌ কারুর সঙ্গেই নেই। ব্যবসা বাণিজ্যও চলছে যেটুকু না হলে নয় সেইটুকুই। দুনিয়ার রাজনীতি নিয়ে বর্মা এখন আর মোটেই মাথা ঘামায় না। এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি জোটছাড়া। কম্যুনিস্টদের সাতেও সে নেই, অকম্যুনিস্টদের পাঁচেও না। একটা লাভ তাতে বর্মার হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে আগুন জ্বলেছে তার আঁচটিও বর্মার গায়ে লাগেনি। কিন্তু কূটনৈতিক ঝামেলা এড়াতে পারলেও আর্থিক ক্ষতি এড়াতে পারেনি নে উইনের আমলে বর্মা। বিদেশী জিনিসের আমদানি একরকম বন্ধ বললেই হয়। তাতে কিছু এসে যেতো না যদি দেশী জিনিস পাওয়া যেতো আর জিনিসপত্তরের দাম কম হতো। তাও তো বারো বছর জঙ্গীশাসনের পর হয়নি। জীবনযাত্রার মান বর্মায় পনেরো বছর ধরে কমেছে। সব জিনিসের দামই বেড়েছে। একান্ত দরকারি জিনিসও চড়া দাম দিয়েও মেলে না।

তবুও কিন্তু জেনারেল নে উইনের দাপট কিছু কমেনি। তিনি তাঁর ক্ষমতার জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন কোনও কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে। নিজের আর অনুগতদের শক্তির ওপর তাঁর এমনই অটুট বিশ্বাস যে এক যুগ পরে তিনি বর্মায় ফৌজী শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন। নতুন এক সংবিধানও চালু করেছেন। বিরোধীরা অবশ্য বলছে শাসন ব্যবস্থা নামেই নতুন, আসলে সেটা ফৌজী শাসনতন্ত্রেরই রকমফের। কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। নতুন সংবিধানে প্রশাসনের যে ব্যবস্থা হয়েছে তাকে গণতান্ত্রিক তো বলা চলেই না, অসামরিকও বলা যায় কিনা সন্দেহ। এতকাল যাঁরা ছিলেন ফৌজী হোমরাচোমরা তাঁরা সবাই ভোল পালটে বনে গিয়েছেন সিভিলিয়ান অর্থাৎ অসামরিক সরকারী কর্মী। নে উইন নিজেই এখন আর জেনারেল অর্থাৎ সেনাপতি নন। ফৌজী খেতাব ছেড়ে

দিয়ে তিনি এখন সাদামাটা নে উইন। তাঁর যিনি ডান হাত সেই সান ইউও তাই করেছেন। নতুন সংবিধানের শর্ত অনুযায়ী তাঁদের আর রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী হতে কোনও বাধা হইলো না। নে উইন যে হবেন রাষ্ট্রপতি আর সান ইউ যে হবেন প্রধানমন্ত্রী এ কথা খড়ি পেতে না গুনেও বলে দেওয়া যায়।

বর্মার নতুন সংবিধান তৈরি হয়েছে গেল বছর। চালু হয়েছে ৪ জানুয়ারি থেকে। তা দেশের লোকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। গণভোটে তা পেশ করা হয়েছিল, ৯৯ শতক লোক তা মঞ্জুর করেছে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের পালা চুকে গেছে গেল ফেব্রুয়ারির দশ তারিখে। প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে পাঁচ স্তরে। গোটা দেশের জন্যে তো বটেই গাঁ, জেলা ডিভিসন আর রাজ্য পর্ষদগুলোতেও। বর্মাতে এখন একটি মাত্র দল। নে উইন ক্ষমতা পেয়েই সব দলকেই বেআইনী করে দিয়েছিলেন। সংবিধানে বলা হয়েছে দেশে দল থাকবে একটি মাত্র—তার নাম হচ্ছে বর্মা সমাজতন্ত্রী কর্মক্রম দল। নে উইন আর তাঁর যে ফৌজী সাকরেদরা উ নুর কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা এতকাল দেশ শাসন করছিলেন বিপ্লবী পর্ষদ নাম নিয়ে। সে পর্ষদ উঠে গিয়ে তার জায়গায় এসেছে এই নতুন রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে তারাই একমাত্র প্রার্থী দিয়েছিল—কেন না সে অধিকার আইনত আর কারুর নেই। জিতেছে তারাই ফাঁকা গোলে গোল দিয়ে।

পাঁচ স্তরে যে নির্বাচন হয়েছে তাদের সবার ওপরে রয়েছে পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস অর্থাৎ জাতীয় জনতা কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসের ৪০ জন সদস্য নির্বাচন করবেন দেশের রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী, সেও একটা সাজানো ব্যাপার। কে রাষ্ট্রপতি হবেন আর কেই বা হবেন প্রধানমন্ত্রী তা তো ঠিকই রয়েছে, প্রতিনিধিরা কেবল ঠাট বজায় রাখার জন্যে দাগ বুলোবেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে বর্মার হেরফের হলো নামেই—এত কাণ্ডের পরও সাবেক চালই বজায় রইলো। সংবিধানে বলা হয়েছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই সরকারী দলের লক্ষ্য। সে সমাজতন্ত্র কিন্তু মস্কো-পিকিং-হাভানার ঢঙে কম্যুনিজম নয়। তবে বর্মা তাদেরই মতো একদলীয় রাষ্ট্র যেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার লোকের নেই, রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবাধ, অসীম। বর্মায় সংবিধান পালটালো বটে কিন্তু কড়াকড়িও কমলো না, গণতন্ত্রও ফিরে এলো না।

লক-আউট

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

প্রকাণ্ড তালার গুহায় বেজে যায় বাঁশি,
বসন্ত বাতাস এসে ঝাঁপ দিলে লোহার ফটকে;
শুধু হাড়গোড় বেচে সন্ধেবেলা স্বপ্নের খোরাকে,
দিনান্তে একবার শুধু সূচকে পাল্টে নেয় দিনান্তের রাশি।

এখন কয়েকটি তারা, পালা করে জাগে দিবানিশি,
লগি-বাঁধা ত্রিপলের নিচে ঐ যে ভাঁড়ে-পাতা সংসার সড়কে;
আগুন জোটে না সেথা নামমাত্র ম্যাচ বিড়ির ধকে,
শিয়রে গোটানো ধ্বনি, লাঠিসার, নির্বাসিতা স্লোগান রূপসী।

কে বা কারা, কি ছিল প্রারম্ভে, তা এখন প্রবাসী।
দানের কৌটোয় খাঁ খাঁ করে হাওয়া, ক্লান্তি মাথা রাখে
কাগজের থাকে;
লোল চামড়ার নিচে জমা হয় আহত বিন্যাস, তাসাপাশা
ফাঁকি নেয় সহজ অভ্যাসে;
জ্বলন্ত ভণিতা শুধু মার খায় ঠোঁটের ধকলে,
গোপন তদ্বির আর ছোঁয় না প্রেয়সী,
দম্ভ খুব উঁচু রাখে চুল্লীর গম্বুজে, ধোঁয়াহীন অমেয় দুরন্ত
ডাকে না সাংকেতিকে;
একত্রিশ, বত্রিশ, সাঁইত্রিশ, সূচকে পাল্টে যায় বাঁচা,
বাঁচার এ মনোহারী ক্লেশে।

পালাবদল

দেবতোষ বসু

মাঝে মাঝে টের পাই প্রকৃতির মধ্যে অবিরাম বদল হচ্ছে
অরণ্য থেকে অগ্নি, নদীর থেকে স্রোত, হাওয়ার থেকে তেজ
ভয়ংকর নিঃশব্দে ছিটকে বেরিয়ে আসছে বিরামবিহীন।
সেই পালাবদল আমারও মধ্যে মাঝে মাঝে সংক্রামিত হয়।
যখন আমার ভালোবাসা যায় জলের কাছে অপ্সুদীক্ষা নিতে
আমায় দুঃখ যায় দূর জঙ্গলে তল্লাশি চালাতে
সেই সব দিনে খুব ভিতরে একটা তোলপাড় শুরু হয়
আমি নিসর্গের অভ্যন্তরে শুয়ে বসে বমি করে ফেলি
আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় অন্যপক্ষে স্বাদলুপ্তি ঘটে
যেন কোনো নীলবিষ
দৈব মাধ্বীক বলে ভুল করে গিলে ফেলেছি অনেকখানি।
তবু, পাছে ঈশ্বর ও প্রকৃতি আমার উপর রাগ করেন
সেই সব ভয়ংকর দিনে আমি সংক্রামক জ্বর গায়ে নিয়ে,
কাঁপতে কাঁপতে
চোখের ভিতরে একটা কম্পাস এঁটে
তোমার দিকে প্রাণপণ ছুটতে থাকি।

নিজেকে অর্পণ করে রাখা ভালো

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

কেবলই নিজের হাতে কর্তৃত্ব নিয়ো না নারী,
আত্মবিশ্বাসিনী।
রাখো, কিছু রাখো ছেড়ে
বাহিরে বিভ্রমে রোদে, বৃষ্টিতে সংশয়ে
কিছু শস্য হোক নষ্ট হোক
অলক্ষ্যে অথবা অপচয়ে।

নিজেকেও ক্বচিৎ কখনও
আক্রমণে, ভয়ে রেখো খুলে।
অবিন্যস্ত চুলে
নিঃশব্দ ঝরুক দুটি পাতার পালক
পরিমিতি থেকে প্রিয়তমা
নিয়ো কিছুদিন নিয়ো ছুটি।

মাঝে মাঝে, মনে
নিজেকে অর্পণ করে রাখা ভালো।
না-হয় জড়ালো পায়ে ফেলে-দেওয়া কিছু খড়নাড়া—
দিলেই বা নিজেকে কখনও মেলে, কিছু ফেলে
হাওয়ারা হঠাৎ এসে ছুঁয়ে যাক নিবন্ধ শরীর
কোনো দিন ভাঙুক পাহারা।

নিরাপদ ঘর

আবু কায়সার

অঢেল রোদের গন্ধে কখনো উদ্দাম একা একা
এখানে ওখানে বড়ো সরে যাও; কখনো আবার
রবীন্দ্রশাসনে তুমি কেতকীকদম্বরেণু ভরা—
বাতাসের তীব্র হাহাকার; যেন টুরিস্ট-পাখির
অবিরাম ডানা ঝাপটানো—চেনা অচেনা গাছের
অনেক বিন্যাস তুমি জেনে গেছো গোপন ভ্রমণে।

সবার অজান্তে এসে অলৌকিক নখের মালিক
আমার ঘুমন্ত মুখ ফালা ফালা করে দিয়ে যাও।
আমসৃণ এ সোহাগ কেন যে দেখি না; জানলায়
এমন কি আঙুলের স্পর্শ নেই সাক্ষ্য ও প্রমাণ
স্বপ্নের সাবান দিয়ে ধুয়েমুছে পদচিহ্নহীন
কে জানে কখন কোন্ অগোচর-আঁধারে পালাও!

সহজ মাটির গন্ধে নিরাপদ ঘর ভরে আছে
অলীক খোলস খুলে মুখোমুখি দাঁড়াও এখন!

ভারতের অর্থনীতি

বিশ্ব-ব্যাংকের মানচিত্রে ভারতের উন্নয়ন-ধারা

সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন হার সম্পর্কে বিশ্ব-ব্যাংকের সর্বশেষ রিপোর্টে ভারত সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। বিশ্ব-ব্যাংকের উন্নয়ন-হার সম্পর্কিত মানচিত্রে ১২৪টি দেশের উল্লেখ আছে ; তার মধ্যে মাথা পিছু আয়ের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান হয়েছে ১০৩ তম। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চলতি বাজার-দরের ভিত্তিতে ভারতের মাথা পিছু জাতীয় আয় হয়েছে ১১০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৮২৫ টাকা। এই মানচিত্রে বলা হয়েছে যে ষাটের দশকে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২·৩ শতাংশ ; ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২·২ শতাংশ। ভারতে ১৯৭১ সালে যে লোক-গণনা হয়েছে তার ভিত্তিতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু ষাটের দশকে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ভারতের ক্ষেত্রে খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ষাটের দশকে ভারতে মাথা-পিছু জাতীয় আয় বেড়েছিল ১·৩ শতাংশ : তবে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মাথা পিছু জাতীয় আয় বেড়েছিল ২·৪ শতাংশ। বলা বাহুল্য ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত কৃষি-উৎপাদনের একটানা বৃদ্ধি হওয়ায় জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কিছুটা বেড়ে যাবার লক্ষণ দেখা যায়। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উন্নয়ন-শীল দেশগুলির জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের. উল্লেখ করে বলা হয়েছে "They reveal little about the absolute state of poverty in the developing world and nothing about its distribution within each country."

শুধু জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির দারিদ্র্য সম্পর্কে কিছুই পরিষ্কার প্রতিভাত হয় না অথবা কোন দেশে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয়েছে সে সম্পর্কেও কোন ধারণা করা সম্ভব হয় না। ১৯৭১ সালে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন চলতি বাজারদরের ভিত্তিতে ছিল ৬২.৭২০ মিলিয়ন ডলার,—চীনের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক। অথচ চীনের জনসংখ্যা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। ভারতের অনুপাতে চীনের উন্নয়ন বিস্ময়কর।

ভারতে প্রায় ৪০ শতাংশ লোক

দারিদ্র্যের সীমারেখার নীচে আছেন বলে দান্তেকার ও রথের সমীক্ষায় জানা গেছে। দারিদ্র্যের প্রকৃত সীমারেখা কী অথবা প্রকৃতই কত শতাংশ লোক দারিদ্র্যের সীমারেখায় আছেন সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঠিকভাবে বণ্টিত হয়নি, অথবা বিকল্পভাবে বলতে গেলে ভারতের মোট জনসমষ্টির একটি বৃহৎ অংশ যে পরিকল্পনার সুফল ঠিকভাবে ভোগ করতে পারছেন না, সে-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ খুবই কম। দারিদ্র্য দূর করার শুভ-সংকল্প পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় গৃহীত হয়েছে। কিভাবে দারিদ্র্যের বোঝা লাঘব করা যেতে পারে সে সম্পর্কেও যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান যে একশতেরও নীচে চলে এসেছে সে সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোন লক্ষণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আছে কিনা আমাদের সম্যক জানা নেই। কিন্তু যে-হারে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলছে এবং যে-হারে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যে ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছে এবং হতাশা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আশংকা হচ্ছে ১৯৭৩-৭৪ সালে উন্নয়ন-হার শূন্য-ও হতে পারে। যদি তা-ই হয় তবে সরকারকে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও আশানুরূপ কমছে না। সরকার পরিবার পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট প্রচার কাজ চালাচ্ছেন ও অর্থব্যয় করে চলেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুউচ্চ হার, স্বল্প উন্নয়ন-হার, জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন, কর্মসংস্থানের অভাব, এগুলি হ'ল আমাদের দারিদ্র্যের মূল কারণ। দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজে আমরা এগোতে পারিনি। জিনিসপত্রের দাম এখন এত বেড়েছে যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সরকারের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। উন্নয়নের মূল শর্ত হল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা,—তা-ই যদি বজায় রাখা সম্ভব না হয়, তবে আমরা উন্নয়ন-হার বাড়াতে পারব না। ভারতের মোট জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে আগ্রহী নন। তাঁরা শুধু ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচতে চান। জনগণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে সরকারকে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা এখন এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে ইচ্ছা থাকলেও সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কাজে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না।
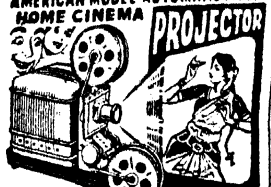
রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবার নতুন প্রয়াস

ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা ব্যর্থতার মধ্যেও শুধু একটি ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি যথেষ্ট সুস্পষ্ট,—এবং তা হ'ল রপ্তানি-বাণিজ্য। চতুর্থ যোজনায় আমাদের ৭ শতাংশ হারে রপ্তানি বেড়ে যাবার কর্মসূচী সফল হয়েছে। এবছর পঞ্চম পাঁচসালা যোজনা শুরু হবে। পঞ্চম যোজনা শুরু হবার প্রাক্কালে বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি বাড়াবার এক নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া তেল-উৎপাদনকারী দেশগুলির সামাজিক উন্নয়ন ও শিল্পোন্নয়নে ভারত বিভিন্ন জিনিস সরবরাহ করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তার বিনিময়ে তেল আমদানির সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে—এ-ধরনের ইঙ্গিতও বাণিজ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আভাস দিয়েছেন, দেশের মধ্যে যে সব জিনিসের প্রাচুর্য কম সেরকম কিছু জিনিসও পারস্য উপকূলের দেশগুলিতে রপ্তানি করা হ'তে পারে। উদ্দেশ্য, আরো বেশি অপরিশোধিত তেল সংগ্রহ করা। এই তালিকার মধ্যে সিমেন্ট এবং ইস্পাতজাত জিনিসও থাকতে পারে। সিমেন্ট সংকট আমাদের দেশে এখন চরমে উঠেছে। সরকারের উচিত, মোট রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবার জন্য এমন জিনিস রপ্তানি করা দেশে যার প্রাচুর্য আছে অথচ বিদেশের কাছে তার চাহিদা থাকতে পারে। এজন্য চিরাচরিত জিনিসের বাইরে অন্যান্য জিনিসের (non-Traditional) উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আশা করেন, আসছে বছর ২৩০০ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানির কর সম্ভব হবে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সংকল্প সিদ্ধ হোক,—তবে দেশে যে জিনিসের একান্ত অভাব সে ধরনের জিনিস বেশি রপ্তানি না করে অন্য জিনিসের রপ্তানী বাড়াবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

সুব্রত গুপ্ত

আসন্ন

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ক্লান্তি নয়, অবসাদও না, অন্য ধরনের একটা অনুভূতি। শঙ্কা আর যন্ত্রণার মিশেল। এ শঙ্কা নিজের জন্য যতটা, সংসারের ভবিষ্যতের জন্য ততটা নয়। যন্ত্রণাও দেহজ শুধু নয়, অন্তরের গভীরে তীব্রভাবে মোচড় দিয়ে ওঠার সংগোপ্ন। যে মোচড়ে অন্ত্রগুলো দলা পাকিয়ে সমস্ত শরীরের রোমকূপে শিহরণ তোলে। মনকে বিমর্ষ করে।

অথচ এমন একটা মুহূর্তের অপেক্ষায় সুষমা ছিল।

শুধু সুষমা কেন, সুষমার কাছের মানুষটাও। মন্ত্র পড়ে আগুন সাক্ষী করে যাকে সুষমা ঘনিষ্ঠ বাঁধনে বেঁধেছে।

সুষমার শাশুড়ী, ননদ, ছোট্ট সাজানো গোছানো এই সংসারের প্রতিটি মানুষ তো এমন একটি লগ্নের প্রত্যাশাই করছিল।

তবু খবরটা শোনার পর থেকেই সুষমা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ভাবল, এমন একটা অবস্থা থেকে যদি পরিত্রাণ পাওয়া যেত। বৈধ অবৈধ যে কোন উপায়ে।

সাধারণভাবে ভয় পাওয়াটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। সব মেয়েই পায়। স্তনবৃন্তের রং বদলায়, বর্তুলাকার হয় উদর, গালে নীল শিরার জট প্রকট। শরীর বেশ ভারি। শুধু তাই নয়। দৈনন্দিন আহারে রুচি থাকে না। খুঁজে খুঁজে অখাদ্য খেতে সাধ হয়।

সাত জন্মে সুষমা টক খেত না। কোন রকম আচারে মোটেই আসক্তি ছিল না।

কিন্তু এখন যেন সুষমা অন্য মানুষ।

খাটের তলায় রাখা শাশুড়ীর তৈরি তেঁতুলের আচারের শিশি টেনে বের করে। নিচু হতে তার কষ্ট হয়। পেটে লাগে। তবু আচারের লোভে এ কষ্টটুকু সে সহ্য করে।

চুরি করে খাবার তার কোন প্রয়োজন নেই। দুবেলা ভাতের থালায় শাশুড়ী যে আচার পরিবেষণ করেন, তার পরিমাণ কম নয়। কিন্তু দুপুরবেলা চিত হয়ে শুয়ে বুকের ওপর লাইব্রেরি থেকে আনা রহস্যের বই পড়তে পড়তে সুষমা উঠে বসে। আচার আস্বাদনের দুর্নিবার স্পৃহায় সব কিছু ভুলে শাশুড়ীর ঘরে ঢোকে।

এখন ঘর খালি। ননদ স্কুলে, আর রান্নাঘরের সরু বারান্দার ওপর যে রোদের ফালি বিছিয়ে থাকে, শীতের দুপুরে মাদুর পেতে শাশুড়ী সেখানে শুয়ে থাকেন। রাতের কাঁথার আতপতপ্ত হয়ে অনেকটা আরাম পান।

মাঝে মাঝে এমনও হয়।

তাড়াতাড়িতে কিংবা শরীরকে ঠিক সামলাতে না পারার জন্য আচারের শিশি শব্দ করে কাত হয়ে যায়।

শাশুড়ীর কানে সে শব্দ যেতেই বুড়ী চীৎকার করে ওঠেন।

ওই দেখ বউমা, পালেদের বাড়ির বেড়াল

এসে ঘরে ঢ়ুকে সব ভাঙছে। খেতে দিতেই যদি না পারবি তো বেড়াল পোষা কেন বাপু।

সুষমা সাবধান হয়ে যায়। চৌকাঠের এপারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। সে জানে, তর্জনই চলবে। তর্জনের পরে বর্ষণ আর হবে না।

যেতো রোগী রোদের উষ্ণতা ছেড়ে উঠে আসবেন না।

দ্রুত সরে আসার জন্য সুষমার হৃৎস্পন্দনের বেগ বাড়ে। সারা মুখ আরক্ত। অস্বস্তিকর অবস্থা।

দু হাত বুকে চেপে সুষমা দাঁড়িয়ে থাকে।

এমন কি হতে পারে না, খুব উত্তেজিত হলে, শোণিতের গতিবেগ বাড়লে, সুষমার শরীরের মধ্যে আর একটা শরীরের যে পুষ্টিসাধন হচ্ছে, হঠাৎ তার জীবনের স্পন্দন থেমে যেতে পারে।

তা হলে তো বিরাট একটা ভয় থেকে সুষমা মুক্তি পাবে।

প্রথম নজরে পড়েছিল শাশুড়ীর।

সুষমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। একটু আগে সুষমার স্বামী অরবিন্দ বেরিয়েছে। বারান্দা থেকে মোড়ের চৌরাস্তা দেখা যায় না। এখানে ট্রাম নেই, বাস। সবাই চৌরাস্তা থেকে বাসে ওঠে।

অরবিন্দ বাসে উঠল কি না বারান্দা থেকে দেখা যায় না, তবু সুষমা দাঁড়িয়ে থাকে।

শুধু অরবিন্দর যাওয়া নয়, পথের সচল জনতা যানবাহন লক্ষ্য করে। সকালের এই অহেতুক ব্যস্ততা দুপুরের সঙ্গে সঙ্গে কেমন ঝিমিয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুষমা বুঝি তাই ভাবছিল।

ঘরের মধ্যে চাল বাছতে বাছতে শাশুড়ী সুষমাকেই দেখছিল। বয়স হয়েছে। শরীরে বয়সের ভার নেমেছে, কিন্তু দুটো চোখ এখনও আশ্চর্য সক্ষম। সক্ষম আর উজ্জ্বল।

সুচে সুতো পরানো, চাল বাছাই ঝাড়াই এসব করতে বুড়ীর কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

বউমা!

শাশুড়ীর আচমকা ডাকে সুষমা ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

ডাকলেন মা?

শোন, এখানে এস।

পায়ে পায়ে সুষমা শাশুড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। দু চোখে কৌতূহলের দৃষ্টি।

তুমি কিছু টের পাওনি বউমা?

কি টের পাব মা?

শাশুড়ীর প্রশ্নের তাৎপর্য সত্যিই সুষমা কিছু বুঝতে পারেনি।

শরীর ঠিক আছে তোমার?

শরীর? হ্যাঁ, শরীর তো ঠিকই আছে।

আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে বউমা। তুমি বরং খোকাকে নিয়ে একবার ডাক্তারকে দেখিয়ে এস।

এ কথার পর সুষমা পা মুড়ে শাশুড়ীর কাছে বসেই পড়েছিল।

আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মা। শুধু শুধু ডাক্তারকে দেখাতে যাব কেন?

নিতান্ত গ্রাম্যভাবে কথাটা শাশুড়ী বলতে পারতেন, অন্য লোকের বেলা তাই বলতেন, কিন্তু সুষমার সামনে ভব্য সাধুভাষায় বললেন।

আমার তো মনে হয়, তুমি মা হতে চলেছ বউমা।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সুষমার চোখের সামনে ঘন কালো একটা যবনিকা নেমে এল। তার মনে হল পৃথিবীর কোথাও ছিটে ফোঁটা আলো নেই।

শুধু অন্ধকার নয়, অন্ধকার তো যন্ত্রণা-দায়ক নয়। এ যেন হৃদপিণ্ডের ওপর কারা হাজার তপ্ত শলাকা চেপে ধরল।

আজ তিন চার মাস ধরে ভয়ের বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, দুলছিল সন্দেহের দোলায়, তার ধারণা হয়েছিল, এ কিছু নয়, শারীরিক এই অনিয়ম কেটে যাবে।

সে বুঝি মিথ্যাই ভয় পাচ্ছে।

কিন্তু বাইরের লোকের চোখে তারি অবস্থা যখন প্রকট হয়ে উঠেছে, তখন নিঃসন্দেহে ভয়ের কথা।

এখন সুষমা কি করবে। অস্বীকার করলেও রেহাই পাবে না।

শাশুড়ীর যখন সন্দেহ হয়েছে, তখন তিনি সহজে ছাড়বেন না। অরবিন্দকে বলবেন। শুধু বলা নয়, সুষমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে বাধ্য করবেন।

তা হলে?

সুষমার মনের গোপন ভয় যদি সত্যে পরিণত হয়!

যদি সত্যি হয়, তা হলে বাড়ি জুড়ে একটা উল্লাসের বন্যা বয়ে যাবে।

অবশ্য উল্লসিত হওয়া স্বাভাবিক।

সুষমার বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছরেরও বেশী। এই সময়, এত সময় একটি নারীর সন্তানবতী হবার পক্ষে যথেষ্ট।

আগের যুগে এই সময়ের মধ্যে গৃহিণীদের কোলে একাধিক সন্তান আসত।

এ কথা সুষমার শাশুড়ী বার বার বলেছেন। আক্ষেপের সুরে। সুষমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

প্রথম প্রথম সুষমা অভিমানে উচ্ছল হয়ে উঠত।

অরবিন্দ অফিস থেকে ফিরে জলযোগ সেরে বিশ্রাম করার সময়ে জল-চকচক চোখে তার কাছে অভিযোগ করত।

জান, মা আজ আমাকে এই কথা বলেছেন। বল, ছেলেপুলে যে হচ্ছে না, সেটা কি আমার দোষ। আমি কি করব!

অরবিন্দর বিশ্রাম মানে, বিছানার ওপর তাস সাজিয়ে পেসেন্স খেলা। লোকটার এই একটা নেশা। যতটুকু অবসর পায় তাস নিয়ে বসে। অফিসেও কাজের টেবিলে তাস সাজায় কি না কে জানে!

সুষমার দিকে নয়, তাসের দিকে চেয়ে অরবিন্দ উত্তর দেয়।

আরে, মার কথা ছেড়ে দাও। সেকেলে মানুষ, এসব ব্যাপারে একটুতেই আঁতকে হয়ে ওঠে।

সুষমা সরে যায় না। স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে বলে, আমার তো ভয় করে। কোন্ দিন বলবেন, বাঁজা বউ সংসারের অলক্ষ্মী।

এবার অরবিন্দ মুখ তোলে। তার ভয়, এখনই বুঝি সুষমার ফোঁপানি শুরু হবে। তা হলেই মুশকিল। কান্নাকাটি অরবিন্দ একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না।

আগে থেকে ওসব ভাবছ কেন? কত মেয়েছেলে বিয়ের দশ বছর পর পোয়াতি হয়। ছেলেপুলের ঝঞ্ঝাট আমি আবার সহ্য করতে পারি না। এই তো বেশ আছি। তুমি আর আমি।

হাত বাড়িয়ে সুষমার কোমর জড়িয়ে ধরতে গিয়েও কি ভেবে অরবিন্দ ধরল না।

মা ঘোরাফেরা করছেন। হয়তো ঘরের মধ্যে ঢুকবেন না, কিন্তু বাইরে থেকে এমন একটা অন্তরঙ্গতার দৃশ্য তাঁর চোখে না পড়ার কথা নয়।

অরবিন্দ মুখে যতই বলুক ছেলেপুলে সে ভালবাসে না, কিন্তু সুষমা জানে, বুঝতে পারে, সন্তান অরবিন্দর অপছন্দ নয়।

সব বিবাহিত পুরুষেরই এ সব ব্যাপারে গোপন লোভ থাকে। শুধু কি লোভ? হয়তো কিছুটা ভয়ও।

নিজে শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বংশের ধারাও বিলুপ্তি—এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা ভাবতেও চায় না।

পুৎ নাম নরক থেকে উদ্ধারের পৌরাণিক কাহিনী নয় সাধারণভাবেই সকলে কামনা করে নিজের অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হোক।

ছোট যে ননদ, কমল, বয়স বছর বারোর বেশী নয়। এ যুগে বারো বছরের মেয়ে অনেক ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে উত্তেজক পোস্টার, ফিল্মের চটুল গান, পার্কের ছায়াচ্ছন্ন আশ্রয়ে ঘনীভূত প্রেমিক-প্রেমিকার কাঠামো ছোট মেয়েদের বড় হতে দ্রুত সাহায্য করে।

তাই কমল এখন ফ্রকের খোলস না ছাড়লেও, জীবনের অনেক গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

সে বলেছে, হ্যাঁ বউদি, কি ব্যাপার তোমাদের বল তো?

সুষমা কথাটা বুঝতে পারেনি।

পাল্টা প্রশ্ন করেছে, কিসের কি ব্যাপার?

কমল এদিক ওদিক দেখেছে। এ সময় তার মা ঠাকুরঘরে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছে, তোমাদের ছেলেপুলে হচ্ছে না কেন?

এমন একটা প্রশ্ন বিশেষ করে কমলের মুখ থেকে, সুষমা কল্পনাও করেনি।

তার যখন বিয়ে হয়, তখন কমলের বয়স সাত।

বিয়ের পর কমলের পরিচর্যার ভার সুষমার ওপরই পড়েছিল।

তাকে স্নান করানো, খাওয়ানো, পোশাক পরানো, সব।

সেই কমল এমন পাকা পাকা কথা বলবে, এ যেন কল্পনাতীত।

সুষমা তখনই কোন উত্তর দেয়নি।

দুটো চোখ বিস্ফারিত করে কমলকে জরিপ করেছে। তার পাকামির জরিপ।

প্রতিদিন প্রতিরাত: নতুন স্বাদ!
সপ্তাহে রোজই ফলের স্বাদে ভরা
এক নতুন রেক্স জেলি!
সোমবারের—স্বতৃপ্তি :
চেরী।
বাচ্চাদের সরস চেরী। ছোট ছোট বাটিতে সবাইকে খেতে দিন, ওরা আনন্দে নেচে উঠবে!
মঙ্গলবারের—মনোরঞ্জন :
পাইন আপেল।
স্বাদেভরা—মনোহরা! বাড়ীর সবাইকে আর বন্ধুবান্ধবদের নতুন কিছু খাইয়ে চমকে দিতে-এর জুড়ি নেই!
বুধবারের—বিস্ময় :
র‍্যাস্পবেরী।
লাল লাল চমকদার-মজাদার! মধ্যাহ্ন ভোজন, নৈশ ভোজন যে-কোনো সময়েই সবার প্রিয়!
বৃহস্পতিবারের—বৃহৎ ব্যাপার :
স্ট্রবেরী।
জোয়ান বুড়ো সবার এক অতি প্রিয় খাবার!
তৈরী করা সহজ। চিনি বা দুধ মেশাবার দরকার নেই :
এক পাইন্ট জল ফুটিয়ে নিন, তারপর ১ প্যাকেট রেক্স জেলি ক্রিস্টাল মিশিয়ে ভাল ক'রে নাড়ুন। ব্যস, এইটুকুই—না চিনি না দুধ কিছুই মেশাবার প্রয়োজন নেই। এরপর ঠাণ্ডা করুন। তারপর ফ্রিজে বা বরফের ওপর রেখে দিন যতক্ষণ না জমছে। এ ভাবেই খেতে দিন অথবা ফল, কাস্টার্ড, কেক, রাবড়ি, ক্ষীর—মোট আপনার রুচিমত অন্য কোনো কিছুর সঙ্গেও দিতে পারেন।
সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপাদানে—অতিশয় যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে তৈরী—রেক্স জেলি ক্রিস্টালস্ আপনার অর্থের বিনিময়ে সবচেয়ে ভাল জিনিষ! এক প্যাকেট আপনার বাড়ীতে রাখুন…সব সময়! খেয়ে সুখ—খাইয়ে সুখ—পুডিং আর ডেসার্ট তৈরী করুন সপ্তাহে রোজই।
শুক্রবারের—ভোজন সুখ :
অরেঞ্জ।
দিলখুশ খেলে—মজা আরও পেলে! কমলার খণ্ড ছড়িয়ে খেতে দিন!
শনিবারের—সুমধুর আয়োজন :
লেমন।
অতিথি সেবার-সবারে হারায়! অভ্যাগতরাও খেয়ে দারুণ তৃপ্তি পাবেন!
রবিবারের—অপরিহার্য্য স্বাদ :
বাড়ীর সবার সবচেয়ে প্রিয় ফলের স্বাদে ভরা রেক্স, ক্রীম ছড়িয়ে, ওপরে নাট সাজিয়ে খেতে দিন। সবাই দু'বার ক'রে চাইবেন, তা'ই তেমন ব্যবস্থাও রাখবেন!
REX
JELLY CRYSTALS
RASPBERRY
কর্ণ প্রডাক্টস্ কোম্পানী
(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই।
রেক্স জেলি ক্রিস্টালস্
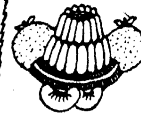
কমল সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল তার বয়সের পক্ষে প্রশ্নটা কিঞ্চিৎ ভারি হয়ে গিয়েছে।

তাই সে সব কিছু তরল করার চেষ্টায় বলেছিল, সত্যি বাপু, বাড়িতে ছেলেমেয়ে না থাকলে মানায় না। বাড়ির জিনিস এধার থেকে ওধার করবে, খাতাপত্র ছিঁড়বে, কান্নায় পাড়া মাত করবে, তবে তো ভাল লাগে।

কমলের বয়সের কথা সুষমাও বুঝি বিস্মৃত হয়েছিল।

তাই সে গলায় কৃত্রিম গাম্ভীর্যের প্রলেপ মাখিয়ে বলেছিল, একটা বাচ্চা ছেলেমেয়ের যখন এত সাধ তখন তোমার দাদাকে না হয় বলি।

কি বলবে?

কমলের একটা বিয়ে দাও—

কথা শেষ হবার আগেই আরক্ত মুখে কমল ধ্যাৎ, বউদিটা যেন কি, বলে ছুটে পালিয়ে গেছে।

এমন একটা খবরে কমলও খুশী হবে।

সবাই খুশী হবে, অখুশী বুঝি কেবল সুষমা!

অথচ মা হবার গোপন সাধ কি তার নেই?

রাত্রে কথা হল।

অরবিন্দ বিছানায় শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ে। রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে সুষমা যখন শুতে আসে তখন অরবিন্দ ঘুমে বিভোর।

সে রাত্রে ঘরে ঢুকেই সুষমা অবাক।

অরবিন্দ খাটে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে।

এ কি, ঘুমাওনি এখনও?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অরবিন্দ বলল, এমন একটি খবর মার মুখ থেকে শুনতে হল?

একেবারে যে বোঝেনি সুষমা তা নয়, তবু না বোঝার ভান করে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর?

অরবিন্দ অশ্লীলভাবে নিজের উদরের ওপর হাত রেখে বর্ধিত আয়তন দেখাল।

দিন দিন যা অসভ্য তুমি হচ্ছ না!

সুষমা রাগে ফেটে পড়ল।

কি এ তো তোমারই আগে জানতে পারার কথা।

পাছে অরবিন্দ আবার অশ্লীল কোন ইঙ্গিত করে সেই ভয়ে সুষমা খাটের এক-পাশে বসে পড়ল।

সব বাজে। কিছু হয়নি আমার।

কিছু হয়েছে কি না দেখবার জন্যই কাল তোমাকে নিয়ে বের হব।

ও মা, কোথায়?

ডাক্তারের কাছে।

না না, আমি যাব না।

কি ছেলেমানুষি কর। এ সময় ডাক্তার দেখানো খুব উচিত। ডাক্তারের নির্দেশমত চলতে হবে। ওষুধ খেতে হবে। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারছি না।

কি বুঝতে পারছ না?

তুমি বুঝতে পারলে না। অনিয়ম তো সবচেয়ে আগে তোমার ধরতে পারার কথা।

সুষমা অরবিন্দর মুখ চেপে ধরল। কথা তাকে শেষ করতে দিল না।

এক সময়ে অরবিন্দর মুখ থেকে হাত সরিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে বলল, না, না, না।

কি না, কিসের জন্য না সুষমা কিছুই বলতে পারল না।

ভয়ের আবছা একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া রূপ তাকে ঘিরে রইল।

মাঝে শুধু একটা রাত।

রাত পার হলেই সমস্যার সমাধান। সুষমা সত্যি মা হতে চলেছে কি না সেটা বোঝা যাবে।

আর কোন অস্পষ্টতা নয়, অন্ধকারের গর্ভে ঢিল ফেলা নয়।

ভয়ের শেষ।

ভয়ের শেষ, না ভয়ের শুরু।

জঠরের শিশু পৃথিবীর আলো না দেখা পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে সুষমা চিন্তায় কণ্টকিত হয়ে উঠবে।

আহারে, বিহারে, নিদ্রায়, জাগরণে এক ভাবনা তাকে ভারাক্রান্ত করবে।

পরের দিন শনিবার। সচরাচর যে সময় অরবিন্দ বাড়ি আসে, তার চেয়ে অনেক আগেই ফিরল।

সুষমা বিছানায় শুয়েছিল। অগোছাল পোশাক। উস্কো খুস্কো চুল। ফোলা চোখ।

যাও যাও, তৈরী হয়ে নাও, এখনই বেরুতে হবে।

সুষমা কোন কথা বলল না। একদৃষ্টে অরবিন্দর দিকে চেয়ে রইল।

কি হল? সাজগোজ করে নাও। সাড়ে চারটের সময় ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

কোন্ ডাক্তার?

তুমি কলকাতার সব ডাক্তারকে চেন? ডাক্তার কুণ্ডু। অফিস থেকে ফোন করেছিলাম। সাড়ে চারটেয় টাইম দিয়েছেন।

অরবিন্দ চা রুটি খেয়ে নিল। সুষমা পোশাক পাল্টাল।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে যখন চুল আঁচড়াচ্ছে, তখন আয়নার মধ্য দিয়ে অরবিন্দর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে দ্রুত হাতে সুষমা বুকের আঁচল টেনে দিল।

ইদানীং বুক বেশ ভারি হয়ে উঠেছে।

কি ভাগ্য, লোকটা যখন সুষমার শরীর মন্থন করে দুর্বার হয়ে ওঠে, তখন ঘর অন্ধকারে ডুবে থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন তার নজরে পড়ে না।

কিন্তু দিনের আলোয় অরবিন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠলেই সর্বনাশ।

রাস্তায় পা দিয়ে অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, কি, হেঁটে যেতে পারবে না রিকশা ডাকব?

মাসের প্রায় শেষ। পয়লা তারিখ হতে আর দিন ছয়েক। এই সময় ট্যাক্সি ডাকবার মতন রেস্ত যে অরবিন্দর পকেটে নেই, সেটা সুষমার জানা।

ডাক্তারের খরচের জন্য নিশ্চয় তাকে বন্ধুবান্ধবের কাছে হাত পাততে হয়েছে।

অরবিন্দ এমন কিছু বিরাট চাকরি করে না। সরকারী চাকরি। চাকরির নিশ্চয়তা আছে, কিন্তু মাসান্তে যে টাকা কটা হাতে আসে তার অঙ্ক যৎসামান্য।

সেই টাকা দিয়ে সেতুবন্ধন করতে হয়। বাড়ি ভাড়া, সংসার খরচ, বোনের স্কুলের মাইনে, সাজপোশাক।

আর বছর তিন-চার, তার মধ্যেই কমল বেড়ে উঠবে। সকলকে পাই টগার মতন। তাকে পাত্রস্থ করার জন্য সঞ্চয় চাই।

এ যুগে আমরা আদর্শের যত বড় বড় কথাই বলি না কেন, অনেকগুলো ব্যাপারে আমরা খুব এগোইনি। হয়তো এগোতে চাইনি।

মেয়ে দেখার সেই পুরনো প্রথা যেমন আছে, তেমনই আছে অলিখিত পণের প্রশ্ন। নগদ টাকার বদলে আসবাবপত্র। পাত্রীপক্ষের তাতে বিশেষ সুরাহা হয়নি।

অরবিন্দর উচিত এখন থেকে অল্প অল্প করে বোনের বিয়ের জন্য টাকা জমানো।

সুষমা বড় বাড়ির মেয়ে নয়। তার বাপ স্কুলের মাস্টার। মাইনে বিশেষ ছিল না, কিন্তু অন্য উপার্জন ছিল।

প্রাইভেট টিউশন, ছেলেদের পরীক্ষার খাতা দেখা, নিজের বাড়ির সামনের ঘরে ছোট একটা বই-খাতার দোকানও ছিল।

এত সব ছিল বলেই তিন মেয়েকে পার করতে পেরেছিলেন।

সুষমা ভ্রু কোঁচকাল।

কেন, রিকশা কি হবে? কতদূরে তোমার ডাক্তারের বাড়ি?

এই তো কাছেই। গোটা তিনেক গলি পরে।

হলে ট্যাক্সিই ডাকত, কাছে বলেই রিকশার কথা বলছে।

না না, রিকশা চড়তে আমার ভাল লাগে না।

সুষমা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

অরবিন্দ সংগে সংগে সুর বদলাল।

শরীরের এ অবস্থায় রিকশা চড়েও দরকার নেই। শহরের রাস্তাঘাটের যা হাল, ঝাঁকানিতে প্রাণ যাবে। তোমারও হয়রানি, পেটে যেটা রয়েছে তারও কষ্ট।

সুষমা আর কথা বাড়াল না। সব কথাই ঘুরে ঘুরে এক কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলছে। কাজেই চুপ করে থাকাই ভাল।

চৌরাস্তায় পৌঁছে সুষমাকে দাঁড়াতে হল।

একটা দোকান থেকে অরবিন্দ সিগারেট কিনল। একটা প্যাকেট। তারপর প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে দোকানে ঝোলানো জ্বলন্ত নারকেল দড়ি থেকে অগ্নিসংযোগ করল।

অরবিন্দ সচরাচর সিগারেট খায় না। সিগারেটখোর তাকে বলা চলে না। যখন তার মনের জোরের দরকার হয়, তখন সে সিগারেট ধরায়। বোধ হয় নার্ভাসনেসটা তাড়াবার জন্য।

সুষমা একটু দূরে, ফুটপাথের একপাশে অপেক্ষা করছিল, অরবিন্দ তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সুষমা বলল, এত বড় শহরে একটা লেডি-ডাক্তার পেলে না?

সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে অরবিন্দ কলকের মতন ধরেছিল, এইভাবেই সে ধরে। গোটা তিনেক টান দিয়ে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে বলল।

কেন, লেডি ডাক্তার কি হবে?

তারপর প্রশ্নের তাৎপর্যটা বুঝতে পেরে হেসে উঠে বলল, ও, লেডি-ডাক্তার চাই? পুরুষ ডাক্তারকে শরীর দেখাতে লজ্জা!

কথাটা বলেই অরবিন্দ জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেল।

একেবারে মধ্যবিত্ত ডাক্তার। চেম্বারের অবস্থা দেখে সুষমার তাই মনে হল। সে ছাড়া আর একটি মাত্র রোগিনী বসে আছে। তার পোশাকের অবস্থা দেখে খুব সামান্য ঘরের বলেই মনে হল।

ছোকরা ডাক্তার।

খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করল। অবশ্য অরবিন্দর দিকে চোখ ফিরিয়ে।

ক মাস?

উত্তরে অরবিন্দ সুষমার দিকে দেখল। সুষমা মাথা নীচু করে রইল।

ডাক্তারই বলল।

অবশ্য সব সময় ঠিক বোঝা যায় না। হিসাবে গোলমাল হয়ে যায়। আপনি আসুন ভিতরে।

তারপর কি ভেবে ডাক্তার অরবিন্দকে উদ্দেশ করে বলল।

আপনিও আসতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ মাথা নাড়ল।

না, না, ঠিক আছে। আমি এখানেই বসে আছি।

ডাক্তারের পিছন পিছন সুষমা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ছোট একটা বিছানা। একটা চেয়ার। মাথার কাছে হেলানো জোরালো বাতি।

সব জানালা বন্ধ।

নিন, শুয়ে পড়ুন। কোমরের কাপড়টা একটু আলগা করে দিন।

মিনিট কুড়ি। অস্বস্তিতে সুষমার শ্বাসরোধ হয়ে এল।

ছি, ছি, ছি। কি লজ্জা। কি লজ্জা!

তার দেহ নিয়ে ডাক্তার কুণ্ডু যা ইচ্ছে করল। শালীনতার সীমা পার হয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

দু একবার সুষমার মনে হল ডাক্তার যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে। শুধু অতিরিক্ত সময়ই নয়, অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ।

ঠিক আছে, উঠে বসুন।

ডাক্তারের এই কথা শোনার পর সুষমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

ডাক্তার কুণ্ডু বাথরুমে ঢুকে যেতে সুষমা শাড়ি ঠিক করে নিল। ব্লাউজের বোতাম আঁটল। তার মনে হল, সমস্ত শরীর যেন কলুষিত হয়ে গেছে।

বাইরে এসে দেখল, অরবিন্দ সজোরে সিগারেট টানছে। তার মানে সে অতিমাত্রায় উত্তেজিত।

একটু পরেই ডাক্তার কুণ্ডু ঢুকল। হাতে তোয়ালে।

আশ্চর্য, আপনার স্ত্রী বুঝতে পারেননি। প্রায় চার মাস। ফিটাস-এর পজিশন ভাল, কোন কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। তবে এ সময় ফলের রস খাওয়াবেন একটু। তাছাড়া একটা টনিক লিখে দিচ্ছি।

ডাক্তার কুণ্ডু যখন মাথা নিচু করে কাগজে টনিকের নাম লিখছিল, তখন অরবিন্দ মানিব্যাগ থেকে চার টাকা বের করে তার সামনে রাখল।

ঠিক সেই সময় সুষমার অদ্ভুত এক কথা মনে হল।

ভাল কারবার ফেঁদেছে ডাক্তারেরা। হাতের কারসাজি করবে, আবার মোটা টাকা দক্ষিণা।

ডাক্তারেরই উচিত, কিছু টাকা সুষমাকে দেওয়া।

রাস্তায় নেমেই অরবিন্দ বলল।

দূর, বিজ্ঞানের এখনও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি।

সুষমা নিজের চিন্তায় এত বিভোর ছিল যে কথাগুলো সম্পূর্ণ তার কানে গেল না। তবে অরবিন্দ যে কিছু একটা বলছে, সেটা বুঝতে পারল।

একটু পরেই অরবিন্দ নিজে সহজ হল।

বেশ, রোগিনীর পেটের ওপর একটা যন্ত্র রাখবে আর তাতেই ধরা পড়বে, গর্ভে কি আছে, ছেলে না মেয়ে।

সুষমা কোন কথা বলল না। কথা বলার মতন মনের অবস্থা তার নেই। এতদিন যেটা অনিশ্চিতের মাঝামাঝি ছিল, সন্দেহের অবকাশে ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা মাত্র, আজ ডাক্তারের পরীক্ষার পর সেটা নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত।

সুষমার অবস্থা অনেকটা যেন ফাঁসির আসামীর মতন।

প্রতিদিন কোর্টে যাওয়া আসা, দু পক্ষের উকিলের বাকযুদ্ধ, আইনের কথা নিয়ে আক্রমণ, জুরীদের ভাবগম্ভীর মুখ, সব কিছুর অন্তরালে একটা আশা। চরম শাস্তি বুঝি নাও হতে পারে।

কিন্তু শেষ দিনে বিচারকের অমোঘ নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সব আশার সমাধি। নির্ভর করার মতন আসামীর কোথাও কিছু রইল না।

সুষমারও এক অবস্থা।

আর কোথাও সন্দেহের ছায়ামাত্র নেই। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে

সঙ্গের লোকটি সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যাচ্ছে। বিরাম নেই। মনে মনে বোধ হয় কিছু একটা ভাবছে। নিজের আগামী পিতৃত্বের কথা স্মরণ করে উল্লসিত হচ্ছে বলেই দুটি চোখ অত বিস্ফারিত।

একেবারে বাড়ির দরজায় এসে অরবিন্দ কথা বলল।

একটা ছেলে হলেই ভাল হয়। আমি ছেলে চাই। তুমি?

প্রশ্নটা সুষমাকে।

সুষমা বলল, থাম বাপু, ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

ভয়? কেন, ভয় কিসের?

তোমরা পুরুষ মানুষ কি বুঝবে? জান, প্রসব হতে গিয়ে কত মেয়ে মারা যায়।

পলকের জন্য অরবিন্দ বিবর্ণ হয়ে গেল।

জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর প্রশ্ন কেন?
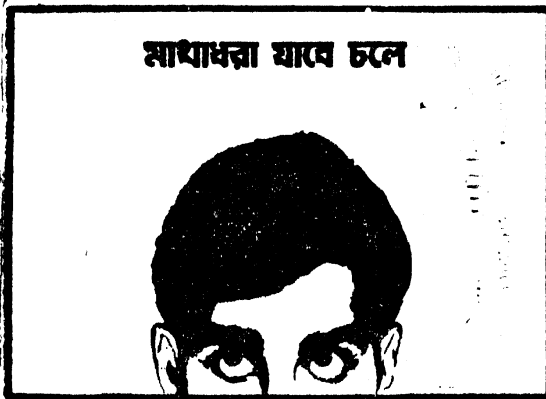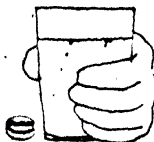
না কি, একই ঘটনার এ-পিঠ ও-পিঠ। একই বস্তুকে দেখা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে অরবিন্দ সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। সুষমা এল শোবার ঘরে।

শাড়ি ব্লাউজ বদলাতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অরবিন্দ রান্নাঘরে যাওয়া মানে, শাশুড়ী এখনই এসে সুষমার সামনে দাঁড়াবেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একগাদা প্রশ্ন করবেন।

ঠিক তাই।

শাশুড়ী চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে বললেন।

বউমা।

এই যে মা।

শাশুড়ী ভিতরে ঢুকলেন।

খোকার কাছে সব শুনলাম বউমা। শুনে যে কি আনন্দ হল। গোবিন্দর ইচ্ছায় সুপ্রসব হক। চাঁদপানা একটি ছেলে আসুক সংসারে।

শাশুড়ী এগিয়ে এসে সুষমার দিকে নিজের হাত প্রসারিত করলেন।

এই তুলসীপাতা দুটো খেয়ে নাও বউমা।

যখন ধারে কাছে কেউ থাকে না, সুষমা একেবারে একলা, তখন ভয়টা যেন একটা অবয়ব পরিগ্রহ করে।

মনকে সুষমা অনেক বোঝায়, এমন একটা অবস্থা তার নিঃসন্দেহে কাম্য, মাতৃত্ব নারীকে নতুন রূপ দেয়, এ কথা সুষমা অনেক গল্প উপন্যাসে পড়েছে, কিন্তু তবু শান্তি পায় না। অদৃশ্য একটা কাঁটা যেন হৃদপিণ্ডে বিঁধে থাকে।

ডাক্তারের ভুল হয় না? এমন যদি হয়, ডাক্তার কুণ্ডু বলেন, আমার একটু ভুলই হয়ে গিয়েছিল। পেটে টিউমার, বাচ্চা নয়। টিউমারের যন্ত্রণা বরং সহ্য হবে, কিন্তু মাতৃত্ব নয়।

সুষমার ভয় প্রসব-যন্ত্রণার জন্য নয়। সে যন্ত্রণা সহ্য করবার শক্তি তার আছে।

সে যন্ত্রণা সহ্য করবার ক্ষমতা মেয়েদের সহজাত।

তার ভয়ের কারণ অন্য।

যদি সন্তান অরবিন্দ কিংবা সুষমার মুখশ্রী নিয়ে জন্মায়, তাহলে ভয়ের কিছু নেই।

এমনও দেখা যায়, সন্তান মা কিংবা বাবা কারও মতনই হয় না। বংশের কোন একজনের চেহারা পায়। যাকে সুষমা অরবিন্দ কোনদিন দেখেনি।

তাহলেও ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু সুষমার গর্ভস্থ সন্তান যদি এক ঝড়ের রাতের সমাজরীতিনীতির চৌকাঠ ডিঙিয়ে আসা মানুষটার মতন হয়। যে মানুষটাকে অরবিন্দ ভাল ভাবেই চেনে।

বিয়ের রাতে যে যেচে এসে অরবিন্দর সঙ্গে আলাপ করেছে। পরিচয় দিয়েছে সুষমার টিউটর হিসাবে।

অরবিন্দ তো জানে না সেই লোকটির কাছে সুষমা পাঠ্যের চেয়ে অপাঠ্যই পড়েছে বেশী, সুষমার সামনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার বদলে দুচোখে যার কামনার দীপ জ্বালিয়ে রেখেছে।

মাত্র মাস পাঁচেক আগে। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে সুষমা যখন বাপের বাড়িতে দিন কয়েক ছিল তখন এক কাল বৈশাখীর রাতে বাইরের পৃথিবী যখন জলে ঝড়ে বিপর্যস্ত তখন দরজা ঠেলে যে মানুষটা ঘরের মধ্যে ঢুকে সুষমাকে গ্রাস করেছিল তাকে সুষমা খুব চেনে।

এমন একদিন ছিল যখন তার হাত ধরে নতুন সংসারের ভিত্তি রচনা করতেও তার দ্বিধা ছিল না।

সন্তান যদি তার মত হয়।

পিঙ্গল দুটি চোখ, বাঁদিকের গালে লালচে আঁচিল, পুরু কামনাপুষ্ট ঠোঁট।

তাহলে সংসারের দিকে সুষমা মুখ তুলে দেখবে কি করে?

কি কৈফিয়ত দেবে অরবিন্দকে!

আসন্ন সেই বিপদের কথা ভেবে ভয়ের খাঁচায় সুষমা ছটফট করে।

মুক্তিপাগল বিজয়লাল

মনকুমার সেন

জীবনে-মরণে সমান জয়ন্ত কবি বিজয়লাল। কাব্যোপনিষদের ঋষি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'জনম মরণ জীবনের দুটি দ্বার।' মৃত্যু জন্ম থেকে কিছু আলাদা জগতের ঘটনা নয় : একই জীবন ও জগতের একটি দরজা দিয়ে আমরা প্রবেশ করি—আমাদের জন্ম হয়; আর একটি দরজা দিয়ে আমরা প্রস্থান করি—তাকে আমরা বলি মৃত্যু। কিন্তু যেহেতু দ্বিতীয় দরজাটিও জীবনেরই অঙ্গ, সেই হেতু মৃত্যু মানে জীবনান্ত নয়—জীবনান্তর। এই অন্তর বা অন্তরা একটি নিরবচ্ছিন্ন সূত্রেরই অপরিহার্য অঙ্গ। —তবে কেন মৃত্যুতে আমাদের এত ভয়? ভয়ের কারণ আমাদের অপ্রস্তুতি। যেমন-তেমন করে আমাদের জীবন কাটে বলেই সেই জীবনান্তে অস্থির প্রায় নিঃসম্পদ জীবন নিয়ে মৃত্যুর মোকাবিলা করতে আমরা ভয় পাই। পক্ষান্তরে, আদর্শনিষ্ঠ লক্ষ্যস্থির জীবন এই মোকাবিলার জন্য সদাপ্রস্তুত। বস্তুত মহৎ মৃত্যুতেই মহৎ জীবনের সার্থক পরিণতি। মঞ্চ থেকে শিল্পীর প্রস্থানের সপ্রতিভ কুশলী ভঙ্গীটুকু ধরিয়ে দেয় তার তামাম শিল্প-প্রস্তুতির পটভূমি।

জীবনের কবি বিজয়লাল কবির যোগ্য আকৃতি নিয়ে, শিল্পীর সমুচিত মাধুর্য নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। জীবনের মহত্তম আকুতিই ছিল তাঁর এই মোকাবিলার হাতিয়ার—ক্ষুদ্র, খণ্ড চিন্তার আবিলতা দিয়ে তিনি তাঁর প্রস্থানের গৌরবকে আবিল হতে দেননি। জননায়ক মহাত্মা গান্ধীর ডাকে মুক্তিপাগল যে সৈনিকদল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্বেলিত মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন, বিজয়লাল সেই পুরোবর্তী বাহিনীর একজন। মুক্তির সেই জীবনব্রত আ-মৃত্যু বিজয়লালকে পরিচালিত করেছে। জাতির রাজনৈতিক মুক্তির পর তাঁর জীবন-মুক্তির কঠিনতর ব্রতে বিজয়লাল অঙ্গীকার-বদ্ধ হন। জাতীয় জীবনকে গতানুগতিক ও ক্রমবর্ধিত বৈষয়িক প্রত্যাশার পাশ্চাত্য কাঙালপনা থেকে মুক্ত করার প্রথম শর্তই হল প্রতিটি ব্যক্তিসৈনিকের মনকে একই সঙ্গে দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী অপমান এবং প্রাচুর্যের সর্বনাশী অবক্ষয় থেকে বাঁচাবার প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতিই ছিল উত্তর-স্বাধীন ভারতে বিজয়লালের ব্যক্তিগত অঙ্গীকার। তাঁর গত পঁচিশ বছরের অধিকাংশ রচনা, প্রিয়জনদের কাছে তাঁর চিঠিপত্র তাঁর এই

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কঠিনতর অন্তরঙ্গ-সংগ্রামের বার্তাই বহন করে। বড় আন্দুলিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির স্থাপন করে 'সমন্বিত ধর্ম-প্রতীকের' কবি-ভক্ত তাঁর অন্তরতম অর্ঘ্য রেখেছেন তাঁরই পাদমূলে যিনি বলতেন, 'মানুষ মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।' বিজয়লাল বড় আন্দুলিয়ায় 'লোকসেবা শিবির' গড়ে তুলেছিলেন ধর্মের এই লোকায়ত রূপটিকেই সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে সত্য করে তুলবার জন্য।

জীবনভর সর্বহারার গান গেয়েছেন বিজয়লাল, সাম্যবাদের তিনি ছিলেন চারণ-কবি। কিন্তু তাঁর সাম্যে 'বাদ-বিসম্বাদের' স্থান ছিল না—বিশ্ব সাথে যুক্ত হয়ে দেশ-বিদেশের মনীষী-মনস্বী-মহাজনদের চরণ-চিহ্ন ধরেই ছিল তাঁর অভিযাত্রা। তাই বিজয়লালের সাম্যবাদ ছিল সাম্যযোগ, যোগে-যোগে সকলকে যুক্ত করে আপন করে সর্বোদয়ের গান্ধীভাবনা এই কবির বিপ্লবী সত্তাকে এক নিরাসক্ত নির্বৈর মাধুর্যে শেষ দিন পর্যন্ত সিক্ত করে রেখেছিল। শান্তিনিকেতনে তিনি পেয়েছিলেন জীবন-সৌন্দর্যের শিক্ষা, সবরমতী-সেবাগ্রামে তিনি নিয়েছিলেন জীবনের দীক্ষা—আর দক্ষিণেশ্বর দিয়েছিল তাঁকে জীবনের চেয়ে বড় মুক্তির মন্ত্র। ভারতের মাটিতে সমাজবাদ বা সাম্য-যোগ অনিবার্যরূপেই এই ত্রিকোণ-স্তম্ভের অবলম্বন নিতে বাধ্য। ক্রান্তদর্শী বিজয়লাল অবিচলিত প্রত্যয় ও নিষ্ঠা নিয়ে, কথায়-গানে-কর্মে, সেই নতুন দিগন্তেরই সত্য-সাধক হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে, আচার-আচরণের বিভিন্নতা-বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করেও ধর্মের পরিচয় যেখানে মূলত সর্বজাগতিক সর্বমানবিক প্রেম, সেই অধ্যাত্মভিত্তিক কর্ম-যজ্ঞের সূত্রেই বিজয়লাল ভারত-মানস ও বিশ্বমৈত্রীর এই তিন পুরুষপ্রধানকে সমানভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। গৌর-কান্তি শালপ্রাংশু এই দরদী মানুষটির বজ্রকণ্ঠে যখন উদ্বেলিত প্রেমাবেগের উজান বইত, তখন ভাবতেই হত জগদ্বরেণ্য বিপ্লবী যৌবন-স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ বৃথাই এ দেশে জন্মগ্রহণ করেননি।

কিন্তু বিজয়লালের পরিচয়ই প্রচ্ছন্ন থেকে যায় যদি তাঁর করুণাময়ী জননী কিরণময়ীর মাতৃমূর্তিটি আমাদের চোখের সামনে না থাকে। সাহিত্যের সঞ্জীবনী ও সংস্কারমুক্ত ধর্মের প্রতিভা মাতৃসূত্রেই বিজয়লাল অধিকার করেন। প্রাণাধিক প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র এই বিজয়লালের মৃত্যুর পরেও ৯৪ বৎসর বয়স্কা কিরণময়ীর প্রশান্ত মূর্তি ও সারস্বত অভিব্যক্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। শোক-সংবিগ্ন-মানসের কোন

বিহ্বলতা সেখানে নেই—বরং বিজয়লালের শোকার্ত ভাইবোনদের তিনিই ধীরে ধীরে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলেন : "কাঁদো কেন? এ বিশ্বে কিছুই হারায় না। এই বিশ্বচরাচর জুড়ে আছেন যিনি, সত্যদাস তো তাঁর আশ্রয়ের বাইরে যায় নি।" (সত্যদাস' মায়ের দেওয়া কবির ডাক-নাম)। মৃত্যুর পূর্বে মুহূর্তে কবি তাঁর পরমারাধ্যা এই সুধাময়ী মায়ের জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।

কিরণময়ী সত্যই এক বিস্ময়। ধর্ম-স্বরূপিণীরূপেই নয়, জাতীয় মুক্তিযজ্ঞে কিরণময়ী জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়লাল ও মধ্যম পুত্র মিহিরলালের পাশে শক্তিস্বরূপিণী হয়েও দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামী কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সরকারী কর্মচারী। ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে দুই পুত্র ঝাঁপিয়ে পড়ার পরেও কিশোরীলালের ইংরেজের চাকুরিতে ইস্তফা না দেওয়া কিরণময়ীর কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল—কিন্তু পুত্রকন্যাদি সহ পরিবারের দায়িত্বের কথা ভেবে কিশোরীলাল চাকুরি ত্যাগ করতে সাহস পাননি। সেই দিন থেকে কিরণময়ী এই চাকুরির 'কদন্ন' অর্থাৎ বিদেশী শাসকের চাকুরি থেকে অর্জিত স্বামীর উপার্জন সম্পূর্ণ বর্জন করেন। এই প্রতিজ্ঞা থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারেনি।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে তাতে কোন ফাটল ধরেনি—কেননা, নিজে অসমর্থ হলেও কিশোরীলাল সহধর্মিণীর এবং পুত্রদ্বয়ের এই প্রবল দেশাত্মবোধকে সম্মান করতেন।

এই প্রায়-শতবর্ষ বয়সেও ধৃতিমেধা কিরণময়ীর আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির পরিচয় আমাকে অভিভূত করেছে। কবিপুত্র বিজয়লাল প্রসঙ্গে তিনি অনর্গল বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং পুত্ররচিত ও স্বরচিত অসংখ্য গদ্য-পদ্যের আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। তাঁর মুখে শুনলাম—১৯১৮ সালে লেখা বিজয়লালের প্রথম কবিতা, যা কিশোর কবি পাঠ করেছিলেন কৃত্তিবাস-স্মরণসভায়। এই সভার সভাপতি ছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক জলধর সেন। কবিতাটি পরে 'ভারতবর্ষ'-এ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ৫৬ বৎসর পূর্বের এই সুদীর্ঘ কবিতাটি প্রায়-সম্পূর্ণ আবৃত্তি করলেন কিরণময়ী। স্থানাভাবে তার উদ্ধৃতি সম্ভব নয়, শুধু কবিতাটির শেষ চারটি পঙ্‌ক্তি আমি তুলে ধরছি। কবি কৃত্তিবাস স্মরণে শ্রদ্ধানত কবি লিখছেন :

মায়ের উষ্ণ স্তনে দিল ভরি
শান্তি চির অমিয়ধারা
মুদীখানা হতে রাজার প্রাসাদ
পান করি হল আত্মহারা।

তাঁর মায়ের উষ্ণ বক্ষঃসুধা পান করে কবি বিজয়লালও তাঁর সাহিত্যকৃতিতে কত পাঠককেই না আত্মহারা করেছেন!

ঘরে-বাইরে কোন দিন নতশির হতে শেখেননি বিজয়লাল। মুক্তিসংগ্রামী ভারতের সৈনিকরূপে তাঁর পৌরুষ ছিল অপরাজেয়। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের এক রাত্রে গান্ধীটুপি পরিহিত উন্নতশির বিজয়লাল যখন উত্তর কলকাতার বাসায় ফিরছিলেন, তখন একদল গোরা সৈন্য তাঁকে টুপি খুলে ফেলতে হুকুম দেয়—বিজয়লাল স্বাভাবিক চারিত্রশক্তিতে তা সরাসরি অস্বীকার করেন। ফলে, সৈন্যদলের অকথ্য নির্যাতন তাঁকে সইতে হয়। ভূলুণ্ঠিত অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে পথচারীরা হাসপাতালে নিয়ে যান। অলিখিত এরূপ কত রোমাঞ্চক ঘটনা বিজয়লালের জীবন-নাট্যের সাক্ষী।

অন্য দিকে তাঁর কুসুমকোমল প্রীতি ও নম্রতা। একজন অনন্যনিষ্ঠ গান্ধীকর্মীরূপে হরিজনদের সেবা ছিল তাঁর জীবন নিত্যপূজা। তাঁর দিলদরিয়া প্রাণের টানেই তিনি তাঁদের বুকে টেনে নিতে চাইতেন—তার অভাব কোথাও দেখলে অত্যন্ত ব্যথাহত হতেন। এই সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা বলি। উত্তর কলিকাতাতেই তখন থাকেন তিনি। একদিন তাঁর মনে হল—যে মুদাল-ঝাড়ুদার রোজ সাফাই করতে আসে তাঁদের বাড়ি, ওদের নিয়ে পঙ্‌ক্তিভোজন করবেন : অর্থাৎ আরও দু-পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব সহ একসঙ্গে ওদের নিয়ে বসে খাবেন। যেমন ভাবা, তেমন কাজ : হরিজন তথা অতিথিদেবতার শুভাগমনে ঘরদোর পরিষ্কার করা হল, এক জোড়া নতুন কাপড়ও আনা হল ওঁদের দেবার জন্য, জনকয়েক বিশিষ্ট গঠনকর্মীও আমন্ত্রিত হলেন।

যথাসময়ে ঝাড়ুদার ও তাঁর স্ত্রী উপস্থিত হলেন, সেবাব্রতী বিজয়লাল দুগাছি ফুলের মালা নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে ত্রস্তে সিঁড়ির গোড়ায় হাজির হলেন, তাঁর পেছনে কৌতূহলী বন্ধুদের একটি ছোট্ট দল। হরিজন-যুগল তো গৃহস্থের কাণ্ড-কারখানা দেখে প্রথমে অবাক, তারপর ভয়ে দে ছুট।

হরিজন ভাইবোনদের সেদিনের এই ব্যবহারে সাদাসিধে বিজয়লাল খুবই হতাশ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই!

বিজয়লালের সাহিত্যকৃতি আলোচনার স্থান এখানে নেই—তার যোগ্যতাও আমার নেই। কিন্তু এক দিকে 'দেশ'-এ ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত তাঁর 'মনের গভীরে' শীর্ষক গ্রন্থের গভীর মনস্তাত্ত্বিকতা, অন্য দিকে "সর্বহারাদের গান"-এ যাঁরা 'সবার পিছে সবার নীচে' তাঁদের চেতনা ও উত্থানের

জন্য তাঁর তীব্র ব্যাকুলতা বিজয়লালের সাহিত্যকে সত্যই প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির পর্যন্ত সমান গ্রহণীয় ও আদরণীয় করেছে।

রেখে-ঢেকে কথা বলা, হিসেব করে চলা এ ছিল একেবারেই তাঁর ধাতের বাইরে। সংসারী জীবনের স্বাভাবিক কদম প্রচুর পরিমাণে তাঁর সংসারেও ছিল, পথ চলতে গিয়ে অজস্র কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এই চারণকবিরও চরণ। তবু সহধর্মিণী ইলা দেবীকে পাশে নিয়ে, বেদান্তবাণীর শক্তিতে তিনি পাঁকাল মাছের মতই নির্মল রয়েছেন, কাদায় রয়েছেন কিন্তু কাদা তাঁর গায়ে লাগে নি। 'দাদা' কিংবা 'ভাই' সম্বোধনে যে নিকুণ্ঠ প্রীতির আলিঙ্গনে জানা-চেনা সবাইকে জড়িয়ে ধরতে পারতেন এই অজাতশত্রু দেশপ্রেমিক মানুষটি, তার তুলনা কোথায়?

একবার একজন অগ্রজপ্রতিম গঠন-কর্মীকে বিজয়লাল বলেছিলেন—"দাদা, আপনি আমাকে সব কিছুতে ছাপিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু পাগলামিতে কখনও না!"

এই পাগলা-ভোলাই বিজয়লালের আসল পরিচয়, হিসেবী মানুষেরা যাঁর নাগাল পাবে না।

এবং, অবশ্য স্মরণ করব, তাঁর এই জীবন-উৎসর্গের উষায় ছিলেন এক প্রদীপ্ত-বুদ্ধি আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, স্বগত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই গুরুর পুণ্য স্মৃতিতে প্রণাম নিবেদন করে বিজয়লাল 'সবহারাদের গান'-এর উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেনঃ

"পাণ্ডিত্য বিশাল ছিল—প্রাণ বৃহত্তর।
জাতিধর্মনির্বিশেষে সবার ভিতর
ঢেলে দিলে আপনার উদার ব্রাহ্মণ!
দারিদ্র্যের মাঝে চিত্ত ছিল অকৃপণ,
প্রেমের ঐশ্বর্যে পূর্ণ; জেনেছিলে সার:
সঙ্কোচই মরণ আর জীবন—বিস্তার।"

বিস্তৃততর বক্ষঃপটে জাতি, জীবন ও সংসারের অপরিমেয় বেদনা ও গ্লানি ধারণ করে বিজয়লাল গুরুকে অতিক্রম করেছেন। বাংলা তথা ভারতের যৌবনের সামনে আদর্শের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই। বৈরাগ্যসাধনে নয়, এই সংসার-জীবনেই লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানুষের সেবায়, জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তিতে এমন পাগলাভোলা মানুষ আর ক'টি আছে?

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার "মনের খেলা" বইয়ে সরল ভাষায় সহজ ভাবে মনস্তত্ত্ব আলোচনা করেছ — [illegible] "বিলিতি বৈজ্ঞানিক" গ্রন্থে যেই তত্ত্ব বিচারকে বেশ জটিলতর থেকে এনে তোমার সহজ [illegible] দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যের সংসারে এই মনস্তত্ত্বের স্থান উঠেছে — যাদের মন গ্রহণের শক্তি আছে তাদের কাছে উপাদেয় হবে। গল্পের মধ্যে লেখকের অলক্ষ্যে মনস্তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে — তুমি তাকে প্রকাশিত করেছ কিন্তু দুঃশাসনের রীতিতে তার মাধুর্য নষ্ট হয় নি। দৃষ্টি বুদ্ধি ও বিচারের তার সঙ্গে যেই রকম সাহিত্যের [illegible] মাধুর্যের [illegible] খুঁজে পেয়েছি। যে হেতু [illegible] কৃত্রিম বিচারের [illegible] একটা আলোচনা অত্যন্তই সহজ। ইতি ৭/১০/৩৩

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"[illegible] যে সমালোচনা
করেছে পড়ে খুসি হয়েছি।
প্রশংসায় সকলেই খুসি হয়
কিন্তু নিন্দুক প্রশংসায় খুসি হতে
[illegible] আরো [illegible] হয়ে থাকে।

বিজয়লালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

বিজয়লাল রচিত কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ

১। মনের খেলা, ২। রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ, ৩। অগ্রদূত, ৪। সাম্যবাদের গোড়ার কথা, ৫। কমিউনিজম, ৬। স্বর্গের ঠিকানা, ৭। রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীচিত্র, ৮। মরু-জয়ের সেনা ৯। সবহারাদের গান, ১০। সাম্যবাদের মর্মকথা, ১১। ঘরের মায়া, ১২। রাশিয়ার কথা, ১৩। মানুষের অধিকার, ১৪। বঙ্কিমের স্বপ্ন, ১৫। অভিশাপ না আশীর্বাদ, ১৬। ত্রয়ী, ১৭। সেনাপতি গান্ধী, ১৮। সভ্যতার ব্যাধি, ১৯। জনের গভীরে, ২০। অগ্রদূত, ২১। মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র, ২২। চারণ-গীতি, ২৩ বন্দীর উক্তি।

লেখকের কৃতজ্ঞতা : ১। বিজয়লাল-জননী কিরণময়ী (কলিকাতা), ২। শ্রীচারুপ্রভা সেনগুপ্তা (সিঁথি), ৩। ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু ও অভয় আশ্রম গ্রন্থাগার (বিষ্ণুটী), ৪। শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় (বীরভূম), ৫। শ্রী কে সি মহাপাত্র (বেলগাছিয়া), ৬। শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন)।

সুরের বাদশা আমীর খাঁ

রবি বসু

সুরসভায় সুরের বাদশা

কয়েক বছর আগেকার কথা। বড়ে গোলাম আলি খাঁর মহাপ্রয়াণে মর্মাহত আমীর খাঁ শোকবিহ্বল কণ্ঠে বলেছিলেন, 'সুরের শেষ সম্রাট চলে গেলেন।' তার জবাবে গোলাম আলির সুযোগ্য পুত্র মুনাব্বর খাঁ বলেছিলেন, 'কিন্তু হিন্দুস্থানে এখনও একজন বাদশা আছেন। শের আমীর খান। আমরা তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছি।'

সেই সুরের বাদশা অকস্মাৎ, অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবে, সুরের জগতে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করে চলে গেলেন। মাত্র ৬২ বছর বয়সে তাঁর জীবনান্ত ঘটল। তাও সাধারণভাবে নয়, একটি মোটর দুর্ঘটনায়। দুঃখটা সেই কারণে আরও বেশি করে বাজছে।

বাষট্টি বছর বয়স হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে পরিণত বয়স, কিন্তু একজন শিল্পীর বেলায় এ-কথা প্রযোজ্য নয়। ওই-রকম একটা বয়সে শিল্পীর কাছে আমাদের কিছু প্রাপ্য থাকে। সকল সাধনার অন্তে নতুন কিছু সৃষ্টির বয়স ওটা। আমীর খাঁ সাহেবও নতুন কিছু সৃষ্টির কথা ভাবছিলেন, কাজও করছিলেন, অকস্মাৎ সে কাজে যবনিকা পড়ল।

আর কোনদিন কোন আসরে আমীর খাঁর কণ্ঠে শোনা যাবে না তাঁর প্রিয় রাগ মারোয়া, কিংবা মুলতানী, দরবারী কানাড়া, শুদ্ধকল্যাণ ললিত অথবা ইমনী [illegible] গাইতেন সেই কলাশ্রী, [illegible] ভৈরো কিংবা নিজের সৃষ্ট চন্দ্রমধুর খাপ (চন্দ্র-কোষ ও মধুকোষের সংমিশ্রণ)। ইন্দোর ঘরানার এই শিল্পী কলকাতাকে, কলকাতার শ্রোতাকে বড় বেশি ভালবাসতেন। অনুষ্ঠান থাক আর না থাক প্রায়ই ছুটে আসতেন কলকাতায়। এই কলকাতাতেই ১৯৫২ সালে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে গান গেয়ে তিনি প্রথম সারির শিল্পীদের মধ্যে জায়গা করে নেন। এই কলকাতাতেই ১৯২৩ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তাঁর প্রথম বেতারে গান গাওয়া। আর এই কলকাতাতেই ১৯৭৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে আমীর খাঁর জন্ম ইন্দোরের আকোলা শহরে। শোনা যায় আমীর খাঁ কারও কাছে নাড়া বাঁধেননি। তাঁর তালিম হয়েছে প্রধানত তাঁর বাবা শমীর খাঁর কাছে। শমীর খাঁ ওরফে শাম্মু, ছিলেন নামকরা বীণকার ও সারেঙ্গীয়া। আমীর খাঁর পিতামহ ছঙ্গে খাঁ ছিলেন [illegible] ইন্দোর ঘরানার স্রষ্টা হিসেবে যাঁর নাম অনেকে উল্লেখ করেন। সুতরাং আমীর খাঁও ইন্দোর ঘরানারই শিল্পী। অনেকে অবশ্য তাঁকে কিরানা ঘরানার শিল্পী বলেও মনে করেন। একই শিল্পীকে দুই ঘরানার মনে করার কারণ কি? এর পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

কিরানা ঘরানার প্রধান ধারার প্রবর্তক সঙ্গীতসম্রাট আবদুল করিম খান ও তাঁর ভাগ্নে আবদুল ওয়াহিদ খান বেহরে। এই ওয়াহিদ খাঁ সাহেবের কাছেই যুবক আমীর খাঁ সংগীতশিক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ওয়াহিদ খাঁ তাঁকে আমল দিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ওয়াহিদ খাঁর ক্লাশে আমীর খাঁ সারাক্ষণ চুপ করে বসে থাকতেন। কোন কথা বলতেন না। চুপ করে বসে রেওয়াজ শুনতেন। অন্যের তালিম শুনতেন। তারপর উঠে চলে যান। বাড়িতে গিয়ে রেওয়াজ করেন। ওয়াহিদ খাঁ সাগরেদদের কাছে বলতেন, বেটা এখান থেকে জিনিস মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু বাছাধন তো জানে না যে এসব জিনিস গলায় তুলতে জিব বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু আমীর খাঁ শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছেছিলেন? অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনার উল্লেখ করলে সেটা বোঝা যাবে। এটা আবদুল ওয়াহিদ খানের শেষ জীবনের কথা। সেদিন রেডিওতে গান হচ্ছিল মুলতানী রাগের খেয়াল। শয্যাশায়ী ওয়াহি

খান শুনতে শুনতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমার জোয়ান বয়সের গান এরা কোথায় পেল?' গানের শেষে গায়কের নাম ঘোষণা করা হল : আমীর খাঁ। বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উপস্থিত সাগরেদদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ওয়াহিদ খাঁ : 'তোরা সবাই আমার ফালতু চেলা। আসল সাগরেদ ওই গাইছে শোন। সকলকে মেরে শেষ পর্যন্ত ওই বেরিয়ে গেল, ওকে তোরা কেউ মারতে পারলি না।'

কিন্তু ঘরানা নিয়ে যে এত ঝটিকাবর্ত সে সম্পর্কে আমীর খাঁর মত কি? একবার এক সংগীত সম্মেলনে সংগীতজ্ঞদের বিভিন্ন ঘরানার বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পীর শিল্পজীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে কিছু বলতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে আমীর খাঁ সাহেব যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ : শিল্পীর আত্মসমীক্ষা, সংগীত সচেতনতা ও বিরামহীন অনুশীলন যত বেশি হবে, যত দিন যাবে, সেই শিল্পীর গণ্ডীর সংকীর্ণতা ততই হ্রাস পাবে। ক্রমে সে তার বংশধারা বা গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করে অর্জিত জ্ঞান-লব্ধ সম্পদ থেকে নিজের স্টাইল গড়ে নেবে। স্বকীয়তায় সে নিজেই নিজের ঘরানা সৃষ্টি করবে। বস্তুত প্রজ্ঞা ও পরিণতিই শিল্পীর কাম্য। কোন বিশেষ ধরনের অভ্যাস বা কালচারাল ম্যানারিজমের প্রতি অনুরাগবোধ বা আসক্তি নয়। এ-কথা তো সর্বজনীন সত্য যে দাসত্ব থেকে মুক্ত করাই শিল্পের লক্ষ্য।

বলা বাহুল্য আমীর খাঁর এই অভিমত অনেককেই খুশি করতে পারে নি। কিন্তু এ অভিমতের যাথার্থ্য অস্বীকার করবারও উপায় নেই।

আমীর খাঁ কেন অনুষ্ঠানে ঠুমরী গাইতেন না। এ নিয়ে অনেকের অনেক অভিযোগ আছে। এ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলতেন যে, পাবলিক পারফরমেন্সে তিনি ঠুমরী গান না। তাই ও অনুষ্ঠানে আলাদা করে ঠুমরী গাইবার কোন প্রয়োজন আছে বলেও তিনি মনে করেন না। কারণ ঠুমরীর বৈশিষ্ট্য যে সূক্ষ্ম মীড়, জটিল সরগম ও লীলায়িত পদক্ষেপ—সে সবই খেয়ালে প্রয়োগ করা যায়। তিনি বলতেন, 'দুনিয়ার [illegible] এবং রসকে হালকা করে দেখার অভ্যাসটা ভাল লাগে না আমার। শৃঙ্গার রসের চাপল্য নিয়ে এত মাতামাতি কেন করবে মানুষ। আনন্দ মানেই তো আর উত্তেজনা উন্মাদনা exotic fun নয়। শ্রীকৃষ্ণ নয় একটি বিরাট বিশ্ব-পুরুষ, কে কবে ছেলেখেলায় কার আঁচল ধরে টেনেছে কি না টেনেছে কার মটকি [illegible] ফাটিয়েছে, কার চোখে জল ভরিয়ে দিয়েছে—এই নিয়েই গানের ধুম। আমার তো মনে হয় এতে যোগেশ্বর কৃষ্ণের নামের অমর্যাদা করা হয়।'

এই প্রসঙ্গে বড়ে গোলাম আলি সাহেবের কথা উঠেছিল। আমীর খাঁ দুঃখ করে বলেছিলেন, 'যাঁর গুদামে হীরে জহরত ঠাসা রয়েছে, আমরা তার দু-চারটে রঙীন পাথর আর ঝুঠো মোতী নিয়েই নাচানাচি করলুম। ও'র খেয়াল শুনলে পত্থর পিঘল যাতা হৈ, অথচ সবাই খালি নাজুখ চীজই শুনতে চাইবে।'

এ নিয়ে একদা ও'দের দুজনের যে কথাবার্তা হয়েছিল সেটাও উল্লেখযোগ্য। আমীর খাঁ একটু দুঃখ করেই ঘটনাটা বলেছিলেন। তিনি বললেন, "আমি ঠুমরী গাই না সেটা জেনেও খাঁ সাহেব বারবার বলতে লাগলেন—'যে ঠুমরী গায় না, তার খেয়ালে জান নেই'......। আমি প্রথমে চুপ করে রইলুম। তারপর মাথা নেড়ে সায় দিলুম। শেষে এক সময় তাঁকে বললুম, 'হুজুর, গুস্তাকি মাফ করবেন, আপনি হিন্দুস্থানের সিংহ, আপনার আওয়াজে পশু পাখি পর্যন্ত মুগ্ধ হয়, আসল জিনিসে যারা আপনার মত সিদ্ধ হয়নি তারাও যখন আপনার অনুকরণ করে বাঈঠুমরী গেয়ে বেড়ায় তখন গান-বাজনার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি শিউরে উঠি—'। গুলাম আলি চুপ করে রইলেন, তারপর আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'ঠিকই বলেছ তুমি।'"

আমীর খাঁর খেয়ালের ধ্যানগম্ভীর রূপটি সহজে ভোলবার নয়। তাঁর গায়কীতে করুণ রস ও শান্ত বৈরাগ্যের প্রভাব বেশি। বিষাদঘন অতন্দ্র রাগগুলির প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল। কোন তাড়া-হুড়ো নেই, ধীরে, অতি ধীরে রাগের রূপটি উন্মোচিত হচ্ছে। উনি নিজে ও'র গানের প্রসঙ্গে পাহাড়ে চড়ার উপমা দিতেন। উনি বলতেন, 'পাহাড়ে চড়ায় ধীরজ চাই। আর অনবরত উঠে যাওয়া চাই। দাঁড়ালে পা পিছলে যাবে। দৌড়ে উঠতে গেলে গড়িয়ে পড়বেই। যারা তোমার দৌড় দেখে হাত-তালি দিয়েছে, তোমার অসহায় পতন দেখেও তারা হাততালি দেবে, বলবে, বেটা বড় কেরামতি দেখাতে গিয়েছিল। তার চেয়ে ধসোনা পাহাড়েই চড়ি। কষ্ট আছে, কিন্তু আনন্দও তো অফুরন্ত। তুমি আনন্দ পাও, পেয়ে মুগ্ধ হও। তোমার কাছে সে আনন্দের সংবাদ নিতে সবাই আসবে। তোমার চোখে মুগ্ধতার ছবি দেখে তারাও ভাগীদার হতে চাইবে।'

নিখুঁত শুদ্ধ রস পরিবেশন করলে শ্রোতারা গ্রহণ করতে পারবে না, এই অছিলায় তাদের ভেজাল বা শস্তা জিনিস দেওয়ার অপচেষ্টা আমীর খাঁ পছন্দ করতেন না। তাঁর গানের ফিলসফি ছিল ভিন্ন। তিনি বলতেন, 'আমি নিজেকে জানতে চাই। সে জানার নাম আনন্দ। আমি তারই স্বাদ দিতে চাই শ্রোতাদের। লোকের মনো-রঞ্জনের চাহিদা মেটাবার জন্যে আমি শস্তা জিনিস নিয়ে নিচে নেমে আসব কেন? দরকার হলে হাত ধরে তাদের টেনে তুলব......সংগীত কোঈ আমীর খানকে বাপ কী দৌলত তো নহী, য়হ সভীকে খাজানা হ্যায়......এ সঙ্গীত আমার পৈতৃক সম্পত্তি তো নয়, এ রত্নাগারে সকলেরই সমান অধিকার।'

সারা জীবন এই সাধনাই করেছেন আমীর খাঁ। অহংকারের লেশমাত্র ছিল না তাঁর। ছোট হোক বড় হোক শিল্পীদের সম্পর্কে ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও স্নেহ। রেডিওতে গান হচ্ছে। সাধারণ কোন গায়ক। 'বেসুরো' বলে কেউ বন্ধ করে দিলে চটে যান। সেকি। একটা লোক গাইছে। ঠিক হোক, ভুল হোক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, তুমি শেষ পর্যন্ত শুনবে না? এত কিসের অধৈর্য! বেশ তো, তার কোথায় ভুল হচ্ছে, বিশ্লেষণ করে বার কর। সাবধান হও, যাতে তোমার একই ভুল না হয়। খারাপ না শুনলে তোমার আত্ম-সমীক্ষার ভাব জাগবে কেন! প্রতি মুহূর্তে নিজেকে সংশোধন না করলে কেউ প্রকৃত শিল্পী হতে পারে না।

এটা তাঁর নিছক উপদেশ নয়, উপলব্ধি।

আর একবার একটি সম্মেলনে ঠিক হল খাঁ সাহেব বেহাগ গাইবেন। আসরে গিয়ে দেখলেন একটি ছোট মেয়ে বেহাগ খামাজ বাজাচ্ছে। খাঁ সাহেব রাগ বদলালেন। 'না, ওই ছোট্ট শিল্পীটির রাগের এফেক্ট নষ্ট করা চলবে না। আমি পূরিয়া কল্যাণ গাইব।'

শিল্পী হিসেবে শুধু নয়, মানুষ হিসেবেও কত বড় ছিলেন তিনি তা ওই ছোট্ট একটি ঘটনায় বোঝা যায়। তাই শুধু একজন বড় শিল্পী নয়, একটি বড় মনের মানুষের অভাব আমরা সর্বান্তঃকরণে বোধ করছি আমীর খাঁর মৃত্যুতে।

মৃত্যু নিয়ে একবার কথা হচ্ছিল। আমীর খাঁ নিজের কব্জি টিপে বললেন, মওত আনে, য়্যহাঁ লয় রুক যাতা হৈ......' বুকে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'য়হাঁসে সুর ছুট যাতা হৈ—ইতনাহী না?'

অর্থাৎ বুকে আর সুর নেই, নাড়ীতে নেই ছন্দ, মৃত্যু তো তারই নাম।

সুরের বাদশাকে সে মৃত্যু কোনদিনই স্পর্শ করতে পারবে না। শিল্পী আমীর খাঁ অমর।

---

* এই নিবন্ধ রচনায় জহুরী সদাগর রচিত 'কোমল আলোর মৃগয়া ও স্বরাহত নিষাদ' প্রবন্ধ থেকে প্রচুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

॥ চৌত্রিশ ॥

স্ট্যালিনগ্রাড থেকে একেবারে বাঙলার মাটিতে, নগ্ন শ্বেতাঙ্গদের দেখে গ্রাম্য সোমত্থ স্ত্রীলোকের ভয়ে দৌড়ে পালানোর দৃশ্য অভাবিত, অবাস্তব রকমের বিস্ময়কর। নগ্ন শ্বেতাঙ্গকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বোঝা যায়, তাড়া করবার কোনো মতলব তার নেই। সে দৌড় দেয়নি, একটি যুবতী স্ত্রীলোককে এগিয়ে আসতে দেখে সেও কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, 'বিবি' বলে ডেকেছিল, এবং যুবতী বউটি সহসা তার সামনে নগ্ন শ্বেতাঙ্গকে দেখে ফণা-তোলা দংশনোদ্যত সাপ দেখার মতোই ভয় পেয়েছিল, যেন নির্ঘাৎ মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচবার জন্য, আর্তস্বরে চিৎকার করে পিছন ফিরে দৌড় দিয়েছিল। পথের আশে-পাশে, দু-একজন যারা দূরে ছিল, তারাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, যদিচ সেটা মোটেই সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করা বা বাধা দেবার উদ্দেশে না, বরং তাদের চোখে ভয় আর সংশয়ই ছিল, এবং সহজেই অনুমান করা যায়, মাতাল ল্যাংটা সাহেব তাদের সংস্কারের অন্ধকারে কালান্তক যম, দুর্ঘটনা কিছু ঘটতে দেখলেই দৌড়ে পালাবে। কিন্তু ফ্রেডারিকের ডাকে নগ্ন শ্বেতাঙ্গ দাঁড়িয়ে পড়ে, হাসে এবং বলে, 'ওকে ধরা বা তাড়া করার কোনো মতলবই নেই।'

ফ্রেডারিক বিরক্ত স্বরে বলে, 'যাই হোক, তুমি রাস্তার ওপর থেকে চলে এসো, পোশাক পরে নাও। কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষেই এ দৃশ্য খুব সুন্দর না, ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে, সবাই তাড়াতাড়ি যাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও।'

ফ্রেডারিক একটু বিব্রত হেসে সবিতা পণ্ডিত এবং সকলের দিকে একবার তাকায়, বলে, 'সামরিক পোশাক পরে একবার বেরিয়ে পড়লে মানুষ তার পেছনটা অদ্ভুতভাবে ভুলে যায়।'

সবিতার কমনীয় মুখ গম্ভীর, তথাপি ও একটু হাসবার চেষ্টা করে। মোহন বলে ওঠে, 'আমাদের দেশের লোকেরা ভীরু।'

সবিতা নরম স্বরে বলে, 'পৃথিবীর বে-কোনো দেশেই গ্রামের মেয়েরা এরকম দৃশ্য দেখলে ভয় পেতো। এটা আমার আর অপরের দেশের কথা কিছু না।' তারপরেই সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'বিদায় কমরেড ফ্রেডারিক, পরে আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়।' ফ্রেডারিক সকলের সঙ্গেই হাত বাড়িয়ে আবার করমর্দন করে।

মোহন করমর্দনের সময় বলে, 'আমি দু-একদিনের মধ্যেই আসবো।'

'স্বাগতম।' ফ্রেডারিব মোহনের হাত ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দেয়, আন্তরিক ভাবে হাসে।

সেই নগ্ন শ্বেতাঙ্গটি তখন ঘাটের কাছে ফিরে গিয়েছে। পোশাক পরতে পরতে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে এবং হাসাহাসি করে। মনে হয় স্ত্রীলোকটির বিষয়েই তারা কথা বলে। ফিরে চলার পথে সবিতার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তখন সামনের দিকে। কিছু দূরে, পথের ওপর বা ধারে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত লোকদের অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ওদের দিকে। পালিয়ে যাওয়া সেই বউটিকে দেখা যায় না। লোকেরা অধিকাংশই গ্রামের, তাদের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় ল্যাংটা গোরাদের সামনে দিয়ে যাবার মতো সাহস বা ভরসা কারোরই তেমন নেই। উত্তর দক্ষিণে রেল লাইনটা পরিষ্কার দেখা যায়, মাল গাড়িটা এখনো চলমান, অতিকায় কেন্নোর মতো দূরে দক্ষিণে এঞ্জিনের ঝক ঝক শব্দ হয়। আকাশে ধোঁয়ার বৃত্তাকার চক্র লাফিয়ে ওঠে, অনেকটা মোটর টায়ারের মতো, আস্তে আস্তে ফেটে মিলিয়ে যায়। মালগাড়িটার জন্য, রেল লাইনের ওপারগামী সকলের, এবং এপারগামীদের পথ বন্ধ। সবিতার চোখে পড়ে, রেল লাইনের ওপার থেকে মাথা নিচু করে অনেকে এপারের দিকে দেখে। নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে।

'সেই বউটা কোথায় গেল?' সবিতা পণ্ডিত জিজ্ঞেস করে রাস্তায় দাঁড়ানো এক-জন গ্রাম্য লোককে যার মাথায় শহরের সওদার বোঝা।

লোকটা তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দেয় না, যেন জবাব দেওয়া উচিত কী-না ভেবে নেয়। তারপরে না বোঝবার মতো ভাব করে অন্য দিকে ফিরে তাকায়। কাছাকাছি আর একজন দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি সবিতা পণ্ডিতদের দিকেই, জিজ্ঞেস করে, 'ওখানে কী হচ্ছে বলেন তো বাবুরা? যাওয়া যাবে তো?'

মোহন বলে, 'যাওয়া যাবে না কেন। বাঘ না ভাল্লুকে ওরা, খেয়ে ফেলবে?'

'বাঘ ভাল্লুক হলে তো একটা কথা থাকে, পাগলা কুকুরকে বিশ্বাস নেই বাবু।' একজন বলে ওঠে রাস্তার ধারে পাতা-ঝরতে শুরু করা শিমুলতলা থেকে। লোক-টার কোমরে কিছু পরা আছে কী না বোঝা যায় না, একটা মোটা ময়লা কাঁথা গলা থেকে হাঁটুর ওপর অবধি জড়ানো। মাথায় একরাশ চুল, কুচকুচে কালো, রোগা ঢ্যাঙা হলদে চোখ। না থেমেই সে আবার বলে,

'এটা কি একটা কথার কথা হল, বলেন? বলতে গেলে এখনো এক পোহর বেলা, রাস্তার ধারে উদোম হয়ে সব জলে ঝাপাই-ঝুড়তে লেগে গেল? এ কি শালা সব মামদো ভূত নাকি রে বাবা!'

একজন শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হেসে উঠে বলে, 'ঠিক কাঁচ কাঁচাদের মতন, না? কিন্তু তাকাতে বাপু লজ্জা করে। ওরা গোরা হলেও বয়স তো হয়েছে।'

মোহন বলে, 'তা তোমাদের কী আছে, তোমরা চলে যাও না।'

'উরে বাবা!' একজন বলে ওঠে, 'ওর নাম গোরা মিলিটারি, দেখলেই শালা এমন তাড়া করে!'

অজয় বলে, 'আমরা এলাম আমাদের কিছু করলো না তো?'

শিমুলতলার লোকটি বলে, 'আপনারা হলেন বাবু, ওদের সঙ্গে কইতে বলতে পারেন। একটা ল্যাংটা লোক, মাথাটাথা খারাপ না, যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, কথাটা কী বলব বলেন তো? হাগনন্তির লাজ নেই, দেখনন্তির লাজ? চোখ পড়লে দৌড়ে মারতে আসে।'

অজয় হা হা করে হেসে ওঠে। এ রকম সরল কথার বিস্ময়ের জবাবে আর কী-ই বা করা যায়। হাসির ছোঁয়া লাগে সকলের মুখেই। মাথায়-বোঝা লোকটি বলে 'সেদিনে কী হয়েছে, সকাল বেলা নতুন মুলো নিয়ে বাজারে যাচ্ছি, শালা কথাবার্তা নেই, বড় রাস্তার ওপর এক গোরা থাবা দিয়ে তুলে কচ্‌কচ্‌ করে খেতে লাগল। ভাবলাম মুখে দিয়ে ফেলে দেবে, ওরে শালা নাকের দুর্গন্ধ বন্ধ খেয়েই নিল। পয়সা অবশ্য অনেক-গুলোন দিয়েছিল। সে না হয় হল, হাঁ? কিন্তু এরকম উদোম উন্মাদ হয়ে থাকলে কার না ভয় করে বলেন? ওই তো মাঠের দিকে রয়েছে চাতোরার বিল, গায়ে গায়ে নারাণ দাসের ঝিল, ওখেনে গিয়ে ল্যাংটো হয়ে নাইলেই হয়। কাকপক্ষীও দেখতে পাবে না।'

অজয়ই আবার ওর চওড়া গোঁফ ছড়িয়ে হেসে জিজ্ঞেস করে 'নারাণ দাসের ঝিলের ধারে বুঝি কাকপক্ষী যায় না?'

কথাটার মজা সবাই হেসে উপভোগ করে। হলদে-চোখ শিমুলতলার লোকটিও। এবং হাসি মুখেই বলে, 'গোরারা আমাদের কাকপক্ষীই মনে করে বটে।'

সবিতা পলকের জন্য লোকটির মুখের দিকে তাকায়, তার চোখে যেন একটা বিস্ময়ের ঝিলিক খেলে যায়। বোঝা মাথায় লোকটা তখন লজ্জা পেয়ে বলে, 'ওই আর কি, কাকপক্ষী মানে মানুষের কথাই বলি।'

সবিতা পণ্ডিত এর আগের প্রশ্নটাই আবার করে 'কিন্তু বউটা কোথায় গেল, কেউ বলছো না কেন?'

শিমুলতলার লোকটি উত্তরের ঝোপঝাড় দেখিয়ে বললো, 'ওখানে গিয়ে লুকিয়েছে।'

সবিতা পণ্ডিত আশশ্যাওড়া বনের ঝোপের দিকে তাকায়। তারপরে মাঠ ছোট-খাটো নীল জলাশয়। সবিতা ঘাড় ফিরিয়ে রেল লাইনের দিকে তাকায়, মালগাড়ির লম্বা-চওড়া বগী প্রায় শেষ, গার্ডের কামরা দেখা যায়। এ সময়েই পুব দিক জীপ এবং ট্রাকের এঞ্জিন গর্জে ওঠে, এবং জীপের পিছনে পিছনে ট্রাক এগিয়ে আসতে থাকে। মোহন বিপিন অজয় সবিতার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। বিপিন বলে, 'চলো পণ্ডিত, গেট খুলে দিচ্ছে।'

জীপ এবং ট্রাক ওদের অতিক্রম করে যায়, সৈনিকেরা হাত তুলে চাস এবং সম্বোধন করে। সবিতা বিপিনকে বলল,

'এরা চলে যাক, তারপরে যাব। ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই, হয় তো নেমে বউটাকে খুঁজতে আরম্ভ করবে।'

মোহন ক্ষুব্ধ অবাক স্বরে বলে, 'ফ্রেডরিক থাকতে তা কখনো করতে পারে?'

সবিতা শান্ত ভাবেই বলে, 'একটা কিছু করে ফেললেই বা রুখছে কে? সবাই তো আর ফ্রেডরিক না, সে একলা সামলাবেই বা কেমন করে। শুনলেই তো, সামরিক পোশাক পরে একবার বেরিয়ে পড়লে মানুষ তার পেছনটা ভুলে যায়। কথাটার মধ্যে অনেক কিছু আছে।'

জীপ এবং ট্রাক যখন রেল লাইনগুলো পার হয়ে যায়, তখন শিমুলতলার লোকটা গলা তুলে ডাকে 'শরতের বউ বেইরে এস, শালারা চলে গেছে।'

সকলেই প্রায় এক সঙ্গে উত্তরের ঝোপ-ঝাড়ের দিকে তাকায়, কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দহীন ঝোপঝাড়ে কেবল বুলবুলি আর চড়াইয়ের ঝাঁক ঝাঁপাঝাঁপি করে। শিমুল-তলার লোকটি ঝোপঝাড়ের দিকে একটু এগিয়ে গলার স্বর আরো চড়িয়ে ডাকে, 'কী হল, অ শরতের বউ, বেইরে এস, ওরা চলে গেছে।'

জঙলা ঝোপঝাড় যেমন তেমনি থাকে। শরতের বউ বেরিয়ে আসে না, কোনো সাড়াও নেই। ইতিমধ্যে রেল-লাইনের ওপারে যারা মালগাড়ির জন্য আটকেছিল তারা এগিয়ে আসে। কাছে এসে একে-তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে এবং তাদের কথা শুনে বোঝা যায়, ইতিমধ্যেই তারা নাকি খবর পেয়েছে, একদল উলঙ্গ গোরা আশেপাশের গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব আরম্ভ করে দিয়েছে, অনেক 'মেয়েছেলেকে' ধরে নিয়ে গিয়েছে, যদিচ গোরাদের গাড়ি তাদের চোখের সামনে দিয়েই এই মাত্র গেল। রেললাইন পেরিয়ে শহরের দিকে যাদের যাবার তারা চলতে চলে যেতো, কিন্তু শরতের বউয়ের অন্তর্ধানে সকলেই স্থির ও কৌতূহলিত। কেউ কেউ ঝোপের মধ্যে ঢোকে। ঝোপের বাঁ পাশ ঘেঁষে খানিকটা উঁচু জমির উপরে বেরিয়ে ওঠে শিমুলতলার লোকটি এবং পূর্ব-উত্তর কোণে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'অই, যা ভেবেছিলাম। যতীন, দ্যাখো তো উই দূরে ছাতারে বিলের গা দিয়ে একটা মেয়েছেলের মতো ছুটতে দেখা যাচ্ছে না?'

বাঁক কাঁধে অল্পবয়সী একজন কাহারকিছিই ছিল, সে শিমুলতলার লোকটির কাছে উঁচু মাটিতে উঠে যায় এবং একটু তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, শরতদার বউয়ের মতনই লাগে যেন।'

'লাগে আবার কী, শরতের বউই ছুটছে! শিমুলতলার লোকটির স্বরে বিরক্তি আর উৎকণ্ঠা এক সঙ্গে ফেটে, বলে, 'একে বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি। বোঝ এখন ঠ্যালা। এতটা ঘুরে গাঁয়ে পৌঁছুতে এক পোহর রাত হয়ে যাবে। তার উপর আবার সঙ্গে কেউ নেই, একলা।' বলেই সে মুখের দু'পাশ হাতের তালু দিয়ে আড়াল করে চিৎকার করে ডাক দেয়, 'অ-শ-র-তের বউউ! " চিৎকার করতে করতেই সে উঁচু জমির ঢালু থেকে নামে এবং নির্দেশ করে, 'যতীন, তুমি আমার সঙ্গে এস।' বলে ছুটতে ছুটতে আসন্ন সন্ধ্যার শেষ হেমন্তের মগ্ন আকাশকে জাগিয়ে চিৎকার করে, 'এ-এ-এই বউ-উ-উ-উ!'...

সবিতা পণ্ডিত বলে, 'চলো, যাওয়া যাক।'

*

সন্ধ্যার ছায়ায় সাধুর গাড়ি ঘোড়ার

পায়ের ঘর্ষণের ও চাকার আর্তনাদের শব্দে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়ির আসনে বসে মধুমতী—মধুদি। সবিতা পণ্ডিত এবং অন্য সবাই লাইটপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। লাইটপোস্টের ঠুলির ঢাকনার মধ্যে আলো এখনো জ্বলেনি। স্টেশন রোডে লোকের ভিড়, কিন্তু কেউ তেমন কর্মব্যস্ত না, ব্যস্ত যাত্রীদের ছুটোছুটিও নেই, আজ রবিবার। পথ চলতি অধিকাংশ বাঙালীর দৃষ্টি সাধুর গাড়ির আসনে বসা মধুদির দিকে—মধুমতী রায়, গার্লস হাই ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস, বিদুষী সুন্দরী এবং অনন্যা এবং এখনো তরুণী বলে মনে হয়। চোখে হাসির ঝিলিক, প্রথমে দেখলেন সবিতা পণ্ডিতের দিকে, তারপরে দৃষ্টি বাকিদের প্রতি, বললেন, 'মনে হচ্ছে কমরেডরা কোথা থেকে দিগ্বিজয় করে ফিরছেন?'

সবিতা বলে, 'হ্যাঁ আজ আমরা গ্রামে কৃষকদের কাছে গেছলাম মালতী বিলের ওপারে।'

'কী বিল বললেন?' মধুদি একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করেন, কণ্ঠার নিচে ও'র শাড়ির পাড় শিথিল হয়ে পড়ে।

সবিতা আবার বলে, 'মালতী বিল।'

মধুদি বলেন, 'প্রায় কবিতার মতো শোনাচ্ছে, বিলের নাম মালতী! সত্যি নাকি?'

সবিতার সঙ্গে সবাই হাসে, বিপিন ছাড়া। সবিতার কোমল মুখ আর আয়ত কালো উজ্জ্বল চোখের সঙ্গে গলার গম্ভীর স্বরটা যেন মেলানো যায় না, বলে, 'বিলের নাম মালতী শুনে এতো অবাক হবার কী আছে? বাঙলাদেশে নদীর নাম মধুমতীও তো হয়, সাঁওতাল পরগণায় বিখ্যাত জায়গার নাম মধুপুর।'

মধুদি খিলখিল করে হেসে ওঠেন, এবং মুহূর্তেই আবার হাসির উজ্জ্বল আবেগকে সামলে নেন, কিন্তু তার মধ্যেই সেই হাসি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাড়োয়ান সাধু যেন পাথরের মূর্তি, আসনে নিশ্চল, দৃষ্টি সামনের দিকে। মধুদি বলেন, 'কমরেড পণ্ডিতের দেখছি জলস্থলের নাম সব মুখস্থ। তা যাই বলুন, মালতী বিল নামটা কিন্তু খুব সুন্দর। বিলটাও কি তেমনি সুন্দর?'

মোহন জবাব দেয়, 'আমি বলছি মধুদি, কপোতাক্ষী বলতে পারেন।'

মধুদি তাঁর সরস ব্যক্তিত্বের সঙ্গে হাসিতে যেন ঠিনঠিন করে বাজেন বলেন, 'চমৎকার? রিয়্যাল একসপ্রেশন অব এ পোয়েট।'

সবিতা বলে ওঠে, 'কিন্তু আমরা যে গ্রামটায় গেছলাম, তার নাম বোদাই।'

'হোয়াট!' মধুদি যেন চমকে ওঠেন, ভ্রূকুটি চোখে সবিতা পণ্ডিতের দিকে তাকান।

মোহন বলে, 'হ্যাঁ, গ্রামটার নাম বোদাই। তা বলে যেন ভাববেন না, বাঙালদের সেই ভোদাই না কী বলে তা-ই।'

সবিতা হাসতে হাসতেই খানিকটা ধমকের সুরে মোহনকে বলে, 'যা জানো না, তা বলো না। কোনো বাঙাল ভোদাই বলে না, তারা বোদাই-ই বলে, দ্য ওয়ার্ড মীনস-এ ফুল, অ্যান্ড দিস ইজ নট অ্যান অবসিন ওয়ার্ড।'

কথাটা বলে সে মধুদির দিকে তাকায়। মধুদির আরক্ত অস্বস্তিকর মুখে যেন একটু স্বস্তি ফিরে আসে, বলেন, 'আমিও বাঙাল তবে এসব কথা আমার জানা নেই, আর মালতী বিলের সঙ্গে গ্রামের নামের কনট্রাসটা একটু বেশি। তা যাই হোক, বেরনো হয়েছিল কখন?'

সবিতা পণ্ডিত বলে, 'ভোরবেলা।'

'আর এই এখন ফেরা!' সাধুর গাড়ির আসনে বসা মধুমতী রায়ের অবাক উৎকণ্ঠিত স্বর যেন হঠাৎ সাধারণ ঘরকন্না করা বধূর মতো শোনায়, 'তা কমরেডদের সারাদিন কিছু খাওয়া হয়েছে?'

'নিশ্চয়।' সবিতা পণ্ডিত বলে, 'আওয়ার আউটলুক ইজ ভেরি রিয়্যালিস্টিক—।'

'রুজ, যু আর মেটিরিয়ালিস্ট, হুঁ?' মধুদির গ্রীবায় বাঁক লাগে, চোখের তারা অক্ষিপটের কিনারায়।

সবিতা ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বলে, 'হান্ড্রেড পার্সেন্ট। প্রচুর মুড়ি, ডাব, ডাল ভাত চচ্চড়ি খেয়েছি।'

মধুদির নড়াচড়ার মধ্যে ব্যস্ততা প্রকাশ পায়, কিন্তু গাড়ি চালাবার নির্দেশ না দিয়ে বলেন, যাক, অ্যান্টিক্যাপিটালিস্ট লড়াইয়ে না খেয়ে থাকতে হয়নি। তা আজকাল কি পণ্ডিতমশাই কলকাতায় আর চাকরি করতে যাচ্ছেন, না ইস্তফা দিয়েছেন?'

সবিতাকে এবার একটু বিরক্ত দেখায়, বলে, 'নিজে থেকে ইস্তফা দিই নি, তবে উইদাউট নোটিশ মাস খানেকের ওপর যাচ্ছি না।'

'তার মানেই ইস্তফা।' মধুদিও ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠেন, এবং এই প্রথম চোখে পড়ে তাঁর পান পাতার মতো চ্যাপ্টা বড় খোঁপায় একটু ঘোমটা টানা ছিল, তা খসে পড়ে—তিনি সবিতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখেন। না, ফরাসডাঙার কাঁচির ধুতি ধুলোয় লুটোয় না, পায়ে জুতোর চকচকানি নেই, গায়ে সোনালি রেশমীর জামা নেই, হাতে দামী সিগারেটের টিন নেই, মাথায় চুলে নেই ক্রিমের ঔজ্জ্বল্য, আগে এক পলকেই যাকে দেখলে চেনা যেতো, সবিতাব্রত সেনগুপ্ত। মধুদি বলেন, 'এখন তা হলে হোলটাইম পার্টি অর্গানাইজার।

সবিতা স্পষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে অন্য কথা জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু আপনি রবিবার দিন এখানে কেন?'

মধুদি বলেন, 'উপায় ছিল না, জরুরি কমিটি মিটিং, অথচ জরুরি বলার কোনো মানেই হয় না। [illegible] কোথায়, আমাদের গায়ে তো এখনো আঁচও লাগেনি, এর মধ্যেই কমিটি মেম্বারদের [illegible] দুশ্চিন্তা হয়েছে, আমাদের ইস্কুলটা গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কী না।'

মোহন অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

'বোঝা পড়বে না?' বলতে গিয়ে মধুদির গলায় ঠিনঠিনিয়ে হাসি বেজে ওঠে।

সবিতা জিজ্ঞেস করে, 'আর মেয়েরা কী করে দূরের গ্রামে রোজ যাবে?'

মধুদির ঠোঁট ধনুকের মতো বাঁক খায়, বলেন, 'সে জবাব অবিশ্যি ডক্টর রায় দিতে পারেন নি—মানে আপনাদের এ শহরে যে ডাক্তার রায় আছেন, আমার অমধার ভদ্রলোকের নাম মনে থাকে না। শুনি নাকি উনি এ শহরের খুব বড় ডাক্তার, খুব বড়লোকও বটে, ইস্কুল কমিটির মেম্বার।'

মধুদির কথা শেষ হবার আগেই সবিতা, মোহন এবং অজয়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বিপিনের ওপর, ডাক্তার রায় বলতে ওর বাবাকেই বোঝায়। সবিতা বলে ওঠে, 'আপনি আমাদের বিপিনকে চেনেন তো, আমাদের পার্টির লোকাল সেক্রেটারি।'

মধুদি বিব্রত বা বিস্মিত হন না, বিপিনকে একবার দেখে বলেন, 'হ্যাঁ, ওকে চিনি বইকি, আপনিই তো আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।' বলে বিপিনকে চোখের কোল বসা, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি শক্ত মুখের দিকে
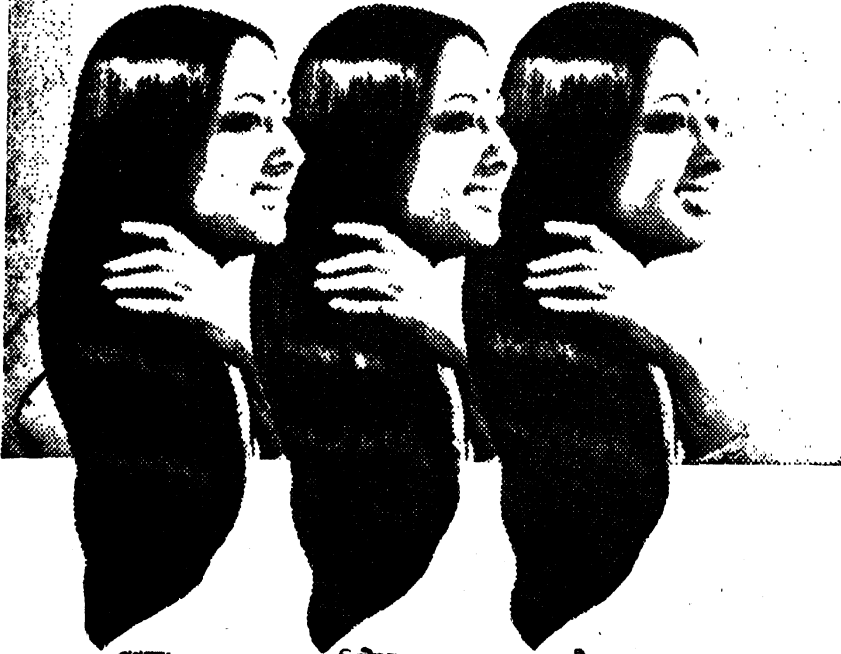
তাকিয়ে হাসেন এবং দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সবিতার দিকে ফিরে বলেন, 'ভাগ্যিস চটকলের সাহেব মিঃ ম্যাকরেল প্রেসিডেন্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বাধা দিতেই দেখলাম, সবাই একমত হয়ে গেলেন। এমন কি আমাদের ডাক্তারবাবুও খুব মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে মিঃ ম্যাকরেলকে সাপোর্ট করলেন। শত হলেও সাহেব তো।'

মধুদির গলায় আবার একটু হাসি বাজে এবং ব্যস্ততার ভাব ফোটে। কিন্তু মোহনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের হাতে লেখা ম্যাগাজিনের কী হলো, বন্ধ হয়ে গেছে?'

মোহন বিমর্ষ মুখে বলে, 'না, বন্ধ হয়ে যায় নি, কিন্তু ত্রিদিবেশটা চলে গিয়ে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেছে।'

মোহনের কথা শেষ হবার আগে, মধুদির মুখের হাসি উবে যায়, ঠোঁটের কোণ দুটি শক্ত দেখায়, এবং দৃষ্টি কঠিন, 'সে কি তোমাদের অন্ধের যষ্ঠি নাকি, সে না থাকলে আর তোমাদের পত্রিকা বেরোবে না? সে না হয় একটু আঁকতেই জানতো। পত্রিকা মানে তো আর আঁকাজোকা না।'

মোহন অবাক চোখে মধুদির দিকে তাকায়, বিব্রতবোধ করে। ত্রিদিবেশ সম্পর্কে মধুদিকে এতোটা বিরূপ এবং কঠিন ভাবতে পারে নি যা এখন অতিমাত্রায় স্পষ্ট। ও বলে 'না, মানে তা না, ত্রিদিবেশই তো সব করতো, ও-ই সব—।'

'ও তো তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে।' মধুদি বেশ কঠিন স্বরে বলে ওঠেন, 'আর যে-পথে গেছে, ভালো কিছু ওর দ্বারা আর হবে না। ওর আশা করে বসে থাকলে তোমাদের ম্যাগাজিন আর কোনো দিনই বেরোবে না। তোমরা নিজেরা যা পারো, তা-ই করো।'

মোহন প্রায় খানিকটা অসহায় চোখে সবিতা পণ্ডিতের দিকে তাকায়। সবিতার মুখ ঠিক গম্ভীর না, কিঞ্চিৎ বিব্রত, মধুদির দিকে তাকিয়ে বলে, 'এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো—মানে ত্রিদিবেশের বিষয়ে। আপনি কোন্ ট্রেনে যাবেন?'

মধুদির চোখে পলকে একটু জিজ্ঞাসু অবাক ঝিলিক খেলে যায়, হাতের কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে বলেন, 'ছটা সাতাশ। আজকাল এ সময়ে ট্রেনে যেতে সত্যি খুব খারাপ লাগে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, প্যাসেঞ্জারদের চেনা যায় না, বোঝা যায় না, কেমন সব লোক। তা আপনি কি আজকাল কলকাতায় মেসোমশায়ের বাড়ি যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন?'

'কেন?' সবিতা ভ্রূকুটি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

মধুদি বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম, হোল টাইম অর্গানাইজারের জীবনে আর কিছুই থাকে না। তা, আজই চলুন না, মেসোমশায়ের বাড়িতে রাত্রিটা থেকে কাল সকালে এসেই আবার পার্টির হাল ধরবেন।'

সবিতা হাসে, একটু ভাবে, তারপরে বলে, 'চলুন যাওয়া যাক।'

সে বিপিনের দিকে ফিরতে গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে বলে, 'তোমরা তা হলে চলে যাও। বকুলতলায় চন্দরদাকে একটু বলে দিও, আমি কাল সকালে ফিরবো, এখন কলকাতায় যাচ্ছি। ইউনিয়ন অফিসেও একটু খবর দিয়ে দিও।'

অজয় বলে, 'আমি ইউনিয়ন অফিসে খবর দিয়ে দেব, অফিসে যাবো তো।'

এই প্রথম মধুদি অজয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'এঁকে চিনলাম না তো।'

'অজয়—ওর নাম অজয় মল্লিক, এখানকার এ আর পি ওয়ার্ডেন, পার্টির সিমপ্যাথাইজার।' সবিতা বলে।

অজয় হাত তুলে নমস্কার জানায়। মধুদি জবাব দেন এবং সামনে তাকিয়ে বলেন, 'সাধু, চলো।'

সাধুর চাবুক উদ্যত হয়, ঝটিতি নেমে শিস দেয়, কিন্তু ঘোড়াকে আঘাত করে না। ঘোড়া চলতে আরম্ভ করে।

মোহনের অন্যমনস্ক নির্বিষ্টতা দেখে অজয় জিজ্ঞেস করে, 'ভাবছ কী?'

মোহন সংজ্ঞা ফিরে পায়, তথাপি অবাক চোখে তাকিয়ে বলে, 'মধুদি ত্রিদিবেশের ওপর এতো রেগে গেছেন? আশ্চর্য! ত্রিদিবেশকে এতো ভালবাসতেন!'

অজয় কোনো জবাব দেয় না, মোহনের পাশে পাশে চলতে থাকে। তাদের দুজনের কাঁধে গোটানো পতাকা। বিপিনও এগিয়ে এসে সঙ্গ নেয়, ওর মুখ কালো এবং শক্ত, জোরে জোরে সিগারেট টানে। মোহনদের বাড়ির কাছে এসে ওরা থামে। বাইরের ঘরের খোলা জানালায় কানন, মোহনের পিঠোপিঠি দিদি। অজয়ের সঙ্গে প্রথম ওর চোখাচোখি হয় এবং ওর চোখে কি একটা ঝিলিক হেনে যায়। খুশির? এবং ঠোঁটের কোণে হাসির একটা ইশারা?

কানন জানালা থেকে সরে যায়। অজয় নেমে যায়। বলে, 'আমি চলি, ঝাণ্ডাটা নাও, রাত্রে আসবো।'

মোহন বলে, 'এখন একটু চা খেয়ে যান, আমরা খাবো।'

মোহন আর বিপিন সিঁড়ি দিয়ে বাইরের বারান্দায় ওঠে। অজয় যেন তখনো দ্বিধা-গ্রস্ত। কানন দরজা খুলে দাঁড়ায়, পা ধোয়া, চুল বাঁধা, সন্ধ্যার ফোটা কৃষ্ণকলির মতো।

(ক্রমশ)

বিশ্ববিজ্ঞান

আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞানী সম্মেলন

নব-প্রাতিষ্ঠিত উপ-সংস্থা এশিয়ার যে সব অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রের সংস্কার এবং সমন্বয়ের কাজে হাত দিলেন, ছবিতে দেখান হল। —ফটো ঃ—দেশ

পৃথিবীর বয়েস কত?

বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি তেজষ্ক্রিয় পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলাস্তরের বয়েস প্রায় তিন শ' কোটি বছরের মত। ওঁরা ভেবেছিলেন, পৃথিবীর বুকে এর চেয়ে প্রাচীন শিলা সংগ্রহ করা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৭০ নাগাদ আলাস্কার একটি অঞ্চলে হিমবাহের গভীর স্তরের মধ্যে থেকে বিশেষ ধরনের কয়েকটি পাথরের টুকরো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা তেজষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে ওই সব পাথরের বয়েস নির্ধারণ করে বলেছেন, 'এই প্রথম আমরা পৃথিবীর প্রাচীনতম পাথরের সন্ধান পেলাম। যাদের বয়েস কম করেও চারশ' কোটি বছর তো হবেই!' পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের শিলাস্তর এবং চাঁদের ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের সঙ্গে পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের কিছু কিছু মিল দেখে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর বয়েস পাঁচ শ' কোটি বছর। অবশ্য এটাও অনুমান।

বয়েস যাই হোক না কেন, একটা কথা কিন্তু সবাই স্বীকার করবেন, প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকের মানুষ মহাকাশ সম্পর্কে যত বেশি খবর রাখে, সে তুলনায় তার পায়ের নিচের পৃথিবী সম্পর্কে তার জ্ঞান এখনও পর্যন্ত অনেক বেশি সীমায়িত। আজকের বিজ্ঞানীরা নিখুঁত-ভাবে আগে থেকেই বলে দিতে পারেন এই সৌরমণ্ডলের কোথায়, কখন এবং কীভাবে বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ বিচরণ করবে। অথবা আবর্তন, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ ভাবুন, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তার গঠন, তার ভূ-তাত্ত্বিক কার্যাবলী, তার অবক্ষয়, এ সবের উপর অনেক তথ্য এখনও পর্যন্ত অজানাই রয়ে গেছে। শান্ত সমাহিত কোন আগ্নেয়গিরি ঠিক কোন মুহূর্তে তার আগ্রাসী লাভার স্রোতে লোকালয়, অরণ্য অথবা ক্ষেতখামার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তার কোন সঠিক পূর্বাভাস এখনও পর্যন্ত যোগান সম্ভব হয় নি।

আগ্নেয়গিরি সম্পর্কিত ঘটনাবলীই নয়, পৃথিবীর ভূত্বক সম্পর্কিত আরও নানা রকম তথ্য আমাদের জানা দরকার। যেমন ধরুন জল। হ্রদ, নদী অথবা সমুদ্র— এরা জলের, অন্যতম আকর তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভূ-স্তরের মধ্যে দিয়ে নিয়ত যে জলের প্রবাহ চলেছে, সে সম্পর্কে কতটুকু তথ্য এ পর্যন্ত আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি? মুশকিল এই, মানুষ তার নিজের ইচ্ছেমত পৃথিবীর বুকে রাজনৈতিক সীমানা তৈরি করে নিতে পারে। যেমন ভারতের, বাংলাদেশের, সোভিয়েত দেশ অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অথবা পৃথিবীর যে কোন দেশের নিজ নিজ সীমানা আছে। রাজনৈতিক পর্যায়ে ওই সব সীমানার নিরাপত্তা বা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। তুলনায়, ভূ-তাত্ত্বিক সীমানার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মানুষের ক্ষমতা নেই বললেই চলে।

জলের কথাই ধরুন। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কত শত নদী নালা নেমে এসেছে সমতল ভূমির দিকে। তাদের জল মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এ ছাড়া, বৃষ্টি এবং নদীর জল ভূ-গর্ভের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হয়ে থাকে—ছড়িয়ে পড়ে এক দেশের রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করে অন্যত্র। ভূগর্ভস্থ এই জলকে কৃষি বা আর কোন ব্যাপারে কাজে লাগাতে গেলে ঠিক কী ভাবে এবং ভূ-স্তরের ঠিক কোন কোন অঞ্চল দিয়ে সেই জল প্রবাহিত হয়ে থাকে সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য আমাদের জানা দরকার। আর তার জন্যে দরকার ভূ-স্তরের মধ্যে প্রবাহিত জলস্রোতের মানচিত্র। এমন ধরনের মানচিত্র, যা দেখে বলে দেওয়া যেতে পারে, কোন্ দেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে ভূ-স্তরের ঠিক কোন্ কোন্ অঞ্চল ধরে জল স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। সেই স্রোত কোন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, অন্য কোন দেশের মধ্যে প্রবেশ করছে কী না, কী পরিমাণ ভূ-গর্ভস্থ জল কাজে লাগালে অন্য কোন দেশে ভূ-গর্ভস্থ জলের ঘাটতি হবে না, এ সবের উপর নানা রকম তথ্যাবলী। বলা বাহুল্য, একমাত্র আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের মানচিত্র তৈরি করা কখনও সম্ভব নয়।

শুধু জলই নয়। পৃথিবীর জনসংখ্যা দারুণভাবে বেড়ে চলেছে। বাড়ছে নানা রকম শিল্পোদ্যোগ। ওই সব শিল্পের জন্যে চাই প্রচুর লোহা, তামা, নিকেল প্রভৃতি নানা রকম ধাতু। সিমেণ্ট তৈরি করতে হবে। তার জন্যে চাই প্রচুর পরিমাণ চুনা পাথর, বকসাইট প্রভৃতি আকরিক পদার্থ। ইতিমধ্যে ওই সব ধাতু বা আকরিক পদার্থের অনেক উৎসই আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু চাহিদা যে ভাবে বাড়ছে, তাতে ওই সব উৎসের সঞ্চিত ভাণ্ডারগুলির পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে তাল সামলান দায় হয়ে উঠবে।

মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে পৃথিবীর বুকে ইতিমধ্যে প্রচুর ভূ-তাত্ত্বিক সম্ভারের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারা ছড়িয়ে আছে স্থলভাগে অথবা গভীর

সমুদ্রের নিচে। কোন্ কোন্ অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে আছে, কেন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই শুধু বিশেষ ধরনের ধাতু অথবা অধাতু বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, তার রহস্য উদ্ঘাটন আজকের ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় রকমের সমস্যা। ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

কিন্তু এ ছাড়াও আরও একটি মূল্যবান দায়িত্ব ভূ-বিজ্ঞানীরা এড়িয়ে যান নি। সেটা হল বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরির দায়িত্ব। এই সব মানচিত্রের সাহায্যে তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন পৃথিবীর কোন্ অঞ্চল প্রাথমিক শিলা দিয়ে তৈরি, কোথায় পাললিক শিলার সমাবেশ, অথবা পরিবর্তিত শিলার স্তর থাবা বাড়িয়ে বিস্তৃত অঞ্চল গ্রাস করে রয়েছে। এই সঙ্গে দেখান হয়েছে ভূ-স্তরের গঠন বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধাতু বা অধাতুর আকরিকের সম্পর্ক।

যেমন ধরুন, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া অথবা তাইল্যাণ্ডের বিশেষ ধরনের ভূ-তস্তরে তামা পাওয়া গেল। ওই ধরনের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন যদি ভারতেও কোথাও চোখে পড়ে তাহলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে ভারতেও তামা পাওয়া সম্ভব?

এ সব কথা ভেবেই ভূ-বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরির কাজে বিশেষ উৎসাহী হয়েছেন। ও'রা মনে করেন, বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সহযোগিতায় ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হলে, এক দেশের অভিজ্ঞতা অন্যদেশের ভূ-তাত্ত্বিক সম্ভার অনুসন্ধানের কাজকে সহজতর করবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, আজ থেকে তিরানব্বই বছর আগে (১৮৮১) ইটালির বোলোনোয় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান কংগ্রেস দ্য কমিশন ফর দ্য জিওলজিক্যাল ম্যাপ অভ দ্যা ওয়ার্লড' বা আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র সংস্থা নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন এর উদ্দেশ্য ছিল একটিই। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের প্রামাণ্য রূপ দেওয়া। বলা বাহুল্য, ওই সময় এই কমিশনের কাজকর্ম শুধুমাত্র ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ইউরোপের ভূ-তাত্ত্বিক ঘটনাবলী ছাড়া অন্যদেশের ব্যাপারে তাঁরা আর মাথা ঘামান নি। পরবর্তী সময়ে কমিশন সমগ্র পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র রচনার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। ঠিক হয়, এক একটি উপসংস্থা তৈরি করে তাদের দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি উপ-সংস্থা কাজও শুরু করে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিভাগ বা জিওলজিকেল সার্ভে-র ডাইরেকটর

জেনারেলের ওপর ওই সব উপ-সংস্থার সহ-সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

*

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে গত ১১ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন বসেছিল কলকাতার জাতীয় সংগ্রহশালার নতুন প্রেক্ষাগৃহে। ভারত সহ আফগানিস্তান, বার্মা, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড ইরান এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রায় পঞ্চাশজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানী। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক, আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র সংস্থার অংশস্বরূপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দূর-পূর্বাঞ্চলের জন্যে একটি উপ-মানচিত্র সংস্থার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। দুই, টেকটোনিক অর্থাৎ ভূ-স্তর বিজ্ঞান এবং মেটালোজেনি বা ধাতু-সংশ্লিষ্ট ভূ-স্তরের উপর আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের ব্যবস্থাও আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রের প্রদর্শনী। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি অনুষ্ঠান উদ্যোক্তারা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। কোন রকম বিতর্কের অবকাশ না রেখে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক যেসব সমস্যা নিয়ে বক্তারা আলোচনা করলেন, এই সম্মেলনে যেসব দেশ অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই নিশ্চয় তা থেকে লাভবান হবেন।

ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রের প্রদর্শনীতে (সামনে বাঁ দিক থেকে) ডঃ এম কে রায়চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ। শ্রী ঘোষের বাঁ পাশে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে জিওলজিকেল ম্যাপ অভ দ্য ওয়ার্লড-এর সভাপতি অধ্যাপক জে মারসাইস

কথা ছিল, মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত এবং খনি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য। অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ। এবং পৌরোহিত্য করেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ এম কে রায়চৌধুরী। উল্লেখ্য ডঃ রায় চৌধুরী নব-প্রতিষ্ঠিত সাব-কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দূর-পূর্বাঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র রচনা এবং ওই সব মানচিত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধনই হবে এই সাব-কমিশনের মূল উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভে ইতিমধ্যে এ দেশের ভূ-স্তর খনিজ সম্পদ, ভূ-গর্ভস্থ জল এবং ভূ-প্রযুক্তি বিষয়ের উপর একটি প্রামাণ্য মানচিত্র প্রকাশ করেছে। অনুরূপ আরও একটি মানচিত্র এবছর মার্চ-এর মধ্যেই প্রকাশিত হবে।

আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞানীদের এই সম্মেলনে যে সমস্ত অতিথি উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কমিশন ফর দ্য জিওলজিকেল ম্যাপ অভ দ্য ওয়ার্লড-এর সভাপতি অধ্যাপক জে মারসাইস, সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, কোরিয়ার ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সাং মান লি, শ্রী এস কে এম আবদুল্লা (বাংলাদেশ), ডঃ রফিকুল ইসলাম (বাংলাদেশ), মার্কিন দেশের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের ডঃ গিল্ড, সোভিয়েত দেশের ডঃ ডেরেংসব নিকোলাই লিয়েনোতিয়েভিচ প্রভৃতি।

এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মারসাইস বর্তমান লেখকের কাছে মন্তব্য করেন : 'পৃথিবীর মূল্যবান খনিজ পদার্থ জল। ভূ-স্তরের জলসম্ভারের ওপর আমাদের আরও অনুসন্ধান চালাতে হবে। জলের ব্যবহারিক দিকটি নির্ভর করছে ভূ-তত্ত্ববিদরা তার সম্পর্কে কী ধরনের তথ্যাবলী সরবরাহ করেন তার ওপর। আমার বক্তব্য, ভূ-তত্ত্ববিদদের সাহায্য ছাড়া কোন সংস্থাই পৃথিবীর জলসম্ভারকে কাজে লাগানর মত সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন না। ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন, এ দিকটা তাঁদের মনে রাখা দরকার।

অধ্যাপক লি বলেন, নব-প্রতিষ্ঠিত এই সাব-কমিশন কোরিয়ার ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

সংশোধন : বিশ্ববিজ্ঞান (২৬।১।৭৪) এর রচনায় ডঃ বি. আর সেনগুপ্তের ছবির ক্যাপশন সভাপতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পশু বিজ্ঞান বিভাগ হবে।

সমরজিৎ কর

ইনি হলেন কোমল... ইনি রহস্যময়ী
মোলায়েম ও কঠিন আর আগুনের উত্তাপ
ইনি সম্পূর্ণ মানবী
রেশমের মত মোলায়েম ট্যাল্ক — যেন প্রীতির
পরশ। আপনাকে সোহাগ করার জন্য।
স্বতন্ত্র এক সুরভি — আপনাকে মুগ্ধ করার জন্য।
আর তা'হোল আপনার ভেইল অব
লাভ — কেবল মাত্র হ্যালো-র কাছ থেকেই।
এর অত্যন্ত হাল্কা, অপূর্ব বিলাসিতায়
নিজেকে মাতিয়ে রাখুন। হ্যালোতে আছে
বিশেষ এক সুগন্ধের মিশ্রণ, তা' দিয়ে
আপনার বাঁধন না মানার সাধ মিটিয়ে
নিন। এটি আপনার সর্বাঙ্গে ঘণ্টার
পর ঘণ্টা নিবিড় ভাবে মিশে
থাকার প্রতিশ্রুতি দেবে।
ছড়িয়ে দিন ভেইল অব লাভ।
সুরভিত অবগুণ্ঠন—একমাত্র
হ্যালো-র কাছ থেকে।
হ্যালো ভেইল অব
লাভ ট্যাল্ক
মাধুর্য্যের অবগুণ্ঠন...
প্রণয়োপম সুকুমার
ওর জন্য...
হ্যালো
ভেইল অব লাভ
ট্যাল্ক
NEW
Halo

ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর

শিবরাম চক্রবর্তী

॥ ১৯ ॥

গভীর নিশীথে লালির সাথে আমার গৃহপ্রবেশ।

গলবদ্ধ তালাটাকে নিয়ে ভগ্ন কড়াটা অন্য কড়ার গলা ধরে ঝুলতে লাগলো, সেদিকে দৃকপাত না করে আমি লালির হাতটা নিজের হাতে নিলাম।

আদরের গরজে নয়, কৌতূহলের বশে।

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি, হ্যাঁ, কব্জি বটে একখানা। এত চওড়া কব্জি কোনো মেয়ের খুব কমই আমি দেখেছি। এমন কব্জি না হলে কি অমন শক্ত লোহার কড়াকে কব্জা করতে পারে?

'অত করে কী দেখছ?'

দেখছি, তোর এই হাতখানা—তুই পাণিগ্রহণের উপযুক্ত কিনা দেখছি ভাই।'

'বাড়ির বাসন মেজে মেজে হাতে কড়া পড়ে গেছে, তাই দেখছ? মার কাছে দাবাই আছে, হাতে মালিশ করে ফের নরম করে নেয়া যায়। দেখি তোমার হাতটা! ওমা, কী নরোম! মেয়েছেলেরও অধম যে গো!'

'তা বটে। দাঁত ছাড়া আর কিছু মাজি না তো এই হাতে।'

'কলমধরা লিখিয়ের হাত কি না! দিন কতক ডাম্বেল ভেঁজে শক্ত করে নিতে পারো ইচ্ছে করলে।'

'দরকার কি তার? গাল টেপবার জন্যে সৃষ্টি তো, কারো গালে চড় বসাবার জন্যে হয়নি—বক্সিংয়ের হাত না। কিন্তু—আমি ভাবছি কি...এই করাল হাত নিয়ে তোর বিয়ে হলে হয়। গলা টিপে তুই মানুষ খুন করতে পারিস। আশ্চর্য, এই বয়সেই তোর হাতে এমন কড়া পড়ে গেল রে!' আমি বিস্মিত হই।

'শুধু কড়া পড়েছে? —কী বলছো? কড়া হাতা খুন্তি হাঁড়ি বোগনো সব। শুধু বাসন মাজাই নয়, বাড়ির রান্নাবান্না সব কিছু আমাকেই করতে হয়, তা জানো?'

'কাজের মেয়ে তুই সত্যি? আমার যা কাজে তুই লেগেছিস না আজ! তোর জন্যেই রে ঠাঁই পেলাম আমার। যার হাতে তুই পড়বি সে ভাগ্যবান আমি মানি। যে বাড়িতে তুই যাবি তার ঘর সংসার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে উথলে উঠবে। যদি কোনো বড়লোকের

দেখছি তোর এই হাতখানা—তুই পাণিগ্রহণের উপযুক্ত কিনা তাই

বাড়িতে পড়িস তো তার হাঁড়ি ঠেলার থেকে বাসন মাজার থেকে—মানে, বাড়ি চালানো হতে গাড়ি চালানো অবধি কোনো কিছুর জন্যেই তাকে কখনো ভাবতে হবে না। শুধু কেবল নিজের দাড়ি কামানোটা তার হাতে থাকবে। আর ঐ টাকা কামানোটাও।'

'বলেছ বেশ।' সে হাসে: 'কিন্তু আমার বরাতে কি তুমি কোনো দিন বড়লোক হবে?'

তার ইঙ্গিতটা গায়ে না মেখে বলি—'কিন্তু আমার ভয়, বিয়ে তোর হলে হয়। গুন্ডা বন্ধুদের সঙ্গে মিশে তুই একটা মেয়ে গুন্ডা হয়ে উঠেছিস। শুধু হাতে তালা ভাঙতে পারিস, সিঁধ কাটতে জানিস, আরো কী কী তোর জানা কি অজানা সে কেবল তুই-ই জানিস। এখন এই মেয়ে গুন্ডাকে কোনো গুন্ডা ছাড়া কে আর বিয়ে করবে? সেই পেশোয়ারিটাই তোর কপালে নাচছে মনে হয়।'

'আমি গুন্ডা?'

'ব্যাকরণ ভুল হলো বুঝি? তা, গুন্ডা না বলে গুণ্ডি বলাই উচিত তোকে।'

'গুণ্ডি—তার মানে?'

'জানিস নে? যা পেলে অনেকেই লুফে নেয়। নিয়েই মুখে ফেলে দেয়। কোনো গুণ্ডিখোরের মুখে পড়লে আর রক্ষে নেই। সাবধান, তাদের কারো সম্মুখে যাসনে যেন। জাহান্নামে যাবি।'

'তোমার বোন জাহান্নামে যাক!'

উড়ো কথায় ওর রাগ দেখে আমার হাসি পায়—'আমার বোন কোথায় রে! মা আমার জন্যে কোনো মেয়ে গর্ভে ধরেননি, কোনো সহোদরার ব্যবস্থা করেননি বাবা। বোন আমার যতো, পরির মত হলেও, সব পরস্মৈপদী। যেমন তুই একটা—'

বলে, উদাহরণস্বরূপ, কবিগুরুর দু ছত্র একটু বদলে নিয়ে তুলে ধরি—কতো অচেনারে চিনাইলে তুমি/কত ঘরে দিলে কোণ/পরকে করিলে নিকট বন্ধু/পরিকে করিলে বোন॥

'আমি কিন্তু তোমার বোন নই, বলে রাখছি।' লালি বলে।

'সব বোন আমার পরোয়া হলেও তুই একেবারে বেপরোয়া।' আমি বলি।

কিন্তু লালির শাপটা ফলে গেছল সত্যিই। আমার বোনের মত পরিদেরই

একটাকে নিয়ে এক অবাঙালী ভদ্রলোক উড়ে গেলেন একদিন।

কথাটা হাওয়ায় উড়ছিল। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ার কালে যে ছেলেটার পরে সে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল সেই ছেলেটিই একদা আমার সেই বোনটির জীবনে অদ্বিতীয় হয়ে দেখা দিল।

উড়ন্ত কথাটা দুরন্তভাবে ঝড়ের মতই এসে পড়ল একদিন।

পায়োনীয়ারের কাউণ্টারে কী যেন কেনার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম, এক তরুণ যুবককে নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকল সে। কাউণ্টারে আমার পাশেই এসে দাঁড়ালো। কিসের যেন অর্ডার দিল তারপর।

আমাকে দেখে তার স্বভাবসুলভ উচ্ছ্বাসের কিছু না পেয়ে নিজের উৎসাহ সম্বরণ করলাম। না-চেনার ভাণ করলাম আমিও।

এটা সেটা কেনাকাটার পর সে যখন পাশের ভদ্রলোকের পকেটের মনিব্যাগটা বের করে সে-সবের দাম মিটিয়ে দিচ্ছে, তখন আমি আর সামলাতে পারলাম না।

—নেমন্তন্ন পত্রটা পাচ্ছি কবে রে?

—সময় হলেই পাবে।

—ডাকযোগে নাকি?

—তা কেন, আমি নিজেই কিংবা আমরা দুজনেই গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসব তোমায়। উপহার নিয়ে এসো। তোমার বইটই নয় কিন্তু। তোমার বই সব পড়া আমার। এইটুকুন বয়স থেকে পড়ছি তো।

'আমার বই কেন, প্রেমেনের বই নিয়ে যাব না হয়। ওর বই সব পড়েই আছে তো।...প্রেমে পড়ার পর প্রেমেনই পড়বার। বিয়ের পরে অবশ্য বরকেই পাট করতে হয়—তারই সাথে সাথে পাঠ্য ওই।'

তারপরে সে এলও বটে একদিন। যুগলে নয়, একক। শুকনো মুখ।

'কী হয়েছে রে? এমন ম্লান দেখছি কেন! কিছু গড়বড় হলো নাকি?'

'হয়েছে একটু।' বলে সে একেবারে চুপ। আর কোনো কথা নেই তার।

'পাশ করাতে পারিস নি বুঝি? বিয়েতে ফেল করলি তুই।'

'কিচ্ছু খবর রাখো না তুমি। কবে এম-এর রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। তাও জানো না!...'

'ও বিষয়ে আমার উৎসাহ নেই আদপেই—তুই জানিস!'

'কী করে থাকবে, ওপথ মাড়াওনি তো! স্কুল কলেজের চৌকাঠ পেরোওনি কখনো। সেই জন্যই।'

'কী রেজাল্ট হলো? এবারও ফার্স্ট হয়েছিস তুই?'

'না আমি সেকেণ্ড। এবারও।'

'আর ফার্স্ট?'

নেমন্তন্ন পত্রটা পাচ্ছি কবে রে?

'সেই ছেলেটা, যাকে আমার সঙ্গে দেখেছিলে সেদিন।'

'বটে? তা বিয়ের কথায় কী বলছে সে এখন?'

'সে কিছু বলছে না। সে তো রাজি কিন্তু আমাদের বাড়িতে কথা উঠেছে। মার ভারী আপত্তি।'

'কী বলছে মা?'

'মা বলছে, অসবর্ণ হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু তাও না, একেবারে বাঙালীই নয়। ওদের ঘরে কী করে মেয়ে দিই?'

'ছেলেটি কী? গুজরাটি পার্শী, ভুটিয়া না মাদ্রাজী? নাকি, তোদের আসামীই সে? সে তো স্বামীজয়াই হয়ে থাকে—বললে গেলে। তা হলে?'

'ধরো না, তোমার অবাঙালীই।'

'তা কী হয়েছে? জাতিধর্মবর্ণভেদ কি এখনও মানা উচিত আমাদের? মেয়েটি বিয়ে করে সোজা স্বামীর ঘর করবে না...'

'তা কী করে হয়। তা হলে বাড়ির বাপ মা ভাই বোন সব ছেড়েছুড়ে যেতে হয় যে।'

'যাবি। সীতা রামের সঙ্গে বনবাসে গেছল—দুজনেই সব কিছু ছেড়েছুড়ে। দময়ন্তী নলের সঙ্গে......' নল আর বাড়াতে হয় না, সাবিত্রীকে যমের বাড়ি পর্যন্ত টানবার আগেই বাধা দিয়ে সে কয়—

'জানি। সব জানি। কিন্তু কী রকম লাগছে যেন আমার।'

'সতীত্ব অমূল্যনিধি বিধিদত্ত ধন। কাঙালিনী পেলে রানী এহেন রতন—পড়িস নি বইয়ে? এখানে সতীত্বের সঙ্গে পতিত্ব জড়িত। রামচন্দ্র পিতৃ সত্য রক্ষার জন্য বনে গেছলেন, তুই নিজের সত্য, কি সতীত্ব যাই বল, বজায় রাখতে শ্বশুরবাড়ি যাবি।'

'কান্নাকাটি করছে মা......'

'আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলব মাকে।'

আজকালের মধ্যেই এক সময় যাব'খন আমি তোদের বাড়ি।'

'কী বলবে শুনি?'

'বলব যে......তুমি দুঃখ করছো কেন? দুঃখের কিছু নেই। এমন জামাই পাওয়া তো ভাগ্যের কথাই। তোমার মেয়েকে কোনো দিন ওই হেঁসেলের হাঙ্গামা পোহাতে হবে না। সোনার বর্ণ ওর কালি হয়ে যাবে না কখনো।......

'বামুন ও নয় যে।'

'সে তো আরও ভালো। খুব সমীহ করে চলবে তোমার মেয়েকে। পায়ে পা ঠেকলে, ঠেকবেই তো কখনো না কখনো, দণ্ডবৎ করে বলবে তখন, পেন্নাম হই মাঠাকরুণ। কতো মান হবে তোমার মেয়ের ভেবে দ্যাখো।'

'কী যা তা বকছো। তোমার মুখে কিছু আটকায় না।'

'আচ্ছা, মাঠাকরুণ না হয়ে বউঠাকরুণই হলো। একই কথা। তা ছাড়া, বলব আরো। ও ছেলেকে মেয়ে না দিয়ে তোমার নিস্তার নেই। ছেলে যখন, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে একবার, সহজে উড়ে যাবার পাত্র নয়। উড়তে হলে তোমার মেয়েকে নিয়েই সে উড়বে। কী করবে বলো?'

'এই বলবে?'

'বলবই তো।'

'মা তাঁর গয়নাগাটি কিছু দেবে না আমাকে এই বিয়েয়—। বলেই দিয়েছে।'

'নাই দিলো, বয়েই গেছে। পতিই সতীর সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। অমন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট স্বামী কটা মেয়ে পায় রে? ও ছাড়াও অনেক গয়নাগাটি জীবনে তুই পাবি —ওর কাছ থেকেই।'

এতক্ষণে ওর মুখে হাসি দেখা দেয়। আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। তার জীবনে এই প্রথম আমি প্রণম্য হই।

অস্তি! স্বস্তি! হচ্ছে। হোক। ত্রিশূন্যের কোথায় যেন দুই ঋষি এই দুটি কথা অহরহ আওড়াচ্ছেন আর সেই কথায় ত্রিভুবনের সব কিছু হচ্ছে আর বরবাদ হয়ে যাচ্ছে—বলতেন মা। সেই অস্তি স্বস্তির মাথায় পড়লে আর রক্ষে নেই। সেটা যাবেই, বা হবেই নির্ঘাৎ।

মা বলতেন সেই ঋষি দুজনের একজন বলছেন অস্তি, আরেকজন বলছেন—স্বস্তি—সেই অস্তি-স্বস্তির মুখের ওপর পড়লেই আমাদের মুখের কথা ফলে যায়, এই কারণে কদাচ কোনো মন্দ কথা মুখে আনতে নেই, তুই মর বলে গাল দিতে নেই কাউকে, শাপমন্যি করতে নেই কখনো—যদি সেটা ফলাও হয়ে ওঠে শেষটায়!

সপ্তর্ষিলোকের এলাকায় অলক্ষ্য সেই ঋষিদের অনুক্ষণ ঘোষিত এই বার্তা ভূতলে গড়িয়ে আমাদের গয়ংগচ্ছ গড়িমসির বারতালায় মুখরিত হয়ে সেই সন্ধিক্ষণের যোগাযোগে সফল হয়ে যায় এক-এক সময়।

লালির সেই অভিশাপের কথাটাও বুঝি ফলে গেল সেই জন্যেই। এক অবাঙালীর মুখেই পড়ে গেল আমার বোনটি শাপটা বর হয়েই ফলেছিল অবশ্য।

'যা, বাড়ি যা এবার। অনেক রাত হয়েছে'—বললাম লালিকে।

'না, যাব না। এখানেই থাকব আমি আজ।' সে বলে : 'বাকী রাতটা গল্প করে কাটবো।'

বা রে, আমি শোব না? ঘুম পাচ্ছে যে!

শোও না, কে আটকাচ্ছে?

আর তুই?

আমিও শুয়ে থাকব তোমার পাশটিতে।

'তা কী করে হয়?' আমার আপত্তি ওঠে : 'একলা ফিরতে যদি ভয় পাস তোর......চ, তোকে আমি বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসছি না হয়। চল্।'

'তুমি ইতুদের পাশে নিয়ে শুতে পারো আর আমি...আমি শুলেই যত দোষ?' সে ফোঁস করে ওঠে। —'আমার বেলাই যত ছুঁই ছুঁই। এই শুচিবাই কেন তোমার।'

'তারা অন্যরকম যে, তুই আরেক রকমের। তুই এক অকালপক্ক মেয়ে, তাক্।

ছেলেমানুষ। মনের দিক দিয়ে—অন্তত। তোর সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না।'

'সব মেয়েই সমান। একটু আঁচড়ালেই টের পাওয়া যায়।' সে বলেঃ 'এই শহরে একটা মেয়েও আর ছেলেমানুষ নেই মশাই। তোমার মতন কচি খোকাটি নেই কেউ।

'হতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম কি থাকতে নেই?' আমি কইঃ 'তোরা যেমন দেখে শুনে ঠেকে শিখেছিস সেসব সুযোগ তো পায়নি ওরা।'

'আমি এক রাত তোমার পাশে শুলেই তোমার জাত যাবে না। চরিত্র খোয়াবে না তুমি। আমি শুলাম।' বলেই সে চৌকিটার ধার ঘেঁষে শুয়ে পড়েঃ 'ঘুমে চোখ ভরে আসছে আমার, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না বাপু। কোথাও যাব না আমি এখন। কিছুতেই যাব না। এখানেই থাকব। কাল ভোর হবার আগেই চলে যাব, কথা দিচ্ছি। তোমার বাসার কেউ আমায় দেখতে পাবে না, নিশ্চিন্ত থেকো।'

'বেশ শো তাহলে।' অগত্যা আমায় বলতে হলো—'একেবারে ধার ঘেঁষে শুবি—গায়ে পড়বি নে, নীচে না পড়ে যাস তাও দেখিস।'

'দেখে শুনে কি আর কেউ পড়ে? পড়বার পরেই দেখতে পায়।' সে বলে।

'কথা কাটাসনে। যা বললাম বুঝতে পারছিস নিশ্চয়।'

'ধার ঘেঁষেই থাকছি।' ধরালো গলায় সে কয়ঃ 'পড়ে যাই যদি উদ্ধার কোরো আমায়।'

'পড়বার মেয়ে তুই নোস। পড়লে আমায় নিয়েই পড়বি, আমি জানি।' তারপর আমিও শুয়ে পড়ি এধারটিতে।

'আলোটা নেবালে না?'

'না। জ্বলুক আলো। সারারাত ধরেই জ্বলবে।' আমি বলিঃ 'কেন, আলো জ্বালা থাকলে কি তোর ঘুম হবে না?'

'নেবানো থাকলেই ঘুম হয় কিনা কে জানে!'

'অন্ধকারেও তোর ঘুম পায় না?'

'খুব পায়, কিন্তু এই যে তুমি...... তোমার পাশে শুয়ে......পাশের ঘরে মনের মত কোনো জোয়ান ছেলে থাকলে আমাদের চোখে ঘুম আসে না। জানো? তোমাদেরও তেমনি হয়ে থাকে নিশ্চয়?'

'আমাদের? আমার কথা বলতে পারি। চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। একেবারে মড়া। নাক ডাকতে থাকে আমার। আলো জ্বালা থাক চাই নাই থাক।'

'ইঁদুরের বাড়ি থাকলে তার থেকেও কি এমনি আড়াই মাইল ফাঁক রেখে শোও? আমার সঙ্গে যেমন করছ?'

'কেমন করে হবে? ঘরের এক চালা বিছানায় সাত জন শুলে ঠাসঠাস হয় না?'

'গায়ে গা লাগে?'

'লাগে বই কি? পাশাপাশি ঘেঁষঘেঁষি হলে লাগবে না?'

'লাগলে পরে কেমন লাগে তখন?' কিছু হয় না তোমার?'

'কিচ্ছু না। এসব কি একতরফা হবার নাকি? দোরোখা হলেই তবে হয়। একজনের মনের চাঞ্চল্য অপর জনের মনে চারিয়ে যায়—একজনের হবার নয়।...... তাছাড়া, ইতুতো বাচ্চা মেয়ে, দশ বারো বছর বয়েস মোটে।'

'তোমায় বলেছে! মেয়েদের বয়েস কখনই বোঝা যায় নাগো! বারো বছরের মেয়ে আসলে বাইশ—মনের দিক দিয়ে তো বটেই।'

'না না, তুই তাকে দেখিসনি, তাই বলছিস। বাচ্চা, নেহাৎ বাচ্চা।'

'আমার দেখা আছে। অনেক দেখেছি। মেয়েদের বাচ্চা হয় বটে কিন্তু বাচ্চা মেয়ে একটও হয় না। সাত বছর বয়েস থেকে ওরা ওস্তাদ। সব কিছু জানে, সব

বাঝে, সবজান্তা পাকা ধাড়ি এক-একটা।'

ইতু সেরকমের নয়। সংসারের কিছু জানে না। সেদিন একটা ছেলেকে কী বলছিল শুনবি? শুনলেই বুঝবি। নিজের কানে শোনা।'

'কী বলছিল? প্রেমের কথা বুঝি?' লালি বলে: 'জানি জানি। অমন সবাই বলে থাকে। পুঁথিপড়া কথা যতো। নভেল পড়া মেয়ে তো।'

'না, না। তা নয়। বারান্দায় ওরই বয়সী একটি ছেলে ওর হাত ধরে বলছিল, ওদের ড্রইংরুমে বসে কানে এলো আমার। ছেলেটা বলছিল, বড় হলে আমাদের বিয়ে হবে তো, কী বলিস তুই?'

'কী বললো ইতু—তার জবাবে?'

'বলল যে, হলে তো ভালোই হোতো, কিন্তু তা কী করে হয় ভাই? আমাদের যে থা সব ঘরাঘরি যে। ঘরাঘরি? সে আবার কী রে? শুধালো ছেলেটি। 'মানে এই দ্যাখোনা, আমার বাবা বিয়ে করেছে আমার মাকে। আর আমার মামা বিয়ে করেছে আমার মামিকে। মাসি বিয়ে করেছে আমার মেসোকে। আর পিসী—' 'তোর পিসেকে। বুঝেছি। কষ্ট করে আর বলতে হবে না।' শোনার আগেই সে পিণ্ট হয়ে গেছে। বিয়ের কথায় ইতি দিয়েছে তৎক্ষণাৎ।'

'ন্যাকা। নেকু! বোকচৈতন! দুজনই।' লালি বলে—এক নম্বরের। ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা এমন হাঁদা মার্কা হয় নাকি? তবে যে শুনেছিলাম, বালিগঞ্জের ছেলেমেয়েরা সব লুকিয়ে লুকিয়ে এ করে?'

'এ করে? তার মানে?'

'এ-র মানে জানো না?'

'জানব না কেন? মোটেই তারা ঐ এ-টে করে না। সবাই তারা চালাক, এবিষয়ে খুব হুঁসিয়ার। কখনই তারা এ করে না, বি করার আগে তো কখনই নয়। আগে বি করে, তারপরে এ করে? বি-এর পরে ঐসব এ-টে, বুঝেছিস? বি-এর আগে এ করলে সবাই সি সি করবে না? চারধারে ডি ডি-কার পড়ে যাবে যে!'

সামাজিক ভদ্রজীবনের ব্যাকরণসম্মত এ-বি-সি-ডির জ্ঞান দিই ওকে।

'কিন্তু বর্ণপরিচয় পড়ালেই যে বর্ণবোধ হয় তা নয়। সেই পাঠ অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেওয়া তো ঢের পরের কথা। ও বলে—'রাখো রাখো, বুঝেছি। সব জানা আছে আমার।'

'তোর জানা নিয়ে তুই থাক। আমাকে ঘুমুতে দে এখন। ঘুম পাচ্ছে না? এত ঘুম পাচ্ছিল তোর একটু আগে। গেল কোথায়?' বলে আমি পাশ ফিরে শুই।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, চট্‌কাটা ভেঙে গেল হঠাৎ।

দেখি ঘর অন্ধকার। লালি কখন উঠে সুইচ অফ করে দিয়েছে। পাশ ঘেঁষে এসেছে সে। জড়িয়ে ধরেছে আমাকে।

ঘুমের ঘোরেই হবে বা। ওর ঘুম যাতে না ভাঙে, আলতোভাবে ওর হাতটা খুলে নামিয়ে রাখি।

আবার সে আমায় জড়িয়ে ধরে।

'এই! কী হচ্ছে। জেগে আছিস তো। এই—এই লালি!'

'উঁ উঁ উঁ উঁ......'

'চালাকি হচ্ছে? জেগে আছিস বেশ। জড়াচ্ছিস কেন আমাকে?' আমি বলি: 'এমন জড়াজড়ি করে আমি ঘুমুতে পারি না।'

'ঘুমুতে হবে না।' বাহুবন্ধন অটুট রেখেই সে কয়।

'এমনি করে জড়িয়ে ধরে হচ্ছেটা কী? গলায় ফাঁস লেগে দম আটকে মারা যাবো যে? জড়াচ্ছিস কেন? আমি কি কোনো জড়োয়া গয়না নাকি?'

'জানি না!'

'শুয়ে আর কাজ নেইকো। উঠে পড়া যাক। চল্, তোকে বাড়িতে রেখে আসি এবার। ঘুমোগে যা নিজের বিছানায়।'

বলতে সে বিনাবাক্যব্যয়ে হাত খুলে নেয়—একটু রাগ করেই হয়ত বা।

আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

আমার ঘুম ভাঙে খানিক বাদেই আবার।

হুড়্‌হুড়ির আওয়াজ এবার। উনুন ধরাবার কয়লা ভাঙা হচ্ছিল তলায়।

লালির কোনো সাড়াশব্দ পাই না। ধারে কাছেও সে নেই মনে হয়।

বিছানায় না হাতড়ে আলোটাই জ্বালি।

কোথায় লালি? ভোর হবার আগেই সে উঠে গেছে। সবার অজান্তে সরে পড়েছে কখন!

(ক্রমশ)

॥ উপসংহার ॥

নৃত্যমঞ্চ থেকে চিরকালের মতন বিদায়!

উদয়শঙ্কর প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন মঞ্চে কৃষ্ণের বেশে মাত্র তাঁর বাইশ বছর বয়েসে লন্ডনের কভেণ্ট গার্ডেন-এ, আটষট্টি বছর বয়েসে শেষবার দেখা দিলেন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদলকে আমেরিকার সানডিয়াগোতে বুদ্ধের ভূমিকায়। কৃষ্ণ ও বুদ্ধ। প্রথম ও শেষ।

প্রথম স্ট্রোক হয়েছিল অসময়ে সাত-আট বছর আগে। এবার এল দ্বিতীয় আঘাত। এরপর আর দৈনিক পরিশ্রম করা চলবে না—চিকিৎসককুল নির্দেশ দিলেন। মানতেই হবে তাঁদের নির্দেশ। এবারে শরীরও হঠাৎ যেন বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে, হ্রাস হয়ে এসেছে দীর্ঘ সময় নিয়ে নৃত্য করার শক্তি। সুতরাং বিশ্রাম।

পাদপ্রদীপের আলোর কম্পন আর কোনদিনও ছায়া ফেলবে না নৃত্যরত উদয়শঙ্করের দেহের ওপর। দেশ ও বিদেশের উৎসাহী মানুষ শুধু শুনবে অতীত যুগের এক নৃত্যশিল্পীর অপূর্ব নৃত্যের কাহিনী। কিন্তু সে নৃত্য দেখার সৌভাগ্য আর তাদের হবে না।

নটের জীবনের মূলধন তার দেহ-সৌষ্ঠব। এই দেহই তাকে পৌঁছে দেয় যশের উচ্চতম শিখরে, তাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় দর্শকের। কিন্তু দেহের বাঁধন শিথিল হতে শুরু করে যখন—যখন বয়েসের ভারে ক্রমে শুকিয়ে আসে দেহশ্রী তখন অল্পে অল্পে মুছে যায় যশ। লুপ্ত হয় গৌরব। তখন অবসরের কাল। এবং পরে পরিণতি স্মৃতির কঙ্কালে—অতীতের ইতিহাসে।

উদয়শঙ্করের মূলধন শুধু যদি হত তাঁর দেহ, তাহলে তাঁর ভাগ্যের লিখনও হত এক—আর সব নট নটীদের মতন। কিন্তু তিনি ব্যতিক্রম। শুধু দেহ নয়, আরও কিছু বেশী ছিল তাঁর—তাঁর মস্তিষ্ক—তাঁর নব নব উদ্ভাবনী শক্তি। দেহ অক্ষম হলেও মন সক্রিয় উদয়শঙ্করের। শরীর দুর্বল তবু তাঁর পরিকল্পনার অন্ত নেই। নতুন সৃষ্টির ভাবনায় মন বিভোর।

নৃত্যমঞ্চ থেকে যদিও বিদায় তবু পরিণত বয়েসে আপনা আপনি যিনি মনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করে চলেছেন বিচিত্র শিল্পলোক—সে লোক থেকে কবে কোন চিকিৎসক তাঁকে দিতে পারে বিদায়ের নির্দেশ? নৃত্যমঞ্চ থেকে আকস্মিক নির্বাসনের কয়েক বছর পরেও সৃষ্টি তাঁর শঙ্করস্কোপ।

শেষবারের মত আমেরিকা থেকে কয়েকমাস পর আবার দেশে ফিরে এলেন উদয়শঙ্কর। কিছু কি পরিবর্তন এসেছে তাঁর জীবনে? ডাক্তাররা বলে বিশ্রাম করতে। কিন্তু কী হয়েছে তাঁর? নৃত্য-জগৎ থেকে, শিল্পলোক থেকে বিদায়ের কথা তিনি ভাবতে পারেন না। একটা বড় রকমের কিছু করতে হবে। ছায়াচিত্রের কথাই তাঁর প্রথম মনে পড়ে।

ডেকের মতন বারান্দার শেষ প্রান্তের একটা ঘরে সারাদিন শুয়ে বসে থাকেন উদয়শঙ্কর। সময় মতন খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম তাঁকে করতেই হয়। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করতে আসে প্রায় প্রত্যহ। অনেক গণ্যমান্য মানুষ আসে তাঁর কাছে, ছাত্র-ছাত্রীরা আসে। সকলকেই তিনি শ্রদ্ধা করেন, স্নেহ করেন। সকলেই তাঁকে উপদেশ দেয় সতর্ক হয়ে থাকতে, তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে। উদয়শঙ্কর সকলের সব কথা শোনেন খুব মন দিয়ে, নিজে কথা বলেন কম।

আসলে বরাবরই উদয়শঙ্কর নিঃসঙ্গ। তাঁর নিজের জগতের বাইরে তিনি শিশুর মতন অসহায়। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা তাঁর কম। নেই বললেই চলে। এক-একজন শিল্পী থাকেন যিনি উপস্থিত হন সব আসরে—অংশ গ্রহণ করেন সব আলোচনায় এবং তাঁর জগতের বাইরেও তিনি জন-প্রিয়।

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে উদয়শঙ্কর ও অমলা। বাঁদিকে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর

কিন্তু নিজের জগৎ মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে আসেন না উদয়শংকর। তাঁর কাছে একমাত্র সত্য তাঁর শিল্পলোক। ভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কোন মানুষ যদি কখনো আসেন তাঁর সংস্পর্শে স্বল্প সময়ের জন্যে তাহলে অনতিবিলম্বেই তাঁর ধারণা হবে যে তিনি এসেছেন এক শিল্পীর সান্নিধ্যে এবং ধীরে ধীরে নিজেও প্রবেশ করে যাবেন অভিনব এক শিল্পলোকে সম্মোহিতের মতন।

রাজার দুয়োরে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কাঙালের মতন যাননি যিনি কোনদিন, রাজা যেচে এসে তাঁকে দিয়েছেন ধন মান, খুলে দিয়েছেন রাজকোষ। কোন মোহের বশবর্তী হয়ে কখনো যিনি বিক্রি করেন নি তাঁর শিল্পী সত্তা, শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারবার তাকে পরিয়ে দিয়েছেন গৌরব-মুকুট।

বস্তুত শিল্পজগতের নিদারুণ সংকট কালে নিন্দা বিদ্রূপ এবং সব অপমান তুচ্ছ করে উদয়শংকর এক দুঃসাহসী সৈনিকের মতন বন্দিনী ও মৃতপ্রায় এক অবহেলিত শিল্পকলালক্ষ্মীকে রূপ দিয়েছেন ছন্দে, সুষমায়—তারই বন্দনা গান গেয়ে এসেছেন প্রায় অর্ধশতাব্দী ভরে। তাঁর পরিণত বয়েসে, নৃত্যমঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করারও প্রায় তিন বছর পরে, ১৯৭১ সনে ভারত সরকার তাঁকে দিলেন পদ্মবিভূষণ উপাধি।

এক জীবনে যত পেয়েছেন উদয়শংকর —সুখ্যাতি সম্মান ধন দৌলত—একজন নটের কাছে তা কল্পনারও অতীত। বাইরের দৈন্য তাঁকে কখনো কখনো নির্মম ভ্রূকুটি করলেও তাঁর অন্তরের সম্পদের এক কণাও নষ্ট হয়ে যায়নি। তাঁর নিজের পরিমণ্ডলের, তাঁর নিজস্ব শিল্পলোকের আজও তিনি একচ্ছত্র সম্রাট।

উদয়শংকরের কন্যা মমতাশংকর বড় হয়ে উঠেছে দেখতে দেখতে। ছোট বেলা থেকেই তার ঝোঁক ভরতনাট্যমের প্রতি। নৃত্যমঞ্চে মমতাশংকরকে দেখলে উদয়শংকরের কন্যা বলে চিনতে ভুল হয় না দর্শকদের। তার চেহারা বাপের মতন। ভরতনাট্যমের কিশোরী শিল্পী হলেও তার নৃত্যে উদয়শংকরের ভঙ্গির প্রভাব সুস্পষ্ট।

আরও একটা আঘাত সামলে নিলেন উদয়শংকর। তাঁর তৃতীয় স্ট্রোক হল ১৯৭২ সালের শেষের দিকে। এরপর ঈষৎ অবসন্ন হয়ে পড়লেও তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করবার কথা তিনি কল্পনা করতে পারলেন না—ভিতরে ভিতরে আরও জড়িয়ে পড়লেন কর্মজীবনের সঙ্গে। নতুন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে গঠন করলেন নতুন দল—সামান্য ক্ষতি আর প্রকৃতি ও আনন্দের প্রদর্শনী চলতে লাগল কলকাতা শহরে।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন উদয়শংকরকে "সামান্য ক্ষতি আর প্রকৃতি ও আনন্দের পর নতুন কোন ব্যালের কথা ভাবছেন?"

উদয়শংকর উৎসাহ প্রকাশ করে বলেন, "হ্যাঁ ভাবছি।"

"কী ভাবছেন?"

উদয়শংকর বলেন, "একটা ফিল্ম করার কথা প্রায়ই মনে হয়। স্ক্রিপট লেখাও শুরু করে দিয়েছি—"

"কী লিখছেন?"

"আর একটু এগিয়ে যাই, তারপর বলব।"

উদয়শংকরের মুখে একথা শুনে আবার যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "নতুন কোন ব্যালের পরিকল্পনা নেই আপনার?"

কয়েক মুহূর্ত তিনি যেন ঈষৎ বিষণ্ণ হয়ে থাকেন। পরে বলেন, "হ্যাঁ, নতুন ব্যালের কথাও ভাবি।"

"কিন্তু করেন না কেন? সামান্য ক্ষতি তো পুরোনো হয়ে গেছে।"

উদয়শংকর একটু ভেবে বলেন, "টাকা পয়সার অসুবিধার জন্যেই নতুন কিছু হঠাৎ করতে পারি না। দিনকাল এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। বুঝি যে টাকার দরকার প্রত্যেকের। [illegible] [illegible] আর্টিস্টদের মাসে মাসে টাকা দেব কেমন

করে! একটা কিছু করতে গেলে অনেক-দিন রিহার্স্যাল দেবার দরকার তো।"

"ফিল্মের ব্যাপারে কী করবেন?"

"আমার মনের মতন দু-একজন প্রডিউসার আছে। সময় মতন কথাবার্তা চালাব তাদের সঙ্গে—" উদয়শঙ্কর একটু চুপ করে থেকে বলেন, "এখন দু-একজন ট্যালেন্টেড ছাত্রছাত্রী আছে আমার। শান্তি-বসু আর অনুপমা দাস—ড্যান্সার হিসাবে এদের আমার খুবই ট্যালেন্টেড বলে মনে হয়। তা ছাড়া আর একজন—ওংকার মল্লিক—অভিনেতা হিসেবে খুব ভাল।"

কথা বলতে বলতে উৎসাহের প্রসন্ন একটা আভা ফুটে ওঠে উদয়শঙ্করের চোখে-মুখে। তাঁকে দেখলে কে বলবে যে তিনটি স্ট্রোক হয়ে গেছে তাঁর। শীতের ঠাণ্ডা একটা ঝলক খেলে যায় ঘরের মধ্যে। উদয়-শঙ্কর পায়ের ওপর কম্বলটা অল্প টেনে নেন। মাথায় ঈষৎ চাপ অনুভব করেন। চোখ বুজে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। পরে আবার চোখ খোলেন। কথা বলেন।

খুব বড় নয় তাঁর ঘর। আসবাবও নামমাত্র। একটি নিচু খাট। গোটা কয়েক চেয়ার। এয়ার কুলার। আর ছোট একটি টেবিল। তার ওপর জড়ো করা কাগজপত্র, কিছু বই, ডাইরী আর নানা-রকম ট্যাবলেট। একটু দূরে লম্বা একটা টেবিলের ওপর নটরাজের অপূর্ব মূর্তি।

১৯৭৩ সালের প্রথম ভাগ। নিঃসঙ্গ জীবনের গভীরে নিমগ্ন হয়ে আছেন উদয়শঙ্কর। এ জীবনই যেন তাঁর কাম্য। তিনি যেন ইচ্ছে করেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন তাঁর সংসার থেকে। কিন্তু মেনন আছে তাঁর কাছে কাছে। কোন দরকার হলেই উদয়শঙ্কর জোরে ডেকে ওঠেন, "মেনন!"

কেউ কোন প্রশ্ন না করলেও আপন মনে কথা বলার মতন উদয়শঙ্কর বলেন, "জীবনে একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। যদি নিজের একটা ইস্কুল গড়ে যেতে পারতাম! তাহলে হয়তো ছাত্রছাত্রীদের কাছে রেখে যেতে পারতাম আমার ভঙ্গি, আমার মুদ্রা, আমার নাচের গোটা ব্যাকরণ। কিন্তু যখন সময় ছিল, সামর্থ্য ছিল তখন তো এ সব মনে হয়নি।"

কিছু সময় চুপ করে থাকেন উদয়-শঙ্কর। পরে আবার বলেন, "তবে আমার নিজের কোন ইনস্টিটিউশন না থাকলেও আমার প্রভাব তো ছড়িয়ে আছে। আমি যা সৃষ্টি করেছি তা হয়তো থেকে গেছে। মণি বর্ধন ছিল, শচীনশংকর আছে। দিল্লী আর বম্বেতেও আছে অনেক গ্রুপ। এদের মধ্যে আমি ছিলাম, আমি আছি। আর হয়তো আমি থেকেও যাব।"

চোখ বুজে শুয়ে থাকেন উদয়শঙ্কর। —

তন্দ্রা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। শুয়ে শুয়েই তিনি ভাবেন অতীতের কথা, দেশ-দেশান্তরের কথা। আমেরিকার মানুষ দেবতার বেশে তাঁকে মঞ্চে দেখে দেবতা বলেই ধরে নিয়েছিল। প্রদর্শনীর পর তাঁর গলার স্বর শুনে মহিলারা বিস্ময়ে চীৎকার করে বলে উঠেছিল, 'হি টকস্! হি টকস্!'

ধর্ম সম্বন্ধে কোন অন্ধ সংস্কার উদয়-শঙ্করের নেই। তবু তিনি জীবনের অপার রহস্যের ভিতরে যেন ডুবে যেতে যেতে বলেন, "বিশ্বাস করুন, আমার কোন শো-এর পরিকল্পনা আমি বই পড়ে করিনি কিন্তু সারাজীবন আমার অলক্ষ্যে থেকে কে যেন আমাকে দিয়ে সব কিছু

নতুন!
সলু-রিসর্সিনল
এবার থেকে এই আনকোরা
নতুন বাক্সে পাবেন।
খুস্কি, মরামাস ও চুল-ওঠার
অব্যর্থ হেয়ার টনিক
২৩ বছর ধরে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হেয়ার টনিক সলু-রিসর্সিনল এবার থেকে এই ঝকঝকে নতুন ফিলফার-প্রুফ বাক্সে পাওয়া যাবে।
'রিসর্সিন'-যুক্ত হেয়ার টনিক সলু-রিসর্সিনল চার ভাবে কাজ করেঃ
• সলু-রিসর্সিনল খুস্কি ও মরামাস চিরতরে নির্মূল করে।
• সলু-রিসর্সিনল চুলের গোড়া সতেজ ও পরিপুষ্ট করে তোলায় চুলের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায় ও নতুন চুল গজায়।
• সলু-রিসর্সিনল চুল-ওঠা, অকালে টাকপড়া, ব্রণ ইত্যাদি নিবারণ করে।
• সলু-রিসর্সিনল চুলকে সুন্দর ও কমনীয় করে তোলে।
চুল সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকলে
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।
সব ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়
সলু-রিসর্সিনল আগের দামেই পাবেন
পাস্তুর ল্যাবরেটরীজ প্রাইভেট লিমিটেড
২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬
SOLU-
RESORCINOL
A SOLUTION OF RESORCIN
AN IDEAL
HAIR TONIC

রিদম্ অব লাইফ নৃত্যে উদয়শঙ্করের স্বহস্ত অঙ্কিত স্কেচ

করিয়ে নিয়েছে। লোকে যখন আমার কোন নাচের প্রশংসা করেন আমাকে ধন্যবাদ দেন এবং ধরে নেন আমি অগাধ পড়াশুনো করে আইডিয়া পেয়েছি তখন আমি তাঁদের কিছু বলতে পারি না।"

উদয়শঙ্কর বলেন, "ছেলেবেলায় বম্বেতে যখন জে জে ইস্কুল অব আর্টস-এর ছাত্র ছিলাম, তখন এক রাতে শান্তিলালের বাড়ি থেকে ফেরার সময় কে আমাকে বাঁচিয়েছিল সাপের কামড় থেকে? সে-ই যে আমাকে চালায়—ভাব দেয়, ভাবনা দেয়, দেয় পরিকল্পনা। সেই তো সাজিয়ে দেয় আমার স্টেজ, জো করে দেয় নিখুঁত। কিন্তু কে সে? তার কথা আমি মানুষকে কেমন করে বোঝাব।" উদয়শঙ্কর নিজেই বলেন, "আমি গোঁড়া ধার্মিক নই। অনেক ভণ্ড তপস্বী দেখেছি বলে গুরু টুরু জাতীয় মানুষের ওপর আমার এতদিন খুব শ্রদ্ধা ছিল না। তবে সম্প্রতি একজনকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে।"

"আমার ছাত্রী অনুপমাই আমাকে প্রথম নিয়ে যায় তার গুরুদেব স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর কাছে। তাঁর ছোট আশ্রম গড়িয়ায়। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দর মতন অসাধারণ মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। নব্বুই-এর ওপরে বয়স। অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁর। আর সবচেয়ে বড় কথা কোন বাণী-টানী তিনি দেন না, ধর্মের গুরুগম্ভীর কথাও শোনান না। মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সমান।"

প্রায় বিশ বছর আগে উদয়শঙ্কর যখন প্রথম আসেন দক্ষিণ কলকাতার শহরতলিতে বাস করতে তখন এদিকে যে গ্রাম গ্রাম গন্ধ ছিল, এখন তা আর নেই। আশেপাশে উঠেছে নতুন নতুন বাড়ি। সেই লম্বা বাঁকা পুকুরটাকেও বুজিয়ে দেয়া হয়েছে। পুকুর ভরাট জমিতেও উঠেছে দু-তিন তলা সুন্দর সুন্দর বাড়ি।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক সময় উদয়শঙ্করের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি ছেলেমানুষের মতনই ঈষৎ ভাবপ্রবণ হয়ে ভাবতে থাকেন, কোথায় গেল সেইসব মানুষ—সেইসব

দিন! তাঁর মনে ভেসে ওঠে নসরৎপুরের কত স্মৃতি, গাজীপুরের কত দৃশ্য, ঝালোয়ার-বারাণসীর কত পথ, কত সুখ! মার কথা মনে হয়। দাদামশাই-এর কথা মনে হয়। বাবার কথা মনে হয়। আর তাঁর মাস্টারমশাই অম্বিকাচরণ? তাঁকে কি ভোলা যায়!
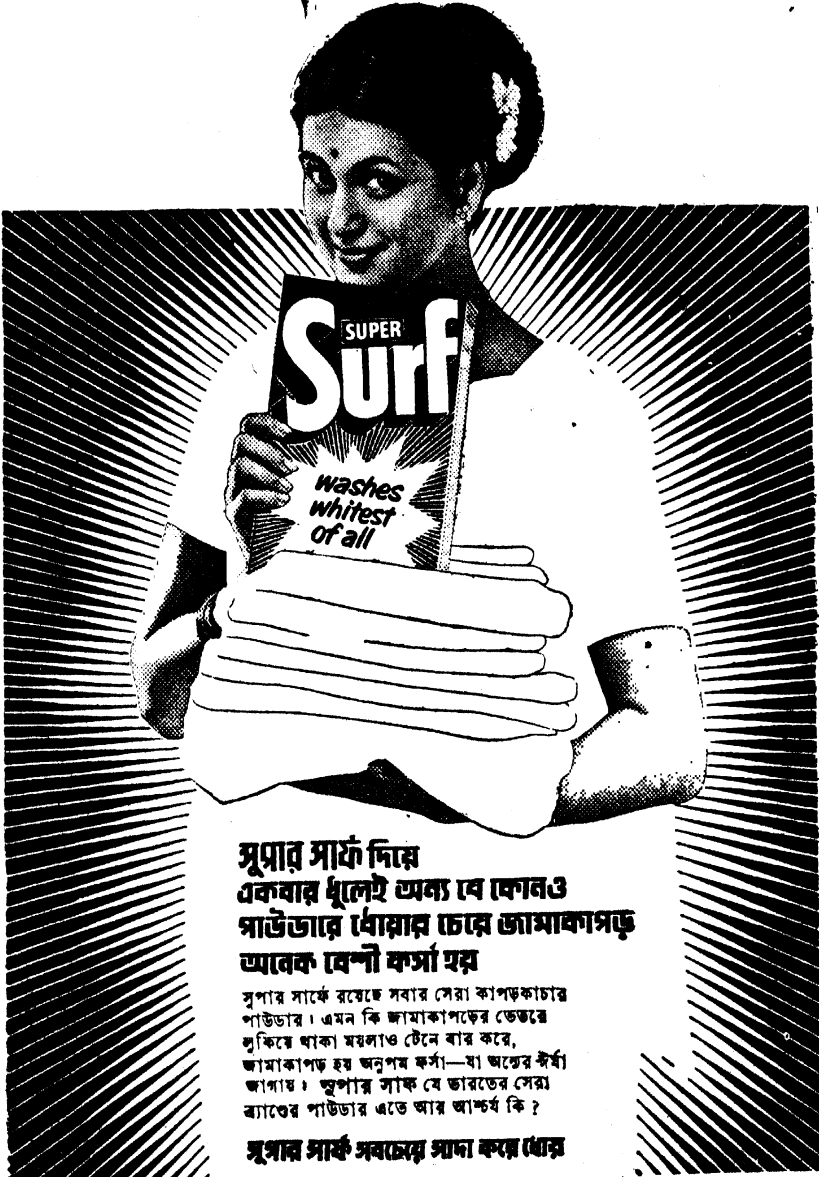
গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম! লক্ষ্য অব্যর্থ। ঝুপ ঝুপ পড়ত অসংখ্য হাঁস। শাতের ভিজে-ভিজে বালির ওপর। লম্বা লম্বা বাঁশের খুঁটিতে দড়ি বেঁধে বড় বড় ছোঁড়া ফুলের মালার মতন ঝুলিয়ে রাখা হত সদ্য শিকার করা সেইসব হাঁস। বাস, তারপর নবাবের বাবুর্চির শেখানো প্রথা মতন তৈরি হত হাঁসের মাংসের কত রকম মোগলাইখানা!

জমিদারের এই বাড়ির চারপাশে রয়েছে বিঘে বিঘে জমি। রয়েছে আম গাছ, লিচু গাছ, তাল গাছ, জাম গাছ—আরও কত রকমের গাছগাছালি। সারাদিন কত নতুন পাখি ডেকে ওঠে, কত নতুন গন্ধ খেলে যায়।

ভোর থেকে বাইরে কাকের সাড়া পড়ে। গভীর ইঁদারা থেকে বড় বড় চামড়ার ব্যাগ নামিয়ে জল তোলা হয়। মানুষ অত ভারী

ব্যাগ টেনে তুলতে পারে না। দুটো তাজা ষাঁড় ঘোরে কুয়োকে ঘিরে। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হয়। জলভরা ব্যাগ ওপরে ওঠে, পরে খালি ব্যাগ আবার নিচে নেমে যায়।

যেন বিরাট এক যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার। অনেক বড় বড় উনুন জ্বলছে। অনেক কড়া চাপান। কোনটাতে দুধ ফুটছে। কোনটাতে রাবড়ি হচ্ছে। কোনটিতে হচ্ছে মেঠাই-মণ্ডা। একদিকে আখ কাটা হচ্ছে। রস জ্বাল হচ্ছে। চিনি কিম্বা গুড় হবে।

অন্ধকার হ'তে না হতেই জমিদারবাড়ির বাইরে ও ভিতরে জ্বালান হয় প্রায় কুড়ি-তিরিশটা কেরোসিনের বাতি। এইসব বাতি পরিষ্কার করে ঠিকঠাক জ্বালাবার জন্যে বিশেষ লোক আছে। চিমনি ধোয়া-মোছা, সলতে বদলান, ঠিক জায়গায় ঠিক বাতিটা বসান—এইসব তার কাজ।

শৈশবের কথা ভাবতে ভবতে ক্লান্ত স্বরে উদয়শঙ্কর বলেন, "সব যেন গল্পের মতন, রূপকথার মতন মনে হয়। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতন ঝপ করে সব যেন হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেছে!"

উদয়শঙ্করকে যাঁরা জানেন দূরে থেকে তাঁদের এমন মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে নৃত্য-শিল্পী হিসেবে তিনি পূর্ণ, চরিতার্থ। কেননা তাঁর যশের ভাণ্ড পরিপূর্ণ কানায়-কানায়। কিন্তু কাছের মানুষেরা তো জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের বাণী এখনো সত্য হয়ে আছে তাঁর কাছে—

"তোমার প্রতিভা আছে। সেই কারণেই আমরা আশা করতে পারি যে, তোমার সৃষ্টি কোন অতীত যুগের অনুবৃত্তিতে বা প্রাদেশিক অভ্যস্ত সংস্কারে জড়িত হয়ে থাকবে না। অসন্তোষই তার জয়যাত্রা পথের সারথি। সেই পথে যে ধ্রুব তোরণ আছে তা থামবার জন্যে নয়, পেরিয়ে যাবার জন্যে।"

উদয়শঙ্করের কন্যা মমতাশঙ্কর

দুটো স্ট্রোক হয়ে যাবার পরেও জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কঠিন অসুস্থতার ভিতরেও উদয়শঙ্কর সৃষ্টি করলেন তাঁর শঙ্করস্কোপ। তাঁর এই অবদান নৃত্য-ভিত্তিক নয়, কলাকৌশল-এর দিক থেকে একেবারে অভিনব। উদয়শঙ্করের আর একটা পরিচয় আছে, যা আজ আমাদের হঠাৎ মনে থাকে না। তিনি শুধু শিল্পী নন, নৃত্যশিল্পী নন—তিনি যাদুকরও। খুব অল্প বয়েস থেকেই যাদুবিদ্যার প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। এবং তাঁর কৈশরকালের মাস্টারমশাই অম্বিকাচরণ তাঁকে কয়েকটা ম্যাজিকের ইংরেজি বইও পড়তে দিয়েছিলেন।

ছেলেবেলায় ঝালোয়ার রাজপ্রাসাদে অনেকের সামনে সে ম্যাজিক দেখিয়ে ছিলেন উদয়শঙ্কর—সেই চোর আর একটি মেয়ে—তা এত বছর পরে তিনি আবার দেখালেন শঙ্করস্কোপে।

এই প্রসঙ্গে উদয়শঙ্কর বলেন, "ফিল্ম স্টেজ ম্যাজিক—সব মিলিয়ে শঙ্করস্কোপ একটা সিনক্রোনাইজড প্রোগ্রাম। বহু বছর ধরে জিনিসটা আমার মনে ছিল। অনেক আগে বোধ হয় একটা ম্যাজিক বা অন্য কোন শো-তে দেখেছিলাম এক মেমসাহেব কুকুর নিয়ে সশরীরে স্টেজে চলে এল। আবার পিছন ফিরে হেঁটে পর্দায় ছবি হয়ে গেল। সেই থেকে মনের মধ্যে জিনিসটা থেকে গিয়েছিল। চেক দেশে এই ধরনের শো চলে। অনেকগুলো ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে শঙ্করস্কোপ-একটা পুরো প্রোগ্রাম।"

উদয়শঙ্কর তাঁর অভিনব সৃষ্টি শঙ্কর-স্কোপ সম্বন্ধে আরও বলেন, "আমার শিল্পী জীবনের শুরু থেকে আমি কখনো এক জিনিসের পুনরাবৃত্তি করতে চাইনি। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। আর আমার সৌভাগ্য সব সময় আমার সৃষ্টিমাত্রেই সর্বত্র গৃহীত হয়েছে।"

এ শিল্পীর অলীক দম্ভ নয়—তাঁর অখণ্ড আত্মবিশ্বাস। শঙ্করস্কোপ-এর মতন সৃষ্টির কথা সম্ভবত ভারতবর্ষের আর কোন পরিচালকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। প্রয়োগ নৈপুণ্যে ও বিভিন্ন আঙ্গিকের মিশ্রণে উদয়শঙ্করের পরিণত বয়েসের সর্বাধুনিক অবদান অভাবনীয়।

উদয়শঙ্করের দেহ জুড়ে নেমে আসুক বার্ধক্য, জরা বারবার তাঁকে বিব্রত করুক, তবু এখনো তাঁর মনে বিদ্যমান পূর্ণ মাত্রায় অসন্তোষ। এখনো তাঁর সামনে সুদূর প্রসারিত জয়যাত্রার পথ!

আরও অনেক তোরণ পেরিয়ে যাবার অদম্য আগ্রহে তিনি চঞ্চল, উদগ্রীব।

রূপদর্শ

আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর...
বিনাকা কোল্ড ক্রীম তখন
সেই স্বপ্নকে সত্যি করে
তোলার জন্যে আপনার ত্বকের
গভীরে কাজে ব্যস্ত !
CIBA Binaca Cold Cream
CIBA
রোজকার মত সে রাতেও বিনাকা কোল্ড ক্রীম দিয়ে আমার মুখ পরিষ্কার করলাম, কারণ এ ত্বকের গভীরে পৌঁছে লুকোনো ময়লা বার করে আনে। ঘুমোনোর আগে আরেকটু মাখলাম।
মুখখানা এমন স্নিগ্ধ আর পরিষ্কার অনুভব করলাম যে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো— গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম।
স্বপ্ন দেখলাম এক অন্তহীন রুপোলী-সাগরের ওপর দিয়ে চলেছি আমি... তুষার শুভ্র চাঁদ আমার দিকে এগিয়ে এলো...কাছে থেকে আরো কাছে ...
তারপর সে চাঁদ—হয়ে গেল এক মহাকাশযান ! দরজা খুলে আমার দিকে এগিয়ে এলো এক দেবকান্তি পুরুষ...
আমাকে সে টেনে নিলো তার যানে। আমার মুখখানা দুহাতে ধরে বললে, "আজ পর্যন্ত যত সুন্দরী দেখেছি...তুমি তার মধ্যে সেরা সুন্দরী।"
ঘুম ভাঙতেই দেখলাম—আমার ত্বক সত্যিই শিশির-কোমল মোলায়েম হয়ে উঠেছে। শুধু স্বপ্ন নয়—আমি সত্যিই সুন্দরী।
21/ben/

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১০৩ ॥

শংকরবাবু স্নান সেরে এসে বললেন, এসো সূর্য, চট করে খেয়ে নেওয়া যাক্। সামান্য যা আছে—

সূর্য ভদ্রতা করেও আপত্তি জানালো না। হঠাৎ কারুর বাড়িতে উপস্থিত হবার পর ভাত খাবার আমন্ত্রণ পেলে মানুষ একবার অন্তত না বলে। সূর্য সঙ্গে সঙ্গে এসে খাবার টেবিলে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

শংকরবাবু বললেন, হাত টাত ধোবে না?

—না, ঠিক আছে।

—নেমন্তন্নর দিন তুমি বাদ পড়ে গেছ, তোমাকে একদিন ভালো করে খাওয়াতে হবে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কোনো কাজ করতে চাও—কোনো একটা চাকরি-টাকরির তো ব্যবস্থা করা যেতেই পারে, তা ছাড়া যদি পার্টির কাজে তোমার আগ্রহ থাকে—আমার তো মনে হয়, পার্টির কাজেই অনেক বেশী থ্রিল আছে।

—আমি কিছু একটা করতে চাই।

—আচ্ছা, দু' এক দিন পর ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

শংকরবাবুর মুখে বেশ একটা সন্তুষ্ট ভাব ফুটে ওঠে। তিনি অনেকের জন্য অনেক কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন এখন। প্রতিদিন কত লোকজন তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসে। মানুষের উপকার করার ক্ষমতা আয়ত্তে এলে চমৎকার আরাম পাওয়া যায়।

দীপ্তি নিজেই খাবার পরিবেশন করলেন। খুবই সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর খাদ্যসূচী। ভাত, নিম-বেগুন, ডাল, পেঁপে-সেদ্ধ, ফুলকপির তরকারি এবং দই। মাছ-মাংস নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এখন নিরামিষাশী।

— সাধারণ লোকে এখন মন্ত্রীদের জীবন-যাত্রার বিলাসিতা নিয়ে অনেকরকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। বিরোধী দলগুলোর নীতিই হচ্ছে সরকারী দলের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের চরিত্রহনন করা। তাদের সুনির্দিষ্ট প্রচারে সাধারণ লোকের ধারণা, মন্ত্রীরা সবাই টাকা চুরি করে, বাড়িতে সোনারুপো চিবিয়ে খায় এবং ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরে প্রোগ্রামের সময় ডাক-বাংলোতে মদ ও মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে।

শংকরবাবু বললেন, মাছ মাংস ছাড়া সূর্যর নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে। দীপ্তি, ওকে একটা ডিম-টিম ভেজে দাও না।

দীপ্তি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ডিম ভেজে দেবো?

সূর্য ঘাড় হেলিয়ে বললো, হ্যাঁ, দিন।

নিরামিষাশীদের বাড়িতে ডিমও থাকে না। লোক দিয়ে দোকান থেকে ডিম আনিয়ে ভেজে দিতে অনেক সময় লাগলো, সূর্যর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বসেই আছে খাবার টেবিলে। ডাল দিয়ে ভাত মেখে বসে আছে ডিম ভাজার প্রতীক্ষায়। শংকরবাবু নিজের খাবার শেষ করেও বসে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যস্ত লোক, খাবার টেবিলে বেশী সময় নষ্ট করতে পারেন না। একটু বাদে তিনি ভদ্রতা করে বললেন, তুমি যদি কিছু না মনে করো, তা হলে আমি উঠি? আমাকে আবার এক্ষুনি বেরুতে হবে তো—তুমি লজ্জা কোরো না, ভালো করে খাও—

সূর্যর লজ্জা পাবার কোনো প্রশ্নই নেই। সে খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। দীপ্তির হাতের রান্না বলেই তার এই উপভোগ। হয়তো দীপ্তি নিজের হাতে রাঁধেন নি, একজন ঠাকুর বা রাঁধুনী থাকাই সম্ভব, তবু তো পরিবেশন করছেন নিজে।

শংকরবাবু বললেন, দীপ্তি, আমার ব্যাগটা তা হলে গুছিয়ে দিও। আমি ততক্ষণ নীচে গিয়ে কাগজ-পত্তরগুলো—

দীপ্তি বললেন, আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। আমিও তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।

তাঁর স্বামী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যাবে? তুমি কি করতে যাবে—মাত্র এক দিনের তো প্রোগ্রাম।

—না, আমিও ঘুরে আসবো ঠিক করেছি। ওদিকটায় কখনো যাইনি।

—এমন কিছু জায়গা নয়। তুমি বরং সূর্যর সঙ্গে গল্প-টল্প করো—এতদিন পরে এলো—

—সূর্য তো আবার আসবেই। আমি তোমার সঙ্গেই আজ যাবো।

শংকরবাবু নীচে নেমে গেলেন। দীপ্তি সূর্যকে জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য, তোমার আর কিছু লাগবে? আর একটু ভাত আর তরকারি নেবে?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, আপনি খাবেন না?

—হ্যাঁ, এবার বসছি।

দীপ্তি খেতে বসেও বারবার নানা অজুহাতে তাঁর পরিচারিকাকে ডেকে নানা-রকম ফরমাশ করতে লাগলেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি সূর্যকে বেশী কথা বলার সুযোগ দিতে চান না।

সূর্য এক দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে। তার বিমর্ষ মুখখানি দেখলে মনের কথা কিছুই বোঝা যায় না। যে নারীটি তার সামনে বসে আছে, এক সময় দিনের পর দিন সূর্য তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থেকেছে। এমনও দিন গেছে, যখন চব্বিশ ঘণ্টাই তারা কাটিয়েছে এক ঘরে। ওই নারীর নগ্ন শরীরটিও তার চেনা—যে শরীরে রয়েছে তার নিজস্ব প্রিয় আগুন কিংবা শান্তি কিংবা অমৃত। এখন তার সঙ্গে কথা বলতে হবে, অল্প-চেনার মতন। অদূরে দেখা যায় দীপ্তির শয়ন-কক্ষ, দরজা খোলা, শুভ্র চাদর পাতা বিছানা—ওই বিছানায় এই নারী এখন অপর পুরুষের সঙ্গে শোয় প্রতি রাত্রে। এখন দীপ্তি তাকে এড়াবার জন্যই শুধু স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে রানাঘাট না বনগাঁর মতন কোনো অকিঞ্চিৎকর জায়গায়।

সূর্য একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, আমি হঠাৎ এসে পড়ায় তুমি খুব বিরক্ত হয়েছো, তাই না?

দীপ্তি শুকনো ভদ্রতার সুরে বললেন, না, বিরক্ত কেন হবো?

—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে—

—তখন সেটাই একমাত্র পথ ছিল।

—তুমি বলেছিলে, তুমি কখনো বিয়ে করবে না। যে-সব মেয়েরা বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে থাকে, তুমি কিছুতেই তাদের মতন হতে পারবে না।

—জীবন বড় নিষ্ঠুর। মানুষ যা ভাবে, কিছুতেই তা শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক মেলে না। বড়মামা মারা গেছেন, তুমি শুনেছো বোধ হয়!

—ওঁর যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল।

—তবু শরীর ভালো ছিল যথেষ্ট। জলপাইগুড়ির ছেলেরা ওঁকে উত্যক্ত করে মারতো, তবু উনি একটুও ভেঙে পড়েননি, কিন্তু নিয়তি যে কখন কোন্ দিক দিয়ে ছোবল দেয়! ওঁকে সাপে কামড়েছিল।

সতোন গুহকে সূর্য বেশ পছন্দই করতো। কিন্তু তাঁর অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদ শুনেও সে কোনো দুঃখ প্রকাশ করলো না,

চুপ করে রইলো। মনে হয় যেন সে খুব অন্যমনস্ক।

দীপ্তি আবার বললেন, বড়মামার মৃত্যুর পর আমি আর কিছুতেই আশ্রমটাকে বাঁচাতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেছিলাম। আশ্রমটাও ভেঙে যাবার পর আমি এই পৃথিবীতে একা হয়ে গেলাম। তখন কেউ আমাকে খুঁজতে আসেনি। আমি অন্ধের মতন এদিক-ওদিক হাতড়ে একজন কারুকে খুঁজেছি। দুঃখের সময় মেয়েরা কিছুতেই একা থাকতে পারে না।

—কলকাতা ছেড়ে তুমি ওই আশ্রমে পালিয়ে গিয়েছিলে কেন? ওটা কি আমার জন্য?

—হ্যাঁ। আমি এরকম কোনো একটা জায়গাতেই থাকতে চেয়েছিলাম। তা হলে আমি শান্তিতে থাকতে পারতাম। কিন্তু কেউ আমাকে থাকতে দিল না। মানুষের অনেক আশাই মিথ্যে হয়ে যায়।

—এটাও মিথ্যে।

—কোনটা?

—এই যে আপনার বিয়ে—

দীপ্তি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, তোমাদের শংকরদা বরাবরই আমাকে স্নেহ করতেন। আমার অনেক বিপদ-আপদে উনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আশ্রমটা উঠে যাবার পর আমি যখন একেবারে ভেঙে পড়েছিলাম, তখন উনিই আমাকে খুঁজে বার করেন, আমি ডাকিনি, উনি নিজেই গিয়ে আমাকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমন কি, আশ্রমটা আবার গড়ে দেবার কথাও বলেছিলেন, কিন্তু তখন সেটা আর সম্ভব ছিল না, একা ওই আশ্রম চালানো যে আমার পক্ষে অসম্ভব তা বুঝে গিয়েছিলাম। উনিও বুঝেছিলেন, একটা কোনো কাজের মধ্যে ডুবে পড়তে পারলেই আমি আবার সুস্থ স্বাভাবিক হতে পারবো। তাই আমাকে এনে জুড়ে দিলেন এখনকার নারীমঙ্গল সমিতির সঙ্গে। তুমি তো জানোই, কোনো একটা কাজ ছাড়া আমি কিছুতেই ঠিক থাকতে পারি না। আর এ-দেশে কোনো একজন পুরুষ যদি একজন মেয়েকে কিছু সাহায্য করে, তা হলেই নানারকম কথা ওঠে। ওইরকম কথা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আগেকার মতন আর অগ্রাহ্য করতে পারি না, সে জোর নেই—তাই দুজনেই ঠিক করলাম, বিয়ে করাটাই—

সূর্য আবার সেই একই সুরে বললো, না, এটা মিথ্যা!

—সূর্য, আমি এখন খুব ভালো আছি।

—আমি ভালো নেই।

—তোমারও সব কিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি একটা কাজ-টাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নাও—এই দেশের কোনো না কোনো কাজের মধ্যে আমাদের থাকতেই হবে—আমরা দূরে সরে গিয়ে কিছুতেই বেশী শান্তি পেতে পারি না—

—দীপ্তিদি, চন্দননগরের সেই বাড়িটার কথা তোমার মনে আছে? যেখানে তোমাকে প্রথম আমি দেখেছিলাম?

—কেন মনে থাকবে না?

—সেখানে আপনাকে আমি বিবাহিত মহিলা হিসেবেই জানতাম। আসলে সেটা ছিল মিথ্যে। আপনারা নকল স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকতেন। সেইরকম এটাও মিথ্যে।

—সূর্য, কি বলছো তুমি?

—আমি ঠিকই বলছি।

—তোমার মাথার ঠিক নেই। তুমি এবার ওঠো তো!

সূর্য টেবিলে একটা চাপড় মেরে কড়া গলায় বললো, না, মিথ্যে, মিথ্যে! আমি বলছি, এটাও মিথ্যে।

(ক্রমশ)

ফ্লাওয়ারস-এরও নাম করা যায়। বস্তুপ্রধান ছবিটির রঙ ব্যবহাররীতি প্রশংসনীয়। দু-এক ক্ষেত্রে একই রঙের স্তরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে শিল্পী বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, যেমন অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট-এ। সমগ্র রচনাক্ষেত্রটি সুগভীর নীলরঙের সূক্ষ্ম নানা স্তরভেদ ভরিয়ে ফেলে ওপরের দিকে সমান্তরাল ইংগিতপ্রধান একটি সিঁদুররেখা আঁকার ফলে ছবিখানির একটি বিশিষ্ট নিসর্গজাতীয় রূপ সকলকেই যেন আকর্ষণ করে। দু-একটি ছবির রঙ ব্যবহাররীতি দেখে রঙীন মানচিত্রের কথা মনে পড়ে, যেমন অ্যাবস্ট্রাক্‌ট্‌ (১৯৬৯)। বলা বাহুল্য, শিল্পীর সব নিদর্শনই পরীক্ষামূলক এবং সমকালীন আকারপ্রধান রচনার চেয়ে বিমূর্ত রচনাতে শিল্পী অধিক পারদর্শী। অন্যান্য ছবির মধ্যে ল্যান্ডস্কেপ ফান্টাসি ১, ও ল্যান্ডস্কেপ ফ্যান্টাসি ২-এর নাম করা চলে।

✻

শিল্পী বিশ্বপতি মাইতি, বিনোদ দাস, গীতা ভট্টাচার্য, আনন্দ রায়, অজিত দে ও অশেষ মিত্র বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁদের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। প্রদর্শ-

নীতে সকলের মোট ৪০টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। প্রথম পাঁচজন গত এক থেকে পাঁচ বছর আগে সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন, শেষোক্ত জন সরকারী আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রদর্শনীর মান উন্নত নয়—বিশেষ করে নির্বাচন ব্যাপারে সকলের অধিকতর সচেতন হওয়া উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেরই দু-একটির অধিক নিদর্শনে বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য চোখে পড়েনি। দু-একজনের ছবিতে প্রায় একই রীতিপ্রাধান্য চোখে পড়ে। প্রত্যেক শিল্পীই যে নিয়মিতভাবে কাজ করেন তার পরিচয় অবশ্যই মেলে, তবে দু-একজন ছাড়া কেউই নিজস্ব বক্তব্যটুকু সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও অংকনচাতুর্যের জন্য বিশ্বপতি মাইতি ছাত্রাবস্থা থেকেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রদর্শনীভুক্ত তাঁর সমকালীন নিদর্শনগুলি দেখে খ্যাতনামা শিল্পী গণেশ পাইনের রচনাপদ্ধতি ও পরিকল্পনার কথা মনে পড়ে। পরিচিত শিল্পীর প্রভাব পড়া স্বাভাবিক, তা সত্ত্বেও এই প্রভাবকে কেন্দ্র করেও শিল্পী যেখানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করতে পারেন সেখানেই তাঁর শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা। আশা করি, এই প্রতিভাবান শিল্পী সে বিষয়ে সচেতন হবেন। বালিকার সরল আকারভিত্তিক মুখমণ্ডল ও কারুকার্যের জন্য ফার্স্ট রোমান্স অনেকের চোখে পড়ে। নীলরঙের সূক্ষ্ম তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত লালরঙ প্রধান রেড হর্স ও অনেকের ভাল লাগে। অশেষ মিত্রের সাম্প্রতিক কাজে নতুনত্বের আভাস মেলে। সূক্ষ্ম রেখাভিত্তিক রচনার মধ্যে তিনি পুতুলজাতীয় সরলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন—ডেথ অব এ কুইন উল্লেখ্য। অপরাপর শিল্পীদের রচনা বিমূর্ত শ্রেণীর। রচনাক্ষেত্রটি কয়েক অংশে ভাগ করে সোজাসুজি রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিনোদ দাস বক্তব্য বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রঙ সুনির্বাচিত না হওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তা অস্পষ্ট থেকে গেছে। তবে কমপোজিশন ও সুকৌশল লালরঙ ব্যবহারের জন্য রেড এনসাইন অনেকের চোখে পড়ে। আনন্দ রায় নানা রঙ ব্যবহার করেছেন এবং দু-একটিতে সাফল্যলাভ করেছেন। যেমন সাবলিমেশন এ। বিভিন্ন রঙের সুকৌশল মিশ্রণ ও পরিকল্পনার জন্য অজিত দে-র দুএকটি নিদর্শন মন্দ লাগেনি, যেমন দি ড্রিম অব পার্ল। চাপা রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গীতা ভট্টাচার্য মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন এবং একটিতে অনেকাংশে সাফল্য লাভ করেছেন, যেমন সাইলেন্ট এভিডেন্স-এ।

চিত্রপ্রিয়

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য : গবেষণা

Namalinganusasana : Edited by Anandoram Barooah. Publication Board, Assam. First published 1887, Reprint 1971. Rs. 15.00.

Nanartha-Samgraha : Anandoram Barooah. Publication Board, Assam. First published 1884. Reprint 1969. Rs. 35.00.

উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের যে অল্প কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় জীবনের অধিকাংশ শ্রম নিঃস্বার্থভাবে ব্যয় করেছেন, আনন্দরাম বড়ুয়া তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আই সি এস ও ব্যারিস্টার আনন্দরাম মাত্র ঊনচল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার জন্য তিনি সময় পেয়েছিলেন শুধু দশ বারো বছর। তথাপি এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক ও কোষ-গ্রন্থের সম্পাদনা, প্রাচীন ভূগোল এবং সংস্কৃত নাট্যকার সম্পর্কে আলোচনা এবং একটি সুবৃহৎ ইংগ-সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থ দুটি তাঁরই সম্পাদিত দুটি কোষগ্রন্থ।

অমরসিংহ রচিত নামলিংগানুশাসন সাধারণভাবে অমরকোষ নামেই পরিচিত। শ্রীবড়ুয়ার সময়ে এ গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ, পাণ্ডুলিপি বা ক্ষীরস্বামী-কৃত বিখ্যাত টীকা—এ সবই দুর্লভ বা অমুদ্রিত ছিল। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, বাংলায় তো বটেই, অমরকোষের সংস্করণ সুলভ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠকের জানা সহজ ছিল না যে, বৌদ্ধ অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম ছিলেন বা তাঁর এই অজস্র শব্দতালিকাপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থটি আগাগোড়া অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত, ত্রিকাণ্ডে এবং নানা বর্গে নিপুণভাবে সন্নিবদ্ধ। শ্রীবড়ুয়া কৃত সংস্করণটি পরিচ্ছন্ন দেবনাগরী হরফে ছাপা ও স্তবকে বিভক্ত; তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুখবন্ধটি এই সংস্করণের এক মূল্যবান সংযোজন।

নানার্থ সংগ্রহ শব্দ ও তার অর্থ সম্পর্কিত গ্রন্থ, চরিত্রগতভাবে একে অভিধান ও কোষের সংকলনগ্রন্থ বলা যায়। একটি উদাহরণে লেখকের পদ্ধতি বুঝতে পারা যাবে। 'সার্বভৌম' শব্দ সম্বন্ধে আছে —'সার্বভৌমস্তু দিঙ্নাগে সর্বপৃথ্বী-পতাবপি, য, বিঃ সার্বভৌমস্তু দিগ্গজে চক্রবর্তিনি, হেম সার্বভৌমো গজে রাজ্ঞি, ত্রি।' বলা বাহুল্য, একাক্ষরগুলি যথাক্রম মেদিনী, বিশ্ব, হেমচন্দ্র এবং ত্রিকাণ্ডকোষ প্রভৃতি প্রাচীন কোষকার বা কোষগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে লেখকের নিজের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"It is the নানার্থ or homonymous words as treated in our best Kosas that I now present before the public. I do so partly for lexicographical purposes to give in original the views of our highest authorities. But my principal object is historical, to show how words and senses multiply." গ্রন্থদ্বয়ের সযত্ন পুনর্মুদ্রণ করে আসাম পাবলিকেশন বোর্ড সংস্কৃতভাষাবিৎ এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই ধন্যবাদভাজন হলেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'এতদিন যা-যা বলেছ সব তোমাদের কথামত করেছি/এবার যে-যা বলে বলুক/আমি কারও প্রতিবিম্ব না হয়ে/আরশিতে নিজের যথার্থ ছবি দেখতে চাই।' আত্মপ্রত্যয়ী এই ঘোষণার সঙ্গে মিলিয়ে 'অন্তর্গত নদী'র কবি রবীন সুরকে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **'আনুষঙ্গিক আর্তনাদ'-এ** (অরণি প্রকাশন, ভাটপাড়া, তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা) অনুসন্ধানী পাঠক অনায়াসে আবিষ্কার করে নিতে পারবেন। খুঁজে নিতে পারবেন সময়সচেতন, বিবেকী, পীড়িত, ক্ষুব্ধ, অভিমানী এক শক্তিমান কবিকে যাঁর কণ্ঠে সত্তর-একাত্তরের সমগ্র বাংলা দেশের গভীর সংকট ও নিষ্ঠুর রক্তপাতের আনুষঙ্গিক আর্তনাদ তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় স্বতোৎসার। 'গলায় নখের দাগ, এক চোখ ওপড়ানো রক্তমাখা থ্যাতা

শরীর নিয়ে উত্তরকালের প্রজন্মের মুখোমুখি এক কবি ভয়ংকরভাবে অনুভব করেছেন বিশালতম দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি 'আমার সময়......কারো হাতে হাত রাখলে পরস্পর বুকের স্পন্দন কিছুতেই সঞ্চার করে না', দেখেছেন 'নিজেই অজ্ঞাতসারে গলা কাটে সতীর্থের শাণিত কৃপাণে : আবহমানের ভীড়, দত্ত হাসে অন্তরালে' কিংবা 'উদ্ধত যুবকের ফাটা খুলির ভিতর থেকে অনর্গল তাজা রক্তে রাঙে রাজপথ' ভিয়ে কণ্ঠ' এবং 'এই দুঃসময়ে প্রণামের যোগ্য কোনো চরণ' পর্যন্ত নেই, এই অসহায় প্রহরে 'নির্বাক মগজ বিক্রি' হয়ে গেছে, সঙ্গত-ভাবেই তাঁর নিজস্ব অস্ত্র তৈরির কথা মনে হয়েছে—কেননা পুরনো শব্দগুলিও এখন মাজনাহীন : 'কিছুদিন আগেও পদের অমোঘ দৌরাত্ম্যে রাত্রি নিদ্রাহীন' এখন সেই শব্দগুলিও 'মগজের ত্রিসীমায় কাছাকাছি ঘেঁষে না', এবং 'দীর্ঘদিনের শ্রম ও অনুসন্ধানের কাতরতায়' নির্মিত এই অস্ত্রই নবীন সুরের সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ। যারা 'চারধারের সকলকে চুইয়ে দিয়ে দিব্যি গাট্টি হয়ে বসে আছে', তাদের অস্ত্র যে আসলে 'শোকের হাতিয়ার' নিজের শাণিত ক্ষুরধার অস্ত্রটি হাতে নিয়ে তিনি সহজেই বুঝে ফেলেছেন—এই বোধই তাঁর রচনাকে সমসাময়িক রাজনীতির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, নিজস্ব দৃষ্টিকোণকে স্পষ্টতর করেছে—এ-কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'নিজে না জেগে এখন কাউকেই জাগাবার দ্বিতীয় কোনো মন্ত্র নেই' একথা শুধু লেখার খাতিরে লেখা নয়, নবীন সুরের কাব্যগ্রন্থে তার অকপট প্রকাশও ঘটেছে। তাঁর এই জাগরণ, সন্দেহ নেই, নিজস্ব কবিসত্তারই জাগরণ।

*

স্বামী পরমেশ্বরানন্দের শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী (শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, চার টাকা) পরম কৌতূহলোদ্দীপক স্মৃতিগ্রন্থ। লেখক শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত সেবক, দীর্ঘকাল জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন, এখন অবসৃত। অশীতিপর বৃদ্ধের স্মৃতির মণিকোঠায় বহু যত্নে রক্ষিত মাতৃ-স্মৃতিপূত বহু দিব্য ঘটনা ও বাণীর অকপট সহজ বর্ণনা এই গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শনের দিন থেকে গ্রন্থের আরম্ভ। লেখকের সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ, কোয়ালপাড়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, জগদম্বা আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম আগমন, কোয়ালপাড়া ও জয়রামবাটীর পল্লী-পরিবেশে মায়ের অবস্থান, গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা, দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্য ও দীক্ষাদান, গুরুভাবের সঙ্গে মাতৃভাবের সমন্বয়, লীলা, প্রচ্ছন্ন শক্তি, তিরোভাব, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি অনর্গল সরল ভঙ্গিতে বলে গিয়েছেন। পুণ্য দিব্য জীবনের এই আকর্ষণীয় কাহিনী সহজেই সমাদৃত হবে—এ-কথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

*

তিন ছেলে, মা ও দেওর—বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের ছেলেধরা (প্রাইমা পাবলিকেশনস, দু' টাকা) নাটকের চরিত্র পাঁচটি। তিন দৃশ্যের এই একাঙ্ক নাটকে বিবেকানন্দবাবু একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের চলমান ছবি তুলে ধরেছেন। তিন ছেলে তিন রাজনীতির সমর্থক। মেয়ের কলমে উড়ো চিঠি পাঠায় পাড়ার বখাটে ছেলেরা। মার অসহায় অবস্থা, ছেলেদের ওপর শাসন চলে না, অথচ পুরো কাণ্ডকারখানা মেনে নেওয়াও শক্ত। কাকা শশধর পুরনো আর নতুন হাওয়ায় মধ্যপথে দাঁড়িয়ে। ভোটদানকে কেন্দ্র করে তিন ভাইয়ের তুমুল ঝগড়া একদিন তুঙ্গে উঠেছে। ছোটভাই দিলু হঠাৎ ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেছে মেজ ও বড়দাদাকে।

রাজনৈতিক মতান্ধতা মানুষকে কীভাবে ঘাতক করে তোলে অল্প পরিসরে তার পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন বিবেকানন্দ [illegible]চার্য। 'ছেলেধরা' বলতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন গোঁড়া রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি, যারা কিশোর মনে হিংসার বীজ [illegible] দিতে তৎপর। নামটি এমনিতেই একটু সমস্তজ। তার ওপর মলাটে হাড়িকাঠের ছবি এঁকে ব্যাপারটাকে যেন আরও বিসদৃশ করে তোলা হয়েছে।

*

প্রকাশকের ভূমিকা থেকে দীপঙ্কর চক্রবর্তীর হে সূর্য হে জীবন (প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা লিমিটেড, দাম এক টাকা) সম্পর্কে, ও কবিতা সম্পর্কেও, অনেক কথা জানা গেল। যেমন, এক, 'ইন্সটিটুট্যুম মিন্সিটুট্যুমের' পর এই বইটি কবির আরেক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দুই, কাব্য সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। তিন, এই বইটি জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার এবং বিকৃত সমাজ-চিন্তার সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ। এবং সর্বোপরি, 'প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণা, ক্রোধ, সংগ্রামী শক্তির জয়গান, তির্যকতার আবেগে সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলা কাব্যে 'হে সূর্য হে জীবন' শব্দের মুখে ছাই দিয়ে নতুন জায়গা বেছে নেবে।'

আধুনিক বাংলা কবিতাকে যে-বিশেষণে ভূষিত করেছেন প্রকাশক তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের সত্যিই কিছু জানা নেই। তাই সঠিক বোঝা গেল না, বইটি ঠিক কোথায় জায়গা পাবে। তবে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে বলা যায়, শ্রীচক্রবর্তীর ভঙ্গি যতটা সপ্রতিভ, ভাষা ততটা কবিত্বময় নয় এখনো।

OBM: 2670 BEN
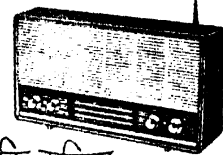
আসুন
বসন্ত মেলায়
বসন্তের এই রঙীন উজ্জ্বল দিনে
বাটার নিবেদন এই সুদর্শন মরশুমী
নকশা। হালকা ক্যাজুয়াল, খোলামেলা
স্যান্ডাল, ছিমছাম চপ্পল। বাটার
বিপণিতে পাবেন আরো অনেক
ডিজাইন আর স্টাইল। সঙ্গে আছে
বাটার সেই চিরকালীন নির্ভরযোগ্যতা
আর পথ চলতে পায়ের আরাম।
আজই আসুন, যোগ দিন
বসন্তের সুখী মেলায়।
জুবিলি ৩৮
স্ক্যাণ্ডার্ডস ১২
ক্র্যাফটসম্যান ৯৩
আরাম ৮৩
ট্রুমক জার্বি
Bata
Bata
Bata
Bata
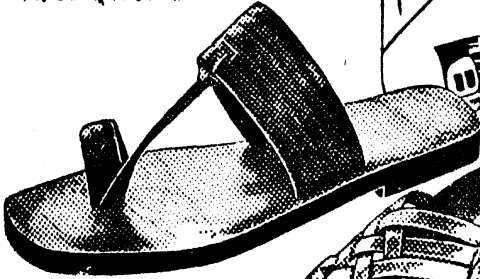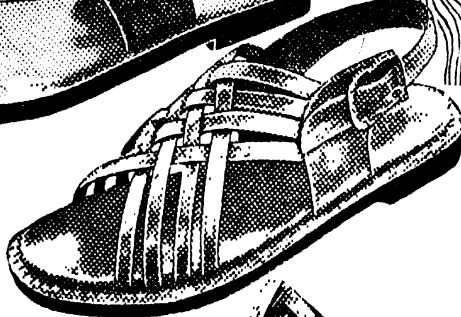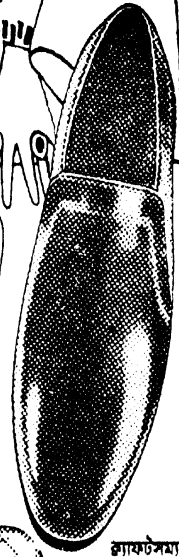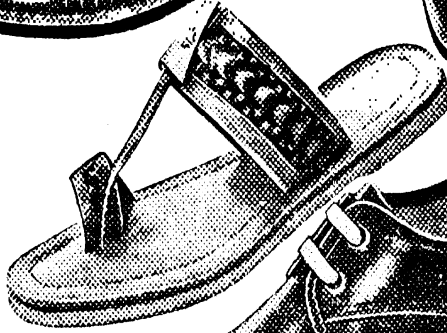
বাসকেটবলে বাংলার বালক অধিনায়ক

পড়াশুনায় যেমন স্কটিশ চার্চ স্কুলের ভাল ছাত্র ছিল চন্দন ভট্টাচার্য, তেমন খেলাধুলায় ছিল সম্ভাবনাময়। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন, টেবল টেনিস, বাস্কেট বল এবং অ্যাথলেটিক্স—সব কিছুতেই ওর বেশ দখল ছিল। তবে বাস্কেটবলে ছিল সব চেয়ে ভাল, যার ফলে ১৯৭২এ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান স্কুল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে চন্দন ভারতের স্কুল দলে নির্বাচিত হয়। সিঙ্গাপুরে খেলেছিলও ভাল।

সিংগাপুর যাবার আগে চন্দনকে মাসখানেক কাটাতে হয়েছিল পাতিয়ালায় নেতাজী সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসের শিক্ষা শিবিরে। সুতরাং প্রথম এশিয়ান স্কুল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য পরের বছর হাইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার্থী ছেলেটির পড়াশুনার বেশ বাধা পড়েছিল।

সিংগাপুর থেকে ফিরে আসার পর বাবা শ্রীঅনিলাভ ভট্টাচার্য বললেন, 'এবার পড়াশুনায় মন দাও, সামনেই তো পরীক্ষা। হাইয়ার সেকেণ্ডারীর রেজাল্ট খারাপ হলে সব পথ বন্ধ। শুধু খেলে বেড়ালেই তো চলবে না।'

ওই ১৯৭২এ জাতীয় স্কুল গেমসে বাংলার স্কুল দলে এবং ৭২-৭৩এ জাতীয় বাস্কেটবলে বাংলার বালক দলে নির্বাচিত হয়েও কেন প্রতিযোগিতায় যেতে পারল না চন্দন বাড়ির আপত্তিতে। তবু হাইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা কিন্তু আশানুরূপ হল না। ফল প্রকাশের আগেই চন্দনকে বসতে হল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার জন্য জয়েণ্ট এণ্ট্রান্স পরীক্ষায়। ফলের ভিত্তিতে ইঞ্জিনীয়ারিংএ ভর্তি হওয়া সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ ছিল। সুতরাং চন্দন যে স্পোর্টসম্যান সে কথাটও আগে থেকে জানিয়ে রেখেছিল পৃথক আবেদনপত্রে। স্পোর্টসম্যানের কোটাগারেতেই চন্দন যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পেল। বাবা বুঝতে পারলেন খেলাধুলার জন্য পড়াশুনার যেটুকু ক্ষতি হয়েছিল সেটুকু ও পুষিয়ে নিয়েছে খেলারই দৌলতে।

নেবেই বা না কেন? খেলাধুলার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের নীতি তো এখনও সর্বক্ষেত্রে। তাছাড়া চন্দন সর্ববিদ্যাবিশারদ স্পোর্টসম্যান। ছাত্র হিসাবেও মেধাবী।

পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি, ছিপছিপে গড়নের (ওজন ১১৫ পাউণ্ড) সাড়ে সতেরো বছর বয়সী ফরসা ছেলেটির আন্তরিকতার খাদ নেই। খেলাধূলার জন্য যেমন প্রচুর প্রাইজ ও প্রশংসাপত্র পেয়েছে, তেমন স্কেণ্ডশিপ ও ক্যারেক্টারের জন্য স্কুল পেয়েছে স্টিফেনস নির্মলেন্দু ঘোষ প্রাইজ এবং পর পর তিন বছর পারফেক্ট অ্যাটেণ্ড্যান্স এর পুরস্কার।

চন্দনের ক্রীড়া ভূমিকাগুলি এক সঙ্গে সন্নিবেশ করলে আমরা দেখতে পাব সব খেলাতেই ওর কিছু কিছু কৃতিত্ব আছে।

কিন্তু যেহেতু বাস্কেটবলেই চন্দনের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী সেইহেতু আর সব খেলা পিছিয়ে পড়েছে। বাস্কেটবলে এগিয়ে গেছে অনেকখানি।

চন্দন ভট্টাচার্য

চন্দনদের বাড়ি চোরবাগানের মিত্র লেনে, বড়বাজার যুবক সঙ্ঘের বাস্কেটবল কোর্টের একেবারে গায়ে। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছে ওখানে ছেলেরা খেলাধুলো করে এবং কত আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করে রিং-এর মধ্য দিয়ে বল গলাতে। সহজাত খেলার নেশা তো ছিলই। সুযোগ এসে গেল ১৯৭০-এ রাজ্যের বাস্কেট বল কোচ শ্রীঅনুভেন্দু ঘোষ যখন ওখানে কোচিং ক্যাম্প খুললেন। চন্দন ও তার দাদা অরুণাভ যোগ দিল ওই ক্যাম্পে। পরে হাতের কব্জিতে চোট লাগার অরুণাভ বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু চন্দন প্রতি বছরই উন্নতির পরিচয় দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন এবার মাদ্রাজে জাতীয় বাস্কেটবলের পাঁচটি খেলায় বাংলার বালক দলের অধিনায়কের স্কোর ১০, ১৭, ২০, ২৭ ও ৩০—মোট ১০৪ পয়েণ্ট। প্রতি খেলাতেই উন্নতির পরিচয়। আর কেউ এত পয়েণ্ট স্কোর করতে পারেনি, একটি খেলাতেও কেউ পারেনি ৩০ পায়েণ্ট অর্জন করতে। সিঙ্গাপুরে এশিয়ান স্কুল বাস্কেট বল চ্যাম্পিয়নশিপে স্কোরার হিসাবে চন্দনের স্থান ছিল দ্বিতীয়, পাঞ্জাবের ছাত্র দাবীন্দার কুমারের পরে। পাতিয়ালা ক্যাম্পে এবং সিংগাপুরে খেলার কোর্টে দাবীন্দারের সঙ্গেই ওর পয়েণ্টের পাল্লা চলে। চন্দন জানালো, পাতিয়ালায় অনুশীলন করতে হত তিনজনের পাস করা তিনটি বল পর পর চোখের নিমেষে ধরে। এই ভাবে ১০০টি বল এক একজনকে বাস্কেট করার জন্য দেওয়া হত। চন্দনের পয়েণ্ট হত ৭৫ থেকে ৭৯, দাবীন্দারের ৭৮ থেকে ৮২। দাবীন্দারকে ওখানে চন্দন হারাতে পারেনি। কিন্তু এবার মাদ্রাজে পাঞ্জাবের বালক দলকে ৬৩—৬৪ পয়েণ্টে হার স্বীকার করতে হয়েছে বাংলার বালক দলের কাছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সুতীব্র উত্তেজনার মধ্যে।

দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়রা স্বভাবতই বাস্কেট বলে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। তার উপর অ্যাথলেটিক চর্চার ফল চন্দনের গতিবেগ ও চটুলতা বেশী। দেহ পেলব। দেহের মোচড়ে প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে বল পাস বা বাস্কেট করায় ও খুবই ওস্তাদ। বড়বাজার যুবক সঙ্ঘের বালক দল থেকে প্রোমোশন পেয়ে চন্দন এবার বড় দলে এসেছে। অনেক আগেই আসতে পারত। পারেনি ওর উপরই বালক দলের অধিনায়কের দায়িত্ব ছিল বলে। চন্দন বাস্কেট বলে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে চায়। অবশ্যই পড়াশুনোটা ঠিক রেখে।

মুকুল

ইস্টবেঙ্গল আবার রোভার্স জিতল

গতবারের যুগ্মজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আবার রোভার্স কাপ জয় করে বোম্বাই থেকে ফিরে এসেছে। গত বছর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফাইনাল খেলা দুদিন গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হবার পর দুই দলকে যুগ্মজয়ী ঘোষণা করা হয়। এবার নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ৯ বছর রোভার্স ফাইনাল খেলে ৬ বার বিজয়ী হল। এর মধ্যে অবশ্য দুইবার যুগ্ম জয়ের হিসাব রয়েছে। গতবার ছাড়া আরও একবার, ১৯৬২ সালে অন্ধ্র পুলিসের সংগে ইস্টবেঙ্গল যুগ্মভাবে রোভার্স বিজয়ী হয়।

রোভার্সে ইস্টবেঙ্গলকে এবার খেলতে হয় তিনটি ম্যাচ। কোয়ার্টার ফাইনাল পুলে অবশ্য দুটি ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতার অপর দল টালিগঞ্জ অগ্রগামী ক্লাব প্রথম খেলায় হেরে গিয়ে কলকাতার চলে আসে খেলোয়াড়দের চোট আঘাত লাগায়। ফলে গোর্খা ব্রিগেডকে ৪—০ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনালে ১—০ গোলে পরাজিত করে গোয়ার চ্যাম্পিয়ন ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবকে এবং ফাইনালে ৩—২ গোলে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে।

সেমিফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাবের কাছে ০—১ গোলে হেরে গিয়ে মোহনবাগান এবার রোভার্স থেকে বিদায় নেয়। তার আগে কোয়ার্টার ফাইনাল পুলে বোম্বাইয়ের অপর টিম মফৎলাল মিলসের সংগে মোহনবাগানের খেলা ১—১ গোলে শেষ হয় এবং দ্বিতীয় খেলায় বোম্বাইয়েরই ওরকে স্পোর্টস ক্লাবকে ২—০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান সেমিফাইনাল খেলার অধিকার পায় গোলের সংখ্যানুপাত ভাল থাকায়।

যাই হক, রোভার্স কাপের ইতিহাসে টানা পাঁচ বছর বিজয়ী হবার যেমন একটি অনন্য রেকর্ড আছে হায়দরাবাদ পুলিসের, তেমন মোহনবাগানেরও একটি গৌরবের রেকর্ড আছে উপর্যুপরি ১০ বছর ফাইনাল খেলার। যদিও যুগ্মজয়ের হিসাব সমেত ১০ বছর ফাইনাল খেলে মোহনবাগান রোভার্স কাপ ঘরে এনেছে পাঁচবার, তবু ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত টানা ১০ বছর ফাইনাল খেলা নজিরহীন ঘটনা। ১০ বছর পরে এবারই ফাইনালের আগে মোহনবাগানকে বিদায় নিতে হয়েছে।

ডিরেক্ট ফ্রি-কিক মানেই ১৮ গজ বা তারও দূরে থেকে কিক। বলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন জাদু জিনিস পোরা থাকে না, থাকে খানিকটা হাওয়া। সুতরাং শট যত তীব্রই হোক, প্রস্তুত থাকা গোলকিপারের পক্ষে সে শটে পরাজিত হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। ফ্রি-কিক বাঁক নিয়ে গোলে ঢোকার সময় মোহনবাগান গোলরক্ষক তরুণ বসু নাকি নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এবং আন্দাজবোধের ফল সব সময় ভাল হয় না। বহু সময় তার জন্য মাশুল গুণতে হয়। তরুণকেও গুণতে হয়েছে রোভার্স থেকে নিজ দলের বিদায় ব্যবস্থা পাকা করার মাধ্যমে।

ইস্টবেঙ্গলের রোভার্স জয় অবশ্যই তাদের দলগত সংহতি এবং ক্রীড়ানৈপুণ্যের পুরস্কার। যদিও ফাইনালে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন টাটা স্পোর্টস ইস্টবেঙ্গলের সংগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, ০—২ গোলে পিছিয়ে পড়েও দুটি গোল শোধ করার পর আর একটি গোল খেয়ে হেরে গেছে। তবু খেলার ধারা অনুযায়ী ইস্টবেঙ্গলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হয়েছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও কুশলী খেলোয়াড় সুভাষ ভৌমিককে বাদ দিয়ে। ডেম্পোর সংগে সেমিফাইনাল খেলার দিন সুভাষের পায়ের গোড়ালি মচকে যাওয়ায় সুভাষ ফাইনালে খেলতে পারেনি। সুভাষ খেলতে পারলে হয়তো ফাইনালে জয় আরও সহজ হত।

গত বছরের মে মাস থেকে আমাদের ফুটবল মরশুম শুরু হয়। নানা প্রতিযোগিতা জাতীয় ফুটবল, ডুরাণ্ড, রোভার্স প্রভৃতি শেষ হতে ১০ মাস কেটে গেল। মাত্র দু' মাস বিরতির পর আবার আরম্ভ হচ্ছে কলকাতার ফুটবল মরশুম। ভারতে ফুটবল এখন সারা বছরের খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এ বছর রোভার্সে একটি নতুন নজির সৃষ্টি হল। কলকাতার কিছু খেলোয়াড় দল বদলের পর রোভার্সে খেলল নতুন ক্লাবের জার্সি গায়ে দিয়ে। অতীতে কলকাতার মরশুম শেষ হবার পর রোভার্স বা ডুরাণ্ড খেলা যেত অন্য ক্লাবের খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করে। কলকাতায়ও একই বছরে এক ক্লাবের হয়ে লীগ এবং আর এক ক্লাবের হয়ে শীল্ড খেলার নিয়ম ছিল। অবশ্যই আই এফ এ-র অনুমোদন সাপেক্ষে। সে নিয়ম অনেক আগে উঠে গেছে। এখন এক মরশুমে দুটি ক্লাবে খেলা যায় না। এবার গোল রোভার্স অনেক দেরীতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং ফুটবল মরশুমের সময়সীমা নির্দিষ্ট না থাকায়।

রণজি থেকে বাংলার বিদায়

ইডেনে মহারাষ্ট্রের কাছে প্রথম ইনিংসের ফলে হেরে গিয়ে বাংলাকে এবার রণজি প্রতিযোগিতার খেলা থেকে বিদায় নিতে হল। এটা ছিল রণজির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা। গতবারও বাংলাকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল মহারাষ্ট্রের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে। খেলাটি হয়েছিল পুণায়। বাংলা হেরেছিল ৯ উইকেটে। তার আগের বছর কিন্তু এই ইডেনেই মহারাষ্ট্রকে বাংলার কাছে ৮ উইকেটে হার স্বীকার করতে হয়েছিল।

এবার খেলার আগের দিন নেট প্র্যাক্টিসের সময় বলের আঘাতে আহত হওয়ায় বাংলার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান গোপাল বসু খেলতে পারেনি। অপর ব্যাটসম্যান পলাশ নন্দী এবং উইকেটকিপার সম্বরণ ব্যানার্জী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনজন নামী খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে বাংলাকে দল গড়তে হয়। তবু অবস্থা ছিল বাংলার জয়ের খুবই অনুকূল। টসে জিতে অধিনায়ক অম্বর রায় মহারাষ্ট্রকে প্রথম ব্যাট করতে দিয়ে বিজ্ঞ সিদ্ধান্তের সাধুবাদ আদায় করে ১৯৭ রানে মহারাষ্ট্রের ইনিংস শেষ হওয়ায়। বোলারদের অসহায়ক উইকেটে সুব্রত গুহ, সমর চক্রবর্তী এবং তপনজ্যোতি ব্যানার্জী সত্যিই ভাল বল করে মহারাষ্ট্রকে অল্প রানে নামিয়ে দিয়েছিল। তারপর বাংলার যখন ২ উইকেটে ৭০ রান তখনও জয়ের সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু দায়িত্ববোধের অভাবে বাংলার ব্যাটসম্যানরা একে একে উইকেট খোয়াতে থাকে শুকনো মাটিতে আছাড় খাওয়ার মত। ৭টি উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৩৯ রানের মধ্যে। মহারাষ্ট্রের রান সংখ্যা থেকে ৫৪ রান পিছনে থেকে বাংলা প্রথম ইনিংস শেষ করে ১৪৩ রানে। অথচ পিচ ছিল ব্যাটসম্যানের সহায়ক। পেস বোলার পাণ্ডুরঙ্গ সালগাঁওকারের বলেও বিশেষ কিছু ছিল না। আশ্চর্যের ব্যাপার সালগাঁওকর চার-পাঁচ কদম ছুটে এসে সিদে বল করেও পাঁচটি উইকেট পায় প্রথম ইনিংসে। এক রাজু মুখার্জী ছাড়া বাংলার কোন ব্যাটসম্যান দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে পারেনি।

তিন দিনের খেলায় প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়ার অর্থই প্রকারান্তরে হেরে যাওয়া। তবু জয়ের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক হেমন্ত কানিৎকার ও যজুবেন্দ্র সিংয়ের দৃঢ়তায় তা উবে যায়।

জাতীয় ক্রিকেটের ৪০ বছরের ইতিহাসে বাংলা মাত্র একবার রণজি ট্রফি জিতেছে। ফাইনাল খেলেছে আরও ৭বার। অনুকূল পরিবেশের মধ্যে এবার যেভাবে হারল এভাবে কিন্তু কমই হেরেছে।

একলব্য

"সে যেখানে দাঁড়িয়ে" (পরিচালনা : অগ্রগামী) ছবিতে দীপঙ্কর দে ও কাবেরী বসু

মতামতের মন্তাজ

ম্যাটিনি আইডল কথাটির সঙ্গে এখন নুন আইডল-ও চালু হতে পারে। বিভিন্ন সিনেমা হাউসে নুন শো শুরু হবার পর ম্যাটিনির কদর কমছে কী বাড়ছে সেটা অবশ্য প্রদর্শকরা অথবা পরিবেশকরা বলতে পারবেন। বাইরে থেকে যা মনে হয় প্রদর্শনী হিসাবে নুন শো এখন যথেষ্ট জনপ্রিয়। হলের সামনে ভিড়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক অল্পবয়স্ক তরুণ। মহিলা দর্শকও অনেক। নুন শোর জনপ্রিয়তা কেন বাড়ছে কিংবা তাতে অল্পবয়স্ক বা মহিলা দর্শকদের কতখানি সুবিধা হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। দুঃখের বিষয়, বাংলা ছবির নুন শো তেমন হয় না।

* * * *

সব বাংলা সিনেমা চেন-এ বাংলা ছবির নুন শোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নুন শোর দর্শক যখন তৈরি হয়েছে তখন আর বাংলা ছবির দ্বিধা কেন? এমন হলও আছে যেখানে মোট চারটি শো হয়। শোর সংখ্যা সব বাংলা চেন-এ বাড়ালে প্রেক্ষাগৃহের অভাবটাও পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সরকার বাংলা ছবির চেন বাড়াবার কথা ভাবছেন। কিছু সংখ্যক হলে বাংলা ছবি চালানো যায় কিনা তাও ভেবে দেখেছেন। হল যদি নাও মেলে চারটি শো তো হাতছাড়া করা যায় না। অবশ্য ছবি কতখানি জনপ্রিয় হবে সেটাই গোড়ার কথা।

* * * *

বাংলা ছবির নুন শো তো দূরের কথা, বাংলা ছবির চেন-এ হিন্দী ছবির নুন শো হচ্ছে। একই হলে তিনটা থেকে বাংলা ছবি, দুপুর বারোটায় হিন্দী ছবি। তাতে বাংলা ছবির সঙ্গে হিন্দীচিত্রের সরাসরি প্রতিযোগিতার পথই প্রশস্ত হচ্ছে। বারোটার শোতে টিকিটের জন্য যাঁরা ভিড় করেন, বা ধস্তাধস্তি করেন তারা হাতে টিকিট পেয়ে হলে টাঙানো বাংলা ছবির স্টিল বা হোর্ডিংয়ের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকান। বাংলা চিত্র তখন কাব্যের উপেক্ষিতা। দূর থেকে বাংলা ছবির হোর্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে এবং হলের সামনে ভিড় দেখে কেউ যেন পুলকিত না হন। বারোটার আগে যে ভিড় তার অধিকাংশই হিন্দীচিত্রের দর্শক।

* * * *

চিত্রপ্রদর্শকরা বাংলা ছবিকে বাঁচাবার জন্য হয়ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নন। তাঁরা অবশ্যই তাঁদের ব্যবসার কথা ভাববেন। তবে বাংলা ছবির চেন-এর মালিকদের কাছে বাংলা ফিলম ইন্ডাস্ট্রি অনেকটা সহযোগিতা আশা করতে পারেন। এমন একদিন ছিল, সেও খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন বাংলা ছবিই ছিল তাঁদের প্রধান ভরসার স্থল। নিউ থিয়েটার্স-এর

আজকের কথা না হয় বাদই গেল, পরবর্তী-কালের বাংলা ছবিও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। জনপ্রিয় বাংলা ছবি আজও হয়। তবে কেন বারোটায় শোতে বাংলা ছবির অধিকার নেই?

* * * *

বাংলা সিনেমার চেন-এ পুরনো জনপ্রিয় বাংলা ছবিও দেখানো যেতে পারে। পুরনোর প্রতি দর্শকের আকর্ষণ যে প্রবল তা ইদানীং প্রমাণিত। তাতে ফিলম ইনডাস্ট্রির যত না উপকার হোক তার চাইতে বেশি উপকার হবে বাংলা ছবির। এই উপকার সাংস্কৃতিক। বাংলা সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবেও বাংলা ছবির প্রদর্শনীর প্রসার ঘটাতে হবে। তার জন্য এক মুহূর্তও অবহেলা করা যায় না। তাই নূন শো কিছুতেই বাদ যেতে পারে না। বাংলা ছবির নিয়মিত নূন শো কবে হবে?

(সি-২২০৫০)

বোম্বাই বিচিত্রা

উনি বললেন "কনট্যাক্ট বাড়ান, কনট্যাক্ট বাড়ান, জীবনে যদি কিছু করতে চান তাহলে জীবনের সান্নিধ্য ছেড়ে বিশেষ বিশেষ জীবের সঙ্গে সখ্যতা করুন; যাদের হাতে ক্ষমতা গোপনে তাদের সব দোষ ক্ষমা করে তাদের খাতির করতে শিখুন, দেখবেন আপনার খ্যাতি হৈ হৈ করে বাড়বে!" উনি যেখানেই যান যেখানেই সখ্য এবং শিষ্য সংগ্রহ করে থাকেন! বিদেশে গিয়েও উনি ছবি দেখেন না, খোঁজ নেন ডেলিগেটদের, খবর নেন যারা খবর ছাপে তাদের, উপঢৌকন দেন তাদের যারা বিশেষ বিশেষ কমিটির ক্ষমতাবান সদস্য। উনি নিজের প্রশংসা নিজে করেন না। উনি নিজেকে কখনো বড় বলেন না নিজে। উনি কেবল যাঁরা প্রশংসিত তাঁদের নিন্দা করেন অকপটে, যাঁরা বড় তাঁদের ছোট করেন হাসতে হাসতে। উনি অপরের নাকভিঙ্গা করেন অন্যের নাক কেটে, ওঁর নিজের নাক নাসিকা ঊর্ধ্বে উন্নীত, উনি বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে 'শট' সংগ্রহ করে ছবি করেন, অপরের ছবি না দেখে দৃশ্যের পর দৃশ্যের সমালোচনা করেন, গুরুগম্ভীর উদ্ধৃতি ছাড়া আলোচনা করেন না; কারুর কাছে ধরা পড়ে গেলে, এতটুকু লজ্জা না পেয়ে, কি প্রথায় অন্য কাউকে ধরে পথ পরিবর্তন করতে হয় তা ওঁর সবচেয়ে ভাল জানা। উনি আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্প করেন, শিল্পের মাধ্যমে রাজনীতি করেন এবং রাজনীতির কল্যাণে শিল্পজগতে রাজত্ব করার স্বপ্ন দেখেন।

আপনারা হয়তো ভাবছেন এই উনি কে? যদি ভাবছেনই তাহলে আরো একটু তলিয়ে, আরো একটু গভীরভাবে ভাবুন দেখবেন আপনি 'ওঁকে' চেনেন; শুধু আপনি কেন অনেকেই ওঁকে চেনেন, হাড়ে হাড়ে চেনেন, কিন্তু ঐ চেনা পর্যন্তই, চিনিয়ে দিতে পারে না কেউ, ধরিয়ে দিতে পারে না কেউ। একদিন কথায় কথায় ওঁকে বললাম, "এত ভণ্ডামি করেন ভয় করে না আপনার?" উনি বিজ্ঞাবিজ্ঞায় বিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, "ভয় করব কাকে? আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বিনা দ্বিধায় আমাকে সনাক্ত করতে পারে এমন কেউ আজকাল আর সচল নয়—যারা আমার বিরোধিতা করতে পারে আমার মুখোশ খুলে দিতে পারে তাদের মুখশ্রী যদি দেখতেন, সবাই মুখপোড়া, কেউ কম কেউ বেশী।" বললাম "আপনার ব্যাপারটা তো অনেকটা কানকাটার শহর সফরের মত!" উনি বললেন, "তা বলতে পারেন, কিন্তু মুখপোড়া আর কানকাটা না হয়ে

উপার কোথায়, অনেকদিন যাবৎ আমিও "অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলেসি" এমন কথায় বিশ্বাস করেছি—বললাম, "গণ্ডগোল তো সেইখানেই, আপনার কাছে অনেস্ট একটা পলেসি, জীবনে বাস্তবিক উন্নতির একটা সিঁড়ি, 'অনেস্টি' আপনার কাছে ব্যবসার সামগ্রী, অনেস্টিতে যদি বাণিজ্য ভাল হয় তাহলে আপনি অনেস্ট, আবার ডিজ-অনেস্টিতে যদি ব্যবসা আরো ভাল হয় তাহলে আপনি ডিজ-অনেস্ট—।" উনি বললেন, "ঠিক ধরেছেন, এ শুধু আমার কথা নয়, এ কেবল ফিলিমওয়ালাদের কথা নয়, একথা সর্বত্র, জীবনের, সমাজের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা সকলেই বাধ্য হয়ে ডিজঅনেস্ট দেখুন না, এই যে আমার লাস্ট ছবিটা, যে ছবিতে দেশের বেকার অবস্থার চিত্র আঁকতে চেয়েছি, দেখাতে চেয়েছি ব্যবসাদারদের অনাচার, সরকারের শৈথিল্য, ব্যুরোক্রাটদের বদমাইসি; সেই ছবিটা কিন্তু বানিয়েছি ব্যবসাদারের পয়সায়, সরকারের সহানুভূতিতে এবং ব্যুরোক্রাটদের বদান্যতায়। যাদের সমস্যা নিয়ে ছবি বানিয়েছি তারা আমাকে শিল্পী বলে মাথায় তুলে নেচেছে। যাদের নিন্দা করেছি তারা আমাকে সার্থক সমালোচক বলে পুরস্কৃত করেছে। আর যাদের বিরুদ্ধে কথায় কথায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি তারা আমার বিদ্রোহী ছবি গলায় ঝুলিয়ে প্রগতিশীল ব্যবসাদার হয়েছে। আরে মশাই আপনার সমালোচক অসৎ, আপনার দর্শক অসৎ, আপনার পৃষ্ঠপোষক অসৎ, আপনার পরিবেশ অসৎ, আপনার পরিবেশক, আপনার প্রযোজক, এক কথায় আপনি যাদের ছাড়া চলতে পারেন না তারা সকলেই অসৎ, সুতরাং ভাল করে ভেবে দেখুন কোথাও না কোথাও আপনিও অসৎ, নইলে এই অসৎ-ফসলে ভরা দুনিয়ায় আপনি ফললেন কি করে?"

সরল শর্মা

অন্য রবিশংকর

সেদিন রবীন্দ্রসদনে (২১ ফেব্রুয়ারি) আমরা আদত রবিশংকরের অভাব বোধ করেছি। ধ্যানী—অন্তলাপগম্ভীর রবিশংকর সেদিনের বাজনায় উঁকি দেননি। তাই ওঁর প্রথম নিবেদন ভীমপলাশী (যা তিনি ওঁর স্বর্গত বন্ধু ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের নামে উৎসর্গ করলেন) শুনে শ্রোতার মনে প্রশ্ন জেগেছে আলাপে চিন্তা এবং সুরের কার্পণ্য কেন। গত বছর পটদীপে আলাপ করে রবিশংকর শ্রোতাদের বুঝিয়েছিলেন আলাপের সুরে শিল্পীর মনের কেমন স্তরের চেতনা। ভীমপলাশী আলাপ এবং জোড়ের সম্পূর্ণ বৃত্তের মধ্যে মনে রাখার মত ভাগগুলো বুঝি সেগুলোই যেখানে রবিশংকর ধ্রুপদগানের আভাস ছড়িয়ে

"আলো ও ছায়া" (পরিচালনা: গুরু বাগচী) ছবিতে জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী বসু এবং অন্যান্যরা

পেরেছেন কিংবা বীণ অঙ্গের তন্ত্রবাদী তৎপরগুলি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য স্বীকার করতেই হয় এত ছন্দে ছন্দে জোড় অঙ্গের কাজ শ্রোতা বড় একটা শোনেন না। সময় সময় সে ছন্দের কাজ নাচুনে ছন্দের পর্যায়েও পৌঁছে গেছে। কিন্তু যে সুর-লালিত্যের জন্য রবিশংকর বাঙ্গালী মানসে একটা অক্ষয় আসন পেতেছেন সে লালিত্য তো সেদিন দেখা দিয়েও সম্পূর্ণ প্রকাশ পেল না।

ভীমপলাশীর আলোচনায় একটা কথা স্মর্তব্য যে সেতারের মাইক সেদিন আসরের প্রথম ভাগে বেঁকে বসেছিল এবং অনেক মীড় গমক কি মূর্ছনার পুরো স্বাদ শ্রোতা পাননি।

ভীমপলাশীই রূপক তালে বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন রবিশংকর। তাল এবং লয়ের ব্যাপারে শিল্পীর জুড়ি মেলা ভার। এবং সে সমস্ত কাজে বাজনায় উত্তরণ আমরা দেখেছি। কিন্তু তাল বাজিয়েও যেভাবে রবিশংকর রাগবিস্তার করেন সেখানটাতেই একটু যেন অভাব থেকে গেছে। ছন্দ-লয়ের দুরূহ চলনে মেতে উঠেছিল বাজনা। অবশ্য আল্লা রাখা সাহেবের বেলের ব্যবহারে একটা কমের ভাব থেকে গিয়েছিল। কাজেই সেতারের কাজেই মন আটকে পড়ল বারবার। বন্দীশের তেহাই কি হিসেবের লড়াই তেই তবলা জেগে উঠল সেতারের দাপট মাললাতে।

রবিশংকরের দ্বিতীয় নিবেদন ছিল তিন তালে (বিলম্বিত এবং দ্রুত) ইমণ মাঞ্জ। অদ্ভুত সুরেলা রাগ ইমণ-মাঞ্জ এবং শিল্পী খুব যত্নের সঙ্গেই বিলম্বিত বিস্তারে মন দিয়েছিলেন। সে সময় ক্রমান্বয়ে সুরের আন্দোলন আমরা দেখেছিলাম। এবং মনেও হয়েছিল ক্ষণে ক্ষণে, এই বুঝি আলাপের অভাব মিটবে গতবিস্তারে। কিন্তু তবলার মাথা-মাথা সঙ্গতের অভাবেই সম্ভবত পণ্ডিতজী চমৎকার করে ধরা বিলম্বিত গতটিকে ছেড়ে দিলেন তবলার সঙ্গে লয়ের সঙ্গতি রাখার জন্য। তখন ধরলেন দ্রুত গত যার পরিণতি আমরা দেখেছি সূক্ষ্ম লয়কারী এবং তালের নৈপুণ্যে। তালবিদ্যার এক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বলা চলে রবিশংকরের ইমণ-মাঞ্জকে। সুরকে নিবিড়ভাবে ধরে রেখেও তালের এই সম্যক ব্যবহার শ্রোতার অত্যাশ্চর্যের কারণ হয়ে উঠেছিল। গতবাদন আমরা বহু শুনেছি যে তাল একটা ফ্রেমের মতন কাঠ-কাঠ, সুরের ওপর বেড়ী। কিন্তু রবিশংকরের নিবেদনে তাল হল গতবিস্তারের হৃৎস্পন্দন। লয় সেখানে ধমনীতে পরিব্যাপ্ত শোণিতধারা। সে মূর্তি আমরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছি ইমণ-মাঞ্জ গতে দ্রুতটিতে। ইমণের মজলিসী সুরে মঞ্চের করুণ যোগাযোগ একটা সুবিস্তৃত সুরমণ্ডল সৃষ্টি করে। তাতে থেকে থেকে অনেক গানের কলি, আর বাউলের ছায়া পর্যন্ত এসে পড়ে। আর এ সমস্তই রবিশংকরের প্রাণের জিনিস। তাই বলতে হয়, আমরা আরও বড় করে পেলাম না কেন ইমণ-মাঞ্জের বিলম্বিত রূপটুকু?

বিরতির পর রবিশংকরজী আওচারের মতন করে আলাপ করেছিলেন কৌশীধ্বনি রাগে। ছোট হলেও বড় সুরে বসেছিল সে আলাপ। সময় সময় মনে পড়ছিল হালে শোনা 'আমীর খাঁর কৌশীধ্বনি'। অলাপটুকু ভাল লাগছিল বলেই চট করে শেষ হয়ে যাওয়াটা বড় কষ্ট দিল। রবিশংকর

তখন ধরলেন ১৭ মাত্রার শিখর তালে গত। তালের ভাগ ছিল ৪-৪-৪-৫। গতে অবশ্য সাথসঙ্গত, সোম-ফাঁকের ব্যাপার এসে যাওয়ায় (এবং অল্পক্ষণ বাজানর জন্যই হয়ত) তন্ত্রবাদী নৈপুণ্যে বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে হাত গরম হয়ে ওঠায় কিছু উল্টো, কিছু সপাট এবং গমক তান বাজনার মৌতাত বাড়িয়ে তোলে।

শেষ নিবেদন মাজ খাম্বাজে দুটো গত বাজালেন রবিশংকর। প্রথম গত দাদরায় বাঁধা। দ্বিতীয় দ্রুতটি তিন তালে। গতের আয়াতিতেই অসংখ্য সুরের মেলামেশা ঘটিয়ে শিল্পী শ্রোতার মনে সাড়া জাগালেন। পাহাড়ী, বাউল, মান্ড, কীর্তন, ভাটিয়ালী, চটকার সুর এবং স্থানে স্থানে একাধিক রাগের গানের স্থায়ী কি অন্তরা সেতার-বাদনকে গায়কের কণ্ঠে রূপান্তরিত করেছিল। এ বাজনায় হাতের কাজও ছিল প্রচুর।

বাংলা ধূন বলে রবিশংকরজীর হাতে আমরা যা শুনেছি ইতিপূর্বে তারই একটা সংস্করণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাজ খাম্বাজ গত। যাঁরা এটিকে নিছক হাল্কা পেশকারী হিসেবে ধরবেন তাঁদের আহ্লাদ হবে এটি শুনলে। কিন্তু যাঁরা রেকর্ড কি আসরে পন্ডিতজীর অনুভূতির ছোঁয়াতে প্রাণ পেতে দেখেছেন এই অতিরিক্ত মধ্যময় যুক্ত খাম্বাজটিকে তাঁরা হয়ত আপত্তি না করে পারবেন না।

সংগীত সমালোচক

সুচিত্রা মিত্রের সম্বর্ধনা

রাষ্ট্রীয় সম্মানে অভিষিক্ত পদ্মশ্রী সুচিত্রা মিত্রকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ গত ১৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং গুণী শিল্পী সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিল্পীর উদ্দেশে প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। সুচিত্রা মিত্র অভিনন্দিত হলেন, কখনো কথার মালায়, কখনো গানের সুরে, কখনো নীরবে সমর্পিত ফুলের তোড়ায়।

এই আনন্দানুষ্ঠানের শুরুতে ছিল বিষণ্ণতার সুর। সম্প্রতি লোকান্তরিত শিল্পীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন। অতঃপর রবিতীর্থের ছাত্রীদের সমবেত গান, নৃত্যমের ছাত্রীদের মন্দিরা-নৃত্যের ছন্দে বরণানুষ্ঠান। ওঁদের নৃত্যের তাল ও ছন্দ নিখুঁত হলে হয়তো এই বরণ-কৃত্যের অভিনবত্বটুকু উপভোগ্য হোতো। কিছু দ্রব্যসামগ্রী, মানপত্র এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের পক্ষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং কয়েকটি সংগীত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এর ফাঁকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু গান, কিছু বক্তৃতা এবং সবশেষে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে কয়েকটি আবেগমণ্ডিত গান—এই নিয়েই সেদিনকার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল।

স্মৃতিচারণের আলোয় বা অনুভূতির উত্তাপে যাঁরা উদ্ভাসিত করে তুললেন সুচিত্রা মিত্রের প্রতিভার নানা দিক তাঁদের মধ্যে ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সন্তোষ-কুমার ঘোষ, দ্বিজেন চৌধুরী, আয়ত্তাভ চৌধুরী, অমল শংকর, নীহাররঞ্জন সেন, শুভ গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এঁদের মধ্যে দ্বিজেন চৌধুরী বিশেষত সুচিত্রা মিত্রের সাংগঠনিক এবং সৃজনশীল ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনায় এবং পরিচালনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতার উল্লেখ করলেন। সুচিত্রা মিত্রের প্রত্যুত্তর পাঠ করে শোনান কল্যাণ রায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা কমিশনার দিলীপকুমার গুহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আনন্দবর্ধন

"মল্লিকা"-র তিনশো রজনী

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে "মল্লিকা" নাটকের তিনশো রজনীর স্মারক-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীউদয়শংকর এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী কানন দেবী। শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের হাতে পুরস্কারগুলি তিনিই বিতরণ করেন। যাঁরা পুরস্কার পান তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাহিনীকার জরাসন্ধ, নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায়, পরিচালক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, আলোকশিল্পী তাপস সেন, সংগীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সবেন্দু, অনুপকুমার, সাধনা রায়চৌধুরী, অলকা গাঙ্গুলি সহ আরও ত্রিশজন শিল্পী। শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া হয় সোনার গহনা, পোশাক, ঘড়ি, ট্রানজিসটার ইত্যাদি এবং কলাকুশলী ও কর্মীদের দেওয়া হয় নগদ অর্থ। শ্রীমতী শ্যামমোহিনী দেবীর হাতে তাঁর পরিচালিত অনাথ আশ্রমে সাহায্যের জন্য ১২০১ টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পুরস্কার গরদের ধুতি ও চাদর দেওয়া হয় প্রযোজক শ্রীহরিদাস সান্যালকে। তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছেন ওই মঞ্চের শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

মূকাভিনেতার বিদেশ সফর

তরুণ মূকাভিনেতা হিরন্ময় কোনিয়া সরকারের আমন্ত্রণে গত নভেম্বর মাস থেকে দীর্ঘ আড়াই মাস আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে মূকাভিনয় প্রদর্শন করে দেশে ফিরে এসেছেন। তার মধ্যে নাইরোবির অনুষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রায় দশ হাজার দর্শক দুদিন ধরে ওখানে তাঁর প্রদর্শনী দেখেন।

আফ্রিকার অন্যান্য অংশেও তাঁর প্রদর্শনী প্রশংসা পায় এবং টেলিভিশনেও তাঁর অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। হিরন্ময়ের মূকাভিনয়ের মধ্যে ইউনিভারসাল বাদ্‌রাহা, আফ্রিকা, আধুনিকা, বেকার, মানুষ ও যন্ত্র ইত্যাদি ফিচারগুলি বিশেষ প্রশংসিত হয়। তিনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

অরণ্যদেব লী ফক

অরণ্যদেব কিংবা তাঁর বাবা বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন একটি ক্ষুদে মানুষকে।
!

'ঠিক এক বছর পর ক্ষুদে মানুষের দল চোরাবালির গহ্বর থেকে রক্ষা করল তাঁকে।'

মজবুড়ো গল্প বলছে-
(অরণ্যদেব তুমি একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে)
(এখন তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে।)

'অরণ্যদেব — নাকি তাঁর বাবা — ক্ষুদে মানুষদের রাজপুত্র ভ্রাদের বন্ধু হয়েছিলেন।'
'তাঁরা পরস্পরের ভাষা শিখতে লাগলেন।'

'ফন্টেনু লাভা-নদীর গুপ্তপথ অরণ্যদেবকে বাতলে দিলেন ভ্রাদ; যাতে তিনি ক্ষুদে মানুষের দেশে যেতে পারেন।'
সাবধান! ওখানে না, এইখানে পা রাখ।

'ক্ষুদে মানুষের গুহা-বাড়ি, যাকে ওরা "জাহাজ" বলত -- অন্য কোন বিদেশীর এজিনিস দেখবার সৌভাগ্য হয়নি।'

দৈত্যমানবদের মধ্যে তুমিই কেবল সব জানলে -- তুমি ছাড়া তোমার অন্য কোন জাতভাইকে আমরা বিশ্বাস করি না ... এই পাখিটি -- ফ্রাকা -- তোমায় উপহার দিলাম।'
অনেক ধন্যবাদ, রাজপুত্র ভ্রাদ।

ফ্রাকাকে তাহলে ওয়া-কাবাবা ক্ষুদে মানুষদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন!
অনেক বাজে গল্প হয়েছে ছেলেরা; এবার ঘুমতে যাও।
বাজে গল্প! ভাগো এখান থেকে

দেশী সংবাদ

১৮ **ফেব্রুয়ারি**—সংসদের তিনদিনব্যাপী বাজেট আজ শুরু হল। কিন্তু শুরুতেই অভূতপূর্ব কাণ্ড। ঘুষোঘুষি। ধস্তাধস্তি। সংসদের যুক্ত অধিবেশনে কংগ্রেস ও সি পি এম সদস্যদের মধ্যে আজ এই কাণ্ড ঘটতে থাকে। যখন রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

বাংলার প্রবীণ চারণ কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রবিবার মধ্যরাত্রে কল্যাণীর গান্ধী স্মৃতি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। বিজয়লালের ৯৪ বছর বয়সের বৃদ্ধামাতা, দুই ছেলে, দুই কন্যা বর্তমান। স্ত্রী কয়েক বছর আগেই গত হয়েছেন।

১৯ **ফেব্রুয়ারি**—ভারতের মাটিতে উৎপন্ন প্রচুর পরিমাণ চাল পূর্ব নেপালে বিভিন্ন গুদামে মজুত রাখা হয়েছে। এই খবর কবুল করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। শিলিগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন সীমান্ত বরাবর পূর্ব নেপালে মেচি নদীর অপর পারে প্রচুর চাল মজুতের কথা তিনি শুনেছেন।

কাম্বে উপসাগরে বোমবাই হাই স্ট্রাকচারে প্রথম কূপ থেকে তেল বের হচ্ছে। এখানে তেলের চাপ আছে যথেষ্ট—প্রতি বর্গ ইনচে ৫০০ পাউনড। একজন সরকারী মুখপাত্র এ কথা জানান। এই কূপ থেকে যে তেল পাওয়া যাচ্ছে সেটা খুবই উঁচু মানের বলে মনে করা হচ্ছে।

২০ **ফেব্রুয়ারি**—আজ বৃহস্পতিবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সরকারী ডাক্তার ও ইনজিনিয়াররা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছেন। বুধবার রাত্রে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওঁদের অতিরিক্ত দাবিগুলি নাকচ হয়ে যায়। এর পর সরকারী ডাক্তার ও ইনজিনিয়ারদের কনফেডারেশন ঘোষণা করেন—সকাল ৬টা থেকেই কর্মবিরতি আরম্ভ হয়।

ভূমি কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত অন্যতম আসামী শ্রীসোমেন্দ্রনাথ মিত্র এম এল এ আজ কলকাতার তৃতীয় অতিরিক্ত বিশেষ আদালতের জজ শ্রী এইচ করের এজলাসে হাজির হয়েছিলেন। আজ তাকে ৫০০০ টাকা ব্যক্তিগত মুচলেখায় মুক্তি দিয়েছেন।

২১ **ফেব্রুয়ারি**—কলকাতা-হাওড়ার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় ১ এপরিল থেকে নতুন করে এবং নতুন রঙের রেশন কারড চালু করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় বিধানসভা সদস্যদের বলেন যে, কেবলমাত্র কলকাতায় ৭ লক্ষ ভুয়া রেশন কারড আছে। কলকাতা বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার জনসংখ্যা ৪৮ লক্ষ। সেক্ষেত্রে রেশন কারডের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ। ১ এপরিল থেকে যে নতুন রেশন কারড চালু হবে তা সাদার বদলে রঙিন হবে।

আজ ভোরে মোরাদাবাদ থেকে দুই কিলোমিটার দূরবর্তী কাঠঘরে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় ৪১ জন মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন ৬০ জনের বেশী। ৬৬ ডাউন দেরাদুন-বারাণসী জনতা একসপ্রেস দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়িতে ধাক্কা লাগালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে ৮ জনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

২২ **ফেব্রুয়ারি**—শ্লোগান হইচই ও হট্টগোলের মধ্য দিয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। আর এস পি সদস্যগণ রাজ্যপালের ভাষণ বয়কট করেন এবং সি পি আই সদস্যগণ রাজ্যপালের ভাষণকালে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। রাজ্যপাল যখন সভাকক্ষে প্রবেশ করছিলেন তখন লবিতে দাঁড়িয়ে আর এস পি সদস্যরা ধ্বনি দিতে থাকেন : রাজ্যপাল ফিরে যাও, তোমার ভাষণ শুনছি না, শুনব না।

একটানা ৪ দিন ধরে হিংসাত্মক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আমেদাবাদ শহরের বেশির ভাগ বাজার ও ব্যাংক অনির্দিষ্টকাল তাদের কাজকর্ম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দাবিতে এখন বিক্ষোভ প্রদর্শনের দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই অগ্নিসংযোগ ও ইটপাটকেল ছোঁড়ার খবর আসছে।

২৩ **ফেব্রুয়ারি**—গুজরাট রাজ্য এবং বোমবাই শহর এখন অশান্ত। মারমুখী জনতাকে ঠেকাতে দু' জায়গাতেই পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে। গুজরাটে গুলি চালিয়েছে জনতাও। পুলিশের গুলিতে গুজরাটে মরেছেন দুজন, আহত হয়েছেন অন্তত দশজন। কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তির গুলিতে নয়জন পুলিশ আহত হয়েছেন। বোমবাইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন সাতজন। জখমের সংখ্যা ২৪।

২৪ **ফেব্রুয়ারি**—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার উপনির্বাচনে কিছু হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে গাইঘাটা কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে ভোট হতে পারেনি। এই কেন্দ্রের পাঁচটি বুথে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া এ দুটি কেন্দ্রে মোটামুটি নির্বিঘ্নেই ভোট হয়েছে। সরকারী হিসাবে বেলগাছিয়ায় শতকরা ৫০টি এবং চুঁচুড়ায় শতকরা ৩৫টি ভোট পড়েছে।

বিদেশী সংবাদ

১৮ **ফেব্রুয়ারি**—আসন্ন ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান মৌলানা ভাসানিকে অনুরোধ করেছেন। অবশ্য যদি তার আগে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। শেখ মুজিবের বক্তব্য, স্বীকৃতি না দিলে সম্মেলনে যোগদান কিছুতেই নয়।

১৯ **ফেব্রুয়ারি**—লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের মধ্যে এক মিটমাটের জন্য নেপথ্যে যে কূটনৈতিক তৎপরতা চলছিল, তা এখন চরম পর্যায়ে পৌঁচেছে বলে মনে হয়। ইসলামী সম্মেলনের আলোচ্য সূচী তৈরি করার জন্য সম্মেলনে যোগদানকারী দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আজ লাহোরে আলোচনা শুরু করেছেন।

২০ **ফেব্রুয়ারি**—সোভিয়েট ইউনিয়ন পরীক্ষামূলকভাবে একটি বিরাট নতুন ক্ষেপণাস্ত্র গতকাল প্রশান্ত মহাসাগরে ছুঁড়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি বহুমুখী আক্রমণের ক্ষমতা রাখে। মাস ঘুরতে না ঘুরতে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতর থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয় দফা নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে ছোঁড়া হল।

২১ **ফেব্রুয়ারি**—ইসলামী সম্মেলনের পক্ষ থেকে সাতজন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিরাট দায়িত্ব নিয়ে আজ সন্ধ্যায় ঢাকায় পাড়ি দিয়েছেন। তাঁরা যাচ্ছেন বাংলাদেশকে শেষ মুহূর্তে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানে রাজি করতে। এই সম্মেলন শুরু হচ্ছে ২২ ফেব্রুয়ারি।

২২ **ফেব্রুয়ারি**—বিসমিল্লাহির রহমানের রহিম :—পরম করুণাময় আল্লাহর নাম করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলাম। পাক প্রধানমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টোর গুরুত্বপূর্ণ এই ঘোষণা। অনেক জল্পনা, অনেক অংক কষার অবসান হল শুক্রবারের অপরাহ্নে—ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে পবিত্র জুম্মাবারে।

২৩ **ফেব্রুয়ারি**—আজ লাহোর বিমানবন্দর কিছুক্ষণের জন্য রবীন্দ্রসংগীতের সুরে মুখর হয়। একদা যে পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত ছিল বে-আইনী, পাক বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ছিল নিষিদ্ধ, সেই পাকিস্তানে ইসলামী সম্মেলনের কেন্দ্রস্থলের কাছে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজানো হয় সামরিক বাহিনীর ব্যানডে।

২৪ **ফেব্রুয়ারি**—পাকিস্তানের বিরোধী দল তেহরিক ইসতাকলাল পারটির নেতা প্রাক্তন এয়ার মারশাল আসগার খান বলেছেন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর কোন অধিকার নেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার যাতে পাকিস্তানের জনগণ নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে স্বীকৃতির ব্যাপারে নিজেদের মতামত জানাতে পারে, তার জন্য শ্রীআসগর খান শ্রীভুট্টোকে পদত্যাগ করতে বলেন।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
শ্রীপবিত্রকুমার মুখার্জী
কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীঅধীপ সরকার কর্তৃক
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — ৩৫.৭০ টাকা
ষাণ্মাসিক — ১৮.২০ ,,
ত্রৈমাসিক — ৯.২০ ,,

বিমান ডাকে
বার্ষিক — ৮৬.৭০ টাকা
ষাণ্মাসিক 88.২০ ,,
ত্রৈমাসিক — ২২.১০ ,,

বিদেশে
জাহাজ ডাকে
বার্ষিক — ৫৮.৬৫ টাকা
ষাণ্মাসিক — ২১.৯০ ,,

আমাদের লনডন অফিস মারফৎ
বার্ষিক — ১৭৪.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক — ৮৭.০০ ,,
ত্রৈমাসিক — ৪৪.০০ ,,

REGD. NO.— WB|CC — 184

আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর—
বিনাকা কোল্ড ক্রীম তখন
সেই স্বপ্নকে সত্যি করে
তোলার জন্যে আপনার ত্বকের
গভীরে কাজে ব্যস্ত!
Cold Cream
CIBA
রোজকার মত সে রাতেও বিনাকা কোল্ড ক্রীম দিয়ে আমার মুখ পরিষ্কার করলাম, কারণ এ ত্বকের গভীরে পৌঁছে লুকোনো ময়লা বার করে আনে। ঘুমোনোর আগে আরেকটু মাখলাম।
মুখখানা এমন স্নিগ্ধ আর পরিষ্কার অনুভব করলাম যে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো— গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম।
স্বপ্ন দেখলাম এক অন্তহীন রুপোলী সাগরের ওপর দিয়ে চলেছি আমি··· তুষার শুভ্র চাঁদ আমার দিকে এগিয়ে এলো···কাছে থেকে আরো কাছে···
তারপর সে চাঁদ—হয়ে গেল এক মহাকাশযান! দরজা খুলে আমার দিকে এগিয়ে এলো এক দেবকান্তি পুরুষ···
আমাকে সে টেনে নিলো তার পাশে। আমার মুখখানা দু'হাতে ধরে বললে, "আজ পর্য্যন্ত যত সুন্দরী দেখেছি···তুমি তার মধ্যে সেরা সুন্দরী।"
ঘুম ভেঙে নিজেই দেখলাম—আমার ত্বক সত্যিই শিশির-কোমল মোলায়েম হয়ে উঠেছে। শুধু স্বপ্ন নয়·· আমি সত্যিই সুন্দরী।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদঃ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

এক মানুষী পরাজয় ও প্রার্থনার কাহিনী

দিন যায়

মূল্য ৮·০০

'দিন যায়' এক অতি সাধারণ মানুষের গল্প—তার দুঃখময় পরাজয়ের, পলায়নের; নাকি তার শুচিশুভ্র বাসনা-প্রার্থনার ? সেই মানুষটির সাধারণত্ব প্রকটিত ছিল প্রতি পদে পদে—আধুনিক যুগের দ্রুতগতির সঙ্গে পাল্লা দিতে সে পারত না, প্রতি মুহূর্তে পিছিয়ে পড়ত, দম হারিয়ে হাঁফাত; তার কামনার ধনকে কল্পনার স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে এনেও তাকে বুকের কাছে ধরে রাখতে পারত না, রুক্ষ বাস্তবের পরুষ বাহু তা অবলীলায় কেড়ে নিতে চাইত;

প্রকাশিত হল

পাপের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া বাঁচার আর কোনও উপায় নেই বুঝতে পেরেও সে শেষ পর্যন্ত তা কিছুতেই করে উঠতে পারত না, দ্বিধা আত্মসমর্পণের সেই চূড়ান্ত ক্ষণটিকে কেবলই বিলম্বিত করে দিত। তবু সেই অক্ষম মানুষ স্বপ্ন দেখত : এই অসুন্দর কুশ্রী বিবর্ণ জগৎ তার ক্ষতগুলি মুছে ফেলে সৌন্দর্যময়ী হয়ে উঠছে, তার যাবতীয় গ্লানি লুপ্ত হয়ে দিব্য বিভায় ভরে উঠছে দিঙ্‌মণ্ডল, মধু ক্ষরিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে নদীবারিতে।

দিন যায়; রুক্ষ বাস্তব তার কঠোরতা নিয়ে আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তার স্বপ্ন আর বাস্তবের ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে উঠতেই থাকে; আর সে আরও বেশী করে ডুবে যায় তার স্বপ্নে—যেন এক অসহায় ক্ষুদ্র মানুষ তার দুর্বল দুটি হাত জোড় করে তার অশ্রুসিক্ত পবিত্র প্রার্থনা নিবেদন করে পরমকারুণিক দেবতার পায়ে। 'দিন যায়' অক্ষম মানুষের সেই পরাজয় আর প্রার্থনার গল্প।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি

শরদিন্দু অম্‌নিবাস

১ম খ [illegible]·০০ ॥ ২য় খণ্ড ২০·০০ ॥ ৩য় খণ্ড ২৫·০০

সুকুমার রায়ের রচনাবলি

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র

১ম খণ্ড ॥ দাম ২০·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

নুনের পুতুল সাগরে

উপন্যাস ॥ দাম ১০·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

অবনী বাড়ি আছো

উপন্যাস ॥ দাম ৪·০০

শান্তিদেব ঘোষের

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা ॥ দাম ১২·০০

ঊর্মিলা হাকসারের

নিজেকে নিয়ে

আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথা ॥ ১০·০০

মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়ের

শঙ্খমালা

উপন্যাস ॥ দাম ৫·০০

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দেখা হয় নাই

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিচিত্র ॥ দাম ২০·০০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

দিনরাতের খেলা

উপন্যাস ॥ দাম ১০·০০

শংকরলাল ভট্টাচার্যের

এই আমি একা অন্য

উপন্যাস ॥ দাম ৯·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

প্রেমের চেয়ে বড়

উপন্যাস ॥ দাম ১২·০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

পিতৃপুরুষ

উপন্যাস ॥ দাম ৫·০০

বিমল মিত্রের

পতি পরম গুরু

উপন্যাস ॥ দাম ৩০·০০

মনোজ বসুর

সেতুবন্ধ

উপন্যাস ॥ দাম ১২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কার্যালয় : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলি: ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২ ॥ বিক্রয় কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলি: ৯

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২১

শনিবার ৯ চৈত্র ১৩৮০

সাহিত্য আন্দোলনের রূপান্তর

কোনো সাহিত্য আন্দোলন, যথার্থই যা সাহিত্যের তত্ত্বগত ও শিল্পগত মতপার্থক্য নিয়ে গড়ে ওঠে, সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রাজনীতি-ঘেঁষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারে কিনা বা হলে তার ফলাফল কি হতে পারে—সে-বিষয়ে নিশ্চয় মতভেদ থাকবে। তবে, সাধারণত দেখা যায়, কোনো আন্দোলনই অঙ্কের নিয়মে বাঁধা পথে গড়িয়ে যায় না, অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটে যায়। সম্প্রতি 'দলিত প্যান্থার' নামে যে সংগঠনটির কথা শোনা যাচ্ছে, এর ইতিহাসও অনেকটা এই রকম। একদা যা ছিল সাহিত্য আন্দোলন—এখন তা রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে একেবারে হালে মধ্য বোম্বাইয়ের লোকসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ের পর রাতারাতি যেভাবে এই প্যান্থারদের নাম কাগজে কাগজে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে অনুমান করা অসংগত হবে না—প্যান্থারদের রাজনৈতিক প্রভাব মহারাষ্ট্রে কিছুমাত্র কম নয়।

আজ যা 'দলিত প্যান্থার', আগে তাই ছিল 'দলিত সাহিত্য'। ষাট দশকে দলিত সাহিত্যের সৃষ্টি। দলিত সাহিত্য কি তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা সম্ভবত কিছু নেই, তবে ওই সময় যে সাহিত্য আন্দোলন বোম্বাইয়ের একাংশে গড়ে ওঠে তার হোতারা ছিলেন সকলেই তফশিলী সম্প্রদায়ের—বা হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত, নব-বৌদ্ধ। শ্রীরাজা ধালে, বাবুরাও বাগুল, নামদেও ধাশেল—এবং আরও অনেক তরুণ লেখক এই সাহিত্য আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। তাঁদের পত্রপত্রিকাও প্রকাশিত হত নিয়মিত, এখনও হয়। এই সব পত্রিকার একটি চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ছিল, সে-চরিত্র বিদ্রোহের। কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? সাহিত্যের নীতিগত কাঠামোর বিরুদ্ধে? বোধ হয় এমন কোনো উচ্চাশা এঁদের ছিল না, সাহিত্যের কারুকর্ম কিংবা প্রচলিত আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও দলিত সাহিত্যের অভিপ্রেত ছিল কি না তাও বলা মুশকিল। এঁরা প্রধানত তাঁদের লেখায় বর্ণ হিন্দুদের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বর্ণ হিন্দুদের বেদ, পুরাণ, আচার-আচরণ সর্ববিষয়েই এঁদের সমালোচনা তীব্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এমন কি 'গীতা'ও পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি বর্ণ হিন্দুরা যে নির্যাতন, অত্যাচার ও নিপীড়ন যুগের পর যুগ চালিয়ে গিয়েছে তার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদই ছিল দলিত লেখকদের উদ্দেশ্য। কোনো সন্দেহ নেই, এই প্রতিবাদ ছিল আন্তরিক, আবেগময়। এঁদের সততা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই তোলা যেতে পারে না। দলিত সাহিত্য বলতে চাইত —মানবিক নির্যাতনের এমন ঘৃণ্য চক্রান্ত যতদিন না বন্ধ করা যাচ্ছে ততদিন তাঁদের সম্প্রদায়ের মুক্তি নেই, স্বাধীনতাও নেই।

দলিত সাহিত্য নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, অনেক শিক্ষিত তরুণ এই আন্দোলনের শরিক হয়ে ওঠেন। নিজেদের সম্প্রদায়ের সমর্থনপুষ্ট দলিত সাহিত্য যে প্রভাব ক্রমশই বিস্তার করে ফেলেছিল তাকে ঘিরেই দলিত প্যান্থারের উদ্ভব। গত পাঁচ সাত বছর দলিত সাহিত্য যে হারে নিয়মিত প্রতিবাদ, অভিযোগ ও আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছে তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, দলিত সাহিত্য ক্রমেই সংগঠিত একটি রাজনৈতিক দলবিশেষ হয়ে উঠছে। এই আন্দোলন গত দু বছরে পরিবর্তিত হয়েছে আশ্চর্যভাবে, রাজনীতি ক্রমশই তার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রমাণ সাম্প্রতিক বোম্বাই উপনির্বাচন। এই উপনির্বাচনে দলিত প্যান্থার নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের ভোট বর্জন করতে বলেছিল, ফলে হরিজন সম্প্রদায় ভোট দেয় নি। যে কংগ্রেস হরিজন ভোটের ওপর নির্ভরশীল, সেই কংগ্রেস হরিজনদের ভোট না পেয়ে পরাজিত হয়েছে।

দলিত প্যান্থার দলের এখনকার চেহারা, অনেকে অনুমান করেন, শিবসেনার অনুরূপ। একই ছাঁচে নাকি দলটি গড়ে তোলা হয়েছে; সেই উগ্রতা, সেই অসহিষ্ণুতা। শ্রীধাসালের অনুরাগী দলিত প্যান্থাররা এখন মার্কসবাদী এবং বামপন্থী রাজনীতির অনুরক্ত। এঁরা মনে করেন, আমাদের বর্তমান সরকার তাঁদের শত্রু, কেননা যাদের বিরুদ্ধে প্যান্থারদের বিদ্রোহ—জমিদার শ্রেণী, পুঁজিপতি, উচ্চ বর্ণের হিন্দু, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন রাজনীতি—সরকার এসবের সমর্থক। কাজেই প্যান্থাররা চান ব্যাপক বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহ যতদিন না সফল হচ্ছে ততদিন সীমায়িত পরিবর্তনের দ্বারা কিছু হবে না। প্যান্থাররা তাঁদের ইস্তাহারে বলেছেন, তাঁরা দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক জগতের ওপরতলা দখল করেই শুধু ক্ষান্ত হবেন না, সমস্ত দেশ তাঁরা শাসন করতে চান।

বলা বাহুল্য, প্যান্থারদের উচ্চাশা অনেক। আবেগও অপরিমিত। প্রসঙ্গত, আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায়ের একাংশের কথা মনে পড়ে যাঁরা আমেরিকার মধ্যে নিগ্রো সম্প্রদায়ের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি রাজনীতি—এমন কি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অস্তিত্বও দাবি করেন। দলিত প্যান্থারদের দাবি অনেকটাই সেই রকম। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আমেরিকার ব্ল্যাক প্যান্থারদের অনুসরণেই তো দলিত প্যান্থার।

দলিত প্যান্থারদের উচ্চাশা সম্পর্কে কিছু বলার নেই। তাঁদের চিন্তা যে একেবারে পরিচ্ছন্ন এবং দেশের পক্ষে কল্যাণকর তাও হয়তো বলা যাবে না। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার ও অমানবিক আচরণের ফলেই এই ক্ষোভ ও ঘৃণা হরিজন সম্প্রদায়ের মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। আজও এঁরা সরকারী বিভেদ নীতির শিকার। কেন কোনো হরিজন সম্প্রদায়ের লোক পুলিসে চাকরি পাবে না, কেন অন্যান্য সরকারী কাজে তাদের যোগ্যতা উপেক্ষা করা হবে—এ-প্রশ্নের জবাব কে দেবে? কোন অপরাধে তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধে উপেক্ষা করা হবে, আর কেনই বা অকারণে সরকার এবং পুলিস তাদের সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখবে? দলিত প্যান্থারদের সাম্প্রতিক বিদ্রোহ তাই মূলত সামাজিক ও অর্থনৈতিক। সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে এর সম্পর্ক আপাতত খুঁজে পাওয়া ভার। যদিও গোড়ায় সাহিত্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

বাঃ! বাঃ!
কে বলেছে আমি শুধু বেড়াল! কী কাণ্ড! আমি তো
বাঘ!
উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা রাজনীতি
সি পি আই

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে বিরোধ

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে যে বিরোধটা এতদিন আমরা নীচের তলায় দেখতে পেয়েছি এবার সেটা দেখতে পাচ্ছি ওপরে—অর্থাৎ যেখান থেকে শুরু, সেইখানে। নীচের তলার ঝগড়াঝাটি-মারামারির খবর এখন কম শোনা যায়। এখন প্রায় প্রতিদিনই কাগজে দেখতে পাওয়া যায় ওপরতলার ঝগড়াঝাটির খবর—সিদ্ধার্থবাবু অরুণবাবুকে কড়া কড়া কথা বলছেন, বিজয়বাবু বিধানসভাতেই মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিচ্ছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুরু থেকেই কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধটা ছিল ওপরতলায়। প্রথম প্রথম দাদারা সামনে আসতেন না। ভাইদের মাধ্যমে লড়াইটা চালাতেন। পশ্চিমবঙ্গে গত নির্বাচনের পরই যে তরুণ কংগ্রেসীদের মধ্যে ব্যাপক ঝগড়াঝাটি মারামারি শুরু হয়ে যায় সেটা প্রধানত দাদাদের উসকানিতেই। এই যে দুই পালটা ছাত্র ও যুব সংগঠন, তাও দাদাদের পরিকল্পনা মতই। ভাইরা সোকার মত দাদাদের উসকানিতে নিজেরা ঝগড়াঝাটি করেছেন, দুর্নামের ভাগী হয়েছেন এবং নিজেদের দুর্বল করেছেন।

নিজেদের ঝগড়াঝাটির ফলে তরুণ কংগ্রেসী নেতাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি আজ প্রবীণদের তুলনায় অনেক অনেক কম। অথচ, নির্বাচনের আগে এবং ঠিক নির্বাচনের সময় প্রদেশ কংগ্রেসের উপর এই তরুণদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল প্রচণ্ড। উভয় গোষ্ঠীর তরুণ নেতারাই (অবশ্য সে সময় তাঁরা ঠিক এইভাবে আলাদা আলাদা গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত ছিলেন না) তখন ক্ষমতাবান। প্রবীণদের মধ্যে সিদ্ধার্থবাবু এবং কিছুটা দেবীবাবু ছাড়া আর সবাই তখন তরুণ নেতাদের তুলনায় পিছিয়ে।

কিন্তু অতি চালাক প্রবীণেরা, এতদিন যাঁরা শুধু উসকে দিয়ে পেছন থেকে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করেছেন, এবার ঘটনাপ্রবাহ আস্তে আস্তে তাঁদেরও প্রকাশ্যে আসতে বাধ্য করছে। এখনও যে নাটের গুরুরা সবাই পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন তা অবশ্য নয়। এখনও ভালমানুষটি বলে নিজেকে দেখাবার জন্য (এবং এখানের হাওয়াটা ভাল করে বোঝার জন্য অর্থাৎ দেখার জন্য যে কে কোন্ পক্ষে দাঁড়ায়) অনেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করছেন আড়ালে থাকার।

ঘটনাপ্রবাহ অবশ্য এ অবস্থায় তাঁদের বেশি দিন থাকতে দেবে না—ঠেলে প্রকাশ্যে নিয়ে আসবেই, কোনও না কোনও পক্ষ নিতে বাধ্য করবেই।

*
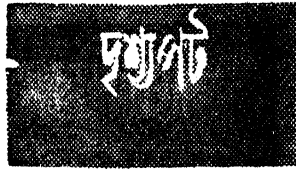
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে এই যে ঝগড়াঝাটি বা ভাগাভাগি এর সঙ্গে অবশ্য কোনও আদর্শগত বিরোধ বা কর্মসূচীগত মতপার্থক্য মোটেই জড়িত নয়। ১৯৬৯ সালে যখন কংগ্রেস পার্টি ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল তখনও যে কোনও কর্মসূচীগত বা আদর্শগত সংঘাত তার জন্য দায়ী ছিল তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসে তখন নেতা হয়েছিলেন শ্রীবিজয়সিংহ নাহার, আর আদি কংগ্রেসের প্রধান ছিলেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। আদর্শগতভাবে যদি পার্টি ভাগাভাগি হত তাহলে হওয়া উচিত ছিল উল্টোটা।

এখনও তাই হচ্ছে। ঝগড়াগুলি মূলত ব্যক্তিগত। এবং কিছু নেতার ক্ষমতালোভ এবং চতুর হস্তবাজদের কাল সেটা আস্তে আস্তে গোষ্ঠীগত আকার নিয়েছে। আর এখন তাকেই একটা রাজনৈতিক রঙ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। একটা গোষ্ঠী বলতে চাইছেন, আমরা প্রগতিশীল, আর ওরা প্রতিক্রিয়াশীল। যারা প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত হচ্ছেন তাঁরা বলছেন, ভাগাভাগিটা মোটেই তা নয়, আসলে একটা গোষ্ঠী সি পি আই-পন্থী, আর একটা দল সি পি আই-বিরোধী।

একদল দাদাও এই প্রচারে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। কারণ, তাঁদের হিসেবটা এই রকম : যেহেতু কংগ্রেস প্রধানত কমিউনিস্ট বিরোধী দল, সুতরাং যাদের সি পি আই-পন্থী বলে চিহ্নিত করা যাবে দলের ভেতর তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য।

এই প্রচারে আবার সি পি আইও কিছুটা সাহায্য করছে। কারণ, সি পি আইকে দলের জাতীয় পরিষদের মূল বিশ্লেষণ অনুসারে দেখাতে হবে যে, কংগ্রেসের মধ্যে দুটো গোষ্ঠী আছে—একটা প্রগতিশীল, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল এবং যে অংশটা প্রগতিশীল সেটা সি পি আইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে।

ক্রমে ক্রমে এই দুই পক্ষের খেলার ফলে এবং বিভিন্ন নেতার ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে আস্তে আস্তে বাইরে মনে হচ্ছে, সত্যিই কংগ্রেসের ভেতরে একটা রাজনৈতিক লড়াই চলছে—সেই রাজনৈতিক লড়াইয়ের একদিকে সি পি আই-পন্থী কংগ্রেসীরা, আর একদিকে সি পি আই বিরোধীরা।

মূলত ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। মূলে বিরোধটা ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থে উদ্ভূত। যেমন ধরুন, সন্তোষ রায়। শ্রমমন্ত্রী। কংগ্রেসের জেলার রাজনীতিতে তিনি ছাত্র পরিষদ-যুব কংগ্রেস গোষ্ঠীর অর্থাৎ সি পি আই-পন্থী বলে চিহ্নিতদের খুব কাছাকাছির লোক। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তিনি কি সত্যিই কমিউনিস্টদের খুব কাছাকাছি? অথবা ধরুন, জ্ঞানসিং সোহনপালের কথা। মেদিনীপুরের রাজনীতিতে তিনি ঘোরতর সি পি আই-বিরোধী। কিন্তু কলকাতার স্টেটসম্যান ইউনিয়নে তিনি লক্ষ্মীকান্ত বসুদের বিরুদ্ধে এবং সৌগত রায়দের সমর্থক।

বা ধরুন, স্বয়ং সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কথা। এই সেদিন পর্যন্তও ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁকে বিধানসভায় ঠিক সি পি আইয়ের ভাষায় বলতে শুনেছি : রাশিয়ার সমালোচনা করা মানেই মার্কিনী দালালি করা। গোষ্ঠী রাজনীতি ঠেলতে ঠেলতে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে এইখানে নিয়ে এসেছে। তিনি বোধ হয় এখন চীনকেও মার্কিন দালাল বলতে কুণ্ঠিত হবেন না। কারণ, পাল্টা গোষ্ঠীর দাদাদের যখন প্রধান লক্ষ সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে খতম করা তখন বাঁচতে গিয়ে সুব্রতবাবুকে একটা আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

ওই দিনই আবার দেখলাম, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে খুব জোরে জোরে বারিদবরণ দাস বলছেন : পি ডি এ ঐক্য বজায় রাখতেই হবে। পি ডি এ ভাঙে এমন সাধ্য কারো নেই। বারিদবাবু এটা কেন করলেন? তিনি তো এখন ঘোরতর সি পি আই-বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে? এর প্রধান কারণ, তাঁর ভয় আছে, সি পি আই এবং অন্য আরও অনেকে তো হলে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রচার করবে। ঠিক এই কারণেই, তরুণকান্তি ঘোষের মত ব্যক্তিও প্রাণপণে চেষ্টা করছেন সি পি আইয়ের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রেখে চলতে।

*

একটা জিনিস অবশ্য এখানে বলে রাখা ভাল। রাজ্য কংগ্রেসের এই ঝগড়ার সঙ্গে বিভিন্ন দাদার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত বলেই নানা শান্তি বৈঠক সত্ত্বেও ঝগড়া মিটছে না। সেই জন্যই বার বার দফায় দফায় আচরণবিধি তৈরি হচ্ছে এবং বার বারই তা ভাঙছে।

দাদাদের ঝগড়াটা এখন যখন প্রকাশ্যে এসেছে তখন আর আচরণবিধি তৈরির সম্ভাবনা কম। এবং, দাদাদের এই ঝগড়া ক্রমেই বাড়বে।

একমাত্র সিদ্ধার্থবাবু যদি শক্ত হাতে হাল ধরেন, যদি দৃঢ় হন তা হলে এই সব ঝগড়ার বহিঃপ্রকাশ কমাতে পারেন।

কিন্তু তা কি তিনি করবেন?

১০-৩-৭৪ নবারুণ গুপ্ত

"বাপের ব্যাটা" কংগ্রেসী

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলীয় সমালোচকদের জন্য একটা ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে দেওয়ায় আশা করা যাচ্ছে এর পর থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে আর নিম্নমানের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে না।

কংগ্রেস দলের কোনও সদস্য বিধানসভার মেঝেয় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে যদি সমালোচনা করতে চান, এমন কি 'চোরের রাজা'ও বলতে চান তবে তাঁর মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন বা ন্যূনতম যোগ্যতা কি থাকা উচিত, মুখ্যমন্ত্রী উক্ত পরিষদীয় দলের বৈঠকে তা স্পষ্ট ভাষায় সদস্যদের বুঝিয়ে দেন। তিনি জোরালো কণ্ঠে বলেন, 'যাঁরা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমার সমালোচনা করবেন তাঁরা বাপের ব্যাটা হলে আমি যা করেছিলাম তাই করবেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভার ঘণ্টা বেজে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে চলে যেতে হয় এবং কংগ্রেস দলের অন্য সদস্যদেরও কেউ কেউ তাঁদের নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, অনেকে ন্যাড়া-পোড়া উৎসবে যোগ দিতে চলে যান। তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য সম্পর্কে কংগ্রেসী মহলে যে প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঁকিঝুঁকি মারছিল তার কোনও উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়নি।

আমরা সেইসকল প্রশ্নের কয়েকটি মাত্র সংগ্রহ করে এখানে প্রকাশ করলাম। তৎসহ সেই প্রশ্নমালার সম্ভাব্য উত্তরও দেওয়া হল।

প্রশ্ন ১ : মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'যাঁরা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমার সমালোচনা করবেন তাঁরা বাপের ব্যাটা হলে আমি যা করেছিলাম তাই করবেন।' মুখ্যমন্ত্রী এখানে 'বাপের ব্যাটা' কথাটি কি কটূক্তি হিসাবে প্রয়োগ করেছেন?

উত্তর : কটূক্তি! না। আমাদের তো তা মনে হয়নি। আমাদের বরং মনে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী 'বাপের ব্যাটা' কথাটি বৈজ্ঞানিক অর্থেই প্রয়োগ করেছেন। 'বাপের ব্যাটা' এই বাক্যাংশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসী সদস্যদের সংজ্ঞা নির্দেশ করতেই চেয়েছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসীদের স্পষ্টতই দুই দলে ভাগ করে দিয়েছেন। এক দল 'বাপের ব্যাটা' কংগ্রেসী এবং অপর দল 'টেস্ট টিউবের ব্যাটা' কংগ্রেসী। আপনারা সকলেই জানেন প্রজনন-বিশারদগণের অত্যাশ্চর্য দক্ষতায় আজকাল বহু ক্ষেত্রে 'টেস্ট টিউব'-ই পিতার অভাব পূরণ করছে। কাজেই বাপের ব্যাটাগণের মত টেস্ট টিউবের ব্যাটারাও ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে, হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করছে, ইশকুল কলেজে পড়ছে, ক্রিকেট-ফুটবলও খেলছে, বিলাত আমেরিকা যাচ্ছে, প্রেম করছে, সংসার-ধর্মও করছে। এ সবই বৈজ্ঞানিক সত্য। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, 'টেস্ট টিউবের ব্যাটারা' যখন 'বাপের ব্যাটাদের' মতই এত সব করছে, তখন তারা রাজনীতিও করছে। আর রাজনীতিই যখন করছে, তখন ধরে নেওয়া যেতেই পারে তারা কমিউনিস্ট পার্টিও করছে, কংগ্রেস পার্টিও করছে।
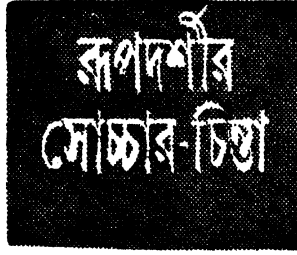
প্রশ্ন ২ : মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'যাঁরা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমার সমালোচনা করবেন তাঁরা বাপের ব্যাটা হলে আমি যা করেছিলাম তাই করবেন।' (ক) এই কথার দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে কোন দলে ফেলেছেন? (খ) মুখ্যমন্ত্রী কি কি করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর : (ক) মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে 'বাপের ব্যাটা' কংগ্রেসীদের দলেই ফেলেছেন। ঐ বাক্যটির ভিতর 'আমি (বাপের ব্যাটা হয়ে) যা করেছিলাম......' বন্ধনীভুক্ত বাক্যাংশটি উহ্য আছে।

(খ) মুখ্যমন্ত্রীও বাপের ব্যাটা রূপেই ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর বাল্য এবং কৈশোর মাতামহ, পিতা এবং মাতার রাজনীতি, আইন এবং সঙ্গীতচর্চার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হলেও যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রীড়ার প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হন। এবং ছাত্রজীবনে ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তারপর ব্যারিস্টারি বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত তিনি যৌবনে বিলাত গমন করেন। তাঁর জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে সেখানেই প্রথম সাক্ষাৎ, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, তারপর অনেকানেক সাক্ষাৎ এবং পরিশেষে পরিণয় হয়। কর্মজীবনে তিনি মাতামহ এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। অতঃপর স্বর্গত ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সুপারিশক্রমে কংগ্রেসী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং কাঁচা বয়সেই বিধান রায়ের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। তদানীন্তন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি বাগ্মী সদস্যের ভূমিকা গ্রহণ করে কমরেড জ্যোতি বসু প্রমুখ বামাচারী নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ঘোর রবে কিছু দিন কংগ্রেস বিরোধিতা এবং চুটিয়ে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। এই সময় বিধানসভায় এবং বামপন্থী সভাসমিতিতে বিধান রায়ের বিরুদ্ধে মিঠে-কড়া, প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে কড়া এবং অতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে অতি-কড়া সমালোচনার দ্বারা সর্বহারা জনগণের স্বার্থরক্ষা এবং হাইকোর্টে পুঁজিপতি মক্কেলদিগের স্বার্থরক্ষা করে তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় উভয় মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য এক ভাবমূর্তি নির্মাণ করতে সক্ষম হন। প্রফুল্ল সেনের শাসনকালে তাঁর সমালোচনার নীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে মোলায়েম সমালোচনা, কমরেড জ্যোতি বসু প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা এবং অতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে অতি কড়া সমালোচনার নীতি প্রবর্তন করে স্বীয় ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করে তোলেন।

এই ভাবমূর্তি তাঁকে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এবং পশ্চিমবঙ্গের লড়াকু তরুণ কংগ্রেসী মহলের নেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। যুক্তফ্রণ্ট আমলে প্রফুল্ল সেনের সহায়তায় তিনি বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তার পর নির্বাচনে পাশার দান উল্টে পড়ায় তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের পথ প্রশস্ত হয়। দিল্লীতে তাঁর ঠিকানা যাতে পরিবর্তিত না হয় সে কারণ লোকসভায় তাঁর পরিত্যক্ত আসনে স্বীয় সহধর্মিণীকে নির্বাচনে জিতিয়ে তিনি আপন ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখেন।

প্রশ্ন ৩ : বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে কোনও 'বাপের ব্যাটা' কংগ্রেসী যদি সমালোচনা করতে চায় তবে তাঁর ন্যূনতম যোগ্যতা কি হওয়া উচিত, এটা জানার পর, আর কেনও বাপের ব্যাটা যোগ্যতা অর্জনের আগে নিশ্চয়ই তাঁর সমালোচনা করবে না। (ক) কিন্তু এই কঠিন শর্ত আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী কি কংগ্রেসী সদস্যদের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করলেন না? (খ) এটা কি গণতন্ত্রবিরোধী কাজ হল না?

উত্তর : (ক) বাক্‌স্বাধীনতা হরণের প্রশ্ন উঠছে কেন? প্রশংসা করতে তো বাধা নেই। 'বাপের ব্যাটা' কংগ্রেসীদের মুখ্যমন্ত্রীকে যেমন খুশি প্রশংসা করার অধিকার তো তিনি খর্ব করেন নি। (খ) এটাকে গণতন্ত্রবিরোধী কাজ বলে আমরা আদৌ মনে করিনে। তা ছাড়া কংগ্রেসী সদস্যরা যদি এতদ্‌সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীকে সমালোচনা করে তো করুক। তবে মুখ্যমন্ত্রীর চোখে তাঁরা আর 'বাপের ব্যাটা' কংগ্রেসী থাকবে না তাদের তিনি 'টেস্ট-টিউবের ব্যাটা' হিসাবেই গণ্য করবেন।

সাপ

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থপতি যে গ্রাম গড়ে, সাপ ছেড়ে দেয় আনাচেকানাচে—
সেই সাপ যারে দেখি একদল পুলিশ
একদল ঠ্যাঙাড়ে—
স্থপতি হাসছে দেখে টেবিলের আড়ে;

মস্তিষ্কপ্রসূত কিছু সাপ এরকম ঘোরে
আনাচেকানাচে, আমাদের বেঁচে থাকা ভূতভবিষ্যতে,
থানা রাখে নোট, ঠ্যাঙাড়ের দল তাড়া করে,
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত—প্রতি ঘরে ঘরে সাপ আছে জেনে
কড়া নাড়ে—ঘুম থেকে তুলে দেয় গৃহবাসী আমাদের
এদিক ওদিক দেখে, ফেরে রাতভোরে—
মনে বাসা বাঁধে সাপ, কড়া নাড়ে নিজেদের ঘরে
ঠিক জানে কোনোখানে কোনো সাপ নেই,
তকতকে ফিটফাট চারপাশ—তবু ফেলে টর্চ,
মন দিয়ে দেখে......
অকপট শান্তি চায় ওরা, পায় বিছানায়
মাঝরাতে দেখে নিজের মিথুনমূর্তি সাপ—
এক জোড়া সাপ খেলা করে বিছানায় চটচটে গরমে কাদায়!

এই সূর্যহীন সময়

ফিরোজ চৌধুরী

ক্রমিক দুঃখবোধ থেকে একদিন আমি গ্রানাইট হয়ে যাবো
ছুঁড়ে ফেলে দেবো সমস্ত মূল্যোবোধ
আমার আটত্রিশ বছরের শুদ্ধতা

ততদিন—ঠিক ততদিন
অপরূপা তুমি ফুলে ফুলে কুঞ্জে কুঞ্জে
টুপটাপ বৃষ্টির মতন শব্দময় খেলে বেড়াও—এ কথা জেনেও
নির্দ্বিধায় মেনে নেবো সম্রাজ্ঞীর অভিপ্রায়—এই সূর্যহীন সময়

চোখ মেলো
দেখ কেমন ম্রিয়মাণ হেমন্তের বিকেল
এমন স্বপ্নময় কেন দাঁড়িয়ে থাকো তবু
কেন কেঁপে ওঠো স্বপ্নালু যুবকের হাতছানিতে

আয়নায় ঋতু বদলে যাবে
সময় হবে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর
অথচ আমার দিক্‌প্রদক্ষিণ একই বৃত্তে বারবার
পুনর্বার লজ্জাহীন ফিরে আসবো তোমার গভীরে

একটা লাল শাড়ির ইচ্ছেতে

সাধনা মুখোপাধ্যায়

একটা লাল শাড়ির ইচ্ছেতে
একবার পাগল হয়েছিলাম
সদ্য সদ্য ভাঁজ-ভাঙা বৃন্তফুটে আকাঁড়া যৌবনে
চামেলির থোপা থোপা কুঁড়ি ধরা
বাতুল মৌমাছিদের অস্থির গুঞ্জরন
শরীর বাগানময় সপ্তদশ বয়সের
এক যৌবনে

একটা লাল শাড়ির ইচ্ছেতে
একবার পাগল হয়েছিলাম
তরতাজা আঙুলগুলো
ঘিরে যবে স্ফুটপূর্ণিমা
চোখের গোলাপী রঙে
দিনে রাতে ভিড় করে আছে
অভিব্যক্তিময় বরকনে
কখনও স্থপতিবধূ
কখনও বা নাগরী গ্রামিণী
স্বপ্নেরও ছিল না যেন কোন সীমা
আর পরিসীমা
যখন মানস শিল্পী
নিঃশ্বাস নিয়ে ভরবুকে
ছেনি দিয়ে কেটে কেটে
তৈরি করে বারবার
এ-মুখ ও-মুখ
ভেঙে দিত অপছন্দে
প্রাণবন্ত বড় খুঁতখুঁতে

অদম্য সৃষ্টির এক ত্রুটিবিচ্যুতিহীন
পুরুষ প্রতিজ্ঞা ছিল
ক্লান্তিহীন তাদের বাজুতে

একটা লাল শাড়ির ইচ্ছেতে
একবার পাগল হয়েছিলাম
যখন দেহের ননী
সবে দুধ তোলা তার রঙ
আহা কি ললিত হতো
লোহিতবরণ সুষমায়
সদা বিকচ এক ফুলের বাগান অভ্রময়
ঘিরে যেন রেখেছিল
শরীরের মোহন বেড়ায়
আহা সেই শাড়ি ছিল
দিবসের ইচ্ছে আর রাত্রির সমস্তলে
শিশিরের নিশ্চুপ পতন
আহা একবার মাত্র একটি অপ্রাপণীয়
ইচ্ছে ছিল
দু এক বছর যাকে নাড়াচাড়া
করেছিল মন
তারপর কত শাড়ি এল গেল
বিচিত্র বরন রং ঢঙ
সবই লাগে অর্থহীন
তার চেয়ে ভাল ছিল এখন কিছু না পেয়ে
তখন সে শাড়িটাই
সপ্তদশী তনুদেহে জড়ানো বরং

১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য যোজনা বরাদ্দ

১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেটে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার প্রথম বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২৬২৯ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ রেখেছেন। এই টাকার মধ্যে ২০৫৫ কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; অবশিষ্ট ৫৭৪ কোটি টাকা বাজেটের বাইরে রাখা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৪-৭৫ সালে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র-শাসিত এলাকার যোজনার সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ৯১১ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১৯৭৩-৭৪ সালে বিভিন্ন খাতে যোজনার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ ছিল ১৯২৪ কোটি টাকা এবং বাজেটের বাইরে যোজনার ব্যয় বাবদ ৩১৮ কোটি টাকা রাখা হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৭৩-৭৪ সালে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র-শাসিত এলাকার যোজনায় সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ৯২০ কোটি টাকা রাখা হয়েছিল। ১৯৭৩-৭৪ সালের সংশোধিত বাজেটে দেখা যাচ্ছে যে যোজনাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১৯২৪ কোটি টাকার পরিবর্তে হয়েছে ১৬৫৬ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সাল হচ্ছে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার প্রথম বছর। পঞ্চম যোজনার প্রথম বছরের বাজেটে যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায় কৃষিখাতে ব্যয়-বরাদ্দ হয়েছে ২১৬ কোটি টাকা; তাছাড়া কৃষি সমবায়গুলির জন্য আলাদা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। শিল্প ও খনি খাতে এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে যথাক্রমে ৭৩১ কোটি টাকা ও ৬৯৫ কোটি টাকা। জল ও বিদ্যুৎশক্তি উন্নয়নে সামগ্রিক ব্যয়-বরাদ্দ হচ্ছে ১২৭ কোটি টাকা। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় কৃষিক্ষেত্রকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। পরিকল্পনা কমিশন থেকে ডক্টর মিনহাসের পদত্যাগের অন্যতম কারণ হল পঞ্চম যোজনায় যে উন্নয়ন-হার ধরা হয়েছে তা অর্জন করতে হলে ব্যয়-বরাদ্দের সংশোধন করতে হবে; কারণ ৫৩,৪১১ কোটি টাকা ব্যয়ে, যার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হল ৩৭২৫০ কোটি টাকা, বার্ষিক ৫·৬ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বাড়ানো সম্ভব নয়। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩১,৩৯০ কোটি টাকা এবং ১৬১৯৪ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় যোজনামন্ত্রী

শ্রী ডি পি ধর লোকসভায় বলেছেন যে কৃষিখাতে বিনিয়োগের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এ ধরনের অভিযোগ ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে পঞ্চম যোজনার লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হতে হলে বিনিয়োগের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই; তবে দেশের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থায় প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করাও খুব কঠিন। গত দু বছরে মূল্যস্তরের অসম্ভব বৃদ্ধি হেতু যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে; বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বেড়ে যাওয়ায় উন্নয়নের জন্য সংরক্ষিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। তা সত্ত্বেও ১৯৭৪-৭৫ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে যোজনা খাতে যে ২৯৬৬ কোটি টাকা (২০৫৫ কোটি টাকা + ৯১১ কোটি টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে, তার জন্য সরকারকে দুটি বিপরীতমুখী বিবেচনার মধ্যে আপস করতে হয়েছে—একটি হল ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ যতটা সম্ভব কম রাখার তাগিদ এবং অপরটি হল উৎপাদনের চাকা সচল রাখার তাগিদ। আগামী আর্থিক বছরের যোজনাখাতে ব্যয়-বরাদ্দের ক্ষেত্রে এমন শিল্প-প্রকল্প ও কৃষি-প্রকল্প বেছে নেওয়া হয়েছে যেগুলি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ জরুরী এবং যেগুলি দুবছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই উক্তির আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ না করেও একথা বলতেই হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সীমিত ব্যয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান; দেশের উন্নতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। সরকারের উচিত কৃষিক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় প্রকল্পগুলিকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যাতে দ্রুত উৎপাদনও বাড়ে, আবার কিছু শ্রমিকের কর্মসংস্থানও হয়।

আজকের দিনে ভারতের পরিকল্পনা

সম্প্রতি Gandhi Peace Foundation এবং Radical Humanist Association-এর উদ্যোগে আজকের দিনে ভারতের পরিকল্পনা নিয়ে কলকাতায় যে আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে তারও মূল সুর ছিল পঞ্চম পাঁচসালা যোজনা

যে খসড়া তৈরি হয়েছে তা কতটা সার্থক হতে পারে সে সম্পর্কে নানাদিক বিচার-বিবেচনা করে দেখা। এই আলোচনা-চক্রের দুটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক অম্লান দত্ত। আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ। অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য তাঁর সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভাষণে আমাদের অর্থনৈতিক যোজনার ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ করে যোজনার সংগঠনের যে পরিবর্তন হওয়া দরকার সেদিকে যে যোজনা কর্তৃপক্ষ ততটা দৃষ্টি দেননি তা তুলে ধরেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে সামাজিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও সুদৃঢ় গ্রামীণ সংস্থা গড়ে তুলে তাদের হাতে জমি পুনর্বণ্টন, শস্য পরিকল্পনা, জল-ব্যবস্থা এবং গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি-ভিত্তিক বিনিয়োগের ভার তুলে না দিলে গ্রামাঞ্চল থেকে শক্ত-সমর্থ শ্রমিকদের জনাকীর্ণ শহরগুলিতে চলে আসা অব্যাহত থাকবে। সরকারী সংস্থাগুলিতেও শুধু আমলাদের হাতে উদ্যোগের ভার ছেড়ে না দিয়ে যাঁরা জাতীয় যোজনা তৈরি করেন এবং যাঁরা আলাদা আলাদা শিল্প পরিকল্পনা তৈরি করেন তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বজায় রাখা দরকার। পরিকল্পনা কিভাবে রূপায়িত হবে সে বিষয়ে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করে তাঁদের সহযোগিতা আদায় করা দরকার। আমাদের দেশে যোজনা তৈরি করা শুরু থেকে তার লক্ষ্যের রূপায়ণ পর্যন্ত জনসাধারণের দায়িত্ব যে আরও বেশি হওয়া উচিত তার উপর অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অধ্যাপক রাখাল দত্ত তাঁর সুলিখিত ভাষণে অভিযোগ করেন যে খসড়া পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় অত্যন্ত গুরুভার শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন, গুরুভার শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে কি উন্নয়ন-হার এখনই দ্রুত বাড়ানো, কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করা ও তার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? তাঁর মতে এ-জাতীয় বিনিয়োগ দেশের উন্নয়নের গতিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে ও দারিদ্র্যের মূলে আঘাত করতে সক্ষম নয়। কারণ এক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে যা উৎপাদন হবে তা আবার নতুন বিনিয়োগের কাজে লাগবে। সিমেন্ট ও ইস্পাত যদি বেশি তৈরি হয় তা বাইরে রপ্তানি করা হবে নতুন মূলধন-সামগ্রী আমদানি করার জন্য। পঞ্চম যোজনায় কৃষির উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত বলে অধ্যাপক দত্ত মনে করেন। তাঁর মতে সমষ্টিগত পরিকল্পনার (Macro Planing) উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ব্যষ্টিগত পরিকল্পনার (Micro Planing) উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তাছাড়া গুরুভার শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর এখন বেশি গুরুত্ব আরোপ করলে যে পরিমাণ আর্থিক সম্পদ এখনই সংগ্রহ করা দরকার তা এখন সংগৃহীত হবে না বলে অধ্যাপক দত্ত অভিমত প্রকাশ করেন। এখন যে দেশে চড়া হারে মুদ্রাস্ফীতি চলছে তা ভুললে চলবে না। শ্রী ভি এম তারকুণ্ডে আমাদের পরিকল্পনার বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে আমাদের পঞ্চম যোজনার লক্ষ্য হওয়া উচিত ৩·৫ শতাংশ হারে উন্নয়ন, ৫·৫ শতাংশ হারে নয়। অধ্যাপক সিনয়ের (Prof Shenoy) অভিমত উল্লেখ করে শ্রীতারকুণ্ডে বলেন, পঞ্চম যোজনায় আমাদের বাজেট-ঘাটতি শূন্য হওয়া উচিত এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের হাতে বিনিয়োগের দায়িত্ব আরও বেশি দেওয়া উচিত। আলোচনা চক্রে প্রশ্ন ওঠে, বাস্তব[illegible] পরিকল্পনার কী লক্ষণ হওয়া উচিত। অধ্যাপক অম্লান দত্ত কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কখন বাস্তববাদী বলা যায় সে সম্পর্কে প্রচলিত যুক্তিগুলির উল্লেখ করেন। অধ্যাপক অমিতকুমার ভট্টাচার্য ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংকট নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে গান্ধীবাদী অর্থনীতি কতটা কার্যকর হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এই আলোচনা-চক্রে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তবে খসড়া পঞ্চম পাঁচসালা যোজনা যে বক্তাদের মনে আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সুব্রত গুপ্ত

॥ ছত্রিশ ॥

সুইচ অফ করার শব্দের সঙ্গে আলো নিবে যায়, জ্যোৎস্না ত্রিদিবেশের গায়ের ওপর পড়ে। উঠোনটা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যায় এবং ত্রিদিবেশ রাস্তার দিকে লোহার গেট দেখে অবাক হয়। ঢোকবার সময় লোহার গেটটা ওর চোখে পড়েনি। ওপর থেকে সবই যেন অন্য রকম দেখায়। একটা বড় বাড়ির ছায়ায় ঢাকা রাস্তা, ছায়া ছায়া মূর্তির মতো অল্প পথচারি, লোহার গেট, তার পাশে একটা পাতা-ঝরা ন্যাড়া গাছ, এবং জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দুটো কাকের বাসা। লোহার গেট থেকে এ বাড়ির পাঁচিল পর্যন্ত খোলা জায়গাটা যেন বেওয়ারিশ, কারোর দখলে নেই। অনেকটা পোড়ো জমির মতো। তার পরে মধুদির বাড়ির পাঁচিলের দরজা, যা এখনো খোলা। লোকজনের কথাবার্তা শোনা যায় অস্পষ্ট। রাস্তার বা কোনো বাড়ির লোকের কথাবার্তা বলে কিছু বোঝা যায় না। বড় রাস্তা থেকে ট্রামের নিয়মিত শব্দ ভেসে আসে, সঙ্গে অন্যান্য যানবাহনেরও। পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দের সঙ্গে, মধুদির নিচু গম্ভীর, কিন্তু সেই ঝংকৃত স্বরে নির্দেশ শোনা যায়, 'চলো।'

মধুদি ত্রিদিবেশের পাশ কাটিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যান, আবছা হয়ে যান অন্ধকারে। আলো জ্বালাবার শব্দ হয়। ত্রিদিবেশ বাঁ দিকে দরজা খোলা পর্দার আড়ালে আলো দেখতে পায়। মধুদির ডাক শোনা যায়, 'এসো।'

ত্রিদিবেশ এগিয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরের দিকে তাকায়। ঘরের সাজসজ্জা চারদিকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, একটু যেন অস্বস্তি বোধ করে। ওর মনের মধ্যে একটা হীনমন্যতার প্রতিক্রিয়া ঘটে, নিজের ময়লা পোশাক বা ছেঁড়া স্যান্ডেলের জন্য না, মধুদির গম্ভীর এবং নির্বিকার আচরণের জন্যও। ইতিপূর্বে মধুদি কয়েকবার বলা সত্ত্বেও ও'র বাড়িতে আসা হয়নি, ত্রিদিবেশের এই প্রথম আগমন। মধুদির সম্পর্কে বরাবরই মনে নানান কৌতূহল ছিল, এখনো তা বর্তমান, কিন্তু এ মধুদি যেন সে মধুদি নন।

ত্রিদিবেশ আড়ষ্টতা কাটিয়ে ঢোকবার আগে দরজার বাইরে স্যান্ডেল খোলবার উদ্যোগ করে। মধুদি বলে ওঠেন, 'স্যান্ডেল খুলতে হবে না, পায়ে দিয়েই এসো।'

মধুদির স্বর নীরস। ত্রিদিবেশ ঘরের মেঝেয় পাতা কার্পেটের দিকে তাকায়, এবং নিজের ময়লা পা ও স্যান্ডেলের দিকে, কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢোকে। মধুদি ঘরের কোণের দিকে রাখা চামড়া-মোড়া একটা টেবিলের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'দরজাটা চেপে ভেজিয়ে দাও।'

ত্রিদিবেশ দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। মধুদি কোণের টেবিলের কাছে দাঁড়ান, দৃষ্টি ত্রিদিবেশের দিকে। ত্রিদিবেশ ঘরের দেয়ালের দিকে তাকায়। ঠিক বিপরীত দিকে একটি বন্ধ দরজার মাথার ওপরে প্রকাণ্ড শিংওয়ালা বাইসনের মুণ্ড। দেখা মাত্র ত্রিদিবেশ ঘাড় ফিরিয়ে নিজের মাথার ওপরে তাকায়, বড় শিংওয়ালা হরিণের মাথা দেওয়ালে গাঁথা। প্রকাণ্ড ঘর, মাঝখানে কার্পেট পাতা এবং তার ঠিক মাঝখানে ডিমের আকৃতির নিচু টেবল, দূরে দূরে প্রায় দেওয়াল ঘেঁষে গদী-মোড়া বড় বড় চেয়ার। তিন দিকে তিনটি বড় আলমারি, কাচের পাল্লার আড়ালে অনেক বই। মধুদি যে-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, সেই টেবিলের এক পাশে কয়েকটি বই, অন্য পাশে খাতা কলম এবং পেন্সিল। টেবিলটির প্রায় কাছ ঘেঁষেই একটি অর্গান, ঢাকনা নেই, আলোয় পালিশের ঝলক। সামনে একটি হাতির পায়ের আসন, মাথাটা হলুদ রঙের কাপড় দিয়ে ঢাকা, বসে অর্গান বাজাবার জন্য। অর্গানের ওপর দিকে, দেওয়ালে কোনো মহিলার একটি বড় ছবি, ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে, ফটোর ওপর রোমাইডের কাজ করা। মাথায় অল্প ঘোমটা, আঁচলের ওপর কাঁধে ব্রোচ আটকানো, জামার গলায় ফ্রিল, চওড়া হার, কানে সোনামোড়া পাথরের মাকড়ি। হঠাৎ মনে হয়, মধুদির সঙ্গে যেন ফটোর মুখের কোথায় মিল রয়েছে, কিন্তু ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে, কিছুই বোঝা যায় না। সব-কিছুই ঝকঝকে, চকচকে, এবং একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ-ছড়ানো বাতাসহীন ঘরে।

'বসো।'

মধুদির স্বর শুনে ত্রিদিবেশ ফটো থেকে চোখ সরিয়ে মধুদির দিকে তাকায়। মধুদির নিষ্পলক দৃষ্টি ওর দিকে, প্রতি মুহূর্তেই ত্রিদিবেশ যা অনুভব করছিল, ওর দিকে না তাকিয়েও এবং ওর মনের মধ্যে কেমন একটা সংশয়, মধুদি অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন কী না। মধুদির শাড়ি পরার ধরন বাড়িতেও সেই রকম, ইস্কুলে যে রকম যান, কিন্তু এখন শাড়ি জামা সবই সাধারণ। জামাটা নীল, শাড়ি সাদা, গোলাপী পাড়, মধুদির শরীরকে যেন একটু স্ফীত দেখায়। কেন, ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে না। মধুদির সারা মুখ তেলতেলে, আলোয় চিকচিক করে প্রায় আয়নার মতো, তেলহীন অথচ উজ্জ্বল কালো চুল আঁচড়ানো, টেনে পিছন দিকে এলো খোঁপায় জড়ানো। এখন হাতে ঘড়ি নেই, কয়েক গাছি সোনার চুড়ি। পায়ে সাদা রবারের স্লিপার। মধুদিকে এখন কি আরও সুন্দর দেখায়। ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে না। মধুদির মুখ গম্ভীর, কিন্তু দৃষ্টিতে যেন তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা।

মধুদি আঙুল দিয়ে দরজার কাছেই

দেওয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলেন, 'বসো ওখানে।'

ত্রিদিবেশ বসে, অস্বস্তি বোধ করে। আসনের বিশালত্বে ও কোমলতায় এবং মধুদির থেকে দূরত্বে। ও সোজা শক্ত হয়ে বসে। মধুদি জিজ্ঞেস করেন, 'কোথা থেকে এলে এখন?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'পার্ক সার্কাস।'

'পার্ক সার্কাসে কে আছে?' মধুদি জিজ্ঞেস করেন, ও'র স্বরে কৌতূহল।

ত্রিদিবেশ বলে, 'রশীদ ওখানে আছে, কাড়েয়া রোডে।'

মধুদি ভ্রূকুটি করেন, জিজ্ঞেস করেন, 'কে রশীদ। তোমাদের ওখানকার মাহমুদ সাহেবের ছেলে?'

ত্রিদিবেশ ঘাড় ঝাঁকায়, 'হ্যাঁ।'

মধুদি কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করেন না, ত্রিদিবেশের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকেন এবং মনে হয় ও'র নাসারন্ধ্র একটু কেঁপে যায়, ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বক্রতা। জিজ্ঞেস করেন, 'তারপরে হঠাৎ এখানে কী মনে করে?'

প্রশ্নটা যেন একটা আক্রমণের সংকেতে ত্রিদিবেশকে সাবধান করে দেয়, ও সচেতন হয়ে ওঠে। ওর শরীরের ভর প্রায় দুই পায়ের ওপর। বলে, 'পণ্ডিতদা বলছিলেন আপনার এখানে একদিন আসার জন্য।'

'সে তো আমিও তোমাকে আগে অনেকবার আসতে বলেছি।' ত্রিদিবেশের কথা শেষ হবার আগেই প্রায় মধুদি বলে ওঠেন, 'কখনো আসোনি। পণ্ডিত বলতেই চলে এলে?'

ত্রিদিবেশ যেন লজ্জা পায়, শুকনো ঠোঁটে একটু হাসি দেখা দেয়, কোনো জবাব দেয় না।

মধুদি আবার জিজ্ঞেস করেন, 'পণ্ডিত তোমাকে কী বলেছে?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'পণ্ডিতদা বলছিলেন, অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, একদিন যেন দেখা করি।'

'কেন পণ্ডিত একথা বলেছে, জানি না।' মধুদি বলেন, এবং এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি দরজার পর্দার ওপরে পড়ে। আবার বলেন, 'তাকে আমি একবারও তোমাকে আসতে বলার জন্য বলিনি।'

ত্রিদিবেশ একটু ব্যস্তভাবে বলে, পণ্ডিতদা আপনার কথা বলেননি, নিজেই বলেছিলেন। অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি তো, তাই।'

মধুদির ভুরু এবং ঘাড় যেন এক সঙ্গেই একটু বাঁক খায়, বলেন, 'তোমার নিজের যখন মনে হয়নি, তখন পণ্ডিতের কথা শুনে আসবার এমন কোনো দরকার ছিল না। আবশ্যি, এমনিতেই বা আসবার দরকার কী।'

ত্রিদিবেশের মনে হয়, পৌষের শীতেও ওর গরম লাগে, বুকে ধকধক করে, মধুদির দিকে তাকাতে পারে না, অর্গানের সামনে হাতীর-পা আসনটার দিকে তাকায়, মনে মনে উঠে দাঁড়াবার সংকল্প করে। মধুদি না থেমেই জিজ্ঞেস করেন, 'রশীদের ওখান থেকে ফেরার পথে হঠাৎ মনে পড়লো বুঝি?'

ত্রিদিবেশ অবাক চোখে মধুদির দিকে তাকিয়ে বলে, 'না তো। আপনার এখানেই আসবো বলে আজ কলকাতায় এসেছিলাম। রশীদের সঙ্গেও দরকার ছিল। ও যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, তাই আগে ওর ওখানে গেছলাম।'

বলতে বলতে ত্রিদিবেশ উঠে দাঁড়ায়। মধুদি যেন অপরিসীম বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হলো?, উঠলে কেন?'

'আমি এখন যাই।' ত্রিদিবেশ বলে।

মধুদির ভ্রূকুটি দৃষ্টি ও মুখ পলকের জন্য একবার শক্ত হয়ে ওঠে, জিজ্ঞেস করেন, 'এসেই চলে যেতে চাইছে, কী ব্যাপার? যাওয়া খুব দরকার নাকি?'

ত্রিদিবেশ মধুদির দিকে তাকায়। তাঁর জিজ্ঞাসা যেন বিশেষ ইঙ্গিতবহ। ও বলে, 'না, তা না—।'

'রাগ করছো নাকি?' মধুদি জিজ্ঞাসা করেন, এবং তাঁর মুখ সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে আসে, ঠোঁটে যেন একটু হাসির আভাস।

ত্রিদিবেশ তাড়াতাড়ি বলে, 'না না।' মুখ নামিয়ে বলে, 'আপনি বোধহয় আমার ওপর রাগ করেছেন।'

বলে মধুদির দিকে তাকায়।

মধুদি সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে দু হাত মাথার পিছনে দিয়ে এলো খোঁপাটা খুলে আবার শক্ত করতে করতে বলেন, 'বসো। রশীদ পার্কসার্কাসে গেছে কেন?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'ওখানে ওর একজন আত্মীয়ের কাছে থাকে।'

'থাকে মানে, রশীদ বাড়িতে থাকে না?' মধুদি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করেন।

ত্রিদিবেশ বলে, 'না। ও ওর বাবার কাছ থেকে চলে এসেছে, আর ফিরে যাবে না বলছে।'

'বাবার অপরাধ?' মধুদির জিজ্ঞাসায় বক্রতা।

ত্রিদিবেশের যেন বলতে আটকায়, এবং না বসেই, এক পায়ের গোড়ালি একবার তোলে, নামায়, বলে, 'ওর বাবা আবার বিয়ে করেছেন। তা ছাড়া বাবার সঙ্গে ওর মতের মিল হয় না।

মধুদি জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের মতামত? বাবার বিয়ে?'

'না।' ত্রিদিবেশ আবার একটু হেসে মাথা নাড়ে, 'মাহমুদ চাচা চান রশীদ ব্যবসাটাবসা দেখবে। ও তা চায় না। ওর ইচ্ছা, চাকরি করার। ও বোধ হয় রেলওয়েতে ঢুকবে, অফিসারস ট্রেনিং নেবে। ওর তো অনেক বড় বড় আত্মীয় আছে, তাদের ধরে ব্যবস্থা করেছে। আমি জানতে গেছলাম, ও ট্রেনিং-এ অ্যাডমিশন পেয়েছে কী না।

মধুদি ত্রিদিবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে, একাগ্রভাবে কথাগুলো শোনেন, এবং ত্রিদিবেশ থামতেই জিজ্ঞেস করেন, 'রশীদ যে বাড়ি ছেড়ে এসে এখানে আছে, এসব খবর তুমি পেলে কী করে?'

'রশীদ আমাকে বলেছিল।' ত্রিদিবেশ বলে, 'আশ্বিন মাস থেকে আমি ওর সঙ্গে ছিলাম।'

মধুদি আবার ভুরু কুঁচকে একটা চিন্তা করেন, এবং কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও, ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে থমকে যান। ত্রিদিবেশের চোখের সামনে শিউলীর মুখটা হঠাৎ ভেসে ওঠে, এবং শিউলীর মুখের ওপারে মধুদির মুখ এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি জেগে থাকে। ত্রিদিবেশ দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, বলে, 'রশীদ আমার জন্য একটা কাজেরও চেষ্টা করছে। আমি প্রায়ই ওর কাছে কাজের খোঁজ নিতে আসি।'

এই সময়ে ঘরের পর্দা সরিয়ে একটি বিধবা স্ত্রীলোক ঢোকে। বিধবা, বয়স পঞ্চাশ হবে। ত্রিদিবেশকে দেখে থমকে যায়, অবাক হয়, মধুদিকে বলে, 'একটা কথা ছিল।'

মধুদি বলেন, 'এখানেই বলো। কোনো অসুবিধে নেই।'

স্ত্রীলোকটি ত্রিদিবেশের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে, 'মাংস ভালো পাওয়া যায়নি বলে লালু মাছ-টাছ কিছু আনেনি।'

মধুদি এক মুহূর্ত ভেবে বলেন, 'লালুকে বলে দাও, বাজারে গিয়ে মাছ পেলে মাছ আনবে বড় কাটা মাছ, টাটকা হয় যেন। তা না হলে, ছোট একটা মুরগী আনতে বলে দাও। সাহেব কর্তা আর মণির জন্য মাছ বা মুরগী স্টু করবে। ডিম এনেছে?'

স্ত্রীলোকটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানায়, 'এনেছে।'

মধুদি বলেন, 'লালুকে বাজারে পাঠিয়ে তুমি ডিম ভেজে, পাঁউরুটি টোস্ট করে নিয়ে এসো। মিষ্টিও দিও, আর চা করো। মণির মিস্ দিদিকে চা দেওয়া হয়ে গেছে?'

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নেড়ে বলে, 'না, এবার দেব। আপনাকেও দেব তো?'

মধুদি ঘাড় কাত করে বলেন, 'দেবে।'

স্ত্রীলোকটি ঘরের বাইরে চলে যায়। ত্রিদিবেশ এখনো দাঁড়িয়ে। মধুদির কথাগুলো শুনতে শুনতে ওর মনে প্রশ্ন জাগে, এ বাড়িতে কে কে আছে। কাদের সঙ্গে মধুদি থাকেন? মধুদির সম্পর্কে নানাবিধ কথা শোনা যায়। যার সত্য মিথ্যা জানা যায় না। ভালো মন্দ নানা কথা, সন্দেহজনক মন্দ কথা বেশি, যা ধন্দ আর রহস্যকে বাড়িয়ে দেয়। সাহেব কর্তা কে, এবং মণি?

'কী হলো, তুমি যে আর বসতে পারছো না দেখছি।' মধুদিকে আগের থেকে একটু সহজ মনে হয়।

ত্রিদিবেশ যেন লজ্জা পেয়ে হাসে ও বসে। মধুদির সামনে টেবিলের পাশেও একটা চেয়ার ছিল। মধুদি দু পা এগিয়ে, সেই চেয়ারের গায়ে একটা হাত রেখে বলেন, 'পণ্ডিত না বললে বোধহয় তুমি আসতে না?'

ত্রিদিবেশ আবার একটু সংকোচ বোধ করে, হাসে, বলে 'আসবো ভাবতাম।'

'তবে আসোনি কেন?' মধুদি জিজ্ঞেস করেন।

ত্রিদিবেশ বলে, 'ভেবেছিলাম, আপনি হয় তো আমার ওপর রাগ করেছেন।'

ত্রিদিবেশ মধুদির দিকে তাকায়। মধুদি দরজার দিকে তাকান। ত্রিদিবেশের মনে একটা প্রত্যাশা প্রায় দৃঢ় হয়ে ওঠে, মধুদির একটা জিজ্ঞাসা। ওর চোখের সামনে শিউলীর মুখ ভেসে ওঠে।

মধুদি বলেন, 'তোমাকে সেই পুজোর আগে দেখেছিলাম। তার মধ্যে কি পণ্ডিতের

সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি।

ত্রিদিবেশ অবাক হয়। মধুদি রাগের কথা বলেন না, প্রত্যাশিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। ও বলে, 'হ্যাঁ, অনেকবার দেখা হয়েছে। আমি যেখানে থাকি, সেখানে গেছেন। পার্টির পোস্টার লেখা ছাড়াও আরো কিছু কিছু কাজ করতে দিয়েছেন আমাকে।'

'তুমি কি এখন পার্টির কাজ করো নাকি ?' মধুদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'পার্টির কাজ করেই তোমার চলে ?'

ত্রিদিবেশ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ে, বলে, 'না না, আমি এখন চটকলে কাজ করছি।'

মধুদির ঠোঁটের কোণ কুঁকড়ে যায়, আবার সহজ হয়, জিজ্ঞেস করেন, 'চটকলে কী কাজ করো ?'

'মার্কিং বয়—তবে, আমাকে অন্য কাজ করতে দেয়।' ত্রিদিবেশ বলে, 'মিলের সব ফার্নিচারে রঙ তুলি দিয়ে নাম্বার লিখি।'

মধুদি কয়েক মুহূর্ত ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেন, তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'কতো মাইনে পাও ?'

'ছ টাকা—মানে, সপ্তাহে।' ত্রিদিবেশ বলে।

মধুদি হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারেন না, ত্রিদিবেশের আপাদমস্তক দেখেন, তারপরে খানিকটা ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, 'কেন যে লেখাপড়া করলে না! তা, তোমার আঁকা-টাকার কী হলো? সব জলাঞ্জলি দিয়েছ?'

মধুদি যেন ঠাট্টা করে হাসেন।

ত্রিদিবেশ হাসে, বলে, 'আঁকি।'

'আঁকো?'

'আঁকি, যখনই সময় পাই।' ত্রিদিবেশ বলে, 'মিল থেকে রঙ কাগজ যোগাড় করে, ছবি আঁকি। এর মধ্যে অনেক এঁকেছি, আপনাকে দেখবো। সবই মিলের আর মিলে যারা কাজ করে, সেইসব মেয়ে পুরুষদের ছবি। পণ্ডিতদা দুটো ছবি নিয়ে গেছেন কলকাতায় তাঁর দাদা নিশিকান্ত বাবুকে দেখাবার জন্য। তা ছাড়া, আমি মাঝে মাঝে মিল কোয়ার্টারে গিয়ে সাহেব, মেমসাহেবদের ছবি আঁকি, তারা কিছু টাকা পয়সা দেয়।' ত্রিদিবেশকে উদ্দীপ্ত দেখায়।

মধুদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, সাহেব মেমসাহেবদের ছবি? মানে পোর্ট্রেট?'

'হ্যাঁ।' ত্রিদিবেশ বলে, মিলের জেনারেল অফিসের একজন বাবু আমার ছবি আঁকা দেখে এক সাহেবকে বলেছিল। সাহেবের একটা স্কেচ আমি করে দিয়েছিলাম। সাহেব খুশি হয়ে আমাকে দুটো টাকা দিয়েছিল, আর বলেছিল, কোয়ার্টারে গিয়ে তার মেমসাহেবেরও একটা স্কেচ এঁকে দেবার জন্য। দিয়েছি। তখন মেমসাহেব আমাকে বলেছিল, আমি যদি কোয়ার্টারে ঘুরে ঘুরে পোর্ট্রেট আঁকি তা হলে অনেকেই রাজী হবে। ছুটির দিনে, আমি প্রায়ই যাই।'

মধুদি অবাক চোখে ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ হেসে ওঠেন, যে-হাসিটা ঠিক যেন মধুদির না। ত্রিদিবেশের সেই রকমই মনে হয়। কেন যেন মনে হয়, এখন মধুদির শরীর একটু স্ফীত দেখায়, এবং হাসলে মধুদির শরীরকে এভাবে কখনো কাঁপতে দেখেনি। মধুদি কখনোই গম্ভীর ছিলেন না, তাঁর মুখে সব সময়েই হাসি লেগে থাকে, কিন্তু সেই হাসির মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা মধুদি ছাড়া আর কারোর পক্ষে সম্ভব না। সে হাসি দূরে সরিয়ে দেয় না, খুব কাছেও টেনে নেয় না, অথচ একটা গভীর আকর্ষণ অনুভূত হয়। এ হাসি যেন প্রগলভ, তার বৈশিষ্ট্যের কোনো প্রভাব নেই। একটু অদ্ভুত, কিন্তু অসাধারণত্ব নেই। বলেন, 'তোমার কথা শুনে আমি হেসে মরে যাচ্ছি। এমন অদ্ভুত জীবিকা আমি কারোর দেখি নি। তুমি চটকলের মার্কিং বয়, আবার কোয়ার্টারে গিয়ে সাহেবদের পোর্ট্রেট এঁকে বেড়াচ্ছো!'

ত্রিদিবেশ বলে, 'সাহেবরা বিশেষ পোর্ট্রেটের জন্য বসতে চায় না, মেমসাহেবরাই বসে।'

'তোমার কপালে অবিশ্যি মেমসাহেবই বেশি জুটবে।' কথাটা খুব দ্রুত বলেন, যেন ঠিক এ কথাটা বলতে চান নি, তারপরেই দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, 'সে যাই হোক, একদিক থেকে বেশ ভালোই বলতে হবে। নিশ্চয়ই তোমার বেশ ভালো রোজগার হচ্ছে?'

ত্রিদিবেশ ঘাড় নেড়ে হেসে বলে, 'না, মেমসাহেবরা বড্ড কিপ্টে।'

মধুদি খিলখিল করে হেসে ওঠেন, এবং তাঁর আঁচল বুকের কাছ থেকে খসে পড়ে, এবং এই প্রথম ত্রিদিবেশের মনে হয়, মধুদির বুকের জন্যই সমস্ত শরীর স্ফীত দেখায়। মধুদির জামায় বোতাম লাগানো নেই, শুধু একটা ফিতার ফাঁস দিয়ে বাঁধা, ত্রিদিবেশ আগে কারোর কখনো দেখেনি। ফিতার ফাঁস থেকে খানিকটা অংশ কাটা, ফাঁকে মধুদির বক্ষস্থলের মসৃণ চিকণ ত্বক দেখা যায়, যার দু পাশে তাঁর বক্ষের আকার যেন ছবিতে দেখা মন্দিরের পাথরের মূর্তির মতো মনে হয়। ত্রিদিবেশ লজ্জা পায়, দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। ওর মস্তিষ্কে একটি পাপবোধ বিদ্ধ হয়, কারণ ও মুগ্ধতা বোধ করে।

মধুদি আঁচল তোলেন না, হাসতে হাসতে বলেন, 'মেমসাহেবরাও কিপ্টে হয় নাকি?'

ত্রিদিবেশ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ। একজন আটআনা পর্যন্ত দিয়েছে। আর একজন কিছুই দেয়নি, বেয়ারাকে ডেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

মধুদির হাসি যেন আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে যায়, এবং তিনি ত্রিদিবেশের সামনে এগিয়ে আসেন, আঁচল হাতে পড়ে থাকে, আর অনুচিত মুগ্ধতায় ত্রিদিবেশের মস্তিষ্ক পাপে বিদ্ধ হয়। মধুদি ত্রিদিবেশের সামনে রুদ্ধ হাসির বেগ সামলাতে সামলাতে বলেন, 'বেয়ারা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে?'

ত্রিদিবেশ মাথা নিচু করে বলে, 'হ্যাঁ, আর বেয়ারাটা আমার চুল টেনে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে।' বলে ও মধুদির দিকে তাকায়।

মধুদির হাসির মুখে যেন ঝড়ের ঝাপটা লাগে, তিনি ঠোঁট বন্ধ করেন না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যেন আচমকা আঘাতে বেদনাহত। ত্রিদিবেশ হাসে, কিন্তু অপমানের করুণ হাসি না, পাপজনিত মুগ্ধতা বোধের ক্ষমা প্রার্থনায়। মধুদি ওর একটি হাত চেপে ধরেন।

(ক্রমশ)

চিত্র প্রদর্শনী

ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেংগল কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে তাঁদের বার্ষিক স্থির চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৫৮ জন শিল্পী মোট ৫৬৮টি একরঙা অর্থাৎ কালো-সাদা নিদর্শন পাঠান। তাঁদের মধ্যে ৫৭ জন শিল্পীর ৮৬টি নিদর্শন নির্বাচিত হয়। রঙীন নিদর্শন পাঠান ৭৩ জন, তাঁদের মধ্যে ২৬ জনের মোট ৩৬টি প্রদর্শনীভুক্ত করা হয়। গত কয়েক বছর যাবৎ নিয়মিত ভাবে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে স্থিরচিত্র শিল্পক্ষেত্রে এই সংস্থাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, নির্বাচন পদ্ধতি তথা প্রদর্শনীর একটি উন্নত মান নির্দিষ্ট করে এই সংস্থাটি স্থিরচিত্র শিল্পক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থানও অধিকার করেছেন। প্রতিবারের মত এবারও কালো-সাদা ও রঙীন, উভয় বিভাগেই কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শন চোখে পড়ে। তবে অন্যান্য বারের মত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক নিদর্শনের সংখ্যা এবছরে কম ছিল—অর্থাৎ বেশ কয়েকটি নিদর্শনে ডার্করূমের কলাকৌশলও ধরা পড়ে। তা সত্ত্বেও প্রদর্শনীর বিভিন্ন নিদর্শন দেখে অনেকেই খুশী হয়েছেন। তবে একটা কথা, মাত্র দু'একটি ছাড়া সমকালীন জীবনের স্মরণীয় কোনও নিদর্শন চোখে পড়েনি। অধিকাংশই নিসর্গ বা চলতি পথের দৃশ্য, তবে তার মধ্য থেকেই অনেকে বিশেষ ক্ষণমুহূর্তটুকু ক্যামেরায় ধরে ফেলে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, যেমন অমিয় চক্রবর্তীর ওপন এয়ার বাথ। কমপোজিশনের দিক থেকে এই সুপরিচিত দৃশ্যটি অনেকের ভাল লাগে। এই প্রসঙ্গে আরও দুটি নিদর্শনের নাম করা যায়—গোরাচাঁদ ব্যানারজির দি ব্রেক ও রমানিকলালাল শা-র স্ন্যাচিং গাল। প্রথমটি চিরাচরিত সমুদ্রতরঙ্গের ছবি—বিরাট তরঙ্গ দুর্বার বেগে ভেঙে পড়ছে, তারই বিপুল জলকণার নিক্ষ্যাতিতম ডিটেলের পরিচয় দিয়েছেন আলোকচিত্রশিল্পী। দ্বিতীয়টিতে আকাশে উড়ন্ত পাখির তাৎক্ষণিক রূপ দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে বসন্ত সাংভির ওয়াচফুল ফ্রাই-এরও নাম করা চলে। ছোঁ মেরে কোনও শিকার ধরার জন্য আকাশের বুক থেকে একটি পাখি নীচের দিকে তীব্রবেগে নেমে যাচ্ছে—এই গতিবেগটিই শিল্পী ক্যামেরায় ধরে ফেলেছেন। বিধ্যাধর মাহাত্রের লাকি থারটিন
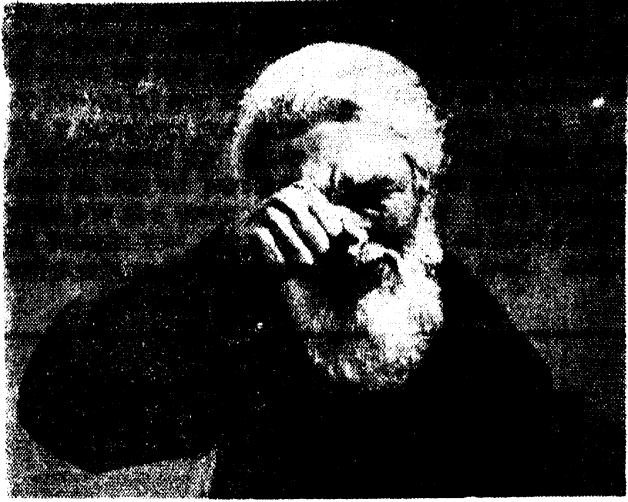
শিল্পী এম এফ হুসেন —চন্দ্রিমা সাহা

কমপোজিশন হিসাবে স্বাভাবিক ও এক দিক থেকে দুর্লভও বটে। কারণ, রাস্তার আধুনিকতম দুই-শাখ প্রধান লাইটপোস্টে একই সময়ে ১৩টি পাখিকে কাচিং পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা যায়। অথচ এই কচিৎঘটিত দৃশ্যই শিল্পীর অনুসন্ধানী চোখে ধরা পড়ে, সে জন্য তিনি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। তবে একান্ত স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও ছবিটি যেন কৃত্রিম মনে হয়, অবশ্য শিল্পী সেজন্য দায়ী নন। অতি সহজ

ও স্বাভাবিক দৃশ্যাই যে সুকৌশলে ক্যামেরা চালনাগুণে কত সুন্দর হতে পারে তার নিদর্শন টি কাশীনাথের হর্সম্যানশিপ—ধুলোয় আচ্ছন্ন আলোকিত পৃষ্ঠভূমির পরিপ্রেক্ষিতে সিলুয়েট ঘোড়া দ্রষ্টব্য। আর একটি স্থিরচিত্রের নাম করা যায়—উদয়চাঁদের নো স্কুল টুডে। প্রদর্শনীতে কয়েকটি প্রশংসনীয় প্রতিকৃতি চোখে পড়ে—ওয়ামান ঠাকুরে-র শিল্পী ডি জে যোশী ও চন্দ্রিমা সাহার, শিল্পী হুসেন। তাৎক্ষণিক রূপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হুসেনের প্রতিকৃতিতে, শিল্পী অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে প্রদীপ সেনের দি ব্লসম ইন ডার্কনেস মন্দ লাগেনি। রঙীন স্লাইডগুলির মধ্যে তড়িৎ বোসের অ্যামিউজিং দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। কাঠের বাড়ির ছোট জানালার মধ্য দিয়ে রাস্তায় কোনও দৃশ্য দেখে একটি ছোট্ট পাহাড়ী ছেলের মুখে কৌতূহল ও বিচিত্র হাসিরেখা ফুটে উঠেছে—স্বাভাবিকতা ও কম্পোজিশনের দিক থেকে এটি উল্লেখ্য। এর পরই মনে পড়ে ও পি শর্মার আইডল্ নূন। দুপুরের অসহ্য রৌদ্রতাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য গাছের সুশীতল ছায়ার আশ্রয়ে একজন বসে আছে—আলো-ছায়ার চমৎকার সমাবেশ। অন্যান্য স্লাইডের মধ্যে উৎপল গুহের দি মোমেণ্ট অব এক্সটেসি, কে পি গুপ্তের হোয়াটস এ ড্রিম ও প্রদীপ সেনের ব্লেসেড উইথ লাইট-এর নাম করা যায়।

*

শিল্পী স্বপনেন্দু ভৌমিক বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে শিল্পীর ২২টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পী আধুনিক রীতিতে কাজ করেন। বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত নিদর্শনের সঙ্গে এক্সপ্রেসানিস্টিব রীতিতে রচিত কয়েকটি কম্পোজিশনও অনেকের চোখে পড়ে। শিল্পীর অধিকাংশ রচনাই প্রতীকমূলক ও বহু স্থলেই তিনি নানা সোচ্চার ও উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করেছেন এবং রচনাপদ্ধতি, বিশেষ করে ব্রাশের ছোট ছোট আঁকাবাঁকা নানা আঁচড় দেখে, অনেকের শিল্পী স্বপনেশ চৌধুরীর শিল্পকর্মের কথা মনে পড়ে যায়। মোটা-মুটিভাবে রচনাগুলি আকারপ্রধান হলেও কয়েক ক্ষেত্রে অহেতুক রেখাজালে আড়ষ্ট হয়ে গেছে—যেমন ইডেন। ওপরের অংশটুকু বিষয়ে শিল্পী অধিকতর সচেতন হলে প্রতীকপ্রধান কম্পোজিশনটি রসোত্তীর্ণ হত। পরিকল্পনা ও রঙ ব্যবহাররীতির দিক থেকে একটি ছবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও সেটি ক্যাটালগভুক্ত ছিল না। একটি বৃহৎ চক্রাকারকে কেন্দ্র করে, চতুর্দিকে ছোট ছোট বৃত্তাকারে লালরঙ ও বাদিকে, বিশেষ করে হলুদ ও সাদা রঙের কারুকার্য সৃষ্টি করে শিল্পী সুন্দর রস-সৃষ্টি করেছেন। বিমূর্ত রচনা নিদর্শন হিসাবে টুওয়ার্ডস দি আননোন ও কম্পোজিশন ১-এর উল্লেখ করা যায়—বিশেষ করে রঙবৈচিত্র্য ও ব্যবহাররীতির জন্য এ দুটি চোখে পড়ে। প্রকাশভঙ্গিমার জন্য ইতস্তত ছড়ানো নীল ও হলুদ রঙ-প্রধান সমবিমূর্ত জাতীয় কম্পোজিশন সানার ড্রিমও অনেকের ভাল লাগে। অপরাপর ছবিতে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি, তবে দু'একটি ড্রয়িং নিদর্শন মন্দ লাগেনি।

*

গত সংখ্যায় শিল্পী বাণীপ্রসন্নর প্রদর্শনী আলোচনায় কাটা কাগজের নিদর্শনগুলিকে আবগামি পর্যায়ভুক্ত করে-ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কাটা কাগজ তৈরি, সংক্ষেপ কাগজ ভাস্কর্য বলা চলে। কয়েকটি জীবজন্তুর আকার রচনার মধ্য দিয়ে শিল্পী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চিত্রপ্রিয়

॥ ২১ ॥

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, ডাকের ফেরতা ডাক।

ডবল ডাকলেই হয় না, বোমেরাং হয়ে যখন সেই ডাক ফিরে এসে ডবল জোরে পৌঁছোয় তার ধাক্কা সামলানো দায়! মাশুলের চন্দনী দিতে প্রাণ যায়।

রাম শ্যাম যদু মধুকে ডাকাটা তেমন কিছু নয়, ততটা মারাত্মক হয় না কিন্তু! কেষ্ট বিষ্টু কাউকে ডেকে বসলেই অস্থির।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গোড়ায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে গিয়ে যে কুরুক্ষেত্র কাণ্ডটা বাধালো, কেষ্টঠাকুর বিশ্বরূপে সাড়া দিয়ে তার দফারফা করলেন, সাতগুষ্টী সমেত সবংশে মারা পড়লো। বেচারা—এমন কি ভূভারতে ছড়া হয়েও নিস্তার পেলো না।

তার, ধরলে পরে আমাদের রামঠাকুরও কিছু কম যান না, সীতা ছিলেন তাঁর কণ্ঠহার, আর সেই কণ্ঠহার তিনি সবাইকে দিয়ে কী কাণ্ডটাই না ঘটালেন রাবণের কপালে, একেবারে লঙ্কায় গিয়ে তাকে সবংশে ধ্বংস করার পর সীতাকে উদ্ধার করে এনে অযোধ্যায় তাঁর সমাধি দিলেন। সীতা ঠাকরুনের রামডাক বোমেরাং হয়ে না ফিরে ডেড লেটার আপিসে গিয়েই জমা হল শেষটায়।

কিন্তু এই ডাকাডাকি এড়ানোর কি জো আছে? ভগবান নিজে না ডাকলেও মানুষে তাঁকে বা তত্তুল্য কাউকে ডাকার দায় ঘাড়ে নেবেই। গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়ার মতই এই চাড় তার চিরকালের।

মানুষের চলার পথ হরদম নোংরা হচ্ছে। এই কর্ম করছে মানুষেই। কিন্তু এমনি মানা করলে কেউ শুনেছে কি? মানাতে হলে, চাপরাস চাই পরমহংস-কথিত, সেই চাপরাস। আর। সেই হেতুই এই চাপরাসীর অবতারণা!

অবতার পুরুষ না এলে এই রাশি রাশি আবর্জনার চাপ সাফ করবে কে? অবতার যেমন চাই তেমনি তাঁর বাহনদেরও দরকার বইকি!

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার...!' বলতে না বলতেই পরমহংসদেব তার ঘাড়ে এসে চেপে বসলেন।

আর যায় কোথায়! তার পর থেকে সে সবাইকে সাফ করতে লাগলো। আর সবার মুণ্ডপাতের সাধনায়।

নীতি কথার শেয়াল যেমন নিজের লাঙ্গুলকর্তনের পর আর সবার লেজ কাটতে উদ্গ্রীব হয় তেমনি ভগবানকে পাওয়ার পর সবাইকে তা না পাইয়ে দেওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। সেই পাওয়া যে পায় তার পাওয়ার সে খাটাবেই। পরের লেজ কাটার সেই প্রিভিলেজ।

অচিন্ত্যরও প্রায় সেই রকমটাই হলো। তার পরমপুরুষ প্রাপ্তির পর সবাইকেই সে রামকৃষ্ণ পাওয়াতে লাগল। আমার পক্ষে মুশকিল, আমি পরমহংসদেবের যেমন ভক্ত তেমনি আবার অচিন্ত্যরও—তাই, ঠাকুর কাঁধে সে যদি আমায় আক্রমণ করে—গুরুজনের কাছে কই আমি পাল্টা আক্রমণ করতে পারব না। তাই তার দর্শন পেলে তার তাড়না খাবার আগেই আমার কথাটা পাড়তে হয়—

'জানো, তোমার কথায় আমি কথামৃত পাঠ শুরু করেছি।'

শুনে অচিন্ত্য খুশি হয়ে ওঠে।

'সেই কবে মার কথায় ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, আবার নতুন করে পড়া গেল। পড়ে পড়ে অনেক কিছু জানলাম। নতুন করে জানা গেল আরো।'

'কি রকম?'

'জানলাম যে পঞ্চ ম-কার ভাই, কিছুতেই ছাড়া যায় না। ছাড়ান নেই তার থেকে। এমন কি, তোমার ওই পরমহংসদেবও তা পারেননি।'

'তার মানে?'

'পঞ্চ ম-কার ছাড়লে তখন ষষ্ঠ ম-কার এসে জোটে। তার মায়া কাটানো দায়। ম-কার এমন চমৎকার! শ্রীমাকে না ছাড়লে কি হবে, মারাত্মক একটা মকার তাঁকে ধরেই থাকলো। রয়েই গেল শেষ পর্যন্ত।'

'কি রকম?' কেবল কথায় নয়, ওর মুখভাবেও কি রকমটা যেন দেখা যায়।

'এই—এই তোমার শ্রীম।' একটু ইতস্তত করে আমি কই—'পঞ্চমের পরে ষষ্ঠম।'

'হুম।'

ওর এই হুঙ্কারের পর আর এগুনো উচিত হবে কিনা ভাবি। ভাবিত হয়ে আরো একটু এগুই—'আরো জানা গেল জীবের মুক্তি নেই। হবার নয়। কখনো হয় না। কোনো জন্মে না। জন্মের পর জন্ম—এই জীবদ্দশা চলবেই। চলতেই থাকবে।'

বলে আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। ফেলে তার পরে নিশ্বাসটাকে চওড়া করতে লাগি—'ভগবান বা তাঁর কোনো অবতার—কারো সাধ্য নেই যে বিশ্বময় বিস্ময়ের এই বিপুল অবতারণা মুছে ফেলতে পারেন। অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব। সার্বজনীন এই স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই কারো, কোনোদিন না। না তাঁর, না আমাদের। তা ছাড়া, মুক্তি চাইছেই বা কে?'

'কেন, তুমি নিজের মুক্তি চাও না?'

'কক্ষনো না। কোনো জন্মে নয়। কিসের দুঃখে? কী পাপ করেছি যে মুক্তি পেতে

মহাপুরুষদের আমি গণনাতীতই মনে করি

মহাপুরুষদের নগণ্য করতে হয়—'না ভাই মাপ করো। যথাযথ হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। অনেকদিন আগেকার ঘটনা—সব কথা আমার মনে নেই। সকলের নামের ফিরিস্তি আমি দিতে পারব না।'

মহাপুরুষদের আমি গণনাতীত বলেই গণ্য করি।

'তোমার কথাটা অকাট্য বলেই বোধ হচ্ছে।' অচিন্ত্যকে আমার আবিষ্কারে সায় দিতে হয়। আমার কথা কাটাতে পারে না।

আর, এর আগেও সেই কথা। যিশুখৃষ্টেরও ঠিক এই বারোজনই ছিল। যথা জুডাস—' বলেই আমার এক লম্ব ড্যাশ। বিস্মৃত বৈগুণ্য আর কাকে বলে! কিন্তু ওকে আমি হাঁ করতে দিইনে, তার ওপরেই হাঁকড়াই—'কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। বুদ্ধদেবেরা পুরো বারোজন ছিল। আমার ধারণা, এই বারোজনই। এঁরাই ঘুরে-ফিরে আসছেন। এই রকম আমার সন্দেহ। সেই এক পালেরই চেহারা পালটে পালটে আসা?' বলে আমি দম নিই। পরম-বিস্ময়-সামন্তর এই বাড়াবাড়ি অচিন্ত্য কী চক্ষে নেয় কে জানে।

'শুধু এই নয়। আরো আছে। এখনি বাক্তৃত হয়নি। আরো আমি আবিষ্কার করেছি। দাঁড়াও, বলি তোমায়—' বলে আমি রাস্তার পাশটায় ওকে টানি। হ্যাঁচকা টানের পর ওর কানের গোড়ায় আমার ফিসফিসানি—এমনকি, তোমার পৌরাণিক যুগেও এই ব্যাপার। কেউ এর মুক্ত পায়নি, পাচ্ছে না, একদম নয়—ঘুরে ঘোর করে মরছে এখানে—কেন যে—যুগ যুগে—কিসের লোভে কে জানে! এমনকি লংকাকাণ্ড গিয়েও দেখবে এই কাণ্ডই। শ্রীরামচন্দ্রেরো ফের এই বারো-য়ারি। বারোটাই সাঙ্গোপাঙ্গ। তাঁরা নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, বিভীষণ, হনুমান...এই হনুমান কে ছিল তুমি ঠাওরাতে পারো?'......এদিক ওদিক তাকিয়ে গলার সুর নামিয়ে আমি বলি—'বিবেকানন্দ। মহাবীর্যের প্রকাশ এই বিবেকানন্দই হনুমান ছিল। কিংবা ঐ মহাবীর হনুমানই ওরফে বিবেকানন্দ হয়েছেন।'

বিবেকানন্দ হনুমান? কথাটা অচিন্ত্যর কাছেও অচিন্তনীয় বোধ হয়।

'সঠিক বলতে পারব না, তবে এই আমার অনুমান। হনুমান সমুদ্র লংঘন করেছিল, আর বিবেকানন্দও। এদের মধ্যে উনিই তো প্রথম সমুদ্দুর ডিঙিয়ে এ যুগের স্বর্ণলঙ্ক আমেরিকায় গেছলেন? তাই না?'

অচিন্ত্য আর দাঁড়ায় না, হনহন করে এগিয়ে যায়। আমার কথার কোনো জবাব না দিয়েই। হয়তো আমাকে জবাব দিয়েই—চিরদিনের মতই...

মনে হচ্ছে এই আমাদের শেষ আলাপ।

অবশ্যি যদি হয়ে... থাকে। মানে, এই আলাপটাই।

আলাপ কথা না হয়ে এটা আলাপ-কাহিনীও হতে পারে।

প্রেমেনের সঙ্গে প্রথম আলাপের কথা বলেছি, অচিন্ত্যর সঙ্গেও এই আলাপচারির কাহিনী গাইলাম।

আলাপ জিনিসটা একান্ত নয়; চুমুর মতই নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী—পরের কপোলের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু কাহিনী নিছক কল্পনা হতে পারে। সুর, মুগুর কিংবা কাগজের মতই তা আপন মনে ভাঁজা যায়। অনুস্মৃতির সাহায্য না নিয়েও জিনিসটা মগজে গজায়। কাগজে অনুসৃত হতে পারে। সুতরাং আপনারা কেউই, এমনকি অচিন্ত্যও যেন এটাকে সত্য বলে ভাববেন না।

সত্যি বলতে, আমার পক্ষে কল্পনাতীত কিছু নেই।

ক্রমশ

আজকের প্রাণবন্ত প্রেমে ডগমগ,
হাসিতে উচ্ছল রঙ।
জুয়েল রেড
ওয়াইল্ড অরেঞ্জ
ভিয়েনা কফি
পপী বেরী
ন্যাচেরাল
ব্রঞ্জো বেরী
ল্যাকমে
আল্ট্রা-গ্লো আর
আল্ট্রা-ম্যাট

পাহাড়ী সান্যাল : ব্যক্তিগত মূল্যায়ন

সমীর দাশগুপ্ত

পাহাড়ী সান্যালের মৃত্যুতে অশ্রু সংবরণ করতে, এমনকি হাসতে পারলেই বোধ হয় তাঁর আত্মার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা অর্পণ করা যেত। তাঁর সমান দুঃখ-বেদনার অধিকারী আমরা অনেকেই নই, তাই হাসতে পারার ক্ষমতাও আমাদের সীমিত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে আমার মতো অশক্ত মানুষের তফাৎটা তাই আরও যেন প্রকট হয়ে উঠল।

পাহাড়ী সান্যালকেও চোখের জল ফেলতে দেখেছি। কিন্তু তা প্রিয় বন্ধু বলরাজ সাহানির মৃত্যু-সংবাদে নয়—যে বলরাজ বছর দুয়েক আগে কর্মব্যস্ত এক-দিনের জন্যে কলকাতায় এসেও একবার তাঁর দোস্ত-কে না-দেখে যেতে পারেননি। স্নেহের পাত্রী অনুভা ঘোষের মৃত্যুর পর অসতর্ক মুহূর্তে দু-চার কথা বলে ফেলে-ছেন, কিন্তু মৃত্যুতে তাঁর সেই কুছ্ পরোয়া নেই ভাব অটল। কিংবা একাধিক দীর্ঘ সন্ধ্যায় দক্ষিণ অঞ্চলের প্রায়-নিভৃত কোনো ঘরে দু-এক কলি গানের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ী সান্যাল যখন তন্ময় হয়ে বলেছেন তাঁর প্রাণের দোসর অতুলদার কথা, তখন সবচেয়ে বিধুর মুহূর্তেও চোখে জল দেখিনি। দেখেছি মাত্র একদিনই, ও-রকমই এক নিভৃত সন্ধ্যায়, ওই ঘরেই, আফ্রিকার যাদুকরী গায়িকা মিরিয়ম্ ম্যাকেবা-র রেকর্ডে এক-সে আঁতলি কিংবা জুলু ভাষায় গাওয়া গান শুনে। পাহাড়ী সান্যাল জন-প্রিয় অভিনেতা, সুগায়ক এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংগীতরসজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর স্মৃতিচারণ, এবং ঘিরে অন্য সব কথাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর দুর্লভ চোখের জলের কথা সব ছাপিয়ে বড় হয়ে মনে এলো।

পাহাড়ী সান্যালের সমকক্ষ অভিনেতা, এমনকি তাঁর চেয়ে বড় শিল্পী, এই বাংলা-দেশেই আরও ছিলেন। তাঁর মত গানও অনেকে গেয়েছেন। কথোপকথনে তাঁর পটুত্ব অসামান্য হলেও অপ্রতিদ্বন্দ্বিত নিশ্চয়ই নয়। তথাপি পাহাড়ী সান্যাল তাঁর জীবদ্দশায় নিজে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার ধারণা, তাঁর ব্যক্তিত্ব অন্য কয়েকটি সংশ্লেষক উপাদানে রচিত না হলে শুধু তাঁর অভিনয়-খ্যাতির জন্য তিনি এ-রকম একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতেন না। তাঁর অগণিত দেশী-বিদেশী বন্ধু ও অনুরাগীদের হৃদয়েও তিনি এত গভীরভাবে ব্যথিত করে চলে যেতেন না।

পাহাড়ী সান্যালের ব্যক্তিত্ব কোনো তাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত ছিল না, জীবনে বারে বারে সুকঠিন পরীক্ষা; দৃঢ়চিত্তে অতি-ক্রান্ত হয়ে তিনি তাঁর নামের তাৎপর্য সফল করেছেন। একুশ বছর বয়সে যখন কপর্দক-হীন অবস্থায় তাঁর চেয়ে বয়সে বড় অসবর্ণ এক মহিলাকে জীবনসঙ্গিনী করেছেন তখনকার পাহাড়ী সান্যাল, আর দ্বিতীয়বার

গিরীশচন্দ্রের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল

প্রেমের বলিষ্ঠ প্রয়োজনে আরও দূরূহ সামাজিক পরিস্থিতিতে তিনি পুনরায় যে বিবাহ-বন্ধনে নিজেকে জড়িয়েছিলেন, সেই পাহাড়ী সান্যাল একই চরিত্র। আবার, ত্রিশোর্ধ বয়সে একাদিক্রমে ছয় বৎসরকাল কথক নৃত্যে তালিম নিয়েছিলেন যে পাহাড়ী সান্যাল, আর সাতচল্লিশ বছর বয়সে এই কলকাতা শহরে বসে প্রচুর পরিশ্রম করে ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন যে পাহাড়ী সান্যাল, তাঁরাও একই ব্যক্তি। বয়সের এবং অভিনয়-জীবনের অনিবার্য প্রতিবন্ধকতার কারণে নৃত্যের অনুশীলন তিনি রাখতে পারেননি, সেজন্য আন্তরিক আক্ষেপ শুনেছি। একবার এক নৃত্যসভায় একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ের কথক নৃত্য দেখতে দেখতে মনে আছে হঠাৎ তার শিক্ষিকা সম্বন্ধে অভিযোগের সুরে বলে উঠেছিলেন : এত অল্প বয়সের মেয়েকে ওই বোলটা দেওয়া খুব অন্যায় হয়েছে। সব রকম বোল সব বয়সের জন্য নয়।

ফরাসী ভাষার সঙ্গে প্রেম অবশ্য তাঁর মৃত্যুর চার-পাঁচ দিন আগেও দেখেছি। সাল-তারিখের হিসেবে প্রায় ত্রিশ বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়েও যাঁর সঙ্গে বিষয়গত আলোচনায়, এমন কি চটুল রসিকতাতেও, কখনো সমবয়সী ছাড়া তাঁকে কিছু মনে করতে পারিনি। অনায়াসেই আমার মত আরও অনেক বয়ঃকনিষ্ঠরাও তাঁর সমবয়সী ছিলেন। বরং বলব তিনি সব বয়সের স্ত্রী-পুরুষের সমকালীন ছিলেন। ফরাসী ভাষা প্রসঙ্গে এই কথাটা উঠল কারণ পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে আমার বই দেওয়া-নেওয়ারও একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁর কাছ থেকে মজাদার দু-চারটি আদিরসাত্মক ইংরেজী বই এদিকে এসেছিল, এবং তারপর থেকে হয়তো সাহিত্যে আদিরসের আস্বাদনক্ষমতায় আমার কিঞ্চিৎ সুস্থ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে, তিনি প্রায়ই বলতেন : "ফরাসী ভাষাটা তো আর শিখলি না, তাহলে তোর উপযুক্ত সুখাদ্য দিতে পারতুম।"

গানবাজনার আসরে এর পর থেকে পাহাড়ী সান্যালের নামে একটি অদৃশ্য আসন শূন্য পড়ে থাকবে। চৌকো ধরনের সেই বিচিত্র হাতবাক্সটি, যার সম্বন্ধে শুনেছি ছবি বিশ্বাস মশাই নাকি জিজ্ঞেস করতেন : "ওহে পাহাড়ী, ওটা কি তোমার ভ্যানিটি ব্যাগ না ইনস্যানিটি ব্যাগ?"—যার ভিতর খুশবু, জর্দা, পানমশলা থেকে শুরু করে চারমিনার সিগারেটের স্টক, ওষুধবিষুধ, ঘাড়ের ব্যান্ড, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বই, আতর, কলম, গল্পের বই সব থাকত। বহুবার তাঁকে গাম্ভীর্যের ভান করে বলেছি : "আপনার প্রেমপত্রগুলো কিন্তু ওটার ভিতরে রাখবেন না।" —ঠিক তেমনি গম্ভীরভাবে ত্বরিত উত্তর এসেছে : "ড্যাম্ ইট্, আই অ্যাম নট অ্যাফ্রেড অব মাই ওআইফ লাইক ইউ ফুলস আর অব ইওরস্।"

সঙ্গীতের আসরে আমাদের বাঙালী কানে, ঠিক যেমন পশ্চিমা শ্রোতাদের কানে, পাহাড়ী সান্যালের মুহুর্মুহু সরব তারিফ হয়তো মাঝে মাঝে বেমানান লাগত। আমি নিজে লক্ষ করেছি, নামজাদা দু-একজন গায়ক-গায়িকা তাঁর দিকে বিরক্ত হয়েও তাকিয়েছেন। যাঁরা বিরক্ত হতেন না, তাঁদেরও একটা ক্ষুব্ধ অভিযোগ ছিল পাহাড়ীবাবু অপাত্রেও বড়ো বেশী উচ্ছ্বাস দেখাতে থাকেন। ফলে ওঁর বিচারবোধ সম্বন্ধেও হয়তো তাঁরা এক ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করতেন। ব্যাপারটা আসলে অন্যরকম, এবং সেটা ধীরে ধীরে আনুষে পাহাড়ী সান্যালকে চিনতে পেরে জেনেছি। পাহাড়ীবাবুর সব ব্যাপারেই অন্যকে তারিফ করার মধ্যে একটা লখনউ-সংস্কৃতি ছিল, সেখানে তিনি ঠিক বাঙালী ছিলেন না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরেও তাই তিনি একইভাবে সাবাস, কেয়াবাৎ, বহুৎ আচ্ছা বলতেন। রবীন্দ্রনাথ শুনলে কী বলতেন জানতে ইচ্ছে করে। আর একটা কথাও আমার মনে হয়েছে।
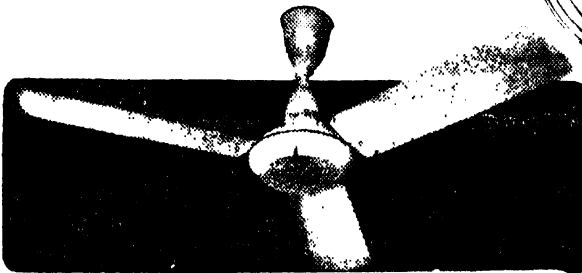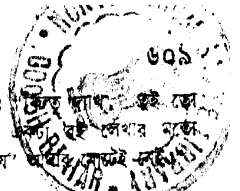
অহমিকাই বলুন কিংবা অন্য-কিছু, সব ধরনের আসরেই পাহাড়ী সান্যাল বোধ হয় বিশ্বাস করতেন যে, তাঁকেই সেখানে প্রাণ-সঞ্চার করতে হবে। গায়ক কিংবা বাদক যদি তরুণ হয় তা হলে তাকে উৎসাহ দিয়ে তার পূর্ণ ক্ষমতা বার করে আনার দায়িত্বও তিনি যেন শুধু তাঁরই মনে করতেন। এই ব্যাপারটি পাহাড়ী সান্যালের ব্যক্তিত্ব দর্শনের পরিচায়ক। অর্থাৎ, যে কিছু পারছে তাকে তারিফ কর, যে ঠিক এখনো পারছে না, তাকে উৎসাহ দাও।

তবে এটাও আমার মনে করার কারণ ঘটেছে যে, যার গান-বাজনা বিশেষ হবার নয় তাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি। একবার এক ঘরোয়া আসরে এক অতি তরুণ গায়কের গান শোনাতে দেড় মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে পনেরো মিনিট পরেই তিনি আমাকে বলেছিলেন : "উঠে পড় যত তাড়াতাড়ি পারিস, এখানে বসে থেকে লাভ নেই, অন্য কোথাও চল্।"—বেরিয়ে এসে বলেছিলেন সুন্দরী গৃহকর্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা না-করতে পেরে গান শুনতে এসেছিলেন, জানতেন না ভদ্রলোক এত খারাপ গান করেন। আরেকজন তরুণ সেতারিয়ার বাজনা শোনার জন্য তাঁকে আমার বাড়িতে আসতে বলায় তার নাম শুনেই বললেন : "ওর খবর আমি জানি তবে আমার বিচার নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে, তুই শুনে বরং আমাকে বলিস কেমন লাগল।"

পাহাড়ী সান্যালের যেমন অনেক সহজ উদারতা ছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা সহজাত নির্লিপ্ততা ছিল, তেমনই যাঁরা তাঁকে বহুদিন ধরে চিনবার সুযোগ পাননি তাঁদের কাছে পাহাড়ী সান্যাল কখনো কখনো অস্বস্তিকর ধরনের মানুষ ছিলেন। কাউকে আপন ক'রে নেবার বহিঃপ্রকাশ তাঁর ছিল তাকে একটু খোঁচা মেরে কথা বলা। অথবা হয়তো দুম্ ক'রে মূর্খ কিংবা বুদ্ধিহীন ব'লে বসলেন। অধিকাংশ ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া আমার পক্ষে সহজ হ'ত না। অবশ্য গান-বাজনা, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি যা বলতেন তার উপর মন্তব্য করার যোগ্যতা আমার ছিল না। কিন্তু নানারকম অন্যান্য বিষয়ে আমাদের পরিচয়ের প্রথম দু'বছরে খুব ঠোকাঠুকি লেগে থাকত। উনিও আমার সঙ্গে দেখা হলে এক ঘর লোকের মধ্যে অপ্রস্তুত ক'রে বসতেন। কিন্তু রসিকতার স্তরটি মাঝে মাঝে উপভোগ না ক'রেও পারতাম না। একবার দুজনেরই ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম পাহাড়ীবাবু আমার সম্বন্ধে নালিশ জানিয়েছেন যে আমি বড়ো বেশি তর্ক করি। সেই বন্ধুকে ব'লে এসেছিলাম পাহাড়ীবাবুকে জানিয়ে দিতে যে তর্কের কারণ না ঘটালে আমিও তর্ক করব না। বুঝতে পেরেছিলাম তিনি বন্ধুটির মারফত খবরটা পেয়েছেন, যখন একদিন সন্ধ্যায় আমাদের এক ঘরোয়া বৈঠকে কি কথায় একজনকে হঠাৎ ব'লে উঠলেন : "দ্যাখো ভাই, আমি তর্ক না-ক'রে কোনো জিনিস মানতে রাজি নই, কারণ আমি আজকাল অমুকের শিষ্য।"

একদিন অনেক রাতে লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ী সান্যালকে খুব ভালো, অর্থাৎ নমনীয়, মেজাজে পেয়ে বলেছিলাম তাঁর সমকালীন বাংলা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি বই লেখার জন্য এখন তাঁর চাইতে উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন অথবা অসম্ভব। কথাটা উঠেছিল কারণ পাহাড়ীবাবুর মুখে আমি অনেকবার শুনেছি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর মতে মাত্র দুটিই প্রতিভাবান পরিচালক দেখা দিয়েছেন—প্রমথেশ বড়ুয়া এবং সত্যজিৎ রায়। আর দুর্গাদাস এবং সায়গল সম্বন্ধে অন্তরঙ্গতম গল্প তো কতই তাঁর মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছি। সে সব গল্প যখন তখনই টুকে রেখে তাঁকে দেখিয়ে নিতে পারলে উত্তরকালের পাঠকদের জন্য লিখতে পারতাম। পাহাড়ীবাবুর মৃত্যুর চার-পাঁচদিন আগেও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বসে এ-বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করব ভেবেছিলাম। কিন্তু তাঁকে সেদিন বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ব'লে কথাটা আর তুলিনি। নিশ্চিন্ত মনে ভেবেছিলাম পরে কথাটা তুলব।

আলাপচারী পাহাড়ীবাবুর আর একটা প্রিয় খেলা ছিল বাংলা অথবা ইংরেজি শব্দ নিয়ে মজা করা। একদিন খাবার টেবিলে অন্য সময়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তুমুল তর্ক লেগে গিয়েছিল 'পুঙ্খানুপুঙ্খ' কথাটির ব্যবহার নিয়ে। তাঁর আদুরে বেড়ালটিকে পাতের এঁটোকাঁটা ভাত ডাল একসঙ্গে মেখে তার মধ্যে আবার একটু দুধ ঢেলে তিনি খেতে দিয়েছিলেন। বেড়ালের খাওয়া লক্ষ করে হঠাৎ বলে উঠলেন : "দ্যাখ্, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবটা খেলো।" কথাটার ব্যবহার খুব জুৎসই হয়েছে বলে আমিও তারিফ করে উঠতে মীরা দেবী আরও জোর আপত্তি করে উঠলেন। প্রসঙ্গত বলে নিই, পাহাড়ীবাবু আমাকে বহুবার বলেছেন যে, মীরা দেবীর কাছ থেকে উনি অনেক ভালো ইংরেজি শিখেছেন। তবে মীরা দেবী ভাষার ব্যাপারে কিছুটা বিশুদ্ধতাপন্থী ব'লে স্বামীর সঙ্গে তর্ক লেগেই থাকত। শব্দ নিয়ে খেলার কথা আরও বলি। সেদিন সেই রাতে লেকের রাস্তায় চলতে চলতে বই লেখার কথা প্রসঙ্গে শেষে বললেন : "বেশ, উত্তম প্রস্তাব, তবে আমার একজন কলমচি চাই।" —তাঁকে কলমচি দেওয়া হবে বলতে তিনি বললেন : "কিন্তু দ্যাখ, তুই তো জানিস, ওরকম একটা বই লেখার মতো মানসিক 'গাম্ভীর্য' আমার মোটেই নেই।"

ব্যবহারিক জীবনে পাহাড়ী সান্যাল ভীষণভাবে পশ্চিমা মনোভাবাপন্ন ছিলেন। আমার অনেক ব্যক্তিগত কথা নিশ্চিন্তে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। যখন দেখাশোনা হয়নি মাসের পর মাস, তখনও আমার সুখ-দুঃখের সব খবর রেখেছেন টের পেয়েছি। কিন্তু কোথাও কারও কাছে আমার ব্যক্তিগত কথার উল্লেখমাত্রও করেন নি। এত কথা বলার স্বভাব যে-বাঙালির ছিল, তার পক্ষে এই মাত্রাবোধ বিস্ময়কর।

পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ঘটেছিল তাঁর জীবনের এক নির্মম পর্যায়ে। তাই হয়তো তাঁর পাহাড়ের মতো শক্তির পরিচয় আরো বেশি করেই পেয়েছি। কিন্তু সেই শক্তির স্বাক্ষর আমার মতো আরও অনেকের মনে রাখতে গিয়ে তিনি তাঁর সময়ের অনেক আগেই চ'লে গেলেন। নিষ্ফল আফসোস্ করব না, তবে তাঁর গুণগ্রাহী আমরা অনেকে তাঁর প্রতি কোনও কর্তব্যই করি নি।

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১০৫ ॥

কৃষ্ণনগর শহরের রাস্তা দিয়ে জোরে জোরে হাঁটছে সূর্য। অনেক রাত হয়ে গেছে। রাস্তায় মানুষজন খুব কম, এক আধটা পানের দোকানের সামনে অলস লোকের জটলা দেখা যায়। তাদের দেখলেই সূর্য এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছে, সার্কিট হাউসটা কোথায়!

লোকেরা হাত তুলে রাস্তা নির্দেশ করে, তবু সূর্যর দিকভ্রম হয়। কিছুদূর গিয়ে আবার কারুকে জিজ্ঞেস করলে, সে সম্পূর্ণ উল্টোদিক দেখায়। কিছুক্ষণ বাদে সূর্য একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে গেল। রিকশাওয়ালা এত রাত্রে ভাড়া যেতে চায় না, তাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো, মোড়ের মাথা থেকে দু'চারজন লোক সেই কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে এসে তারাও রিকশাওয়ালাকে বললো, আরে ভাই নিয়ে যাও না, উনি বলছেন যখন বিশেষ দরকার—।

বিশাল মাঠের মধ্যে সার্কিট হাউস, বেশ খানিকটা দূরে গেট। এখন সেই গেট বন্ধ, সেখানে পাহারা দিচ্ছে শান্ত্রী। সে সাইকেল রিকশাকে কিছুতেই গেট দিয়ে ঢুকতে দেবে না। সেখানে একটা বচসা বেধে গেল। সার্কিট হাউসের বাইরের সিঁড়িতে বসে থাকা দুজন সেপাইও ছুটে এলো সেদিকে।

সারাদিন বহু স্মারকলিপি, বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কমিটি স্থাপন এবং দুটি জনসভা সেরে উপমন্ত্রী শংকর বসু খুবই ক্লান্ত হয়ে একটু আগে ঘুমিয়েছেন। মাথার কাছে এক কাপ দুধ ঢাকা রয়েছে, ভোর বেলা উঠে তিনি ঠাণ্ডা দুধ খান। ঘুমের মধ্যেও চিন্তাক্লিষ্ট তাঁর মুখভঙ্গি।

দীপ্তি জেগেই ছিলেন। ঘুম আসছিল না কিছুতেই, তিনি যেন উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন কিছুর অপেক্ষায়। তাঁর হৃৎস্পন্দন এখন দ্রুত, হাতের তালুতে জ্বালা জ্বালা করছে। দীপ্তি ঘুমন্ত স্বামীর পাশ থেকে উঠে পড়লেন। একটা পাতলা শাল জড়িয়ে নিয়ে বসবার ঘর পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়।

সামনের বাগানে ফুটে আছে এক ঝাড় চন্দ্রমল্লিকা। বিরাট নিরাট আকাশিয়া গাছগুলির চিকন পাতায় হাওয়ার সরসর শব্দ শোনা যায়। পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে চরাচরে। সেই জ্যোৎস্না পড়েছে দীপ্তির মুখে। তাঁর মুখখানি বিবর্ণ।

দীপ্তি তাকালেন গেটের দিকে। ওখানে কি হচ্ছে তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। তবু তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, রামরতন, কি হয়েছে? ওখানে গোলমাল হচ্ছে কেন?

রামরতন এসে জানালো যে সাইকেল রিকশা চেপে একজন আদমি এত রাত্রে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। সে বলছে, সাহেবের সঙ্গে তার জরুরি দরকার। বোধহয় মাতোয়ালা-টাতোয়ালা হবে।

দীপ্তি বললেন, এখন দেখা হবে না, ওকে চলে যেতে বলো।

দূর থেকে সূর্য ডেকে উঠলো, দীপ্তিদি—

দীপ্তি আবার বললেন, ওকে চলে যেতে বলো। বলো, কাল সকালে আসতে—

এই কথা বলার পর দীপ্তির মুখখানা কাঁকড়ে গেল। চোখ বুজে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার চোখ

খুলে দেখলেন, রামরতন এগিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। তিনি বললেন, আচ্ছা, ওকে ভেতরে আসতে দাও। চেনা লোক।

গেট খোলা পেয়ে সূর্য সাইকেল রিকশা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে চলে এলো বারান্দার কাছে। তারপর উত্তেজিত অভিযোগের সুরে বললো, তুমি আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে বারণ করেছিলে?

সেই উত্তেজনা দীপ্তিকে স্পর্শ করলো না। তিনি নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য, তুমি কেন এসেছো?

জ্যোৎস্নায় দীপ্তির হালকা ছায়া পড়েছে সিঁড়িতে। সূর্য সেই ছায়াতে দাঁড়িয়ে। তার দীর্ঘ শরীর দীপ্তির চোখের সামনে থেকে দূরের বাগানটা আড়াল করে দেয়।

সূর্য বললো, আমি থাকতে পারলাম না। ট্রেন খুব লেট ছিল, তাই আমার এত দেরি হলো।

দীপ্তি দেখলেন রামরতন অদূরে দাঁড়িয়ে, তার সন্দেহ মেটেনি, সে সব চোখে দেখছে সূর্যকে। দীপ্তি অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করলেন। চাকরবাকর-দেহরক্ষী-পাহারাদার এরা তাঁর সম্পর্কে কি ভাবছে কে জানে। তিনি আড়ষ্টভাবে বললেন, ওঁর সঙ্গে যদি তোমার দরকার থাকে—উনি তো রাত্রে আর উঠবেন না, সকালবেলা আসতে পারো—কিংবা বসবার ঘরের সোফায় যদি রাতটা কাটাতে চাও...

—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—আমি এখন শুতে যাবো।

—এক্ষুনি? একটু দাঁড়াও—

দীপ্তি অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে রামরতন, তুমি শুতে যাও—। তিনি সেদিকেই কিছুক্ষণ চেয়ে রামরতনের চলে যাওয়া দেখলেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত ম্লান গলায় বললেন, সূর্য, তুমি আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো। আমি একটা সামান্য মেয়ে। আমার কিছুই নেই। আমার মনের জোর ছিল না, আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, আমি হেরে গেছি। আমি একেবারেই হেরে গেছি। তুমি আমার ওপর রাগ করতে পারো, আমাকে ঘেন্নাও করতে পারো, কিন্তু তুমি নিজেকে নষ্ট করো না। তোমার শক্তি আছে, তুমি এখনো অনেক কিছু পারবে।

সূর্য বললো, সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, চলো, ঐ মাঠের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি।

—তা হয় না।

—কেন? তুমি তোমার স্বামীকে ভয় পাও?

—ওর সঙ্গে আমার ভয়ের সম্পর্ক নয়!

—তাহলে?

—তুমি কিছুই বুঝতে পারো না! তুমি কি ভাবো, তুমি যা চাও, তাই হবে? তোমার ভালোর জনাই আমি তোমাকে চলে যেতে বলছি

—কতদিন তোমাকে দেখিনি, কতদিন যে তোমার আঙুলগুলোতে চুমু খাইনি

দীপ্তি দু'কানে হাত চাপা দিলেন। তাঁর সারা মুখটা কাঁপছে। অতিকষ্টে কান্না সামলে তিনি বললেন, ছিঃ, ওসব বলো না! কেন আমাকে কষ্ট দিতে চাও? আমি খুবই সাধারণ একটা মেয়ে। তুমি যাও—

সূর্য এগিয়ে এসে দীপ্তির একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললো, আমি কোথাও যাবো না। এবার আমাকে এত সহজে তাড়াতে পারবে না।

দীপ্তি ত্রাসের সঙ্গে চাপা গলায় বললেন, ছাড়ো আমাকে, শিগগির ছাড়ো!

—আমি তোমাকে এক্ষুনি নিয়ে চলে যাবো।

—এভাবে তুমিও বাঁচতে পারবে না, আমিও বাঁচতে পারবো না!

—দীপ্তিদি, আমার কোথাও আর যাবার জায়গা নেই। আমি তো তোমার কাছ থেকে অনেক দূরেই চলে গিয়েছিলাম। কোনো জায়গায় আমি শান্তি পাইনি। সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমার জীবনটা কি এই রকমভাবে নষ্ট হবে? তোমার কথা চিন্তা করলেই একমাত্র আনন্দ পাই, আমার আবার ভালোভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে—তোমাকে পেলে আবার আমি অনেক কাজ করতে পারবো, সব মানুষকে ভালোবাসতে পারবো।

—লক্ষ্মীটি হাত ছাড়ো-

—না।
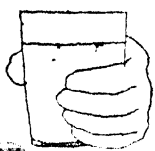
—তোমার পায়ে পড়ি, সূর্য, আমাকে ছেড়ে দাও। এখানে অনেক মানুষজন আছে। আমি যদি ওদের বলতাম তোমাকে ঢুকতে না দিতে?

—তুমি তা পারতে?

—ভুল করি আর ঠিক করি, আমার বিয়ে হয়ে গেছে অন্য একজনের সঙ্গে।

—এটা নকল বিয়ে। সেই যেরকম চন্দননগরে—

—না, না, এটা তা নয়।

—দীপ্তিদি, একটা কথা সত্যি করে বলো তো, তুমি আমাকে কোনোদিন ভালোবাসো নি? আমাকে কখনো চাও নি?

—হাত ছাড়ো, বলছি—

সূর্য হাতটা ছেড়ে দিতেই দীপ্তি কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। জ্যোৎস্নাটা সরে গেল তাঁর মুখ থেকে। শাড়িটা ঠিক করার জন্য তিনি আঁচল সমেত বাঁ হাতটা একবার তুললেন। সেই আবছা অন্ধকারে এক মুহূর্তের জন্য আঁচল-ছড়ানো বাঁ হাত সমেত তাঁর সম্পূর্ণ দেহটা ভারতের মানচিত্রের মতন মনে হয় যেন। সূর্যর চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

দীপ্তি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমি যদি সত্যি কথাটা বলি, তারপর তুমি এখান থেকে চলে যাবে বলো? কথা দাও?

—আগে বলো। সত্যি কথাটা বলো—

—সূর্য, তোমাকে আমি কখনো ভালোবাসিনি। তোমাকে আমি কখনোই চাইনি। আমি খুব খারাপ—

কথাটা শেষ করেই দীপ্তি দ্রুত ঢুকে যাচ্ছিলেন ভেতরে, সূর্য দৌড়ে এলো সেদিকে। ড্রয়িং রুমে ঢুকে দীপ্তি দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করেও পারলেন না, সূর্য জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। দীপ্তির শরীর তখন কান্নায় দুলে দুলে উঠছে, তিনি দেয়ালে ঠেস দিয়ে না দাঁড়ালে পড়েই যেতেন।

সূর্য তাঁর পিঠে হাত দিয়ে শান্ত গলায় বললো, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ঐ কথাটা আর একবার বলো—

দীপ্তি কান্না থামাতে পারলেন না। সেই অবস্থাতেই বললেন, ও এক্ষুনি জেগে উঠবে।

—উঠুক।

—সবই আমার দোষ। আমি তোমাকেও নষ্ট করলাম।

—এখনো সব কিছু ঠিক করার সময় আছে।

দীপ্তি ভেজা মুখখানা ফেরালেন। তারপর হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়ে বললেন, আমি মরে গেলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যায়, তাই না?

—না। এই বিয়ে ভেঙে দিয়ে এক্ষুনি যদি আমরা এখান থেকে চলে যাই, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যেতে পারে।

—বিয়ে ভাঙা যায় না। সমাজ থেকে পালিয়ে পালিয়ে কিছুতেই আমি বাঁচতে পারবো না। আজ থেকে কুড়ি তিরিশ বছর বাদে হয়তো এ সবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে, কিংবা অন্য কোনো দেশে, কিন্তু আমাদের নিয়তি অন্যরকম। আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাবো না—এটা আমার শেষ কথা।

—তা হলে আমার কথাও শুনে রাখো, আমি তোমাকে আর শংকরদাকে কিছুতেই এক সঙ্গে থাকতে দেবো না। আমি ত্যাগ জানি না।

—সূর্য, শান্ত হও! একটু চিন্তা করে দেখো। শুধু রাগারাগি করলেই সব পাওয়া যায় না।

—আমি শান্ত হতে পারছি না।

—তুমি ভালো হয়ে ওঠো, তোমার এসব পাগলামি সেরে যাক। তোমার একটা সুখী জীবন দেখলে পৃথিবীতে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী সুখী হবে না।

—আমার সব সুখ তোমার কাছে জমা আছে।

এই সময় শংকর বসুর শয়ন কক্ষে খুট করে একটা শব্দ হলো। দীপ্তির পিঠে তখনও সূর্যর হাত, তিনি বিদ্যুৎগতিতে সরে যেতে চাইলেন। সূর্য তবু তাঁকে সবলে ধরে রইলো।

দীপ্তি আকুলভাবে বললেন, কি করছো কি, ছাড়ো, ও জেগে উঠেছে।

সূর্য কোনো কথা না বলে সেই দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

দীপ্তি নীচু হয়ে সূর্যর পা ছোঁয়ার চেষ্টা করে বললেন, আমায় ছেড়ে দাও, আমি তোমার কেউ না, কোনোদিনই আমি তোমার কাছে যাবো না—

সূর্য চেয়েছিল, সেই মুহূর্তেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাক। শংকরবাবু

মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে এসে দেখবেন তাঁর স্ত্রী পর-পুরুষের আলিঙ্গনে। সূর্যর এ জন্য কোনো লজ্জা নেই। সে শংকর বসুকে স্পষ্ট বলবে, এই নারী আমার। তুমি এই দেশ নাও, যত ইচ্ছে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নাও, কিন্তু এই নারীকে পাবে না। কিন্তু দীপ্তি যখন বললেন, কোনো দিনই আমি তোমার কাছে যাবো না, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যা সূর্যকে আমূলে নাড়িয়ে দেয়। তার যুক্তিহীন উত্তেজিত হৃদয়ও যেন অনুভব করতে পারে যে এর পরে আর কোনো জোর চলে না। সূর্য হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লো। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দীপ্তির দিকে তাকালো আর একবার। মনে হলো, এই মুখ তার অচেনা। বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

সূর্য দীপ্তকে এবার ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে ডাকলো, শংকরদা—

ড্রয়িং রুমের পর বিরাট ডাইনিং রুম, তার ডান দিকে শোবার ঘর। সেই ঘরের দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন শংকর বসু। পাজামা পাঞ্জাবি পরেই শুয়েছিলেন, সেই অবস্থায় উঠে এসেছেন, চুল অবিন্যস্ত,
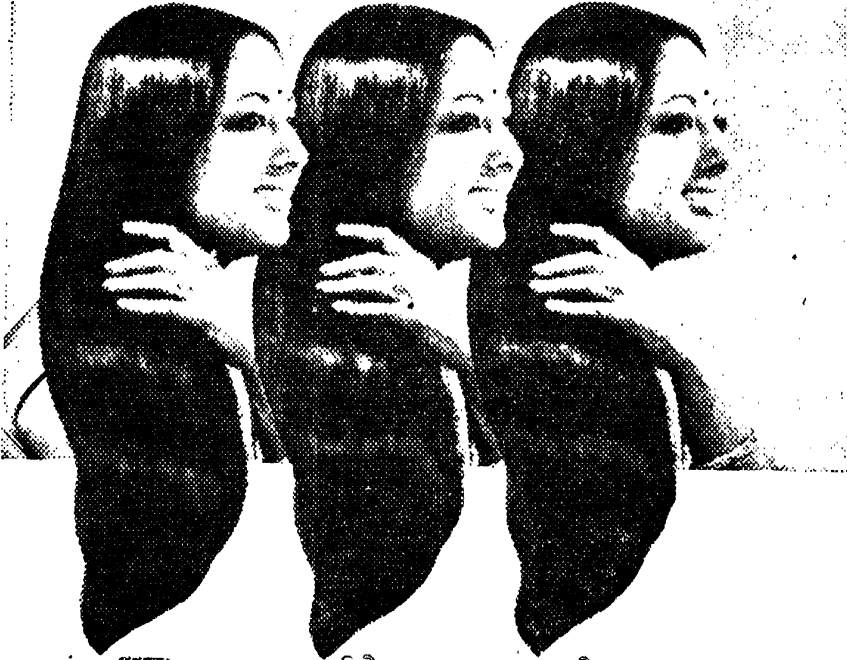
এখন তাঁকে নিজের বয়েসের চেয়েও বেশী বয়স্ক দেখাচ্ছে। চোখে লেগে আছে ঘুম, চিবুকের কাছে শ্রান্তি।

তিনি বললেন, কে ওখানে? সূর্য?

সূর্য উত্তর দেবার আগেই দীপ্তি তার স্বামীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, সূর্য হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে—

শংকরবাবু মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে হাই তুলে বললেন, কি ব্যাপার, সূর্য? হঠাৎ চলে এলে যে?

সূর্য বললো, আমি তো বলেইছিলাম আমি আপনাদের সঙ্গে আসবো। আপনারা নিয়ে এলেন না, তাই আমি নিজেই এলাম।

—এখানে তো আমাদের অনেক কাজ। তুমি এখানে কি করবে? আমরা তো আর প্রমোদ ভ্রমণে আসিনি।

—আপনার সঙ্গেও আমার অনেক কাজের কথা আছে।

—সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তা বলে এখানে—

শংকরবাবু হঠাৎ হাসলেন। দীপ্তির দিকে ফিরে বললেন, সূর্য বুঝি তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে? আমাকে ডাকলে না কেন!

দীপ্তি কোনো উত্তর দিলেন না।

শংকরবাবু সেই রকম হাসিমুখেই সূর্যকে বললেন, দীপ্তির সঙ্গে যদি তোমার আলাদা কিছু বলার থাকে, তুমি অনায়াসেই তা বলতে পারো, আই ডোণ্ট মাইণ্ড। কিন্তু এত রাত্রে, এইরকম জায়গায়—ব্যাপারটা ভালো দেখায় না—

সূর্য চুপ করে রইলো।

শংকর বসু ডাইনিং রুমের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সূর্যকে বললেন, বসো, এখানে এসে বসো। দীপ্তি তুমি—

দীপ্তি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছেন। বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে।

শংকরবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, একটা সিগারেট দাও। আছে?

সূর্য পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করলো। দুজনেই ধরালো সিগারেট। শংকরবাবু অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বললেন, সূর্য, তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নেই। বড় হয়ে উঠতে শেখো। ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা তো করলেই হয় না। সব কিছুর দায়িত্ব নিতে হয়। দীপ্তিকে যে তুমি শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছো, এতে তোমার কি লাভ?

এ সব যুক্তিতর্কের কথা। সূর্য যুক্তি তর্ক কিছুই বোঝে না। সে বকুনি খাওয়া গোঁয়ার বালকের মতই গুম হয়ে রইলো।

শংকরবাবু আবার শুরু করলেন, তোমার আর দীপ্তির মধ্যে কি হয়েছিল, আমি তা জানি। আমাকে ও সব বলেছে। স্বাধীনতার ঠিক আগে সবাই যখন ছত্রভঙ্গ, বিশেষত তোমাদের মতন যাদের কোনো পার্টি ছিল না, তাদের নিজস্ব কোনো দাঁড়াবার জায়গাও ছিল না—সেই সময় তোমরা কয়েকজন কাছাকাছি এসেছিলে। তোমার তখন বয়েস কম—তাই তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে দীপ্তিকে। দীপ্তি সত্যিই মানুষকে শান্তি দিতে পারে—শুধু ওর রূপ নয়, চরিত্রটাই অসাধারণ। তার ফলে তোমার দিক থেকে খানিকটা ইনফ্যাচুয়েশন হয়েছিল। তুমি হয়তো তাকে লাভ বলে ভেবেছিলে, কিন্তু আমি ইনফ্যাচুয়েশনই বলবো। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো এটা কেটে যাবার কথা। তুমি কি চিরশিশু হয়ে থাকতে চাইছো নাকি! তোমার মতন বয়েসে আমি প্রেম-ভালোবাসা টাসার কথা চিন্তা করারই সময় পাইনি। দীপ্তিকে আমি বহুকাল ধরে চিনি—কোনো দিন অন্যরকম কিছু ভাবিনি—এখন বুঝতে পারছি, প্রেম-ভালোবাসার চেয়ে পরস্পরকে বুঝতে পারাই বড় কথা। আমরা দুজনকে যে-রকম...

সূর্য অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললো, শংকরদা, অগাস্ট আন্দোলনের সময় আমি নিজের হাতে তিনজন মানুষকে খুন করেছিলাম। কেন করেছিলাম?

শংকরবাবু একটু চমকে গিয়ে বললেন, হঠাৎ একথা কেন?

—এই মুহূর্তে আমার মনে পড়লো।

—ওসব পুরোনো কথা এখন একেবারে ভুলে যাও। ওসব আর মনে স্থান দিও না।

—আমার দোষ এই, আমি কোনো পুরোনো কথাই ভুলতে পারি না। তার বদলে কি আমি কিছুই পাবো না?

—তোমাকে তো কতবার বললাম, একটা কোনো কাজ নিতে। আমি তো রাজিই আছি।

—আমি চাকরি করবো, আর আপনি মন্ত্রিত্ব করবেন?

—মন্ত্রিত্বটা বুঝি খুব আরামের! নাঃ, তোমার দেখছি মাথাটা এখনো গরম হয়ে আছে।
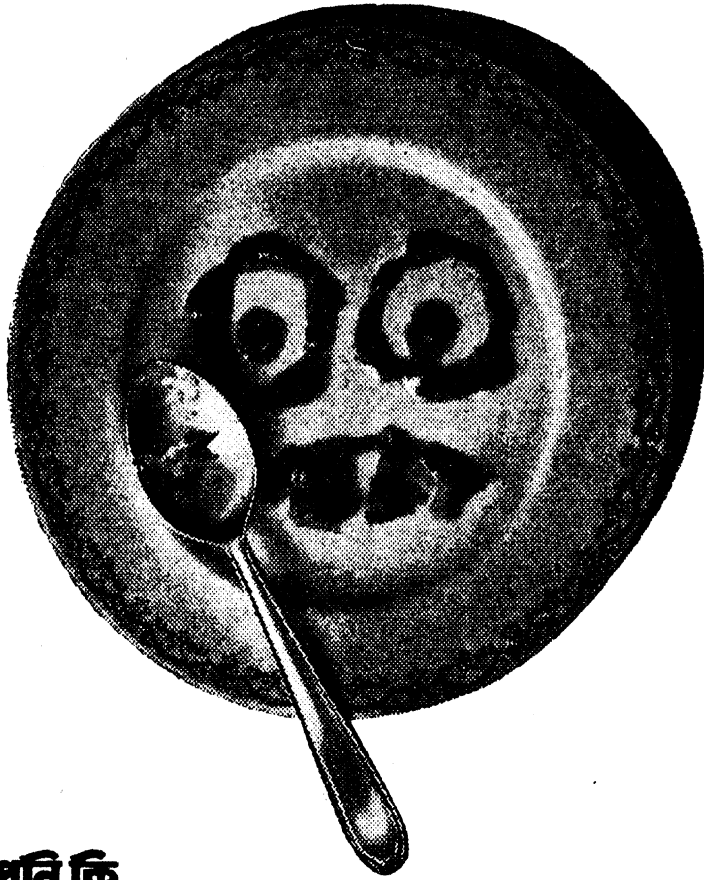
আপনি কি বদ্‌হজমের ভয়ে অস্থির?

হিউলেটস্ মিক্সচার খান—আর আবার নির্ভয়ে খাওয়া-দাওয়া করুন।

হজমশক্তি কমে গেলে শুধু খাবার ইচ্ছেই চলে যায় না—সঙ্গে সঙ্গে আপনার মেজাজও খারাপ হয় এবং আপনি খিটখিটে হয়ে পড়েন, আপনাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। হিউলেটস্ মিক্সচার হাতের কাছেই রাখুন। ইহা দ্রুত কাজ করে, আপনার পেটে এক প্রতিরোধ—প্রলেপ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত অ্যাসিড বা অম্লাক্ত পদার্থকে প্রশমিত করে; যন্ত্রণা কমায়। সব রকমের হজমের গোলমাল দূর করে ও আরাম দেয়।

পেটের অসুখ হ'লে আফিং মিশ্রিত হিউলেটস্ মিক্সচার চেয়ে নিন।

সি জে হিউলেট অ্যাণ্ড সান (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ মাদ্রাজ-৬০০ ০০২ • কলিকাতা-৭০০ ০০১

SAA/CJH/1192 BN

শংকরবাবু গলা চড়িয়ে ডাকলেন, দীপ্তি!

দীপ্তি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে শংকরবাবু বললেন, তোমার এই আদরের ছোট ভাইটি দেখছি সব সময় রেগে টং হয়ে আছে। একে নিয়ে কি করা যায় বলো তো!

সূর্য দীপ্তির দিকে তাকিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বললো, দীপ্তিদি, তুমি এখানে একটাও কথা বলবে না!

শংকরবাবু বললেন, আরে একি! সূর্য, তুমি আমার স্ত্রীকে এখনো দিদি বলে ডাকো, অথচ সম্মান দিয়ে কথা বলো না, এটা ঠিক না! ব্যবহার-ট্যাবহার একটু ঠিক করো। যাক্ শোনো, অনেক রাত হয়েছে, এখন আর কথাবার্তা বলে লাভ নেই। এসেই যখন পড়েছো, তখন রাতটা কাটিয়ে যাও এখানে। দীপ্তি তুমি ওর একটা শোওয়ার ব্যবস্থা করে দাও—উত্তরের ঘরটা বোধ হয় খালি আছে।

সূর্য বললো, আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করার দরকার নেই।

শংকরবাবু বললেন, দরকার নেই মানে? তুমি ঘুমোবে না? আমাদের তো ঘুমোতেই হবে।

দীপ্তিও খুব কোমল গলায় বললেন, সূর্য, এবার শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়ে গেছে, প্রায় একটা।

শংকরবাবু উঠে এসে সূর্যর কাঁধে হাত রেখে বললেন, আর চলো, চলো, আবার কাল সকালে কথা হবে। দীপ্তি, দেখো তো বিছানা পাতা আছে কিনা।

শংকরবাবু সূর্যকে ধরে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। দীপ্তি ঘরের মধ্যে ঢুকে ঠিকঠাক করে দিলেন বিছানার চাদর বালিশ। বেরিয়ে এসে বললেন, যদি রাত্তিরে তোমার জল তেষ্টা পায়—এই ডাইনিং রুমে জল আছে।

যে-কারণেই হোক, সূর্য আর আপত্তি করলো না। ঘরে ঢুকে সে খাটের ওপর বসলো। সেখান থেকে সে দেখলো, শংকরবাবু আর দীপ্তিদি ঢুকে গেলেন তাঁদের ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সূর্যর শরীরটা জ্বলছে তখন, হাত দুটো শক্ত হয়ে গেছে, চোখ দুটি বিস্ফারিত। তার মুখটা দেখলে এখন চেনাই যায় না। অন্তত দশজন মানুষের সারা জীবনের রাগ সে অনুভব করছে এই মুহূর্তে। যে-নারীকে পেলে সে পূর্ব-জীবনের সব কিছু ভুলতে পারে, যে নারীর জন্য সে আবার সব কোমলতা, দয়া, মায়া, ফিরে পেতে পারে—সেই নারী আজ তারই চোখের সামনে অপর পুরুষের সঙ্গে শয়ন কক্ষে চলে গেল।

ক্রোধ মানুষকে অসহায় করে দেয়। সূর্য নিশ্চল হয়ে বসে রইলো সেখানে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে শুনতে চাইলো, ও ঘর থেকে কোনো শব্দ আসে কিনা। ও ঘরের আলো নিবে গেছে, কোনো শব্দ নেই।

সূর্য সেখানে কতক্ষণ বসে আছে, তার খেয়াল নেই। দরজা খোলা, সে খরচক্ষে চেয়ে আছে দরজার দিকে। তার মনে হচ্ছে, যে-কোনো সময় দরজার কাছে দীপ্তিদির চুম্বকময় শরীরখানি দেখতে পাবে। সূর্য ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা—দীপ্তিদি কি তা দেখতে আসবে না, দীপ্তিদি যে বলেছিল, সূর্যর ঘুমন্ত মুখের পাশে তাঁর বসে থাকার খুব সাধ ছিল। সে কি মিথ্যে? আজ এত কাছে—সেই জন্যই কি সূর্য এ ঘরে শুতে আসার জন্য এত সহজে রাজি হয়নি? এই [illegible] অ[illegible]দীপ্তি[illegible]তের স্পর্শ... [illegible]ত অন[illegible]পল, [illegible] প্রহর কেটে [illegible] জা[illegible] বাইরে ঝমাঝম করছে রা[illegible] কোথাও একটা[illegible] নেই। সূর্যের কানে [illegible]দের অসুস্থ্য শব্দ। পৃথিবীতে আর সবাই ঘুমন্ত। শুধু সে একা জেগে আছে। সবাই সব পুরোনো কথা ভুলে যেতে পারে, শুধু সে পারে না। তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে, হাজরা রোডের একখানা ঘর, সেখানে সে আর দীপ্তিদি—বাইরে দাংগা-হাংগামা, দীপ্তিদি তার বুকের মধ্যে ছটফট করতে করতে বলেছিলেন, সূর্য, তুমি আমাকে নাও, তুমি

আমাকে নাও, আরও জোরে চেপে ধর—তারপর মনে পড়লো যোগানন্দর কথা, সে বলেছিল, এবার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ভালো করে বাঁচবো বুঝলি, তোর বোনের বাড়িতে গিয়ে ভালো করে খাবো—

সূর্য উঠে দাঁড়ালো। সে বুঝে গেছে, কেউ আসবে না। এক-একদিন নিস্তব্ধতার মধ্যেই বোঝা যায়, এর মধ্যে কোনো সম্ভাবনা নেই। সূর্য কি এখন চলে যেতে পারে এখান থেকে? সেও কি অন্য রকম ভাবে বাঁচতে পারে? অন্য রকম কি ভাবে বাঁচা যায়, সে জানে না, এখন তার আর কিছুই মনে পড়ছে না। আর কোনোদিকে রাস্তা নেই।

সূর্য পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো শংকর বসুর ঘরের দরজার সামনে। চোরের মতন কান পেতে শুনতে চাইলো কোনো শব্দ। কিছুই নেই। এখনও সূর্য ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তার ফিরে যাবার সাধ্য নেই। সে প্রচন্ড জোরে ধাক্কা দিল দরজায়।

ভেতর থেকে শংকর বসু বললেন, কে?

—আমি সূর্য, দরজা খুলুন।

—কি চাই?

—শিগগির দরজা খুলুন।

—আঃ, কি চাও এখন? যাও, ঘুমোও—

—শিগগির দরজা খুলুন।

শংকর বসু ভীরু মানুষ নন। তিনি দরজা খুলে বিরক্ত মুখে দাঁড়ালেন। আগেকার সব ভদ্রতার চিহ্ন মুছে গেছে।

সূর্য উঁকি দিয়ে ভেতরে দীপ্তিকে একবার দেখবার চেষ্টা করলো তৃষ্ণার্তের মতন। শংকরবাবু দরজা আড়াল করে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আবার কি হলো? একটু শান্তিতে ঘুমোতেও দেবে না?

—আপনি বাইরে আসুন, আপনার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।

শংকরবাবু এবার প্রচন্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, এসব কি পাগলামি হচ্ছে? তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই। যত সব ন্যাকামি।

শংকর বসু ধমক দিয়ে একটু ভুল করলেন। ধমকে ভয় পাবার ছেলে তো এ নয়। সূর্য শংকর বসুর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাইরে বার করে এনে ভয়ঙ্কর মুখ করে বললো, আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

—সূর্য, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু। তুমি আমার বন্ধু হিসেবে কিংবা দীপ্তির ছোট ভাই হিসেবে যতবার ইচ্ছে আমাদের বাড়িতে আসতে পারো—কিন্তু এরকম যদি করো—

—আমি আর কোনোদিন আসবো না। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

দীপ্তি উঠে এসেছেন। দু'জনের মাঝখানে হাত রেখে বললেন, একি! সূর্য একি করছো? ছেড়ে দাও। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

সূর্য তার সেই অস্বাভাবিক হিংস্র মুখটা দীপ্তিকে দেখিয়ে বললো, তুমি এর মধ্যে এসো না। তোমার সঙ্গে আর আমার কোনো দরকার নেই। কিন্তু আমি একেও এখানে থাকতে দেবো না।

শংকরবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, এ তো একেবারে পাগল হয়ে গেছে। এখন একে আটকে রাখা ছাড়া—...

সূর্য শংকরবাবুর কথা শেষ করতে দিল না। তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে দৌড় করিয়ে সোজা নিয়ে এলো বাইরে। দীপ্তি চেঁচিয়ে উঠলেন, রামরতন, রামরতন—। তারপরই নিজের মুখে হাত চাপা দিলেন। তিনিও ছুটে এলেন বাইরে।

সূর্য ততক্ষণে শংকরবাবুকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। শংকরবাবু প্রাণপণে চাঁচাচ্ছেন ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। তিনি দুর্বল মানুষ না হলেও সূর্যর গায়ে এখন অসুরের মতন শক্তি। সে শংকরবাবুকে কোথায় নিয়ে যাবে জানে না, নিজে কোথায় যাবে তাও জানে না, শুধু জানে, দীপ্তিদির কাছ থেকে এই লোকটাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। সে দূরে সরে যাবে, এই লোকটাকেও এখানে রেখে যেতে পারবে না। সে সব কিছু ছাড়বে কেন। সেপাই শান্ত্রীরা জেগে উঠেছে, সূর্যর ভ্রুক্ষেপ নেই।

শংকরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?

সূর্য বললো, চুপ! আমি যদি গ্রামে গিয়ে মাটি কোপাবার কাজ করি, আপনাকেও তাই করতে হবে।

সেই সময় রামরতন পেছন থেকে ঝাপটে ধরলো সূর্যকে। সূর্য যন্ত্র-মানুষের মতন
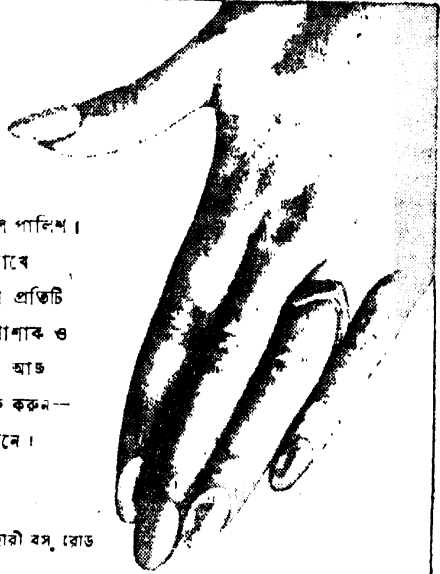
প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। সেই অবসরে একটু আলগা পেয়ে শংকর বসু ছুটতে লাগলেন ফুল বাগানের দিকে।

সূর্য বাঘের মতন তাড়া করে গেল তাঁর দিকে। ফুলবাগান লণ্ডভণ্ড করে সে যখন শংকর বসুকে প্রায় ধরে ফেলেছে, তিনি মাটিতে বসে পড়ে চিৎকার করলেন, মেরো না, আমাকে মেরো না—ভয়ে তাঁর মুখ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন।

রামরতনের প্রথম গুলিই সূর্যর পিঠে লাগে। কিন্তু সূর্য যেন টেরই পায়নি। তখনও সে শংকরবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, মারবো না, উঠে আসুন!

সেইটাই সূর্যর শেষ কথা। রামরতনের দ্বিতীয় গুলি লাগবার সঙ্গে সূর্য পড়ে গেল মাটিতে। কয়েকবার উল্টে পাল্টেই তার শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

রামরতন ততক্ষণ কাছে এসে গেছে। শংকরবাবু বিহ্বলভাবে একবার তার দিকে আর একবার সূর্যর দিকে তাকালেন। তারপর ঠাস করে রামরতনের গালে এক থাপ্পড় মেরে বললেন, উল্লুক, একি করলি?

দীপ্তি ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, সূর্য গুলি করেছে! তোমার লেগেছে?

শংকরবাবু বললেন, না। ওই দ্যাখো।

দীপ্তি নীচু হয়ে সূর্যর গায়ে হাত দিয়ে বললো, এ কি, ও উঠছে না কেন? অজ্ঞান হয়ে গেছে?

শংকরবাবু বললেন, সব শেষ।

দীপ্তিকে যেন কেউ চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা ভাবে টানলো। তিনি সূর্যর বুকের ওপর হাতটা রাখলেন, আর একটাও কথা বলতে পারলেন না। সেই সময় তাঁর চোখে কান্না এলো না। সমস্ত শরীরের মধ্যে এলোমেলো গরম হাওয়া ঘুরছে। একটা চিন্তাই তাঁর মাথায় গেঁথে গেল, আমি কেন জন্মেছিলাম? এই ব্যর্থ ভীতু জীবন নিয়ে আমি কি করবো?

শংকরবাবু বিহ্বল ভাবটা হঠাৎ কাটিয়ে উঠলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে বললেন, দারুণ কেলেংকারি হয়ে যাবে। আমার মান-সম্মান—খবরের কাগজে যদি...দীপ্তি, শিগগির ওঠো, ঘরে যাও, সূর্যর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি, ও জোর করে এখানে ঢুকে আমাকে মারতে এসেছিল, থানায় খবর দাও, এই রামরতন দৌড়ে যা—ও যে রিকশায় করে এসেছিল, সেই রিকশা-ওয়ালাকে ধর, সে সাক্ষী দেবে—এই তোমরা কেউ ওর বডি এখন ছোঁবে না—

শংকরবাবু দীপ্তিকে ধরে তুললেন। তারপর সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন, ছেলেটা একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। চলো তুমি শুয়ে পড়বে চলো—তোমার হয়তো কষ্ট হচ্ছে, আমারও তার চেয়ে কম নয়...

দীপ্তিকে ধরে ধরে তিনি নিয়ে গেলেন ভেতরে। কয়েকটা ফুলগাছ দলিত করে সূর্যর দেহটা পড়ে রইলো সেখানে। রক্তের গন্ধ পেয়ে একটা কুকুর কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছিল, দু জন সেপাই সেটাকে তাড়াচ্ছে।

সূর্যর মুখখানা আকাশের দিকে ফেরানো। ফিকে জ্যোৎস্নাতেও স্পষ্ট দেখা যায়, এখনো সেখানে রাগ আর অভিমানের আঁকাবাঁকা রেখা পড়ে আছে। আর কোনোদিন মুছবে না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নাম নাদেঝদা লেবেদিন। বাড়ি ইক্রেইন-এর মাগলেভ গ্রামে। বয়েস ৫৪। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে, অন্তত ডাক্তার বলেন, 'তিনি 'ফ্লু' রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল মাথা ধরা, মানসিক অস্বস্তি এবং অবসাদ। মাঝে মাঝে কেমন যেন ঝিমুনি ভাব। তখন তাঁর একমাত্র মেয়ে ভালিয়ার বয়েস মাত্র পাঁচ।

তারপর কি যে হল! একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন নাদেঝদা। আর ওই অবস্থাতেই দীর্ঘ কুড়িটি বছর অতিক্রান্ত হল। গত আগস্ট মাসে ও'র মা মারা গেছেন। দীর্ঘ এই কুড়ি বছরের মধ্যে মা মেয়ের সেবা করেছেন, নাতনীকে মানুষ করে তুলেছেন। মেয়ে বেহুঁশ। একটা কথাও বলে নি।

মৃত্যুর আগে মা শুধু আদর করে বলেছিলেন, বাছা নাদিয়া, অন্তত শেষ বারের মত মাকে বল 'শুভযাত্রা'। তিনি চিৎকার করে কেঁদেছেন। কিন্তু মেয়ের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয়নি। মা মারা গেলেন।

অতঃপর মায়ের মৃত্যুর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পর বেহুঁশ ভাবটা কেটে গেল। একটা আচ্ছন্নের ঘোর ছেড়ে দীর্ঘ কুড়ি বছর পর নাদেঝদা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, হয়তো তাঁর মায়ের করুণ চিৎকারেই এমনটি ঘটে থাকবে।

কিন্তু রোগটি কি? চিকিৎসকরা বলেছেন সাবকরটিক্যাল এনসিফেলাইটিস বা মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত রোগ। যা তাঁর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে অকেজো করে রেখেছিল। সম্ভবত মায়ের করুণ চিৎকারেই তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা ভেঙে দিয়েছে।

সন্ন্যাস রোগ প্রসঙ্গে

গোড়ায় যে কেউ ভুল করতে পারেন। এমন কি অভিজ্ঞ চিকিৎসকও। কারণ, ঠিক ওই সময়ে প্রাণঘাতী এই রোগের উপসর্গগুলি এমনই সাধারণ বলে মনে হয়, যা শুনে হয়তো অনেকেই বলবেন, এ আর এমন কি ব্যাপার! আজকাল প্রত্যেকেরই জীবন যে রকম দৌড়ঝাঁপ করে কাটে তাতে ওই ধরনের কিছু, কিছু শারীরিক অসুবিধা মাঝে মাঝে তো দেখা দিতে পারেই।

যেমন।

প্রাথমিক উপসর্গগুলি ঠিক এই রকম : যেমন ধরুন, হঠাৎ স্নায়ুতন্ত্রের ওপর চাপ পড়ল। যার অর্থ, প্রায়ই মাথার যন্ত্রণা হয়। কখনও কখনও যেন মাথার কোন একটি পাশ কে যেন থাবলা দিয়ে চেপে ধরে আছে। কখনও দপদপ করে যন্ত্রণা বাড়ে, কখনও বা চাপা যন্ত্রণা ভাব। এর সঙ্গে শুরু হয় দৈহিক ক্লান্তি। চিরকাল হয়তো খুব ভোরেই

আপনার ঘুম ভাঙত। কিন্তু হঠাৎ সে অভ্যেসটি চলে গেল। অদ্ভুত একটা ক্লান্তি সব সময়ই যেন শরীরকে ভারী বোঝার মত করে রাখতে চায়। বিশেষ করে একটু পরিশ্রম করলেই মনে হয়, আর যেন পারা যাচ্ছে না।

গোড়ায় এই ক্লান্তিভাবটা যে সব সময় ঘটে, তা নয়, মাঝে মাঝে ঘটাতে দেখা যায়। পরে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় রোজকারের মত। সামান্য পরিশ্রমেই শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে সন্ধের পর সামান্য চলাফেরা অথবা কথা বলতেও যেন ইচ্ছে করে না।

আর এর সঙ্গে শুরু হয় আরও একটি উপসর্গ। মেজাজটা খিটখিটে হয়। একটা বিরক্ত ভাব, কেন কিছু ভাল না লাগা, অনেক সময় অকারণে রেগে ওঠা—এক একে এই সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে।

'হ্যাঁ, এ সব যখন চলতে থাকে তখন বুঝতে হবে, আপনার মস্তিষ্কের রক্ত-সংবহন তন্ত্র হয়তো ঠিকমত কাজ করছে না।' বলেছেন বিশিষ্ট সোভিয়েত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী অধ্যাপক এল, বাদালিয়ান। 'এর অর্থ, আপনার মস্তিষ্কের কোষকলার বিভিন্ন অংশে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত পৌঁছাতে বাধা পাচ্ছে। ফলে বিপাকীয় কাজকর্ম চালানোর জন্যে ওই সব কোষের যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন কোষগুলি ততটা অক্সিজেনের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়। মস্তিষ্ক কোষগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।'

অধ্যাপক এল, বাদালিয়ানের বক্তব্য, 'ঠিক এমন যখন অবস্থা, সত্যিকারের বিপদের সূত্রপাত হয় তখনই। গোড়ায় ব্যাপারগুলি চলে থেমে থেমে, কখনও-সখনও। তারপর হঠাৎ করে মাঝে মাঝে মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন (Cerebral blood circulation) ভীষণভাবে বাধা পেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কখনও ঝিমুনি, কখনও বা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়া। শরীর অবসন্নও হয়ে পড়তে পারে। তার সঙ্গে দৈহিক দুর্বলতা এবং সাময়িক বাক্‌শক্তিলোপ।'

ব্যাপার এই, মস্তিষ্কের রক্তসংবহন তন্ত্রের বিপরীত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল সামলে চলার ক্ষমতা কিন্তু অপরিসীম। সেখানকার নির্দিষ্ট রক্তবহনকারী সূক্ষ্ম নালিকাগুলি যখন কোষে কোষে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত পৌঁছে দিতে অক্ষম হয়, তখন বিকল্প ব্যবস্থা স্বরূপ আশপাশের আর রক্ত-বহনকারী নালিকাগুলির সাহায্যে ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা চলে। বিকল্প এই ব্যবস্থার সাহায্যে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাজ চালানো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সেটা আর পারা যায় না, বিপত্তি শুরু হয় তখনই। অস্থায়ী উপসর্গগুলি তখন হয়ে দাঁড়ায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এবং অবশেষে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত জীবনের অন্তিম মুহূর্তটি যে ঠিক কখন কিভাবে আবির্ভূত হয়, সে সব কথা অন্ধকারের মধ্যেই থেকে যায়।

✻

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমীক্ষা চালিয়ে এ পর্যন্ত যে তিনটি রোগকে দুরারোগ্য কালব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের প্রথমটি হৃদরোগ। দ্বিতীয় স্থান ক্যানসারের। এবং তৃতীয় সন্ন্যাসরোগ বা ইংরেজীতে যাকে বলা হয়, 'অ্যাপোপ্লেকটিক স্ট্রোকস'। এ সব রোগ যে একদিনেই হঠাৎ করে শরীরের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে, তা নয়। জীবনের কোন না কোন এক সময়ে বিভিন্ন কারণে এরা অংকুরিত হয়। অনেক সময় খুব কম বয়েসেও হতে পারে। অবশেষে অংকুর যখন ক্রমে পল্লবিত হয়, রোগের এক-একটি উপসর্গ একে একে ধরা পড়ে।

এই ধরা পড়ার ব্যাপারটা অনেক সময় দেরিতেও ঘটতে পারে। 'যেমন ধরুন, কারোর কারোর মন্তব্য, 'তিরিশ বছর বয়সেই কারোর শরীরে হয়তো ক্যানসার রোগ দানা বাঁধতে শুরু করল। অথচ ওই রোগের যন্ত্রণা বলতে যা বোঝায় পরবর্তী তিরিশ বছরের মধ্যে হয়ত তার কিছুই বোঝা গেল না। তারপর হঠাৎ পরিণত বয়সে ক্যানসারের

লক্ষণগুলি দ্রুত একে একে প্রকাশ পেতে শুরু করল। বেশির ভাগ সময় দেখা যায় রোগটি তখন অনেক দূরে গড়িয়ে গেছে। হয়তো বা চিকিৎসার বাইরেই চলে গেছে।'

ব্যাপার এই, সচরাচর একটি নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পরই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। ক্যানসারের ক্ষেত্রে এই বয়সটিকে বলা হয় 'ক্যানসার রোগের বয়েস।' এবং এইভাবে নামকরণ হয়েছে 'হৃদরোগের বয়েস' বা 'এজ অব কার্ডিয়াক ডিজিজেস।' অথবা ধরুন 'অ্যাপোপ্লেকটিস এজ' বা সন্ন্যাস রোগের বয়েস। বেশির ভাগ সময় এসব রোগের সূত্রপাত তরুণ বয়েসেই ঘটে থাকে। কিন্তু এদের লক্ষণ এবং কষ্টকর উপসর্গগুলি প্রকাশ পায় কিছুটা পরিণত বয়েসে। যখন কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় বা প্রতিরোধের চেষ্টা বৃথা হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসকের নাগালের বাইরে চলে যায়। অবশ্য বিশেষ বিশেষ রোগীর বেলায় অনেক সময় কম বয়েসেও এসব রোগ মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

*

কাঞ্চার কারের মতে সন্ন্যাস বংশগত রোগ। বংশগত সূত্রে কেউ কেউ হয়তো বিপাকীয় ত্রুটি নিয়েই জন্মায়। যা শেষ পর্যন্ত শরীরের কোন কোন জৈব-রাসায়নিক কাজকর্ম অস্বাভাবিক করে তোলে। ফলে মস্তিষ্কের রক্ত সংবহনকারী নালিকাগুলি কখনও বা অনমনীয় হয়ে পড়ে। কখনও এইসব নালিকার ছিদ্রপথ সংকীর্ণ করে তোলার দরুন মস্তিষ্কের কোষে কোষে রক্তের সাবলীল চলাফেরা ব্যাহত হয়।

এ ছাড়াও আরও কিছু কিছু ব্যাপার সন্ন্যাস রোগ সৃষ্টির ব্যাপারে সাহায্য করে। যেমন ধরুন, নিয়মিত দূষিত বাতাস গ্রহণ করার দরুন মস্তিষ্ক কোষ উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন পেতে বঞ্চিত হতে পারে। অতিরিক্ত ধূমপান এবং মদ্যপান, খুব বেশী খাওয়াদাওয়া অথবা নির্দিষ্ট অসময়ে খাদ্যগ্রহণও সন্ন্যাস রোগের অন্যতম কারণ। একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দৈহিক ওজন যাঁদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী তাঁদের মধ্যেই এই রোগটির প্রাদুর্ভাব সবচাইতে বেশী দেখা যায়।

'তবু', অধ্যাপক এল কার্লিয়ন-এর বক্তব্য, 'ধূমপান, মদ্যপান অথবা অতিরিক্ত ভোজন, এসব ছাড়াও সন্ন্যাস রোগের প্রকোপে বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে সবচাইতে বেশী কাজ করে অতিরিক্ত মানসিক চাপ। অথবা বলতে পারেন মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়।'

প্রশ্ন এই, যান্ত্রিক জীবনের সঙ্গে মানসিক বৈষম্য এখন যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে। ফলে তৃপ্তি নিয়ে কাজ করার মত ক্ষমতা ক্রমেই আমরা হারিয়ে ফেলছি। এ সব ব্যাপার নিয়ে বিশেষজ্ঞরা অবশ্য নানাভাবে চিন্তা করছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলছেন, অতিরিক্ত পরিশ্রম কমান দরকার। সেই সঙ্গে দরকার জীবনের চালচলনের মধ্যে [illegible] মধ্যে একটা শিথিলভাব টেনে [illegible] বিশ্রাম নিন। সব সময় এটা-ওটার পেছনে না দৌড়ে থিতিয়ে বসুন। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'রিলাকস' করা। এই রিলাকসেসন এবং কাজের মধ্যে সমন্বয় আনা দরকার।

তা না-হয় হল। কিন্তু এই সঙ্গে আরও তো একটি প্রশ্ন থেকে যায়! যেমন ধরুন, কেউ কেউ মনে করেন অতিরিক্ত পরিশ্রম মানসিক অথবা স্নায়বিক দৌর্বল্য ডেকে আনে। প্রশ্ন এই, সত্যিই কি তাই? কারণ, যে সব কাজ করতে কারোর ভাল লাগে, যে সব কাজের মধ্যে একটা সংযত পরিকল্পনা থাকে, দেখা গেছে তেমন ধরনের কোন কাজ যত বেশীই মানুষ করুক না কেন, তাতে ক্লান্তি তো আসেই না, বরং ওটাই মন এবং শরীরের পক্ষে অনেক বেশী উপকারী।

বরং দেখা যায়, ইচ্ছের বিরুদ্ধে মানুষকে যখন কতকগুলি ছকে বাঁধা কাজ দিনের পর দিন করে যেতে হয়, অথবা এমন কিছু কাজ যা মোটেই তার [illegible] না, বিপত্তি দেখা দেয় তখনই। এলোমেলোভাবে কাজ করা, বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করা, অথবা একই সঙ্গে এমন সব কাজ করে যাওয়া, যে সব কাজের মধ্যে কোনটির সঙ্গে কোনটির সম্পর্ক থাকে না, [illegible] কাজে পরস্পরবিরোধী মানসিকতা নিয়ে কাজ করে, বলা বাহুল্য, সে ধরনের কাজ শরীরের স্নায়বিক তন্ত্রের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। যা শেষ পর্যন্ত শুধু যে সাধারণ শারীরবৃত্তীয় ঘটনাবলীর মধ্যেই অস্বাভাবিকতা ডেকে আনে তা নয়, শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের রক্তসংবহন তন্ত্রকে বিকল করতে শুরু করে। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, হুজুগেপ্রবণতা অথবা তড়িঘড়ি কাজ করার

চেষ্টা, এ সবই ওর রক্তসংবহনের ত্রুটি আরও বাড়িয়ে তোলে।

সন্ন্যাস রোগ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে **প্রাথমিক যে কয়েকটি দিকের ওপর দৃষ্টি রাখা দরকার** সেগুলি **: এক,** অহেতুক দুশ্চিন্তা বাড়াবেন না। **দুই,** বিশ্রাম করুন, কিন্তু ওই সময় এমন কিছু করবেন না বা ভাববেন না, যাতে করে আপনার মন বিক্ষিপ্ত হতে পারে। **তিন,** প্রাত্যহিক খাবারের সময়টিকে অবহেলা করবেন না এবং আপনার খাদ্যতালিকা এমনভাবে তৈরি করুন, যা খেলে আপনার স্বাভাবিক পুষ্টি বজায় থাকে, শরীরের ওজন না বাড়ে। **চার** কথাবার্তায় বা কাজকর্মে কোন সময়েই উত্তেজিত যাতে না হন, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। **পাঁচ,** আপনার প্রাত্যহিক কাজের একটি রুটিন করুন, কখন কি-ভাবে ওই সব কাজ আপনাকে করতে হবে সে ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছকে নিন এবং চেষ্টা করুন যাতে করে ওই ছক অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, যে কাজ করতে আপনার ভাল লাগছে না, সম্ভব হলে সাময়িকভাবে সেই কাজটিকে বর্জন করুন। মনে রাখা দরকার, সেই কাজটির চেয়ে আপনার জীবনের দাম অনেক বেশী। সে কাজ আর কেউ করে দিতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় বস্তুটি দেবার ক্ষমতা কারোর নেই। **ছয়,** নিয়মিত মাথা ধরা, ক্লান্তি, বিরক্তভাব এসব দেখা দিলে, আপনার উচিত কোন নিউরোলজিস্ট-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা, তাঁর পরামর্শ বা সাহায্য নেওয়া। কারণ, মস্তিষ্কের রক্তসংবহনজনিত ত্রুটির ব্যাপারে ইতিমধ্যে নানা রকম চিকিৎসা পদ্ধতি বের হয়েছে। গোড়ায় তাদের সাহায্য নিলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সন্ন্যাস রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্যে দরকার, **এক,** অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম যতটা সম্ভব কমান, **দুই,** মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মরণে

গত ১০ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরের **বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা** পত্রিকা সংস্থা বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মরণে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন যোগেন্দ্রনারায়ণ মিলনী হলে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমণীশ ঘটক এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ময়মনসিংহের শ্রীশৈলেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী। শ্রীঘটক এবং শ্রীআচার্য চৌধুরী পরলোকগত বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ 'বোস সংখ্যায়ন'-এর বিষয়বস্তু প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেন। 'শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ' সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সম্পাদক শ্রীঅলোক সেন এবং শ্রীবিমল বসু এই পত্রিকাটির প্রকাশনার ব্যাপারে কিভাবে আচার্য উৎসাহ যুগিয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন। এই উপলক্ষে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সত্যেন্দ্রনাথ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, যার পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। শহর কলকাতার বাইরে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা-গোষ্ঠী বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে রীতিমত একক চেষ্টায় ইতিমধ্যে যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, অনেকের কাছেই সেটা হয়তো অনুকরণীয় হতে পারে।

সংবাদ

সম্প্রতি **ইন্ডিয়ান ফিজিকস অ্যাসোসিয়েশন (ক্যালকাটা চ্যাপটার)-এর নতুন** কার্যসমিতি পুনর্গঠিত **হল। নতুন এই** কার্যসমিতির **সভাপতি এবং সহ-সভাপতি** নির্বাচিত **হয়েছেন যথাক্রমে ডঃ জয়ন্ত** বসু এবং **ডঃ নকুলচন্দ্র দাস। সম্পাদক ডঃ** সুপ্রকাশচন্দ্র রায়, **কোষাধ্যক্ষ ডঃ সুবিমল** সেন। সদস্যবৃন্দ ডঃ **রাজকুমার** মৈত্র, অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন নাগ, **ডঃ রমেন** কর, ডঃ সুখেন্দুবিকাশ **বন্দ্যোপাধ্যায়** এবং ডঃ প্রশান্ত রুদ্র।

আমরা আশা করব, **নবগঠিত কার্য**-সমিতি **সর্বস্তরের** পদার্থ **বিজ্ঞান পঠন**-পাঠন এবং **গবেষণার ব্যাপারে নতুনভাবে** আলোকপাত **করার চেষ্টা করবেন।**

সমরজিৎ কর
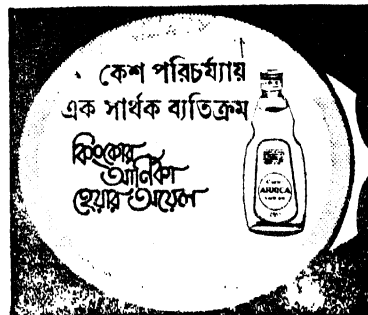
আপনার শ্রেষ্ঠত্ব
ফুটিয়ে তোলে
নতুন ধারার
DCM 'টেরিন' স্যুটিংস্
mcm/dcm/918

গণতন্ত্রে নারী

ফেব্রুয়ারী ১২ থেকে ২৬ ছিল নির্বাচন পক্ষ। চারটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত পণ্ডিচেরীর ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। কিছু কিছু ফলের খবর এসেছে, কিন্তু আমি যখন লিখছি বসে তখন ফলের সবটুকু জানা যায়নি। আমাদের উদ্দেশ্য এই নির্বাচনে মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা। গণতন্ত্রের প্রথম যুগে শাসনব্যবস্থায় মেয়েদের অধিকার এতটুকুও ছিল না। খ্রীষ্ট-জন্মের পাঁচশ' বছরেরও বেশী আগে গ্রীস দেশের নগরগুলির সরকার ছিল গণতন্ত্রভিত্তিক। গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসী শব্দটির জন্মও সেখানে। Demos মানে people বা জনতা আর Kratein মানে শাসন বা rule। Democracy-র বর্তমান অর্থে সেগুলিও অসম্পূর্ণ ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শহরের সরকারী ব্যবস্থার অংশীদার ছিলেন, কিন্তু অগণিত দাস বা কেনা গোলাম যারা শহরের সব শ্রমসাধ্য ক্লান্তিকর কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে দিত, তাদের কোন স্থান শাসনব্যবস্থায় ছিল না সে সময়। তার চেয়ে বড় কথা, মেয়েদের কোন হাতই ছিল না কোথাও। দাস সমাজ হোক আর স্বাধীন নাগরিক সমাজ হোক, মেয়েরা ছিল প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থার বাইরে।

ডেমোক্রেসির সেই আদিম যুগের শহরের জনসংখ্যা ছিল অল্প। একত্র হয়ে আইন-কানুন আলোচনা সম্ভব ছিল। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা বাড়তে লাগলো। কাজেই সরাসরি সবার একত্র হয়ে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। সেই থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের আরম্ভ। প্রতিনিধি হবে সাধারণের আস্থাভাজন। সাধারণ নাগরিক তাই নির্বাচন করে নেবেন যাঁকে তাঁরা বিশ্বাস করেন। সেই রীতিই মোটামুটি বজায় আছে।

গ্রীক শহরভিত্তিক গণতন্ত্র বেশী দিন বজায় ছিল না। কারণ, গণতন্ত্রের নামে বহু অন্যায় আচরণ আরম্ভ হয়েছিল। যে দল শক্তিশালী হতো তারা দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের সুবিধা করে নিতে ব্যস্ত হতেন। আশেপাশের দেশগুলি সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিন্তু গণতন্ত্র আদর্শ হিসাবে রয়ে গেছে এবং যুগযুগান্ত পরে এ আদর্শ কতশত শাসনবিধির বাধা-বিপত্তির প্রলয় পার হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। রাজতন্ত্র তো বটেই, নতুন নতুন সর্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন একনায়ক মাথা তুলেছেন। Fuehrer আর Duce এসেছেন, কিন্তু তবু গণতন্ত্র অনেক অসুবিধা ও ত্রুটি সত্ত্বেও টিঁকে আছে।

অনেকের মতে, রাজনীতির সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে গণতন্ত্র। সেই প্রেরণাতেই এব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বলেছিলেন,

"We here highly resolve......the Govt. of the people, by the people for the people, shall not perish from the earth."

আমরা এখানে দৃঢ়সঙ্কল্প করছি......জনসাধারণের শাসন, তাদের নিজেদের নিয়ে গঠিত শাসনব্যবস্থা এবং তাদের জনাই গঠিত শাসন কাঠামো পৃথিবী থেকে চলে যাবে না।

এত সব সত্ত্বেও পৃথিবীর তথাকথিত উন্নত দেশে মেয়েদের ভোটাধিকার এসেছে অনেক কষ্টের ফলে। এখনও কোন কোন স্থানে অধিকার নেই। আমাদের ভোটাধিকার সে ব্যাপারে উদারতম। সে অধিকার ভারতীয় মেয়েরা সযত্নে রক্ষা করছেন বলেই মনে হয়। সাম্প্রতিক নির্বাচনের সব খবরের সঙ্গে মেয়েরা কেমন দল বেঁধে নির্বাচন-কেন্দ্রে গেছেন তারও কথা খবরের কাগজে, রেডিওতে সর্বত্র ফলাও করে বলা হয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা

বিজয়িনী নন্দিনী সৎপথি

কতটা আর কতটা বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ দিয়ে উৎসবের আনন্দ করার মত বাসনা, বলা কঠিন। আর হবেই বা না কেন। পেট্রল অগ্নিমূল্য, রেলের ভাড়া সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, যানবাহনে বেড়ানোর আনন্দ সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে। ভোটের দিনে সেজেগুজে দলে দলে কেন্দ্রে যাওয়া হয়তো বা মহিলা সমাজের

কাছে মন্দ লাগে না। সে তুলনায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সব রাজনৈতিক দলেই কম। নতুন কেউ যেন আর আসছেনই না। এর কারণ কি? এমন কি যুবসমাজের তরফ থেকেও মহিলাদের কেউ তেমন আগ্রহী নন মনে হয়। একবার শ্রীমতী নন্দিনী সৎপাথিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন মেয়েরা রাজনীতিতে তেমন ব্যাপকভাবে নামছেন না। তিনি বলেছিলেন যে, রাজনীতির ক্ষেত্র এখন বেশ পরিশ্রম ও মনোযোগের ক্ষেত্র। যে মেয়ে সম্পূর্ণভাবে সে ভূমিকায় নামতে পারবে সে-ই আজকের রাজনীতিতে স্থান পাবে। তবে কি তেমন সময় ও মনোযোগ মেয়েরা দিতে পারেন না? না, কুটিল রাজনীতির কঠিন পথ তাঁরা এড়িয়ে যেতেই চান? তাই কি নির্বাচন অভিযানের ফেস্টুন আর পতাকার মত কেন্দ্রের শোভাবর্ধন তাঁদের ভূমিকা হয়েছে? আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করার মত। পল্লী অঞ্চলে মহিলা ভোটার বেশী আসেন। তাঁরা কতটা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হন জানা কঠিন।

আমাদের রেডিও, খবরের কাগজ অনেক দিন থেকে নির্বাচনের সংবাদ ও তার

সমীক্ষা নিয়ে উত্তেজনায় টইটম্বুর। নানা মত এবং বিচারের খবরে ছাপাছাপি অবস্থা। কিন্তু সাধারণ ভোটদাতাকে নির্দেশ দেবার অর্থাৎ তাদের শিক্ষিত করে তোলার কোন আয়োজন নেই। যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোট, সেখানে এই শিক্ষার অনেক দাম। মহিলা ভোটারদের ব্যাপারে এ শিক্ষাদানের মূল্য বিচার করার প্রশ্ন ওঠে না। পার্টির প্রচারের প্রভাব অথবা অন্যের মতবাদের বা সুবিধাবাদিতার প্রভাব মেয়েরা তা হলে সহজে অতিক্রম করতে পারবেন।

নির্বাচনের হিড়িকের প্রভুশক্তি যাতে ভোটদাত্রীকে কাবু না করে তাও এই শিক্ষাদানের বিষয় হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের গলদ এখানে। এই গলদ আজকের না। তাও চলে আসছে বহুদিন থেকে। কোথাও বেশী, কোথাও কম। চার্লস ডিকেন্সের Pickwick Papers-এ Eatanswill-এর নির্বাচনের হাস্যকর বর্ণনা থেকে আন্দাজ করা যায় ভোটরঙ্গ কোন দিনই নিছক

কাল যে শত্রু ছিল, আজ সে মিত্র হতে পারে যদি সে কাজে ও কথায় প্রতিশোধ-পরায়ণতা প্রত্যাহার করে।

—বলেছেন মহাত্মা গান্ধী।

যিনি একটি জাতির সংবাদ সৃষ্টি করতে পারেন তিনি মহামানব। তার পরেই স্থান তাঁর যিনি যে সংবাদ কলঙ্কিত করে তোলেন! —বলেছেন জোসুয়া রেনল্ডস।

আদর্শের মধ্যে অবশ্য থাকেনি। গোপন ভোটদান চালু হবার আগে নাকি প্রার্থীরা প্রকাশ্যে ঘুষ দিয়ে ভোট ক্রয় করতেন। অবশ্য গোপন ভোটদানের পরেও যে নানাভাবে প্রার্থীর ভোট সংগ্রহ করা হয় একথা অস্বীকার কেউ করতে পারেন না। ১৬৯৭—১৭৬৪ সালে এনগ্রেভ করা উইলিয়ম হোগার্থ নামক শিল্পীর ছবিতে তদানীন্তন পরিবেশটিকে কেমন করে ভোটদাতাদের ভয় দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে, পান-ভোজন অপর্যাপ্ত করে ভোট নেওয়া হতো তার নমুনা পাওয়া যায়। একদিকে পান-ভোজন চলছে, শিষ্টাচারের বন্যা বইছে, অন্য দিকে সেই আসরে পাথর ছুঁড়ছে বিপক্ষ। আজও আইন করে এসব আটকানো যায় না। তাই বলছিলাম, ভোট যে দেবে তার মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করার মত শক্তি সংগ্রহে সহায়তা করা সমাজের কর্তব্য। সেখানে মেয়েদের ভূমিকা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আদর্শ বজায় থাকলেও গণতন্ত্র সার্থক না হলে তার মূল উদ্দেশ্যই বিফল।

শ্রীমতী

বৎসর দর্পণ

গত এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা কবিতা থেকে বেছে নিয়ে আলাদা একটি সংকলন প্রকাশ করার ব্যাপারটা বেশ কজের। এ রকম প্রচেষ্টা বিভিন্নভাবে বেশ কয়েকবার হয়েছে। কিছুকাল আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও এক বৎসরের সংকলনটি সম্পাদনা করেছিলেন। গত দু'বছর ধরে মনীন্দ্র গুপ্ত ও রঞ্জিত সিংহ ব্যাপারটা খুব সুষ্ঠুভাবে করে আস ছেন। পরপর দু' বছর যে প্রায় সঠিক সময়েই সংকলনটি বার করতে পেরেছেন সেটা একটা কম কথা নয়।

দু' বছরেই অবশ্য এদের সংকলনের একটা বিরাট ত্রুটি এই যে, এরা বাংলাদেশে প্রকাশিত কোনো কবিতা গ্রহণ করেন নি। আমার ধারণায় মনে হয়, পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের সাহিত্যকে আলাদা করে রাখা অত্যন্ত ক্ষতিকর ব্যাপার হচ্ছে। এ সম্পর্কে অন্যতম সম্পাদক অবশ্য আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, যেহেতু বাংলাদেশের সকল পত্র পত্রিকা পাওয়া দুষ্কর, ভুল বিচার বা আংশিক বিচারের আশংকায় তাঁরা ওখানকার কবিতা নিতে পারেন নি। বাংলাদেশের অনেক প্রখ্যাত কবির রচনা প্রকাশিত হয় নানা দৈনিক পত্রিকায়, সেগুলি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবু, আগামী বৎসরে তাঁরা এ জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

পশ্চিমবাংলায় বহু সংখ্যক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় দাবি করেছেন যে, এঁরা সেই সমস্ত পত্র পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেছেন এবং নামী অনামীর বিচার না করে শুধু ভাল কবিতার সন্ধান করেছেন।

এঁরা যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, সেটা রীতিমত রোমহর্ষক এবং ইতিহাসে স্থান পাবার মতন। এরা পেয়েছেন মোট ১৬৩টি পত্রিকা তার মধ্যে ১২৮ খানিই সম্পূর্ণত কবিতার বা মূলত কবিতা-আশ্রয়ী। এর থেকেই বোঝা যায়, এদেশে কবিতার কি প্রাবল্য চলেছে। কেন চলেছে, তা কে জানে! এবং এদের পত্রিকার তালিকাও যে সম্পূর্ণ নয়, তা আমি একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারি। দু' দশটা বাদ গেছেই। এই সব পত্র পত্রিকার মধ্যে এঁরা খুঁজে পেয়েছেন প্রায় সাত শোর মতন কবি, এবং আরও শ' দুইকে এরা কবিতার শিক্ষানবিশ আখ্যা দিয়েছেন। এক যুগে, এক কালে সাত শো কবি? মনে হচ্ছে, জীবনানন্দর সেই উক্তি, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'—এঁরা বিশ্বাস করেন না।

ওই সব কবিদের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কবিতা এঁরা পাঠ করেছেন। এর মধ্যে এঁরা সংকলনে স্থান দিয়েছেন সাতানব্বই জন

কবির প্রায় পৌনে তিনশো কবিতা। না, এর মধ্যে সবগুলিকেই কবিতা বলা যায় না। আজকাল ভাঙা ছন্দে, চালাক-চালাক বা ধোঁয়াটে লাইন সমন্বিত এক প্রকার কবিতার প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে। সেই প্যাটার্নটি অনুকরণ করা খুব একটা শক্ত নয়—সুতরাং অনেকেই খুব সহজে কবি হয়ে যায়। সেই রকম সহজ কবির সংখ্যা এই সংকলনে কম নয়। সেইসব লাইন তুলে এখানে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারছি না, কারণ আমার হৃদয় কোমল, চট্ করে কারুর মনে আঘাত দিতে ইচ্ছে করে না আমার।

তবু এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭৩-এর মূল্য এই যে এই সংকলনখানি ওল্টালে গত এক বছরের পশ্চিম-বাংলার কবিতা-প্রকৃতির একটি দর্পণ পাওয়া যায়। একে খানিকটা সমাজ দর্পণও বলা যায়। এবং সেই সঙ্গে বেশ কিছু ভালো কবিতা পাঠেরও যে স্বাদ পাওয়া যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কয়েকজন তরুণ বা অতি তরুণের কবিতা বিস্ময়কর রকমের চমকপ্রদ এবং পাকা। যেমন আমার বিশেষ ভালো লেগেছে বীতশোক ভট্টাচার্য, শ্যামল-কান্তি দাশ, রণজিৎ দাশ বা অনিন্দ্য রায়ের রচনা। অপরপক্ষে যে-কয়েকজন উল্লেখ-যোগ্য কবির অনুপস্থিতি এখানে লক্ষ্য করা গেল, তার মধ্যে ফণিভূষণ আচার্য অন্যতম। সংকলনটি বিশেষ ভাবে সংগ্রহযোগ্য।

প্রেমের কবিতা

কিছুকাল আগে আমরা এই বিভাগে মন্তব্য করেছিলাম যে আজকাল বাংলায় প্রেমের কবিতা প্রায় লেখাই হয় না। গত বছর অনেকগুলি শারদীয় সংখ্যায় আমরা একটাও প্রেমের কবিতা খুঁজে পাই নি। সম্প্রতি হাতে এলো শান্তনু দাস সম্পাদিত গঙ্গোত্রী পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা, যেটাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রেম সংখ্যা। এতে তরুণ এবং তেমন তরুণ নয় এমন সব কবিদের নির্ভেজাল কবিতা ছাপা হয়েছে। এই সব কবি অন্যান্য পত্র পত্রিকায় প্রেমের কবিতা না লিখে শুধু এই পত্রিকাতেই লিখলেন, এতে মনে হতে পারে কিছু কিছু লেখা অর্ডারি। তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতি হয়নি, প্রেমের কবিতা নিছক অর্ডারি হতেই পারে না—বুকের মধ্যে ছিলই এই সব। একটু ডাক শুনেই বেরিয়ে এসেছে। উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের প্রবন্ধ 'প্রেম: রবীন্দ্রক ও রবীন্দ্রোত্তর', কয়েকটি বিদেশী প্রেমের কবিতার অনুবাদ, চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়ের 'কীটসের প্রণয়নী' প্রভৃতি আলোচনা সংখ্যাটির মূল্য বাড়িয়েছে। এই পত্রিকার অলংকরণের খ্যাতি তো আছেই, এই সংখ্যায় আছে শিল্পী সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কয়েকটি মূল্যবান ছবি।

প্রেমের কবিতার আলোচনার চেয়ে উপভোগ করাই শ্রেয়। আমি কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি:

যতোবার মুখ নামিয়েছি তোমার স্তনের ওপর
তুমি কি কোনোদিনই শোনো নি
ফৈয়াজ খাঁর নাভীমূলের নিনাদ
তোমার শরীরে কেবলি বুনো জানোয়ারের
থাবার দাগ
(মণীন্দ্র রায়)

তুমি ঠিক চাঁদ নও, চাঁদের মতনও কিছু নয়
ভালোবাসা থেকে তুমি বহু দূরে, বহু দূরে,
নিচু
সেখানে একাকী তুমি থেকো চিরদিন—
এই-ই চাই
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

পৌষের দেহের গাঁজ পৃথিবীর ইতর যৌবন
যেন
ভেবে নাও, মাত্র রসভাঁড়
মাত্র পান-পাত্র ভেবো হেলায়, ফেলায়।
মুঠোয় কোমর তার?
(কবিতা সিংহ)

সন্ন্যাসীর দেহ থেকে শেষ কর্পূরটুকু
উড়ে যায়
(রত্নেশ্বর হাজরা)

আমি এখন
ভালোবাসার বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসি...
(সুভদ্রা ভট্টাচার্য)

সনাতন পাঠক

নতুন!
সলু-রিসর্সিনল
এবার থেকে এই আনকোরা
নতুন বাক্সে পাবেন।
খুস্কি, মরামাস ও চুল-ওঠার
অব্যর্থ হেয়ার টনিক
২৬ বছর ধরে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হেয়ার টনিক সলু-রিসর্সিনল এবার থেকে এই ঝকঝকে নতুন, পিলফার-প্রুফ বাক্সে পাওয়া যাবে।
'রিসর্সিন'-যুক্ত হেয়ার টনিক সলু-রিসর্সিনল চার ভাবে কাজ করে:
● সলু-রিসর্সিনল খুস্কি ও মরামাস চিরতরে নির্মূল করে।
● সলু-রিসর্সিনল চুলের গোড়া সতেজ ও পরিপুষ্ট করে তোলায় চুলের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায় ও নতুন চুল গজায়।
● সলু-রিসর্সিনল চুল-ওঠা, অকালে টাকপড়া, ব্রণ ইত্যাদি নিবারণ করে।
● সলু-রিসর্সিনল চুলকে সুন্দর ও কমনীয় করে তোলে।
চুল সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকলে
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।
সব ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।
সলু-রিসর্সিনল আগের দামেই পাবেন
পাস্তুর ল্যাবরেটরীজ প্রাইভেট লিমিটেড
২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬
SOLU-
RESORCINOL
A SOLUTION OF RESORCIN
AN IDEAL
HAIR TONIC
PASTEUR LABORATORIES PRIVATE LTD.

পঙ্কজকুমারের আত্মজীবনী প্রসঙ্গে

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালের 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা বিভাগে আমাদের বন্ধুবর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়, বন্ধুবর পঙ্কজকুমারের 'আত্মজীবনী' প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তারই সূত্র ধরে আমার এ পত্রের অবতারণা।

বন্ধুবর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন যে, আমার ছদ্মনামী 'জাতিস্মরের শিল্পলোকে' আমি লিখেছি যে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটির মূল সুরকার হচ্ছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং সেই থেকে লোকমুখে এ সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। আমার আত্মজীবনী লেখার সময় এ প্রশ্ন যদিচ আমার মনে ওঠে কিন্তু বীরেনবাবুর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলে এ প্রশ্নের সমাধান তখনি হয়ে যায়।(বীরেন বাবু নিজ কণ্ঠে গেয়ে রেডিওতে আমাদের একদিন শোনান তাই প্রশ্ন উঠেছিল) কাজেই এ সম্বন্ধে আমি কোনো কিছুই আমার জাতিস্মরের শিল্পলোকে প্রকাশিত করিনি। বরং নবকল্লোল ১৩৬৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পঙ্কজবাবুর সম্বন্ধে জাতিস্মরের শিল্পলোকে লিখিত হয়—"আজ শিল্পী শিল্পীর শিল্প-চাতুর্য চুরি করেন। পঙ্কজবাবুকেও এ নিদারুণ ব্যথা পেতে হয়েছে। বহু গানের বহু সুর সৃষ্টি করে তাঁকে অপরের বেদিতে সে সুরগুলিকে বলি দিতে হয়েছে' সেদিনের সে ব্যথা তাঁর সারা মন-প্রাণে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে সে অগ্নিও জ্বলনি' ইত্যাদি। কাজেই বীরেনবাবুর এই কল্পনাপ্রসূত সূত্র নিয়ে যেমন তিনি অস্বস্তি ভোগ করেছিলেন, তেমনি বীরেনবাবুর কাল্পনিক অস্বস্তিতে আমিও অস্বস্তি অনুভব করছি।

'মুক্তি ছবিখানি' মুক্তি লাভ করলে 'দিনের শেষে'র স্বরলিপি বেতার জগতে শ্রীযুত পঙ্কজকুমারের নামেই প্রকাশিত হয় —তখন কবি রবীন্দ্রনাথ জীবিত। কাজেই যে গান সেই যুগে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের, এমন কি স্বয়ং কবিকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছিল সেই গানখানির সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা—কোনো যুক্তিই ওঠে না বা ওঠা উচিত নয়।

বন্ধুবর বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মতানুযায়ী আমিও বিশ্বাস করি পঙ্কজবাবু মূল সুরের উৎস যেখান থেকেই সংগ্রহ করুন না কেন—এ গান তাঁরই কণ্ঠমাধুর্যে আজ বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত।

পঙ্কজবাবু আমারও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি আপন শিল্প-চাতুর্যে স্বপ্রকাশিত হয়ে আমাদের মধ্যে 'মধ্যমণি' হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন বলে আমি অন্তরে গর্বিত অনুভব করি। এইসব সামান্য কারণ যেন আমাদের আজীবনের বন্ধুত্ব জীবন সীমানায় দাঁড়িয়ে না ভেঙে যায়, শুধু পারিপার্শ্বিকের

অবান্তর আলোচনায়! তাই এ চিঠি দিতে বাধ্য হলাম।

হীরেন বসু (পঞ্চবর্ষী)
কলকাতা-১৯

সৈয়দদা-র স্নেহ

বোলপুর-শান্তিনিকেতনে সংবাদপত্র-এজেন্টরূপে আমার পরিচয়। সেই সূত্রেই সৈয়দ মুজতবা আলীর কাছাকাছি যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন তিনি থাকতেন শান্তিনিকেতনের উত্তর-প্রান্তে শ্মশানের ধারে। পরিহাস করে তাঁর রাস্তার নাম দিয়েছিলেন 'মহানির্বাণ রোড,' বলতেন "এখানে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তাহলে এই শ্মশানেই যেন স্থান হয় আমার।" আমাদের হকারের ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হওয়ায় একদিন আমাকে যেতে হয়েছিল তাঁর কাছে। সেই আলাপ ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়ায়। বিকেলের দিকে তাঁর বাসায় যেতাম—শোনাতেন নানা দেশ-বিদেশের গল্প, তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা। শান্তিনিকতনের 'সৈয়দদা' তখন থেকে আমার-ও 'সৈয়দদা' হয়ে গেলেন।

এর কিছুকাল পর বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর নিয়ে সৈয়দদা বোলপুরে নিচুপট্টিতে বাসা নিলেন, ফলে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আরও বাড়লো। তিনি একাকীই থাকতেন। তাঁর সেই নিঃসঙ্গ জীবনে আমরা কিছুটা সঙ্গ দিতে পেরেছিলাম বলে আজ ধন্য মনে হচ্ছে আমরা সাহিত্যরসিক পণ্ডিত নই—কিন্তু তার জন্যে সৈয়দদা আমাদের অবজ্ঞা করতেন না। আমাদের সঙ্গে গল্প করার সময় আমাদের পর্যায়ে নেমে আসতেন তিনি—সে ক্ষমতা তাঁর ছিল। মাঝে মাঝে দেখতাম কলকাতা থেকে তাঁর কাছে আড্ডা দেবার লোভে এসেছেন শ্রীসাগরময় ঘোষ শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ শ্রীফণী দেব প্রমুখ। তাঁদের পেয়ে সৈয়দদার সে কি আনন্দ! অতিথিরা চলে গেলে আমাদের কাছে তাঁর আনন্দের ভাবটা প্রকাশ করতেন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। সেই ৬৭-৬৮ সালে তাঁর লেখা অনেকগুলো ছোট চিঠি আর চিরকুট এখনো আমার কাছে রয়ে গেছে।

আর রয়েছে, অতি সাম্প্রতিকালে তাঁর লেখা কিছু চিঠি—গত জানুয়ারি মাসেও সৈয়দদা দু'খানি চিঠি লিখেছেন আমাকে ঢাকা থেকে। ১১ জানুয়ারি লিখছেন—"ভাই অনিল, আমার অসুস্থতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে সর্বপ্রথম তুমিই চিঠি লিখেছ। সেজন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ * * *" এর পর লিখেছেন তাঁর অসুখের

বিবরণ, আমেরিকান ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকার কথা, জানিয়েছেন "মাঝে মাঝে মনে হয় অবস্থা একটু ভালোর দিকে।' সর্বশেষ যে-চিঠি পেয়েছি তা ৩০ জানুয়ারি লেখা। তাঁর অসুস্থতার খবর জেনে ঢাকা যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে লিখেছিলাম তাঁকে। সৈয়দদা তার উত্তরে লিখছেন—"তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি এখানে আসতে চাও জানতে পেরে আমি খুব খুশী হয়েছি। * *" তারপর লিখেছেন ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সমস্যা থাকলে তা তিনি সমাধান করে দেবেন।

কিন্তু ওই চিঠির উত্তর লেখার আগেই পেলাম তাঁর মৃত্যুর খবর। ঢাকা গিয়ে তাঁকে শেষবারের মতো দেখে আসার সাধ আমার অপূর্ণ থেকে গেল। এখন ওই চিঠিগুলিই সৈয়দদার স্নেহের স্মৃতি হিসেবে আমি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার মত সামান্য ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে যে-স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি তা আমার সারাজীবনের পাথেয় স্বরূপ। পরলোকে তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক—এই কামনা-ই করি।

অনিলকুমার দাস
বোলপুর।

সৈয়দ মুজতবা আলী

যে কয়জন মুষ্টিমেয় বাঙালী লেখককে দেখার আমার ভীষণ দুর্বলতা ছিল, মুজতবা আলী তার মধ্যে অন্যতম। আমার দুর্ভাগ্যবশত সে সৌভাগ্য কখনও হয়নি। তাঁর সঙ্গে একবার একটি চিঠি বিনিময় হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে যখন আমি জঙ্গীপুরে পোস্টেড ছিলাম, তখনকার লেখা চিঠি। সেটি এই সঙ্গে উদ্ধৃত করলাম।

নিচাপট্টী, পোঃ বোলপুর
৩১।৫।৬৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনারা আমার লেখা চেয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। স্বর্গত সতীনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে সর্বপ্রচেষ্টার সঙ্গে নিজকে সংযুক্ত করতে পারলে নিজকে গর্বিত মনে করবো।

দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকদিন যাবত আমার দক্ষিণ বাহুমূলে আর্থ্রাইটিস দেখা দিয়েছে। ইনি আমার প্রাচীন দিনের নর্ম সহচর না হয়ে ধর্ম সহচর, এবং লেখার কর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। অধুনা পুনরায় যে 'পঞ্চতন্ত্র' সীরিজ 'দেশে' আরম্ভ করেছিলুম সেটাও বাধ্য হয়ে provisional notice যোগে বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছি।

অথচ 'সতীনাথকে আমার শ্রদ্ধা না জানালে যে আমার নিজের প্রতি অবিচার করা হয়।

এদেশে সতীনাথের মত লেখক অতি অল্পই জন্মেছেন। এরকম বিদগ্ধ, দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত—মোহমুক্ত অপিচ দৃঢ়ভক্ত—, প্রাচীন অর্বাচীন সর্বসমস্যা সম্বন্ধে সচেতন, সদামুক্তমনব্ তায়ন নিয়ে এদেশে এযুগে অল্প অতি অল্প লেখকই কলম ধরেছেন। যেসব গুণের উল্লেখ করলুম তার উপরও তাঁর ছিল একটি অতুলনীয় অর্জিত বৈভব। শ্রীযুক্ত বিনোবার মতই তিনি এদেশের গ্রামজীবনের সঙ্গে ছিলেন অতিশয় সুপরিচিত। গ্রামের পঙ্কজকে তিনি যেমন চিনতেন তার তলার পঙ্কটির দুর্গন্ধ সম্বন্ধেও তিনি বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন।

বিদগ্ধ জন হয় নাগরিক—গ্রাম সম্বন্ধে সে অচেতন। পক্ষান্তরে জনপদবাসী বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতির সম্বন্ধে উদাসীন। সতীনাথ ব্যত্যয়। বিরল ব্যত্যয়। জনপদজীবনের সরল সভ্যতা-প্যাটারন্ তথা মহানগরীর বৈদগ্ধ্য নির্যাস দুটিই তাঁর জীবনকে করেছিল:

Rich in experience, Radiant with love।

দোষ না গুণ কি বলবো জানিনে, সতীনাথ ছিলেন writer's writer। তাঁর

প্রধান বৈশিষ্ট্য : ঠাসবুনোটের লেখা। এরই অন্য প্রান্তে অন্য এক্সট্রিমে রয়েছে, যাকে বলে, হৃদয় তাপের ভাপে ভরা ফানুস', কথার ফুলঝুরি, সেপ্‌পেকস্‌-অরেটরি। 'ঢোঁড়াই চরিত মানসের' মত ঠাসবুনোটের লেখা বই দিশী বইয়েতে তো না-ই, বিদেশী বইয়েও অল্পই পড়েছি। তাই এ-বই কখনই জনপ্রিয় হবে না। আমরা এখনো 'উচ্ছাস' সাবানের বুদবুদ' ভালোবাসি। সতীনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা অনেক কাল ধরে writer's authors writing হয়ে থাকবে।

তবে হ্যাঁ, আমরা ক্রমে ক্রমে যত tense precise accurate লেখার সম্মান দিতে শিখবো তেমন তেমন সতীনাথের প্রকৃত মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে শিখব। 'ঢোঁড়াই চরিত মানসের stunt-হীন নামের মহত্ত্ব বুঝতেই আমাদের অনেককাল লাগবে।

কিমধিকমিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী

পুঃ আর্থরাইটিসের অত্যাচারে আর এগোতে পারলুম না। অপরাধ নেবেন না।

আমার সম্পাদিত 'সতীনাথ স্মরণে' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন। সঠিক ঠিকানা না পাওয়ায় এই গ্রন্থের এক কপি তাকে পাঠানো হয়নি। একবার কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লিখি। জবাব পাইনি। হয়তো সে চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছয় নি। যখন তাঁর ঠিকানা পেলাম, তখন তিনি সব ঠিকানার বাইরে। তাঁর স্মৃতি নিয়ে আছে শুধু এই চিঠি।

সুবল গাঙ্গুলী

পাটনা ১৫

॥ ২ ॥

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একান্ত সেবক শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের পরলোকগমনে সাহিত্য গগনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হল।

বাংলা গদ্যরীতিতে আলী সাহেবের দান অপরিমেয়, কিন্তু নিজের লেখার উপর তাঁর কোন মায়া মমতা ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর অসংখ্য লেখা নানা সাময়িকপত্রের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। অনেক লেখা লিখতে আরম্ভ করে পাঠকদের নিরাশ করে মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন। তাঁর এইসব লেখা পড়ে স্বতঃই মনে হয় যে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে পারতেন।

'শবনম' উপন্যাস আলী সাহেবের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও এত সুন্দর ও মহান প্রেমের গল্প খুব কমই আছে। বইটি জনপ্রিয় হয়েছিল বটে, কিন্তু আমরা কি তার সঠিক মূল্য নির্ণয় করতে পেরেছি? আমাদের এই অক্ষমতা দেখেই কি আলী সাহেব তাঁর নিজের লেখার উপর সব মায়া-মমতা হারিয়েছিলেন?

আমরা বাঙালী, ধর্মে আমরা হিন্দু ও মুসলমান। আমরা পাশাপাশি বাস করি, এক ভাষাতে কথা বলি, কিন্তু আমরা পরস্পরকে চিনি না। আলী সাহেবের লেখার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ছিল আমাদের পরস্পরকে পরিচিত করিয়ে দেবার।

আলী সাহেব সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কোনদিনই কোন ক্ষুদ্র ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী—যে বাঙালীর ধমনীতে প্রবাহিত হিন্দুর নির্লিপ্ততা, ইসলামের সাম্য ও বৈষ্ণবের প্রেম।

সত্যব্রত ঘোষ

কলকাতা-২৬

পাখি দেখার নেশায়

দেশ পত্রিকার গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সংখ্যার আলোচনা বিভাগে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মাইতির চিঠি পড়লাম। লেখক তাঁর চিঠিতে পাঁচটি পাখির বর্ণনা দিয়েছেন; তার মধ্যে প্রথমটি ছাড়া বাকি চারটিকে সঠিকভাবে চিনতে পারলাম।

কেবল প্রথম পাখিটি সম্বন্ধেই একটু সন্দেহের অবকাশ আছে। যত দূর মনে হয় পাখিটি বেনে বউ যার ইংরিজী নাম Blackheaded Oriole ও বৈজ্ঞানিক নাম Oriolus xanthornus। এর অবশ্য কতকগুলো প্রচলিত বাংলা নাম আছে, হলদে পাখি, গৃহস্থের খোকা হোক, কৃষ্ণগোকুল, ইষ্টিকুটুম।

দ্বিতীয় পাখিটি সম্বন্ধে লেখকের অনুমান ঠিক। সাতভায়া বা সাত-ভাই পাখিই হলো ছাতারে। এর ইংরিজী নাম Jungle Babbler ও বৈজ্ঞানিক নাম Turdoides striatus।

ফিঙে; Black Drong বা King Crow (Dicrurus adsimiles); কাজলপাতি নামে পরিচিত জানতাম না,
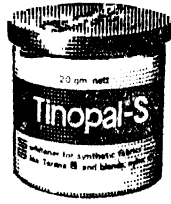
নামটি প্রথম শুনলাম। তবে নামটি যে সঙ্গত ও শ্রুতিমধুর সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। নামটির প্রচলন হওয়া উচিত।

চতুর্থ পাখিটির পালকের রঙের কোনোই বর্ণনা না দিয়ে লেখক যদি তার ল্যাজের বিবরণটুকু লিখতেন, তাহলেও পাখিটাকে বাঁশপাতি বা নরুণচেরা বলে চিনতে কোনোই অসুবিধে হতো না। কারণ ওই রকম ল্যাজ আর অন্য কোনো পাখির নেই। শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে উড়ন্ত পতঙ্গ ধরতে পটু এই পাখির ইংরিজী নাম Small Green Bee-eater; বৈজ্ঞানিক নাম Merops Orientans

শেষ পাখিটি পানকৌড়ি; Little Cormorant যার ইংরিজী নাম; বৈজ্ঞানিক নাম Phalacrocorax niger মাত্র আট লাইনের মধ্যে পানকৌড়ির সুন্দর বর্ণনা দিয়ে লেখক শুধু তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয়ই দেন নি, তাঁর অসাধারণ কল্পনা শক্তিরও প্রমাণ দিয়েছেন। শরীর জলে ডুবিয়ে শুধু গলাটুকু বার করে রেখে পানকৌড়ি যখন সাঁতার কেটে বেড়ায়, তখন তাকে "অর্ধমগ্ন

জ হাজের" মতোই লাগে। আর জল ছেড়ে ওড়ার সময়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে ঝুলিয়ে রাখা তার পা-দুটোকে একদম "পা-ভাঙা খোঁড়া কুকুরের মত" বলে মনে হয়। ঠিক জল ছেড়ে ওড়বার সময় পানকৌড়ির গলা তার শরীরের সঙ্গে এক সরলরেখায় থাকে না; খানিকটা নেমে থাকে। অর্থাৎ তখন গলা ও পেট একটি 'স্থূল কোণ' বা 'Obtuse angle'এর সৃষ্টি করে, 170° মতন। এই অবস্থাকে শৈলবাবু গাড়ী টানার সময়ে ঝুঁকে থাকা ঘোড়ার গলার সঙ্গে তুলনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

কাঁথি অঞ্চলের আরও কিছু পাখির বর্ণনা লেখক লিখে পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।

শুভময় চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৪৫

॥ ২ ॥

আপনাদের সাপ্তাহিকে ইদানীং প্রকাশিত শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'পাখি দেখার নেশায়' ও শ্রীপ্রদ্যোত সেনগুপ্তের 'একতারা ঝরনার পথে পাখি' লেখা দুটি আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। দুটি লেখাই খুব ভাল লেগেছে। তবে এদের সম্পর্কে অল্প কিছু বক্তব্যও রয়েছে। শ্রীসেনগুপ্ত পাখির যে বাংলা নামগুলি ব্যবহার করেছেন তার সবগুলি বহুল প্রচলিত নয়। তিনি বাংলা নামের সঙ্গে এদের বৈজ্ঞানিক নামগুলিও দেননি। এবং সাদাকালো ছবিতে পাখিকে নিশ্চিতভাবে চেনাও সম্ভব নয়। ফলে অনুরাগী জনও এই প্রবন্ধের পাখিগুলিকে চিনতে অসুবিধায় পড়বেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় দোয়েল (Copsychus saularis) ও বেনে-বউকে (Oriolus xanthornus) আগন্তুক পাখি বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এ দুটির কোনটিই আগন্তুক পাখি নয়, যেখানে জন্ম এ দুটি সেখানেই স্থায়ী বাসিন্দা। তবে বেনে-বউর নিকট আত্মীয় গোল্ডেন অরিওল (Oriolus oriolus kundoo) ও মেরুন অরিওল (Oriolus traillii) কোন জায়গার স্থায়ী বাসিন্দা নয়, তাই তারা বিভিন্ন জায়গার পক্ষে আগন্তুক পাখি। গোল্ডেন অরিওল সমতল বাংলায় আসে না বলে প্রচলিত ধারণা। কিন্তু এ পাখিকে কলকাতার উপকণ্ঠেও আসতে দেখেছি। পরিশেষে বউ-কথা-কও পাখির সম্পর্কে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। একই ধ্বনি বউ-কথা-কও বলে ডাকে Hierococcyx Varius (যখন এটি অবিশ্রাম না ডেকে মাঝে মাঝে ডাকে)। Cuculus micropterus এবং আমাদের অতি পরিচিত বেনে-বউ। আসলে এই তিনটিই কি বউ-কথা-কও?

ভিক্ষু বুদ্ধদেব
দেওঘর।

বাংলার লোক ধর্ম ও সাধনা

The Folk-Cults of Bengal : Dr. P. K. Mahapatra : Indian Publications: Price Rs. 25.00.

প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির মূলে লৌকিক-পৌরাণিক ভাবনার মিশ্রণ। সে-মিশ্রণের স্বরূপ বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় ধরা পড়েছে। মিশ্রণ আজও ঘটছে। এর মধ্যে পৌরাণিক ধর্মের উদ্ভব ও বিস্তারের রহস্য জানা অপেক্ষাকৃত সহজ। তুলনায় দুরূহ ব্যাপার হল লৌকিক ধর্মের এবং লোকসংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন। উপযুক্ত নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা সত্ত্বেও লোকযানের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। কারণ লোকসংস্কৃতির অনেক তথ্য কালবাহিত এবং পৌরাণিক ধর্মের সাঙ্গীকৃত। অন্যদিকে লৌকিক পূজাবিধির সব কিছুই ব্যাখ্যাগম্য নয়।

বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক সমাজবিন্যাসে বাস্তুদেবতার এবং পৌরাণিক দেবতার পাশাপাশি অবস্থান লক্ষণীয়। এ ছাড়া নানা ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্বও দুর্লক্ষ্য নয়। এ সবের মধ্যে লৌকিক সংস্কার এবং লৌকিক ভাবনা কোথাও অন্তঃশীলা কোথাও প্রত্যক্ষ। ডঃ পীযূষ মহাপাত্র এরকম কয়েকগুলি লোকধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার বাউল, নাথ সম্প্রদায়, ধর্মপূজাবিধি, শৈবধর্ম আলোচ্যগ্রন্থে উপস্থাপিত। কিছু কিছু অপ্রধান লৌকিক দেবদেবীর আলোচনাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সংকীর্ণ অর্থে এগুলির কোনোটিকেই বিশুদ্ধ লোকধর্ম বলা যায় না। অন্য দিকে এ সকল ধর্মমতের সঙ্গে লোকজীবনের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভক্তদের মধ্যে অধিকাংশ তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু। এই সকল ধর্মে বিধিনিষেধ পালনে যাদুবিদ্যা, নানা কৌম সংস্কারের উপস্থিতিই প্রমাণ করে লোকসংস্কৃতির অভ্রান্ত অস্তিত্ব। বস্তুত এই রকম অর্থে বিচার না করলে শ্রীযুক্ত মহাপাত্রের গ্রন্থের নামকরণটির সার্থকতা থাকে না।

স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাংলার এই সকল ধর্মমতের বিশ্লেষণ করেছিলেন 'অবসকিওর রিলিজ্যস কাল্টস' গ্রন্থে। তিনি লক্ষ করেছিলেন সহজিয়া সাধনার ধারাবাহিকতা। ডঃ দাশগুপ্তও এই সকল ধর্মমতে উল্টা সাধনার পরিচয় পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ঔপনিষদিক ধর্মমতের সূত্রটিও যে এই সকল স্বল্প পরিচিত ধর্মে বিধৃত শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাও দেখিয়েছিলেন।

পীযূষবাবুর গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে বাউলধর্ম ও বাউল সাধনার গূঢ় তত্ত্ব। সহজিয়া সাধনার 'ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড' উপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে উভয় সাধনায় দেহের গুরুত্ব স্থাপনে। তাদের 'মনের মানুষ', 'চারচন্দ্র' এবং গুরু-ভজনা নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ সব গুহ্য সাধনার কথা যতটা সম্ভব পীযূষবাবু আলোচনা করেছেন। নাথপন্থে অলৌকিকতা এবং হঠযোগের রীতি তাদের দুই প্রধান গ্রন্থ গোবিন্দচন্দ্রের গীত এবং গোরক্ষ বিজয় গ্রন্থে প্রকাশিত। পীযূষবাবু এ দুটি গ্রন্থের গল্পাংশ উদ্ধার করেছেন। এর পর হঠযোগের আশ্রয়ে নাথধর্মের গুহ্য-তত্ত্ব বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। রাঢ় অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের পূজাবিধি ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান। বৈদিক-অবৈদিক নানা স্রোত ধর্মঠাকুরের ধ্যানে মূর্ত হয়েছে। পীযূষবাবু অবৈদিক উৎস নির্ণয়ে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। শিবের লৌকিক রূপের পরিচয় পাই শিবরাম কাব্যে নানা ছড়া-গীতে। শিবের কোচ-রমণী-প্রীতি কেবলমাত্র কৌতূহলের বিষয়ই নয় বরং কোচ জাতির সঙ্গে শিবের সম্পর্কটি নৃতত্ত্বের গবেষণার বস্তু। শিবের শাঁখা-পরানো আখ্যান বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের মধুর রূপের প্রকাশ। চাষপালাতে কৃষিনির্ভর বাঙালীর ধনধান্যে সুখী জীবনের আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে শিব

বাংলার লোকসংস্কৃতির দেবভাবনার কেন্দ্রীয় ভূমিকা।

ডঃ মহাপাত্রের আলোচনা বিবরণ-জাতীয়। কখনও কখনও তা ব্যাখ্যাধর্মী। লোকজীবনের নানা পুজো-বিধি অথবা 'মিথ' নিয়ে ব্যাপক কাজ এখনও হয়নি। এ-কাজ দুরূহ এবং অধ্যয়ন সাপেক্ষ। পীযূষবাবুর গ্রন্থ সেই উদ্যমের সূচনা।

বিবিধ

কে আমি। রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। বাগানিয়াপাড়া। পোঃ নবদ্বীপ. জেলা নদীয়া। মূল্যে চার টাকা।

কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়?
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়?

আমি কে, এই প্রশ্ন, এই চিন্তা প্রায় সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই অসীম মহাশূন্যে ভাসমান জীবজগতের অনন্ত রহস্য কোন দিন সমাধান করা যাবে কিনা সন্দেহ? তবুও চেষ্টার ত্রুটি নেই। বিজ্ঞান এই ব্যাপারে কতদূর সফল হবে বৈজ্ঞানিকরা জানেন। বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসার পরিসর, সমস্যার বিশালতাকে নিঃসন্দেহে স্পষ্ট করেছে। বিজ্ঞান যেখানে

এসে থেমেছে চিন্তার জগৎ ভাবের জগৎ সেখানে আরো অনেক দূরে এগিয়েছে। অবশ্য এই সব চিন্তা এখনও ধর্ম ও দর্শনের জগতেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ স্বভাবতই পরিবেশবদ্ধ। অসীমের সঙ্গে যুক্ত হবার সাধারণত তিনটি স্বীকৃত পথ আছে—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ। আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা বিদুষী এবং গৌড়ীয় ভক্তিশাস্ত্র আলোচনায় সুযোগ্যা। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাত স্নিগ্ধ আবেগের পথে ভক্তিযোগের আশ্রয়ে মানুষের সেই চিরন্তন 'আমি কে' প্রশ্নের সমাধান খুঁজেছেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উত্তর বাংলার কবি রণজিৎ দেব-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৬-এর রথযাত্রার দিন—**প্রভু, অন্ধকারে আমি একা** (পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ, তিন টাকা)। লক্ষণীয়, নাম-কবিতাটি মূল সংকলনের বাইরে, আখ্যাপত্রে, সন্নিবিষ্ট। খুব সহজ, সরল ভঙ্গিতে তিনি লিখেছিলেন, 'অনন্ত জনতা মানুষের ভিড়/আমি একা/আমি একা হয়ে আছি এ অন্ধকারে।' ভেতরেও একাধিক কবিতায় 'অন্ধকার' শব্দটি [illegible] ব্যবহৃত। [illegible] একগুচ্ছ কবিতায় তিনি অতলান্ত অন্ধকারে ডুবে আছেন, 'বারান্দা থেকে বিকেলের ম্লান আলো [illegible] গেল/আমি একা/—কেন কাঁদি নিরন্ধ্র ঝড়, কেন একা অন্ধকারে' জাতীয় প্রশ্ন, 'সূর্যের সমীপে' কবিতায় তিনি হাজার হাজার আলোর সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃসংকোচে ব্যক্ত করেছেন—'আমার অন্ধকার চাই।' আবার অন্যত্র তাঁর দীর্ঘশ্বাসময় প্রার্থনা 'শুধু আলোর জন্য এক কোটি ফুল দিতে পারো'—এ ধরনের আপাতবিমুখ বহু বিবৃতি থেকে মনে হতে পারে অন্ধকার হয়তো তাঁর অন্ধকারেরই প্রতীক, যা তখনো আলো-অন্ধকারের মধ্যকোটিতে দাঁড়িয়ে দ্বিধায় কম্পমান, একবার আলো ও একবার অন্ধকারের দিকে সমান সমতায় প্রসারিত। তাঁর ব্যক্তিত্বের কথাই উন্মোচন এখনও হয় নি বলাই ভালো। কখনো অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, কখনো বিস্মিত স্বগতোক্তি—তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিটিকে [illegible] করে তোলে নি। একা অন্ধকারে তিনি তখনো পথ-সন্ধানী।

ঠিক চার বছর পর, ১৩৮০-এর রথযাত্রায় প্রকাশিত **শাখাপ্রশাখা শেকড়গুচ্ছ** (পরিবেশক : [illegible] প্রকাশনী, তিন টাকা) কাব্যগ্রন্থে রণজিৎ দেব সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছেন তাঁর কণ্ঠস্বর। এখন তাঁর [illegible] ভেতর [illegible] সরল রেখা আলোর দিকে' সরাসরি প্রসারিত। এখন তিনি আক্রোশ, ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে, বলতে পারেন 'আমার [illegible] দুটি হাত ছিঁড়ে ফেলেছে অন্ধকার [illegible] পায় হেঁটে যাচ্ছে কোন এক সম্পূর্ণ মানুষ।'

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে রণজিৎ দেবের কবিতা [illegible] আর্তি এক সম্পূর্ণ মানুষের কবিতা। 'আমি হাঁটতে [illegible] জ্যোৎস্না দু [illegible] চায়/আমার পেছন দিকে [illegible] [illegible] সপ এসে খেলা করে, খেলা করে [illegible] [illegible] দূরে ঘাসের উপর [illegible] অজস্র সমস্ত বৈভব', 'আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] ও সমাজ [illegible] সম্পর্ক রূপকার রণজিৎ দেব চমকে দেন তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থে।

✻

প্রথম পর্ব, ইছামতীর এপারে; দ্বিতীয় পর্ব, ইছামতীর ওপারে—এই দুটি পর্বের কাহিনী এক মলাটের মধ্যে সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস **আহত আশার দীপ** (পপুলার লাইব্রেরী, চার টাকা)। পরস্পরবিচ্ছিন্ন দুই পর্বের মধ্যে না আছে কোনো সাধারণ চরিত্র, না [illegible] ঐক্য। তবু যে একত্র স্থান পেয়েছে তার কারণ, বোধ করি, বক্তব্যের সাদৃশ্য।

ইছামতীর এপারের গল্প সমকালীন কলকাতা। অভাব, বঞ্চনা, দারিদ্র্যের তাড়নায় অরুণা বেছে নিয়েছিল এক পাপপঙ্কিল জীবিকা। নাট্যকার অমিতাভ সেন তাকে ফিরিয়ে আনে। অভিনেত্রীর জীবন বেছে নিয়ে অরুণা যখন পায়ের তলার মাটি সবে খুঁজে পেয়েছে, তখনই পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে অমিতাভ। জাল নোট পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত অমিতাভ পেশাদার অপরাধী নয়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছোট ভাই-এর চিকিৎসার খরচ যোগাতে সে শুধু নোটগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল। তবু তার অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অরুণা। এই আশাবাদ পরবর্তী পর্বের গল্পেও। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা কাহিনীর শেষে অধিনায়ক [illegible] মৃত্যুতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন সম্ভাবনার একটি সোপান রচিত হল—এই জাতীয় আশাবাদ ধ্বনিত। তপনবাবুর মেজাজ যতটা ঔপন্যাসিকের, তার থেকেও বেশী নাট্যকারের। ফলে সংলাপ-

অংশ স্বাভাবিক হলেও বর্ণনাংশে দুর্বলতা থেকে গেছে।

*

সমরেশচন্দ্র বসুর **স্ফুলিঙ্গ** (প্রকাশক : জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-৩১, তিন টাকা) অতি সরল ভঙ্গিতে লেখা উপন্যাস। প্রলয় নামে যে-চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের আখ্যানাংশ গড়ে উঠেছে তার প্রতি লেখকের পক্ষপাত ও শ্রদ্ধার মনোভাব তিনি গোপন করতে পারেননি। প্রলয়ের কর্মসঙ্গিনী ও কর্ম-সহচরী হিসেবে ইন্দ্রাণী চরিত্রেও এই দুর্বলতা। ফলে, যা হবার হয়েছে। পরীক্ষায় প্রথম, রেকর্ড নম্বর পাওয়া, শ্বেতাঙ্গ অফিসারের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে শ্রমিকের স্বার্থে চাকরিতে ইস্তফাদান, গোপনে বিপ্লবী দল গড়ে তুলে ইংরেজ বিতাড়ন—সব ব্যাপারেই প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়েছে নায়ক। ইন্দ্রাণী পাশে পাশে থেকেছে মূর্তিমতী প্রেরণা হয়ে। শুধু যা হয়নি, তা হল, বর্ণনা-সংলাপ-ভঙ্গি ইত্যাদি, সব মিলিয়ে উপন্যাসটির হয়ে-ওঠা। দুর্বল ভাষা, সমতল বর্ণনা, অহেতুক ইংরেজী ব্যবহার ও বহু প্রাচীন ভঙ্গি—উপন্যাসটি পড়ে ফেলার পক্ষে পরম অন্তরায়।

অতীত দিনের প্রখ্যাত খেলোয়াড় বলাই চ্যাটার্জির মৃত্যু ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে এক মহানায়কের প্রস্থান। মৃত্যু অবশ্যই অপরিণত বয়সে নয়। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। কিন্তু অর্ধ-যুগেরও বেশীকাল যিনি ছিলেন সব রকমের খেলাধুলোর সদাসঙ্গী, গড়ের মাঠ যাঁর কাছে ছিল বার্ধক্যের বারাণসী, তাঁর পরলোকগমনে একটা শূন্যতা সৃষ্টি স্বাভাবিক। আর কোনদিনই খেলার মাঠের মানুষ দেখতে পাবে না দশাসই চেহারার সেই বিরাট পুরুষ, যিনি সব সময় হেসে কথা বলতেন, যাঁর উপস্থিতি অতীত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলত।

বয়স যাঁদের পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, ষাট ছুঁই-ছুঁই—তাঁদের অনেকেরই খেলাধুলোর বাল্যস্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েকটি নাম। যেমন গোষ্ঠ পাল, সামাদ, সূর্য চক্রবর্তী, বলাই চ্যাটার্জি। ব্রিটিশ যুগে সহজাত ক্রীড়াদক্ষতায় এরা খ্যাতি অর্জন করেছেন কলকাতার ফুটবল মাঠে। কিন্তু এদের ক্রীড়াশৌর্যের নানা কাহিনী প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল সারা বাংলার ঘরে ঘরে। গোষ্ঠ পালের শটের সামনে দাঁড়াতে পারে এমন বুকের পাটা নাকি ছিল না কোন সাহেব ও গোরা খেলোয়াড়ের। পায়ের যাদুতে ফুটবলে ভেলকি দেখাত সামাদ, বানর নাচাবার মত নাকি নাচাত সাহেবদের। 'তুম ভি মিলিটারি তো হাম ভি মিলিটারি' মন্ত্রের মহানায়ক ছিল বি ডি চ্যাটার্জি। ঠ্যাং ভেঙে ল্যাংড়া করে ছেড়েছে কত সাহেব খেলোয়াড়কে।

কিংবদন্তী কথাটির মধ্যে কিছু ডাল-পালা থাক, থাক অতিরঞ্জন বা অলীক কিছুর আভাস। কিন্তু ব্রিটিশ যুগের ফুটবলে গোষ্ঠ পালের সিংহ বিক্রম, সামাদের যাদু, সূর্য চক্রবর্তীর শিল্পশৈলী এবং বলাই চ্যাটার্জির দুঃসাহসের দীপ্তির মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন নেই। এবং সাগর পারের বহু পল্টনী সাহেব এবং কলকাতার ইউরোপীয়ান দলের বহু বাঘা বাঘা খেলোয়াড় যে বলাই চ্যাটার্জির সামনে এসে ভয়ে চুপসে গেছে সে কথাও ঠিক। কারো কারো ঠ্যাং ভেঙেছে, তাও মিথ্যে নয়। সাহেবরা ছিল আমাদের শাসক, প্রভু। প্রতি ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের কাছে মার খেয়েছি। কিন্তু ফুটবল মাঠে মাঝে মাঝে এই মারের যাঁরা শোধ তুলেছে তাঁরা সর্বসাধারণের কাছে পেয়েছে জাতীয় বীরের সম্মান। বাংলার ঘরে ঘরে তাঁদের নাম পৌঁছে গেছে। স্মৃতি জাগানো সেই সব নাম একে একে সরে যাচ্ছে। সামাদ, সূর্য চক্রবর্তী আগেই গত হয়েছেন। বলাই চ্যাটার্জিও চলে গেলেন।

খেলাধুলায় বর্ণময় নাম বলাই চ্যাটার্জী

চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতার ফুটবল মান কেমন ছিল, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণের ফলে এখনকার ফুটবলমান আগের চেয়ে কতটা উন্নত সে প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, বলাই চ্যাটার্জি ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের অসমসাহসী এক জাতীয় সৈনিক, যাঁকে বাদ দিয়ে ভারতীয় ফুটবলের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হতে পারে না।

কিন্তু শুধু ফুটবল কেন? ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে সর্বাধিক খ্যাতি
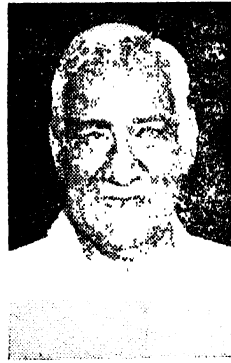
অর্জন করলেও এমন কোন খেলা ছিল না, যে খেলায় তাঁর বিশেষ দখল না ছিল। বক্সিং, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, বাস্কেটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, হকি, ফুটবল সব খেলাতেই প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছিলেন। ফুটবল খেলা শুরু করেন এরিয়ান ও ওয়াই এম সি এ দলে। ১৯২১ সালে মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেবার পর মোহনবাগান ও বলাই চ্যাটার্জি নাম দুটি প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে খেলতেন লেফট ব্যাকে পরে সেন্টার হাফ হিসাবে প্রতিষ্ঠা। আই এফ এ দলের সঙ্গে জাভা সফর করেছেন, মোহনবাগানের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলেছেন ইউরোপীয় দলের সঙ্গে। স্থানীয় আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে।

হকিতেও ভাল হাত ছিল। ১৯২৮ সালে বলাই চ্যাটার্জি ছিলেন মোহনবাগানের হকি অধিনায়ক। ক্রিকেটে [illegible] না পেলেও [illegible] ভারতীয় স্কুল দলে খেলেছেন ইউরোপীয় স্কুল দলের বিরুদ্ধে। ছক্কা মারার একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বলাই চ্যাটার্জির অধিনায়কত্বেই বাংলার বাস্কেটবল দল ১৯২৮-এর ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের তখনকার নাম ছিল অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান।

বক্সার হিসাবেও বলাই চ্যাটার্জির নাম সর্বজনবিদিত। মিডল ওয়েট বক্সার ছিলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কিংস কার্নিভল স্টেডিয়ামে সার্জেন্ট ডে-কে নক আউট করা ওর মুষ্টিযোদ্ধা জীবনের বড় সাফল্য।

বলাই চ্যাটার্জির মত অ্যাথলীটই বা ক'জন ছিলেন? প্রধানত দৌড়, লাফ এবং হার্ডলস-এ বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করলেও হ্যামার, শট পাট, ডিসকাসেও ওর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। বিশের দশকে বহু বিষয়ে রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। অবশ্য বাংলার অ্যাথলেটিকসে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও কি কৃতিত্বের চিহ্ন কম? ১৯২৪-এর অলিম্পিকে ভারতের দল গড়ার জন্য দিল্লির ট্রায়ালে ওর হাই জাম্প, হার্ডলস ও লং জাম্পে দ্বিতীয় স্থান দখল করায় মাদ্রাজ ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাক সাহেব বলাই চ্যাটার্জিকে অলিম্পিক দলভুক্ত করার জন্য জোর সুপারিশ করেন। কিন্তু প্রথম স্থান দখল না করায় অলিম্পিকে যেতে পারেন না। পরে বাক সাহেবের অনুরোধে মাদ্রাজের ট্রেনিং কলেজে যোগ দিয়ে ফিজিক্যাল কালচার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন বলাই চ্যাটার্জি।

খেলাধুলোর অন্যান্য বিষয়ে ওর সাফল্য অনেক প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যদের বেসবল খেলতে দেখে নিজেই বেসবলের একটি দল গড়েছিলেন। রাগবী খেলেছেন, কাবাডি খেলেছেন, খেলেছেন তাঁর [illegible] খেলাও। এক কথায় বলাই চ্যাটার্জির মত সর্ববিষয়বিশারদ চৌকস ক্রীড়াবিদ ভারতে কমই জন্মগ্রহণ করেছে।

তার চেয়েও বড় কথা, খেলাধুলোর অধীত বিদ্যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। যতদূর জানি বহুকাল তিনি মোহনবাগান ফুটবল দলের প্রশিক্ষক ছিলেন। অলিম্পিক ফুটবলে তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম ফুটবল কোচ। ১৯৪৮-এ লন্ডন অলিম্পিকে গিয়েছিলেন ফুটবল কোচ হিসাবে, ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে গিয়েছিলেন বক্সিংয়ের কোচ হিসাবে। জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলের প্রশিক্ষণের ভারও তাঁর উপর বহুদিন ন্যস্ত ছিল। অ্যাথলেটিকস চর্চার জন্য [illegible] নিজেই একটি ক্যাম্প গড়েছিলেন। অ্যাথলেটিকসের

বিচারক, ফুটবলের রেফারি, হকির আম্পায়ার হিসাবেও তাঁর ভূমিকা কম নয়। বলাই চ্যাটার্জি বহু অ্যাথলীট ও ফুটবলার তৈরী করে গেছেন যাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ফুটবলার চুনী গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত। মাত্র বছর খানেক আগে ফুটবলে মেয়েদের নিয়ে একটি দল গড়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। রোজ ভোরে মেয়েদের ট্রেনিং দিতেন ময়দানের সি টি সি মাঠে। মুক্ত আকাশের নীচে খোলা মাঠের খেলাধুলোর মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে গেলেন বলাই চ্যাটার্জি।

আজ আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে বলাইদার সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতের সেই মিষ্টি হাসিটি—বছর দুই আগে ওঁর বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবি দেখিয়ে যেভাবে হেসেছিলেন। অবাক করার মত একটি ছবি। রাশি রাশি কাপ মেডেল শীল্ডের মাঝে বসে আছেন ২৪ বছর বয়সী বলাই চ্যাটার্জি। মাত্র এক বছরের সংগ্রহ শ দুই পুরস্কার। হেসে বললেন, তবু কিছু কিছু কাপ মেডেল এদিক ওদিক চলে গেছে। আর যেগুলো সত্যিকার সোনার তৈরী ছিল সেগুলো ভেঙে তোর বউদির গয়না করে দিয়েছি'।

বলাই চ্যাটার্জি যখন খেলাধুলো করেছেন সোনা তখন সস্তা ছিল। পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা ভরি। কিন্তু বলাই চ্যাটার্জির মত চৌকস খেলোয়াড় বেশী ছিল না। বলাই চ্যাটার্জিকে বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যতিক্রমও বলা যায়।

মুকুল

উত্তর কোরিয়ার টেবল টেনিসে চটক ছিল বেশী

কলকাতায় ইডেনের ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম টেবল টেনিস টেস্টে যেভাবে ভারতের মেয়ে ও পুরুষ দল সহজে হেরে গেছে তাতে অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছে, কয়েক সপ্তাহ আগে কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত সাত দেশের আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসে ভারত দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল কিনা! শুধু দ্বিতীয় স্থানই নয়, সকালের সেমি-ফাইনালে চীনের জুড়ি এবং বিকালের ফাইনালে জাপানী জুড়িকে হারিয়ে ভারতের নীরজ বাজাজ এবং মনজিৎ দুয়া ডাবলস-এরও খেতাব পেয়েছিল। ভারতের মেয়েরাও কাঠমাণ্ডুতে নাকি খুবই ভাল খেলেছিল। কিন্তু ইডেনে মেয়েদের টেস্টে ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছে ০—৩ খেলায়, পুরুষদের টেস্টে ০—৫ খেলায়। অর্থাৎ ভারতের পুরুষ ও মেয়েরা একটি ম্যাচেও দক্ষিণ কোরিয়াকে হারাতে পারেনি।

টেবল টেনিস খেলায় দক্ষিণ কোরিয়া নিঃসন্দেহে পৃথিবীর পুরোবর্তী দেশগুলির অন্যতম। যুগোস্লাভিয়ার সারাজেভো শহরে ১৯৭৩-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চীন ও জাপানের আধিপত্য খর্ব করে দক্ষিণ কোরিয়ার মেয়েরাই চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারিণী হয়েছে, ছেলেরা পেয়েছে অষ্টম স্থান। দক্ষিণ কোরিয়ার এক নম্বর মেয়ে লী আইলেসা, প্রধানত যার জন্য ওদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান, সহসা পারীতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দলের সঙ্গে ভারতে আসেনি। ওদের এক নম্বর পুরুষ খেলোয়াড়ও আসতে পারেনি। কিন্তু যারা এসেছে তারাও যে টেবল টেনিসের নিপুণ শিল্পী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবে স্বীকার করতেই হবে, ওরা যে খেলা দেখিয়ে গেছে তার চেয়েও আমরা ভাল খেলা দেখেছি গত বছর ওই ইডেনেই, ওদের উত্তরাংশের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে। আমি উত্তর কোরিয়ার টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের কথাই বলছি। টেবল টেনিস খেলার মধ্যে তারা যে শিল্প-শৈলী, নৃত্যচ্ছন্দ এবং মারের চটক দেখিয়ে গেছে আজও যেন তা চোখের উপর ভাসছে। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশন উত্তর কোরিয়ার নাম ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কোরিয়া হিসাবে গ্রহণ না করার প্রতিবাদে উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়রা সারাজেভোর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দেয়নি। ওরা খেললে ওদের মেয়ে দলকে হারিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

যেহেতু মাত্র এক বছরের ব্যবধানে দুই কোরিয়ার দুটি দল কলকাতায় খেলে গেল সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই দুই দেশের খেলার তুলনামূলক আলোচনা এসে পড়ছে। খেলার ধারা অবশ্য একই রকম। সেই পেন হোল্ড গ্রিপে ব্যাট ধরে মারের বন্যায় টেবিলের উপর তুফান ছোটানো। দুই-একজনের খেলায় অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। শেকহ্যান্ড গ্রিপেও খেলেছে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি মেয়ে। কিন্তু সেও টেবল টেনিসের মারমুখী মেয়ে।

খেলার আগে কসরতের মাধ্যমে দেহকে চাঙ্গা করে নিচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার দুই মেয়ে পাক মী রা ও চুং হায়ুন সুক ফটো—দেশ

রক্ষণাত্মক ক্রীড়াধারার ওরা ধার ধারে না তবে উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়দের হাতে মারের বাহার যেন আরও বেশী করে ফুটে উঠেছিল। কোর্টক্র্যাফট এবং ফুটওয়ার্কেও তারা দর্শকদের সাধুবাদ পেয়েছিল বেশী। দক্ষিণ কোরিয়ার খেলোয়াড়রাও তাদের স্বভাবসুলভ আক্রমণাত্মক ক্রীড়াধারায় দর্শকদের হাততালি কম আদায় করেনি। বিশেষ করে টেস্ট ম্যাচে তারা দেখিয়ে গেছে আমাদের খেলার চেয়ে তাদের খেলা কত উন্নত। কিন্তু আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতার সবকটি খেলায় আমাদের খেলোয়াড়রা দক্ষিণ কোরীয়দের বিরুদ্ধে যে প্রাধান্য দেখিয়েছে উত্তর কোরীয়দের বিরুদ্ধে সে প্রাধান্য দেখাতে পারেনি।

অবশ্য পুরুষ ও মেয়েদের আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতায়ও জয়ী হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার খেলোয়াড়রাই। তবু দুটি ফাইনালেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ভারতের দুই চ্যাম্পিয়ন মনজিত দুয়া এবং রূপা ব্যানার্জি। তাছাড়া ভারতের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন গালাক্ষুর জগন্নাথের কাছে দক্ষিণ কোরিয়ার ছয় নম্বর লী চেস চুল ও দুই নম্বর চই সুং কুক হার স্বীকার করেছে। মনজিত দুয়া হারিয়েছে ওদের পাঁচ নম্বর সো ইয়াং ইনকে, কাবাড জয়ন্ত চার নম্বর লী সাং কুককে। মেয়েদের আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতায় আমাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রূপা ব্যানার্জির কাছে ওদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের পার্ক মী রা-র পরাজয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্ব টেবল টেনিস ক্রমপর্যায়ে পঞ্চম স্থানাধিকারিণী পার্ক মী রা-কে হারিয়েও রূপা ব্যানার্জি ফাইনালে হারাতে পারেনি পৃথিবীর ৮ নম্বর মেয়ে চুং হায়ুন সুককে। আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতার প্রথম দিকে পুরুষ খেলোয়াড়রাও যে চমক জাগিয়েছিল তার বিন্দুমাত্র পরিচয় রাখতে পারেনি শেষ দিকের খেলায়। আর টেস্ট খেলায় সহজ হারের কথা তো আগেই বলেছি।

আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে পাঁচ নম্বর কাবাড জয়ন্তই দর্শকদের প্রত্যাশা কিছুটা পূর্ণ করেছে তার পেনের কব্জির চটুল চৌকস মারে। আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে আমাদের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন জগন্নাথের কাছে ওদের দুই নম্বর (ভারত সফরকারী দলের এক নম্বর) খেলোয়াড় চই সুং কুক হার স্বীকার করলেও সে হার জগন্নাথের অসীম ধৈর্যের কাছে। জগন্নাথ রক্ষণাত্মক খেলোয়াড়। ফোরহ্যান্ডে অবশ্যই মার আছে, কিন্তু একটি গেমে দুটি বা তিনটির বেশী সে মার দেখার সুযোগ ঘটে না। সে মারেও আবার অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়, বিপক্ষ পয়েন্ট পায়। প্রতিপক্ষের স্ম্যাশ চপ-এর কারুকার্যে ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যেই জগন্নাথের যা কিছু

দক্ষিণ কোরিয়ার দুই মেয়ে দুই গ্রিপে খেলে। উপরে পার্ক মী রা-র পেনহোল্ড গ্রিপ, নীচে শেকহ্যান্ড গ্রিপ চুং হায়ুন সুক-এর ফটো—দেশ

বাহাদুরি। হাতে অসাধারণ কন্ট্রোল। অবিশ্বাস্যভাবে বল ফিরিয়ে দেয় প্রতিপক্ষের টেবলে। কিন্তু যারা আঘাতের পর আঘাত হেনে খেলে এবং জগন্নাথের চপ ও ভেরিয়েশন ধরে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে ওই রক্ষণাত্মক খেলা অকার্যকরী হতে বাধ্য। মারের জোরে পয়েন্ট পাব না, পয়েন্ট পাব প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগে, [illegible] টেবল টেনিসে সে খেলা এখন চলে না। আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাতেই সাফল্য আসে।

আমাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মনজিত দুয়ার ফোরহ্যান্ডে অবশ্যই ভাল মার আছে। কিন্তু ব্যাকহ্যান্ড দুর্বল। ন্যাটা মনজিতের ফোরহ্যান্ড শক্তিশালী বলে খেলেও টেবিলের ডান পাশে দাঁড়িয়ে কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন ডাইনে বাঁয়ে বল চালিয়ে আক্রমণ করে তখন সে আক্রমণের মোকাবিলার জন্য যে ফুটওয়ার্কের দরকার, মনজিতের সে ফুটওয়ার্ক নেই।

আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতার ফাইনালে রূপা ব্যানার্জি চুং হায়ুন সুক-এর কাছে এবং টেস্টে পার্ক মী রা-র কাছে হেরে গেলেও স্বীকার করতেই হবে আমাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নের বর্তমান ক্রীড়াধারা আগের চেয়ে অনেক উন্নত। ওর পেনের কব্জাতে এখন কারুকার্যও বেশী, মারগুলিও আগের চেয়ে জোরালো। কিন্তু শারীরিক পটুতায় যে ঘাটতি আছে, বিশ্বের পাঁচ নম্বরকে হারিয়ে আট নম্বরের কাছে পরাজয় স্বীকারেই তা প্রমাণিত।

বিন্দুভূষণ নামে উত্তরপ্রদেশের যে মেয়েটি এবার জাতীয় টেনিসে বালিকা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং বড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোয়ার্টার ফাইনালে রূপার কাছে হেরে গেছে সে কলকাতায় প্রথম খেলল। মেয়েটির মারের হাত ভালই কিন্তু অভিজ্ঞতায় কাঁচা। তালিম পেলে ও ভাল খেলবে। ভবিষ্যতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ওকে অনায়াসেই চিহ্নিত করা যায়।

দক্ষিণ কোরীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছে কাং মন সু-র খেলা। যদিও কোরিয়ার ক্রমপর্যায় তালিকায় ওর স্থান তৃতীয়, তবু দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চই সুং কুক-এর চেয়ে ওর খেলার ধারা উন্নত, মারগুলিও শাণিত। আক্রমণে এবং আত্মরক্ষায় সমান দক্ষ, ফোরহ্যান্ড ও ব্যাক-হ্যান্ডের মারের মধ্যে সমান শক্তি, সমান লাবণ্য। খেলেও মাথা খাটিয়ে প্রতিপক্ষের ক্রীড়াধারার সঙ্গে তাল রেখে। ওদের লী চেস চুল নামীয় তরুণ খেলোয়াড়টি ৬ নম্বর থেকে অচিরেই উপরে স্থান করে নেবার মত প্রতিশ্রুতি রেখে গেছে সাবলীল ক্রীড়াছন্দে। কোরীয় খেলোয়াড়দের শারীরিক পটুতার কথা নতুন করে না বলাই ভাল। খেলাকে যারা জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে প্রতি দিন তিন দফায় মোট ৬ ঘণ্টা জিমন্যাসিয়ামে অনুশীলন তাদের প্রায় বাধ্যতামূলক। সুতরাং, দৈহিক পটুতায় ওদের ঘাটতি নেই। নৈপুণ্য এবং শক্তির সংমিশ্রণে কোরিয়া বিশ্ব টেবল টেনিসের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে, চীন জাপানের মনে ত্রাস জাগিয়েছে।

একলব্য.

ইনি হলেন কোমল... ইনি রহস্যময়ী
মোলায়েম ও কঠিন আর আগুনের উত্তাপ
ইনি সম্পূর্ণ মানবী
রেশমের মত মোলায়েম ট্যাল্ক...যেন প্রীতির
পরশ। আপনাকে সোহাগ করার জন্য।
স্বতন্ত্র এক সুরভি—আপনাকে মুগ্ধ করার জন্য।
আর তা'হোলে আপনার ভেইল অব
লাভ—কেবল মাত্র হ্যালো-র কাছ থেকেই।
এর অত্যন্ত হাল্কা, অপূর্ব বিলাসিতায়
নিজেকে মাতিয়ে রাখুন। হ্যালোতে আছে
বিশেষ এক সুগন্ধের মিশ্রণ, তা' দিয়ে
আপনার বাঁধন না মানার সাধ মিটিয়ে
নিন। এটি আপনার সর্বাঙ্গে ঘণ্টার
পর ঘণ্টা নিবিড় ভাবে মিশে
থাকার প্রতিশ্রুতি দেবে।
ছড়িয়ে দিন ভেইল অব লাভ।
সুরভিত অবগুণ্ঠন—একমাত্র
হ্যালো-র কাছ থেকে।
হ্যালো ভেইল অব
লাভ ট্যাল্ক
মাধুর্য্যের অবগুণ্ঠন...
প্রণয়োপম সুকুমার
ওর জন্য...
হ্যালো
ভেইল অব লাভ
ট্যাল্ক
Halo

রাজস্থানের মরু অঞ্চলে সত্যজিৎ রায়ের "সোনার কেল্লা" ছবির দৃশ্যগ্রহণ। উটের পিঠে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান সিদ্ধার্থ প্রভৃতি। ক্যামেরায় লুক-থ্রু করছেন সত্যজিৎ রায় স্বয়ং [সংবাদ ভিতরে]। ফটো—দেশ

মতামতের মন্তাজ

ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন এবং ফিলম অ্যাওয়ারড—এ দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকার কথা নয়। তবে আজকাল আমরা যে ধরনের অ্যাওয়ারড দেখছি তার মূলে ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন কতখানি সক্রিয় তা বলা মুশকিল। ফিলম সেনস বা ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন এক বস্তু, ফিলম অ্যাওয়ারড অন্য ব্যাপার—এরকমই একটি ধারণা অনেকেরই হয়ত থাকতে পারে। কারণ এদেশের বেশির ভাগ অ্যাওয়ারড-এরই লক্ষ্য নির্দিষ্ট। সরকার যে পুরস্কার দেন তার লক্ষ্য দেশে সুন্দর ও সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহ সৃষ্টি করা। আদর্শ চলচ্চিত্র কি? এ প্রশ্নের উত্তর এদেশে সম্ভবত এই যে ছবি পরিচ্ছন্ন, যে ছবি আনন্দ দেয় এবং সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাই সুস্থ বা সুন্দর চিত্র। সরকার এ-ধরনের ছবিকে সর্বোচ্চ পুরস্কার দিতে প্রস্তুত। ফিলম সেনস ছবিতে আরও কিছু বস্তু খোঁজে। ইনডাসট্রিকে সাহায্য করাও সরকারের নগদ টাকার পুরস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য। অ্যাওয়ারড যখন বিবিধ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তখন শুধুমাত্র ফিলম সেনস বা ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর উপর আস্থা রাখা যায় না।

*　*　*　*

অন্য বিপদও আছে। ফিলম সেনস প্রয়োগ করার মতো ছবি এদেশে কটা বা হয়। এবং ফিলম-বোধ যাঁদের আছে তাঁদের কজনকেই বা বিচারকের আসনে বসায়? প্রথম বিষয়টি বেশি প্রণিধানযোগ্য। ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর সঙ্গে অ্যাওয়ারডের জন্য ছবি বাছাই করা এদেশে খুবই কঠিন কাজ। বিভিন্ন ফিলম ক্লাবের দৌলতে সমকালীন বিদেশী চিত্র দেখে ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন যাঁদের বা গড়ে তোলা হল সেটা এদেশের ছবি দেখার বেলায় মুলতুবি রাখতে হয়। নতুবা দেশীয় ছবি দেখে কষ্ট পেতে হবে। অ্যাওয়ারড দেওয়া তো দূরের কথা! তবু বছরে একটি-দুটি বাংলা ছবি দেখার সময় নবলব্ধ ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন কাজে লাগে। ওই ছবির ভাগ্যে পুরস্কার জুটবেই এমন কথা হলপ করে বলা যায় না। জাতীয় পুরস্কারের বেলায় সব অঞ্চলের প্রতি সমদর্শন দরকার। অতএব বাংলা ছবি ভাল হলেও প্রতিবার অ্যাওয়ারড পেতে পারে না। রাজ্য সরকারের অ্যাওয়ারড যা নতুন প্রবর্তিত হল বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে সাহায্য করার জন্য। এক্ষেত্রেও নজর থাকবে যাতে বেশি সংখ্যক ছবি নগদ টাকার পুরস্কার পায়। একজন বিখ্যাত পরিচালক প্রতি বছর সর্বোৎকৃষ্ট ছবি করেও প্রতি বছর পুরস্কার নাও পেতে পারেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর প্রশ্ন ওঠে না। সমালোচকদের তেমন কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তাঁদের পুরস্কারের বেলাও যে ফিলম সেনস খুব কার্যকর হয় এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। ফিলম অ্যাওয়ারড-এরও একটা 'পপুলার অ্যাপিল'

ময়ূর ইত্যাদি সবই আছে। ওই রহস্য-কাহিনীর রহস্য যাকে কেন্দ্র করে সেই কিশোর জাতিস্মর মুকুল গাড়ি থেকে নেমে পড়ল লোকের ধারে ময়ূর দেখে। ওই দৃশ্যে ময়ূরগুলিকেও বেশ বাধ্য শিল্পীর মত শট্ দিতে দেখলাম। যোধপুরের এই পর্যায়ে মরুভূমির রাস্তায় উটের পিঠে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (রহস্যভেদী ফেলুদা), শ্রীমান সিদ্ধার্থ (তোপসে) এবং সন্তোষ দত্তকে (গোয়েন্দা-গল্পলেখক জটায়ু) নিয়েও কয়েকটি দৃশ্য গৃহীত হল। ওঁরা অজয় ব্যানার্জি (নকল ডাঃ হাজরা) ও মুকুলকে অনুসরণ করে চলেছেন। উটের পিঠে সৌমিত্রবাবুকে সত্যিকারের গোয়েন্দাদের মত দেখাচ্ছিল।

পরবর্তী পর্যায়ের শুটিং হল বিকানীর ফোর্ট-এ। ফোর্ট-এর একটি মহলের নাম ডেংরা নিবাস। ওখানেই বেশি শুটিং হল। কী চমৎকার কারুকার্য দেওয়ালে, শিলিং-এ। রঙীন ছবিতে হয়ত অপরূপ দেখাবে এগুলো।

দৃশ্যগ্রহণে উত্তেজনা দেখলাম জয়শলমীর এসে। এখানকার একটি রেল-স্টেশনের নাম শ্রীভাদরিয়ালাঠি। যোধপুর থেকে স্পেশাল ট্রেন আনানো হয়েছে শুটিং-এর জন্য। রেল কোম্পানি থেকে শুরু করে রাজ-মহারাজা এমন কি সাধারণ মানুষেরা পর্যন্ত সকলেই দারুণ সহযোগিতা করছেন মানিকদার সঙ্গে। তাঁর সম্পর্কে সকলেরই দেখলাম দারুণ শ্রদ্ধা।

রেল স্টেশনে সূর্যাস্তের একটি দৃশ্য গ্রহণের সময় সামান্য বিপত্তি দেখা দিল। শুটিং স্টার্ট করে দেখা গেল ক্যামেরা চলছে না। সবাই হন্তদন্ত হয়ে ক্যামেরা নিয়ে পড়ল। মানিকদার মুখেও চিন্তার রেখা। তাঁর দৃষ্টি একবার সূর্যের দিকে, একবার ক্যামেরার দিকে। একটু পরেই ক্যামেরা রেডি। স্টার্ট সাউন্ড, স্টার্ট ক্যামেরা। ক্যামেরা আবার অচল। মিনিট দুই মত বাকি সানসেট হতে। মানিকদা চঞ্চল, অন্য সবাই হন্তদন্ত। এ দৃশ্য বুঝি আর নেওয়া গেল না। সূর্য ডুবু ডুবু, প্রচণ্ড লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে মরু-প্রান্তরে। এমন সময় ক্যামেরা চালু হবার আওয়াজ শোনা গেল। উত্তেজিত গলায় মানিকদা বললেন: স্টার্ট। ঠিক কাট্ বলার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেব টুপ করে ডুব দিলেন দিগন্তে।

সন্ধ্যা হতেই জেনারেটর বসিয়ে মরুভূমির একটি অংশ আলোয় আলো করে ফেলা হল। ছবির কিশোর নায়ককে নিয়ে বদমাইশরা চলেছে ট্রেন করে, আর ট্রেন মিস করে গোয়েন্দা ও তার সহকারীরা উটের পিঠে চলেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ট্রেনের এঞ্জিনে সৌমেন্দু, বড় ক্যামেরা নিয়ে রেডি। মানিকদা নিজে আর একটি ক্যামেরা নিয়ে জিপে। দুটি দৃশ্যই

জয়শলমীর ফোর্টে "সোনার কেল্লা"-র বহির্দৃশ্যে ফেলুদা রূপী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

একসঙ্গে গৃহীত হবে। সে এক দেখবার মত দৃশ্য। শুটিং দেখতে দেখতে আমরাই রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। হলে বসে যে সব দর্শক দেখবেন তাঁদের কথা সহজেই অনুমেয়।

পরবর্তী পর্যায়ের শুটিং হল জয়শলমীর ফোর্টে। কাহিনীতে যেটাকে বলা হচ্ছে সোনার কেল্লা। এক হাজার বছরের পুরনো ফোর্টে ছবির শেষ দিকের কিছু দৃশ্য গৃহীত হল। শৈলেন মুখোপাধ্যায় (আসল ডাঃ হাজরা) ও কামু মুখার্জিও অভিনয় করলেন। অনেকগুলি গুলির আওয়াজ শোনা গেল। শেষ গুলিটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ফেলুদা অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের রিভলবার থেকে।

—তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বসন্ত বন্দনা

এইচ-এম-ভি'র বসন্ত বন্দনার রেকর্ড এবারও কম নয়। চৈত্র ও বৈশাখ। রবীন্দ্রসংগীত দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের গান, ভক্তিগীতি, বাউল, ছড়াগান প্রভৃতি সবই আছে। আধুনিক পর্যায়ে মান্না দে'র চারখানি গান রাগভিত্তিক। তার মধ্যে 'অভিমানে চলে যেও না' এবং 'তুমি অনেক যত্ন করে' বার বার শোনার মতো। এত ভাল গান শিল্পী অনেককাল গাননি। অনিবার্যভাবেই রেকর্ডটির কদর হবে। গানের সুর রতু মুখোপাধ্যায় চমৎকার দিয়েছেন। জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (মেটে নেই মন/যমুনা কিনারে) এবং শ্যামল মিত্রর গানও (ও দুটি নয়নে কেন/পায়ে পায়ে) শ্রোতারা আগ্রহের সঙ্গে শুনবেন। এছাড়া গেয়েছেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ললিতা ঘোষ, অরুণ দত্ত, মীনা কাপুর, অরূপ সরকার, গীতা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী মুখোপাধ্যায়, সর্গরিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পাপিয়া বাগচি, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, অজিতকুমার, অসীমা ভট্টাচার্য, গীতা সেন, তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়, মীনা মুখোপাধ্যায়, পীযূষকান্তি সরকার প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কয়েকজন শিল্পীর গান সম্পর্কে অনায়াসেই সপ্রশংস উক্তি করা যায়। এঁরা হলেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অরুণ দত্ত, অসীমা ভট্টাচার্য, গীতা সেন ও তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবার বেশ কয়টি গানের সুর দিয়েছেন। তার মধ্যে অসীমা ভট্টাচার্য ও তাপস চট্টোপাধ্যায়ের গানের সুর উল্লেখযোগ্য। অন্যদের গানও কারো কারো ভাল লাগতে পারে।

অন্যান্য গানও বসন্ত বন্দনা রেকর্ডের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। একটি এল-পি-ই রেকর্ডে মায়া সেন (বড়ো বিস্ময় লাগে/দেখ সখা, ভুল করে) অর্ঘ্য সেন (সেই তো বসন্ত) ও পূর্বা দাম'র (হেথা যে গান গাইতে আসা আমি আছি তোমার সভার) গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত খুবই চিত্তাকর্ষক। মায়া সেনের 'দেখো সখা' কিংবা পূর্বা দামের 'হেথা যে গান গাইতে আসা' একবার শুনে আশ মেটে না। একটি ই-পি রেকর্ড গোরা সর্বাধিকারীর গানের (চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে খোল খোল দ্বার) সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেকর্ডটির প্রধান আকর্ষণ এইখানেই। বনানী ঘোষ (শূন্য প্রাণ কাঁদে সখা সখী ওই বুঝি বাঁশি বাজে), কণী ঠাকুর (ওকে বলো সখী বলো নয়ন ছেড়ে গেলে চলে) এবং স্বপন গুপ্তের (আরো কিছুক্ষণ অনেক কথা যাও যে বলে) গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে আরও একটি এল-পি-ই রেকর্ড বেরিয়েছে। বনানী ঘোষের সখী 'ওই বুঝি বাঁশি বাজে' গানটিতে প্রাণের স্পর্শ ও সূক্ষ্ম অলংকরণের কাজ লক্ষণীয়। কণী ঠাকুর 'ওকে বলো সখী বলো' খুবই দরদ দিয়ে গেয়েছেন।

অতুলপ্রসাদের গানের বিশিষ্ট শিল্পী

হিসাবে শর্বাণী সেনের চারটি গানই (আজি হৃদয় সরসি কি জোয়ারা/প্রবল ঘন মেঘ আজি/জ্বলে বসন্ত/তুমি কবে আসিবে) মনোগ্রাহী। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের আসরে বন্দনা সিংহ হয়ত অচিরেই স্থায়ী আসন ক'রে নেবেন। তাঁর দুটি গান (সারা সকালটি বসে বসে/আয় রে বসন্ত) শোনার পর এ-সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের শিল্পী হিসাবে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর গাওয়া নতুন দুটি গান 'জীবনটা যে রেখা গেল' এবং 'বসিয়া বিজনে' শিল্পীর সুনাম আরও বাড়াবে। দ্বিতীয় গানটি শ্রোতাকে তন্ময় করে। একটি রেকরডে চারখানি ভক্তিগীতি গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। শ্রোতাদের কাছে সেটা এক নতুন সংবাদ। সব কটি গানই ভাল হয়েছে। শিল্পী বেশ ভাল গেয়েছেন 'হরি দিন তো গেল'। গানটি এখানে আখরযুক্ত (সংগীত পরিচালনা দিনেন চৌধুরী)। লালন ফকিরের চারটি গান দরাজ গলায় পরিবেশন করেছেন প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী। দুটি গান 'কথা কয়রে দেখা দেয় না' এবং 'বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়' খুবই ভাল। দীপালি নাগের রাগ-প্রধান বাংলা গানের রেকরডটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছড়া গানের রেকরড (ঘুটঘুটে আনধার ভুশণ্ডী মাঠ/সুন্দর বনে সুন্দরী গাছ) ছোটরা লুফে নেবে। শিশুদের মনের মতো ছড়া লিখতে জানেন অমিতাভ চৌধুরী। তাঁর রচিত ছড়ায় সুন্দর সুর যোগ করেছেন ভি বালসারা। তার চেয়েও বড় কথা, কথাবস্তুর অ্যাটমসফিয়ার গড়ে তুলেছেন সংগীত পরিচালক। ভুশণ্ডীর মাঠ-এ যেটা লক্ষণীয়। গেয়েছেন বনশ্রী সেনগুপ্ত, অনুপ ঘোষাল, কণিনিকা মিত্র, অরিন্দম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। বনশ্রী সেনগুপ্তর গানের জন্য 'সুন্দর বনে সুন্দরী গাছটি' বেশি ভাল লাগে।

"একদিন সূর্য" (পরিচালনা : নীতীশ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সোমেন ভট্টাচার্য ও জয়শ্রী রায়

রজনীকান্তের গানের দুজন শিল্পী নীলা মজুমদার (তোমার দেওয়া প্রাণে/তুমি আমার অন্তস্থলের) এবং নিশীথ সাধু (বেলা যে ফুরায়ে যায়/ভাসারে জীবন তরণী) খাঁটি মেজাজে গানগুলি গেয়েছেন। নীলা মজুমদারের গান প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। রজনীকান্তের গানের শিল্পী হিসাবে নিশীথ সাধুর নাম সুপরিচিত। তাঁর 'বেলা যে ফুরায়ে যায়' বিশেষভাবে ভাল লাগবে।

একটি রেকরডে সুবোধ রায় ও অতীন রায়ের লোকগীতি শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করবে। সুশীল চক্রবর্তীর কৌতুক নক্শা, বিশেষ ক'রে বাসের কড়চা উপভোগ্য।

এইচ-এম-ভি চেয়ারম্যানের ভারত সফর

দি গ্রামোফোন কোং অব ইনডিয়া লিঃ-এর ডিরেকটর বোরডের চেয়ারম্যান শ্রীভাস্কর মেনন সম্প্রতি ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেকটর শ্রীঅনিলকুমার সুদের সঙ্গে কলকাতা, বোমবাই, দিল্লি এবং মাদ্রাজের গ্রামোফোন কোম্পানির অফিস এবং দমদম ও বোম্বাইয়ের ফ্যাক্টরিগুলি পরিদর্শন করেন। কলকাতায় শ্রী ও শ্রীমতী মেননকে একটি পারটিতে আপ্যায়ন জানানো হয় যেখানে শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমেনন শিল্পী, প্রযোজক ও ডিলারদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

শিল্পীর সম্বর্ধনা

"আক্ষরিক অর্থে তিনি দ্বিজ : প্রথমে শিল্পী, পরে শিক্ষক—একই জীবনে জন্ম-জন্মান্তর ঘটে গেল"—দ্বিজেন চৌধুরীর ব্যক্তি-পরিচয়টি এই ধরনেরই কয়েকটি কথায় উদ্‌ঘাটন করলেন সন্তোষকুমার ঘোষ 'রবিতীর্থ প্রাক্তনী' আয়োজিত দ্বিজেন চৌধুরীর সম্বর্ধনা-সভায়। সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবরের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানটি গানে এবং ভাষণে উজ্জ্বলতালাভ করেছিল। সেদিনকার অনুষ্ঠান পৌরোহিত্য করেছিলেন শ্রীমতী কনক বিশ্বাস এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পংকজকুমার মল্লিক।

ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সন্তোষ সেনগুপ্ত, সুরসাগর হিমাংশু দত্তের ভ্রাতা সুধাংশু দত্ত প্রমুখ গুণী ব্যক্তিবর্গ যাঁরা দ্বিজেন চৌধুরীকে অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন এবং জেনেছেন। সুরের প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল রবিতীর্থ প্রাক্তনীর প্রায় পঞ্চাশজন শিল্পীর সমবেত কণ্ঠের গান : 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা।'

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের শেষে প্রথমে সুচিত্রা মিত্র, অতঃপর 'রবিতীর্থ' প্রাক্তনীর বিভিন্ন শিল্পী কয়েকটি গান গেয়ে শোনান।

আনন্দবর্ধন

রবিরশ্মির মিউজিক রুমের উদ্বোধন

দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষাকেন্দ্র রবিরশ্মির নব-প্রতিষ্ঠিত মিউজিকরুমের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এইদিন 'রবিরশ্মি'র পক্ষ থেকে পদ্মশ্রী সুচিত্রা মিত্রকেও সম্বর্ধনা জানানো হয়।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ভাস্কর বসু নতুন সংগীত-ভবনের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি ভাষণে জানান যে, সংগীত-বিষয়ে গবেষণা, গ্রন্থাগার-স্থাপন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা চিন্তা করেই এই মিউজিক-রুম প্রতিষ্ঠিত হল। গতানুগতিক শিক্ষাপ্রদানের মধ্যেই এর কর্মধারা সীমাবদ্ধ থাকবে না।

রবি-রশ্মির শিল্পীদের কণ্ঠে একটি সুপরিকল্পিত এবং সুগীত উদ্বোধন-সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ও'রা সেদিন সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া তিনটি গানে নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। বিশেষত 'পুরোনো জানিয়া'র সুর যে তাঁর কণ্ঠে কোনোদিনই পুরানো হবার নয়, সে-কথা সেদিন আবার নতুন করে উপলব্ধি করা গেল। **আনন্দবর্ধন**

রূপান্তরগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান

রূপান্তর গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত নবীন গোষ্ঠী হলেও, ওই দুদিনের অনুষ্ঠান পরিবেষণা ও পরিকল্পনার মধ্যে তাঁরা তাঁদের নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল নাটক। কুমার দীপক রচিত 'মাটি' পুরুলিয়ার ভূমিহীন চাষীদের কাহিনী। তাদের বঞ্চনা, বিক্ষোভ এবং ভ্রান্ত নেতৃত্বের ফলে কৃষকদের নানাবিধ বিপর্যয় এই নাটকের মূল বিষয়। নাট্যকাহিনীতে কিছু অমলিয়ানা অবশ্যই ছিল, প্রথানুগ নাট্যসৃষ্টির চেষ্টাও একাধিক বার লক্ষ্য করা গেছে, তবুও নাটকের মূল বক্তব্য যে বিন্দুটিকে নিয়ে তা অবশ্যই নতুনত্বের দাবী রাখে। জোতদার, জমিদার কিংবা মহাজনদের দ্বারা উৎপীড়িত চাষীদের হাহাকার বাংলা নাটকে বিরল নয়, কিন্তু তাঁদের দুর্দশার, মূলে এক শ্রেণীর কৃষক নেতার ভ্রান্ত নেতৃত্বও যে অনেকখানি দায়ী একথা এত স্পষ্ট করে বাংলা নাটকে বিশেষ বলা হয়নি। বক্তব্যের এই ঋজুত্ব নাটকটির এক গুণ।

প্রযোজনা মোটামুটি ভাব আকর্ষক। প্রধান চরিত্রে কয়েকজন শিল্পীর অভিনয় প্রশংসা পাবার যোগ্য। বিশেষ করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, ফকিরদাস কুমার, প্রণব সমাজপতি, সৌরিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বেলা সরকার। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। অংশুমান রায়ের সংগীত পরিচালনা নাট্যানুগ।

রূপান্তর-এর "মাটি" নাটকে বেলা সরকার ও দীপক মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল বাংলা গানের আসর। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অরুণ বসু, অংশুমান রায়। অনুষ্ঠানটি আকর্ষক। **—নাট্য সমালোচক**

বিবস্ত্র স্বর্গ

(শিল্পীলোক)

শিল্পীলোক-এর প্রযোজনায় রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের নাটক "বিবস্ত্র স্বর্গ" মঞ্চস্থ হল থিয়েটার সেন্টারে। নাটকটিকে যদি একটি বক্তব্যপ্রধান মেলোড্রামা বলা যায় তাহলে বোধ করি এমন কিছু অত্যুক্তি তা নয়। শ্মশানের ডোমশ্রেণীর মানুষদের জীবন-যাত্রাকে সামনে রেখে সামাজিক অবক্ষয় দেখাবার চেষ্টা এখানে শেষ মুহূর্তে অসফল এবং এ দেশ নাটকে সততাবোধ যতখানি ছিল শিল্পচেতনার অভাব পরিলক্ষিত হয় ঠিক ততটাই। তাছাড়া ভাসা ভাসা অতিনাটকীয়তা, টীম ওয়ার্কের দুর্বলতা আলোচ্য নাটকটির মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় ত্রুটি হিসেবে ধরা দিয়েছে।

নামকরণের সার্থকতা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা থাকলেও জমিদারের অত্যাচার ও লাম্পট্যের যে ঘটনাবলী নাটকে রয়েছে তা একালের বিষয় নয়। এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা বাস্তব মনে হবে জানি না, তবু এর অভিনয়ের দিকে তাকিয়ে কয়েকজনের নাম প্রশংসার সঙ্গেই উল্লেখ করা যায়। সেবা-ডোমের ভূমিকায় পরিচালক হরিমোহন চক্রবর্তী, প্রসাদপাগলরূপী প্রমোদ মুখোপাধ্যায় এবং হাবলা চরিত্রে কিশোর অভিনেতা উত্তম বিশ্বাস দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আবহসংগীত এখানে বিশেষ কোন মাত্রা যোগ করতে পারেনি। তার চাইতে বরং প্রসাদ পাগলের গান দর্শকদের ভাল লাগবে। **—নাট্য সমালোচক**

অরণ্যদেব ✫ লী ফক

ছোট মানুষটি তো অরণ্যদেবকে (নাকি ওঁর বাবাকে?) সেই পাখিটা উপহার দিলেন।
এই আমাদের সেরা পাখি। আপনাকে দিলাম।
দারুণ জিনিস দিলেন। ধন্যবাদ, রাজপুত্র, ভ্লাদ।

"অরণ্যদেব সেই পাখি নিয়ে, আগুনের নদী পেরিয়ে, ছোট্ট মানুষদের রাজ্য থেকে ফিরে এলেন।"

বুড়ো মজ-এর গল্প .....
কী, গাঁজাখুরী গল্প বলে মনে হয়?
না না, শুনতে ভারী ভাল লাগল --
7/22

কী রে, রাজা, গল্পটা কি মিথ্যে?
না, টম, আমার মনে হয়, ওয়াকার-কাকা এই পাখিটা সত্যিই ছোট্ট মানুষদের কাছ থেকে পেয়ে-ছিলেন।

ফ্রাকার পিঠে চড়ে একদিন আমিও আকাশে উঠব!
আমিও!
এখন ঘুমোবে চলো।

মিস্ টাগাসা, আজ আমি উঠোনে ফ্রাকার কাছে শুয়ে ঘুমোব?
বেশ তো, বৃষ্টি যখন নেই, তখন বিছানাটা বাইরে নিয়ে এসো।
কী মজা! কী মজা!

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে রাজা... এদিকে...

?
৮

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

গভীর অরণ্যে ঘুমন্ত রাজা আর প্রহরী বাজপাখি ফ্রাকা...

শ্‌ শ্‌ শ্‌
!

ঘুমন্ত রাজা স্বপ্ন দেখছে···এমন সময়·····
রাজা··রাজা

এ কী, এ তো দেখছি আর একটা বাজপাখি! পিঠের উপরে ও কে?
চুপ! তোমার ওয়াকার-কাকা অর্থাৎ অরণ্যদেব কোথায়?
7/29

ওয়াকার-কাকা তো এখানে নেই, দূরে কোথাও গেছেন·····
তাঁকে দরকার। আমাদের সাহায্য করতে পারে, এমন তো আর কেউ নেই। কী করি তাহলে? তুমি···তুমি আমাদের সাহায্য করবে?

সাহায্য? কী রকমের সাহায্য?
পরে বলব। যেখানে আছো, চুপ করে বসে থাকো।

আকাশ থেকে হঠাৎ অসংখ্য খুদে-খুদে বঁড়শি নেমে এল···
আরও চাই···

সেই বঁড়শিতে আটকে রাজাকে মাটির থেকে আকাশে তুলে নিল একদল বাজপাখি!
!!
৯

দেশী সংবাদ

৪ মারচ—কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থার দুরবস্থার অবনতির অভিযোগ তুলে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা ডাঃ দাশগুপ্ত কলকাতা হাইকোরটে একটি আবেদন পেশ করেছেন। এই আবেদন অনুসারে হাইকোরটের বিচারপতি শ্রীঅমিয়কুমার মুখারজি কলকাতা টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজার ও অ্যাকাউনটস অফিসারের (বিলস) উপর একটি নোটিস জারি করান। আগামী ৯ এপ্রিল এই আবেদনের শুনানীর দিন ধার্য করেছেন।

দলের কয়েকজন এম এল এ-র বিরুদ্ধে শো-কজ নোটিস জারি করা এবং হুগলি জেলা কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দেওয়া নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, আজও তা কোনও স্পষ্ট রূপ নেয়নি। বিক্ষুব্ধরা এখনও স্থির করে উঠতে পারেননি যে, তাঁরা শ্রীঅরুণ মৈত্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলার চেষ্টা করবেন কিনা।

৫ মারচ—আগামী পহেলা এপ্রিল থেকে কলকাতায় স্টেট বাসে 'প্রথম শ্রেণী' তুলে দেওয়া হচ্ছে। গত প্রায় এক বছর আগে দোতলা বাসের ওপরের তলায় এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। তিনটি পাখা ও আরামপ্রদ গদি লাগানো এই উপরতলায় যাত্রীদের অতিরিক্ত পাঁচ পয়সা বেশী ভাড়া দিতে হয়।

মঙ্গলবার ছিল পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীদের নিজেদের কোন্দলের ঝগড়ার "সই সংগ্রহ পর্ব।" এই দিন মোট তিনটি সই সংগ্রহ অভিযান চলেছে। একটা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্রের বিরুদ্ধে। আর একটা শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের বিরুদ্ধে। তৃতীয় হুগলি জেলা কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দেওয়ার বিরুদ্ধে।

৬ মারচ—হাওড়ায় সাত লক্ষ লোক বিপন্ন। জীবন বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জরুরী তার পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে: অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন। ময়লার স্তূপে ও দুর্গন্ধে শহরটি আমাদের কল্পিত নরককেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রমশ খবর আসছে, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড দ্রুত ছড়াচ্ছে। নর্দমার উপচে পড়া ময়লা জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে শ্রীবাস দত্ত লেনের একটি বাচ্চা মেয়ে মারা গিয়েছে।

ধর্মঘটী ডাক্তার-ইনজিনিয়ারদের ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য আজ চরমপত্র দেওয়া হবে। অন্যথায় সরকার ভারতরক্ষা বিধি প্রয়োগ করবেন। প্রয়োজনে সরাসরি বরখাস্ত পর্যন্ত করা হতে পারে। রাজ্য মন্ত্রিসভা ঠিক করেন, ডাক্তার-ইনজিনিয়ারদের আর বাড়তি কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না।

৭ মারচ—আজ দুপুরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারি পরলোকগমন করেছেন মাদরাজে তাঁর ছেলের বাসভবনে। তিন ছেলে, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের পাশে রেখে তিনি মারা গেলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। কৃষ্ণমাচারি নিজেই কিছুদিন আগে তাঁর সম্ভাব্য মৃত্যুদিনের কথা বলেছিলেন—৪ থেকে ৬ মারচ আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিন।

ইনজিনিয়ার ও ডাক্তারদের কর্মবিরতি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার একদিকে সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীর উচ্চতর বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণ করলেন, অন্যদিকে ধর্মঘটী ডাক্তার-ইনজিনিয়ারদের অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন।

৯ মারচ—কেন্দ্রের তদন্ত ব্যুরোর অফিসাররা ৩৬ লাখ টাকার বিদেশী মুদ্রা নিয়ে প্রতারণার এক জাল কারবার খুঁজে বের করেছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে বোমবাইয়ের ফিরোজ শা মেটা রোডে রিজার্ভ ব্যাংকের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চারজন অফিসারের অফিস ও বাড়িতে হানা দিয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাংকের কোন বিভাগে হানা দেওয়া অভূতপূর্ব ব্যাপার। ওই জাল কারবারে প্রতারণায় জড়িত ব্যবসায়ী এতদিন ধরে প্রতারণা চালাতে পেরেছে—কারণ রিজার্ভ ব্যাংকের কিছু অফিসার জড়িত ছিল।

কেন্দ্র সোনার ব্যবহার কমাতে গয়নার দোকানগুলিকে নয়া সরকারী নির্দেশ। কিছুদিন আগেই কলকাতার গয়না দোকানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—শো-কেসে গয়না সাজানো চলবে না। আলোর ঝলকানি কমাও। এমন নোটিশ আসছে—বছরে ছয়শ গ্রামের কম সোনা বা গহনা বিক্রি হলে সে দোকানের লাইসেনস বাতিল হতে পারে।

১০ মারচ—মিজোরামের লেঃ গবরনর শ্রীশান্তিপ্রিয় মুখারজি ও তাঁর নিরাপত্তা রক্ষী আজ সকালে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুলি ছুঁড়েছে কারা তা জানা যায়নি। তবে সন্দেহ এরা বৈরী মিজো। ঘটনাটি ঘটেছে আইজল থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে শিলচর-আইজল রোডে। আহত দুজনকেই আইজল সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গুজরাটের কংগ্রেস এম এল এ শ্রীদিনকর দেশাই আজ জনতার হাতে চূড়ান্ত নাকাল হন। তাঁর মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। মুখে লেপে দেওয়া হয় কালি। এমন কি গাধার পিঠে চড়াবার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পুলিস এসে তাদের সাধে বাদ সাধে।

বিদেশী সংবাদ

৪ মারচ—বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডওয়ারড হীথ আজ পদত্যাগ করেছেন। তাঁর রক্ষণশীল সরকার ৪৪ মাস গদীনসীন ছিলেন। শ্রীহীথের পদত্যাগের কারণ—সাধারণ নির্বাচনে গরিষ্ঠতা লাভে এবং পরে কোয়ালিশন গঠনে তাঁর দলের ব্যর্থতা। রাণী এলিজাবেথ শ্রমিক দলের নেতা হ্যারলড উইলসনকে বৃটেনের নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন।

৫ মারচ—শ্রমিক দলের নেতা হ্যারলড উইলসন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গতকাল ফিরে এলেন। রক্ষণশীল দলের নেতা এডওয়ারড হীথ নির্বাচনে সামান্য কয়েকটি আসনের ব্যবধানে পরাজিত হয়ে গদি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। হীথ ৪৪ মাস ধরে ক্ষমতায় আসীন ছিলেন।

৬ মারচ—শ্রীনিকসনের উকিল আজ আদালতের শুনানী উপলক্ষে বলেন, প্রতিনিধি সভার বিচার বিভাগীয় কমিটি মৌখিক অথবা লিখিতভাবে ওয়াটার গেট সম্পর্কে যা যা প্রশ্ন করবেন, প্রেসিডেনট নিকসন তার জবাব দিতে প্রস্তুত আছেন।

৭ মারচ—মারকিন প্রশাসনসূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, বৃটেনে রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিসভার জায়গায় শ্রমিক দলের মন্ত্রিসভা কায়েম হওয়ায় ভারত মহাসাগরে দিয়েগো গারসিয়া দ্বীপে ইঙ্গ-মারকিন সামরিক ঘাটি স্থাপনের সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে বিলম্ব ঘটেছে।

৯ মারচ—গতকাল গোলান হাইটের পাথুরে জমিতে ইজরায়েলী ও সিরিয়ার ট্যাংক বাহিনীর কামানগুলি পুনরায় গর্জে ওঠে। উত্তর ফ্রনটে সম্ভাব্য সিরিয়ার অতর্কিত আক্রমণ সম্পর্কে ইজরায়েল অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। দামাসকাসে প্রেসিডেনট হাফিজ আসাদ এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, যুদ্ধ আবার বেঁধে যেতে পারে।

১০ মারচ—আজ রাতে কায়রোতে আরব রাষ্ট্রগুলির তেল মন্ত্রীদের সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই বৈঠক স্থগিত রাখা হয়েছে। মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসমাইল ফাহমি এবং সৌদি আরবের তেলমন্ত্রীর মধ্যে এক বৈঠকে সম্মেলন মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম: ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
শ্রীপার্বতীকুমার মুখার্জী কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীঅধীপ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)

বার্ষিক	—	৩৫.৭০ টাকা
ষান্মাসিক	—	১৮.২০ „
ত্রৈমাসিক	—	৯.২০ „

বিমান ডাকে

বার্ষিক	—	৮৬.৭০ টাকা
ষান্মাসিক		৪৪.২০ „
ত্রৈমাসিক	—	২২.১০ „

বিদেশে
জাহাজ ডাকে

বার্ষিক	—	৫৮.৬৫ টাকা
ষান্মাসিক	—	২১.৯০ „

আমাদের লনডন অফিস মারফৎ

বার্ষিক	—	১৭৪.০০ টাকা
ষান্মাসিক	—	৮৭.০০ „
ত্রৈমাসিক	—	৪৪.০০ „

FORTIFIES YOU FOR THE DAY...
RELAXES YOU FOR THE NIGHT

ASP/JIL-V-1A/73 BEN

সর্বাধুনিক খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যার ফল ভিভা। এর পেছনে আছে পুষ্টির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের গবেষণা। আর পাঁচটা খাদ্য পানীয়ের মত ভিভাতেও আছে পুরো ননীযুক্ত খাঁটি দুধ ও বার্লি মল্ট। কিন্তু ভিভাই শুধু একমাত্র যাতে আছে হুইট মল্ট।

হুইটমল্ট কেন?

কারণ হুইট মল্টে রয়েছে সহজপাচ্য আকারে প্রকৃতিদত্ত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন আর খনিজ।

হুইট মল্ট যোগ হওয়ায় আরও নানা দিক থেকে ভিভা হয়েছে বহুগুণে ভালো। এর স্বাদ ঢের ভালো রং গাঢ় সোনালী এবং জলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়।

সেইজন্যেই আপনাদের দৈনিক আহার্যের যাবতীয় ঘাটতি পূরণে ভিভা, জুড়ি নেই।

আপনার হাতে এখন বেছে নেবার উপায় রয়েছে। আপনার পরিবারের পক্ষে যে স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয়টি আজকের সবচেয়ে ভালো সেইটি বেছে নিন।
ভিভা কিনুন।

ভারতে তৈরী করছেন:
জগতজিৎ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ভিভা
অফুরন্ত জীবনী শক্তির উৎস

Cover Printed by Ananda Offset Private Ltd.—Calcutta - 54.

দেশ

৪০ বর্ষ] শনিবার, ৮ আষাঢ়, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 23rd June, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ৩৪

আসামী হাজির

মিত্র ও ঘোষ

সূচীপত্র

ড্রাই সেলের দুনিয়ায়
বিজলীর চমক আর আওয়াজ !
ক্রম্পটন ড্রাই সেল
সুরু থেকেই অধিক শক্তি যোগায় !
সুরক্ষার জন্য উপরিভাগে একটিমাত্র কঠিন ঢাকনা !
'লিক' এড়াবার জন্য দুটো আবরণ !
Crompton
কত স্পষ্ট আওয়াজ — কত চড়া আলো !
ট্রানজিস্টার, টেপ-রেকর্ডার আর টর্চে ক্রম্পটন ড্রাই সেল লাগিয়ে দেখুন — সঙ্গীতাদি কত সুমধুর ও স্পষ্ট আর আলো কত উজ্জ্বল ! ইলেকট্রোলিটিক ম্যাঙ্গানীজ্ ডাইঅক্সাইড্ ২০% বেশী থাকায় এই সেলগুলি আরও বেশী শক্তি ধারণ করে। তাই সুরু থেকেই বেশী ভোল্টেজের যোগান দেয়... সেলগুলির শক্তি ও সামর্থ্য থাকেও বেশী দিন !
সেলগুলো 'লিক-রেজিস্টাণ্ট' !
উচ্চ ও স্থায়ী শক্তি ছাড়াও ক্রম্পটন ড্রাই সেলের উপরিভাগে একটিমাত্র কঠিন ঢাকনা লাগানো আর কার্ডবোর্ডের আবরণটি অতিরিক্ত একটি টিনের আবরণে ভরা ! তাই, নির্ভয়ে ট্রানজিস্টার ইত্যাদি সরঞ্জামে ক্রম্পটন ড্রাই সেল লাগান !
অতিরিক্ত শক্তি ও নিরাপত্তার জন্য...
ক্রম্পটন !
Crompton Greaves
AIYARS-CG.189 REV.BN
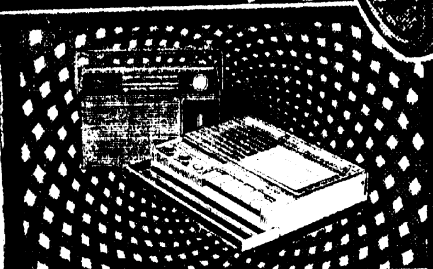
সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীরমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪০ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৪
শনিবার ৯ আষাঢ় ১৩৮০
Saturday 23 June 1973

বর্ষার শুভাগমন

বর্ষার আগমন ঘটেছে। আবহাওয়া অফিসের মতে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এখন আমাদের মাথার ওপর ঘন হয়ে আছে, কাজেই বর্ষার জন্যে আর নিমন্ত্রণ নেই। এবারে বর্ষা ঠিক সময় হিসেবে অনেক আগে দেখা না দিলেও জৈষ্ঠের গোড়া থেকেই ঝড়বৃষ্টির আসা-যাওয়া চলছিল। নিয়মিত পশলা পশলা বৃষ্টির দরুন কিছু আরামও পাওয়া গেছে; আবার পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে এই বৃষ্টি শুকনো মাটিকে ভিজিয়ে দিতে পেরেছে। কৃষির দিক থেকে এমন সুযোগ সব সময় আসে না। প্রকৃতি অন্তত এ-বছরে আপাতত সদয় হয়েছেন। যথার্থ বর্ষা যখন আসার কথা তখন থেকেই এসেছে এটাও শুভ লক্ষণ। তবে পরে কি হবে তা বলা যায় না।

নাগরিক জীবনে, অন্তত কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠে এলাকার মানুষদের বর্ষার দিনে একটা নিয়মিত ভোগ আছে। সে দুর্ভোগ প্রতি মরসুমেই সহ্য করতে হয়। এবারেও বাদ যাবে না। বরং গত পক্ষকালের মধ্যে যে দু চার পশলা জোর বৃষ্টি হয়েছে তাতে কলকাতার স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত না হয়ে যায়নি। অন্যান্য বছরের সঙ্গে তুলনা করা বৃথা, তবু শহরময় জল দাঁড়াবার নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে যথারীতি জল দাঁড়িয়েছে, ট্রাম বন্ধ থেকেছে, বাস ও অন্যান্য যান-বাহন বিশেষ চলতে পারেনি। কল-কাতার সব প্রান্তেই বড় বড় রাস্তার অনেকগুলিই খোঁড়াখুঁড়িতে অব্যবহার্য হয়ে আছে। সি এম ডি এ এ-যাবৎ যত-গুলি রাস্তার জল-জমা বন্ধ করতে তৎপর হয়েছে, সেই রাস্তাগুলি এখন খেয়ায় পারাপার হবার মতন অবস্থা। অর্থাৎ আগের হালের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন তো ঘটেইনি, উপরন্তু জলের পরিমাণ বেড়ে গেছে বলেই শোনা যায়। তার ওপর কিছু কিছু রাস্তার কাজ আধখাপচা হয়ে পড়ে থাকায় সেখানে জলকাদার ডোবা। বলতে আপত্তি নেই, যেসব কাজ বর্ষার আগে শেষ করা যায় না, বা বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, সেসব কাজে হাত দেবার কি অর্থ? হাত দিলে বর্ষার আগে তা শেষ করাই সংগত। সি এম ডি এ সম্ভবত বলতে পারবেন না, অমুক রাস্তায় তাঁদের হাত পড়ার পর সেই রাস্তার বিশেষ উন্নতি ঘটেছে। এসব কারণেই কলকাতার রাস্তা খোঁড়ার কাজ এখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বর্ষার মরসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোনো কাজ হবে না। তার পরিবর্তে এখন জমা জল বের করে দেবার জন্যে পাম্প জোটানো হচ্ছে। জানি না, পাম্প দিয়ে কোথাকার জল কোথায় ঠেলে দেওয়া হবে। কলকাতার অনেকগুলি এলাকায় জলের জন্যে নীচু ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট ডুবে থাকে, বিশেষত বস্তির চেহারা হয় অকল্পনীয়। এ ধরনের ডুবো জায়গা থেকে জল বের করার কাজে পাম্প কতটা সাফল্য অর্জন করে আমরা তা দেখার অপেক্ষায় থাকব।

এবারে বর্ষার সঙ্গে আরও একটি বিপদ মিশে আছে, তা হল বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের বিপদ। জলে ডোবা কলকাতা, খোঁড়াখুঁড়িতে বিধ্বস্ত কলকাতা এবং এলাকায় এলাকায় অন্ধকার কলকাতা নগরবাসীকে কী পরিমাণ নাজেহাল করবে তার কল্পনায় আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। সাধারণত, বিকেলের শেষে এক একদিন অন্তরীক্ষের কোনো সুরসিক পুরুষ আমাদের দুরবস্থা দেখার জন্যে কৌতূহল অনুভব করে শহরে প্লাবিত করে দেন। আমরা সভ্য শহরের মানুষরা জন্তুর মতন মরিবাঁচি করে বাড়ি ফিরি। এ বছরে তিনি কি দেখবেন জানি না। তবে আমাদের মনে হয়, বর্ষার দিনে কলকাতার সমস্ত পথেঘাটে বিদ্যুৎ ছাঁটাই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। নয়ত দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়বে।

কলকাতা পৌরসভা এবং রাজ্য সর-কারকেই এ বছরের বর্ষার সঙ্গে যুঝতে হবে। সি এম ডি এ ইতিমধ্যেই দায়িত্ব ত্যাগ করে দূরে সরে গেছে। বর্ষার পর আবার তাদের শুভাগমন ঘটবে, আবার কলকাতা নতুন করে উন্নয়নের অলংকার গায়ে পরবে।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৪৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৩৬·০০
ষাণ্মাসিক	— টাঃ	১৮·৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	৯·৫০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	টাঃ	৪৪·০০
ষাণ্মাসিক	— টাঃ	২২·৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	১১·০০

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৮৭·০০
ষাণ্মাসিক	— টাঃ	৪৪·০০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	২২·০০

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৬০·০০
মাসিক	— টাঃ	৩১·০০

লণ্ডন অফিস মারফত

বার্ষিক	— টাঃ	১৭৪·০০
ষাণ্মাসিক	— টাঃ	৮৭·৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	৪৪·০০

গতকাল

উপদলীয় বিবাদ

আজ

যা, যা বলছি !

রাজ্য কংগ্রেসে শান্তি প্রচেষ্টা

বাইশ দফার এক চুক্তির ভিত্তিতে রাজ্য কংগ্রেসে একটা রফা হয়েছে। প্রথমে এই চুক্তি অনুমোদন করেছেন দলের একত্রিশজন নেতা। গভীর রাত পর্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিংসে বৈঠক করে তাঁরা চুক্তিটি পাকা করেছেন, কিন্তু সেদিনই এই চুক্তির কথা ঘোষণা করেন নি। সেদিন শুধু ঘোষণা করা হয়েছে ঐক্যের কথা। সেদিন ওই একত্রিশজন নেতা শুধু বলেছেন : আমরা সব ভুল বোঝাবুঝি ও পার্থক্যের অবসান ঘটালাম। আমরা এখন থেকে পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করব। আমরা একযোগে রাজ্যের কল্যাণের চেষ্টা করব এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়ণের জন্য লেগে পড়ব। তার পরদিন প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসমিতির বৈঠকে বাইশ দফা প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে।

সেই বাইশ দফার মধ্যে প্রধান প্রধান শর্ত হল : সব কংগ্রেস কর্মীকে কোনও না কোনও ফ্রনটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। কোনও কংগ্রেস কর্মী একটি ফ্রনট থেকে বহিষ্কৃত হলে আবার কোনও ফ্রনটে যোগ দিতে পারবেন না। ছাত্র পরিষদ কংগ্রেসেরই অনুমোদিত একটি শাখা এবং এই শাখা কংগ্রেসেরই নির্দেশ অনুসারে চলবে। এজন্য যথোপযুক্ত সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হবে। যুব কংগ্রেস ও কৃষক কংগ্রেসকেও একইভাবে এক সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হবে। শ্রমিক ফ্রনটে কংগ্রেস কর্মীরা সবাই আই এন টি ইউ সি-র মাধ্যমে কাজ করবেন। কলকারখানা বা কোনও সংস্থায় কংগ্রেস স্বীকৃত বা অনুমোদিত একটি মাত্র ইউনিয়নই থাকবে। কংগ্রেস কর্মী বা কোনও ফ্রনটের কংগ্রেস কর্মী পরস্পরের সমালোচনা করতে পারবেন না। দলের মধ্যে কেউ বিভেদমূলক কার্যকলাপ চালালে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তিকে দলের চোখে বড় করে তোলার জন্য দেয়ালে লেখা চলবে না। দেয়ালে যেসব লেখা আছে সেগুলিকে মুছে ফেলতে হবে। সমাজবিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং আইন অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। [illegible] কংগ্রেস বা কোনও ফ্রন[illegible] [illegible]দেশ কংগ্রে[illegible] [illegible]পতির অনুমোদন ছাড়া [illegible]থাও বা বা সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করতে পার[illegible] না। কোনও কংগ্রেস কর্মী বা ফ্রনট সদস[illegible] জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বা স্থানীয় এম এল এ-কে না জানিয়ে কোনও জনসভা বা সম্মেলনে ভাষণ দিতে পারবেন
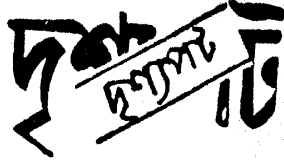
না। এ ব্যাপারে কারু কোনও অভিযোগ থাকলে তা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে জানাতে পারবেন। কোনও কংগ্রেস এম এল এ নিজ এলাকা ছাড়া অন্য এলাকার সভা-সমিতিতে ভাষণ দিতে পারবেন না। নিজ এলাকা ছাড়া অন্য এলাকায় ভাষণ দিতে হলে তাঁকে সেই অঞ্চলের এম এল এর অনুমতি নিতে হবে। ছাত্র পরিষদ ইউনিটগুলি কেবলমাত্র কলেজগুলিতে কাজ করবে। যুব কংগ্রেস নতুন সদস্য তালিকাভুক্ত করবে এবং নির্বাচনের আয়োজন করবে। কংগ্রেস কর্মী বা ফ্রনটের কোনও সদস্য পারমিট, লাইসেনস বা সরকারের কাছ থেকে কনট্রাক্ট গ্রহণ করতে পারবেন না। কোনও কংগ্রেস বা ফ্রনট সদস্যের নামে বা তাঁর স্ত্রীর নামে বা তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর নামে মদ বিক্রির লাইসেনস থাকবে না। এ রকম কিছু থাকলে তাঁকে সমাজবিরোধী বলে গণ্য করা হবে।

মোটামুটি এইগুলিই হল মূল শর্ত। এইগুলি এখন থেকে সবাইকেই মেনে চলতে হবে। যিনি মানবেন না তাঁর বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নেতারা সবাই প্রকাশ্যে আশা প্রকাশ করেছেন যে, অতঃপর সব ভালোয় ভালোয় চলবে। আর কোনও ঝগড়াঝাঁটি হবে না। এবং এই রফার পরই মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় রাজধানী একসপ্রেস যোগে রাজধানী চলে গিয়েছেন।

*

কংগ্রেস নেতারা মুখে যিনি যাই বলুন, কংগ্রেস কর্মীদের এবং জনসাধারণের সকলের মনেই এখন একটা প্রশ্ন : সত্যিই দলে শান্তি আসবে কিনা, সত্যিই ঝগড়ার অবসান হলো কিনা।

কংগ্রেসের ঝগড়া সবে যখন শুরু হল তখন যদি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এই রকম কতকগুলি আচরণবিধি তৈরী করতে [illegible] [illegible] যদি সেই আচরণবিধি [illegible] করতে [illegible] হলে অনায়াসে বলা যেত, হ্যাঁ, ঝগড়া মিটবে। হ্যাঁ এবার দলের ভেতরে শান্তি আসবে।

আজকে কিন্তু ওই কথা বলা তত সহজ নয়। কারণ, এই ব্যাপারটা দীর্ঘ-দিনের। আগের কথা না ধরলেও দল

আবার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রায় দেড় বছর হয়ে গিয়েছে। এবং এই দেড় বছরে ঝগড়াঝাঁটি অনেক বেড়েছে ও জটিল হয়েছে। গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব শেকড় অনেকদূর চলে গিয়েছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই নিজ নিজ স্বার্থও দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে গিয়েছে গোষ্ঠী নেতাদেরও নিজ নিজ স্বার্থ।

কংগ্রেসে যদি শান্তি আনতে হয় তা হলে এই আদর্শহীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক গোষ্ঠীতন্ত্রের অবসান ঘটাতেই হবে। তা না হলে ঝগড়াঝাঁটি মিটতে পারে না। গোষ্ঠীগুলি যদি থেকেই যায় তাহলে আবার ঝগড়াঝাঁটি শুরু হবেই।

দেড় বছর ধরে যেসব গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে সেগুলির অবলুপ্তি এত সহজ নয়। এইসব গোষ্ঠী গড়ার পেছনে যেসব শক্তি কাজ করেছে সেগুলি তো থেকেই গিয়েছে। সেগুলি এখনও সক্রিয়।

সিদ্ধার্থবাবু, অরুণ মৈত্র এবং দেবী-বাবু যদি বছরখানেক আগে দলের ভেতরে ঐক্য আনার জন্য এইরকম একটা চেষ্টা করতেন তাহলে দলে ঐক্য আনার কাজটা অনেকটা সহজ হত। কিন্তু তা তাঁরা করেন নি। নিজ নিজ স্বার্থের বিবেচনায় তাঁরা অহেতুক

[illegible] নষ্ট করেছেন এবং ঝগড়াঝাটি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাড়াতে দিয়েছেন। তারপর যখন দিল্লির চাপ এসেছে, তখন সক্রিয় হয়েছেন। তখন প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন একটা কিছু দাঁড় করাবার। এবং সেজন্য সর্বপ্রকারের কৌশল অবলম্বন করেছেন। যথাশক্তি চাপ দিয়েছেন।

কিন্তু শুধু চাপ দেওয়া ঐক্য বা চেপেচুপে একটা সমঝোতা আনলে কি তা বেশিদিন টিঁকতে পারে? না পারে না। তাই এই চাপের ঐক্যকে যদি সত্যিকারের ঐক্যে পরিণত করা না যায় তা হলে শান্তি বেশিদিন থাকতে পারে না। কারণ রাজ্য কংগ্রেসের ভেতরে আজ পারস্পরিক অবিশ্বাস ভীষণ বেশি। একে অপরকে প্রায় সর্ববিষয়ে সন্দেহ করেন।

এই অবিশ্বাস ঘুচতে সময় লাগবেই। এবং এই অবিশ্বাস ঘুচতে পারে একমাত্র কাজের মাধ্যমে। যদি যৌথভাবে সকলকে কাজে লাগানো যায় তাহলে সেই কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবার পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নেতৃত্ব এই রকার সঙ্গে ব্যাপক কোনও কর্মসূচী তৈরি করলেন না। শুধু বলা যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য চেষ্টা করব, বা শুধু বলা যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রীমতী গান্ধীর কর্মসূচী রূপায়ণের চেষ্টা করবো, সেটা যথেষ্ট নয়। ওতে খুব বেশী এসে যাবে না। প্রয়োজন হল একটা নির্দিষ্ট সুষ্ঠু কর্মসূচী। যে কর্মসূচীতে কর্মীদের সক্রিয় করে তোলা যাবে এবং জনসাধারণকেও উদ্বুদ্ধ করা যাবে। যে কর্মসূচীতে হাজার হাজার ছেলেকে মাতিয়ে তোলা যাবে।

নির্বাচনের পরেই কংগ্রেস নেতাদের উচিত ছিল দলের সামনে সেইরকম একটা কর্মসূচী রাখা। সেটা যদি তাঁরা রাখতে পারতেন তাহলে আজ দলের এ অবস্থা হত না। আজ দল এতটা বেকায়দায় পড়ত না। দলের ভেতরে যে জোতদার শ্রেণীর লোকেরা ও সরকারী অনুগ্রহপ্রার্থীদের আবার ভিড় বেড়েছে ও বাড়ছে তাও হতে পারত না।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এত ঠেকেও তাঁরা শেখেন নি। এবারও তাঁরা দলের সামনে কোনও কর্মসূচী রাখলেন না। কর্মীদের কোনও কর্মসূচী দিলেন না।

যদি এই কর্মসূচীহীন অবস্থাই চলে তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই আবার ঝগড়াঝাটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে বাধ্য। এবং সেটা শুরু হবে এই ২২ দফা আচরণবিধি কার্যকরী করা নিয়েই। এই আচরণবিধি মেনে চলতে গেলে সকলেরই স্বার্থে কিছুটা ঘা পড়বে। সুতরাং সবাই কিছুটা যদি-কিন্তু করবেন। সবাই দেখতে চাইবে অন্যপক্ষ এই আচরণবিধিমত ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা, মানছে কিনা। এবং হাতে অন্য কাজ না থাকলে এই নিয়ে ঝগড়াঝাটিই হয়ে উঠবে একমাত্র কাজ। পারস্পরিক অবিশ্বাস যেখানে খুব বেশি সেখানে কাজের মধ্যে ছাড়া আর কোনও অবস্থায় ঐক্য আসতে পারে না।

*

প্রশ্ন হতে পারে, কী কাজ দেবেন কংগ্রেস নেতৃত্ব?

অনেক কাজ দিতে পারেন। যেমন ধরুন, গ্রামে লুকোনো জমি উদ্ধারের কাজ, ছোট চাষী ও ভূমিহীনকে সাহায্য করার কাজ। ছোট চাষী যাতে সরকারী সাহায্য পায়, ভূমিহীন যাতে খাস জমি পায় এবং চাষের জন্য সরকারী সাহায্য পায় তার জন্য সক্রিয় হতে পারেন কংগ্রেস কর্মীরা। এ কাজে কলকাতার ছেলেদের নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এ কাজে মফঃস্বল অঞ্চলের ছেলেদেরই লাগানো যেতে পারে। তাঁরা সঠিক নেতৃত্ব এবং কর্মসূচী পেলে এই কাজ ভালভাবেই করতে পারেন। এতে রাজ্যের প্রচুর উপকার হতে পারে।

রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ যে সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করেছেন সেটা কার্যত ঠাণ্ডা ঘরে। অথচ পশ্চিম বাংলাকে বাঁচাবার জন্য এর চেয়ে ভাল পরিকল্পনা হতে পারে না। এই পরিকল্পনা অবিলম্বে চালু করা উচিত এবং সেই কাজেও ছেলেদের লাগানো যেতে পারে। অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার সমর্থনে জনমত গঠন, তাতে সবাইকে আগ্রহী করে তোলা, এই পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য সকলকে একত্র করা—এসব কাজে ছেলেদের লাগানো যেতে পারে। যদি তা লাগানো যায় তাহলে এর মধ্য দিয়েই নতুন পশ্চিম বাংলার বনিয়াদ গড়ে তোলা যাবে এবং গড়ে তোলা যাবে সেই নতুন বাংলা গড়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মীদল। ভবিষ্যতে এরাই পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে উঠতে পারবেন।

বৃহত্তর কলকাতা পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন সেই কাজের সমর্থনে জনমত গঠনের ব্যাপারেও কংগ্রেসের ছেলেদের লাগানো যেতে পারে। কাজগুলি ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা সেইটা দেখার জন্য তাদের লাগানো যেতে পারে। এই কাজে যদি বাধা দেখা দেয় তা দূর করার জন্যও ছেলেদের লাগানো যেতে পারে। লাগানো যেতে পারে এই মহানগরীকে পরিষ্কার রাখার কাজে। এমন প্রচুর কাজ আছে যা করা দরকার এবং সেইসব কাজে খুব সুষ্ঠুভাবে ছেলেদের লাগানো যেতে পারে। তাতে দলেরও লাভ হয়। দেশেরও লাভ হয়। এবং ছেলেদেরও লাভ হয়।

এইভাবে গঠনমূলক কাজে দলকে বিশেষ করে দলের ছেলেদের লাগিয়ে দেওয়াই ছিল রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের দায়িত্ব। নির্বাচনের পরই এই কাজ শুরু করা উচিত ছিল। কিন্তু তা তাঁরা করেন নি। এখনও তাঁরা তা করছেন না।

সময়মত কর্মসূচী না দেওয়ার ফলে দলে যে শুধু ঝগড়াঝাটি মারদাঙ্গা বেড়েছে তাই নয়, দল থেকে ভাল ছেলের অনেকে সরে গিয়েছে এবং খারাপ লোক ও কুচক্রীদের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছে। গ্রামে গ্রামে আজ জোতদার মহাজনরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শহরে সরকারী কৃপাপ্রার্থীরা দলে ভিড় করছে। বড় লোকরা, কালোবাজারীরা নানা ধরনের খেলা সুরু করেছে। কংগ্রেসের ইমেজ ক্রমেই নষ্ট হচ্ছে। দলের নেতৃত্বেও যুব শক্তির বদলে জোতদার শ্রেণীর লোক ও কুচক্রীদের প্রাধান্য বাড়ছে।

এই যে বাইশ দফা আচরণবিধি তৈরী হয়েছে এর মধ্যেও দেখুন উভয় গোষ্ঠীর যুব সম্প্রদায়কেই নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা বেশি। নিয়ন্ত্রিত বললে বোধ হয় একটু কম বলা হবে। বলা উচিত, তাঁদের খর্ব করাই এর প্রধান লক্ষ্য। এবং এই আচরণবিধির মাধ্যমে আজ দলে যাঁদের ক্ষমতা বাড়ল তাঁরা হলেন সেইসব লোক যাঁদের সাধারণভাবে স্বার্থান্বেষী, কুচক্রী ও জোতদার শ্রেণীর লোক বলা চলে। যুক্তফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন এরা অনেকেই অনেকটা চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন লড়ছিল ছেলেরা। ধীরে ধীরে সেই ছেলেদের সরিয়ে দিয়ে এরাই আজ দলের ক্ষমতা পুরোপুরি দখল করে নিলেন। এই বাইশ দফার ফলে শুধু প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বা সুব্রত মুখার্জি খর্ব হন নি, খর্ব হয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত বসু, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রভৃতিরাও।

এই কুচক্রী স্বার্থান্বেষী ও জোতদার মনোভাবের প্রবীণরা আর যাই করুন, দলে তরুণদের আকৃষ্ট করতে পারবেন না। ফলে দল থেকে ক্রমে ক্রমে তরুণরা আরও সরে যাবে এবং কংগ্রেস আবার পুরোপুরি সেই ৬০-৬৫ সনের কংগ্রেসে পরিণত হবে।

এই কংগ্রেস আর যাই পারুক, পশ্চিম বাংলাকে রক্ষা করতে পারবে না।

১০।৬।৭৩।

নবারুণ গুপ্ত

মানুষ মারা ব্যবসা

দেবরাজ

ইংরিজীতে একটা কথা আছে—বিজনেস ইজ বিজনেস অর্থাৎ ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা, তার সঙ্গে পাপ পুণ্য, দয়া ধর্ম, ন্যায় অন্যায়, মায়া মমতা, নীতি দুর্নীতির কোনও সম্পর্ক নেই। কথাটা ইংরেজ চিরদিন মেনে এসেছে। তবে তার ওপর দিয়ে যায় তার সাকরেদ আমেরিকা। ব্যবসা বজায় রাখবার জন্যে এককালে ইংরেজরা দুনিয়া জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য ফেঁদেছিল। আমেরিকানেরা অবশ্য সে পথে যায়নি, কেননা রাণী প্রথম এলিজাবেথের যুগের চাল তো আর দ্বিতীয় এলিজাবেথের যুগে চলে না। কিন্তু পয়সা লোটবার জন্যে হেন ব্যবসা নেই যা তারা করেনি, ব্যবসার খাতিরে হেন কাজ নেই যা তারা করেনি। ডলারের ফাঁসে তারা সারা দুনিয়াকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছে। দাতা বলে দুনিয়াতে তাদের ইদানীং যে নাম রটেছে তাও আসলে ব্যবসা। লাখ লাখ ডলার তারা গরিব দেশগুলোকে সাহায্য বাবদ দিচ্ছে এ কথা ঠিক। কিন্তু সে সাহায্য পুরোপুরির কারবারদারি। দানছত্র তারা আদপে খোলেনি। সাহায্য যে দেশ পায় তাকে মার্কিন ডলার খরচ করতে হয় দুনো দাম দিয়ে মার্কিন জিনিস কিনে। বেশ কিছু সুদও ঘরে আসে আমেরিকার।

হালে নতুন এক ব্যবসায় নেমে পড়েছে আমেরিকা। ব্যবসাটা অবশ্য ঠিক নতুন নয়, বেশ পুরোনোই। কোটি কোটি ডলার আমেরিকা খাটাচ্ছে সে ব্যবসাতে। মুনাফাও কামাচ্ছে প্রচুর। মার্কিন দেশের সব ব্যবসার মতো এ ব্যবসার মালিকও বেসরকারী ধনপতিরা যাঁরা আমেরিকায় সংখ্যায় অগুনতি। নতুনত্বের মধ্যে হচ্ছে এ ব্যবসাতে সরকারেরও নেমে পড়া—বেসরকারী মালিকদের সঙ্গে জুটে তাঁরাও দিব্যি মুনাফা কুড়োতে লেগে গেছেন। মালপত্তর তৈরি হচ্ছে বেসরকারী মালিকদের কারখানায় কারখানায় আর দুনিয়ার হাটে তাদের ফেরি করে বেড়াচ্ছেন মার্কিন সরকার। সরকারী ছাড়পত্র ছাড়া সে সব জিনিস বিদেশে রপ্তানি করা বারণ। সে ছাড়পত্র সরকার দিচ্ছেন বেছে বেছে। তাতে অবশ্য মালিকদের কিছু এসে যায় না। তাদের মুনাফা নিয়ে কথা। হিসেব মতো তা মিললেই হলো। তা ছাড়া বাজারে মাল কাটানো তো এক ঝকমারি। সে ঝক্কি যদি নেন সরকার নিজে তবে তাতে চতুর ব্যবসাদারেরা আপত্তি করবে কেন?

ব্যবসাটা হচ্ছে লড়াইয়ের সরঞ্জাম কেনাবেচার অর্থাৎ মানুষমারার উপকরণ যোগানো। সে সব সরঞ্জাম অপরিহার্য অনেক সরকারই তৈরি করতে পারেন না আজকাল। তার জন্যে তাঁরা নিজেরাই কারখানা চালান। কিন্তু নিজেদের খাই মেটাবার ক্ষমতা খুব কম দেশের সরকারেরই আছে। নিজেদের খাই মিটিয়ে ভিন দেশে চালান দেবার মতো বাড়তি লড়াইয়ের সরঞ্জাম যে সব দেশের আছে তাদের সংখ্যা তো হাতে গোনা যায়। আজকের দুনিয়াতে তাদের সবার সেরা হলো আমেরিকা। নিজের চাহিদা মেটাবার সামর্থ্য তার তো আছেই, আছে অন্যকে ধরাতে গেলে অফুরন্ত সে সব জিনিস যোগান দেবার। দুনিয়ার হাটে লড়াইয়ের মালমশলা বিক্রী করে পয়সা কামায় ব্রিটেন আর ফ্রান্সও বটে। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে টেক্কা দেবার সাধ্য তাদের কারুর নেই। তবে আমেরিকা যেখানে পাইকারী হারে লড়াইয়ের নানান সরঞ্জাম সরবরাহ করে তার পেছনে পেছনে এসে দুজনেই খুচরো জিনিস তারাও যোগান দেয়। তাদের মালপত্তরের অজস্র নেই বটে, তবে সে সব জিনিস খুব উঁচুদরের।

গো-মড়কে যেমন মুচির পার্বণ, তেমনই যারা মারণাস্ত্রের কারবারদার যুদ্ধ বাধলেই তাদের মোচ্ছব লেগে যায়। দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে সেই সুযোগেই খুঁজে বেড়াতেন স্যর বেসিল জাহারফ আর স্যর চার্লস্ ক্রাভেন। লোকে তাঁদের যে যমদূত বলতো তা কিছু মিথ্যে অপবাদ নয়। ১৯২১-২২ সালে গ্রীকদের সঙ্গে তুর্কীদের যে লড়াই বেধেছিল তা তো লাগিয়ে দিয়েছিলেন স্যর বেসিল জাহারফই চক্রান্ত করে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঝড়তিপড়তি মাল যোগান দেবার মওকা তাতে তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। স্যর বেসিলের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছিল লয়েড জর্জের দৌলতে। এখন মার্কিন সরকার সুবিধে করে দিচ্ছেন তাঁদের দেশের মালদার ব্যবসায়ীদের সামরিক সাহায্য দেওয়ার অজুহাতে বিদেশে অবাধে অস্ত্রশস্ত্র বেচবার হুকুম দিয়ে। এতদিন আমেরিকা কম্যুনিস্ট জুজুর ভয় কংগ্রেসের কাছ থেকে দেশে দেশে অতি আধুনিক যুদ্ধের মালমশলা পাঠাবার অনুমতি আদায় করেছিল। চীনের সঙ্গে আঁতাতের পর সে সাফাই তো আর টিকছে না। তবুও দরাজ হাতে অস্ত্র সাহায্যের নাম করে আমেরিকা দেদার সাজাচ্ছে পাকিস্তানকে, দক্ষিণ কোরিয়াকে, দক্ষিণ ভিয়েতনামকে, ইরানকে, কুয়েতকে, সৌদি আরবকে। তার দাক্ষিণ্য ভোগ করছে দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, মায় চিলিও।

দক্ষিণ কোরিয়া কী দক্ষিণ ভিয়েতনামকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার তবু একটা কৈফিয়ত আছে। কম্যুনিস্ট-অকম্যুনিস্ট বিরোধ ও অঞ্চলে মেটেনি। কিন্তু পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার অর্থ যে কী তা বুঝতে আজ আর কষ্ট নেই। তবুও আমেরিকা তাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দিয়েই যাচ্ছে কখনও দাম নিয়ে কখনও দাম না নিয়ে। তবে ইরানকে যে সে অস্ত্রশস্ত্র বেচছে তাতে তার প্রচুর লাভ। এক বছরেই নাকি তিনশো কোটি ডলারের জিনিস আমেরিকা বেচেছে সে দেশকে। এমনই চলবে অন্তত আরও দু বছর। কী না কিনছে ইরান আমেরিকার কাছ থেকে? জঙ্গী হেলিকপ্টার, বোমারু বিমান, উড়ন্ত বিমানে শূন্যে তেল ভরতে পারে এমনিতর জেট ট্যাঙ্কার, আরও কত কী। টাকার অভাব নেই ইরানের। অঢেল টাকা ইরান রোজগার করছে পেট্রোল বেচে। তাই দিয়ে সে লড়াইয়ের সরঞ্জাম কিনছে আমেরিকা থেকে তো বটেই ব্রিটেন আর ফ্রান্স থেকেও। তাদের এতে দুনো লাভ। এক দু পয়সা পাওয়া যাচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র বেচে, আবার তেলও যোগাড় করা যাচ্ছে যার ঘাটতি দুনিয়া জুড়ে দেখা দেওয়ার উপক্রম হয়েছে।

আমেরিকা এক ইরানকেই লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম বেচছে না, বেচেছে সৌদি আরবকে ষাট কোটি ডলারের মাল। সবসুদ্ধ তাকে বেচবে এক শো কোটি ডলার দামের জিনিসপত্তর। ক্ষুদে কুয়েতও খরিদ করেছে ৫০ কোটি ডলারের অস্ত্রশস্ত্র। ইরানের মতো এদেরও তেল বেচা টাকা। সে টাকা নিয়ে কী করবে তা তারা ভেবে পাচ্ছে না। যত টাকাই এদের আয় হোক তেল বিক্রী করে দেশের লোকেরা আজও খুবই গরিব। কিন্তু গরিবি ঘোচাবার কোনও চেষ্টা না করে তারা মেতে উঠেছে মরণ খেলায়। তাদের নাচাচ্ছে আমেরিকা নিজেদের বাড়তি লড়াইয়ের সরঞ্জাম কাটাবার জন্যে। রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আর চীনকে রুখতে আমেরিকা তার অস্ত্রশস্ত্র তৈরির বহর এত বাড়িয়েছে যে অত মাল নিয়ে কী করবে তা ঠিক পাচ্ছে না। সে খরচের খানিকটা সে তুলতে চেষ্টা করছে বাড়তি সরঞ্জাম বিদেশে বেচে। তাতে উত্তেজনা বাড়ছে, যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। আমেরিকার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। অতশত ভাবতে গেলে কী আর ব্যবসা করা চলে, না দুনিয়াতে মুরুব্বিয়ানা করা যায়? দশ বছরে তার অস্ত্র রপ্তানি থেকে আয় একশো কোটি ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনশো চল্লিশ কোটি ডলারে। সে কী কম কথা!

কবির লেখা উপন্যাস

ইদানীং বেশ কয়েকজন কবি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। ব্যাপারটা কৌতূহলোদ্দীপক হলেও নতুন কিছু নয় অবশ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েকটা বছর শুধু মনে হয়েছিল কবিতা রচনা ও গল্প-উপন্যাস রচনা সম্পূর্ণ আলাদা দুই ধরনের লেখকদের কাজ। কিন্তু আবহমান কালের বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখকই একসঙ্গে সাহিত্যের এই দুই শাখায় বহু সাবলীলভাবে বিচরণ করেছেন।

সম্প্রতি উপন্যাস রচনাকারী কবিদের নামের তালিকায় নবতম সংযোজন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম উপন্যাস, হাংরাস। এই উপন্যাস কোনো পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়নি, সরাসরি বেরিয়েছে গ্রন্থাকারে।

এর আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য লিখেছেন নানা রকম। তাঁর 'ডাক বাংলোর ডায়েরি' একটি উল্লেখযোগ্য বই। বিভিন্ন সময়ে তাঁর রিপোর্তাজ ধরনের আলগা লেখা বহু পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। বাংলাদেশের যুদ্ধের পর তাঁর 'ক্ষমা নেই' রচনা প্রচুর বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়া বিদেশী ভাষা থেকে উপন্যাস অনুবাদের কাজও তিনি আগে করেছেন। কিন্তু তাঁর মৌলিক উপন্যাস এই প্রথম।

যে-কোনো লেখকের পক্ষে, প্রথম উপন্যাসটি আত্মজীবনীর আদলে লেখাই সুবিধাজনক। তাতে গল্প বানাতে বা খুঁজতে হয় না। আবার নিজের জীবনটাকে ইচ্ছে মতন বদলাবার স্বাধীনতাও পাওয়া যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক আর একজন কবি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'পিতৃপুরুষ'-এ আত্মজীবনীর রূপটিই গ্রহণ করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অবশ্য আত্মগোপন করার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনের ছাপ উপন্যাসটির সর্বাঙ্গে।

হাংরাস একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। সার্থক দুটি কি তিনটি। এই উপন্যাসটি শুধু সার্থক নয়, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবাল্য রাজনৈতিক কর্মী। সুতরাং প্রথম উপন্যাস রচনার সময়, তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর সব চেয়ে বেশী জানা বিষয়টিই গ্রহণ করেছেন। জেলখানার পটভূমিতে ডায়েরির আকারে লেখা এই উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে প্রথমে সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরীর কথা মনে পড়বেই। কিন্তু এই দুটি উপন্যাসের গতিপথ বিভিন্ন।

হাংরাস কথাটি বাংলার স্ট্রাইকের সংক্ষিপ্ত রূপ—শ্রমিক কৃষকের মুখে মুখে কথাটি যেভাবে বদলেছে। জেলখানার মধ্যে একদল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ জানাচ্ছিলেন, সান্ত্রীরা প্রতিরোধ করে, শেষ পর্যন্ত গুলি চালায়—কয়েকজন মারা যায়। বাকিরা অনশন শুরু করে দিলেন। দাবি না মেটা পর্যন্ত অনশন।

ভারতীয় জেলে দীর্ঘকাল অনশনের রেকর্ড আছে তিরিশের যুগে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পর লাহোর জেলে—যতীন দাস যাতে মারা যান। তার চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে অজয় ঘোষের লেখা 'ভগৎ সিং

—

অ্যান্ড হিজ কমরেডস' বইতে। গান্ধীজী প্রবর্তিত এই অস্ত্রটি সব দলের কর্মীরাই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তখন অস্ত্রটি প্রযুক্ত হতো বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে। এই উপন্যাসের রাজনৈতিক কর্মীরা অনশন করছেন স্বাধীন দেশে, তাঁদের সহকর্মীরা নিহত হয়েছেন দেশীয় সরকারের পুলিসের গুলিতে।

এই উপন্যাসে লেখক কোনো রকম সাল তারিখ ব্যবহার করেন নি, বিশেষ কোনো আন্দোলনকেও ফোটাতে চান নি। বিষয়টিকে তিনি আর একটু উঁচুতে তুলে, মানুষের অধিকারের লড়াই হিসেবে রূপ দিতে চেয়েছেন। তবু অনুভব করা যায় সেই কাকদ্বীপ-তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের দিনগুলোর সময়—যখন সারা দেশ জুড়ে বিপ্লব শুরু হয়ে যাবার আর দেরি নেই, এমন একটা সুখকর চিন্তা অনেককেই উদ্বেল করে তুলেছিল। যে সময় রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। জেলখানার মধ্যে অনশন করাকেও জেলের বাইরে যরা আছে—তারা মনে করছে বেশী নরম পন্থা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় উপন্যাস রচনার কোনো প্রথাসিদ্ধ নিয়ম মানেন নি—তাই তাঁর রচনায় একটা চমৎকার টাটকা স্বাদ ফুটেছে। যেন সব কিছুই চোখে দেখা বর্ণনা, অথচ বিবরণ মাত্র নয়, তার চেয়ে অনেকখানি বেশী। এই উপন্যাসে দুটি চরিত্র পাশাপাশি চলেছে—একজন হচ্ছে বর্ণনায় 'আমি', যে একজন মধ্যবিত্ত সংসারের যুবক, শৈশবে মাতৃহারা, দাদু-দিদিমার কাছে মানুষ, পার্টির পত্রিকার কর্মী, কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক কিন্তু পার্টির ধ্যানধারণার সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য সব সময় উন্মুখ। সেই 'আমি' ভবিষ্যতের একটি উপন্যাসের খসড়া হিসেবে জেলখানার মধ্যে তার এক সহকর্মী—বাদশা নামে পরিচিত একজন মুসলমান যুবকের জীবন কাহিনী নিয়মিত শোনে এবং টুকে নেয়। এইভাবে অনশনের দীর্ঘ দিনগুলিতে দুজন স্বপ্ন-দেখা মানুষের সম্পূর্ণ জীবন উন্মোচিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, কলকাতার একটি নোংরা বস্তির অতি দরিদ্র ঘরের ছেলে বাদশা কি করে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ক্রমে ক্রমে শ্রমিকদের মধ্যে একজন নেতা হয়ে উঠলো—সেই কাহিনী অদ্ভুতভাবে বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্যের মতন বিস্ময়কর। মুসলমান সমাজ নিয়ে এরকম অকৃত্রিম, ভাবালুতাবর্জিত সার্থক রচনা বাংলায় কদাচিৎ চোখে পড়ে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি আদর্শবাদের, কিন্তু চ্যাঁচামেচি বা স্লোগান নেই। সাধারণত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি এমন রসকষবর্জিত ও উচ্চকণ্ঠ হয় যে পড়তে ইচ্ছে করে না। সেই সব লেখকরা ভুলে যান যে, মানুষকে গড়তে হয় মানুষেরই আদলে, তার দুর্বলতাগুলো বাদ দিলে তাকে নিত্যসঙ্গী করা যায় না। অনশনব্রতীর দৃঢ়তা দেখাতে গিয়েও এই লেখক যখন বলেছেন, ফোর্স ফিডিং-এর সময় পেটের মধ্যে গরম দুধ পড়লে ভারী আরামের অনুভূতি হয় এবং ফোর্স ফিডিং করাতে না এলে অভিমান হয় মনে—কিংবা আপোসের কথাবার্তার জন্য গাড়ি এলো কিনা জানার জন্য মন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে—তখন সেই মানুষকে খুব চেনা লাগে। মনের এই সব দুর্বলতাকে যারা দমন করতে পারে—তারাই শ্রদ্ধার্হ। যাদের এই সব দুর্বলতা একেবারেই জাগে না—সব সময়ই আদর্শ জপ করে, সে আমাদের কেউ নয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষা অত্যন্ত ঝরঝরে ও স্বচ্ছ। কবিদের লেখা গল্প বলতে অনেকে এক ধরনের ধোঁয়াটে কষ্ট-কল্পিত বোঝে—যা আমার দু' চক্ষের বিষ। এই উপন্যাসটি পাঠ করা একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

সনাতন পাঠক

ফ্রেস্‌কাকে অভিনন্দন জানান
ফ্রেস্‌কা বিউটি ট্যাল্‌ক তাজা মনমাতানো গন্ধে আর তুষার শুভ্র লালিত্যে আপনাকে ঘিরে রাখবে। ফ্রেস্‌কার চাপা সোনালী বর্ণচ্ছটায় আপনার কান্তি হবে কমনীয় তার রূপ হবে রমণীয়।
ফ্রেস্‌কার শীতল সৌরভে সজীব তরুণ বোধ করবেন। নিন ফ্রেস্‌কার মধুর স্পর্শ।
দু'টি সাইজে পাবেন—
ফ্রেস্‌কা বিউটি ট্যাল্‌ক
গোদরেজের তৈরী
ফ্রেস্‌কা মানে-তরতাজা
Beauty Talc
fresca
Interpub/GSF/9/73 BN

শব্দ

মণীন্দ্র গুপ্ত

বনজ গন্ধের তুল্য কিছু শব্দ ক্রমে তার কবিতায় আসে
কেননা সে পাখিদের মতো শীতদুপুরে গহন বনবাসে
ঝরাপাতাদের মধ্যে ঘুরেছিল, সালাকোসে পোকাদের ক্যামোফ্লাজে
শুয়েছিল কড়াইশুঁটির ক্ষেতে বুক পেতে—আলস্যে—সবুজে।

তার কিছু শব্দে বেশ রং ছিল এবং আঘাত
কেননা সে দোলদেবতার সঙ্গে দেয়াসিনীদের উদ্ভ্রান্ত সাক্ষাৎ
দেখেছিল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝামাঝি। দেখেছিল :
মেঘের করেণু
নেমেছে গোধূলিজলে, প্রিয় নারীটির মুখে ঝরে যায়
অলীকের রেণু।

তার কিছু শব্দ ক্রমে শব্দহীনতার দিকে যায়
কেননা এখন তার দিন কাটে ভ্রমরের মতো
বিশাল পদ্মের মধ্যে মুগ্ধ মধুপান ক্রমাগত—
ক্রমে মাতোয়ারা—বুঁদ—ক্রমে অতলের ধ্বনি শুনতে পায়।

আত্মচরিত

জিয়া হায়দার

আমাদের পৃথিবীতে সবিতাকে এনে
দেবো বলে যে হাতে ধরেছি অস্ত্র, অতি
সন্তর্পণে, অন্ধকার নিধনের হেতু,
সর্বস্ব দিয়েছি বিসর্জন—

নির্লজ্জ প্রকাশ্যে ব্যস্ত রয়েছি এখন
সুনীতি এবং ন্যায় সত্যকে নির্মম
উল্লাসে হত্যার সাধনায়।

মিথ্যা উষ্ণীষের ভারে সদম্ভ সাহসে
নিয়েছি প্রতিজ্ঞা দৃঢ়, জয়ী
অথবা শহীদ হবো সহাস্যে নির্ভীক—

ক্রমশই এ পৃথিবী থেকে
মুছে দেবো সব সূর্যালোক,
প্রগাঢ় তুমুল অন্ধকারে
গেয়ে যাবো বীররসে ভেসে
উদ্বাহু নৃত্যের তালে বেতাল বেসুর
জীবনের খেউড় আখড়াই॥

ইতিহাস

পার্থসারথি চৌধুরী

পরিচিত সব লোক নরনারী যুগলে হারিয়ে গেলে
কতিপয় তরুণ কিশোর থাকে বাকি,
এইসব কিশোরেরা অঙ্গদকুণ্ডলকণ্ঠী অলঙ্কাররাশি
ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে, হাতে তুলে তোমার অক্ষয় তূণ
অমোঘ শরগুলি...।

অধিকার মৃত্তাপণ গেরুয়াবসনে চলে যায়,
পুরাতন পৃথিবীর পথে
চরণের চিহ্ন রয় আঁকা।

শহরবাসের পাপে তাবৎ জনতা অভিভূত,
দিনগত চাতুরীতে বঞ্চনার ক্ষতের প্রলেপ,
স্নায়ুভারে বিস্মরণ কি করবে নিয়ে এই মনুষ্যজীবন,
লুপ্ত সাধ শ্রম তৃষ্ণা প্রসন্ন প্রভাত,
মধ্যরাত্রি জনহীন করে তরুণ কিশোর চলে যায়।

বিশাল অরণ্য তার স্নেহকোলে ডেকে নেয় তারে,
মধুপর্কে পিপাসার তরল মাধুরী,
দর্পণে সমস্ত মুখ আশা ভবিষ্যৎ :
বজ্রবাহু তুলে ধরে শরাঘাতী জন্তুর শরীর,
সমবেত বহ্নি থেকে উঠে আসে মদামাংসপ্রেম,
বক্ষশিখে আন্দোলিত অয়স্কান্ত প্রত্যয়ের দিব্যদেহ ঝলো।

সভ্যতার সব ভ্রান্তি অলীক নগর সমস্ত মধ্যাহ্নে পুড়ে যায়,
রক্তসন্ধ্যা শিলাতলে কিশোরেরা বীজমন্ত্রে সত্যেরে জাগায়।

জাগরণ — নিজ বাসভূমে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

ঘুমিয়ে রয়েছো—স্নিগ্ধ জোড়হাতে,
যেখানে পিতলই শুধু জেগে ওঠে মুদ্গর আঘাতে
সেই ঘুমে। তারো চেয়ে বড়ো জাগরণ
আর কি এসেছে? দেখি আবছা সুপারিবন
করে যাওয়া-আসা,
মাথার ভিতরে খুব গভীর কুয়াশা
যায় ভরে—
প্রহরে প্রহরে।

সে কি ছবি, না কবিতা? না কি বিড়ালের
থাবা শুধু? নৌকো এসে হালকা সকালের
কাছে বাঁধা পড়ে, তাকে জলবায়ু আদর দিয়েছে, দিতো আরো
রাতভর— এই শর্তে, যদি না কৌটোয়
ভ্রমরের কাছে গিয়ে ভ্রমরীরা শোয়।
অমন সংসর্গখেলা, হারজিত, বাঁশি ও হাততালি
শরীরের থেকে আজ মুছে দেয় তালি।

এখন বুকের কাছে সকাতর এই জোড়হাত
আর কে ছিঁড়বে? কার মুঠোয় সে চলে যেতে পারে দৈবাৎ
খিল ভেঙে, গোপনে। শব্দের হাত-পা
স্বয়ংক্রিয় কি? —না।
ঘণ্টা বেজে ওঠে, ঘরে জল : চিরজীবনের স্বচ্ছ ঘুমে
বৃন্তচ্যুত সে—ঠোঁটে, জাগরণে—নিজ বাসভূমে।

মানিয়া মুরমু-কে ওরা কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে এলো। রোদ তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মাথার ওপর সূর্য হাজার হাজার জ্বলন্ত উনুন সাজিয়ে বসেছে। সেই আঁচে শুকিয়ে যাচ্ছে সব। মাটি থেকে ভাপ উঠছে। কাছে-পিঠে গরু পর্যন্ত নেই একটা। গরুর গলায় 'ঘরাকি'র আওয়াজ নেই।

জঙ্গল-বাবুর অফিস আর কোয়ার্টার এক সঙ্গে। কুয়োতলার পেছন থেকে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে, টানা চলে গেছে সেই কুড়ুর বাস-রাস্তা অবধি। শাকুর, মহুয়া মেধ, সিধ, জটাসিঙ্গার ঘন বুনোট জঙ্গল।

ভোর হলে গরু-মোষের গলার ঢং-ঢং শোনা যায়। বকোয়া হতে পাথর ভাঙতে, মহুয়া কুড়োতে জঙ্গলে যায় ভূমিহীন শুঁড়ি-সাউ, হরিজন আর আদিবাসী। ফরেস্ট গার্ডরা যায় গাছ দাগরাজি করতে।

মানিয়া মুরমুকে যখন ওরা বেঁধে নিয়ে আসে, তখন কোথাও কোন সাড়া শব্দ ছিল না, মানুষ-জন ছিল না, গাছপালাগুলো নিঃশব্দে পুড়ে যাচ্ছিল। সব কিছু ব্যেপে এক অলীক জলের ছায়া কাঁপছিল তিরতির

করে।' মাঝে মাঝে বরফের কুচির মতো শিমুল তুলো উড়ে উড়ে এসে পড়ছিল। সেই অবস্থায় তা-ও এক মায়া।

মানিয়াকে ওরা ইউক্যালিপটাস গাছের সঙ্গে বাঁধল। ওর পাকানো, কালো শরীরে তখন আর রুখে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। শরীরের রক্ত জল হয়ে কপাল, বুক বেয়ে গড়িয়ে—আধ হাত নেংটির তলায় সেঁধিয়ে যাচ্ছে। খেঁড়ু গাইয়ের মতো বোকা বোকা চোখ। পেটের ভেতর এক প্রবল ফাড়াফাড়ি চলেছে। দু' দিন পেটে কিছু পড়েনি। দু' দিন ঘর থেকে পালিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল মানিয়া। শুধু আমলা চিবিয়ে থেকেছে। এখনো ঠোঁটের কষে শুকিয়ে আছে তার রস। সেই সময়, এই শালা খোঁজারুগুলো দানোর মতো গিয়ে পড়ল। মানিয়ার হাতে বলোয়া ছিল। হয়তো চালিয়েই বসত। 'যাঃ শালা দিকু, মরগা। জঙ্গল-সরকার তুর জম্মকালের বাপ, বাপের ঘরকে যা।' অন্তত একটা মুণ্ডু নির্ঘাত খসে যেত।

কিন্তু কারিকার কথা মনে হওয়ায় মানিয়া বলোয়া সামলেছিল। আর সেই সঙ্গে ভেসে উঠেছিল একটা কচি কালো মুখের আদল। মুখটা এর মধ্যেই ঝাপসা হয়ে গেছে। মানিয়া আর যেন তাকে ঠাহর পায় না। শুধু মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট স্মৃতি এই মরীচিকার মতো তিরতির করে কাঁপে। বড় কষ্ট দিয়েছিল কারিকাকে। ওর বুক, পেট, জন্মস্থান সব যেন ভূমিকম্পের মতো কাঁপিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। যন্ত্রণায় মাটি কামড়ে কারিকা বলেছিল, 'ই ছেল্যা লয় গো,ছেলাম লয়। দানো বিয়াইছি আমি। তাথেই এত কষ্ট।'

জঙ্গলবাবু দুপুরের খাওয়া সেরে, ঘর অন্ধকার করে চৌকিতে গড়াচ্ছিলেন। বগলে, বুকের লোমে তখনো খামচা-খামচা পাউডার। বারান্দায় খুরসি পাতা, তাতে গি এসে বসলেন। মানিয়া তার দিকে তাকাল না। তাকাতেও আর পারছিল না। চোখের ভেতর যেন জবাকুসুমের কুচি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে; রোদের এত তেজ। ঘাম গড়িয়ে চোখের পাতা জুড়ে যাচ্ছিল। হাতটা পেছন দিকে মোড়া। কিছু করবারও উপায় নেই। মানিয়া জিব দিয়ে নাকের টপটপে ঘাম চাটতে লাগল।

'কি বাপ, তুমার নামটি কি আছে?'

মানিয়া জবাব দিল না। ঠোঁট তুলে সাদা দাঁতগুলো বের করে দেখাল।

জঙ্গলবাবু পচ্ করে পানের পিক ফেললেন। 'শালা কথা কানকে লিচ্ছিস নাই? নাম কি? বাপের নাম তক্ ভুলায়ে ছাড়ব, ইটে জানবি! রামু, বেতটো লিয়ে আয় ত!'

এ জনহীন জঙ্গলে রামুই জঙ্গলবাবুর অর্জুন, বৃহন্নলা, অরণ্যবাসে সে-ই আবার ভীম হয়ে রান্না করে। আসলে তাঁর শ্বশুর-

বাড়ির গাঁয়ের ছেলে। একটু ছোট জাত; তা হোক্‌, কে দেখতে আসছে, তিনি তার হাতে খাচ্ছেন কিনা! বউ জানে, তার অভাবে রামু স্বামীর গা-হাত-পা টেপে, ফাই-ফরমাশ খাটে, কুয়ো থেকে জল তোলে, বাসন মাজে। কিন্তু রাত পড়লে যখন জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই জেগে থাকে না, জঙ্গল-বাবু তখন রামুর সঙ্গে বসে অনেক গল্প করেন। ট্রানজিসটার বাজান। দূরে, কচ্ছে-পিঠের ব্যাপ্ত চরাচরকে মনে হয় স্তব্ধ অভিসারিণীর মতো। কেউ যেন তাতে কোনদিন উপগত হয়নি। কুমারী মেয়ের মতো অস্পৃষ্ট।

জঙ্গলবাবু তখন পাকা, প্রাচীন পাপীর মতো একাই তার বুকে কলংক এঁকে দিতে থাকেন। কুয়োতলার কাছে কাঁঠালগাছ। সেই কাঁঠালগাছের তলায় বসে চুপি চুপি মহুয়ার বোতল খোলেন। খেয়ে রামুর হাত ধরে হু-হু করে কাঁদেন। তখন মুখ থেকে নিজের দেহাতি ভাষ বেরিয়ে আসে। যদিও ভাষার কোন সমস্যা এখানে নেই। একমাত্র ভাষা, জৈব, আদিম পেটের ভাষা।

জঙ্গলবাবু গার্ডকে বললেন, বেত চালাতে। কয়েক ঘা পড়তেই মনিয়ার শরীরটা সামনে লটকে এলো। মুখে ফেকো পড়তে লাগল।

'নাম বলবি নাই?'

'মানিয়া হুজুর। মানিয়া মুরমু'।

'তু জঙ্গলে আগ লাগাইছিলি?'

মনিয়া কোন জবাব দিল না। ঘাড় নাড়ল এ-পাশ ও-পাশ। গার্ডের হাতে বেতটা লক্ষ করল। মুখে ফেকো পড়ছে। মাটিতে থুথু ফেলল কয়েকবার।

'ই জঙ্গলে তুর বাপের আছে? সরকার উয়ার বিটিছেলার সাথে তুর বিয়া দিবেক? তু মন করেছিস কি, এ্যাঁ? শালা, দেড়লাখ টাকার গাছ লাগালম। তু আগ লাগাবি, ইয়ার লেগে? হেই—চালা, বেত চালা—'

সপ সপ করে বেত চলল। মানিয়া দাঁড়িয়ে খাবি খেতে লাগল। আর সে তাকাতে পারছে না। চোখের সামনে কেবলি জবাফুল ফুটছে, ফাটছে; তার কচ ছিঁড়ে পড়ছে।

'কেনে আগ লাগাইছিলি?'

'ভুখ হুজুর, ভুখে...'

'সরকার বিনি-মাগনা মহুয়া দিলছে নাই? শালা নমকহারাম। তু আগ লাগালি কেনে বল্‌?'

'কিছু ঠাহর করত্যে লারলাম অজ্ঞা উ শালা গিদ্ধড়টো...মাথাটো কেমন ঘুরায়ে দিল...আমার বেটছানাটো হুজুর, আমার বেটাছানাটে ...'

মানিয়ার মুখে কথা আটকে যায়। শরীর বেঁকে আসে ধনুকের মতো। তিরিশ বছরের যোয়ান-মরদ ছোট ছেলের মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। ভালো করে কাঁদতেও পারে না। ব্যথা করে ওঠে পেট; পেটে কিছু নেই। একটা কোঁ-কোঁ আওয়াজ ওঠে। যেন বিহানের মুরগি ডাকছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। এ-প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই। রোদ যেন তার ভেতর থেকে সব শোঁ-শোঁ শুষে নিচ্ছে। মানিয়ার দু' চোখের দুই মণির বদলে দুটো রক্তজবা। রক্তনাড়িতে প্রবল টান পড়ে। কুমোর-চাকার মতো বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে থাকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। সব কিছু ভুলে যাবার আগে মনিয়ার মনে হল, তার শরীরে আগুন লেগেছে। মনে হল, এই আগুনে যদি সে ছড়িয়ে দেয় সব জায়গায়? বনে, জঙ্গলে, লোকালয়ে দুনিয়ার যত দিকুর কপালে? ছড়িয়ে যদি এক লংকা-কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়ে?

সাতদিন ধরে মস্ত মেলা বসেছিল। গাঁয়ে গাঁয়ে গরু এসেছে। দূরে দূরে থেকে লোক এসেছে সেই গরু নিয়ে। দু' তিনদিন হেঁটে। গরু কেনা-বেচা হবে, টাকা হাত-বদল হবে। গোঁজেয় ওঠবার আগে ভাগাবানরা কিছু কিছু টাকা ঢেলে যাবে এখানে।

'মানুষের কত সাধ! চালবেক নাই! যার যত টাকা, উয়ার তত সাধ। সাধ বিনা কি মানুষ হয় রে?' বলেছিল কারিকা।

কিন্তু সে মেলায় যেতে চায়নি। তার সাধ নেই। কেনন, তার সাফ কথা, তার টাকা নেই, যার টাকা নেই, তার সাধও থাকতে নেই।

কিন্তু মানিয়া পীড়াপীড়ি করেছিল। বলেছিল, 'চল, চল। দেখে আসিগা। কত নাচা-কুদা হলছে। বাজার বসা গেইছে। শুনলম, ঘোড়ার পারা এক একটা গাই আনছে। কি তেজ, টগবগ টগবগ ছুটো বুলছে!'

'তু যা কেনে! আমি বেটাছানাকে লিয়ে ঘরকে থাকি।' তারপর একটু থেমে বলে-ছিল, ঘরে একটাও পয়সা নেই। একদানা খুদ নেই, পারলে মনিয়া যেন যাহোক কিছু জোগাড় করে নিয়ে আসে। নিজেরা না-হয় যাঁটো খেয়ে চালিয়ে দেবে। কিন্তু ছেলেটাকে অন্তত একটু আমানি তো দিতে হবে। অবশ্য কারিকার বুকে অনেক দুধ। কিন্তু দুধ সে চিরকাল পাবে না। তাই কারিকার কথা হল, ওর কপালে যা নাচছে তা এখন থেকেই ধরিয়ে দেওয়া ভালো।

মানিয়া একটু চটে গিয়েছিল। কারিকার খালি পয়সা আর খাওয়ার ভাবনা। দুনিয়ায় যেন আর কোন চিন্তা নেই। সাধ-আহ্লাদ নেই। এই যে সিং-বোঙ্গার এত বড় পৃথিবী সেটা যেন কেবল ফেন আর আমানিতে ডুবে আছে! তাছাড়া, ওটা মানিয়ার দুর্বলতম জায়গা। সেই জায়গায় বারবার ঘা দিলে কোন্‌ মরদ সইতে পারে?

'তু খালি পইসার ধান্দা করিস কেনে, কারিক? পইসা মোদের কুনো দিন রইবেক নাই। ইটো জানবি। আমার বাপটোর ছিল নাই, আমার নাই, ছেল্যাটারও থাকবেক নাই। ইয়ার লেগে এত খেদ কেনে? ধুলুকে গড়াগড়ি খায়ে' শ্যাষে যেয়ে' একদিন শিঙ্গা ফুঁকো দুব।'

কিন্তু মানিয়া শুধুই ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে মরতে চায় না। তার আগে যতটা পারে সে চেখে নেবে, দেখে নেবে। তারপর যঃ শালা, মরগা!

সুতরাং কারিকাকে সে একরকম জোর করেই নিয়ে চলল। তাছাড়া, মেলায় গেলে কেউ না কেউ নির্ঘাৎ তাকে মহুয়া খাওয়াবে। আজকাল নিয়মিত জোটে কই! শালা ডিংলে শুঁড়ি ধরে মাল ছাড়তে চায় না। জঙ্গলের মহুয়া কুড়িয়ে যখন বেচে আসে তখন দু'-এক বোতল আংড়ে নেয়। তাও কি দিতে চায়? হিসেবের সময় পয়সা কাটে।

আর যখন পাথর ভাঙার কাজ পায়,

হপ্তা মেলে তখন দম-ভরে খায়। আগে কারিকাও খুব খেত। খেয়ে মানিয়াকে জাপটে ধরে 'সনা-সনা' বলে আদর করত। কিন্তু ছেলেটা হবার পর এই পাঁচ মাসে কারিকা খুব বদলে গিয়েছিল। এখন খালি ভাবনা করে, মনে স্ফূর্তি নেই। এখন খালি চালের খুদ, জন খাটার পয়সা আর ঝড়তি-পড়তি ভুট্টা সেদ্ধ করে ঘাটে বাঁধাবার হিসেব কষে।

দু' বছর আগেও কি ডাটো চেহারা ছিল কারিকার। শংড়ি ডিংলে বলত, ডাকানো চেহারা। 'শরীল তো লয় যেন খালি ডাকছে, আয়-আয়।' লিকলিকে বাঁশের মতো সরু কোমর। কিন্তু পিঠ, কাঁধ মানানসইভাবে চওড়া। ডান বুকে সূর্য আর বাঁ বুকে চন্দ্র। সাপের মতো ঝাপটে ঝাপটে পথ চলে।

তখনো কারিকা মানিয়ার হয়নি। তখন ফাড়িংবাবু ওর পাশে পাশে খুব ওড়াউড়ি করছে। জাত গোয়ালার ছেলে ফাড়িংগা এত-দূরে থেকে সেই পুরুলিয়ায় গিয়ে ড্রাইভার না কি হয়েছিল। গালের হনু-ওঠা, হাড়-ডিগডিগে তার চেহারা। ছুঁচলো প্যান্ট আর আঁটো জামা পরে গাঁয়ে আসে। সেই জন্যে ফাড়িংগা হয়েছে ফাড়িংবাবু। কারিকার জন্যে হেজেলিন, প্লাস্টিকের চুড়ি আর কি-সব পঁচাপঁচা বিশ্রী ছবির বই আনে।

সেই ব্যাটা ফড়িংগা কারিকার পাতলা-কোমরের মর্ম কি বুঝবে? কারিকার এক বুকে সূর্য, এক বুকে চন্দ্র। তার তাপে ব্যাটা ফড়িং পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবে চাপের চোটে। তাই, এক রবিবারের হাটে ফড়িংবাবুর সঙ্গে মানিয়ার সলোয়া চালাচালি হয়ে গিয়েছিল। দু' জনেই তখন নেশায় বেহুঁশ। ভাগ্যে বেশি দূরে গড়ায়নি। ফড়িংবাবুর বাঁ হাতের দুটো আঙুল শুধু ফাড়িংগের মতো উড়ে গিয়ে-ছিল। ডান হাতের গেলে আর গাড়ি চালাতে হত না। সেই অপমানে ফড়িং আর গাঁয়ে আসেনি।

মানিয়া বিয়ে করে এনেছিল কারিকাকে। বিয়েতে শিঙা বেজেছিল, মাদল বেজেছিল। ফুলিয়া আর দুলিয়া গাঁয়ের দুই হিজড়ে। তারা এসে নেচে গিয়েছিল। শালা হানিফ খালি বকরি গস্থাবার তালে থাকে। তাই মানিয়ার ঘরের খাসিটাকেই কাটতে হয়েছিল। বস্তির দু' চারজনকে বলতে হবে তো!

তারপর এই তো পাঁচ মাস হল ছেলেটা হয়েছিল। পাঁচ মাস ক' দিন। খুব টানাটানি চলছিল ছেলেটা কারিকার পেটে আসার পর থেকে। পাথর কাটার কাজ সব সময় জুটছিল না। আর ছিল জন-খাটা, তাও তো মহাজন বলতে ওই বড় সাউরা। ওদের হাতেই যত পয়সা, জমি। ওরা একমেটে ধান করে, আঢ়কি আর ভুট্টার চাষ করে। সেখানে জন খাটতে মানিয়ার মতো অনেকেই যায়। বাধ্য হয়েই যায়। কিন্তু ইচ্ছে করে না, মন চায় না। মনের ভেতর চাপা ক্ষোভ, অস্বস্তি পোষা থাকে। ওরা যেসব দিকু। বাইরে থেকে নতুন এসে বসতি করেছে। পঞ্চাশ কি এক শ' বছর—কি তারও আগে ওরাই তো মানিয়া এবং তার মতো লোকেদের জায়গা-জমি সব নিয়ে নিয়েছে। তাদের বাপ-পিতামহরা খুব ডাঙগর ছিল যাহেক। পাঁচ-সাত পয়সায় জমি দিয়ে দিয়েছিল। কেউ কেউ কিছুই পায়নি। এই বন-জঙ্গল, নদী-নালা, দূরের ওই ছোট ছোট বুরু, পাহাড় সবই তো একদিন তাদের ছিল। তখন তাদের পূর্ব-পুরুষরা কত সুখে-শান্তিতে থাকত। আকাশ আর মাটি কত কাছে ছিল। আকাশ থেকে সিং-বোঙ্গা নেমে আসতেন। বর্ষার সময় তুমুল বর্ষা হত আর শীতের সময় কনকনে শীত। রোদের এত তাপ ছিল না কি তখন! বাপরে বাপ, যেন হাজারটা চিতা ধকধক করে জ্বলে। এই যে ঘরে ফসল নেই, পেটে দানা নেই, পেছনে টানা নেই—এ তো সব অমঙ্গলের, অনাসৃষ্টির লক্ষণ। আকাশ মাটিতে এক কড়া লেন-দেন নেই। সিং-বোঙ্গার অভিশাপেই এসব হয়েছে। এখন দানোতে ভরে গেছে দুনিয়া। নইলে এ ভারি জঙ্গলে শিয়ালের খাদ্য জোটে না। শিয়াল নাকি আজকাল ঘরের উঠোন অবধি চলে আসছে। পেটের টান এমন টান যে ভ

ডর বলে কিছু নেই।

প্রকাণ্ড মাঠের চারধারে সা[illegible] উঠেছে। জারি দোকান-বাজার বসে গেছে। শাক-সব্জি, চাল-ডাল, চিঁড়ে, নুন বস্তা বস্তা শুকনো লংকা, হলুদ, ভেলিগুড়, রকম রকম জামাকাপড়, গরুর খোল, পায়ের নাল —কি নেই এখানে! সব মিলবে। আরনা আছে, মেটে সিঁদুর আছে, আলতা-পমেটম আছে, গিল্টি-করা চন্দ্রহার, রুপোর বাউটি আছে। ফুলিয়া আর দুলিয়া ঢোল বাজিয়ে, হাত তালি দিয়ে নাচছে আর গাইছে!

'অড়ে-উড়ে অলি বউ
টাইড়ে দাড়্যালি
চ্যালা কাঠের মাইর খায়ে'
সরাই' দাড়্যালি
আ-ছাটা চালের ভাত
কুঁচে মাছের ঝোল
খবলায়ে' খালি যে তুই
কত ভুখে ছিলি...'

একটু তফাতে গাছের আড়ালে নেশা করার জায়গা। দুটো করে কেরোসিন কাঠের বেঞ্চি ফেলা সেখানে। পয়সা খসালেই এন্তার তাড়ি আর মহুয়া মিলবে। ডোবার পাশেই মশার আড্ডার মতো আরো একটেরে দুটো তাঁবু। শুঁটকো শুঁটকো 'লালটিন' মেয়ে-মানুষেরা সেখানে দাঁড়িয়ে রঙ্গ-তামাশা করছে। তাদের চোখের কালি গাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। গালে আলতা, চোখে সুর্মা, কপালে কাচপোকার টিপ। থেকে থেকে বিদ্যুতের মতো বিলোল কটাক্ষ ছুঁড়ছে তারা শুঁড়ির দোকানের দিকে। দু' একজন হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছে, টলতে টলতে, চুপি চুপি, সুড়ুৎ সুড়ুৎ ঢুকে পড়ছে তাঁবুর ভেতর।

মানিয়া খুব সগর্বে কারিকাকে বলেছিল, 'কি ভারি মেলা বসইছে ইয়ারা' যেন ইয়াদের মধ্যে সে-ও আছে।

কারিকা ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'তাথে মোদের কি? উ খালি দেখ্যাদেখি আর ঘুরে বল্যা-ই সার। মাথায় রোদ লাইগে' যাবেক ছেল্যাটার।' বলে বাচ্চার গায়ে ভালো করে আঁচল-চাপা দিয়েছিল। ওকে ওর সঙ্গেই এনেছিল। কোথায় রেখে আসবে! চালের টনটনে জ্বালার ভেতর থেকে একমাত্র সিল্কের খসখসে শাড়িটা বের করে পরে নিয়েছিল কারিকা। কিছু পয়সা ওই জ্বালার ভেতরেই লুকিয়ে রেখেছিল। সঙ্গে নিয়েছিল সেটা। অন্তত একসের যেমন-তেমন চাল কিনতে হবে। আর যদি কিছু টুকিটাকি মেলে।

দেড় হাজার টাকায় একটা গাই বিক্রী হতে দেখে চোখ কপালে উঠেছিল কারিকার। কত মণ নাকি দুধ দেয়। কি পুরুষ্টু বাঁট। আহা, ছেলেটার মুখে যদি ওই বাঁটে গুঁজে দেওয়া যেত গো! চকচক করছে গা। যেন আলো ঠিকরোচ্ছে। মানিয়া খবর করে জেনে-ছিল, গাইয়ের মালিক নাকি হপ্তায় তিন দিন ঘেনো ঢেলে তার গা ডলে দেয়।

সব দেখা-শোনা হয়ে গেলে মানিয়া ছুঁক ছুঁক ছটফট করছিল। কারিকা বুঝতে পারছিল ওর মতলব। কিছু পয়সা তাই সে গুঁজে দিয়েছিল ওর হাতে। কিন্তু তাতে মানিয়ার কি হবে? তার কেন, তার পাঁচ মাসের ছেলেটারও তো এ-পয়সায় নেশা হবে না। কিন্তু সেই খেই ধরেই মানিয়া শুঁড়িখানায় মক্কেল ও মাল দুই পাকড়ে ফেলল।

ততক্ষণে কারিকা চাল কেনে। লাল, মোটা চাল, তাও ভাঙা ভাঙা; গরুর খাদ্য। তাই এক টাকা বাট করে সের। তারপর শালপাতায় জড়িয়ে দুটো ফুলুরি কিনে গাছতলা দেখে বসে। ছেলেকে বুকের দুধ দেয়। নিজে ফুলুরি খেতে খেতে নজর রাখে, মানিয়া কখন বেরোয়।

'চল্ কারিকা, ঘরকে যাই।' মানিয়া যখন বেরোয় তখন ওর পা টলছে। চোখ দুটো খেঁড়ু গরুর মতো। বিকেলের আলো তখন পড়ে এসেছে। শত শত গরুর খুরের ধুলোয় আকাশ ঝাপসা। ধুলো-ওড়া মাঠ পড়ে-আসা আলো, মানুষ-পশুর মিলিত হাঁক ডাকের মধ্য দিয়ে ওরা দুটো অলীক ছায়ার মতো ঘরে ফিরে চলল।

এ তল্লাটে জঙ্গলের সব হদিশ মানিয়ার জানা। নিজের গায়ের রোঁয়ার মতোই চেনে বেহুঁশ অবস্থাতেও তার দিক্-ভুল হয় না কারিকাও চেনে।

জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে কে যেন হঠাৎ এক পোঁচ ফিকে অন্ধকার মাখিয়ে দেয় মানিয়ার চোখে। কিন্তু তখনো যথেষ্ট আলো ছিল। আরো যেতে অন্ধকার চেপে এলো। গাছপালা সব এগিয়ে এলো। যেন এক বিশাল চক্রান্ত করে সব জায়গার সব গাছপালা কেবলি পথ রুখে দিতে লাগল। ওদের পায়ে পায়ে আওয়াজ হচ্ছিল। মানিয়া হাতের বলোয়া এদিক-ওদিক চালাতে চালাতে যাচ্ছিল। যদি কোন ডালপালা বেরিয়ে থাকে। খোঁচা লাগতে পারে কারিকার শাড়িতে, বেটাছানার গায়ে। বেটাছানাটা একটু আগে কাঁদছিল। এখন নেতিয়ে পড়েছে।

ওরা প্রায় এসেই গিয়েছিল।

কিন্তু কারিকা আর পারছিল না। বহুক্ষণ ধরে চেপে রেখেছিল। সেই কখন বেরিয়েছে! মেলায় একটুও আড়াল অবসর মেলেনি। চার ধারে শুধু লোকজন। একটু আড়াল করে বসা দরকার। তলপেটটা বড্ড টনটন করছে। মানিয়াকে বলেছিল, শুধু এইটুকু খানিক আগলে থাকো। আমি বসি।

মানিয়া সারা রাস্তায় একটা কথা বলেনি। তখনও কিছু বলল না। তার মাথার ভেতর তখন এক প্রকাণ্ড মেলা বসেছে। শুধু গাছপালা, মানুষ, হিজিবিজি, দেড় লাখ টাকা, 'লাকটিন' মেশিন সবই একসঙ্গে পানকৌড়ির মতো ডুব দিয়ে উঠছে, জড়াজড়ি করে নাচছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। অথচ বুকটা তার ভারি ভারি, ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

সামনেই গাছের ওধারে বসেছিল কারিকা। বেটাছানাকে কোলেই রেখেছিল, মানিয়াকে ধরতে দেওয়া নিরাপদ মনে হয়নি। শুধু একটু খচখচ শব্দ হচ্ছিল। জঙ্গলে অমন কত শব্দ হয়। শুকনো পাতা ঝরে, কাঠবেড়ালি লাফায়। কারিকা কিছুই বোঝেনি। হঠাৎ তার ডান পাশে কি যেন নড়ে উঠল, মনে হল। দুটো আগুনের ভাঁটা, দুটো আগুনের গোলা। সঙ্গে সঙ্গে দুটো বিশ্রী, বেঁটে মুখ; অন্ধকারে একবার দাঁত খিঁচিয়ে, কাছের বাতাস শুকিয়ে গোঁ করে উঠল। তারপর ঝটপট শব্দ। বেটাছানাটা একবার কেঁদে উঠেছিল। কারিকা চিৎকার করবার আগেই তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল শিয়াল দুটো।

সেই রাতেই লোকজন এসে টিন পিটিয়ে জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলেছিল মানিয়া আর কারিকা। কিন্তু বেটাছানাকে আর পাওয়া যায়নি। কারিকা তারপর থেকে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। খায় না কথা বলে না। খালি বুক চাপড়ায় আর বলে, 'শেয়াল নয় গো, আমিই মেরে ফেলেছি বেটাছানাটাকে।'

তখনো কারিকার ডান বুকে সূর্য, বাঁ বুকে চন্দ্র। কিন্তু দেহটা তার দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। দেহ যেন ক্ষয়িষ্ণু ধরিত্রী।

সেই সময় একদিন জঙ্গলে মহুয়া কুড়োতে গিয়ে মানিয়া গাছে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। যাঃ শালা, সব পুড়ে যাক, জঙ্গলো ছার হয়ে যাক। ই শালা দুনিয়া ঠারে-ঠারে চিতা সাজায়েছে। কারো পার নাই। আমি অধম মানিয়া মুরমু। আমার বাপটো বাঁচা-কালে শান্তি পায় নাই, আমি শান্তি পাই নাই, আমার বেটা ছানাটোর শান্তি মিললো নাই। আমি পরের লেগে শান্তি-বাঁধ বুঝাকে পাব। যাঃ, যাঃ, সব পুড়ো বা।

যেন মন্ত্র পড়ে-পড়ে আগুন ছিটিয়ে দিচ্ছিল মানিয়া মুরমু।

জঙ্গলবাবু কাঁঠালগাছ-তলায় চাটাই বিছিয়ে মহুয়ার বোতল হাতে নিয়ে বসলেন। বাবুকে সেদিন আর ডাকলেন না। বাড়ি বকর-বকর করতে ভালো লাগছিল না। টিনজিনসটার সঙ্গে এসেছিলেন। চালাচ্ছেন না, চাটাইয়ের ওপর সেটা পড়ে রইল উঁচু-নিচুর মধ্যে। সারাদিন খুব ধকল গেছে, কিন্তু ভাবনা মাথা থেকে নামছে না। লোকটা খাঁটি আচ্ছা লেকায়-পড়া ফেলে দিল সাহেবকে। এরা সেখানে সব কাঠ-কাঠুরেদের মতো কিছু হাড়-বজ্জাত। কাউকে বিশ্বাস নেই, কখন ফাঁসিয়ে ছাড়ে! এখন ছোট শালা হেড-অফিস। ডি এফ ও সাহেব তো হাতে মাথা কাটবেন! তবু কি ভাগ্য, বেশি গাছ বরবাদ হয়নি।

আর সরকারও হয়েছে তেমনি। হঠাৎ হুকুম হল, দেড় লাখ টাকার গাছ লাগাতে হবে এবার। পাই পয়সা পর্যন্ত খরচ তিনি হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ তো বিছুটি-ঝাড়ের অমা। কাঁহাতক পাহারা দিয়ে থাকা যায়! এত বড় জঙ্গলে একা-একা টিমটিম করছেন তিনি! দূরে আগুন লাগলে তাঁর কি করবার আছে? গার্ড কটাকে নিয়ে ছুটে যেতে যেতেই তো জঙ্গল জ্বলে খাক হয়ে যাবে। তারপর ওই হারামজাদা কণ্ট্রাকটারগুলো! ওরা তো সব সাপের বাচ্চা। গাছকে গাছ সাবাড় করে দিলে তিনি ওদের হাতে নাতে ধরবেন কি করে? সরকার একটা গাড়ি দেবে না, আগুন নেভাবার ব্যবস্থা রাখবে না। অথচ বলে, জঙ্গল দেখ। না-হয় ঘোড়াই দিক।

লোকটাকে তার আরো পেটার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার আগেই বেহুঁশ হয়ে গেল। দেখতে জোয়ান-তাগড়া কিন্তু ভেতরে কিছু নেই। থাকবে কি করে! পেটে কিছু পায় নি কদিন। আর খুব রোদ খেয়েছিল পেটাতে ওকে। সাহেব কাল দেবেন কিনা

জঙ্গলবাবু ভাবতে লাগলেন। নিজেকে বাঁচাতে ওকে চালান করতেই হবে। খবর পেয়ে বউটা এসে খুব কান্নাকাটি জুড়েছিল। বলছিল, ওদের ছেলেকে নাকি শিয়ালে নিয়ে গিয়েছে। তাই শোকে লোকটার মাথার ঠিক ছিল না। সত্যি-মিথ্যে এক ভগবানই বলতে পারেন। তবে এদের হাড়ে-হাড়ে ভেলকি খেলে।

এই সব ভাবতে ভাবতে জঙ্গলবাবুর বোতল শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল অন্ধকার বাড়ছে। হাতের ঘড়ি দেখলেন, ঘড়ির কাঁটায় অন্ধকার। তাঁর চোখও জুড়ে আসছিল। জঙ্গলবাবু হাঁক পাড়লেন, 'রামু খাবার নিয়ে আয়।'

রামু বাঁগ-থালায় রুটি, ডাল, ঝিঙের তরকারি দিয়ে গেল। আর বাড়িতে পাতা একটু দই। জঙ্গলবাবু আঁচালেন শুদ্ধি করলেন। তারপর হাত বা থালার দিকে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, শিয়াল দেখলেন একটা। তারপর এ ও-পাশে তাকিয়ে শুধুই শিয়াল পেলেন। সামনের এবং পেছনের অ অন্ধকার ভেদ করে কেবলি শিয়াল ে আসতে লাগল।

॥ ১৬ ॥

বেশ কিছুকাল ধরে এখানে আছে অভিজিত। এদেশের আদব-কায়দা রপ্ত হয়েছে। অর্থাভাবের প্রথম ঝুঁকিটা কাটিয়ে ওঠার পর সামলে নিয়েছে সব দিক। ধার-দেনা কিছু হয়েছিল বন্ধু-বান্ধবের কাছে। ক্রমে সব শোধ করে দিতে পেরেছে কায়িক পরিশ্রম করে, রোজগার করে।

শুধু, যে-ভাবে ও পড়াশোনা করবে ভেবেছিল, তা হয়ে উঠলো না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি। তারপর সন্ধে থেকে রাত নটা পর্যন্ত ক্লাস। মিচেল লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা একটু আধটু। ঘরে ফিরে আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ দিয়ে ভাত কোনোদিন। কোনো দিন তা-ও না। এক বোতল দুধ খেয়ে শুয়ে পড়া। সপ্তাহের শেষে পাবলিক বাথ-এ স্নান। যেহেতু, তখন যেখানে ওর আস্তানা ছিল, সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং ভাড়া, সেখানে একটা ভাগের পায়খানা ছাড়া আর কোনো সুবিধে ছিল না। শোয়া, বসা, রান্নাবান্না, পড়াশোনা সব একটা ঘরে।

ছুটির দিন-টিনে কখনো ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় কারি-রাইস খেয়ে আসতো। কখনো বা নিজে রাঁধতো। এ-দেশে বেশ ভালো চাল পাওয়া যায়, কিন্তু মটন মানে ভেড়ার মাংসে বড়ো দুর্গন্ধ। অগত্যা ও ভালো দেখে গরুর মাংসই কিনতো। আদা-পিঁয়াজ-রসুন গরম-মশলা দিয়ে চমৎকার মাংস রাঁধতে শিখে গিয়েছিল অভিজিত। ভাতের ফ্যান গালতে শিখেছিল। তবে খরচ তাতেও কম পড়তো না। এক বেলা রেঁধে দু' বেলা খেয়ে ও পুষিয়ে নিত খরচটা।

প্রথম বছর বড়দিনের সময় পোস্ট-অফিসে ঠিকে কাজ করে বেশ কিছু টাকা রোজগার করেছিল অভিজিত। ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত এই শীতের দিনে, বৃষ্টির দিনে, কার্ড বিলি করার কাজ। পার্শেল দু'-চারটে। পাঁচ শিলিং ঘণ্টায়—কম কী। তার ওপর টিপ্‌স্। সেই রোজগারের টাকায় ও কিছু পোশাক বানিয়ে নিয়েছিল। এই-ভাবে কাটলো প্রায় চার বছর। চার বছরে বড় ছেলে, সংগতি থাকলে, ডাক্তার ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে যায়। অভিজিতে একটা ছোট ডিপ্লোমা কুড়োলো মাত্র।

চার বছর কৃচ্ছ্রসাধন করার পর হাতে কিছু টাকা জমিয়েছিল অভিজিত। ঘর পালটে একটা অপেক্ষাকৃত ভালো আস্তানায় উঠে এসেছিল।

ইতিমধ্যে চাকরি বদলেছে দু'বার। এখন একটা বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি স্থিত। এখানে মাইনে ভালো, সহকর্মী ছেলে-মেয়েরা ভদ্র। শরীরের শক্তি দিয়ে নয়, মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হয় এখানে। তাই অভিজিতের ভালো লেগেছে কাজটা। সান্ধ্য-কলেজে পড়ে পাওয়া ডিপ্লোমার জন্যই যে এ-কাজটা পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে, ও জানে। এদেশে এটুকু পড়াশোনা করার মতো উৎসাহী ব্যক্তিও বেশি নেই, প্রয়োজন অনুসারে।

স্কুলের পরীক্ষা পাস করার পর সাধারণ ছেলে-মেয়ের পক্ষে উচ্চ শিক্ষায় বাধা আছে এদেশে। উজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরোজা মাড়াতে পায়। আর বাকি সব নানান চাকরিতে লেগে পড়ে। উঁচু আর নিচু স্তরের চাকরিজীবীর মধ্যে মজুরির বিশেষ তারতম্য নেই দেখে অভিজিতের ভালোই লাগে।

কথাটা ঠিক বলা হলো না বোধ হয়। মজুরির তারতম্য আছে খানিকটা, কিন্তু মোটামুটি সচ্ছল জীবনযাত্রা প্রায় প্রত্যেকেরই আয়ত্তের মধ্যে।

অভিজিতের নিজের অফিসেই যেমন। সব মিলিয়ে পঁচিশ-তিরিশজন কর্মচারী। তাদের মধ্যে উনিশজন নিজের গাড়ি করে কাজে আসে। সারি সারি গাড়িগুলো পার্ক করা থাকে অফিসের বাইরে, দেখে নিজের দেশের কথা মনে পড়ে যায় অভিজিতের। যেখানে মোটর গাড়ির মালিক নিজেকে উঁচুস্তরের নাগরিক মনে করেন।

সবচেয়ে মজা লাগে, অভিজিত যখন দেখে, পাশাপাশি একই মডেলের নতুন দুটো গাড়ি। একটা সবচেয়ে ওপর-অলা যিনি তাঁর, আর একটা আংকল ব্রাউন-এর। আংকল ব্রাউন এখানকার কমিশনেয়ার—অর্থাৎ আমরা যাকে বলি—দারোয়ান তথা রিসেপশনিস্ট। খুব মিশুকে ভদ্রলোক।

সপ্তাহে পঁচিশ পাউন্ড মাইনে—আমাদের দেশের হিসেবে, মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা।

এই তো ভালো, অভিজিত ভাবে। সবাই সচ্ছল, সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছে। যে বেশি পরিশ্রমী বা মেধাবী, সে সচ্ছলতর। সবাই অপ্রাণ খাটছে, দেশের সম্পদ বাড়াচ্ছে, আর হই-চই করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। অভিজিত খবর রাখে, দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন নেতারা, কিন্তু কী করে আসবে সুস্থ সমাজতন্ত্র যেখানে লোক এত বেশি, সম্পদ এত কম সেই তুলনায়?

কয়েকজন ধনী, আর অধিকাংশ গরিব—এ ব্যবস্থা নিশ্চিত সমর্থনযোগ্য না। কিন্তু তা বলে, সবাইকে গরিব করে দিয়ে এর মীমাংসা? সবাইকে ধনী করে তোলার চেয়ে সেইটাই বোধ হয় বেশি সহজ, বেশি নাটকীয়!

মোট কথা, জায়গাটা ক্রমশ ভালো লেগে গেছে অভিজিতের। বেশ কেটে যায় দিনগুলো। মাঝে মাঝে শুধু বড়ো একা লাগে নিজেকে। মনে হয়, যেন ও হারিয়ে গেছে। একটা জনস্রোত থেকে ছিটকে বেরিয়ে নিরুদ্দিষ্টের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অবশ্য, এই হঠাৎ হঠাৎ মন খারাপের ওষুধও ও আবিষ্কার করেছে এখন। এ-দেশে সে-ওষুধ খুব জনপ্রিয়। বেশ কিছুক্ষণের মতো বন্দী করে রাখতে পারে চারজনকে—মাত্র সাড়ে সাঁইত্রিশ শিলিং দামের একটা বোতল।

এমনি সময়ে আইভির সঙ্গে পরিচয় হলো অভিজিতের।

এর আগে এ-দেশে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর পরিচয় যে হয়নি, তা নয়, তবে তা একেবারেই সাময়িক। একটু-আধটু নাচের আসরে যাওয়া, কফি খাওয়া, এদিক-ওদিক বেড়াতে যেরেনো—এই পর্যন্ত। কিছুই দানা বাঁধেনি সেই সম্পর্ক থেকে। তা ছাড়া, শুধুই প্রমোদের লোভে একটি মেয়ের পিছু পিছু ঘুরতে ওর প্রবৃত্তি হয়নি।

কিন্তু আইভির সঙ্গে ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়ালো।

মনে আছে, সেদিন রবিবার ছিল। এপ্রিল মাস। ইস্টারের সপ্তাহ। একটানা কয়েকটা দিন ছুটি পাওয়া গেছে।

শীত বেশ কম। ঘরে হিটার না জ্বালিয়েই ঘুমোচ্ছিল অভিজিত। যখন ঘুম ভাঙলো, তখন সাতটা।

বেশ আলো হয়ে গেছে বাইরেটা। ছ'টার আগেই সকাল হয় এই সময়, সন্ধে হয় আটটার পর।

অভিজিত উঠে পড়লো চটপট। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে, শার্টের ওপর একটা ফর্সা কলার ও তার ওপর ধূসর রঙের নতুন স্যুট চাপিয়ে প্রস্তুত। আইভির দেওয়া লাল টাইটা পরেছে আজ, দেখলে ও খুশী হবে।

আটটায় আইভির আসার কথা ছিল। ও যখন এল, তখন সাড়ে আটটা বাজে। দেরি দেখে অভিজিত অধৈর্য—পায়চারি করছে ঘরে। ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছে। আর ভাবছে, মেয়েরা কখনোই সময় মেনে চলতে শিখলো না। আদর দিয়ে পুরুষেরা ওদের মাথা খেয়েছে!

টিং করে ঘণ্টা বাজতে অভিজিত দরজা খুললো। ভেতরে আসতে বললো আইভিকে।

ভেতরে এলে পর ওর কাঁধ থেকে ওভারকোটটা খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখলো নিয়মমতো।

বললো, "তুমি দেরি করে ফেলেছ। বৃষ্টি পড়ছে নাকি?"

—"হ্যাঁ। একটু একটু। তবে, ইচ্ছে করেই আমি দেরি করলাম। ভাবলাম, গিয়ে যদি দেখি তুমি তখনো বিছানায়!"

—"বাঃ! আমি কখন থেকে তৈরী।"

—"সে তো দেখতে পাচ্ছি। খুব সেজেছ!"

অভিজিত হাসলো। এ-কথার উত্তর দিল না। লক্ষ করলো, আইভির হাতে একটা প্যাকেট। সযত্নে বাঁধা।

জিগ্যেস করলো, "ওটা কী?"

—"বাবার জন্যে একটু উপহার নিলাম। বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে বাড়ি যাচ্ছি। ইচ্ছে করলো।"

—"আমিই কিনবো ভাবছিলাম।" অভিজিত বললো।

—"কেন?" আইভি আপত্তির সুরে প্রশ্ন করলো। "আজ প্রথম দিন যাচ্ছ, তুমি কেন খরচ করবে? তুমি আজ আমার অতিথি, আমাদের পরিবারের অতিথি।"

অভিজিত বললো, "আর দেরি কর না। চলো বেরিয়ে পড়া যাক।"

ওরা যখন ডম্বারটন পৌঁছলো, তখন বেলা এগারোটা। বেশ রোদ উঠেছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি। বাংলো ধরনের। সামনে খানিকটা খালি জমিতে বাগান। তারপর গেট।

গেট দিয়ে ঢুকতে ওরা, দেখলো এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন। মুখোমুখি হতে অভিজিতের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

বললেন, "আমি রবার্ট উইলিয়মসন।"

অভিজিত সমান বিনয় সহকারে অভিবাদন করলো।

নিজের নাম উচ্চারণ করার আগেই আইভি বলে দিল, "ড্যাডি, এ অভিজিত ড্যানিয়াল। আমার বন্ধু।"

রবার্ট ওদের নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসলেন।

বললেন, "তোমার কথা আইভির মুখে শুনেছি। তুমি ইন্ডিয়ার ছেলে।"

—"হ্যাঁ।" অভিজিত একটু হেসে

বললো, "ইণ্ডিয়া অবশ্য একটা প্রকাণ্ড দেশ।"

—"কোন্ অঞ্চলে তোমার বাড়ি?" রবার্ট জিগ্যেস করলেন।

এবার একটু মুশকিলে পড়লো অভিজিত। কী বলবে? ভাগলপুরে? না, কলকাতা?

ভদ্রলোক সামলে নেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "ওদেশে তো ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের আলাদা ভাষা, তাই না?"

অভিজিত বললো, "আমার বাড়ি বেঙ্গল-এ। বেঙ্গল-এর যে অংশটা পাকিস্তানকে উপহার দেওয়া হয়নি, সেখানে।"

রবার্ট একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, "ক্যালকাটা?"

অভিজিত প্রতিপ্রশ্ন করলো, "নাম শুনেছেন ক্যালকাটার?"

—"শুনেছি মানে? আমি তো ছিলাম ওখানে। তিন বছর। ঠিক ক্যালকাটায় নয়, তার কাছাকাছি। যুদ্ধের সময়।"

—"জায়গাটা পছন্দ হয়েছিল আপনার?" নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন করলো অভিজিত। কথার পরে কথা।

ভদ্রলোক বললেন, "কতটুকুই বা দেখেছি তখন! তবু মন্দ লাগেনি। এখন গেলে আরো ভালো লাগতো।"

—"কেন?"

—"ওয়েল—" কথা শেষ না করেই রবার্ট উঠে গেলেন। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা শৌখিন আলমারি। সেটা খুলে দু' গ্লাস সবুজ পানীয় ঢেলে নিয়ে এলেন হাতে করে।

—"তোমরা কথা বলো, আমি একটু ভেতরে যাচ্ছি।" আইভি এতক্ষণ চুপ করে বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। খুটখুট পায়ে চলে গেল।

একটা গ্লাস অভিজিতের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

জিগ্যেস করলেন, "তুমি ড্রিংক করো তো?"

—"অল্প সল্প।"

—"ইণ্ডিয়ানরা সাধারণত ড্রিংক করে না, তাই জিগ্যেস করলাম।" রবার্ট বললেন। "তবে, ভাবলাম, এখন ফেস্টিভালের সময়, একটু-আধটু—"

আগের প্রসঙ্গে ফিরতে চেষ্টা করলো অভিজিত।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে জিগ্যেস করলো, "আপনি বলছিলেন, এখন গেলে ভারতবর্ষ আপনার বেশি ভালো লাগতো। কেন?"

এক মিনিট চুপ করে কী ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর স্বাভাবিক ব্রিটিশ ভদ্রতা-বশত বললেন, "তখন আমরা গিয়েছিলাম আমাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। এখন গেলে যাবো একটা স্বাধীন দেশে। নেহরুর মতো মানুষ তোমাদের দেশনেতা। নেহরুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি।"

কথা বলতে বলতে এক-এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল অভিজিত। পাশের ঘরে আইভির কলকল কথার শব্দ শুনছিল। মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। কাজ করছিল। সম্ভবত সাহায্য করছিল রান্নাবান্নায়।

মিসেস উইলিয়মসন এরই ফাঁকে বার-দুয়েক এসে অভিজিতের সঙ্গে কথা বলে গেছেন।

খাবার টেবিলে বসে খেতে খেতে নানান কথা হচ্ছিল।

এক সময় হঠাৎ রবার্ট বললেন, "মিস্টার সান্যাল—"

অভিজিত মাথা নিয়ে বললো, "কল মি অভিজিত।"

উনি বললেন, "খানিক আগে তুমি একটা কথা বললে, অভিজিত, কথাটা আমায় ভাবিয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ। বেঙ্গলকে দু' ভাগ করা ঠিক হয়নি। ইন ফ্যাক্ট, আমার মতে, রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান একটা কৃত্রিম দেশ।"

মিসেস উইলিয়মসন এর মধ্যে বলে উঠলেন, "একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ

অভিজিৎ আর অ ইভির নামের উচ্চারণে কেমন মিল আছে, না?"

এই কথা শুনে টেবিলের বাকি তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠলো।

বিকেল বেলা কফি খেতে খেতে রবার্ট নিজেদের কথা বলছিলেন। নিজের পরিবারের কথা। দেশের দুঃসময়ের কথা।

বলছিলেন, "যুদ্ধের বছরগুলো ব্রিটেনের বড়ো দুঃসময় ছিল। আমরা জানতাম, এ যুদ্ধে না জিতলে ব্রিটিশ জাত ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রথম যুদ্ধে আমাদের ঢের লোকক্ষয়, ধনক্ষয় হয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন ধরে মন্দা চলেছে। কতটুকুই বা দেশ। যা তৈরী করি, বেশির ভাগ বিভিন্ন দেশে বিক্রি হয়, রপ্তানির আয় থেকে আমাদের ভরণপোষণ। আমাদের দেশের কাপড়ের, কয়লার, জাহাজের, কল-কবজার চাহিদা ক্রমশ কমতে লাগলো। বেকারের সংখ্যা বাড়তে লাগলো দিনের পর দিন। সেই রকম অবস্থায়—আবার একটা যুদ্ধ। দু'-দুটো যুদ্ধে আমাদের কোমর ভেঙে গেছে।"

অভিজিৎ একবার ভাবলো, ব্রিটিশ জাত ভারতকে দীর্ঘকাল ধরে শোষণ করে এসেছে। বাড়িয়েছে নিজেদের ঐশ্বর্য। কিন্তু একে-একে ওদের উপনিবেশগুলোতে মুক্তির জন্যে সাড়া জেগে উঠলো যখন, তখন টনক নড়েছে।

আবার পরক্ষণেই রবার্ট উইলিয়মসনকে ওর প্রতিপক্ষ মনে হলো না। উনি যেন একটা অভিমানী জাতির প্রতিভূ—যে জাতি অভিজাত কিন্তু যে ক্রমশ দরিদ্র, দুঃস্থ হয়ে যাচ্ছে।

কথা প্রসঙ্গে রবার্ট একবার বললেন, "জানো, আইভির ছেলেবেলাটা বড়ো একা, অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে। আর-একটি সন্তান হোক, আমাদের দু'জনেরই সেই রকম ইচ্ছে ছিল। ছেলে হলে ভালো, না হলে, মেয়েই। কিন্তু, ওই যে বললাম—প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশের লোকের দিন কাটছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার—আমরা পেছিয়ে দিচ্ছে লাগলাম। এ বছর থাক, আগামী বছর দেখা যাবে। এই ভাবে সময় গেল চলে। আমরা হাল ছেড়ে দিলাম। একা সঙ্গহীন এবং যথেষ্ট মনোযোগ ছাড়া ও বড়ো হয়েছে বলে ওর চরিত্রে মাঝে কিছু অসামঞ্জস্য তৈরী হয়েছে। কেটে যাবে, আশা করি।"

ফেরার পথে এই সব কথা ভাবছিল অভিজিৎ।

যেন বলছিল, "আর ওকে একা থাকতে হবে না। একজন বন্ধু ও পেয়ে গেছে। শুধু ওর একার বন্ধু নয়, সমস্ত পরিবারটার বন্ধু। আমায় তোমরা নিজের লোক মনে করে গ্রহণ করে নিতে পারবে? বিদেশে পড়া এই পাখিটকে এখানে বাসা বানাতে দেবে তোমরা?

স্বদেশ থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে অন্য এক দেশ, অন্য শহর। ভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা, সামাজিক অভ্যেস রীতি-নীতি, নরনারীর সম্পর্ক। প্রায় সারা বছর ধরে যে-দেশে শীত, মাসের পর মাস অন্ধকার বর্ষার দিন। হিম হয়ে যায় হাত-পা।

এই দেশের এক প্রান্তে একজন বাঙালী যুবা তার মনের মতো নারী, সহচরী, জীবনসঙ্গিণী খুঁজে পেল, আমরা দেখলাম। সোনালি চুল, নীল চোখ। কখনো বিষণ্ণ, কখনো হাসি-খুশী এই নারীর হাত ধরে ও নিজের গৃহ রচনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যেখানে আশ্রয় আছে, আহ্বান আছে, গ্রহণ করার জন্যে ব্যাকুলতা আছে, তারই নাম গৃহ। অভিজিতের গৃহটি এত দূর দেশে ওর জন্যে অপেক্ষা করতো বলে কি ও ছটফট করেছে কলকাতায়! আপ্রাণ চেষ্টা করেছে চলে আসতে?

তারপর ওরা দু'জন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর-সংসার করতে লাগলো—এই রকম একটি বাক্য দিয়ে পরিচ্ছেদের যবনিকা টানলে আমরা নিশ্চিন্ত হতাম। মনের কোণে একটু ব্যথা হয়তো থেকে যেতো তা সত্ত্বেও—একটু মন-কেমন, ওই লুপ্তপরিচয় বাঙালী ছেলেটির জন্যে।

জনবহুল বাংলা দেশ। কত লোক এখানে অর্ধাশনে, চিকিৎসার অভাবে, বেকার থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। তার চেয়ে এই আত্মবিলোপ হয়তো ঢের ভালো। আত্মহত্যার চেয়ে ঢের বেশি গৌরবময়।

সুখী হয়েছিল ওরা? কে জানে। সুখ তো একটা ধারণা, একটা মানসিক অবস্থা। তার সঙ্গে ঐহিক জগতের সম্পর্ক কতটুকু।

অভি বলেছিল, "তোমার আর আমার নাম প্রায় একরকম শোনায় এখনকার লোকেদের মুখে। তোমার মা একবার বলছিলেন কথাটা। তোমায় ইতু বলে ডাকবো?"

—"ইতু কে?"

—"একটি খুব লক্ষ্মী মেয়ের নাম।" অভিজিৎ বলেছিল প্রথমটা। তারপর নিজেই ভুল শুধরে বলেছিল, "না, না, ইতু একটা পুজোর নাম, যে-পুজো করলে নিঃস্ব সবংশের ঘরও ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে। বাঙালী হিন্দুরা গ্রামগুলো এই পুজো করে। গোল হয়ে বসে এর স্টোরি শোনে। ছোটবেলায় আমি ইতুর ব্রতকথা শুনেছি।"

—"ছোটবেলার অনুষঙ্গ তোমার খুব প্রিয়, না?"

অভিজিৎ বলেছিল, "হবে না? শৈশবকাল কার না প্রিয় স্মৃতি বলো?"

—"আমার না।"

ইতু বলেছিল গম্ভীর হয়ে। "ছোটবেলায় আমি শুধু যুদ্ধ আর মন্বন্তরের কথা শুনেছি। সব সময় ভয়—এই বুঝি সব গেল! এই বুঝি মাথার ওপর বোমা পড়লো! এই বুঝি দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে আমাদের সারি সারি গুলি করা হবে। সে যে কী ভীষণ প্যানিক, তুমি বুঝবে না।"

নিজেদের পৃথক আস্তানা দুটো ছেড়ে ওরা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল শহরের মধ্যে। ওদের জমানো টাকা দিয়ে ফার্নিচার কিনেছিল প্রয়োজন মতো। পুরোনো গাড়ি কিনেছিল একটা বেশ সস্তায়।

দু'জনে মিলে ভাগ করে ওরা ঘরকন্নার কাজ করতো। আগেকার মতো অভিজিতের ক্লান্তিবোধ হতো না এ-সব কাজে। বরং মজাই লাগতো। খেলা-খেলা। মাঝে মাঝে বাইরে খেয়ে আসতো ওরা। মাসে-দু'মাসে একবার করে পার্টি ডাকতো। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-হৈ করতো উইক-এণ্ড-এ ঢের রাত অবধি।

এর মধ্যে ফাঁক পেলেই ওরা গাড়ি নিয়ে চলে যেতো শহর ছাড়িয়ে পল্লী অঞ্চলে। সাধারণত, ডাম্‌বারটন-এ। শনিবারের রাত শ্বশুর-বাড়িতে কাটিয়ে রবিবার বাসায় ফিরতো। স্মরণীয় সেই সব শনিবারের সন্ধ্যাগুলো।

বিশেষ করে, যে-সমস্ত সন্ধে বা অধিক রাত অবধি কাটিয়েছে ওরা 'লিটল হার্ট' নামের পাব বা পানশালাতে। পরিবারের সবাই—একসঙ্গে। একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেলে রবার্ট উইলিয়মসন পিয়ানো বাজাতেন। উপস্থিত সবাই সেই বাজনার সঙ্গে তালে তালে গান গাইতো। বাড়ি থেকে অল্প দূরে, ফাঁকা রাস্তাটার কোণে ছোট্ট পানশালাটি—ডাম্‌বারটনের প্রধান আকর্ষণ—মুখর হয়ে উঠতো তখন।

এমনি এক শনিবার রাত্রের কথা মনে পড়ে অভিজিতের।

লিটল হার্ট-এ গিয়ে বসেছে ওরা চারজন। বড় বড়ো মগ ভরতি কালো স্টাউট বিয়ার খাচ্ছেন রবার্ট উইলিয়মসন। আর উচ্চকণ্ঠে কথা বলছেন। কখনো টেবিল ছেড়ে উঠে অন্যত্র গিয়ে বসছেন খানিকক্ষণ, দু'-হাত দিয়ে ধরে করমর্দন করছেন কোনো চেনা প্রতিবেশীকে। সপ্তাহান্তে অনেকের সঙ্গে এখানেই দেখা হয়।

আবার হয়তো উঠে গেলেন কাউণ্টারে। ও-পাশে দাঁড়ানো সুশ্রী চটপটে এবং হাসি-মুখ মেয়েটির হাত থেকে একটা পান-পাত্র নিলেন। হয়তো রসিকতা করলেন একটা। পানশালা গমগম করছে। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে মশগুল।

এখানে সকলে ওঁকে চেনে। আমুদে হাসিখুশী ভদ্রলোক বলে খ্যাতি আছে রবার্ট উইলিয়মসনের। নানান দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন এক সময়, লোকের সেই সব

ভ্রমণ-কাহিনী আগ্রহ নিয়ে শোনে। ওঁর ভাঁড়ার নিঃশেষ হয় না।

সেদিন মা আর মেয়ের মাঝখানটিতে বসে অভিজিত ভাবছিল, কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছে ও ভাসতে ভাসতে। কেমন মিশে গেছে সম্পূর্ণ পরিবেশটার সঙ্গে। একেবারে অন্য জগত। কী সংস্কার-মুক্ত এদের সমাজ, কী খেলা-মেলা, কী পরিচ্ছন্ন ওর মনে হচ্ছিল।

এক সময় হঠাৎ সব গোলমাল গুঞ্জন যেন থেমে গেল। কে একজন দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করলো, "কোয়াইএট কোয়াইএট এভ্রিবডি। মিউজিক নাউ।"

পিয়ানোয় টুংটাং সুর বাজছে। রবার্ট টলতে টলতে গিয়ে বসেছেন ওখানে।

নিজের মনে কিছুক্ষণ পিয়ানো বাজাবার পর নিজেই গেয়ে উঠলেন :

"বাট্ আই হাব পার্টেড়
ফ্রম মাই লভ
নেভার টু মীট এগেন—মাই ডিয়র
নেভার টু মীট এগে-এ-এন।"

—"রাবি বার্নস।" আইভির মা অভিজিতকে বললেন।

—"নাম শুনেছ এঁর? আমাদের জাতীয় কবি। দু'শো বছর আগে জন্মেছিলেন, এখনও ওঁর গান, কবিতা আমাদের মাতিয়ে রাখে।"

আইভি বললো, "তোমাদের যেমন টেগোর।"

অনেকক্ষণ ধরে গান গেয়েছিলেন রবার্ট সে-রাতে। সবাই গলা মেলাচ্ছিল ওঁর সঙ্গে। অভিজিত একা, শুধু শুনেছিল চুপ করে বসে। কেনো অজানা কারণে ওর মন খারাপ লাগছিল।

শেষ পর্যন্ত আসর শেষ হলো, তখন রাত বারোটা।

রবার্টের অবস্থা কাহিল। দাঁড়াতে পারছেন না। মেয়ে-জামাই দু'পাশে ধরাধরি করে ওঁকে গাড়িতে তুললো।

একটা ছোট্ট জনতা হই-হই করতে করতে বেরিয়ে এল।

—"গুনাইট, গুনাইট বব্।" সমস্বরে সবাই রবার্টকে বিদায় জানাচ্ছিল।

সুরায় ও আনন্দে মত্ত এই দেশের একদল মানুষ।

অভিজিত একদিন স্বপ্ন দেখলো, ওর মায়ের ভীষণ অসুখ। হয়তো বাঁচবে না। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

ভাগলপুরের বাড়িটা পরিষ্কার দেখতে পেলো স্বপ্নের মধ্যে। সেই বাবার তৈরী করা গোলাপ-বাগান। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাগান পার হয়ে বাড়িতে ঢোকার দরোজা। ঢুকে ডান দিকে দুটো সিঁড়ি উঠে [illegible]—বাবার [illegible] পড়ার ঘর, বৈঠকখানা। বুকের সামনে উঠোন—উঠোন পার হয়ে রান্নাঘর একপাশে, অন্য পাশে পাতকুয়ো, স্নানের ঘর, পায়খানা।

যেন দেখতে পেলো, বুকের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভূপেন ডাক্তার বলছেন বাবাকে—চেষ্টা করছি তো, এর বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না।

অচেতন হয়ে শুয়ে আছে মা, মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসছে, আর বিড় বিড় করে বলছে, অভি, অভি রে একটু জল দিবি।

যেন বাবা বলছে, তুমি শান্ত হও, অভিকে ডাকছ কেন, ও তো আর ফিরবে না। এই তো আমরা আছি তোমার পাশে, আমরা তোমার সেবা করছি। এদের মুখ চেয়ে তুমি সেরে ওঠো তাড়াতাড়ি।

যেন বাবা বলছে, বরং আশীর্বাদ করো, যেখানে আছে যে-ভাবে আছে, থাকুক। ও সুখে থাকুক।

যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট মুখে মা যেন বলছে, ওকে একবার না দেখলে আমার মরণ হবে না গো, অভিকে একটা খবর দাও। খবর পেলে নিশ্চয় চলে আসবে।

খুব মন-খারাপ নিয়ে ঘুম থেকে উঠলো অভিজিত। স্বপ্ন ওটা, সত্যি ঘটনা নয়, দেখে স্বস্তি পেল অবশ্য। তারপর ইভুর দিকে পাশ ফিরে শুলো। অনেকক্ষণ ঘুম এল না। ইভুর মুখের দিকে চেয়ে রইল অভিজিত। শান্ত, নিশ্চিন্ত একটি সুন্দর ফর্সা মুখ শুধু মুখটাই—কারণ বাকি শরীর কম্বলে ঢাকা—লিলির মতো ফুটে রয়েছে।

এর পর কিছুদিন মন খারাপ-বোধটা কষ্ট দিল অভিজিতকে। ভাগলপুর থেকে চিঠি পেয়েও ও যেন স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ হতে পারছিল না।

আইভি লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছে "কী হলো তোমার হঠাৎ?"

অভিজিত জবাব দেয়নি।

কাজের জায়গা থেকে সেদিন আইভি ফিরে এসেছিল আগেই। মোড়ের গ্রে সারি

থেকে কিনে এনেছিল খাবার জিনিসপত্র। ডিম, আলু, মাখন, মাংস, জ্যাম—এই সব। আর একটা স্প্যানিশ ওয়াইন। ড্রাই। অভিজিত ভালোবাসে।

এক-একদিন অভিজিতের ফিরতে দেরি হয়, ও জানে। তাই, অপেক্ষা না করে নিজেই সন্ধ্যের রান্না সেরে নিচ্ছিল। অভি এসে দেখবে, কাজ সব শেষ, ওর করার কিছু নেই। এই সব ভেবে বেশ মজা পাচ্ছিল আইভি। কাজ করতে করতে তাই গানের সুর ভাঁজছিল গুনে গুনে করে।

অভি ফিরলো সাতটা নাগাদ। অভ্যেস মতো জিগ্যেস করলো, "কোনো চিঠিপত্র আছে?"

আইভির জবাব না পেয়ে নিজেই চিঠি রাখার জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল।

লিটলউড্সের কুপন! আর কিছু নেই।

ভাগ্যে হয়তো কোনোদিনই শিকে ছিঁড়বে না, অভিজিত ভাবলো। তবু সপ্তাহে দুটো করে শিলিং 'জয় গুরু' বলে ফেলে দেওয়া। ওর হিসেব মতো আটটা ফুটবল ম্যাচে যদি ড্র হয়, তাহলে ওকে পায় কে। কী করবে অতগুলো টাকা নিয়ে, তা ওর ভাবা আছে।

আইভি পাশের ঘর থেকে বললো, "তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি। পোশাক বদলে এসো, দেখাবো।"

কোনো কথা না বলে অভিজিত শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো।

রান্নাঘরের টুংটাং শব্দের মধ্যেও আইভি টের পেয়েছে, অভিজিত বাথরুমে গেল, বেরোলো কখন। তার পরেও খাবার জায়গাটার দিকে আসছে না দেখে আইভি নিজেই ঢুকলো শোবার ঘরে। ঢুকে দেখে, অভিজিত বিছানার ওপর চুপ করে বসে আছে।

—"কী হলো? তোমার শরীর ভালো নেই নাকি?"

—"না।" অভিজিত দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—"তবে? আপিসে কিছু গোলমাল হয়েছে? তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে যেন।" আইভি উদ্বিগ্ন ব্যাকুল স্বরে জিগ্যেস করলো আবার।

খুব ধীরে ধীরে অভিজিত বললো, "ভাবছি, দেশে ফিরে যাবো এবার। এখানে আর ভালো লাগছে না।"

ঢং করে যেন ঘণ্টা বাজলো আইভির বুকের মধ্যে। খুশীর একটা নির্মল আবহাওয়া তৈরি করে রেখেছিল, তা যেন ছিঁড়ে গেল হঠাৎ।

তবু, মুখে হাসি ফুটিয়ে ও বললো, "এই কথা! আমি ভাবলাম কী না কী!"

তারপর প্রায় হাত ধরে টেনেই দাঁড় করালো অভিজিতকে।

বললো, "তোমায় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চলো, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বে না হয়। তোমার জন্যে স্প্যানিশ ওয়াইন এনেছি, খেতে খেতে তোমার কথা শুনবো, এসো।"

ওদের দুজনের ছোট্ট একটা সংসার। পাখির বাসার মতো। বাইরের লোক কেউ নেই। একটা বসার, একটা শোবার—এই দুটো ঘর। বসার ঘরের একপাশে খাবার টেবিল, চারটে হাতল-ছাড়া চেয়ার।

মুখোমুখি দুটো চেয়ারে ওরা বসে দুজন। বাকি দুটো শূন্যই থাকে। নিমন্ত্রিত কেউ এলে পর ভরাট হয়। এই ছোট্ট ফ্ল্যাটে আসবাবপত্রের যেমন বাহুল্য নেই, তেমনি অভাবও নেই। আইভির হাতের স্পর্শে সবটা বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন।

খেতে খেতে আইভি জিগ্যেস করলো, "হঠাৎ দেশে ফেরার কথা মনে হল তোমার? এতদিন পর? এখানে কি খারাপ রয়েছো তুমি?"

অভিজিত পানীয় ঢালছিল দুটো গ্লাসে। গ্লাস দুটো উঁচু করে দু হাতে ধরে চোখের সামনে পরিমাণ পরখ করতে করতে বললো, "এভাবে জীবন কাটাবার কোনো মানে হয় না, জানো। নিজের দেশ ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথায় পড়ে আছি!"

একটা গ্লাস আইভির দিকে এগিয়ে দিল। নিজেরটায় চুমুক দিল তারপর।

বললো, "কেন, কী জন্যে, বলতে পারো ইতু?"

মুখ তুলে তাকালো ইতু। যেন অভিজিতের মনের ভেতরটা পড়ার চেষ্টা করছে।

বললো, "এই রকম জীবন তুমিই তো চেয়েছিলে।"

—"হ্যাঁ।"

—"তবে? এখন তোমার কেন ও কথা মনে হচ্ছে?"

অভিজিত একটু চুপ করে থেকে বললো, "দেখ ইতু, যুক্তি দিয়ে তোমায় ব্যাপারটা বোঝাতে পারবো না। কিন্তু কথাটা আমার বেশ কিছুদিন থেকে মনে হয়েছে। তোমাকে কীভাবে বলবো, ভাবছিলাম।"

মাথা নিচু করে ইতু কিছুক্ষণ ছুরি-কাঁটা দুটো নাড়তে থাকলো উদ্দেশ্যহীন-ভাবে।

একটু পরে বললো, "কত কষ্ট করে আমরা দুজন এই সংসার পেতেছি। কত অভাব অনটন হাসিমুখে মেনে নিয়েছি আমরা। কেন, না, একদিন সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে বসতে পারবো। অনেকটা পেরেওছি, তাই না? এমন সময় তুমি স-ব ভেঙেচুরে দিয়ে চলে যাবার কথা ভাবছো কেন, বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস করো।"

অভিজিত বললো, "হয়তো ঠিক সেই জন্যেই। এতদিন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অসচ্ছলতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। অভাব—ব্যবহারিক সুখ-সুবিধের অভাব ঘোচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সে দুর্দিন যখন কাটিয়ে উঠলাম, তখনও দেখছি অভাববোধটা নিজের স্বরূপ নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আমার মধ্যে। স্বস্তি দিচ্ছে না।"

—"একটা কথা বলবো?" ইতু ছলছল চোখে তাকালো অভিজিতের দিকে।

এতক্ষণ নিজের ভাবনা চিন্তায় মশগুল ছিল অভিজিত। নিজেকে শুনিয়েই যেন কথাগুলো বলে যাচ্ছিল। অথচ যাকে বলা, যার উদ্দেশে ও কয়েক দিন ধরে কৈফিয়ত-গুলো তৈরি করেছে, তার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে লক্ষ করেনি।

—"একটা কথা বলবো? কিছু মনে করো না?" ইতু আবার প্রশ্ন করে।

—"কী কথা?"

টেবিলের দিকে চেয়ে মুখ না তুলে ইতু আস্তে আস্তে বললো, 'আমার সঙ্গে থাকতে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

—"হঠাৎ এ কথা কেন?" অভিজিত অবাক হয়ে প্রতি-প্রশ্ন করে। "তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে।"

খাওয়া সাঙ্গ করে মুখ মুছতে মুছতে ইতু উঠে দাঁড়ালো।

বললো, "না, এমনি। মনে হল হঠাৎ। মনে হল, দেশে তোমার কোনো বান্ধবী আছে, যাকে তুমি এখনও মিস্ করো। যেন, আমি তোমার মনের সবটা জুড়ে থাকতে পারিনি।"

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো অভিজিত।

—"যত সব বাজে সেন্টিমেন্ট আমাদের! দেশে চাকরি কোথায়? [illegible] লক্ষ বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে আমি গিয়ে হাজির হবো কী দুঃখে? এক এক সময় কী যে হয়!"

বলে সেও উঠলো।

ইতুর কোমর জড়িয়ে ধরে একটু আদর করলো।

বললো, "চলো, বসে বসে খানিকক্ষণ টেলিভিশন দেখি। আর তোমার আনা ওয়াইনটা আর একটু খাই। ডিনারের পর হলই বা!"

তারপর সুর করে বললো, "ওয়াইফ অ্যান্ড ওয়াইন হ্যাভ নো ফিকস্ড টাইম!"

সুর মিলিয়ে আইভি জবাব দিল, "দ্যাট্স নো রাইম!"

দুজনেই হেসে উঠলো।

(ক্রমশ)
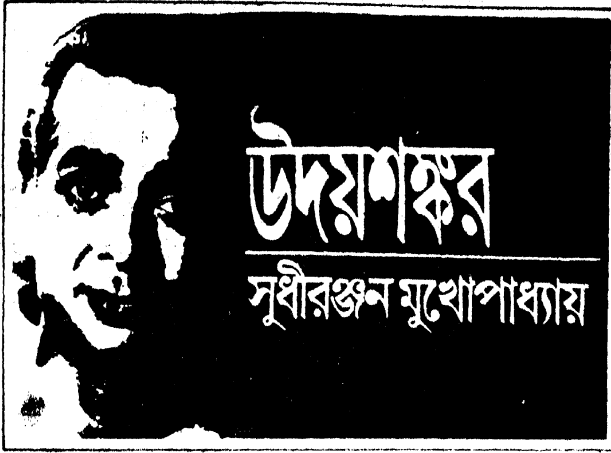
॥ ষোল ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরতি হয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে! আর এর মধ্যে উদয়শংকর এত বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছে জে জে স্কুল অব আর্টস-এ যে, সেখানকার ইংরেজ অধ্যক্ষ তাকে মাঝের দু শ্রেণী ছাড়িয়ে একেবারে তুলে দিলেন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। এবং সেই শ্রেণীতে আশ্চর্য ব্যতিক্রম হিসেবে উত্তীর্ণ হয়ে আসার পরেও 'ফিগার' ও 'ল্যান্ডস্কেপ' দক্ষতার সঙ্গে আঁকতে লাগল উদয়শংকর।

কিন্তু বাইরে তখন অসন্তোষের চাপা আগুনে ধকধক করে জ্বলতে শুরু করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অবিচল পদক্ষেপ ও অহিংসার ললিত বাণী ধৈর্য রাখতে পারল না যুবসমাজ ও কিছু জনসাধারণের। কোথাও কোথাও সন্ত্রাসবাদ দেখা দিল।

তার একটা নিকটতম কারণ যদিও আছে। যুদ্ধের পর-পর জনসাধারণ আশা করেছিল সামরিক আইন-কানুন শিথিল হয়ে যাবে এবং ভারতবাসী সুখ-সুবিধা উপভোগ করবে কিছু বেশী মাত্রায়। কিন্তু তা হল না। স্যার সিডনী রাওলাট রিপোর্ট পেশ করলেন যে, যুদ্ধকালীন কঠোরতা পূর্বের মতই বলবৎ থাকবে।

"ডাউন উইথ রাওলাট!"

মহাত্মা গান্ধী দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করলেন, "দেশব্যাপী আমরা পালন করব সাধারণ ধর্মঘট!"

ভারতের সর্বত্র পালিত হল সাধারণ ধর্মঘট দিবস। কিন্তু মনে মনে বড় আহত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে গান্ধীজী বললেন, "শুনলাম কিছু কিছু পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে। না, তা হলে চলবে না। এ তো সত্যাগ্রহ নয়!"

কিন্তু তবুও কোথাও কোথাও দেশবাসী হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হল। মহাত্মা গান্ধী আবার বললেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—আমি বুঝতে পারিনি যে, এই রকম আন্দোলন সার্থক করতে হলে প্রথমে আইন অমান্য করার শিক্ষার প্রয়োজন। হরতাল পালন এখন থাক!"

তারপর আর অল্প পরেই ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে ব্রিগেডিয়ার-জেন রেল মাইকেল ও' ডায়ারের নেতৃত্বে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সংঘটিত হল নির্মম হত্যাকান্ড!

'জৈন হিতেচ্ছু' ছাত্রাবাসের হলে বক্তৃতা করতে এসেছেন মতিলাল ওয়াডিলাল শা। তাঁর মুখ ঈষৎ বিষণ্ণ। দৃষ্টিও ব্যথিত। ধীর স্বরে তিনি ছাত্রদের বললেন, "আমাদের বিদেশী শাসক ব্রিটিশের পৈশাচিক ব্যবহারে আজ দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তরুণ ছাত্ররা! জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটে গেল, এ যুগে আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। এমন নৃশংসভাবে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হত বর্বর যুগে—" বলতে বলতে মতিলাল বুঝতে পারলেন যে, তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি উত্তেজনা প্রশমিত করে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

বালক রবিশঙ্কর, হেমাঙ্গিনী দেবী এবং অন্যান্যরা

[illegible] হিন্দু [illegible] [illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]

"ব্রিটিশ সরকারের এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে দেশ-বাসী আজ অস্থির হয়ে উঠেছে। ছড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাসবাদ। কোথাও কোথাও খুনো-খুনিও হচ্ছে।

"তরুণ ছাত্ররা! হিংসার সাহায্যে চির-স্থায়ী কিছু লাভ করা যায় না। যদি কেউ অন্যায় করে, তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আমি আমার মনুষ্যত্ব হারাতে পারি না—নিজেও পড়তে পারি না অন্যায়কারীর পর্যায়ে।

"কিন্তু অন্যায় আমরা সহ্য করব না। পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকলেও আমাদের বিদেশী শাসককে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমরা মানুষ—আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব হারাইনি। তোমরা পশুর মত ব্যবহার করলেও আমরা প্রতিবাদ জানাব মানুষের মত।"

শিক্ষাব্রতী মতিলাল এক খণ্ড খবরের কাগজ তুলে ধরলেন চোখের সামনে। বললেন, "তরুণ ছাত্র বন্ধুরা! এই চিঠি আমি আজ পড়ে শোনাব তোমাদের। মানুষ হলে কেমন করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয় দেখ।"

মতিলাল বললেন, "তোমরা জান নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রিটিশ সরকার 'স্যার' উপাধি প্রদান করেছিল। এই চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বড়লাট চেমসফোর্ডকে—" বলে তিনি পড়তে শুরু করলেন সেই চিঠি—

"Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India.

The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised Governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote.

Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification.

The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reacting every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, possibly congratulating themselves for imparting, what they imagine as salutary lessons.

This callousness has been praised by the most of the Anglo-Indian papers which have, in some cases, gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers.

Knowing that our appeals have been in vain, and the passion of vengeance in blinding the noble vision of statesmanship in our government, which could so easily afford to be magnanimous as [illegible] fitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions surprised into a dumb anguish of terror.

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings.

And these are the reasons which have painfully compelled me to ask your excellency to relieve me of my title of my knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose noble-

ness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully
Rabindranath Tagore."

১৯১৯ সালের শেষের দিকে শ্যামশংকর আবার ইউরোপে চলে গেলেন। আর হেমাঙ্গিনী দেবীও ঝালোয়ারের পাট চুকিয়ে চলে এলেন তাঁর কাশীর বাঙালীটোলার বাড়িতে। এ খবর পেয়ে উদয়শংকর প্রথমেই ভাবল টিব্বুর কথা। তার কি হল।

হেমাঙ্গিনী দেবী পরে তাকে জানালেন টিব্বুর ভার নিয়েছে রাজ্য। সে নাকি বেশ হিংস্র হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া তার খাওয়া-দাওয়ার খরচও বেড়ে গিয়েছিল অনেক। ঝালোয়ার সরকার তার ভার নেওয়ায় সব দিক থেকেই ভাল হয়েছে। টিব্বুর সঙ্গে আর দেখা হবে না ভেবে মন বেশ খারাপ হয়ে গেল উদয়শংকরের। সে ভাবল শুধু টিব্বুর জন্যেই তাকে মাঝে মাঝে ঝালোয়ারে যেতে হবে।

১৯২০ সালে বম্বের জে জে ইস্কুল অব আর্টস-এর নতুন ক্লাসে উঠল উদয়শংকর। এটাই তার শেষ বছর এই স্কুলে। এবার সে পাবে ডিপ্লোমা। অর্থাৎ পাঁচ বছরের পাঠক্রম সে শেষ করবে মাত্র দু বছরে।

গ্রীষ্মের ছুটি হতে এখনো অল্প দেরি আছে। কাশী থেকে হেমাঙ্গিনী দেবী লিখলেন, ৭ এপ্রিল আর একটি ভাই হয়েছে উদয়শংকরের। মার কথা মনে করে উদয়শংকর ঈষৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। তিনি আবার হয়তো ভেবেছিলেন একটি মেয়ে হবে তাঁর। কন্যা-সন্তানের বড় শখ হেমাঙ্গিনীর। কিন্তু এবারেও ভাই হল উদয়শঙ্করের।

রবিশংকর!

উদয়শংকর কাশীতে এল ছুটিতে। এসে তার সবচেয়ে ছোট ভাইকে প্রথম দেখল। রবিশংকরের বয়স তখন মোটে দু-তিন মাস। হেমাঙ্গিনী দেবী তাকে নিয়ে বেশ খুশী এখন। রবি বেশী কাঁদে-টাঁদে না।

একদিন হেমাঙ্গিনী দেবী উদয়শংকরকে ডেকে বললেন, "খোকা, সাইকেল নিয়ে এক্ষুনি চলে যা ক্যাণ্টনমেণ্টে। এক টিন ভাল বিলিতী কনডেন্সড্ মিল্ক কিনে আন তো বাবা। একটু তাড়াতাড়ি আসবি।"

মার বড় বাধ্য উদয়শংকর। সে একটুও দেরি করল না। হেমাঙ্গিনী কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে চলল ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে। বাঙালীটোলা থেকে ক্যাণ্টনমেণ্ট প্রায় মাইল দুয়েক দূর।

জমাট দুধের টিনটা দেখতে বেশ। সাদা লেবেলের ওপর ছাই-ছাই রঙের বেশ বড় গরুর ছবি আঁকা। লাল অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা দুধের নাম। ফেরবার সময় সাইকেল চালাতে চালাতে বাঁ হাতে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে ডান হাতে টিনটা চোখের সামনে তুলে দেখল উদয়শংকর। পরে নামিয়ে নিল। আবার তুলল। নামাল। এই রকম করল দু-তিনবার।

এবং টিনটা দেখতে দেখতে উদয়শংকরের মনে হল তার বেশ খিদে পেয়ে গেছে। একটু চেখে দেখলে কেমন হয়। যেই মনে হওয়া অমনি সে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মুখে ঠকাস ঠকাস করে গায়ের জোরে ঠুকল বিলিতী দুধের টিন। আর ঠোকাঠুকিতে টিন ফুটো হল।

তখন সাইকেল চালিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বাঙালীটোলায় বাড়ির দিকে আসতে আসতেই দুধের টিনের ফুটোয় মুখ লাগিয়ে চুকচুক করে একটু খেল উদয়শংকর। আর একটু খেল। তারপর আর একটু। আবার একটু। একটু। একটু। একটু। এবং যথা-সময় বাড়ি পৌঁছে সে হেমাঙ্গিনী দেবীকে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, "আমার খুব খিদে পেয়েছিল মা। রাস্তায় টিনের সব দুধ আমি

রবিশঙ্কর ও কনকলতা

রবিশঙ্কর ও ন্যাপ্‌ড়ে নৃত্যে উদয়শঙ্কর এবং বংশীবাদক নগেন দে

খেয়ে ফেলেছি—" মনে মনে যেন বেশ লজ্জা পেয়ে উদয়শঙ্কর বলল, "আমি এক্ষুনি আর একটা টিন কিনে আনছি—" বলে সে আবার গেল ক্যান্টনমেন্টের সেই দোকানে।

গঙ্গার অবাধ হাওয়া ওদের গায়ে এসে লাগছিল। প্রথম অপরাহ্ন বেলা। তিন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে তার শৈশব-কৈশোরের সেই কাশীকেই আবার যেন নতুন করে দেখছিল উদয়শঙ্কর।

সব ঠিক একই রকম আছে। সিঁড়ি নেমে এসেছে ঘাটে। মাঝির দল নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছে যাত্রী পাবার আশায়। মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। আর গঙ্গার ঘাটের ধারের বাড়িগুলোও ঠিক তেমনি আছে।

চারপাশ দেখতে দেখতে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটছিল উদয়শঙ্কর। বেড়াতে বেড়াতে চার বন্ধু এসে পড়ল বারাণসীর আশী ঘাটে। এখানেই দেহ রেখে-ছিলেন সন্ত তুলসীদাস। এ কথা প্রমাণ করবার জন্যে একটা শ্লোকও লেখা আছে।

> সম্বদ ষোল শ আশী
> আশী গঙ্গাকে তীর
> শাওন শুক্লা সপ্তমী
> তুলসী ত্যাজ শরীর।"

উদয়শঙ্করের চার বন্ধুর মধ্যে একজন আশী ঘাটের কাছে একটা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে হঠাৎ বলল, "ওই বাড়িতে খুব বড় এক জ্যোতিষী থাকে।"

আর একজন বলল, "চল না, যাই তার কাছে।"

"গিয়ে কি হবে?" উদয়শঙ্কর হেসে জিজ্ঞেস করল।

"গণকের কাছে লোকে যায় কেন?" বন্ধু দাঁড়িয়ে পড়ল, "ভবিষ্যতে আমাদের কি হবে আমরাও তা জানব।"

উদয়শঙ্কর তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বেশ জোরে বলে উঠল, "দূর!"

কিন্তু শেষ অবধি চার বন্ধুই নিজেদের ভবিষ্যৎ জানবার আশায় গিয়ে উঠল বারাণসীর আশী ঘাটের গণকঠাকুরের বাড়িতে। ঠাকুরমশাই তখন ছিলেন না। তাঁরই এক অনুচর চারজন নব্য যুবককে বলল একটু অপেক্ষা করতে। জ্যোতিষী এখুনি ফিরবেন।

একটু পরে সেই অনুচরটি জানাল, গণকঠাকুর ফিরেছেন। এবং চার বন্ধুকে নিয়ে গেল দোতলায়। নিয়ে গিয়ে দূরের একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই যে উনি বসে আছেন। আপনারা চলে যান ওঁর কাছে।"

জ্যোতিষী মশাই মেঝের ওপর বসে মাথা নিচু করে কি লিখে যাচ্ছিলেন। উদয়-শঙ্কর দূর থেকে শুধু দেখল তার মুণ্ডিত মস্তক। দৃশ্যটা উদয়শঙ্করের বড় মজার মনে হল। ওরা চারজন এসে চুপচাপ দাঁড়াল গণকের সামনে।

দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। অনেক সময় কেটে যায়। গণক মাথা তোলে না। ওদের দিকে তাকায়ও না। বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে উসখুস করে। তবুও ন্যাড়া মাথা তোলে না গণক।

এক বন্ধু আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বলল, "আমরা আপনার কাছে এসেছি। আমাদের ভাগ্যের কথা একটু বলুন এবার—"

এই কথা শুনে রাগে যেন ফেটে পড়ল গণক। চিৎকার করে বলল "বস্ সকলে চুপ করে!"

পর পর ঠিক চারটেই কাঠের চেয়ার রাখা ছিল সামনে। গণকের হুমকিতে ঘাবড়ে গিয়ে চার বন্ধু ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। এক পাশে উদয়শঙ্কর, অন্য পাশে তার এক বন্ধু। আর মাঝখানে বাকি দুজন।

জ্যোতিষী কাউকে কাছে ডাকল না, কারুর হাতও দেখল না। আদেশ করার মত উদয়শঙ্কর আর তার বন্ধুদের বলল, "একটা করে ফুলের নাম ভাব সকলে।"

একটু পরে গণক এক-একজনকে লক্ষ করে বলল, "তুমি বেল। তুমি যুঁই। তুমি গাঁদা।" এবং সে উদয়শঙ্করকে বলল, "তুমি ভেবেছ চামেলী ফুলের কথা।"

আশ্চর্য! ঠিক কথা বলেছে জ্যোতিষী। সকলের অবিশ্বাস এবার হ্রাস হয়ে এল। ওরা যেন বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল মনে মনে।

প্রথম জনের মুখ দেখতে দেখতে গণক বলল, "পরীক্ষা ভাল দাওনি। সুবিধা হবে না এ বছর। তুমি ফেল করবে। তবে লেখা-পড়া ছেড় না। চালিয়ে যাও। লেখাপড়া তোমার হবে।"

দ্বিতীয় জন বেশ বড়লোকের ছেলে। তার দিকে তাকিয়ে গণক বলল, "তোমার বাপ পয়সাওলা লোক। তুমি ব্যবসা-ট্যাবসায় লেগে পড়। লেখাপড়া করে তোমার বিশেষ সুবিধা হবে না।"

তৃতীয় জনকে সে বলল, "তোমারও ... পয়সাকড়ি হবে। নিজের আপিস হবে। তুমিও ব্যবসায় নেমে পড়।"

তিন বন্ধুকে এই রকম বলে উদয়-শঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকল সেই জ্যোতিষী বেশ কিছু সময়। তাকিয়ে তাকিয়ে তার পা থেকে মাথা অবধি দেখল। এবং অল্প পরে আপন মনে বলে উঠল কয়েকবার, "কলা! কলা! কলা!"

পরে সে উদয়শঙ্করকে বলল, "তুমি কলাকার হবে।"

শুধু এ কথা বলেই থামল না জ্যোতিষী। সে উদয়শঙ্করের দিকে তাকিয়ে আঙুল নেড়ে নেড়ে জোরে বলে উঠল, "এক মাহিনাকা অন্দর তুম হিন্দুস্থান ছোড়েগা!"

(ক্রমশ)

ইউরোপ ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ একবার মন্তব্য করেছিলেন, ওরা চলতে শিখেছে, কিন্তু থামতে শেখেনি। বলা বাহুল্য, ইউরোপের তৎকালীন শিল্পপ্রবৃত্তি সভ্যতাকে লক্ষ করেই সম্ভবত কবির এই মন্তব্য। সম্প্রতি এই মন্তব্যটিরই যেন প্রতিধ্বনি করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। ও'রা প্রশ্ন করেছেন: আধুনিক বিজ্ঞানীরা মানব সভ্যতাকে কি ক্রমেই অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না? 'যে বিজ্ঞানকে এখন আমরা দেখছি, তা ক্রমেই যেন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে', বলেছেন হার্ভার্ডের জীববিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-ইতিহাস লেখক এভারেট আই মেনডেলসন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রাঙ্ক রোডস-এর মন্তব্য: জীবনযাত্রার মান, কাজের মান, অর্থাৎ কোয়ালিটি কন্ট্রোল কোয়ালিটি কনট্রোল করে আমরা শুধু চিৎকার করে চলেছি। যার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক কম, টেলিফোন গ্রাহকের কাছে টেলিফোনের নম্বরের মূল্য ঠিক যতটা।

মলেকুলার বাইওলজিস্ট বা অণুজীব-বিজ্ঞানী গুন্থার স্টেন্ট তাঁর বহুবিতর্কিত গ্রন্থ 'দি কামিং অভ দি গোল্ডেন এজ'-এ বলেছেন, তাঁর নিজের গবেষণাজগতের যা কিছু মৌলিক প্রশ্ন তাদের সবগুলিরই সমাধানের কাজ হয় সমাপ্ত, নয় সমাপ্তির [illegible] তাঁর ধারণা, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের গতি যত বাড়ছে, তার কাছ থেকে আমাদের পাওনার হারটা ততই কমছে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক, তার গবেষণা নিয়ে যতই আত্মপ্রকাশ করুক, পরম সত্য জানার জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা [illegible] দিনই সে জানতে পারবে না। বিশ্বজগতের জন্ম অথবা পরমাণুর অভ্যন্তরে মৌলকণার শক্তি কী ভাবে হল, কেন হল এ সব প্রশ্ন চিরদিনই অসমাধিত অবস্থায় থেকে যাবে। এসব প্রশ্ন [illegible] মাত্রিক [illegible] জিজ্ঞাসা এবং [illegible] মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। [illegible] না চাইছেন, যা [illegible] চাইছেন, তার যেন শেষ নেই।' গুন্থারের কটাক্ষ।

না। এ ধরনের কটাক্ষপাত শুধু আজকের ঘটনাই নয়। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ভেরনার হাইজেনবার্গ 'প্রিন্সিপাল অভ আনসার্টেইনিটি' বা অনিশ্চিতি তত্ত্বেও যেন একই কথা বলতে চেয়েছেন। যার মূল কথা: পর্যবেক্ষণ করা মানেই ব্যাপারটাকে বিকৃত করা। 'কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে পর্যবেক্ষককে পৃথক করে দেখবেন কী ভাবে?' বলেছেন পদার্থবিজ্ঞানী [illegible]। 'বিজ্ঞান ক্রমেই রোমাঞ্চকর, রহস্যজনক হচ্ছে এবং আধিভৌতিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল নিকোলাস কোপার্নিকসের ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'অন দ রেভোলিউসন অভ দ হেভেনলি বডিজ' এই বইটিই প্রথম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে পৃথিবী নামক এই গ্রহটিকে বিমুক্ত করে। বস্তুত সেই সঙ্গে মানব চিন্তাধারারও মুক্তি। সেই প্রথম কল্পনা এবং আত্মজিজ্ঞাসাকে বিশ্বরহস্যের একমাত্র উদ্ধারকারীর ভূমিকা বর্জন করতে হল। পরিবর্তে তাদের সঙ্গে সংযোজিত হল পরীক্ষা এবং নিরীক্ষার পালা। কার্যকারণ সম্পর্কটিকে বুঝতে হলে দেখতে হবে। ঘটনা যা ঘটে নিজের অভিজ্ঞতায় যাচাই করতে হবে। অতঃপর সিদ্ধান্ত। বস্তুত মৌলিক এই চিন্তাধারা শুধু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু মনেই যে নতুন [illegible] যোগিয়েছিল তা নয়, তৎকালীন ধর্ম, সমাজ, দর্শন, সব

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর: ১৯৬১

কিছুতেই তার প্রভাব অপরিসীম হিসেবে দেখা গিয়েছিল। উত্তরকালে গ্যালিলিও, জোহান কেপলার, আইজ্যাক নিউটন কোপার্নিকাসের উত্তরসূরী হিসেবে কাজ করেন। সেই প্রথম বলা হল, যা কিছু তত্ত্ব, তাকে পরীক্ষার মাধ্যমে নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত এখান থেকেই। ব্যাপক অর্থে এই প্রথম 'একসপেরিমেন্টাল সায়েন্স' বা পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান-এর জন্ম।

বিজ্ঞান এবং সাধারণ মানুষ

গত দুশো বছরে এই এক্সপেরিমেন্টাল সায়ান্স কী ব্যাপক হারে সম্প্রসারিত হয়েছে, সে খবর আজকের দিনে কারোরই অজানা নেই। একের পর এক বিচিত্র ওষুধ, রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি মানুষের পরমায়ু ক্রমেই বৃদ্ধি করেছে। বিচিত্র যানবাহনের কল্যাণে পৃথিবীতে অগম্য স্থান বলে আজ আর কিছু নেই। বিদ্যুৎ শক্তির আবির্ভাব বেঁচে থাকার সংগ্রামকে সহজতর করেছে। সেই সঙ্গে বিভ্রান্তও।

প্রাচীনতম বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথাই ধরুন। শোনা যায় কবে বৃষ্টি নামবে কি নামবে না এটা জানার জন্যে মিশরের মানুষ আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে মাটির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থাকত। পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে ওরা অদ্ভুত একটি তথ্য আবিষ্কার করেছিল। মিশরের আকাশে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে যখন নির্দিষ্ট কোন নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটত ওরা দেখত সেই সময় নীল নদের উপত্যকায় নামত অঝোর বর্ষণ। বর্ষার জলের উপর নির্ভর করতে হয় চাষবাসের জন্যে। অতএব ওই নক্ষত্রটিকে চিনে নাও। দেখ আকাশের ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলে কখন সে প্রবেশ করছে। যে মুহূর্তে প্রবেশ করল চাষীদের জানিয়ে দাও এবার বৃষ্টি হবে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে চাষবাসের ব্যাপক প্রস্তুতি।

মাটির পৃথিবীতে বাস করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকার এই হয়ত সূত্রপাত। পরবর্তীকালে মহাকাশ দর্শন যেন হয়ে দাঁড়াল সাধনার মত। মিশর থেকে মধ্যপ্রাচ্য, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রাশিয়া। ওদিকে ইনকাদের দেশ মেক্সিকো অথবা ব্রাজিল এবং পেরুর প্রত্যন্ত অঞ্চল—সর্বত্র।

প্রথমে খালি চোখ। তারপর কাচের লেন্সের তৈরি দূরবীক্ষণ। সেই ধারা শেষ পর্যন্ত আকাশ দর্শনকে যে কতখানি জটিলতর করেছে আজকের দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে কোন একটি বই হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন। সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাজগতের দিকে যাত্রা। জ্যোতির্বিজ্ঞান কথাটি ক্রমে অপসৃত হয়ে তার জায়গা জুড়ে বসেছে জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান। উদ্দেশ্য, শুধু গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান জানলেই চলবে না, জানতে হবে, তারা কে কোথায় অবস্থান করছে, তাদের গতিপ্রকৃতি, সৃষ্টি রহস্য, এ সব নিয়ে কতভাবে যে গবেষণা চলছে যে কোন একজন বিজ্ঞানীর কাছেও সে সব ব্যাপার মাঝে মাঝে যেন অজ্ঞাত বলেই মনে হয়।

উদাহরণ : জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে এক একে উদ্ভূত হয়েছে। : অ্যাসট্রো-কেমিস্ট্রি বা জ্যোতির্রসায়ন। যার কাজ দূর নক্ষত্র জগতে, সম্ভাব্য যেসব রাসায়নিক বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প, মিথেন, ইথেন মিথাইল অ্যালকোহল, নাইট্রোজেন, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি এদের সম্পর্কে রাসায়নিক ব্যাপারা স্যাপার লক্ষ করা। জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান বা অ্যাসট্রোফিজিকস-এর শাখা প্রশাখা হিসেবে গজিয়েছে মেজার অ্যাসট্রোনমি, হাই অ্যান্ড লো-এনার্জি অ্যাসট্রোফিজিকস, এক্স-রে অ্যাসট্রোনমি, নিউট্রন অ্যাসট্রোনমি কোয়াজারস অ্যাসট্রোনমি, সেপল বাইওলজি, রেডিওঅ্যাসট্রোনমি, ব্ল্যাক-হোল এবং প্রভৃতি প্রভৃতি।

যেমন ধরুন মেজার (MASER) অ্যাসট্রোনমি। মেজার কথাটি সম্প্রসারিত করলে দাঁড়ায় মাইক্রোওয়েভ অ্যামপ্লিফিকেশন। বাই স্টিমিউলেটেড এমিশন অভ রেডিয়েশন। এর মূলে আবিষ্কর্তা ডঃ লার্স এইচ টাউনস। ১৯৫৪ সালে তিনি বলেন, ধরা যাক কোন বস্তুর মধ্যে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পরমাণু নির্দিষ্ট কোন কম্পাঙ্কে আন্দোলিত হচ্ছে। এবার এই পরমাণুদের মাইক্রোওয়েভ বা অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যতরঙ্গকে আঘাত করতে দিন। যদি ওই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক পরমাণুগুলির কম্পাঙ্কের সমান হয় তাহলে দেখা যাবে আঘাত করার পর পরমাণুগুলি থেকে যে পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসবে সেই শক্তি ওই ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের শক্তিকে দারুণভাবে বাড়িয়ে দেবে। তখন ওই তরঙ্গের পক্ষে দূরপাল্লার পথ অতিক্রম করা সহজতর হয়।

না, কীভাবে মেজারের উৎপত্তি, সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, মেজারের প্রসঙ্গটি এখানে এই কারণে উল্লেখ করলাম, এর সাহায্যেই দূরে নক্ষত্র জগতের একাধিক গ্যাসীয় পদার্থের অস্তিত্ব জানা আজ সহজতর হয়েছে। এবং পদ্ধতিটা এই রকম। ধরুন মেজার তরঙ্গ দূরে কোন নক্ষত্র অঞ্চল থেকে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসার সময় মাঝপথে তাকে হয়ত জলীয় বাষ্পের এক খণ্ড মেঘকে অতিক্রম করতে হল। এখন যে মুহূর্তে সে জলীয় বাষ্পের মধ্যে গিয়ে পড়বে তার শক্তি এবং তরঙ্গ বিষয়ক কিছু কিছু বৈচিত্র্যের পরিবর্তন ঘটবে। যদি জানা থাকে জলীয় বাষ্পের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করার সময় মেজার তরঙ্গ কীভাবে প্রভাবিত হয় তাহলে নক্ষত্র জগৎ থেকে এগিয়ে আসা মেজার তরঙ্গ পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যেতে পারে ওই তরঙ্গ মাঝপথে কোন জলীয় মেঘ অতিক্রম করেছিল কী না এবং ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক কোন অঞ্চলেই বা করেছিল? আর ওই একই পদ্ধতি মহাব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিচরণ রত আর সব বস্তুগুলির অস্তিত্বও ধরা সম্ভব?

মহাকাশে আবিষ্কৃত হয়েছে এক্স-রের উৎস। কম অথবা বেশি শক্তিসম্পন্ন এক্স-রশ্মি মহাজাগতিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভেসে এসে পৃথিবীর পরিমণ্ডলকে আঘাত করছে। অথবা শক্তিশালী বস্তু কণা কসমিক পারটিকলস—যারা প্রতি মুহূর্তে আঘাত হানছে পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলের স্তরে অথবা নিয়ত অভিঘাত সৃষ্টি করছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে।

অথবা ধরুন অ্যাসট্রো-বাইওকেমিস্ট্রির কথা। অ্যাসট্রোফিজিকস-এর এটি আর একটি শাখা। মহাকাশে অথবা মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে, উল্কার মধ্যে যেসব জৈবিক অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে বিশেষ এই শাখাটি

প্রশ্ন উঠেছে, অন্য কোন নক্ষত্রমণ্ডলেও কি পৃথিবীর মত প্রাণী বাস করে? বিশেষ করে উল্কাপিণ্ডের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মত কোন কোন জৈবিক-রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করার পর এবং অ্যামোনিয়া, হাইড্রোকারবন প্রভৃতির সন্ধান, অন্তত যেটুকু এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে সেসব দেখে কেউ কেউ ভাবছেন প্রাণ সৃষ্টির মূল উপাদান ডি এন এ এবং আর এন এ হয়ত একদিন মহাজাগতিক পরিমণ্ডলেই জন্মলাভ করেছিল। অবশেষে নৈসর্গিক কোন উপায়ে পৃথিবীতে তাদের আগমন। অতঃপর বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান প্রাণীজগতের সৃষ্টি।

ভাবুন, এসবের তাৎপর্য অনুশীলন করে চলেছেন আজকের জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানীরা। চীনে ম্যাজিকের বাক্সের মতই এক থেকে বহুর সৃষ্টি। তার শেষ কোথায় কেউ জানে না। মানুষের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে এ যেন এক অদ্ভুত খেলা। যার মধ্যে রয়েছে অন্তহীন রোমাঞ্চ, অভূতপূর্ব অনুভূতি। মিশরের মানুষ যে দৃষ্টি নিয়ে একদা রহস্যভরা মন নিয়ে দূর আকাশের তারার দিকে চেয়ে থাকত, সে রহস্য এখন অনেক বেশি ঘনীভূত।

প্রশ্ন এই, মিশরের মানুষ তারা দেখত। তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বর্ষার আগমন অথবা বিভিন্ন ঋতু সম্পর্কে আগাম অবহিত হওয়া। তার সঙ্গে তুলনা করলে আজকের মহাকাশনিরীক্ষা মানুষের বাস্তব প্রয়োজনকে কতখানি মেটাতে পেরেছে? যার জন্যে এত তোড়জোড়, কোটি কোটি টাকা খরচ, মহাকাশযান পাঠানো, নানা রকমের বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি, যাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জনসাধারণকেই সরবরাহ করতে হয়, তার রিটার্ন না বিনিময় মূল্য হিসেবে পৃথিবীর আপামর মানুষ কতটা লাভ করছে গুনেথার স্টেনটের মত :

ধরুন মলেক্যুলার বাইওলজির কথা। প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এক সময়ে কাজ শুরু করেছিলেন কত রকমেরই না প্রাণী নিয়ে।

গাছপালা একদিকে, আর একদিকে মনুষ্য, বাঘ, ভালুক, সরীসৃপ, কত কী? আবিষ্কৃত হল এদের সবারই মূলে উৎস প্রোটোপ্লাজম। এখন অবশেষে ডি এন এ, আর এন এ। সম্প্রতি কৃত্রিম উপায়ে কিছু কিছু এনজাইমও তৈরি হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে, জীবজগতের মূলে উৎপত্তি দিন থেকে। কিন্তু এত সব জেনেও, আবার সেই যে তিমিরে সেই তিমিরেই। কারণ জীবজগতের ক্ষুদ্রতম অথচ বিশিষ্টতম সৃষ্টিকণা ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে আজ যেন বিরাট একটি জগৎ। তার বিরাট অণুর মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে বাস করে নানা রকমের অণু। বিচিত্র ভাবে তারা সাজান। তাদের কোনটির কাজ পেশী তৈরি করা, কারোব কাজ বিশেষ ধরনের হরমোন তৈরি করা এবং ইত্যাদি। কিন্তু কোন অংশ কখন, কেন এবং কীভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে জীবদেহের চাহিদামত কাজ করবে এ সব প্রশ্নের উত্তর এখনও দূরে অস্ত।

মলেকুলার বাইওলজিস্টরা বলছেন, তাঁরা কৃত্রিম উপায়ে জীবন সৃষ্টি করবেন, শরীরের দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন ক্যানসার প্রভৃতি এ-সবের নিরাময় ঘটাবেন, প্রয়োজন জড়বুদ্ধিসম্পন্নদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তুলবেন।

খুবই আশার কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও উঠেছে, বুদ্ধিদীপ্ত বলতে সত্যিকারের কী বোঝায়? ধরুন একটি ছেলে বা মেয়ে একবার পড়েই পড়া মুখস্থ করতে পারে, আর একজন পারে না। অথচ যে পড়া মুখস্থ করতে পারে তার চেয়ে যে পারে না, তার মধ্যে প্রেম, স্নেহ, মমতা এ সবের উপস্থিতি অনেক বেশি। বলুন, কাকে আপনি বেশি বুদ্ধিমান বলবেন? যদি সেটা আমরা না জানতে পারি, তা হলে বুদ্ধিদীপ্ত করা যাবে কীভাবে? এবং তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, সত্যিকারের মর্মটা কী? মানুষ মনে করে সেই নাকি পৃথিবীর একমাত্র বুদ্ধিমান জীব। তা যদি হয়, তা হলে প্রশ্ন এই, এই আত্মঅহমিকা করার আগে সত্যিই কি আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, আর যে সব প্রাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় তাদের কেউই আমাদের মত বুদ্ধিমান নয়?

সেটা সম্ভব নয়। কারণ, আর সব প্রাণীকে বিচার করতে গিয়ে মানুষ তার নিজস্ব প্রতিলিপিকেই কাজে লাগাবে, তার নিজস্ব মননশীলতার ফ্রেমকে রেফারেন্স করে। নিজেকে প্রমাণ বা স্ট্যাণ্ডার্ড করে। কিন্তু কে বলতে পারে, এই স্ট্যাণ্ডার্ডটাই সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড নয়। এ ধরনের কাজ ভুল বাটখারা দিয়ে ওজন করা নয়? এমনও তো হতে পারে, যাদের আমরা মনুষ্যেতর প্রাণী বলি বুদ্ধিবত্তার দিক দিয়ে মানুষের চেয়ে ঢের বেশি-সুদ্ধ, স্বাভাবিক এবং উন্নত? তাই মলেকুলার বাইওলজির ক্ষেত্রেও

ফ্রান্সের ওদিলোতে অবস্থিত সৌর-চুল্লি

'ফাস্ট অ্যাপ্রোচিং এ পয়েন্ট অব ডিমিনিসিং রিটার্ন' কথাটা কিছুটা খাটে।

*

বলছি না, সবটাই ডিমিনিসিং রিটার্ন। বিজ্ঞানের সাহায্যে গত কয়েক দশকে কত কীই না ঘটে গেল। দ্রুতগামী যানবাহন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মানবকল্যাণে সমুদ্রের ব্যবহার, শিল্পপ্রযুক্তির প্রয়োজনে কয়লা তেল ছাড়াও পরমাণুকেন্দ্রিক জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন, দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়, নিঃসন্দেহে এ সব আশার কথা। কিন্তু একই সঙ্গে আর একটি দিকও দেখুন। কারণ একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করেছে হিরোসিমা নাগাসাকির বিপর্যয়, রাসায়নিক বিষ ছড়িয়ে পূর্ব এশিয়ার বনসম্পদ ধ্বংস করেছে। অথবা তৈরি করেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে এমন ধরনের আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র।

শিল্পপ্রযুক্তি সমাজ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। দ্রুত। দ্রুত থেকে দ্রুততর। এ যেন হাউই এর পলতেয় আগুন লাগানোর মত। প্রথমে ধীরে জ্বলা। তারপর দ্রুত প্রজ্জ্বলন। এত দ্রুত, কোন সময়ে নাগালের মধ্যে থেকে সেই হাউই ছুটে বেরিয়ে গেছে। আর কখনও তাকে মুঠোর মধ্যে ফিরে পাওয়া যাবে না।

এই যে অনন্ত এবং অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, আজকের কোন কোন বিজ্ঞানীর কাছে এটাই এখন যেন বড় সমস্যা।

যেমন ধরুন, বিজ্ঞানকে আমরা নতুন নতুন জীবনব্যবস্থায় কাজে লাগিয়েছি। আরও একটু স্পষ্ট করে একটা উদাহরণ দিলে ভাল হয়। যেমন ধরুন, বিদ্যুৎশক্তি। বর্তমান জীবনধারণ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ ছাড়া চলতে পারে না। অথচ কয়লা বা তেল থেকে এ পর্যন্ত এত বেশি বিদ্যুৎ সংগ্রহ করা হয়েছে যে, জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে যা বোঝায় ক্রমে সেই জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। বিকল্প বিদ্যুৎ উৎস নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। চেষ্টা চলছে পরমাণুকেন্দ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার। যে পদ্ধতিতে সূর্যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, যাকে বলা হয় তাপ-পরমাণুকেন্দ্রিক বিক্রিয়া পরমাণুকেন্দ্রিক সংযোজন, সেই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে যাতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায় এ নিয়ে জোর কাজ চলছে রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে। শোনা যাচ্ছে, মার্কিন দেশেও কাজ শুরু হচ্ছে। এ ছাড়া বাতাসের শক্তিকে ব্যাপক-ভাবে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কথাও ভাবছেন কেউ কেউ। এর জন্যে সমুদ্রে বড় বড় জেটি ভাসিয়ে দেওয়া হবে। এই সব জেটির উপর থাকবে বড় বড় পাখা। বাতাসের ধাক্কায় সেই পাখা ঘুরবে। আর সেই পাখা জেনারেটার চালিয়ে উৎপাদন করবে বিদ্যুৎশক্তি। এ ছাড়া ম্যাগনেটো হাইড্রো ডাইয়ানামিকস পদ্ধতিতেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। এই পদ্ধতিতে গরম এবং আয়নিত কোন গ্যাসকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রেখে সঞ্চারিত করা হয়। পরিবর্তে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন। এ ধরনের পদ্ধতি নাকি তাপবিদ্যুৎ চুল্লির উৎপাদন পদ্ধতি থেকে শতকরা ৪০ ভাগ বেশি লাভজনক। ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় শুরু হয়ে গেছে ভূ-তাপশক্তি বা জিওথার্মাল এনার্জি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের চেষ্টা। এর জন্যে স্টিলের তৈরি দুটি নল পাশাপাশি ভূ-ত্বকের গভীর পর্যন্ত চালিয়ে দেওয়া হবে, যেখানে ভূস্তরের তাপমাত্রা প্রায় ১০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মত। এবার একটি নলের মধ্যে পাঠান হবে জল। ওই জল নিচে গিয়ে বাষ্পে পরিণত হয়ে অন্য নল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। তখন ওই

দাম্প দিয়ে চালান হবে টারবাইন এবং সেই সঙ্গে জেনারেটার।

খুব ভাল কথা। ইতিমধ্যে এমনিতেই ভূস্তরের ভেতর থেকে কোন কোন অঞ্চলে যে উষ্ণ বাষ্প বেরিয়ে আসছে তার কিছু কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে কাজে লাগান হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, কৃত্রিম নল পুঁতে জল পাঠিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনা যদি পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে চালান হয়, তা হলে বলুন, পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ উত্তাপ খুব কম সময়ে কি কমে যেতে শুরু করবে না? হঠাৎ তেমন ঘটনা ঘটতে শুরু করলে, ভূ-সংকোচন ঘটবে হামেশা। ফল ভূকম্পন এবং ব্যাপক হারে যখন তখন ভূকম্পন। এর ফলে কত ঘরবাড়ি ধ্বংস হতে পারে? প্রাণহানি ঘটতে পারে?

খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এমন ধরনের বহু পরিকল্পনাই এখন চোখে পড়বে যারা আপাতদৃষ্টিতে হয়ত খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, আবিষ্কার অথবা পারদর্শিতার সাফল্যের রোমাঞ্চে ভরা। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে যাদের ফলাফল অনেক বিপদই টেনে আনতে পারে। বিজ্ঞানীরা এবং আরও একটা ট্র্যাজেডি, গুটিকয় মানুষ ছাড়া, বৃহৎ জনসাধারণ বলতে যাদের বোঝায় বর্তমান বিজ্ঞাননির্ভর যুগে তারাই যেন আজ সবচাইতে বেশি অসহায়ের দিন যাপন করছে। বরং হয়ত বলা চলে, পৃথিবীর মানব ইতিহাসে এত বেশি অসহায় মানুষ আর কখনও ছিল না।

একটু চেষ্টা করলেই এটা বোঝা যাবে। সবাই তো জানেন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা যাঁদের হাতে, তাঁরা তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন। সৃষ্টির যে আনন্দ, সৃষ্টির যে রোমাঞ্চ তাঁরাই তা ভোগ করছেন। অবশিষ্ট যারা তাদের ভূমিকা যেন নাট-বল্টুর মত। যে লোক বিরাট রকেটটিকে একটা সুইচ টিপে এই মাত্র আকাশে ওড়াল, সে জানে ওই সুইচ টেপার কাজটা অন্য কেউ করলেও চলত। ঠিক যেন একটার বদলে আর একটা বল্টু ব্যবহার করলে যা দাঁড়ায় কতকটা যেন তাই। সেই কর্মযজ্ঞের সে যে একজন অধিকারী, তার মন, তার কল্পনা, তার নিজস্বতার ইনভলভমেণ্ট এখানে নেই। এই ব্যাপারটাই মানুষকে যেন কতকটা যন্ত্রে পরিণত করে দেয়। যার ফলশ্রুতি : এমন একটি পরিবেশে বাঁচতে গিয়ে অনেক কিছু মানবিক বোধ সে হারিয়ে ফেলে। আমি করছি, আমার ক্ষমতা করছে, আমার হৃদয় করছে—এ সব থেকে সে ক্রমে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। এই যে বিযুক্তি, এটাই আজ হৃদয়বৃত্তিকে বিকশিত করে তোলার ব্যাপারে যেন এক বড় রকমের বাধা। সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এটা এখন বড় রকমের সমস্যা।

আসল কথা এই, বর্তমান দশকের পাদপীঠে এসে অনেক বিজ্ঞানীই এখন চিন্তিত। তাঁরা মনে করছেন, বিজ্ঞান এ পর্যন্ত যা করেছে তার একটা সুষ্ঠু মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এবং যে কোন গবেষণায় হাত দেবার আগে দেখা দরকার : কী নিয়ে গবেষণা করব, কেন করব, কতটা করব এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতাই বা কতটা? এর সঙ্গে প্রয়োজন বৃহৎ জনমানসের সঙ্গে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী, যাঁদের উপর সব কিছু বিজ্ঞান প্রচেষ্টা নির্ভর করছে তাঁদের সংযোগ। এতে বিজ্ঞান প্রগতির মূল্যায়ন সহজতর হতে পারে।

সমরজিৎ কর

চিঠি

'দেশ' (৪০ বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা, ২৬শে মে, ১৯৭৩) পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিশ্ব-বিজ্ঞান' বিভাগে মহাকাশ থেকে পৃথিবী নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে যে, "অতিবেগুনী (আলট্রা ভাওলেট) রশ্মি শরীরে ভিটামিন 'সি' তৈরী করতে সাহায্য করে।" কিন্তু ভিটামিন 'সি' মানুষ, গিনিপিগ, পাখী ইত্যাদি এদের শরীরে তৈরি হয় না। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর লিভার এবং কিডনিতে মাত্র ভিটামিন 'সি' তৈরী হয়, সেখানে অতিবেগুনী রশ্মির পৌঁছানোই সম্ভব নয়। অতএব ভিটামিন 'সি' তৈরিতে অতিবেগুনী রশ্মির কোন ভূমিকা নেই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, অতিবেগুনী রশ্মি ভিটামিন 'ডি' (ডি-২ এবং ডি-৩) তৈরী করতে অংশ গ্রহণ করে, ভিটামিন সি যাহা স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে, তাহা নহে। রিকেট রোগ প্রতিরোধকারী ভিটামিন 'ডি' তৈরী হয় উদ্ভিদ স্টেরল-এর উপর ২৬০—৩১০ মিলিমাইক্রন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণের ফলে।

লেখকের বক্তব্য : শ্রীযুক্ত সজন অধিকারীর চিঠির জন্য ধন্যবাদ। মুদ্রণ প্রমাদে ভিটামিন-ডি-এর পরিবর্তে ভিটামিন-সি ছাপা হয়েছে। এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৬৮ ॥

একটানা আট দিন বড়বাবু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। ঘুম ও জাগরণের মাঝখানের একটা অবস্থা। কখনো তিনি তাকিয়ে থাকেন লোকজনের মুখের দিকে, কেউ কথা বললে শুনতে পান ও মনে হয়, কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারেন না। আবার এক এক সময় নিজে থেকেই একটা দুটো কথা বলে ওঠেন—সে সব কথার মর্মোদ্ধার করাও সহজ নয়।

ধন্বন্তরি হিসেবে বিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সদ্য প্র্যাকটিস করা বন্ধ করেছেন, বাড়িতে শুধু সকালে এক ঘণ্টা বিনা পয়সায় রোগী দেখেন। মন্দাকিনীর ছেলে সুরেশ্বরের সঙ্গে ডাঃ বিধান রায়ের পরিচয় আছে। সুরেশ্বর বিশেষ চেষ্টা করলেন তাঁকে আনবার জন্য। কিন্তু ডাঃ রায় অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্য বাড়িতে আসতে পারলেন না, চেম্বারে আনতে বললেন। সেখানে বড়বাবুকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই এখন ওঠে না, তাই ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনকে কল দেওয়া হলো।

বাড়িতে সব সময় লোকজনের ভিড়। নানা সূত্রে বড়বাবুকে অনেকেই চেনে। খবর পেয়ে সবাই ভিড় করে আসছে। সকলেই একবার অন্তত রোগীর কাছে গিয়ে জানাতে চায়, আমি এসেছি, আমাকে চিনতে পারছেন তো? ভিড় সামলানোই মুশকিল।

সূর্য এ কদিন একবারও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। বাদলও সব সময় তার সঙ্গেই থাকে। বাড়িতে একটা থমথমে ভাব। সকলেই বড়বাবুর ঘরের মধ্যে বা কাছাকাছি থাকে সব সময়। দু'জন নার্স রাখা হয়েছে দিনে ও রাত্রে পালা করে থাকার জন্য, পাড়ার ডাক্তার প্রত্যেকদিন তিন চারবার করে আসেন।

নবম দিন দুপুরের দিকে বড়বাবু চোখ খুলে দুর্বল স্বরে বললেন, মা, মা—

চিররঞ্জন বারান্দায় ছিলেন, ছুটে এলেন। বড়বাবু অনেকটা পরিষ্কারভাবেই বললেন, চিরু, আমি ভালো আছি।

চিররঞ্জনের শুকনো মুখে বিদ্যুতের মতন আলো ফুটে উঠলো। কয়েক দিনেই চিন্তা ভাবনায় চিররঞ্জন অনেক রোগা হয়ে গেছেন।

কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনাকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে। যন্ত্রণা-টন্ত্রণা আছে?

বড়বাবু বললেন, না। এবার বোধ হয় ধাক্কাটা সামলে উঠবো। আমাকে একটু তুলে ধরো তো!

পাশ থেকে নার্স বললো, না, না, এখন উঠবেন না।

বড়বাবু বললেন, এ মেয়েটি কে?

বাড়ির সকলেই অবিলম্বে উপস্থিত হলো সেখানে। বড়বাবুকে কয়েকটা বালিশ উঁচু করে ঠেস দিয়ে বসানো হয়েছে। এতদিন পর তাঁর চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ প্রকট। চামড়া ঝুলে গেছে, চোখ দুটি কোটরগত। গলার আওয়াজে সেই দৃঢ়তা আর নেই। দেখে যত না অসুস্থ মনে হয়, তার চেয়েও বেশী মনে হয়, মানুষটা খুবই ক্লান্ত।

ভালো মতন জ্ঞান ফেরা মাত্রই ডাক্তারকে খবর দেবার কথা ছিল, তাই সূর্য চলে গেছে ডাক্তারকে ডাকতে।

চিররঞ্জন বললেন, আমি এমন বিপদে পড়েছিলাম...ডাক্তাররা বলছিলেন হাসপাতালে পাঠাতে—কিন্তু আপনার মতামত না নিয়ে...

—হাসপাতালে কেন?

—হার্টের চিকিৎসা বাড়িতে ভালো মতন—

—হার্টটাই গেছে বুঝি?

—গুরুতর কিছু নয়, সামান্য অ্যাটাক—

—হুঁ। হাসপাতালে না পাঠিয়ে ভালোই করেছো—

হিমানী বললেন, এ ক'দিন তো আপনি কিছুই খাননি। শুধু গ্লুকোজ ইঞ্জেকশান দিয়ে...আজ কিছু খাবেন?

—ক'টা দিন কেটেছে বলো তো?

সবাই তখন দিনের হিসেব মেলাতে বসলো। তারপর সেই সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার বর্ণনা।

বড়বাবু চুপ করে শুনলেন সব। তারপর হঠাৎ ছেলে মানুষের মতন বললেন, আমাকে একটু মুগের ডাল খাওয়াতে পারো? আমার মায়ের হাতের রান্না খেয়েছিলাম—

সকলে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। এত কঠিন অসুখের রোগীকে কি মুগের ডালের মতন গুরুপাক কিছু খাওয়ানো উচিত? তা ছাড়া, বড়বাবু আবার নিজের মায়ের রান্না খেলেন কবে? কোনোদিন তো ও'র মুখে ও'র মায়ের কথা শোনা যায়নি।

হিমানী একটা স্তোকবাক্য দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। রান্নাঘরে গিয়ে মুগের ডাল বার করে রাখলেন—তবে,

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস না করে রান্না চাপবেন না।

ডাক্তার এসে বড়বাবুর অবস্থা দেখে খুব খুশী হলেন, কিন্তু মুগের ডাল খাবার অনুমতি দিলেন না। অসুখ হলে—এত বড় একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গেও সবাই শিশুর মতন ব্যবহার করে। ডাক্তারও বললেন, আর কয়েকটা দিন বাদেই তো পুরো ভালো হয়ে যাবেন—তারপর যা খুশি হয় খাবেন, কেমন?

সন্ধেবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর বড়বাবুর অবস্থা আরও অনেক ভালো মনে হলো। নিজে দুধের বাটি হাতে নিয়ে চুমুক দিলেন। বললেন, রেডিওটা খোলা তো, একটু খবর শুনবো—

কিন্তু সকলেরই মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি রয়ে গেল। আর সব দিক ভালো হলেও বড়বাবুর কথাবার্তা একটু যেন অসংলগ্ন। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলছেন, যার মানে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় তাঁর চৈতন্যের জগতে একটা কিছু উলোট-পালোট চলছে। মায়ের কথা বলছেন বারবার। এককালে তিনি গান শিখতেন ওস্তাদ সৈফুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, খাঁ সাহেব কি এসেছিলেন কাল?

সবাই জানে, সৈফুদ্দিন খাঁ সাহেব মারা গেছেন সাত আট বছর আগে।

কেউ কিছু উত্তর না দিলে বড়বাবু সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, এখন কলকাতায় গান বাজনার জলসা হচ্ছে না কোথাও? আমাকে একটু নিয়ে যেতে পারো?

চিরঞ্জন বিব্রতভাবে বললেন, শরীরের এই অবস্থা। আপনি এখন কি করে যাবেন?

—শরীরটা কি আমার একেবারেই গেছে?

—আজ তো বেশ ভালো আছেন।

বড়বাবু বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। চিররঞ্জন ও নার্স এসে দু' পাশ থেকে ধরলো তাকে। দু'তিন পা হেঁটেই বড়বাবু বললেন, আমার মাথা ঘুরছে!

—আপনি বিছানায় এসে বসুন।

—না, আমি আর একটু হাঁটবো। শরীরকে বেশী প্রশ্রয় দিলেই পেয়ে বসবে।

চিররঞ্জন ও নার্সের কথা অগ্রাহ্য করেই বড়বাবু ঘর থেকে বেরুবার চেষ্টা করছিলেন, তখন সূর্য এসে বললো, বিছানা থেকে নামা আপনার একদম বারণ।

বড়বাবু বললেন, ডাক্তার বৈদ্যের কথা শুনে আমি কখনো চলিনি। সূর্য, চল, সমুদ্রের ধারে কোথাও বেড়াতে যাবি।'

—যাবো। আপনি আগে একটু সেরে উঠুন।

সূর্য তার বাবাকে ধরে ধরে আবার [illegible]

বড়বাবু বললেন, আমার এ জায়গাটা আর ভালো লাগছে না। আমি অন্য কোথাও যাবো।

পরদিন বড়বাবু চিররঞ্জনকে একটা চেক সই করে দিলেন পর্যন্ত। এর আগে তিনি হাতও নাড়াতে পারতেন না। হাসতে হাসতে বললেন, আমি ঠিক সেরে উঠবো। এত সহজে মরতে রাজি নই হে।

তারপর হঠাৎ আবার অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, বেঁচে থেকে কি হবে, তাও তো জানি না।

একটু বাদেই বৃষ্টি এলো, আকাশ অন্ধকার। ঘরের মধ্যে একটা থমথমে ছায়া। চিররঞ্জন উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করতে যেতেই বড়বাবু বললেন, থাক, এখানেই থাক।

বাদল সূর্যকে বললো, সূর্যদা, আমরা তো আছি, তুমি আজ একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো না।

এর আগে সূর্য বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে কাটাতো। এই ক'দিন সে একটানা বাড়িতে থেকে যেভাবে কাজকর্ম করেছে—তা দেখলে অন্যদের মায়া লাগে। বাড়ির কাজ করা যে-সব ছেলের স্বভাবে নেই—তারা কিছুতেই নিজেদের এসব ব্যাপারে ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না।

সূর্য বললো, আজকের দিনটা থাক্। কাল বেরুবো।

বাদল উৎসাহের সঙ্গে বললে, লরেন্স অলিভিয়ার-এর হ্যামলেট এসেছে, তুমি দেখবে না?

সূর্য অন্যমনস্কভাবে বললো, হ্যাঁ রে আমি যখন ডাক্তার টাক্তার ডাকতে গেছি, তার মধ্যে কি কখনো দীপ্তিদি এসে-ছিলেন?

—না তো। এলে ঠিক বসিয়ে রাখতাম।

—এলো না কেন? আশ্চর্য। ওর একটা খবর নেওয়া দরকার।

—আমি যাবো?

—দেখি আজকের দিনটা।

সূর্য জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে, সমস্ত শহরটা নিস্তব্ধ মনে হয়। এই কদিন বাবার অসুখের চিন্তার মধ্যেও সে দীপ্তির কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভোলে নি। দীপ্তি একবারও খবর নিতে এলো না কেন? দীপ্তি এ বাড়িতে তো আগে একদিন এসেছিল। দীপ্তির কোনো বিপদ হয়নি তো?

সূর্যর মনে হলো, বৃষ্টির মধ্যেও সে কেন দীপ্তির শরীরের সুগন্ধ পাচ্ছে। দীপ্তি যেন কোনো একজন নারী নয়—সূর্যর মুখ লুকোনোর জায়গা।

দীপ্তি আসেনি, দীপ্তির সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি—কেন সে এরকম কষ্ট দিচ্ছে? সূর্য এর শোধ নেবে। সে তার ভালোবাসা দিয়ে দীপ্তিকে পাগল করে দেবে।

রাত্তিরবেলা ঘুমোতে যাবার আগে সূর্য এসেছে বাবাকে দেখতে। বড়বাবু তখন চোখ বুজে আছেন।

অসুখ অনেক রকম হয়, তবু অসুস্থ মানুষ দেখলেই প্রথমে জ্বর দেখার কথাই মনে পড়ে। সূর্য তার একটা হাত রাখলো বড়বাবুর কপালে। বড়বাবুকে ঘুমন্ত মনে হয়েছিল, কিন্তু তিনি চোখ খুলে তাকালেন। বললেন, বেশ একটু—

রাত্রির নার্স একটা বই খুলে বসেছিল শিয়রের কাছে। বড়বাবু বললেন, তুমি একটু বাইরে যাও তো মা।

নার্সের টুলে সূর্য বসে পড়ে বললো, আপনার বেশী কথা বলা নিষেধ।

বড়বাবু সে কথা গ্রাহ্য না করে বললেন, আমার যদি হঠাৎ কিছু হয়ে টয়ে যায়—তোকে কয়েকটা কথা বলে রাখা দরকার। বাড়ির দলিল, কোম্পানির কাগজ।

সূর্য বললো, এসব কথা এখন থাক না। পরে হবে।

—পরে যদি আর সময় না পাই?

—ডাক্তাররা তো বলছেন।

—আমি ডাক্তারি ওষুধে বিশ্বাস করি না। আজ সকাল থেকে তোর কথাই ভাবছি। তোর মায়ের কথা। তুই গোয়ালিয়র চলে যা।

—গোয়ালিয়র? কেন?

—এটা তোর জায়গা নয়।

—ওখানে গিয়ে আমি কি করবো? কারুকেই চিনি না

—ও, আচ্ছা থাক্‌সনি। তুই এখানে কি করবি?

—ঠিক ভেবে দেখিনি

—তুই বিয়ে করবি না?

সূর্য কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। নিজের বিয়ের কথাটা সে বাবাকে জানাবে বলেই মনঃস্থির করে রেখেছিল। কিন্তু এখন একথা বলার প্রকৃষ্ট সময় নয়।

সে বললো, আপনি আগে পুরোপুরি সেরে উঠুন

বড়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

সূর্য এ কথার ঠিক তাৎপর্য বুঝতে না পেরে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো বাবার দিকে। তার মনে হলো, বাবার বুকটা যেন একটু বেশী জোরে ওঠা নামা করছে। নিশ্বাসের কষ্ট হবার লক্ষণ কি!

সে বললো, আপনার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে?

বড়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, না।

তারপর খুব টেনে টেনে বললেন, আমি চলে গেলেও এ পৃথিবী এরকমই থাকবে।

ব্যাপারটা খুব ভালো না মনে হওয়ায় সূর্য উঠে গিয়ে চিররঞ্জনকে ডেকে আনলো। চিররঞ্জন হন্তদন্ত হয়ে এলেন। বললেন, চিরু, বসো, তোমার সঙ্গেও কথা আছে।

চিররঞ্জন প্রায় ধমক দিয়েই বললেন, আপনি এখন ঘুমোন তো। সব কথা কাল শুনবো।

বড়বাবু বললেন, না।

নিজেই উঠে বসার চেষ্টা করলেন। নার্স তাড়াতাড়ি এসে তাঁর গা ধরে বললো, কি করছেন কি? শুয়ে পড়ুন

বড়বাবু বললেন, আমার শয্যাকণ্টকী হয়েছে। পিঠ জ্বলে যাচ্ছে। আমি শুয়ে থাকতে পারছি না।

সূর্য প্রিয়রঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তার ডাকবো?

বড়বাবু ততক্ষণে উঠে বসেছেন। খানিকটা জোর লাগা গলায় বললেন, আমি সারাজীবন ধরে বোঝবার চেষ্টা করেছি, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমার মা বলেছিলেন...এই কথাটা আমাকে জেনে যেতে হবে। আমি পারিনি। তোমরা কেউ জানো?

প্রিয়রঞ্জন কাঁদো কাঁদো ভাবে বললেন, বড়বাবু, কথা বললে আপনার কষ্ট বাড়বে। ডাক্তারকে ডেকে আনছি এক্ষুনি

বড়বাবু নার্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে ইশারায় বললেন, এক গ্লাস জল। নার্স জল গড়িয়ে এনে খাইয়ে দিতে গেল, বড়-বাবু সেটা নিজের হাতে নিলেন। ঠোঁটে ঠেকাবার আগেই গেলাসটা হাত থেকে পড়ে বিছানা জলে ভেসে গেল। বড়বাবু যেন সেই জল শুষে নিতে চান—এই ভঙ্গিতে নিজেও ঠাস করে উপুড় হয়ে পড়লেন বিছানায়—তাঁর বুক দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগলো।

সূর্য তক্ষুনি ছুটে যাচ্ছিল ডাক্তার ডাকতে। চিররঞ্জন সূর্যর হাত চেপে ধরে বললেন, তুমি না। তুমি সামনে থাকো—।

বাদলকে পাঠানো হলো ডাক্তারের জন্য। চিররঞ্জন আর সূর্য ধরাধরি করে বড়বাবুকে সোজা করে শুইয়ে দিল। বড়বাবু স্থির চোখ মেলে চেয়ে আছেন, আবার তাঁর বাক-রুদ্ধ হয়ে গেছে। চিররঞ্জন আকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে লাগলেন, নার্স ঘষতে লাগলো পায়ের পাতা।

ডাক্তার এসে দেখে মুখ কালো করলেন। নীচু গলায় বললেন, একটা ইঞ্জেকশান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আর কোনো আশা নেই। শুধু শুধু আর কষ্ট দিয়ে কি হবে! কেমার পরের স্টেজে একটু ভালো হয়ে তারপর হঠাৎই এই রকম

সূর্য বললো, আপনি তবু ইঞ্জেক ...ন দিন

ইঞ্জেকশান দেবার পর মাত্র এক মিনিট বাদেই বড়বাবু আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক চোখ ঘোরালেন। তারপর ঠোঁট নড়ে উঠলো। কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ কিছু শুনতে পেল না। শেষ নিশ্বাস বেরুবার আগে সেইটাই বড়বাবুর শেষবার কথা বলার চেষ্টা। তাঁর শেষ কথা কেউ বুঝতে না পারলেও বাদল দাবি করে, সে ঠোঁট নাড়া দেখেই কথাটা ধরতে পেরেছে। বড়বাবু বলতে চেয়েছিলেন, দেখে গেলাম। এবং এই দেখে গেলাম কথা দুটিরই অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে বাদল। তার মতে, বড়বাবুর সারা জীবনের চরিত্রের সঙ্গে এই কথা দুটি মিলে যায়।

(ক্রমশ)

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

পুনা দরবার থেকে বিঠুর দরবারঃ নটী বেঙ্কট নারাশি

পুনে দরবারের চেয়ে পুনা শহর অনেক পুরানো।

মধ্য যুগের ইতিহাসে পুনা নগরীর নাম প্রথম পাওয়া যায় ১৬০৪ সালে, যখন তার কর্তৃত্ব লাভ করেন মালোজী—শিবাজীর পিতামহ। তার প্রায় ৬০ বছর পরে (১৬৬৩-তে) আওরঙ্গজেবের সুবাদার শায়েস্তার অধিকারে পুনা চলে যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার পুনরুদ্ধার করেন শিবাজী। তারপর থেকে, নানা ভাগ্য বিপর্যয়েও পুনা মারাঠা শক্তির কেন্দ্রস্থল গণ্য হয়েছে। তবে পুনার দরবার গড়ে উঠেছে আরো পরে, স্বাধীন পেশোয়াদের আমলে।

পুনার সেই বিখ্যাত শনিবার প্রাসাদের দরবার। পেশোয়া প্রথম-বাজী রাও ১৭৩০ সালে শনিবার প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। পুনা দরবারেরও পত্তন হল সেই সঙ্গে। তার একশ' বছরের মধ্যেই (১৮১৮) আর এক বাজী রাওয়ের (দ্বিতীয়) আমলে তার ঝাড়-লণ্ঠন নিভে গেল। আবার ওই বছরেই তাঁর নির্বাসিত জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল বিঠুর দরবার। নবাব ওয়াজিদ আলীর নির্বাসনের ফলে লক্ষ্ণৌ দরবারের রোশনি আঁধার করে যেমন মেটিয়াবুরুজ দরবার জ্বলে উঠেছিল।

মেটিয়াবুরুজের মতন বিঠুর দরবারও অর্বাচীন। এ দরবারের কোন পরম্পরা নেই। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৩ সাল (শেষ পেশোয়া, দ্বিতীয়-বাজী রাওয়ের মৃত্যু বছর) পর্যন্ত বিঠুর দরবারের অস্তিত্ব-কাল। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যেই সে সংগীত-সভা লুপ্ত হয়ে যায়। আর দরবারপতি একজনই—বাজী রাও।

কিন্তু বিঠুর স্থানমাহাত্ম্যে মহা গরীয়সী। অতি প্রাচীন কাল থেকে স্বনাম ধন্য এই জনপদ। পুণ্য ঐতিহ্য-মণ্ডিত বিঠুর। গঙ্গার তীরবর্তী জন-বসতি। গঙ্গা ও জন নদীর সঙ্গম বিঠুরের দক্ষিণেই। কানপুরের ছয় ক্রোশ উত্তরে এর অবস্থান। ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ও অন্তরে এক পবিত্র তীর্থভূমি বিঠুর। পুরা পরম্পরায় গণ্যমান্য।

সৃষ্টিকর্ম সম্পূর্ণ করে ব্রহ্মা এই স্থানেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে-ছিলেন—ইতি পুরাণ আখ্যায়িকা। তারই স্মারক বিঠুরের গঙ্গাতটে ব্রহ্মাবর্ত ঘাট।

বিঠুরের আর এক পৌরাণিক শ্রুতি-স্মৃতির স্থান রামায়ণ রচনাকার মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। অযোধ্যার নির্বাসিতা রাজলক্ষ্মী সীতা। তাঁকে বাল্মীকি আশ্রমে আশ্রয় লাভের জন্য লক্ষ্মণ এখানে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। বাল্মীকির কুটিরেই লব কুশের জন্ম। যমজ দুই ভ্রাতা লালিত পালিত হন এই স্থানেই। পরে রামচন্দ্রের যজ্ঞের অশ্ব এখানেই বন্দী করেন লব কুশ। ফলে—পিতা ও পুত্রেরা তখনো পরস্পরের অপরিচিত—অযোধ্যা বাহিনীর সঙ্গে ভ্রাতৃ-দ্বয়ের যুদ্ধ। এই স্থানেই রাম পুত্রদের পরিচয় পান, লব কুশের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। বিঠুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম রামেল। কোন কোন মতে, রামেল হল রামমেল কথার বিকৃতি, রামের সঙ্গে লব কুশের দ্বন্দ্ব ও মিলনের স্মারিকা। বিচ্ছিন্ন রামের সঙ্গে মিলন—রামেল নামের এ তাৎপর্যও সম্ভব। মহর্ষি বাল্মীকির স্মরণ-সম্মানে মারাঠারা এক মন্দির নির্মাণ করে দেন, বিঠুর নগরের দক্ষিণে এক টিলায়। কপালেশ্বর নামে এখানে এক প্রাচীন মন্দিরও আছে—তা শ্রীরামের অন্যতম উপাধি কাকপক্ষেশ্বরের বিকৃত রূপও হতে পারে।

অতি দূর অজানা কালের কাহিনী সে-সব। দুস্তর ইতিহাসের সে কোন্ উষালগ্ন পুরাণের রহস্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা যায়, যুক্ত প্রদেশের এই সমস্ত অঞ্চলে বহু পুরা-কীর্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য বিশেষ হয়েছে কি? হলে, সুপ্রাচীন ইতিহাসের কোন কোন অন্ধকার অধ্যায়ে হয়ত আলোকপাত ঘটত।

বিঠুরের ঐতিহাসিক পর্বেও শ্রুতি-স্মৃতি রয়েছে চন্দেল্ল বংশের প্রথম নৃপতি চন্দ্রবর্মাকে ঘিরে। কোন এক সময়ে বিঠুর তাঁর রাজধানী ছিল। তার পরের মধ্য যুগে বিঠুরের নাম পাওয়া যায় একটি পরগনার প্রধান শহর রূপে। অনেক পরে, ১৮১১ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত এখানে জেলার সদর কার্যালয়। অবশেষে ১৮১৮-তে এখানকার বিচারালয়গুলি স্থানান্তরিত করবার পরই নির্বাসিত

পেশোয়া বাজী রাওয়ের বসবাসের জন্যে বিঠুর নির্দিষ্ট করা হয়। তিনি এখানে এসেই পত্তন করেন দরবার এবং তার আয়ু ছিল দরবারপতির সমকালীন—১৮৫৩ পর্যন্ত। তাঁর পোষ্যপুত্র, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নানা সাহেব হয়ত বিঠুর দরবারের ধারা রক্ষা করতেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার নানাকে স্বীকৃতি দিলে না, বন্ধ করে দিলে তাঁর প্রাপ্য বার্ষিক বৃত্তি। নানা ঝাঁপ দিলেন সাতান্নর মহা বিদ্রোহে। তারপর সেই দারুণ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত হয়ে যায় নানা সাহেবের জীবনতরীর সঙ্গে বিঠুর দরবারও। শেষের সেই পরিচ্ছেদ সকলেরই সুপরিচিত।

দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের রাজ্য হারাবার প্রায় একশ বছর আগে পুনা দরবারের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর ব্যর্থতায় সে-দরবার ও মারাঠা রাজ্যের বিনষ্টি। প্রথম বাজী রাও শুধু মারাঠার নয়, ভারত ইতিহাসেরও ছিলেন এক স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁর শৌর্যে বীর্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় মহারাষ্ট্রের সম্মানসূর্য মধ্য গগনে দীপ্ত হয়েছিল। শিবাজীর হিন্দু পদ পাদশাহী বা হিন্দু সাম্রাজ্যের পরিকল্পনাকে, হিন্দু স্বরাজ্যের আদর্শকে সার্থক রূপায়িত করেন পেশোয়া প্রথম-বাজী রাও। তাঁর দিগ্বিজয়ী বীরত্বে মহারাষ্ট্রের সাম্রাজ্য আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সেই বাজী রাও পুনার বিখ্যাত শনিবার প্রাসাদ গড়ে তোলেন ১৭৩০ সালে। তখন থেকেই প্রাসাদে পুনার সঙ্গীত-দরবারেরও পত্তন। পেশোয়া অধ্যুষিত রাজ্যের রাজধানীর গৌরব সে-সময় পুনা লাভ করেছে। শনিবার প্রাসাদ তার কেন্দ্রবিন্দু। পুনা দরবারে নৃত্যগীতের আসর তখন থেকেই ধর্তব্য। সেই শনিবার প্রাসাদ দরবারের নায়িকা—অপরূপ সৌন্দর্যময়ী নর্তকী মস্তানী। বাজী রাওয়ের জীবন-নাট্যেরও উপ-নায়িকা থেকে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রী নায়িকা। পেশোয়ার দৃপ্ত জীবনের সকরুণ বিয়োগান্তের বিষামৃত।

বাজী রাওয়ের পেশোয়া বা মন্ত্রী পদ নাম মাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল। মরাঠা সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হন তিনি। রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও মর্যাদা তাঁর করায়ত্ত হয়। পেশোয়ার এই রূপান্তরের সূচনা করেন তাঁর পিতা বালাজী।

পেশোয়া অর্থ প্রধানমন্ত্রী। মহারাষ্ট্রে প্রথমে অর্থাৎ শিবাজীর (১৬২৭-১৬৮০) আমলে পেশোয়া ছিলেন অষ্ট প্রধানের অন্যতম। শিবাজীর পৌত্র সাহু যখন ছত্রপতি হলেন তখন থেকেই মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী মরাঠা রাজ্যের প্রধান শক্তির অধিকার লাভ করলেন।

শিবাজীর পৌত্র (শম্ভাজীর পুত্র) ও উত্তরাধিকারী সাহুকে আওরঙ্গজেব বন্দী রাখেন দীর্ঘকাল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৭০৭) মোগল শিবির থেকে মুক্তি পেয়ে সাহু মহারাষ্ট্রে ফি এলেন। তারপর বহুদিনের গৃহযুদ্ধের শেষে, বালাজী বিশ্বনাথ নামে বিচক্ষণ বীর ব্রাহ্মণের সহায়তায় অভিষিক্ত হলেন সাতারার সিংহাসনে। ছত্রপতি হলেও কিন্তু সাহুর রাজ্য শাসনের যোগ্যতা ছিল না। সেজন্যে তিনি বালাজী বিশ্বনাথকে রাজ্য পরিচালনা ও শাসনকার্যের পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে নিযুক্ত করলেন পেশোয়া পদে। পুনার ৪ ক্রোশ দক্ষিণে মঞ্জুরি প্রান্তরে (১৭ নভেম্বর, ১৭১৩) তা আনুষ্ঠানিক-ভাবে সম্পন্ন হল। সুযোগ্য বালাজী রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ছত্রপতির রাজ্যসীমাকে বিস্তৃত করেন বহুদূর পর্যন্ত। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের দৃষ্টান্তেই মরাঠাদের এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন নিঃশব্দে ঘটে গেল। ছত্রপতির হস্তচ্যুত হয়ে পেশোয়ার করতলগত হল রাজশক্তি।

বালাজী বিশ্বনাথের প্রায় ৬০ বছর বয়সে মৃত্যু (২ এপ্রিল ১৭২০) হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজী রাও, জেন উত্তরাধিকারেই, পেশোয়া পদ লাভ করলেন। বাজী রাওয়ের (জন্ম ১৭০১, ১৮ই আগস্ট) বয়স তখন ১৯ বছর মাত্র। কিন্তু সেই অতি তরুণ বয়সেই তিনি নানাভাবে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে রাষ্ট্রের কর্ণধার হলেন। মাত্র ২০ বছরের কর্মপ্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করলেন বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য। সমগ্র পেশোয়া পরম্পরায় তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ নন, ভারত ইতিহাসেরও একজন স্মরণীয় পুরুষ। শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে দিল্লী, আমেদাবাদ থেকে হায়দরাবাদে তিনি গৈরিক পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। স্বপ্নে আহ্বান জানিয়েছিলেন মোগল ও নিজামের মিলিত শক্তিকে। শিবাজীর তুল্য দৃষ্টান্ত বাজী রাও-ই মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে স্থাপন করেছিলেন। উত্তর ভারতের বুন্দেলা ও অন্যান্য রাজপুতদের, এমন কি সুদূর পঞ্জাবের শিখদেরও মোগল কৃত নির্যাতন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেরণা জোগায় তাঁর মহান উদাহরণ। মোগল সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত হতে থাকে।

প্রথম বাজী রাওয়ের সময় থেকেই পেশোয়াতন্ত্র সম্প্রসারণশীল। তার ফলে উত্তর ভারতের রাজপুত ও অন্য দরবারের সংস্পর্শে নানা প্রভাব পড়তে লাগল পেশোয়ার দরবারী জীবনে। কলা বিলাসের সঙ্গে ভোগ বিলাসের অলক্ষ্য সঞ্চরণ আরম্ভ হল। দরবারের আলোছায়ায় মোহিনী বিভ্রম।

বালাজী বিশ্বনাথের সময় থেকেই পেশোয়া পরিবার অতিশয় রূপবান, গৌরবর্ণ। মানসিকতার দিকে তাঁরা আচার ব্যবহারে প্রবল ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে শাসিত ও গঠিত। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষাত্রশক্তির সম্মিলন ঘটেছিল এঁদের চরিত্রে। একদিকে অনলস কর্মোদ্যম, অধ্যবসায়, অন্যদিকে কঠোর সংযত সংগ্রামী জীবন। কিন্তু সম্প্রসারণের কালে, বিশেষ উত্তর ভারতে নানা অভিযানে নব নব অভিজ্ঞতার প্রভাব পেশোয়াদের দরবারী জীবনে ক্রমে ক্রিয়া করতে লাগল। মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরিবেশে দেখা গেল রূপান্তরের সূচনা। সে পরিবর্তনের ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। নৃত্যগীতাদি সংস্কৃতি অনুশীলন ও বিলাসব্যসন উভয়ই তৎকালীন উত্তর ভারতীয় দরবারের অনুকরণে পেশোয়া দরবারেও রূপবতী নটীর আবির্ভাব ঘটল। সেই সঙ্গে নৃত্য গীত বাদ্য মুখরিত সান্ধ্য আসর।

বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র প্রথম বাজী রাও পুনার শানিবার প্রাসাদে প্রথম সংগীত-দরবারেরও প্রবর্তন করলেন (১৭৩০)। আর সেই আসর আলোকিত করে আবির্ভূতা হলেন অনিন্দ্যসুন্দরী নর্তকী মস্তানী। নৃত্যে গীতে রূপে যৌবনের বিলাস কলার মধুচ্ছন্দে সে নটী শুধু দরবারের নয়, পেশোয়ার হৃদয়েরও অধিশ্বরী হয়ে উঠলেন। প্রাসাদের একটি পৃথক মহল বাজী রাও নির্মাণ করে দিলেন প্রেয়সী মস্তানীর নামে।

মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাতের দ্বিতীয় নায়ক তখন ত্রিশ বছর বয়সী যুবক বাজী রাও। বহু দুর্বার যুদ্ধ অভিযানের সার্থক পরিচালক। সমর-নেতা ও জাতীয় নেতা রূপে সর্বমুখী প্রতিভার আধার। যেমন দুর্দান্ত সাহসী রণনিপুণ বীর, তেমনি প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ কূটনীতিক। সেই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক সুমার্জিত আচরণ এবং সংস্কৃতিবান অন্তর। অসামান্য স্বাস্থ্য শ্রীমণ্ডিত সুদর্শন পুরুষ। তাঁর দৃপ্ত জীবন-সূর্য সেসময় প্রতিষ্ঠার উচ্চ আকাশে ভাস্বর। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাজী রাও।

কিন্তু জাতির [illegible] কালেই তাঁর [illegible] উদয় হল। [illegible] তাঁর চরিত্রে [illegible] মস্তানীর [illegible] তিনি [illegible] হতে লাগলেন যে [illegible] জাতির জীবনে [illegible] পেশোয়ার সুসংবদ্ধ পারিবারিক [illegible] সামাজিক রীতিনীতিতে বিষম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল মস্তানীর সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কের ফলে। মস্তানীর একটি পুত্র সন্তান জন্মাল। বিবাহিত বাজী রাওয়ের পারিবারিক জীবনে নানা জটিলতা দেখে ক্রমে আরম্ভ হল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। মস্তানী ও বাজী রাওয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ঘনিয়ে উঠল। কারণ অসহ্য আঘাত পড়েছে শুচিতার সংস্কারে, রীতিনীতিতে। রাষ্ট্রের প্রধান পুরুষের এই চরিত্রচ্যুতিতে শুধু তিনি নন, রাজশক্তি হেয় হতে লাগল লোকচক্ষে। পেশোয়ার পরিবার ও সামরিক নেতারা প্রতিবিধানে তৎপর হলেন।...

নটীর পূর্ব পরিচয় প্রায় অজ্ঞাত।

জনক হিন্দু এবং জননী মুসলমানী, সম্ভবত নর্তকী—এই মাত্র জানা যায়। একমাত্র পরিচিতি মস্তানী স্বয়ং। যেমন নৃত্যকলায় অপূর্ব পটিয়সী, তেমনি অপরূপ যৌবনধন্য শ্রীময়ী দেহসৌষ্ঠব। 'তারিখ-ই-মহম্মদশাহী' পুস্তক অনুসারে 'সে ছিল এক কাঞ্চনী (নর্তকী), অশ্বারোহণে এবং তরবারি ও বর্শা চালনায় নিপুণা।'

নৃত্যে সঙ্গীতে রীতিমত পারদর্শিনী মস্তানী বার্ষিক গণপতি উৎসবে পেশোয়ার প্রাসাদে সাধারণের সমক্ষ গুণপনার পরিচয় দিতেন। ক্রমেই তাঁর আকর্ষণে একান্ত আসক্ত হয়ে পড়েন বাজী রাও। মস্তানীর সাজ সজ্জা, আচার ব্যবহার, দরবারের বাইরে, হিন্দু নারীর মতনই ছিল। বাজী রাওয়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও সেবাযত্ন করতেন তিনি পত্নীতুল্য একনিষ্ঠায়।

৯।১০ বছর বাজী রাও মস্তানীর সংসর্গ করেন। পারিবারিক জীবনের এই বিশৃংখলা প্রতিকারের আশায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র দেখা গেল এবং তার নেতৃত্ব নিলেন বাজীর ভ্রাতা চিম্নাজী আপ্পা ও পুত্র নানা সাহেব। ১৭৩৯ সালের শেষ দিকে বাজী রাও একটি সমর অভিযানে পুনা থেকে যাত্রা করলেন। সেই সুযোগে চিম্নাজী ও নানা মস্তানীকে গ্রেপ্তার করে অবরুদ্ধা রাখলেন অজ্ঞাতবাসে। বাজী রাও ফিরে এসে প্রণয়িনীর আর সাক্ষাৎ পেলেন না। আগেই তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কাল ব্যাধি যক্ষ্মায়। সেই ভগ্ন শরীরে আত্মীয় স্বজনদের ওপর আর প্রভুত্ব করতে অপারগ হলেন এবং মস্তানী বিহনে জীবনেও বীতস্পৃহ। এমনি মানসিক ক্লেশভোগ থেকে নিস্তারের দুরাশায়—মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক জি এস সরদেশাইয়ের মতে—অপরিমিত সুরাপান আরম্ভ করেন বাজী রাও এবং ফলে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে (২৮ এপ্রিল, ১৭৪০)। নর্মদা নদীতীরে রাভের খেদিতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল। সেইখানে, ইন্দোর ও খান্দেশয়ার মধ্যে, নির্মাণ করা হয় তাঁর একটি ক্ষুদ্র স্মরণচিহ্ন।

বাজী রাওয়ের মৃত্যুর একমাস পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজী বাজী রাও ওরফে নানা সাহেব পেশোয়া পদাধিকারী হলেন। বয়সে নিতান্ত তরুণ (১৮ বছর, ৬ মাস। জন্ম : ১২ ডিসেম্বর, ১৭২১) হলেও পিতার যোগ্য পুত্র বালাজী দৃঢ় হাতে সাম্রাজ্যের হাল ধরলেন। অব্যাহত রইল মারাঠাদের বিজয় অভিযান।

বালাজীর আমলেও শানিবারের সংগীত দরবার স্তব্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু সে উপলক্ষ্যে পিতার মতন সংকটাপন্ন হয়নি তাঁর জীবন। তখনো উত্তর ভারতে মরাঠা সম্প্রসারণে ছেদ পড়েনি। সেই সূত্রে উত্তর ভারতীয় নানা নর্তকী গায়িকার অবস্থান হতে থাকে পুনার পেশোয়া দরবারে। এ-বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দেখা যায়। বালাজীর সময় থেকে উত্তরাঞ্চলের নটী কিংবা বালিকা ক্রয় করে সঙ্গীত নৃত্য শিক্ষা দিয়ে নিযুক্ত করা হতে থাকে পুনা ও মহারাষ্ট্রের অন্যত্র। এইভাবে মহারাষ্ট্রের দরবারে তথা সংগীত সমাজে নৃত্য সংগীতের ধারা বিস্তার লাভ করে।

পেশোয়া বালাজী ১৭৪৪ সালের ১১ই জুন দামোদর পন্থ হিংগনেকে এক পত্রে লেখেন, 'তোমার উত্তরে যাত্রার প্রাক্‌কালে তোমায় বলেছিলেম যে, বছর দশেক বয়সের সুন্দরী হিন্দু বালিকাদের ক্রয় করে আমায় পাঠিও। এ বিষয়টি যেন ভুলো না এবং মেয়েদের যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ কোরো।'

এমনিভাবে ক্রীতা ও আনীতা কন্যাদের নৃত্যগীতে পারদর্শিনী করবার ব্যবস্থা হত—সাধারণ রূপজীবিনী নয়। প্রধানত নটী, শিল্পী রূপেই গণনীয়া তারা। উত্তর ভারতীয় দরবারের অনুকরণে ও অনুসরণ মহারাষ্ট্রীয় দরবারে নৃত্য ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান তথা পৃষ্ঠপোষকতা এইভাবে চলে। উত্তর ভারত থেকে নর্তকী গায়িকাদের পুনা ও অন্যান্য দরবারে আগমন অব্যাহত থাকে অনেকদিন পর্যন্ত।

বালাজীর সময়েই সাতারার ছত্রপতি সাহুর মৃত্যু হয় (১৫ই ডিসেম্বর, ১৭৪৯)। তাঁর পরে সাতারার সিংহাসনে বসেন ২৩ বছর বয়সী রামরাজা। তিনি আরো অপদার্থ। এইভাবে সাতারা ও কোলহাপুরে শিবাজী বংশীয় দুই শাখার উত্তরপুরুষ নামে ছত্রপতি থাকলেও প্রকৃত রাজশক্তি পেশোয়া পরিবারেরই হস্তগত থেকে যায় বংশগতভাবে।

পুনা দরবারে বালাজীর আমলে নৃত্য সঙ্গীতাদি চর্চায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। রণ অভিযানে ও কূটনীতিতে কৃতিত্বের সংগে তিনি ছিলেন কলারুচিসম্পন্ন এবং নৃত্য সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। ১৭৬১ সালের ২৩ জুন তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব রাও পরবর্তী পেশোয়া হলেন (১৭ জুলাই, ১৭৬১)। মাধব রাওয়ের মৃত্যু ঘটে ১৭৭২ সালের ১৮ই নভেম্বর। মাধব রাওয়ের সময় থেকেই পেশোয়াশক্তির ক্রমাবনতি।

১৭০৭ সালে শিবাজী-পৌত্র সাহুর সাতারায় প্রত্যাবর্তন ও বালাজী বিশ্বনাথের ক্ষমতা প্রাপ্তির সময় থেকে ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরাঠা বাহিনীর পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত পেশোয়াতন্ত্রের সম্প্রসারণের যুগ। তারপর শেষোক্ত বছরে পানিপথের বিপর্যয়ে পেশোয়াশক্তি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ধুলোয় লুণ্ঠিত হয় মরাঠাদের ও পেশোয়ার মর্যাদা, প্রতিপত্তি। উত্তর ভারতে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। পেশোয়া মাধব রাও থেকে শেষ পেশোয়া বাজী রাও (দ্বিতীয়) পর্যন্ত পেশোয়া তথা মরাঠাদের রাজ্য ও অধিকারের ক্রমিক সঙ্কোচনের ইতিহাস।

পেশোয়া বংশের কালানুক্রমিক তালিকার প্রতি এখানে একবার দৃষ্টিপাত করে নেওয়া যায়—বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০), প্রথম বাজী রাও (১৭২০-১৭৪০), বালাজী বাজী রাও (১৭৪০-১৭৬১), মাধব রাও (১৭৬১-১৭৭২), নারায়ণ রাও (১৭৭২-১৭৭৪), মাধব রাও নারায়ণ (১৭৭৪-১৭৯৬), দ্বিতীয় বাজী রাও (১৭৯৬-১৮১৮)। পুনা দরবার থেকে ১৮১৮ সালে নির্বাসিত হয়ে ১৮৫৩ পর্যন্ত দ্বিতীয় বাজী রাও যে বিঠুর দরবারে অবস্থান করেছিলেন, সে পর্বে তিনি আর পেশোয়ারূপে গণ্য হননি।

এই কালের মধ্যে ১৭৩০ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত শানিবারের সংগীত দরবার ঝংকৃত থাকে নৃত্য গীতের অনুষ্ঠানে। কিন্তু তার ধারাবাহিক সাংগীতিক বিবরণ প্রায় অপ্রাপ্য। কত নর্তকী গায়িকার এখানে আসর

বসেছিল, কত সংগীতগুণীর অনুষ্ঠানে সঞ্জীবিত হত শনিবার দরবার তার বৃত্তান্ত অল্পই পাওয়া যায়। বেশির ভাগ শিল্পীর নাম ও সংগীতজীবনের পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। তবু পেশোয়া দফতর থেকে কিছু তথ্য যা পাওয়া যায়, এখানে উল্লেখ করা হল। প্রথমেই বলে রাখা যায়, এই তালিকায় শুধু নটীদের কথাই জানা গেছে, গায়ক বাদকদের প্রসংগ অজ্ঞাত।

পুনা দরবারের প্রথম পর্বের নটী মস্তানীর পরে যে নর্তকী গায়িকার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর নাম ময়না। বালাজী বিশ্বনাথের সময়ে দরবারী নটী। শোলাপুর থেকে ময়না পুনাবাসিনী হয়েছিলেন। অতি রূপবতী এবং কণ্ঠসংগীত ও নৃত্যে যুগপৎ পারদর্শিনী বলে তাঁর নাম উল্লিখিত। মাসিক দেড়শ টাকা বেতনে পেশোয়া নানা সাহেবের (বালাজী বিশ্বনাথেরই অপর নাম) নিযুক্তা শিল্পীরূপে ময়না অবস্থান করেন।

ময়নার পরবর্তী নর্তকী গায়িকার নাম হৈমন্তী। ১৭৫২ সালে পেশোয়া দরবারে তাঁর যুক্ত থাকার কথা জানা যায়। হৈমন্তীরও খ্যাতি ছিল নৃত্য ও গীতে পটুতা এবং তনু সৌন্দর্যের জন্যে। পুনা দরবারে নটীর মাসিক দক্ষিণা ছিল সাতশ টাকা।

হৈমন্তীরই আর এক সমসাময়িক দরবারী নটীর নাম হীরা। পেশোয়া দরবারে মধুর কণ্ঠের গায়িকা ও নর্তকীরূপে হীরার প্রসিদ্ধি ছিল।

আরো একজন হীরার কথা জানা যায় অতিশয় নিপুণা নর্তকী বলে। ১৮০৭ সালে দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দরবারে এই দ্বিতীয়া হীরা নিযুক্তা থাকেন। অসামান্য প্রতিভাময়ী নৃত্যশিল্পী হীরা। পেশোয়া দফতরের সংবাদ—এই নটীর প্রতি নৃত্যানুষ্ঠানের জন্যে বাজী রাও মঞ্জুরী বরাদ্দ করেছিলেন এক হাজার টাকা।

শেষ পেশোয়ার দরবারে নিযুক্তা আরেক শ্রেষ্ঠা নটী নারোশি। নৃত্যে অসাধারণ কলাবতী নায়কটি নারোশি নামে প্রসিদ্ধা। বাজী রাওয়ের দরবার তখন আর পুনার শনিবারে নয়, দূর উত্তরের বিঠুরে। মহারাষ্ট্রের স্বাধীন পেশোয়া তখন ভাগ্যচক্রের আবর্তনে ইংরেজ সরকারের বৃত্তিভোগী নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন।

দ্বিতীয় বাজী রাও যে রাজ্য হারাবার মতন নিতান্ত অযোগ্য ও নির্গুণ ছিলেন, তাও নয়। ১৯ বছর বয়সে পেশোয়া পদে তিনি যখন অভিষিক্ত হলেন, (১৭৯৬ সালের ৪ ডিসেম্বর) রীতিমত রাজকীয় প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর চরিত্রে ও ব্যক্তিরূপে। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতায় শ্রদ্ধা আকর্ষক, যৌবনলাবণ্যময় সুগঠিত স্বাস্থ্য ও শ্রী-যুক্ত সুপুরুষ, পরিশীলিত আচরণ ও বাচনে সকলের প্রতি প্রভাব সৃষ্টিকারী, যেমন তরবারি ও বর্শা চালনায় তেমনি অশ্বারোহণে রীতিমত সুদক্ষ, সেই সংগে শাস্ত্রচর্চায় প্রবীণ ছিলেন যৌবনকালে। কিন্তু বয়সের সংগে পেশোয়ারূপে তাঁর দুর্ভাগ্যজনক প্রকৃতি প্রকাশ পেতে লাগল। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব, মারাঠা সামন্তদের সংগে ঐক্যবোধের পরিবর্তে বিদ্বেষ পোষণ, বিশেষ নানা ফাড়নবীশ ও সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত, সকলকেই অবিশ্বাস, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, জাতীয়তার শত্রুরূপে বৃটিশ ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম না করা (বিজাতীয় শক্তির প্রতিনিধিরূপে ইতোমধ্যে মোগলের স্থান অধিকার করেছে বৃটিশ শক্তি) ইত্যাদি অবগুণে তিনি মারাঠা রাজ্যের এবং আপনার সর্বনাশ ত্বরান্বিত করলেন। আপন দুর্বলতায় ও মারাঠা সামন্তদের সংগে কলহের ফলে ১৮০৩ সালে বৃটিশ রাজশক্তির সংগে বেসিনে যে চুক্তিবদ্ধ হলেন, তা তাঁর পক্ষে অধীনতামূলক। বেসিনের এই সন্ধির ফলেই ইংরেজরা পেশোয়াতন্ত্র তথা মারাঠা শক্তির মৃত্যুর ঘণ্টা ধ্বনিত করে দেয়। পেশোয়া বাজী রাওয়ের কর্তৃত্ব প্রায় তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। পরে অবশ্য আপন প্রমাদ বুঝে হৃত প্রতিপত্তি উদ্ধারে তৎপর হন বাজীরাও। সিন্ধিয়া প্রভৃতির সংগে ঐক্যের প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু তখন বড়ই বিলম্ব ঘটে গেছে। বিদেশীর করতলগত হয়েছে রাজনৈতিক সুযোগ। সর্বনাশ থেকে মুক্তিলাভের আশায় পেশোয়া ইংরেজদের সংগে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামেন। কিন্তু কির্কি এবং আস্টির দুটি যুদ্ধেই পরাজয়ের পর আত্মসমর্পণ করেন, দীর্ঘ সন্ধি আলোচনার শেষে। ৩ জুন, ১৮১৮ তারিখে বড়লাট মার্কুইস অফ হেস্টিংসের প্রতিনিধি স্যার জন ম্যালকমের কাছে বাজী রাও আত্ম-

সমর্পণ করবার পরই তাঁকে উত্তর প্রদেশের বিঠুরে নির্বাসিত করা হল। এক বাজী রাওয়ের আমলে মহারাষ্ট্রের যে রাজনৈতিক ভাগ্য উদয়াচল স্পর্শ করেছিল, তা রসাতলে গেল আর এক বাজী রাওয়েরই কালে।

বিঠুরে নির্বাসনের সময়ে বাজী রাওয়ের বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। তারপরে তিনি সেখানে আরো ৩৫ বছর জীবিত ছিলেন। পেশোয়াদের মধ্যে তিনিই সম্ভবত সব চেয়ে দীর্ঘজীবী।

বিঠুরে নির্বাসিত পেশোয়ার জন্যে জায়গীরের ব্যবস্থা হয়েছিল। আর নির্ধারিত হয় বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি। এই প্রাচীন তীর্থস্থানে বাজী রাও বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করে প্রায় রাজকীয় মর্যাদাতেই (অবশ্য বাহ্য) বাস করতে লাগলেন। তাঁর বিঠুরে প্রথমে অনুচরের সংখ্যা ছিল ষোল হাজার। পরে তা পাঁচ হাজারে নামে। এখানে তিনি দরবারেরও পত্তন করেন। বিঠুর প্রাসাদের সেই বিরাট কক্ষ নিত্য ঝংকৃত হত নৃত্য-ধারায় সংগীতের অনুরণনে। নিযুক্ত নটী নট বাদ্যকর—দরবারের নানা বিচিত্র চেতন অচেতন শোভা সম্পদ ভোগ্য সামগ্রী বিলাসের উপকরণ নিয়ে বাজী রাও রম্য জীবন যাপন করতে থাকেন। প্রাসাদে বহু-সংখ্যক দাসদাসী, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী, সান্ত্রীপ্রহরীর সমন্বয়ে কৃত্রিম রাজ সমারোহে বাস করেন রাজ্যহারা পেশোয়া।

বিঠুরের মহারাজা বলেই তিনি পরিচিত হতেন, যদিও নামে মাত্র। তাঁর এই বিপুল ব্যয় সংকুলান অবশ্যই বার্ষিক আট লক্ষ টাকায় সম্ভব হত না। ক্ষমতাচ্যুত পেশোয়ার পূর্বসঞ্চিত ধনরত্নের অবশেষ ছিল তখনো। রাজ্য হারাবার তিন বছর আগেও, অর্থাৎ ১৮১৫ সালে, মহারাষ্ট্রের আসল রাজস্ব আদায় হত বার্ষিক এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। সেসময় তিনি নাকি বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করতেন—ইংরেজ ঐতিহাসিক জেমস ডাফের এই অভিমত। এ কথা যদি অতি-রঞ্জিত হয়, তাহলেও পেশোয়ার সঞ্চয় প্রচুর হয়েছিল অনুমান করা যায়। তারই দাক্ষিণ্যে বিঠুরে তাঁর রাজকীয় আড়ম্বরে জীবনযাত্রা সম্ভব হয় রাজ্য হারিয়েও। অবশেষে এই প্রাসাদেই ১৮৫৩ সালে ৭৬ বছর বয়সে বাজী রাওয়ের জীবনাবসান ঘটে।

অপুত্রক থাকায় তিনি দত্তক নিয়েছিলেন শ্রীরিথ ধুন্দুপন্থকে। মহা বিদ্রোহের ইতিহাসে ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। নানা সাহেবও বিঠুর রাজার উত্তরপুরুষরূপে বর্ধিত হন এই প্রাসাদ দরবারের পরিবেশে। কিন্তু ধর্মপিতার মৃত্যুর পর বড় লাট লর্ড ডালহাউসি নানা সাহেবের বার্ষিক প্রাপ্য আট লক্ষ টাকা বৃত্তি রহিত করলেন। আরো অনেক উত্তরাধিকার সুলভ সম্মান থেকে বঞ্চিত হলেন ধুন্দুপন্থ। অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের কাছে পেশোয়ার উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি পেলেন না। মারাঠা সভাসদদের নিয়ে নানা সাহেবের বৃটিশ বিরোধী চক্রান্ত আরম্ভ হয় বিঠুর প্রাসাদেই। এখানেই তাঁর গুপ্তধন সঞ্চিত রেখেছিলেন। সাতান্নর মহাবিদ্রোহে তাঁর প্রধান সহযোগী হন যে তাত্যা টোপে, তিনিও বাল্যকালে বিঠুর প্রাসাদে বাস করেছিলেন। নানার অপর সহকারী আজিমুল্লাও এ প্রাসাদে অনেকদিন ছিলেন তাঁর আশ্রয়ে।

মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্তিম অধ্যায়েও নানা সাহেবকে বিঠুরে দেখা যায়। বিদ্রোহীদের কেন্দ্রীয় শক্তি কানপুরে অবরুদ্ধ হলে তাঁদের পশ্চাদপসরণ করতে হয় বিঠুর-পথ বরাবর। তাঁদের বেশির ভাগই বিঠুরে পলায়ন করতে সক্ষম হন, সেই সঙ্গে নানা সাহেবও। অবশেষে বিঠুর থেকেই গঙ্গা পার হয়ে নানা নেপাল তরাইয়ে চলে যান ভারত থেকে চিরবিদায় নিয়ে। বিজয়ী ইংরেজ সেনাদল বিঠুরে প্রবেশ করে। তাদের কামানের গর্জনে বিধ্বস্ত হতে থাকে বিঠুরের সমস্ত সম্পদ। তোপ মুখে মন্দির ধূলিসাৎ হয়। অগ্নিকাণ্ডে জ্বলতে থাকে বাজীরাও নানা সাহেবের প্রাসাদ, দরবার। প্রাসাদ আগুনে জ্বালিয়ে দেবার আগে ইংরেজরা নানার গুপ্তধনের অনেকাংশ আত্মসাৎ করেছিল।

এমনিভাবে বিঠুর দরবার ধ্বংস হয়ে যায় বিদ্রোহের ঘনঘটায়। সেসবের অনেক বছর আগেকার কথা। বিঠুর দরবারের এই কাহিনী।

বিঠুরে তখন শেষ পেশোয়া সাড়ম্বরে বিলাস জীবন যাপন করছেন। নৃত্য ও সংগীতপ্রেমী রূপবিলাসী বাজী রাও। আলো ঝলমল বিঠুর দরবার সেসময় রূপের ছন্দে সুরের তরঙ্গে মায়ালোক হয়ে ওঠে সন্ধ্যায় রাত্রিতে। বিঠুরে তাঁর ৩৫ বছরের নির্বাসিত জীবন যে বিলাসিতায় পেশোয়া যাপন করে যান তার এক প্রধান অঙ্গ তাঁর সংগীতসভা। সে দরবার নর্তকী গায়িকা গায়ক বাদকদের নিয়ে ঝংকৃত থাকে। আর তার কেন্দ্রে নৃত্যপরা বিদ্যুৎলতা ব্যাংকট নারাশি। বাজী রাওয়ের দরবারী শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে নামী নটী।

নর্তকীর নামেও অভিনবত্ব—দুটি পৃথক অংশে। ব্যাংকট পুরুষের নাম এবং দক্ষিণ ভারতীয়। নারাশি স্ত্রীবাচক ও নটীর প্রকৃত নাম। ব্যাংকটেশ বা ব্যাংকট হলেন নর্তকীর নৃত্যগুরু—তিনি কর্ণাটক-নিবাসী। তাঁর নিকটেই ভারত নাট্যম পদ্ধতির নৃত্য নারাশি শিক্ষা করেছেন। গুরুর প্রতি নটীর শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাই তাঁর নামকে স্মরণীয় রাখবার জন্যে, তাঁর স্মৃতির সঙ্গে নিজে যুক্ত থাকবার জন্যে গুরুর নামকে আপনার অগ্রে ধারণ করেছেন। যেন শিরোধার্য করে আছেন গুরুর আশীর্বাদ।

নারাশির ব্যক্তিজীবন বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। নটীর নৃত্যপ্রতিভা অসামান্য এবং অতি চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য ও পেলব তনু—এইমাত্র ব্যক্তিবর্ণনা আছে পেশোয়া দফতরে। আর তাঁর নৃত্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য — ভাব প্রকাশে অসাধারণ নিপুণতা।

বাজী রাও ভিন্ন অন্য কারো সামনে নারাশি নৃত্যের অধিকারিণী নন। পেশোয়ার বর্ণাঢ্য দরবারে ছন্দিত হয় নটীর নৃত্যধারা। ভাব, নৃত্য, গীত এবং কাব্য, রূপ ও বর্ণের সুসমঞ্জস সমন্বয়ে গঠিত এই পদ্ধতি। তার রূপায়ণে নর্তকীর সহযোগিতা করে গায়ক বাদকদের মণ্ডলী। নৃত্যের ভাব-অনুসারী সংগীত ধ্বনিত হতে থাকে। কাব্য সুষমাময় ঐশ্বর্য-

মণ্ডিত তার ভাষা। সঙ্গে ধ্যাবন্ধ ও সূক্ষ্ম ছন্দ তালের মৃদঙ্গ সঙ্গতে মন্দ্রিত জীবন্ত আবহ। একটি সর্বমুখী ললিতকলা নিবেদন। নৃত্যের সঙ্গে নাট্যবোধ, অঙ্গের শিল্প, বর্ণ ও আকৃতি, সঙ্গীত ও কাব্যের সমাহার। আর সর্ব অঙ্গের অন্তঃশীলা এক গভীর অন্তর্মুখী আকুতি।

নারাশির শিল্পী-সত্তা মরমী। শিল্প-কলার রস ও তার অনুভব তাঁর কাছে সব চেয়ে মূল্যবান। শিল্পরসবোধ যার আছে—যা-ই হোক তার সামাজিক মর্যাদা, তারই প্রতি নটীর আত্মীয়তা। রস-বেত্তা যে, রসিকজন, তার মর্ম তিনি যথার্থ বোঝেন। ব্যাংকট নারাশির এই শিল্পী-প্রাণের একটি কাহিনী পেশোয়া দরবারের স্মৃতি-স্মৃতিতে আজো প্রাণবন্ত হয়ে আছে।

আগেই বলা হয়েছে, নারাশির আসর সকলের জন্যে নয়। সেখানে কেন্দ্রমণি হয়ে থাকবেন শুধু পেশোয়া আর তাঁর সঙ্গে তাঁরই মনোনীত কয়েকজন মাত্র দর্শক। আর নটীর নৃত্য যত মনোহরণই করুক, তারিফ করবার অধিকার অন্য কারো নেই। শুধু বাজী রাওয়ের। সমস্ত মারাঠা রাজ্য হারিয়ে পেশোয়ার কর্তৃত্ব এই বিঠুরের নটীর আসরে যেন তখন সীমাবদ্ধ।...

দরবারে সেদিন নারাশির অনুষ্ঠান চলেছে। পেশোয়ার অনুচরদের মধ্যে আছেন জানোবা পটনকর। তাঁর আপন কাজে নিযুক্ত একজন করণিক জানোবা। রাজী রাও তাকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন, কারণ পটনকর নৃত্যসঙ্গীতের বড় সমঝ-দার।

ছন্দিত নর্তকী অতি উচ্চমানে তখন পুষ্পপদ্মা দেখাচ্ছেলেন। সে দৃশ্য সঙ্গীত যেন লীলায়িত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। আত্মবিস্মৃত হলেন তন্ময়চিত্ত জানোবা। নটীর এক অতিশয় মনোহারী সমের মুখে তিনি সাবাস দিয়ে উঠলেন। নারাশি সার্থকতার তৃপ্তিতে তাঁর রসবোধকে স্বীকৃতি জানালেন নৃত্য ভঙ্গিমার মধ্যেই।

কিন্তু পেশোয়ার দরবারী আদব কায়দায় গুরুতর ত্রুটি ঘটে গেল। জানোবার অপরাধ অমার্জনীয়। অত্যন্ত রুষ্ট হলেন বাজী রাও।

দ্বারের সান্ত্রীকে আদেশ জানালেন, 'পটনকরকে এখান থেকে বিদায় করো। নিয়ে যাও কয়েদখানায়।'

প্রহরীর সঙ্গে জানোবা দরবার ত্যাগ করে গেলেন।

কিন্তু এমন আকস্মিক, রূঢ় বাধাতেও তালভঙ্গ হল না নটীর। এ ঘটনায় তাঁর মনে যে আঘাত লাগল মুখভাবে তাও প্রকাশ পেলো না। অব্যাহত রইল নৃত্যধারা। বরং আর এক সংকল্প জাগল কি শিল্পী-অন্তরে? যেন এক নতুন প্রেরণায় আরো নন্দিত হয়ে উঠল ছন্দশ্রী।

তারপর পুনরায় নারাশির এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির মুহূর্তে পেশোয়া উচ্ছ্বসিত হলেন, 'অপূর্ব অপূর্ব'; সাধুবাদ জানিয়ে বললেন, 'তোমার এই কার্যটির তুলনা নেই, নারাশি। তোমাকে আজ পুরস্কার দেব। বল, তুমি কি চাও?'

একবার আনত হয়ে নটী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যা প্রার্থনা করব, তা-ই দেবেন ত পেশোয়াজী?'

'নিশ্চয়। যদি তা আমার ক্ষমতার মধ্যে হয়।'

ব্যাংকট নারাশি নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানালেন—টাকার তোড়া নয়, হীরা মাণিক নয়, রত্ন অলংকারও নয়—তাহলে জানোবাকে মুক্তি দিন মহারাজ। আপনার এই দানই হবে আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার। তিনি একজন সত্যকার রসিক। সে সম-টি এত সুন্দর এত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে প্রকৃত বোদ্ধা তখন সাধুবাদ না দিয়ে পারেন না। এ তাঁর ঔদ্ধত্য নয়, রসবোধের পরিচয়।'

বাজী রাও তখনি নটীর ইচ্ছা পূরণ করলেন জানোবাকে মুক্তি দিয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁকে দরবারে উপস্থিত করা হলে, প্রীতি জানিয়ে বললেন, 'দরবারী আসরে তুমি যখন খুশি সাবাস দিও। এখন থেকে তোমার এই বিশেষ অধিকার রইল।'

কৃতার্থ হলেন জানোবা পটনকর।

প্রতুলনাথ সেনগুপ্ত

খাদ্যে অবশ্যপূরণীয় সুষম প্রোটিনের অভাবই উন্নতিশীল দেশে শিশু, প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের বালক বালিকা, প্রসূতি এবং গর্ভবতী মাতাদের একটা গুরুতর অপুষ্টিজনিত সমস্যা। প্রোটিনের অভাব-জনিত রোগের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যদি খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক-দিন ধরেই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং সেই কারণেই শরীর ও স্বাস্থ্য ক্রমশ অপটু হয়ে ওঠে। প্রোটিনের অভাবজনিত রোগের জন্য এইসব দেশে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি এবং আমাদের দেশেও কম নয়। এই সমস্যার সঙ্গে যদি পরিমিত সুষম খাদ্যের অভাবে প্রয়োজনীয় উত্তাপ (ক্যালোরি) খাদ্য থেকে না পাওয়া যায় তাহলে যুগ্ম প্রোটিন-ক্যালোরির অভাবজনিত রোগ ভয়াবহ হয়ে ওঠে। একেই প্রোটিন ক্যালোরি অপুষ্টি-জনিত রোগ (Pretein-colorie malnutrition) বলা হয়। এই যুগ্ম অপুষ্টিজনিত রোগ সাধারণত পাঁচ বৎসরের কম শিশুদের মধ্যেই ব্যাপক। এজন্য এক থেকে পাঁচ বৎসরের বয়সের শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার খুবই বেশি।

আমাদের দেশে ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে এ সমস্যাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এর তীব্রতা খুব কম না হলেও আমরা যেন সেভাবে গুরুত্ব দিতে পারছি না। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত খাদ্য সমস্যা এতই তীব্রতর হয়ে উঠছে যে, পরিবার সুষম খাদ্য সম্বন্ধে অত সচেতন হতে পারেন না। পরিবারের সকলকে সমভাবে খেতে দিতে পারাই দিনের সমস্যা। দ্বিতীয়ত সর্বতোভাবে পরিবার পরি-কল্পনার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি একটি ভয়াবহ স্তরে পৌঁছেছে। বৎসরে ভারতে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক বেশি হয়। পশ্চিমবঙ্গে হয় দশ লক্ষ লোক। যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩·৫ শতাংশ থেকে কমে ২·৪ শতাংশ হয়েছে কিন্তু এতেও কোন সুফল এ যাবৎ দেখা যাচ্ছে না। হায়দারাবাদের জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (National Nutrition Institute) দেখিয়েছেন যে, যুগ্ম প্রোটিন-ক্যালোরির অভাবে শিশুর বুদ্ধিমত্তা যথেষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ বেঁচে থাকলেও শিশু বুদ্ধিহীন হয়ে বেঁচে থাকবে। ফলে জনসংখ্যা বেশী হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কতকগুলি বুদ্ধিহীন বিকলাঙ্গের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। সেইজন্য এ সমস্যাকে কোন ভাবেই উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়।

প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েরাও এই যুগ্ম অপুষ্টিজনিত রোগের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ে থাকেন। মায়েরা শিশুর দেহের গঠন ও বৃদ্ধির জন্য স্তন্য দুধের মাধ্যমে শিশুকে সুষম প্রোটিন দিয়ে থাকেন। মায়ের পেশির প্রোটিন ক্ষয় হয়ে ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acids) দুধে সৃষ্টি হয়। সেই-জন্য মায়েদের খাদ্য থেকে উপযুক্ত পরিমাণ সুষম প্রোটিন পাওয়া খুবই প্রয়োজন। বহু স্থানে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, মাতা সুস্বাস্থ্যবতীই হোন অথবা পুষ্টির অভাবজনিত রোগীই হোন না কেন, তিনি যে স্তন্য দুধ সন্তানকে দেন তার মধ্যে প্রোটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ ও গুণাবলীর কোন তারতম্য হয় না। এজন্য তাঁরা খাদ্য থেকে আবশ্যকীয় পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালোরি খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন যাতে পেতে পারেন সে বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশে খাদ্যানুসন্ধান দ্বারা দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পরিবারের মধ্যে খাদ্য বণ্টন প্রয়োজনানুসারে হয় না। পরিবারের শীর্ষ ব্যক্তিই বিশিষ্ট অংশ পেয়ে থাকেন এবং মায়েরাই সর্বোতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এই অবস্থা আমাদের দেশেও প্রচলিত রয়েছে।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বহু বৎসর-ব্যাপী বিশ্বের অধিকাংশ দেশে খাদ্যের ও পুষ্টির যে নিরীক্ষা করেছেন এবং হিসাব ও সমতাপত্র (Food Balance Sheet) প্রকাশ করেছেন তা থেকে দেখা যায় যে, উন্নত দেশগুলির অধিবাসী গড়ে ৯০ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য থেকে নিনে পেয়ে থাকেন, আর উন্নতিশীল দেশগুলিতে গড়ে ৫৭ গ্রাম সরবরাহ হয়ে থাকে। কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কতগুলি দেশে গড়ে ৪০ গ্রামের বেশি পাওয়া যায় না। উন্নতিশীল দেশে ৬ থেকে ২০ গ্রাম গড়ে ১০·৭ গ্রাম আমিষ-জাতীয় (দুধ মাংস, মাছ ও ডিম থেকে পাওয়া) প্রোটিন পাওয়া সম্ভব হয়। এই সংস্থা দেখিয়েছেন ভারতের অধিবাসী গড়ে

৫১ গ্রাম প্রোটিন পেয়ে থাকেন যার মধ্যে ১২ শতাংশ অর্থাৎ ৬ গ্রাম আমিষ জাতীয় প্রোটিন। এই তুলনায় জাপানে গড়ে ৬৭ গ্রামের মধ্যে ১৭ গ্রাম, সিংহলে ৪৫ গ্রামের মধ্যে ৯ গ্রাম, নিউজিল্যান্ডে (পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রোটিন খাওয়া হয়) ১০৫ গ্রামের মধ্যে ৭২ গ্রাম, আমেরিকায় ৯২ গ্রামের মধ্যে ৬৫ গ্রাম এবং ইংলণ্ডে গড়ে ৮৬ গ্রামের মধ্যে ৫২ গ্রাম আমিষ-জাতীয় প্রোটিন।

প্রোটিন ও ক্যালোরির সরবরাহের এই সব গড়ের পরিসংখ্যানের দুই প্রকার প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ গড়ে কতটা প্রোটিন দিনে পাচ্ছেন তার মধ্যে তুলনা করা। দ্বিতীয়ত এই গড়ের পরিসংখ্যান সরকারের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের এবং সরবরাহের পরিকল্পনার সহায়ক। গড়ে কি পরিমাণ ক্যালোরি ও প্রোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টি বিষয়ক বস্তুর প্রয়োজন, কি পরিমাণ এখন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং পরিকল্পনা দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বেশি হলে প্রয়োজনের কতটা নিকটবর্তী হওয়া যাবে তার হিসেব নিকেশের জন্য এই পরিসংখ্যানের খুবই প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা যেতে পারে যে এসব গড়ের পরিসংখ্যান থেকে জনগণের প্রকৃত পুষ্টিজনিত সমস্যার নিদর্শন পাওয়া যায় না। কত পরিবার যে গড়ে ৩০ গ্রাম প্রোটিন ও ১৬০০ ক্যালোরি পেতে পারেন না (প্রয়োজনীয় ৫৭ গ্রাম প্রোটিন ও ২২০০ ক্যালোরির পরিপ্রেক্ষিতে), কত পরিবার রুগ্ন ও অস্থি চর্মসার (Kwashiorkor marasmic) সন্তানদের একটু পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারেন না এবং কত পরিবার অতিশয় সচ্ছলতার জন্য দিনে ৮০-৯০ গ্রাম প্রোটিন খাচ্ছেন এবং তার কতকাংশ অপচয়ে নষ্ট করছেন তার হিসেব কি এই গড়ের পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায়? সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের নিকট বিবৃতিতে বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা সত্তর জনই দারিদ্র্য সীমার নিচে (যাঁদের মাসে আয় বিশ টাকা বা তার কম) অর্থাৎ যাঁরা কোন প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যই পেতে পারেন না। তাদের কি এই গড়ের হিসেব থেকে খুঁজে পাওয়া যায়? ভারত একটা মহাদেশ। এদেশের বিভিন্ন প্রদেশের আচার পদ্ধতি, খাদ্যের অভ্যাস এবং খাদ্য নির্বাচন বিভিন্ন রকমের। সে কারণে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের পুষ্টি বিষয়ক কোন নিদর্শন গড়ের পরিসংখ্যান দিতে পারে না। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গড়ের প্রয়োজন দিনে ২২০০ ক্যালোরি ও ৫৭ গ্রাম প্রোটিন—খাদ্যের প্রাপ্যানুসারে গড়ে পাওয়া যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩০ ক্যালোরি ও ৫০ গ্রাম প্রোটিন, তামিলনাড়ুতে ১৫০০ ক্যালোরি ও ৩৬ গ্রাম প্রোটিন, পাঞ্জাবে ২৪৩২ ক্যালোরি ও ৪৮ গ্রাম প্রোটিন, এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ১৯৯০ ক্যালোরি ও ৫৫ গ্রাম প্রোটিন। এসব পরিসংখ্যান থেকে কোন্ স্থানের কোন সামাজিক বা আর্থিক গোষ্ঠীর কত শতাংশ পরিবারের পক্ষে কতটা প্রোটিন, ক্যালোরি ও পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এবং কতটা অভাব রয়েছে তা জানা যায় না। এসব তথ্য জানা গেলেই খাদ্য ও পুষ্টি উন্নততর করার পরিকল্পনা রূপায়িত করা ও তা সম্পাদন করার প্রচেষ্টা হতে পারে। এ প্রকার তথ্য প্রকাশ করার জন্য খাদ্য নিরীক্ষার কর্মসূচী বিশেষভাবে প্রস্তুত করা দরকার। যদিও ভারতে ১৫০০র বেশী খাদ্য নিরীক্ষা হয়ে গেছে কিন্তু এ প্রকার বিশদ তথ্য কোন নিরীক্ষা থেকেই জানা যায় না। এই ব্যাপক নিরীক্ষা শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে হওয়া প্রয়োজন যদিও শহরতলীর অবস্থা গ্রামাঞ্চল থেকে উন্নততর। পুষ্টি বিষয়ক সমস্যা বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না। সমগ্রভাবে শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলের কথাই ভাবতে হবে।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অধীনে দীর্ঘদিন পারস্যে ও ত্রিনিদাদে অবস্থিত ক্যারিবিয়ান ফুড ও নিউট্রিশন ইনস্টিটিউটের শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রূপে এই প্রকার ব্যাপক নিরীক্ষা ঐসব দেশে পরিচালনা করার সুযোগ প্রবন্ধ লেখকের এসেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ত্রিনিদাদ, বারবাডোস ও গায়নাতে এই নিরীক্ষা হয়েছিল এবং বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছিল যে সামাজিক কোন শ্রেণী বা কোন্ গোষ্ঠীর মধ্যে পুষ্টির অভাবজনিত সমস্যার প্রকটতা বেশী এবং কেন। স্বভাবতই স্বল্প আয়ের পরিবার, একজনের আয়ের উপর নির্ভরশীল বৃহৎ পরিবার এবং খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে বা জোগাড়ে অসমর্থ পরিবারই অপুষ্টিজনিত সমস্যাতে ক্লিষ্ট দেখা গিয়েছে। এই সব নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এই সব দেশে সুষ্ঠু খাদ্য ও পুষ্টির নীতি (Food and Nutrition Policy) ... চালাবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। এখনকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই ভারতের বংশজাত। দেখা গেছে যে দিনের আয় একটু বেড়ে গেলে শুকনো মাছের জন্য আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, মাংস চাইলেও পাওয়া যায় না। দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষা নেই, বয়স্করা দুধ পান না; আমদানি করা জমাট মিষ্ট দুধ (Sweetened Condensed milk) শিশুদের প্রধান খাদ্য, যদিও পুষ্টির জন্য এই দুধ তাদের পক্ষে অনিষ্টকর। আমাদের দেশেও এ প্রকার বুভুক্ষা রয়ে গেছে, কোন স্থানে মাংসের জন্য, কোথাও আরও মাছের বা দুধের জন্য এবং অধিকাংশ স্থানে অধিকতর পরিমাণ ডাল-রুটি-ভাত বা অধিকতর খাদ্যের জন্য। আমাদের আয় বেশী হলেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত এসব খাদ্যের জন্য ব্যয় করি। দুধের চাহিদা
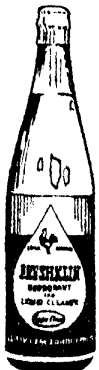
বিভিন্ন প্রদেশের দুধের প্রকল্প যথা মেট্রোবার প্রচেষ্টা শহরাঞ্চলে চলছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের কোন উপকার হয়নি এতে। একথা বলাই বাহুল্য যে মায়ের দুধের মতন উপকারী আর কোন দুধই শিশু পেতে পারে না। শিশুর দুর্দশা এসেছে তখনই যখন সে মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে প্রায় সব মাকেই কাজ করতে হয়। তাদের শিশুদের সারাদিন এক বৃদ্ধার হেপাজতে থেকে সারাদিন দুধের নামে সাদা জল পান করে অথবা পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যের সমস্যা হয়ে পড়ে এবং সেই জন্যই প্রোটিন-ক্যালোরির বৃভুক্ষা অপুষ্টি-জনিত ব্যাধি এত প্রকট হয়েছে।

খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ সুষম প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। আমিষ-জাতীয় খাদ্যের অভাব হলেও উপযুক্ত পরিমাণ বিভিন্ন নিরামিষ জাতীয় মিশ্রিত খাদ্য খেয়েও বয়স্কগণ প্রোটিনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। বর্তমানে বিশ্ব সংস্থাগুলিতে আমিষ জাতীয় প্রোটিন (animal protein) কথাটা আর ব্যবহার করা হয় না, পরিবর্তে শুধু প্রোটিন অথবা সম্পূর্ণ প্রোটিন (complete protein) বা সুষম প্রোটিন বলা হয়। কিন্তু অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের কিছু পরিমাণ দুধ ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী, কারণ তারা অধিক পরিমাণ পারিবারিক খাদ্য খেতে পারে না। কম পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। এসব খাদ্যে প্রয়োজনীয় উত্তাপ যোগাবার উপাদান থাকা আবশ্যক। খাদ্যে প্রয়োজনীয় ক্যালোরি না দিতে পারলে প্রোটিনের উপকারিতা অনেক কমে যায়।

বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদের দেহের ওজনের উপর ভিত্তি করে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যুগ্ম-ভাবে সর্বদেশের প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করার জন্য যে নীতি অনুমোদন করেছেন তা এক কাল্পনিক ভিত্তিতে প্রতি-ষ্ঠিত। একে তুলনামূলক (Reference) প্রোটিন বলা হয়। কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে, এই প্রোটিন পরিপূর্ণভাবে শরীরে ব্যবহৃত হবে। এই কাল্পনিক প্রোটিন অবাস্তব, কারণ খাদ্য-প্রোটিন যে দেশেরই হোক না কেন বা যতই পুষ্টিকর হোক না কেন, এর শত-শতাংশ শরীরে ব্যবহৃত হয় না, এর যে আনুপাতিক অংশ শরীরে পরিপূর্ণরূপে গৃহীত হয় তাকেই প্রোটিনের সার পদার্থ বা পুষ্টি মূল্য (nutritive value) বলা হয়। এটা নির্ভর করে কতটা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ওই প্রোটিনে আছে তার উপর। প্রোটিনের মধ্যে বিদ্যমান ২২টি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে ১০টিকে অত্যাবশ্যকীয় বলা হয়। কারণ, মানব দেহ এগুলোকে সৃষ্টি করতে পারে না—খাদ্যের মধ্য দিয়েই যোগাতে হয়। গবাদি পশু কিন্তু ঘাস-পাতা ও অন্যান্য শস্য জাতীয় পদার্থ খেয়েও মাংস ও দুধের মতন পুষ্টিকর বস্তু সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন দেশের খাদ্য থেকে মানুষ যে পরিমাণ প্রোটিন শরীরে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে তাকেই খাদ্য-প্রোটিনের পুষ্টি-মূল্য (Net protein utilisation বা সংক্ষেপে NPU) বলা হয়। এই NPU এর মূল্য দ্বারাই বিভিন্ন দেশের খাদ্যের প্রোটিনের পুষ্টিগুণ নির্ণয় করা এবং খাদ্যের মাধ্যমে কতটা প্রোটিন পেতে হবে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। স্বতন্ত্রভাবে ডিম, গরুর দুধ, মাংস, মাছ, ভাত, ময়দা ডাল ও পালং শাকের প্রোটিনের NPU হচ্ছে যথাক্রমে ১০০%, ৭৫%, ৮০%, ৮৩%, ৫৭%, ৫২% এবং ৪৪%। দেখা যাচ্ছে ডিমের প্রোটিনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

উন্নত দেশে খাদ্যে আমিষ জাতীয় খাদ্য-দ্রব্যের প্রাধান্য থাকায় প্রোটিনের NPU ৬৫—৭০% হয়ে থাকে এজন্য মোট প্রোটিনের চাহিদাও কম। কিন্তু উন্নতিশীল দেশের খাদ্যে এই গুণ ৫০-৫৫%-এর বেশী হয় না, কোন কোন দেশে ৪৬-৫০%ও দেখা গিয়েছে। ভারতে গড়ে খাদ্য-প্রোটিনের NPU হিসেব করা গিয়েছে ৫৩%। এসব দেশে মোট প্রোটিনের প্রয়োজন তুলনামূলক ভাবে বেশী—বিভিন্ন দেশের খাদ্যের প্রোটিনকে এ কারণে "স্থানীয় প্রোটিন" (local protein) বলা হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, বয়স ও দেহের ওজনের ভিত্তিতে কোন উন্নত ও কোন উন্নতিশীল দেশের গড়ের রেফারেন্স প্রোটিনের প্রয়োজন যদি ৩০ গ্রাম হয়, তাহলে প্রোটিনের গুণানুসারে উন্নত দেশে (NPU ৬৫%) খাদ্য থেকে দিনে ৪৬ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন, কিন্তু উন্নতিশীল দেশে (NPU ৫০%) থেকে দিনে ৬০ গ্রাম প্রোটিন সরবরাহের প্রয়োজন। যদি দেশের সব লোকের কথা ভাবা যায় তাহলে রেফারেন্স প্রোটিন ৩৬ গ্রাম এবং উন্নত ও উন্নতিশীল দেশে যথাক্রমে ৫৫ ও ৭২.০ গ্রাম সরবরাহের প্রয়োজন।

গত বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে 'প্রোটিন সমস্যা' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডাঃ সুখাত্মে বলেছিলেন যে, দুই বিশ্ব সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ভারতে গড়ে ২২০০ ক্যালোরি ও ৩০ গ্রাম প্রোটিন এবং ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীর চাহিদা পূরণ করার জন্য দিনে মাথাপিছু ৩৬ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন—সে স্থলে ভারতে পাওয়া যাচ্ছে ২০০০ ক্যালোরি ও ৫০ গ্রাম প্রোটিন। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে প্রোটিনের অভাব কোথায়? ডাঃ সুখাত্মের বক্তার ভিত্তিতে 'দেশ'এর দুটি সংখ্যায় (২৭ মাঘ ও ১২ ফাল্গুন) বিশ্বরঞ্জন

অধ্যায়ে ঐ একই প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে যে আমাদের দেশে প্রোটিনের অভাব কোথায়?

এ কথা বুঝিয়ে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীতে উন্নত বা উন্নতিশীল এমন কোন দেশ নেই যেখানে গড়ে প্রোটিনের প্রয়োজন ৩০।৩৬ গ্রাম। এশিয়ার মধ্যে উন্নত দেশেও গড়ে ৪৩ গ্রাম এবং ইউরোপের প্রায় সব দেশে ও অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডেও গড়ে ৪৩-৪৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন। বিজ্ঞান কংগ্রেসে এ কথাটা বুঝিয়ে বলা হয়নি যে, ভারতে গড়ে প্রয়োজন ৩০ গ্রাম হচ্ছে দুই বিশ্ব সংস্থার প্রকাশিত রেফারেন্স প্রোটিনের ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য পরিমাণ। ভারতের প্রোটিনের NPU ৫৩% বিবেচনা করলে গড় দিনে ৫৬ গ্রাম স্থানীয় প্রোটিন খাদ্য থেকে সরবরাহ করতে হবে। অথচ আমরা ৫০ গ্রাম পাচ্ছি। এতে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে আমাদের দেশে প্রোটিনের অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বহু নিরীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে এবং আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান থেকেও জেনেছি যদি প্রয়োজন ও সরবরাহের পরিমাণ নিকটবর্তী হয় তাহলে দেখা গিয়েছে যে দেশের ৩০-৪০ শতাংশ ব্যক্তির প্রোটিনের অভাব রয়েছে। সেজন্য দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর (৯৭.৫%) চাহিদা পূরণ করতে হলে গড়ের পরিমাণের ১২০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৬ গ্রামের ১২০ শতাংশ—৬৭ গ্রাম প্রোটিন মাথাপিছু দিনে সরবরাহ করতে হবে। ক্যালোরি প্রোটিন সরবরাহের পরিকল্পনার মধ্যে এ বিষয়ে নজর রাখতে হবে। এ কথাও পুনরুক্তির প্রয়োজন যে, ক্যালোরির চাহিদা না মেটাতে পারলে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিনের সরবরাহ হলেও সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, প্রোটিনের কিয়দংশ তখন শরীরে উত্তাপ যোগাবার কাজে ব্যবহৃত হবে। এখন প্রশ্ন আসছে যে, এই অতিরিক্ত ২০০ ক্যালোরি কিভাবে পরিপূরণ করা যেতে পারে? এই আলোচনার পূর্বে ভারতে খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে।

গত ২০ বৎসরে (১৯৫১-১৯৭১) ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫২ শতাংশ (৩৬১.২ থেকে ৫৪৬.৯ কোটি), এবং পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে ৬৮ শতাংশ (২৬.৩ থেকে ৪৪.৪ কোটি)। ওই সময়ে মাথাপিছু দিনের হিসেবে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৩২০ থেকে ৪৩৭ গ্রাম, ডালের উৎপাদন কমে গেছে (৬৪ থেকে ৫৮ গ্রাম), তৈলবীজের উৎপাদন একই রয়েছে—৩৯।৩৮ গ্রাম এবং মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন খুবই কমে গেছে। নিম্নে সর্বভারতের গড়ে দৈনিক খাদ্যের পরিমাণের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যে সব খাদ্য নিরীক্ষা হয়েছে তার ফলাফলের তুলনা করে খাদ্য সরবরাহের একটি তালিকা দেওয়া হল। তালিকাটিতে যথাক্রমে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ও পশ্চিমবঙ্গের গড় দৈনিক পরিমাণ দেখান হয়েছে: মোট খাদ্যশস্য—৩৯৫,৪২০ গ্রাম; ডাল—৫১,৩০ গ্রাম; চিনি—৪৫,২২ গ্রাম; মাছ, মাংস, ডিম—১২,৩০ গ্রাম; দুধ—১০৮,৫২ গ্রাম; তরকারী—৫৩,১৪০ গ্রাম; ঘি, মাখন, তেল—১৪,১৮ গ্রাম। ভারতে আসামে সর্বাপেক্ষা বেশী ডিম খাওয়া হয়—মাসে জনপ্রতি ২.২০টি, পশ্চিমবঙ্গে ১.৩৪টি এবং সর্বনিম্ন পাঞ্জাবে—০.১৭টি এবং ভারতে ০.৭৫টি। ডিমের এই হিসেব শহরাঞ্চলের। সর্বভারতে শহর ও গ্রামের জনপ্রতি—০.২৫টি ডিম হিসেবে পাওয়া সম্ভব হয়। এই প্রকার ভারতের ও বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ থেকে যে পরিমাণ ক্যালোরি ও প্রোটিন পাওয়া সম্ভব হয় তারও তালিকা এখানে দেওয়া হল। সর্বভারতে—১৯৮৫ ক্যালোরি ও ৫৫ গ্রাম প্রোটিন; পশ্চিমবঙ্গ—১৯২৭ ক্যালোরি ও ৪৮ গ্রাম প্রোটিন; সর্বোচ্চ পাঞ্জাব—২৮৩২ ক্যালোরি ও ৮৭ গ্রাম প্রোটিন; এবং সর্বনিম্ন তামিলনাড়ুতে—১৮৯৮ ক্যালোরি ও ৩৮ গ্রাম প্রোটিন।

প্রাক্-বিদ্যালয় শিশুদের (১—৫ বৎসর বয়স্ক) খাদ্য নিরীক্ষা থেকে যে তথ্য জানতে পারা গেছে তারও একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। তুলনার জন্য অনুমোদিত পরিমাণ বন্ধনীতে দেখান হল। মোট খাদ্যশস্য—১৪৭ (১৭৫) গ্রাম; ডাল—১৬ (৪৫) গ্রাম; চিনি—৫ (৩৫) গ্রাম; মাছ, মাংস, ডিম—৪ (২০) গ্রাম; দুধ ৮০ (২৪০) গ্রাম; তরকারী—১৮ (১০৩) গ্রাম; ঘি, তেল, মাখন—৪ (২৩) গ্রাম এবং ফল—৭ (৫০) গ্রাম। এই খাদ্য থেকে শিশুরা পেয়ে থাকে—৭৫৮ (১২৭৫) ক্যালোরি; ১৯.৩ (১৯.৫) গ্রাম প্রোটিন; ভিটামিন এ—৫৭২ (১০৫০) I U; লৌহ—৮.৬ (১৭.৫) মিলিগ্রাম এবং ক্যালসিয়াম—২৩০ (৪৫০) মিলিগ্রাম। এই সব অনুসন্ধানজনিত তথ্য থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, আমাদের শিশুদের খাদ্য অতিশয় অপোষ্টিক। ক্যালোরি ও আমিষ জাতীয় প্রোটিনের অভাবই শিশুদের দুর্দশার প্রধান কারণ যা থেকে তারা জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করার বা বুদ্ধিদীপ্ত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ সমস্যাকে উপেক্ষা করা চলে না।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, ভারতের জনগণ যে দিনে গড়ে ২০০ ক্যালোরি কম পাচ্ছেন এবং অন্ততপক্ষে ৩০ শতাংশ ব্যক্তির প্রোটিনের অভাব রয়েছে তার কোন সমাধান আছে কিনা। থাকলে কোন্ খাদ্য এবং কত পরিমাণ দ্বারা পূরণ করতে হবে। খাদ্যশস্য, ডাল, চিনি ও তৈল জাতীয় খাদ্যই আমাদের ক্যালোরির প্রধান সরবরাহক। চিনির মধ্যে অন্য কোন পুষ্টিকর বস্তু না থাকাতে অতিরিক্ত ৫০ গ্রাম চিনি দ্বারা ক্যালোরির ঘাটতি পূরণ করা অনুচিত। সেই প্রকার খুব বেশী উত্তাপ যোগাবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ২৩ গ্রাম অতিরিক্ত তৈল জাতীয় খাদ্য দ্বারা ক্যালোরির অভাব পরিপূরণ করার প্রস্তাব বিবেচনার অযোগ্য। অধিক মূল্যবান মাছ, মাংসের কথা না ভেবে এবং দুধের অপ্রতুলতার জন্য (যদিও এই সব খাদ্য বেশী পরিমাণ ক্যালোরি দিতে পারে না, সুষম প্রোটিন দিতে পারে) কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য, ডাল এবং অল্প আমিষ জাতীয় খাদ্য যোগ করে এবং বাধ্যতামূলকভাবে কিছু গাঢ় সবুজ শাককে দিনের খাদ্যের নির্দিষ্ট অংশ মনে করে দিনের খাদ্যকে নূতন করে পরিকল্পনা করতে পারলে শুধু যে দিনের ২০০ ক্যালোরি পূরণ করা সম্ভব হবে তা নয়, বরঞ্চ সঙ্গে সঙ্গে আরও খানিকটা প্রোটিন, ভিটামিন-এ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর বস্তুও পাওয়া যাবে। এই প্রচেষ্টা রূপায়িত করতে হলে দিনে জনপ্রতি অতিরিক্ত ৩৫ গ্রাম চাল অথবা আটা অথবা ময়দা, ৫ গ্রাম ডাল, ৫ গ্রাম চিনি, ৫ গ্রাম চীনাবাদাম ও সপ্তাহে একটি ডিম খাদ্যের

মধ্যে আনতে হবে। এর সঙ্গে যে কোন সবুজ পাতার শাক অবশ্যই রাখতে হবে। এই মিশ্রিত খাদ্য থেকে যথাক্রমে ১২৭, ১৮, ১৯ ও ২৭ ক্যালোরি ও একটি ডিমের সাপ্তাহিক অংশ থেকে ২৩—মোট ২১৪ ক্যালোরি দিনে পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে অতিরিক্ত ৬·০ গ্রাম প্রোটিনও এসে যাবে যার মধ্যে ১২ শতাংশ আমিষ জাতীয় প্রোটিন। ভিটামিন-এ'র পরিমাণও বেড়ে যাবে।

ক্যালোরির ঘাটতি পূরণের জন্য যদিও মাত্র ৫০ গ্রাম অতিরিক্ত খাদ্য গড়ে দিনে প্রয়োজন যার মূল্য হবে আনুমানিক ১৬ পয়সা, তাহলেও এই অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহের জন্য আর্থিক সক্ষমতা কত শতাংশ পরিবারের আছে তা বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা সরকারের বণ্টন সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এখানে একটু হিসেব করে দেখা যেতে পারে যে, এই অতিরিক্ত খাদ্য যদি সংগ্রহ বা উৎপাদনের উপর নির্ভর করে তা হলে কি পরিমাণ খাদ্য আরও সংগ্রহ/উৎপাদন করতে হবে। ১৯৭৩ সালের অনুমানিক সর্বভারতে ৫৭৪ মিলিয়ন (৫৭·৪ কোটি) লোকসংখ্যার এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৭ মিলিয়ন (৪·৭ কোটি) লোকের প্রয়োজন দেখানো হয়েছে। পরিমাণ সবই হাজার (০০০) মেট্রিক টনে দেওয়া হয়েছে:

এবং শিক্ষিত পরিবার সহজেই এ জ্ঞান লাভ করতে পারেন যাতে তাঁদের সীমিত আয়ের মধ্যেও প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন করে পরিবারের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের মান উন্নত করতে পারেন। সরকারের খাদ্য পরিকল্পনার প্রচেষ্টাকেও সাফল্যমণ্ডিত করতে পুষ্টিবিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হলেই জনগণের পুষ্টির মান উন্নত করা সম্ভব হবে।

বিশ্বের বহুস্থানে পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা সভায় বা বিভিন্ন দেশের উন্নতি-মূলক কর্মসূচীতে যেখানেই অতিরিক্ত অপুষ্টিজনক সমস্যা আলোচনা হয়েছে সেখানেই ভারতে অপুষ্টির সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। এতে ভারতের গুরুতর অপুষ্টির কথাই প্রচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে। করা হয়ে থাকে কয়েকটি কারণে। প্রথমত, ভারতের বিরাট জনগণের সুষ্ঠু খাদ্য সরবরাহ ও পুষ্টির খানিকটা মান বজায় রাখা একটা বিস্ময়ের বিষয়। দ্বিতীয়ত, ভারতে গত ৪০ বৎসর যাবৎ পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা চলছে। ১৯৩০।১৯৩২ সালে ডাঃ ম্যাককারিসন এই গবেষণার প্রবর্তন করেন, তার পর ডাঃ অ্যাকরয়েড একে চালু করেন এবং পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে উন্নত ধরনের

	১৯৭৩ সালে প্রয়োজন (০০০) মেঃ টন		১৯৭০ সালে উৎপাদন
	সর্ব ভারত	পশ্চিমবঙ্গ	সর্বভারত (০০০) মেঃ টন
চাল/আটা/ময়দা	৭,৩৩০	৬০০	৯০,৫৫৩
ডাল	১,০৫৭	৮৫·৭	১০,১৩৫
চিনি	১,০৪৭	৮৫·৭	১১,৯০২
চীনা বাদাম	১,০৪৭	৮৫·৭	৬,৪০০
ডিম (সংখ্যা)	২৯,৮৪৮,০০০,০০০	২,৫৪৬,০০০,০০০	২,২২৯,০০০,০০০

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার Production Year Book (১৯৭০) থেকে দেখা যায় ভারতে ১৯৬৯ সালে ২২৬৯ মিলিয়ন ডিম উৎপাদন হয়েছিল কিন্তু এসব সংখ্যা অনুমানিক মাত্র, কারণ গৃহস্থরা যেসব ডিম উৎপাদন করেন তার বেশী পরিমাণ নিজেরাই বিক্রি করেন এবং কিছু পরিমাণ খেয়ে ফেলেন। এসব উৎপাদনের কোন পরিসংখ্যান থাকে না। ডিম, দুধ, শাক-সব্জী প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যের ত্রুটিবিহীন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কেবল উদ্দেশ্যমূলক খাদ্য নিরীক্ষা থেকে এসব প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যেতে পারে।

এই খাদ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হলে অধিকতর উৎপাদন বা সংগ্রহ ব্যতীতও কিছু পরিমাণ পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান গ্রামাঞ্চলের পরিবারকে দেওয়া প্রয়োজন

পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা হয়েছে বহু সহস্র বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায়। তৃতীয়ত, বহু সহস্র খাদ্য সমীক্ষা ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা হয়েছে এবং বহু সহস্র পত্র, পত্রিকা, পুস্তক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশের ও বিদেশের সাময়িকীতে প্রকাশ করা হয়েছে। চতুর্থত, ভারতের অনেক পুষ্টিবৈজ্ঞানিক পৃথিবীর অন্যতম অভিজ্ঞ (expert) ব্যক্তিরূপে বিশ্বের বিভিন্ন সংসদে উপদেষ্টারূপে আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থায় কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। এসব কারণে উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতের পুষ্টি/অপুষ্টি বিষয়ক তথ্য বিশ্বে অধিকতর জানা হয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে।

এ অবস্থাতেও দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে বিজ্ঞান, কংগ্রেস এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সভাতেও যেসব পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা হয়ে থাকে সেসব আলোচনাতেও সমস্যাগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে। এখন সময় এসেছে এখন প্রয়োজন ভারতের বর্তমান অবস্থাতে কি পদ্ধতিতে পুষ্টির সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করা যেতে পারে তার নির্দেশ থাকা ও আলোচনা হওয়া। আমরা পুষ্টিবিজ্ঞানীরা কেবল সমস্যাগুলির পুনরাবৃত্তি করেই আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। পুষ্টি-বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের এ প্রকার ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে সমন্বয় করে একটা সুষ্ঠু পুষ্টি বিষয়ক পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং পুষ্টি সমস্যার সমাধানের সহায়ক হবে। এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যে-কোন পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব হোক না কেন, তাকে বিচ্ছিন্ন কর্ম-সূচী করা চলবে না, এই পরিকল্পনা হবে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত।
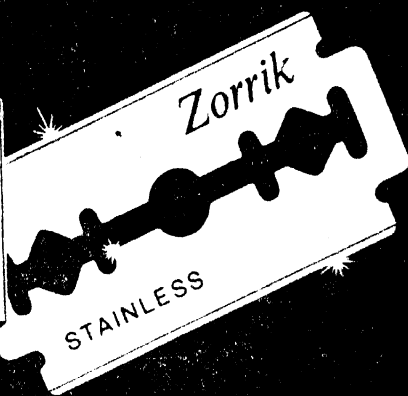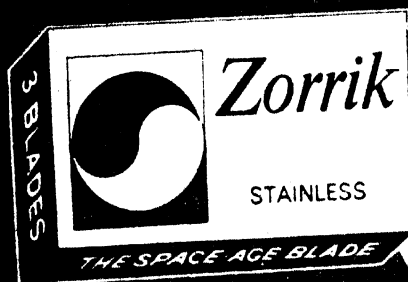
নতুন পাঠক্রমের বিরোধিতা

আপনার পত্রিকার ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় 'নতুন পাঠক্রমের বিরোধিতা' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পড়লাম। আপনারা বলেছেন যে, এই বিরোধিতার মর্ম উদ্ধার করতে পারছেন না, তাই পাঠক্রমটির কোথায় গলদ, কি অর্থে তা গুরুভার এবং তার মধ্যে 'অকারণ জটিলতা' আছে কিনা—সে সম্বন্ধে কার্যকর সমালোচনা চেয়েছেন। সেই ভরসা পেয়েই আমরা প্রধান শিক্ষকদের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপিত করছি।

প্রথমেই এই পাঠক্রমের বিবর্তন ধারাটির দিকে তাকান যাক। (১) ১৯৪০ পর্যন্ত দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রমের আবশ্যিক তালিকায় ছিল।—ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত, এই তিনটি ভাষা এবং গণিত। মোট ৪টি বিষয়। (২) তারপর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই পাঠক্রমে ইতিহাস ও ভূগোল যুক্ত হয়ে আবশ্যিক তালিকায় পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা হল ৬। (৩) ১৯৫৭ পরে ১৯৭৩ পর্যন্ত কলা বিভাগ (হিউম্যানিটিস) ছাড়া অন্য সকল বিভাগের ক্ষেত্রে তিনটির জায়গায় ভাষার সংখ্যা হল ২ (বাংলা ও ইংরাজী)। তার সঙ্গে গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল ও একটি নির্বাচিত বিষয় নিয়ে হল ৬টি বিষয়, এবং তার সঙ্গে সর্বপ্রথম যুক্ত হল সাধারণ বিজ্ঞান। মোট ৭টি বিষয়। কেবলমাত্র কলা বিভাগের জন্য নির্বাচিত বিষয়ের মধ্যে তৃতীয় ভাষা সংস্কৃতও হল আবশ্যিক, এই পটভূমিকায় এবার আমরা পর্ষদের নতুন পাঠক্রমটি বিচার করব।

এর রচনাপর্বের সূচনাতেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসচিব পর্ষদকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা যেন একটি ব্যাপক সমালোচনার কথা মনে রাখেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পাঠ্যসূচী বেশ খানিকটা গুরুভার। এই সমালোচনার যুক্তিযুক্ততা না থাকলে নিশ্চয়ই এই সতর্কবাণীর কোন প্রশ্নই উঠত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন পাঠক্রমে দেখছি আবশ্যিক তালিকায় বিষয় সংখ্যা আগের চাইতে বেড়েছে। বিজ্ঞানের দুটি বিভাগকে যদি দুটি বিষয় ধরা হয় (এবং যা ধরাই হল সঙ্গত) —তাহলে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় গিয়ে ৯-এ। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত পাঠক্রমের তুলনায় নতুন পাঠক্রমের ভার কি বাড়ল না? যদি (৩) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রচলিত পাঠক্রম গুরুভার বলে বহু ব্যাপক সমালোচনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে এই নয়া পাঠক্রমের ভার কি গুরুতর বলে আরও সমালোচনাযোগ্য হয় না?

এ গেল নিছক বিষয় সংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিচার। নীতির বিচারে দেখা যাবে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি এই নয়া পাঠক্রমে স্বীকৃত হয়নি। সেই

সিদ্ধান্তটি হল এই যে আজকের শিক্ষাকে করতে হবে উৎপাদনমুখী ও কর্মকেন্দ্রিক যাতে তা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক ও সহায়ক একটি বৈপ্লবিক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। আমাদের নয়া পাঠক্রমে 'কাজের অভিজ্ঞতা'কে 'কর্ম-শিক্ষা' নামে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। কিন্তু ভাষার ভারাক্রান্ত সেই পাঠক্রমে হাতে কলমে কাজের কতটুকু সময় থাকবে? আমরা একটি নমুনা সমীক্ষায় প্রায় ১৬০ জন প্রধান শিক্ষকের মত বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে নয়া পাঠক্রম চালু করতে চাই সপ্তাহে প্রায় ৫২টি পিরিয়ড। এখন আছে সপ্তাহে ৩৯ পিরিয়ড। বিদ্যালয়ের সময়সূচীর এক চতুর্থ পরিমাণ বাড়াতে গেলে ছেলেদের দুপুরের খাবার দিতেই হবে। আমাদের সরকারের আপাতত এতটা সামর্থ্য নেই বলেই মনে হয়। কাজেই প্রচলিত ক্র্যাফট্ শিক্ষা বা অতীতের বুনিয়াদি শিক্ষার কর্মকাণ্ডের মত নয়া পাঠক্রমের কর্ম শিক্ষার হালও কি একই হবে না? যদি তা হয় তবে নয়া পাঠক্রম আবার সেই বিষয়-কেন্দ্রিক অচল বস্তুতেই পর্যবসিত হবে। অথচ আমাদের আদর্শ শিক্ষাকে জীবনমুখী করতে হবে।

পর্ষদের অন্যতম একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ভাষা এবং গণিতসহ ভৌতবিজ্ঞানকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু আমাদের নমুনা সমীক্ষার রায় বলছে তিনটি ভাষা শেখাতে গেলে ভাষা এবং গণিতসহ ভৌতবিজ্ঞানের নিয়োজ্য সময়ের অনুপাত হতে হবে ১১ : ৭। অর্থাৎ ভাষার গুরুত্ব হবে ১½ গুণের একটু বেশী, গণিতসহ ভৌতবিজ্ঞানের গুরুত্ব হবে ১ গুণের কিছু কম। তার অর্থ ভাষার আধিপত্য পাঠক্রমটিকে আবার পুঁথিসর্বস্ব করে তুলবে। গণিত, ভৌত ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং কর্মশিক্ষার স্থান হবে অতিশয় সঙ্কুচিত। অথচ জীবনের দাবী হল এইগুলোর উপরই সবচাইতে বেশী।

আমাদের মতে এগুলোর উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতেই হবে। দিতে হলে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতারা বলেছেন ভাষার সংখ্যা কোন মতে দুটির বেশী রাখা চলবে না। National Committeeর সুপারিশ—দ্বিতীয় ভাষাটি পর্যন্ত নবম শ্রেণীর পর বর্জন করে দশম শ্রেণীতে রাখতে হবে শুধু একটি ভাষা। আমরা বলেছি দুটি ভাষাই যথেষ্ট। এ রাজ্যের কলকাতা ও যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাশিক্ষা বিভাগ, ডেভিডহেয়ার ট্রেনিং কলেজ এবং শিক্ষক-সংস্থাগুলো একই মত প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সব উন্নতশীল দেশের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের দ্বিতীয় কথা হল এই যে মাতৃভাষার বেলাতেও নবম-দশম শ্রেণীতে সাহিত্যের উপর একটু বেশী জোর দিয়ে দুটি পত্র থেকে একটি পত্রে মাত্র ব্যাকরণের অধিকার সীমিত করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় ভাষাকে সত্য সত্য দ্বিতীয় ভাষারূপে গণ্য করে তার পাঠ্যসূচী ও পঠন-পদ্ধতি বহুলাংশে সরলতর ও বিজ্ঞানসম্মত করা প্রয়োজন। এইভাবে ভাষাশিক্ষার সময় পরিমিত করলেই নয়া পাঠক্রমকে আমাদের বহুবিঘোষিত নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী কর্মকেন্দ্রিক তথা উৎপাদনমুখী করে তোলা সম্ভব।

তৃতীয় ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি শুধু সংস্কৃতের বিরোধিতা একথা আপনারা কোথায় পেলেন বোঝা গেল না। আপাতত সে প্রসঙ্গে না-ই বা গেলাম।

মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্মসচিব
পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাবিষয়ক শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি সময়োপযোগী শুধু নয়, মূল্যবান এবং চিন্তা-উদ্দীপকও হয়েছে (দেশ, ১৯-৫-৭৩)। ভারতের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতার কারণ ও তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে লেখক যে সব সূত্র দিয়েছেন, তার সবগুলিই যথার্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ।

কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেন নি—তা হলো প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক সমস্যা।

একথা অনস্বীকার্য যে যার ওপর শিক্ষা ইমারত গড়ে উঠবে, সেই প্রাথমিক শিক্ষার ভিত নির্মাণে সব চেয়ে দক্ষ এবং উপযুক্ত শিক্ষক দরকার। অথচ আমাদের দেশে এর সম্পূর্ণ বিপরীতটাই ঘটছে। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষকের বাজার যে কি রকম ভয়াবহ, তা যাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্গে একটু সংস্পর্শ আছে, তাঁরাই জানেন, অথচ এই শিক্ষকদের সম্পর্কে আলোচনা এ যাবৎ কমই হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্পর্কে লেখক আলোচনা না করলেও তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন, 'কক্ষে কক্ষে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় বসে কি লিখেছ এবং কি শিখেছে শিক্ষার অভিভাবকেরা তার খোঁজ পর্যন্ত রাখেননি। অত্যন্ত ঠিক কথা। শুধু তাই নয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকরা নিজেরা কতটা শিক্ষিত সে খোঁজও তাঁরা রাখেননি। এর ফলেই প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত নানারকম নৈরাশ্যকর ও অবিশ্বাস্য ব্যাকরণ-বিচ্যুতি ও বানান ভুল, যার দৃষ্টান্ত লেখক দিয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং শিক্ষণরত এমন শিক্ষকও আমি দেখেছি, যাঁর পরীক্ষার অন্যতম বিষয় ইংরিজি হওয়া সত্ত্বেও, ঐ বিষয়কে যমের মত জ্ঞান করেন এবং বাংলা ভাষায় অতিসাধারণ শিশুদুর্লভ ভুল করেন।

শিক্ষক নির্বাচনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই কড়াভাবে প্রয়াস চালাতে হবে—সৎ এবং আন্তরিক প্রয়াস। নিয়োগের পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষকদের কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে হবে —শুধু বিষয়বস্তুর জ্ঞানের নয়, শিশু-শিক্ষণের যোগ্যতারও পরীক্ষা। এজন্য যাঁদের ছাত্রজীবনের খতিয়ান উজ্জ্বলতম, তাঁদেরই নিয়োগ করতে হবে শিক্ষকরূপে। অথচ বর্তমান পদ্ধতিতে এর সম্পূর্ণ বিপরীত মানের ছাত্ররাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'শিক্ষক' নিযুক্ত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা যাতে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হন, সে রকম অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে সরকারকে। দেশকে, অর্থাৎ এর শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে শিক্ষক পদকে সবরকম ক্ষুদ্র বিবেচনার ঊর্ধ্বে রাখতে হবে, এমনকি পূর্বোক্ত 'মানবিক' বিবেচনারও। কাজেই শিক্ষক তৈরির সমস্যা মাত্রও গৌণ নয়, লেখক যেরকম বলেছেন। এটা আশু সমস্যা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রাথমিক সমস্যা।

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী
জামশেদপুর-৯

রবীন্দ্র কাব্যে ফুল

এই নামের শ্রীপ্রভাসচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ সম্পর্কে ভিক্ষু বুদ্ধদেবের পত্র দেখেছি। তবে পত্রলেখক বোধ হয় বড্ড বেশি আশা করেছেন। এটা মনে রাখা দরকার যে ফুলের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ খুবই কম। যোগ বিশেষ না থাকায় কবি বা সাহিত্যিক সাহিত্যকর্মে ফুলের উল্লেখ করেছেন দেখলেই আমরা খুশী হই। ফুলের সম্পর্কে এর চাইতে বেশি জানার প্রয়োজন দেখি না। তাই প্রবন্ধকারের লেখায় ফুলগাছকেও চেনাতে হবে; এটা পত্রলেখকের আশা না করাই ভাল।

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নামগুলি কোন গাছকে বোঝায় তাদের উদ্ভিদ বিদ্যার নাম নীচে দেবার চেষ্টা করছি। এতে গাছগুলিকে সঠিকভাবে চেনার হয়ত সুবিধা হবে। (১) হিমঝুরি: মিলিংটোনিয়া হরটেনসিস (Millingtonia hortensis)। এটি এর অন্য বাংলা নাম 'আকাশ নিম' হিসাবেই বেশী পরিচিত। (২) সোনাঝুরি: অ্যাকেসিয়া মনিলিফর্মিস (Acacia Moniliformis)। (৩) নীলমনিলতা: পেট্রিয় ভলুবিলিস (Petria Volubilis)। (৪) রক্তমুখী: কিজেলিয়া পিনাটা (Kigelia Pinnata)। (৫) মধুমঞ্জরী: কুইসকোয়ালিস ইনডিকা (Quisqualis Indica) এটিও এর অন্য বাংলা নাম 'মধুমালতী' বলেই সুপরিচিত। মধুমালতীকে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী গাছ বলে মনে করেছেন। কিন্তু আসলে বোধ হয় এটি বিদেশী নয়। বার্মা এর জন্মভূমি বলে পরিচিত হলেও ভারতও বোধ হয় এর একটি অন্যতম আদি বাসস্থান।

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া উপরের নামের গাছগুলি সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেলেও অগ্নিশিখা, বনপুলক ও বাসন্তী নামে তিনটি ঠিক কোন গাছগুলিকে বোঝায় সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সহজ নয়। বাসন্তী—ওকনা স্কোয়ারোসা (Ochna Squorrosa) এবং অগ্নিশিখা স্পাথোডিয়া ক্যামপানুলেটা (Spathodea Campanulata) হতে পারে।

ইক্সোরা পারভিফ্লোরার একটি বড় বৈশিষ্ট্য যে এটি বাগানের চেয়ে ঝোপেঝাড়ে বনে নিজের মনের আনন্দে বেড়ে উঠতে ভালবাসে। এটি ফোটে বসন্তে গাছ ভরে, সাদা ফুলে কোমল কোমল গন্ধ এবং অনেক ফুল ফোটে বলে সে গন্ধ একটু দূরে থেকেও পাওয়া সম্ভব।

আমাদের আশপাশে বা ফুলবাগানে যে সব গাছ রয়েছে তাদের সবারই বাংলা নাম হওয়া দরকার। কিন্তু প্রচলিত অনেক বাংলা নাম অনেক সময়ে আমাদের দূরত্ব না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্লুমেরিয়ার বহু বাংলা নাম আছে। যথা কাঠগোলাপ, গোরচাঁপা, কাঠচাঁপা, গুলঞ্চি, গুলচি, গুলেঞ্চ, গুলান, চাঁপা, গোলক চাঁপা, গরুড় চাঁপা প্রভৃতি। এর কোন কোন নাম কোন কোন অঞ্চলে বেশী প্রচলিত এবং অন্যগুলি মোটামুটি অপরিচিত। এ অবস্থায় যে কোন বাংলা নামেই গাছটিকে কি করে সঠিক বোঝানো যায় সে সম্পর্কে ভাববার প্রয়োজন রয়েছে।

মলয় দাশগুপ্ত
ভদ্রেশ্বর

সাহিত্য ও আদালত

গত ৩০ সংখ্যার 'দেশ'-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্যে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানবেন। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধে আনীত মামলার রায় দ্বারা কেবল শ্রীবসু বা বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষা পায়নি, এর দ্বারা আইনের অভিভাবকগণও নিজেদের সম্মানিত করেছেন। একথা যথার্থই অনস্বীকার্য যে 'অশ্লীলতা' সঠিক সংজ্ঞা আইন আদালতের নথিপত্র খুঁজতে যাওয়া নিছক বিভ্রান্তি; এবং যুগবিবর্তন বা কালভেদে অশ্লীলতার ব্যাখ্যাও রীতিমত আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল। আজ যা অশ্লীল-রূপে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে চিহ্নিত, দু দিন পরে পরিবর্তিত সমাজ-মানসের সম্মুখে সেটাই বিনন্দিত। তবুও, যেহেতু সাহিত্য ও শিল্প সমাজচেতনার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং যেহেতু শিল্পী বা সাহিত্যসেবী বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও কালগত মূল্যবোধ বা মানসচর্যার অধীন, অতএব যতদিন পর্যন্ত না কোনো একটি যুগোত্তীর্ণ ও চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হচ্ছে—তৈরী হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক নিরিখ—ততদিন পর্যন্ত সৃজনশীল সাহিত্যসেবীর, আমার মনে হয়, সমাজ ও কালের বিশেষ বিশেষ মানসিকতা ও রুচিবোধের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সহনশীলতা জ্ঞাপন করাই উচিত। ১৯২৩ সনে জেনেভায় গৃহীত

আন্তর্জাতিক আইনের (Article I of the International convention) অনুসরণে সংযোজিত ভারতীয় ফৌজদারী আইনের অশ্লীলতা সম্পর্কিত ধারায়ও (২৯২ ও ২৯৩ ধারা) এই সামাজিক লক্ষ্যকে ('Social purpose') বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এবং ধর্মমূলক শিল্প (চারুকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য), এমন কি নগ্ন নারী-দেহকেও আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে—কারণ, 'works of art are never considered obscene'. অশ্লীলতার নিরিখ হিসেবে জাস্টিস কক্‌বার্নের ১৮৬৮ সনে প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়কে ভারতীয় আইনেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে: 'The test of obscenity is this, whether the tendency of the matter charged as obscene is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences, and into whose hands a publication of this sort may fall'.

সাহিত্যে, শিল্পে অশ্লীলতার বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে:

'The test of obscenity to adopt in India is that obscenity without a preponderating social purpose or profit cannot have the constitutional protection of free speech and expression and obscenity is treating sex in a manner appealing to the carnal side of human nature or having that tendency. The obscene matter in a book must be considered by itself and separately to find out whether it is so gross and its obscenity so decided that it is likely to deprave and corrupt those whose minds are open to influences of this sort and into whose hands the book is likely to fall. In this connection the interests of our contemporary society and particularly the influence of the book on it must not be overlooked'.

সবশেষে উপসংহারে বলা হয়েছে: 'when there is nothing in it to offend the ordinary decent person, it is impossible to say that it is obscene within the meaning of this section'.

এদেশে প্রাক-স্বাধীনতার আমলে অশ্লীলতামূলক সাহিত্য নিয়ে আইন আদালত পর্যায়ে ততটা মাতামাতি হয়নি যতটা হয়েছে রাজদ্রোহসূচক সাহিত্য নিয়ে। স্বাধীনোত্তর ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় ক্রম-বর্ধমান জটিলতা দেখা দিচ্ছে জনজীবনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে। একালের সাহিত্য ঐকান্তিক-ভাবে বাস্তবনির্ভর; বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্টি-শীলতার অভিকেন্দ্রে অন্যান্য অনুভূতির মতন যৌনচেতনাও অবিচ্ছেদ্য। যৌনানুভূতিকে বাদ দিয়ে জীবনধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি, স্বভাবতই অসম্ভব। সিনেমা, চিত্রশিল্প, বিজ্ঞাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সর্বত্রই যৌনাবেগের জোয়ার বইছে; যত দোষ কেবল সাহিত্যের বেলায়? মিল্টন বলেছেন, 'একটি ভালো বইয়ের প্রচার বন্ধ করা নরহত্যার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।' আইনের অভিভাবকদের, অতএব, সমাজবোধশূন্য তথা শিল্পচেতনা-বিহীন হয়ে এমন কোনো কাজ করা উচিত হবে না যাতে করে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, এ ধরনের 'জাতীয় আত্মহত্যার' দ্বারা জাতীয় জীবন থেকে তথাকথিত অশ্লীলতা বিতাড়িত হয় না। আর, যুগে যুগে সাহিত্যের ইতিহাসে এ কথাও বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে নিছক যৌনতাসম্বলিত বা পর্নোগ্রাফিক সাহিত্য কোনোদিনই কালজয়ী হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে আইন আদালতের ছত্র-ছায়াতলে মুড়ি ও মুড়কি একই দরে চলতে পারে না। এবং তার ফলে সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী কোনো সুফলও পাওয়া যায় না।

উর্ধেন্দু দাশ
আসাম

বনস্পতির বৈঠক

'বনস্পতির বৈঠক'-এর লেখক মহাশয় লিখেছেন তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে—১৯২৮ সালের শেষার্ধে। তিনি লিখেছেন, বাঙলায় তখন "বিগ ফাইব" রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। এদের আগে ছিল দৈনিক "ফরওয়ার্ড" (ইংরেজী) ও দৈনিক "বাঙলার কথা।" পরে রাজদ্রোহের মামলায় জড়িয়ে এ দুটি কাগজ রাতারাতি নাম বদলিয়ে হয় 'লিবার্টি' ও 'বঙ্গবাণী'।

কথাগুলি যেরূপ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লেখা হয়েছে, নাম-পরিবর্তন ও রাজ-রোষ সত্ত্বেও পত্রিকা দুটির প্রকাশ অব্যাহত রাখা তেমন সহজ ছিল না। তদানীন্তন রাজ-সরকারের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামের ফলে ওই পত্রিকা দুটিকে ক' লক্ষ টাকা সরকারে খেসারত দিতে হয়েছিল তার সামান্য পরিচয় এখনও দিতে পারেন ফরওয়ার্ড পাবলিশিং ও লিবার্টি নিউজ পেপার্স লিমিটেডের পরিচালক ডিরেক্টর বোর্ডের মধ্যে জীবিত দুই ব্যক্তি শ্রীপ্রভু-দয়াল হিম্মৎসিংকাজী এবং শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়। উভয়েই সুপরিচিত এটর্নী। ও-সব সংবাদ জানা থাকলে লেখক মহাশয় 'রাতারাতি' নাম বদলাবার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারতেন। অবশ্য সে সব কাহিনী বর্ণনা করবার স্থানই বা কোথায়?

আরও লিখেছেন, "এ দুটি কাগজে যারা কাজ করত তারা আমাদের বন্ধু।"

এতগুলি নাম ও নামহীন বন্ধুর মাঝখান থেকে তিনি তাঁর অন্যতম বন্ধু, প্রেমেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে লিখেছেন।

"ওদেরই মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল প্রেমেন 'বঙ্গবাণী'তে সাব-এডিটর কিংবা প্রুফ-রিডার হয়ে। যাহোক একটা চাকরি ছাড়া তার কোনওদিনই চলে না। সে ছা-পোষা। মাইনে ছিল নামে ষাট টাকা। কিন্তু ক্রমশ অবস্থা এমনিই হয়েছিল যে কর্তারা মাইনে যোগাতে পারতেন না।"

অতগুলি বন্ধুর মধ্যে একজনকে উপলক্ষ্য করে লেখকমহাশয় যে ভাষায় এবং যেরূপ ভঙ্গিতে মন্তব্যসহ তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন, কোন বন্ধুর পক্ষে কি তা সম্ভব!

তদানীন্তন দৈনিক 'বাঙলার কথা' ও 'বঙ্গবাণীর' সম্পাদকরূপে আমি প্রবোধ-বাবুর মন্তব্য আপত্তিকর ও শালীনতা-বর্জিত মনে করি।

'বাঙলার কথা' প্রকাশের প্রথম দিন থেকে 'বঙ্গবাণী' প্রকাশের শেষ দিন পর্যন্ত প্রেমেনবাবু সহকারী সম্পাদক-রূপে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। যা হোক একটা চাকরি ছাড়া কোনও দিনই চলে না।—এরূপ লোকেরা পোস্টাপিসে বা সেনাবিভাগে কাজ করতে পারে, সেকালের বিপদসংকুল পথে সহযাত্রী হয়ে সামান্য টাকার চাকরি করতে যায় না বা চায় না। ক্রমশ আমাদের অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছিল তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। "কর্তাদের" উপর কোনও অভিযোগ কর্মীদের তখনও ছিল না, এখনও নেই।

গোপাললাল সান্যাল
কলিকাতা-২০

রবীন্দ্রসঙ্গে ডেম সিবিল থর্নডাইক

উজ্জ্বল মজুমদার

সিবিল থর্নডাইক নব্বই বছর অতিক্রম করে গেলেন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী এই মহিলা পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকেও বৃদ্ধ বয়সে অভিনয় করে অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বয়সের জীর্ণতাকে তুচ্ছ করে তাঁর জীবনীশক্তি নাট্যপ্রেমকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। জীবনরঙ্গমঞ্চেও তাঁর ব্যক্তিত্ব যে-কোনো সাহিত্য-রসিক—বিশেষত নাট্যরসিকের কাছে লোভনীয় সম্পদ বলে মনে হয়েছে।

লিখবো না বাঁচবো—এই সমস্যা যেমন প্রত্যেক সৎ-শিল্পীকে পীড়িত করে—তেমনি তাঁকেও করেছিল। অল্প বয়সে বেনভেনুতো চেল্লিনির রোমাঞ্চকর আত্মজীবনী পড়ে থর্নডাইকের মনে হয়েছিল বোধ হয় কারুর জীবনই একঘেয়ে নয়। কারুর জীবনই স্তব্ধ হয়ে নেই। প্রত্যেকেরই জীবনে বিকাশ আছে। বিকাশের মুহূর্তে মুহূর্তে রোমাঞ্চ আছে। সকলে সে রোমাঞ্চকে ধরে রাখতে পারে না, লিখে রাখতেও পারে না। লিখতে পারলে খুবই ভালো হয়। সেই থেকেই তাঁর সংকল্প ছিল জীবনের কথা লিখে রাখতে হবে। বিয়ের পর স্বামী—অভিনেতা ও প্রযোজক—লুইস ক্যাসন তাঁকে সেই আত্মজীবনী রচনার জন্য বার বার অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, প্রকাশিত হোক আর নাই হোক, লিখতে হবে। তাতে বুকের গভীর বেদনার ভার কমবে। জীবন অনেক স্থিতিশীল হবে, শান্ত হবে, জীবনীয় হবে।

কিন্তু লিখবো লিখবো করে সিবিলের ষাট বছর বয়স হয়ে গেল। একটি লাইনও লেখা হলো না। অসংখ্য মানুষ, প্রতিভাধর মানুষ, অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক, লেখক, নাট্যকার, সংগীতকার আর রাশি রাশি বই তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুললো। সংসার বাড়লো, নাতি-নাতনির কলগুঞ্জনে বৃহৎ পরিবার বহু মানুষের মেলায় সপ্রাণ হয়ে উঠলো। জীবনমোহে মুগ্ধ হয়ে সিবিল ভাবলেন, জীবন যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে, সংসারের ধারাসূত্রটি যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে, তখন আর লিখে কী হবে! জীবনটাই তো সেই মহৎ শিল্পস্রষ্টার বৃহৎ রচনার অংগ।

পঁয়ষট্টি বছর বয়সে একবার কলম ধরেছিলেন। কলম ধরে যখন বংশপরম্পরার সূত্র ধরে শুরু করতে গেলেন, তখন দেখলেন প্রপিতামহদের ঠিকুজী উদ্ধার এমনই সময়সাপেক্ষ অথচ আকর্ষণীয় কাজ যে এই বয়সেই তার সেই মগ্নতা থেকে উঠে এসে নিজের জীবনবিকাশের সূত্রটিকে ধরতে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তার চেয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া ভালো। তাই হঠাৎ যখন চেরিং ক্রসে ওয়াটারগেট রঙ্গমঞ্চের পরিচালিকা এলিজাবেথ স্প্রগ তাঁর জীবনী লিখবেন বলে সাহায্য চাইতে এলেন, তখন তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বলে ফেললেন 'Oh you do it, like the angel you are, and leave me to get on with my life and work.'

এইরকম একজন জীবন-প্রেমিকের সঙ্গে সৌভাগ্যবশত আর এক জীবন-প্রেমিকের পরিচয় ঘটে গেল ১৯২০ সালে। তিনি ভারতীয় কবি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁর নাম ইওরোপে-আমেরিকায় বিশেষ-ভাবে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর জীবন-প্রেম একটু অন্যরকম। এই প্রেমের অর্ধেক উপভোগ, অর্ধেক রচনা। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'পদ্মের বীজকোষ এবং তাহার দলগুলির মতো একত্র রচিত আমার জীবন ও কাব্য-গুলিকে একসঙ্গে দেখাইতে পারিলে সে চিত্র ব্যর্থ হইবে না।' তাঁর কাছে জীবন হলো পদ্ম আর শিল্পসৃষ্টি হলো পদ্মের বীজ-কোষ-উদ্ভিন্ন দলবিকাশ। জীবন আর সৃষ্টি মিলিয়ে তাঁর জীবনপ্রেম। কিন্তু কিছু মানুষ তো থাকেন যাঁরা পরের শিল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। কবিতায় কণ্ঠ দেন, সংগীতে মন-প্রাণ সমর্পণ করেন, নাটকে জীবন দিয়ে জীবন রচনা করেন। সিবিল এই ধরনের মানুষ। স্রষ্টার পক্ষে এইরকম শিল্পীর প্রয়োজন হয়। নিজের রচনাকে তিনি দেখতে চান। আর শিল্পী তো এই রকম স্রষ্টা ছাড়া বাঁচতেই পারেন না। কিন্তু সিবিল সেইরকম স্রষ্টাকেই চেয়েছিলেন যাঁর মধ্যে রোমাঞ্চ আছে, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যিনি জীবনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চান, বাঁধা ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসেন, জীবনকে বারবার গড়ে তোলার মতো গভীর স্নেহ যাঁর মধ্যে অফুরন্ত। সিবিল বলেছেন, এই ধরনের শিল্পীরাই 'break[illegible] of the mould'। লুইস ক্যাসন সেই breakers-দের মধ্যে পড়েছিলেন বলেই তাঁকে জীবনসঙ্গী রূপে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্যাসন ছাড়া এই রোমাঞ্চকর প্রতিভার কিছু কিছু আদর্শ তাঁর জীবনে ছিল। বাস্তব জগতের অ্যাডভেঞ্চারার থেকে শুরু করে অধ্যাত্মজগতের অ্যাডভেঞ্চারার পর্যন্ত অনেকেই তার মধ্যে পড়েন। এবং আশ্চর্যের বিষয়, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অন্যতম। তাঁর জীবনীকার সিবিলের কাছ থেকে শুনে লিখছেন :

As long as she can remember, Sibyl has wanted to escape from life's confines, to 'break the mould,' as she puts it, when speaking with reverence and envy of the great explorers, whether in earthly or spiritual realms. It might be Sir Francis Young-husband or Sir Edmund Hillary or the astronauts,

Euripides or Rabindranath Tagore, Teilhard de chardin or even Jesus Christ himself; they are all 'breakers of the mould' to her, and this is the quality which of all others she most admires. As soon as she met Lewis she knew instinctively that he too was an explorer—as h remained for the whole of his life (Sybil Thorndike Casson by Elizabeth Spriggi, London, Victor Gollanz Ltd., 1971, Page 76).

বোধ হয় রবীন্দ্রকাব্যের মানব নির্ভর আধ্যাত্মিক চেতনা, রবীন্দ্রনাথের নাট্যকলাগত স্বাধীন চিন্তা ও প্রথামুক্ত নাট্যরচনা, রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী সভ্যতার নির্ভীক সমালোচনায় সিবেলের কাছে রবীন্দ্র প্রতিভা দুঃসাহসিক বলে মনে হয়েছিল।

যাই হোক, ১৯২০ সালের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। এবার যখন রবীন্দ্রনাথ ইওরোপ হয়ে ইংল্যাণ্ডে গেলেন, তখন ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ বিধ্বস্ত। তার ওপর স্বদেশে ব্রিটিশ অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। কেদারনাথ দাশগুপ্ত-পরিচালিত ইসট্ অ্যান্ড ওয়েসট্ সোসাইটির উদ্যোগে লণ্ডনের যে ক্যাক্‌সটন হলে রবীন্দ্রনাথ আট বছর আগে সাধনার বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানেই রবীন্দ্রনাথ এবারও হাজির হলেন। ইংল্যাণ্ডের বিদ্বৎসমাজ রাজনৈতিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের আগমনকে তেমন সুনজরে দেখলেন না। তবু সেই ক্যাকসটন হলেই তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন হলো (২২শে জুন? ১৯২০)। ভারতসচিব মন্ট্যাগুর ভূতপূর্ব আনডার সেক্রেটারি চার্লস রবার্ট সভাপতি হলেন। মিস্ টাব্‌স্ চারটি রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন পাশ্চাত্ত্য সুরে। এই উৎসবের জন্য লরেন্স্ বিনিয়নের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন তখনকার বিখ্যাত অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক। থর্নডাইক ও তাঁর স্বামী লুইস কাসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম আলাপ। থর্নডাইক তখন ওল্ডভিক ছেড়ে এসে পল ক্লোদ্যালের 'দ্য হস্টাজ' এবং গিলবার্ট মারের ইউরিপিদিসের অনুবাদ নাটকে হেকুবা ও মিডিয়ার অভিনয় করে শেকস্‌পিয়রীয় নাট্যাভিনয়ের সুনামকে অব্যাহত রেখে চলেছেন। সেই প্রথম আলাপের স্মৃতি-চারণা করতে গিয়ে বলেছেন:

'After that, whenever he came to England he sought us out and we had long talks which added to my passionate interest in India.

এ মন্তব্যটি করেছেন ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। কিন্তু ১৯২০ সালের পর রবীন্দ্রনাথ অ্যামেরিকা থেকে ১৯২১ সালে ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন প্যারিস যাবার পথে মার্চ মাসে। দিন পনের ছিলেন

ডেম সিবিল থর্নডাইক

ইংল্যাণ্ডে। সে সময়ে ভারতীয় ছাত্রসভায় পূর্ব-পশ্চিমের মিলন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সময় হয়তো থর্নডাইক ও ক্যাসনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে থাকবে। কিন্তু সে সাক্ষাতের কোনো বিবরণ আমরা পাই নি।

১৯২৬ সালে ইটালি থেকে সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রানস্ হয়ে আবার রবীন্দ্রনাথ এলেন ইংল্যাণ্ডে। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে তিন সপ্তাহ তিনি ছিলেন। সময়টা হলো জুলাই-এর শেষ থেকে অগাস্ট-এর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। কিছুদিন আগে থেকেই তখনকার জনপ্রিয় মহিলা নাট্যকার ক্লেমেন্স ডেন-এর লেখা Granite নামে একটি নাটকে থর্নডাইক ও ক্যাসন খুব ভালো অভিনয় করছিলেন। এই সুন্দর নাটকটি অনেকেই দেখতে এসেছিলেন এবং প্রশংসা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে সিবিল বলছেন:

Another person who rather surprisingly came to see **Granite** was Rabindranath Tagore. Lewis and I had been friends of his for years, ever since I recited the poem. Lawrence Binyon wrote to welcome him to England....One morning I went to his hotel at about eight o'clock, and he was there with a number of his fascinating Indian professors and talked to me about theatre.

That night he came to see the play with his professors, and afterwards came on the stage and talked about what theatre should mean in the life of the people. It was wonderful, and the stage hands, who always dash away the moment the curtain comes down, all stayed and listened entranced. Afterwards I joined a dramatic society that doing the plays of Kalidas, who is the **sort of Shakespeare of India. I re-**

member having a bit of difficulty with my sari. We had darling Indian ladies to help us, and I asked the one who was dressing me for a safety pin, but she said my tummy would keep it up.

এর পরে অভিনয়ের সময়ে যে করুণ অথচ কৌতুকময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে তার বর্ণনা তাঁর মুখ থেকেই শোনা ভালো :

Well, my muscles weren't like Indian ones, and in the middle of my most impassioned speech I felt the whole thing slipping. I clutched myself round my tummy, and the next day one of the notices said, 'It was a most original way of showing emotion, but we felt something very true come from right down in her middle.' (Sybil Thorndike Casson by Elizabeth Sprigge, Pp. 177-178).

এই রবীন্দ্রভক্ত অভিনেত্রী ও তাঁর স্বামী ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই। তাই ১৯৫৫ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে যখন তাঁদের ভারত-ভ্রমণের ব্যবস্থা হলো তখন তাঁদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা যেন সার্থক হলো। তাঁর জীবনীকার স্প্রিগ লিখেছেন :

"This was to offer them their heart's desire. They had grown passionately interested in India, and Indian theatre, ever since their meeting, nearly thirty years earlier, with Rabindranath Tagore.'

তারপর ক্যাসন দম্পতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরেছেন। বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ভারতীয় নাটক ও অভিনয় পদ্ধতি দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। ফুটপাথবাসী মানুষের দুর্দশা যেমন দেখেছেন তাঁরা, তেমনি দেখেছেন কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয়—সৌন্দর্যের শীর্ষতম মুহূর্ত। রবীন্দ্রনাথের দেশকে তাঁরা নানা কারণেই ভুলতে পারেন নি।

তাই যখন রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় এগিয়ে এলো, তখন লণ্ডনে ভারতীয়দের রবীন্দ্র স্মরণোৎসবে প্রায়ই দর্শক ও শ্রোতার আসনে এই অশীতিপর দম্পতিকে দেখা গেছে। ১৯৬০ সালে ৪ঠা মে লণ্ডন মজলিস, দা ইণ্ডিয়া লীগ, ওয়াই এম সি এ, ভারতীয় ছাত্র পরিষদ এবং বেঙ্গলী ইনস্টিট্যুটের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' (ইংরিজি মন্তব্য ও টীকাসহ) অভিনীত হলো সেণ্ট প্যানক্রস টাউন হলে। সেখানেও প্রধান অতিথি রূপে সিবিল থর্নডাইকের উপস্থিতি সকলকে প্রেরণা দিয়েছে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব কমিটি যে বুলেটিন প্রকাশ করেছিলেন তাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্র নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে শতবার্ষিক উৎসব পালনের সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচী ছাপা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে এই উৎসব-যাপন প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল ডেম সিবিল থর্নডাইক এবং তাঁর স্বামী লুইস ক্যাসন রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ের চেষ্টা করছেন। যদি ব্রিটিশ কাউন্সিল সম্মত হন, তাহলে ১৯৬১-৬২ সালের শীতকালে তাঁদের প্রযোজনায় এই অভিনেতৃ-দল ভারতে এসে অভিনয় করবে।

এই বুলেটিনেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটক অভিনয়ের যে মহড়া চলেছে তার একটি তালিকা রয়েছে। ইংল্যাণ্ডের প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে : Chitra proposed to play by Thorndike and Casson.

কিন্তু চিত্রা বা চিত্রাঙ্গদা ছাড়াও বোধ হয় বিসর্জন নাটকও এই উপলক্ষে অভিনীত হয়েছিল। কারণ The Bermingham Post-এর একটি ছোট খবরে (24th January, 1961) বেরিয়েছিল :

In May, Tagore's birthday month, the old Vic is to stage his play Sacrifice..... an entertainment will be brought to London from Tagore's University of Shantiniketan.

ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে যেমন ক্যাসন ও থর্নডাইক এর প্রযোজনায় রবীন্দ্র-নাটকের অভিনেতৃ দল ভারতে আসে নি। তেমনি শান্তিনিকেতন থেকেও কোনো দল শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে লণ্ডনে যায় নি। কিন্তু Old Vic যে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক অভিনয় করেছিল, তাতে থর্নডাইক ও ক্যাসন অভিনয় করেছিলেন বলেই মনে হয়। কারণ ১৯৬১ সালের ১৫ই মে লণ্ডনে Daily Telegraph কাগজে সম্পাদককে লেখা এক চিঠিতে শ্রীরজত বিশ্বাস লণ্ডন N. W. 3 থেকে লিখছেন বিসর্জনের অভিনয় প্রসঙ্গে :

In the English version of this play Lewis Casson, John Stride, Sybil Thorndike, Barbara Jefford and others succeeded in creating the atmosphere vividly. I wish the Old Vic actors were invited to India to give dramatic performances from Tagore.

১৯৬৬ সালে বেঙ্গলী ইনস্টিট্যুট ভারতীয় ও ইংরেজদের মিশ্র অভিনয় পরিকল্পনার মাধ্যমে ডেভিড কেনের পরিচালনায় বিসর্জন নাটকটি লণ্ডনে অভিনয় করে। সেই প্রসঙ্গে সংবাদ দিতে গিয়ে যুগান্তর পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি ১৯৬১ সালের Old Vic-এর নাট্য-গোষ্ঠীর রবীন্দ্র নাটক অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং থর্নডাইক ও ক্যাসন যে বিখ্যাত নট-নটীদের দিয়ে নাট্যপাঠ বা প্লে-রীডিং করিয়েছিলেন সে কথারও উল্লেখ করেছিলেন।

নব্বুই বছর অতিক্রম করে জীবনশিল্পী সিবিল এখন বলছেন : যখন আমার প্রায় একশো বছর বয়স হবে, তখন নিজের কথা আর ভাববো না। শুধু ভালোবাসা স্বামীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা, নাতি-নাতনি আর তাদের শিশু সন্তানদের কথা। ভাববো সেই সব চমৎকার বন্ধুজনদের কথা এবং যে আশ্চর্য উদ্বেলিত জীবন কাটিয়ে এসেছি তার কথা। আরও যে অজ্ঞাত রোমাঞ্চময় ভবিষ্যৎ এগিয়ে আসছে তার কথা।

লাওনেল হ্যারিস সিবিলকে প্রশ্ন করেছিলেন : 'জীবনকে যৌবন বলে ভাবেন কী করে এই বয়সে?' উত্তরে বলেছিলেন : 'I think people forget that after a certain age you have to start generating your own electricity.' বোধ হয় এই স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎগর্ভ জীবনের স্পর্শ পেয়েই রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছে : সত্যের সে পায়/আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।/কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে./শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে/আপন ভাণ্ডারে।

॥ ২৫ ॥

প্রাত প্রত্যুষে খড়মের শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। বারীন ঘোষ এক পেয়ালা গরম চা হাতে নিয়ে তেতলা থেকে নেমে আসছেন। আমি নিচের ঘরে ন্যাড়া তক্তা-খানার উপর সারারাত পড়ে থাকি। এটা আমার আপিস-ঘর। দরজাটা খুললেই মোহনলাল স্ট্রীট।।

চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে বারীনদা পরিহাস করেন, রাত জেগে কোন্ উর্বশী-মেনকার কথা ভাবছিলে?

ভোরবেলা হাসির ঝড় তুলে বারীনদা আবার ওপরে উঠে যান। এরই মধ্যে তাঁর স্নান, যোগধ্যান ইত্যাদি সবই সারা হয়ে গেছে। বারীনদার দিদি সরোজিনীরও তাই। তিনিই রান্নাবান্না করেন, বারীনদাও প্রায়ই নিজের হাতে টোস্ট, অমলেট ও চা প্রস্তুত করে নেন। প্রাতঃরাশের পর বারীনদা সংবাদপত্র ও পড়াশুনো নিয়ে বসেন। বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে তাঁদের আহারাদি শেষ হয়ে যায়। বেলা বারোটা পর্যন্ত বারীনদার বিশ্রাম। তারপর লেখাপড়া নিয়ে আবার বসে যাওয়া। তখন আবার চা।

এখন 'বিজলী'র চাকাটা কিছু ঘুরেছে। পাঁচজন সম্পাদকের মধ্যে দুজন উদাসীন, শুধু নলিনী সরকার লেখেন একটা ফীচার, নাম—'চাটিম চাটিম'। সেইটুকু লিখেই তিনি খালাস। আমি মরেছি! সমস্ত কাগজ-খানাই আমার হাতে—আমি যা করি। বারীনদা ছোট ছোট পুস্তিকা ও 'আত্মকথা' লেখা নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় লেখাও লিখতে সময় পান না। ফলে একা-ধারে আমি হয়ে উঠলুম 'বিজলী'র সম্পাদক, প্রুফ রীডার, প্রবন্ধলেখক, কেরানি—সবই। লোকে জানছিল বারীনদা যোগতপস্বী এবং রাজনীতিক নেতা, আর আমি হলুম বিজলীর সর্বেসর্বা! সব চিঠি, সব লেখা, সকল দর্শনার্থী, সকলের সলা-পরামর্শ শুধু আমাকেই ঘিরে। আমার মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, চার সপ্তাহে নাকি এক মাস, সুতরাং কিরণবাবু প্রতি সপ্তাহে শনিবারে আমার হাতে পাঁচটি করে টাকা দেন।

আমি শ্যামবাজারের ভিতর মহলে এক পাইস-হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সারি। এক আউন্স কাগজমোড়া খাঁটি মাখন এক আনা, এবং দশ পয়সার মধ্যে ভাত, ডাল, ভাজা, ছ্যাঁচড়া, মাছের ঝোল, দাগা মাছের বা ডিমের কালিয়া। পাতি লেবু ও চাটনি ফাউ। আমার বাঁধা বাজেট চৌদ্দ পয়সা। আমার সঙ্গে বসতো বাজারের ফড়ে, আলু-ওলা, মনোহারী দোকানের চাকর, বাস ও ট্রামের ড্রাইভার ও কনডাকটর, পুরনো কাগজ বিক্রির লোক, পান-বিড়িওলা, আর জি কর হাসপাতালের মজুর, মদের দোকানের বিক্রেতা, জেলে দু-চারজন, উল্টো-ডিঙির নৌকার মাঝি-মাল্লা ইত্যাদি নানা লোক। ভোজের আসর নানা গল্পে মশগুল হয়ে উঠত। ওরই মধ্যে এক-আধ দিন আমার ঘাড় ভেঙে খেতে বসে যেত নজরুল আর শৈলজানন্দ আর ভবানী মুখুজ্যে এবং আমার সহবাসী রতিকান্ত আর অনিল ভটচায। সেদিন আমার সর্বনাশ! আমার বাজেট মেলাতে প্রাণান্ত।

'বিজলী'তে তখন নিয়মিত বেরোচ্ছিল নজরুলের রাজনীতিক ও সামাজিক হাসির কবিতা। পরে এই কবিতাগুলি একত্র করে 'চন্দ্রবিন্দু' নামে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া বেরোচ্ছিল অচিন্ত্যর 'বিবাহের চেয়ে বড়', শৈলজানন্দর 'সেবাদাসী', বুদ্ধদেবের কবিতা ও নাটিকা একটির পর একটি।

অচিন্ত্য তার বিয়ের আগেই উপরোক্ত ধারাবাহিক উপন্যাসটির নাম দিয়েছিল 'বিবাহের চেয়ে বড়'। সে এনেছিল 'কল্লোল-সাহিত্যে' নতুন ঢং। তার সবই নতুন। নতুন এবং মৌলিক ছাড়া তার অন্য চিন্তা নেই। সে পুরনো সাহিত্যের নবতম ঐতিহ্যবাহী নয়, সে আনকোরা নতুন। শব্দচয়নে, বাক-ভঙ্গিতে, বিশুদ্ধ ব্যাকরণিক ভাষা প্রয়োগে, অভিনব প্রকাশভঙ্গিতে—সে আগাগোড়া মৌলিক। ইংরেজি ও সংস্কৃতে সে পণ্ডিত। কথায় কথায় সে বানান ভুল করে না। 'বিবাহের চেয়ে বড়' রসিক পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হচ্ছিল।

'বিজলী'র বাড়ির নিচের তলায় আমার আপিসের পাশের ঘরে থাকেন বারীনদার রাঙা-মা। ইনি অপরিসীম রূপলাবণ্যময়ী এক বৃদ্ধা। মুখে দু পাটি দাঁতই নেই, চোখে মোটা আতস কাঁচের চশমা। বারীনদা ও সরোজিনী যখন তাঁদের পাগলিনী জননী স্বর্ণলতার উৎপীড়নে প্রায় আধমরা—তখন বারীনদার বয়স বছর দশেক এবং দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্বর্ণলতা যখন দেও-ঘরের 'রোহিণী' অঞ্চলে উন্মাদ অবস্থায় প্রায় নির্জনবাস করছেন, সেই সময় খুলনার এক তালুকদার চিন্তামণি গুহ চৌধুরী রোহিণীতে গিয়ে কয়েকজন স্থানীয় গুণ্ডার সহায়তায় বালক বারীনদাকে হিঁচড়িয়ে টানতে টানতে এক আমবাগানে নিয়ে আসেন, এবং পূর্বব্যবস্থা মতো এক পালকিতে চড়িয়ে ও পরে ট্রেনযোগে কল-কাতায় এনে যে তরুণী বালবিধবার কাছে গচ্ছিত করেন, তিনিই এই রাঙা-মা! রোহিণীতে বারীনদাকে অপহরণের কালে স্বর্ণলতাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য এক গোছা ফুল উপহার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই পুত্র অপহরণের দৃশ্য দেখে উন্মত্ত হয়ে তিনি ঘরের ভিতর থেকে মস্ত ছোরা নিয়ে গুণ্ডার দলকে তাড়া করে ছোটেন। সেটা বোধ করি ১৮৯০ খৃস্টাব্দ।

যাই হোক, সমস্ত ব্যবস্থাটা ছিল পূর্ব-কল্পিত। তৎকালে বিলাতফেরত এম-ডি পাস-করা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন খুলনার সিভিল সার্জেন। তিনি ছিলেন খাস সাহেব। বিলাতের বহু ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁর তিনটি ছেলে—বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও অরবিন্দ তখন বিলাতে পড়াশুনো করে। কৃষ্ণধন ঘোষের স্ত্রী স্বর্ণলতা সন্তান প্রসবের

প্রাক্কাল থেকেই মস্তিষ্ক বিকারে প্রায়ই ভুগতে থাকেন। সেই অবস্থাতেই একেকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সর্বশেষ সন্তান বারীন ঘোষের জন্মকালে লণ্ডনের পথে 'ইংলিশ চ্যানেলে প্রবল ঝড়ের সময় জাহাজের মধ্যে উন্মাদিনী স্বর্ণলতার প্রসববেদনা দেখা দেয়, সেই কারণে নবজাত সন্তানের নাম রাখা হয় বারীন্দ্রকুমার। বারীনদা ভূমিষ্ঠ হন লণ্ডনের উপকণ্ঠে নরউডে। অতঃপর স্বর্ণলতা আপন খেয়াল অনুযায়ী ক্রয়ডনের বার্থ রেজিস্ট্রেশন আপিসে বারীনদার নতুন-নামকরণ মুদ্রিত করেন—'ইম্যানুয়েল ম্যাথিউ ঘোষ!'

সেই দেশবিশ্রুত সিভিল সার্জেন ডাঃ কে ডি ঘোষের উপপত্নী হলেন এই বালবিধবা রাঙ্গা-মা। দশ বছর বয়সে বারীনদাকে এই রাঙ্গামার কাছে এনে দেন পূর্বোক্ত চিন্তামণি ভক্ত, আড়াল থেকে সহায়তা করেন পিতা কে ডি ঘোষ। এই রাঙ্গা-মার সম্বন্ধে বারীনদা এক জায়গায় বলেছেন, "নিচে ছুটে এসে আমায় কোলে তুলে নিলেন এতক্ষণের রহস্যের রাঙ্গামা ...দীর্ঘছন্দ সবল বলিষ্ঠ দেহ, অপূর্ব রূপ সারা যৌবনসুঠাম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। বয়স আন্দাজ আঠারো উনিশ...কলকাতায় বাবা থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা যেতুম গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে খোলা ফিটনে বসে। আমার বাবা টিপ-টপ সাহেব। তাঁর পাশে রাঙ্গামা বসতেন বুক-খোলা গাউন পরে নানা ফুল-ফলে ভরা লেডিজ হ্যাট মাথায় দিয়ে রুমাল হাতে...রূপসী মা ইডেন গার্ডেন আলো করে চলতেন তাঁর সম্রাজ্ঞীর মত লাবণ্যে ও শ্রী-গরিমায়...এই মা আমার বাবার শূন্য জীবন সুখের প্লাবনে ভরে দিয়ে তাঁর ভাঙ্গা সংসার আবার গড়ে তুলেছিলেন..."

রাঙ্গামাকে কোথা থেকে যেন বারীনদা এনে তুলেছেন এই ঘরে। আমি তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি মেঝে থেকে প্রায় কড়িকাঠ পর্যন্ত পুরনো বই আর কাগজপত্রে ঠাসা—এমনই ঠাসা যে ওই বৃদ্ধার পক্ষে বাকি জায়গাটুকুতে রান্না করা ও রাত্রিবাস এক-প্রকার অসম্ভব। উনি সমস্ত দিনমান ও মধ্যরাত্রি পর্যন্ত একমনে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি বই, কাগজ ও সাময়িক পত্রাদি তন্ময়তার সঙ্গে পাঠ করেন। শুনেছুম, বিগত দেড়শ বছরে যত মূল্যবান বাংলা বই ও কাগজ বেরিয়েছে ওঁর ভাঁড়ারে সব মজুত।

আমি দিনে দু-তিনবার রাঙ্গামার পান ছেঁচে দিতুম, এবং তাঁর রান্নাবান্নার জন্য টুকিটাকি এটা ওটা কিনে আনতুম। রাঙ্গা-মার মুখে নিত্যপ্রসন্ন হাসি যেন ঝলমল করত। উনি কিশোরী জীবনে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবীকে এবং স্বামী বিবেকানন্দর সকল খবর উনি রাখতেন। সকল ঘটনাই ওঁর মনে আছে।

বারীনদা যে কয়টি কারণে পণ্ডিচেরী ছেড়ে চলে এসেছেন, তার অন্যতম হল তাঁর এই রাঙ্গামার শেষ জীবনের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। নিজের জননী নয়, কিন্তু তাঁর পিতার এই নিঃসন্তান উপ-পত্নীর নিকট তিনি সেই দুর্লভ মাতৃস্নেহ লাভ করেন। অথচ একই বাড়িতে তিনতলার উপরে থেকেও বারীনদার দিদি সরোজিনী এই বৃদ্ধার প্রতি বিরূপ ছিলেন। দিদির ধারণা, আমি তাঁর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল, ভক্তিমান এবং অনুরক্ত। কেননা তিনি যখন তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিচিত, আপন-পর ইত্যাদি সকলের নিন্দায় মুখর হতেন, আমি হাসামুখে সেগুলির থেকে রস পেতুম। তিনি একদা প্রতাপ নামক এক যুবকের সহিত কি প্রকার নিবিড় প্রণয়ে আসক্ত হয়েছিলেন এবং সেই যুবক অব-শেষে কীভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়, এটি আমাকে আনুপূর্বিক শুনতে হয়েছিল। দিদি এক সময়ে তাঁর সেজদা শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে কিছুকাল ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিচেরী ত্যাগ করার সময়ে তিনি শ্রীমা-র প্রতি অপ্রসন্ন মন নিয়ে ফিরে আসেন।

আমি একপ্রকার অমায়িক সৌজন্যের মুখোশ পরে নিরিবিলি এক-এক সময়ে তাঁর কাছে বসতুম। আমার চেয়ে তিনি হয়ত তিরিশ বছরেরও বেশী বড়, কিন্তু আলাপ-চারীতে বয়সের পার্থক্য ভুলে তিনি অন্তরঙ্গের মতো কথা বলতেন। তিনি যাদের কথা বলতেন, তাদের অনেকেরই নাম আমার শোনা। বাঙ্গালার সমাজ জীবনে তারা নিতান্ত অপরিচিত নয়। কেউ তাদের মধ্যে আজও বেঁচে আছে, কেউ বা নেই।

দিদির আলোচ্য বিষয় ছিল, কে কাকে ঠকালো, ফাঁকি দিল, কে কাকে পথে বসালো, কোন্ ব্যক্তি তার মামাতো বোনকে নিয়ে সরে পড়লো, কোন্ মেয়ে তার ভাসুরের সঙ্গে নষ্ট, কোন্ স্বামীর সঙ্গে কোন্ স্ত্রীর মুখ দেখাদেখি বন্ধ—এ সবের আনুপূর্বিক কাহিনী এই প্রবীণা মহিলার মুখে শুনতে শুনতে আমি অবাক হতুম। এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা। আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতুম, আমাকে এগুলো বলবার জন্য দিদি অবসর খুঁজে ফিরতেন এবং আমি প্রায়ই তাঁকে এড়িয়ে চলতুম। তাঁর হাতে এবং ঠোঁটে একটু শ্বেতী রোগ ছিল। বারীনদারও পায়ের দিকে ছিল এই রোগের চিহ্ন। প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ বসুর গোষ্ঠিতে এবং ঘোষ বংশের ধারায় কিছু কিছু ব্যাধি ছিল যাকে বলা চলে 'হেরি-ডিটারি'। এঁদের বংশে ও গোষ্ঠিতে এক-দিকে যেমন হাঁপানি, যক্ষ্মা, শ্বেতী, মস্তিষ্কবিকার, পাগল বা অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি—তেমনি অন্য দিকে দেখি পাণ্ডিত্য, মনীষা, কাব্য ও সাহিত্য-প্রীতি, চিন্তাশীলতা, জাতীয়তাবাদ দেশ-প্রীতি, সমাজচিন্তা ইত্যাদি। এই একই পরিবারে কবি, সাহিত্যকর্মী, দার্শনিক, দেশসংস্কারক, জনহিতব্রতী, বিপ্লববাদী, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ইত্যাদি বহু দেখা যায়। শিশির ভাদুড়ী এত বড় নাট্যপ্রতিভা, কিন্তু একই রক্তধারায় তাঁর পিসি হয়েছিলেন বদ্ধ উন্মাদ, পিসির মেয়ে আদমবাউড়ো,—আরও কত কি। বারীনদাকে দেখছি স্নেহের কাঙ্গাল হয়ে জন্মেছিলেন। শিশুর মতো তিনি সরল, স্নেহশীলা নারীর মতো তিনি স্বভাব-কোমল। কিন্তু তিনি কবি হয়ে জন্মেছিলেন। গোলাপের মতো সুগন্ধী তাঁর মন। তিনি শুধু ভালবাসতে চেয়েছিলেন, ভালবাসা পেতে চেষ্টা করেছিলেন! নিজেই তিনি বলেছেন, তিনি মনেপ্রাণে অহিংস, তিনি মানবপ্রেমিক। ইংরাজ রাজশক্তির উপর রাগ করে তিনি নিরপরাধ এক একজন ইংরেজকে হত্যা করতে একেবারেই নারাজ!

তবু তিনি হয়ে উঠলেন ভারতের প্রথম বোমার স্রষ্টা। হয়ে উঠলেন এই শতাব্দীর প্রারম্ভকালের বঙ্গবিপ্লববাদীদের অবিসম্বাদী নেতা! বলো, স্নেহপিপাসু, কৈশোরে কাব্যপিপাসু, তারুণ্যে প্রেমপিপাসু, যৌবনে অগ্নিপিপাসু।

পণ্ডিচেরী ছেড়ে আসার আগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যৌগিক দৃষ্টিশক্তিতে বারীনদাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে বলেছিলেন, তুমি ফিরে যেয়ো না, এখানেই তোমার চিত্তের প্রশান্তিলাভ ঘটবে, তুমি এখানেই থাকো, বারীন।

শ্রীমা তাঁর যোগবলে বারীনদার চিত্তশুদ্ধির জন্য বহুতর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় বারীনদাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা পান। কিন্তু আত্মা নিয়তি বারীনদাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। একদা নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন পণ্ডিচেরী থেকে সোজা কলকাতার দিকে।

'বিজলী' নিয়মিতই বেরোচ্ছে, আমি তার কর্ণধার। এমন সময় একদিন শিলঙ থেকে কবি রাধারাণী একখানা কালো বাঁধানো খাতা রেজেস্টারি করে পাঠিয়ে লিখলেন, এর মধ্যে কবিতাগুলি আমার এক বান্ধবী 'অপরাজিতা দেবী'র লেখা। এর থেকে একটি কবিতা 'ভারতবর্ষ'-এ পাঠিয়ে দেবেন।

সেই প্রথম অপরাজিতা দেবী! কয়েকটি কবিতা পড়ে আমার তাক লেগে গেল। শুধু সেদিন আমারই তাক লাগেনি, বারীন-দাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং লেখক সমাজেও একটা কলরব দেখা দিল।

'বিজলী' ও 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক রায়-বাহাদুর জলধর সেনের কাছে অনুসন্ধিৎসু চিঠির পর চিঠি! কে এই মেয়ে-কবি? নামটা তো খুব ইনট্রিগিং? থাকে কোথায়? স্বামী আছে কি? বয়স কত? এমন সুন্দর ছন্দে মেয়েদের মনে মধুর যৌবনরসাস্বাদ আর কোন্ মেয়ে কবে লিখেছে কবিতায়? এ মেয়ে যে প্রতি কবিতায় নিজের শয়ন-কক্ষের শূন্য শয্যার দিকে ইঙ্গিত করে। কে এই রসভাষিণী মধুরহ্লাদিনী?

পরে শুনলুম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একটু নড়ে বসেছেন!

আমার কোনও প্রকার উদ্বেগ বা কৌতূহল ছিল না। আমার কাছে কোনও প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা এলে আমি সোজা শিলংয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিতুম। পরে শুনলুম কবি রাধারাণী ও কবি অপরাজিতা—উভয়েই নাকি হরিহরের মতো একাত্ম। শিলংয়ের নিভৃত পাইনবনকুঞ্জে কৃষ্ণ হয়েছেন কালী, শ্যাম হয়ে উঠেছেন শ্যামা। দুই মিলে এক, একাঙ্গিনী।

আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে যেমন সমগ্র ভারতবর্ষে, তেমনি কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠে লবণহ্রদের অন্তর্গত মহিষ-বাথানে লবণ সত্যাগ্রহ চলছে। ব্রিটিশ কর্তৃ-পক্ষের সামনে নতুন সমস্যা উপস্থিত। চারিদিক থেকে পিলপিল করে এই প্রথম মেয়ে সত্যাগ্রহী বেরিয়ে পড়েছে। তারা পথে পথে, দোকানে ও বাজারে, ভবানীপুরে আর কালীঘাটে, সাহেব পাড়ায় আর লাল-দিঘীতে, কলেজ স্ট্রীটে আর বড়বাজার অঞ্চলে—বাঙলার জেলায়-জেলায় পুরুষের পাশে পাশে তারা। এ দৃশ্য নতুন। দিদিমা থেকে দিদিমণি, বালিকা কিশোরী থেকে কোলের খুকীটি পর্যন্ত। পুলিস যদি ওদের ধমকায় তা হলে দেশী খবরের কাগজে বেরোবে—মারতে এল! মারতে এলে ছাপা হবে মারলো! আর যদি বা দু-এক ঘা বসিয়ে দেয় তবে আর রক্ষা নেই—বোলতার চাকে ঘা! সুতরাং মেয়েদের পিকেটিং, গ্রেপ্তার ও মারমুখী পুলিসের কর্মতৎপরতা দেখার জন্য সর্বত্র জনারণ্য!

ঠিক এমনি সময় ১৮ এপ্রিল সমস্ত ভারতবর্ষকে উচ্চকিত করে একটি যুগান্তকারী সংবাদ এল, "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন"! নেতা বীর অনন্ত সিং, তার সঙ্গে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা দস্তিদার প্রভৃতি বহু অসমসাহসিক তরুণ। তারা চট্টগ্রাম স্টেশনের অস্ত্রাগার লুট করেছে, প্রহরীকে খুন করেছে, কোষাগার ভেঙেছে, এবং পুলিসের নাকের উপর পাল্টা পাঠিয়ে জলালাবাদ পাহাড়ের বনপথে গা ঢাকা দিয়েছে। বাঙলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন হুকুম জারী করলেন, কলিকাতার পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন। চারিদিকে প্রবল জনরব ও আন্দোলন মাথা তুলল।

খবরটা যখন ঠিক বাসি হয়নি সেই সময় একদিন সকালে দুজন মহিলা বুঝি বারীনদার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে উপর থেকে নেমে গলির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। বোধ হয় ওরই মধ্যে বারীনদার জনৈক সহচর অমূল্য আমার কথা ওঁদেরকে বলে থাকবে। আমার নামটা যেন একটু বুড়ো-হাবড়ার বয়সের ইঙ্গিত করে। 'উত্তরা'র ক্যানভাসার হয়ে যখন ভাগলপুরে গিয়েছিলুম তখন শরৎ চাটুজ্যের এক মামা গিরীন গাঙ্গুলী আমাকে দেখে সচকিত হয়ে বলেছিলেন, এ কি, আপনার নাম শুনে আমি ভাবতাম আপনার বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হবে! মাত্র সাড়ে চব্বিশ! অবাক করলেন আপনি!

যাই হোক, [illegible] সকৌতুক মহিলা দুজন আমার ঘরে হঠাৎ ঢুকলেন এবং সেই মুহূর্তেই [illegible] [illegible] আমার জীবনে আরেকটি ধোঁকা দিলেন।

আমার পরনে ছিল ধুতি ও হাত-কাটা বেনিয়ান। অন্তত আমার গায়ে পাঞ্জাবিটা থাকা উচিত ছিল। ওঁরা দুজন মাতা ও কন্যা, দুজনেই অতি সুশ্রী। জননীর বয়স আমার থেকে অপেক্ষা অনেক কম এবং কন্যাটিও দেখে কবির আমার বয়স অপেক্ষা কিছু কম। আমি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ওঁদেরকে নমস্কার করলুম। শুকনো আপিস ঘরটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

আমার নামটি ওঁদের পরিচিত, কিন্তু আমাকে আগে ওঁরা দেখেননি। বোধ হয়

আমার ডাকাবুকো চেহারাটা দেখে প্রথমটা ও'রা একটু থতিয়েই গিয়ে থাকবেন। ওই ফাঁকেই দেখে নিলুম বিধবা ভদ্রমহিলার সুন্দর নধর মুখশ্রীর উপর একজোড়া চশমা—তার ভিতরে দুটি আয়ত কালো চোখ। পরনে ধবধবে মোটা খদ্দরের সাদা থান এবং গলায় বৈষ্ণবদের মতো কণ্ঠী। কন্যার মুখে সহজ পরিচ্ছন্ন হাসি। কপালের সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নেই। ধবধব করছে রং। হাতে সামান্য দু-গাছি সরু সোনার চুড়ি ছাড়া সর্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য। পরনে কোমল বাসন্তী রংয়ের মোটা রাঙা-পাড় খদ্দরের শাড়ি। আধুনিক টয়লেটের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাথার রেশমী চুল পিছন দিকে টানা খোঁপায় বাঁধা। স্বাস্থ্যের দিকে চোখ পড়লে যে কোনও পুরুষের বক্ষোরক্তে আগুনের ফুলকি ওঠে!

কন্যার কণ্ঠ নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ ও স্বচ্ছ। বললেন, আপনার লেখাগুলো পড়ে মনেই হয় না আপনি এত লাজুক। ইনি আমার মা লাবণ্যপ্রভা দত্ত।

লাবণ্যপ্রভা বললেন, এ আমার ছোট মেয়ে শোভা। আমাদের দলের সব মেয়ে মহিষবাথানে কাজে নেমেছে, আবার ভবানীপুরের ওদিকে পিকেটিং করছে। গ্রেপ্তার হয়েছে অনেক মেয়ে।

শোভা বললেন, আপনারা বিজলীতে যে গান্ধীবাদ আর অহিংসার বিরুদ্ধে লিখছেন, এতে আমরা খুব দুঃখিত নয়! আমাদের কাছে এই আইন অমান্য আন্দোলন একটা মুখোশ।

এতক্ষণ পরে মুখ তুললুম। বললুম, কেন?

—আপনি নিজেই বুঝবেন একদিন। শুনুন—শোভা বললেন, মা আমাদের গ্রুপকে পরিচালনা করছেন, কেননা উনি গান্ধীজীর ভক্ত। কিন্তু আমাদের কাজকর্ম একটু অন্য রকম। বারীনদার কাছে সেই জন্যেই এসেছিলুম!

—কী বললেন বারীনদা?

লাবণ্যপ্রভা হাসলেন। শোভা কিন্তু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, এখন সেকালের সেই বারীন ঘোষের বয়স হয়েছে। খোলে আর বারুদ নেই!

লাবণ্যপ্রভা সেদিন আমাকে ও'দের বাড়িতে যাবার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন এবং শোভা বললেন, আসছে কালই আসুন না? দুপুরে আমাদের ওখানে খাবেন? আপনি দেখছি বড্ড মুখ-চোরা!

ও'রা আমাকে হাজরা রোডের একটা ঠিকানা দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন এবং সৌজন্যবশত আমি ও'দের পিছনে-পিছনে চললুম। কয়েক পা এসে শোভা বললেন, আমার সঙ্গে হাঁটবেন না, গোয়েন্দার চোখ আছে আমার ওপর। আচ্ছা আমি যাই, কাল আবার দেখা হবে।

বিষধর জাত-গোখরো লীলায়িত ভঙ্গীতে জননীর পিছু-পিছু এগিয়ে চলল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম পিছন থেকে।

"কাননে যত কুসুম ছিল
ফুটিল তব পায়ে—"

ঘরে এসে একবারটি দাঁড়ালুম। সেদিন ভোর থেকে একটা ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। পাতা তিনেক প্রায় লেখা হয়েছিল। বোধ হয় গল্পটা প্রণয় কাহিনীর দিকেই ঘেঁষতো। কিন্তু আর না এগোয়! এ জীবনে যে ব্যক্তি এখনও কোনও মেয়েকে ভালবাসতে শেখেনি, সে লিখবে প্রেমের গল্প?

ননসেন্স! খাতাখানার থেকে তিনটে পাতা তুলে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে মোহনলাল স্ট্রীটের ফুটপাথে উড়িয়ে দিলুম—"কাননে যত কুসুম ছিল—"

অচিন্ত্যর মতন সংস্কৃত জানলে 'মেঘদূত'খানা আরেকবার ওলটাতুম। একটা শ্লোকের অনেকগুলো শব্দের মানে এখনও বুঝিনে। যেমন "তন্বীশ্যামা শিখরী-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মধ্যেক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ শ্রোণী-ভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্......"

না, ওই অবধি আমার বিদ্যে, এর পরে আর মনে নেই।

সমস্ত সকালটা কী নিয়ে যে কাটল বুঝতে পারলুম না। 'বিজলী'র জন্য কি যেন একটা লেখা লিখতে গেলুম, কিন্তু সব লেখাই মনে হচ্ছিল হিজিবিজি! না, আমি লেখক নই, লিখতে আমি জানিনে। এ যাবৎ যা কিছু লিখেছি সব বাজে, ফাঁকি, রাবিশ। জীবনের সত্য উপলব্ধির সঙ্গে ওগুলোর কোনও যোগ নেই। আমার মধ্যে রয়েছে সাংঘাতিক অতৃপ্তি আর অসন্তোষ। যাদের জীবনে বার বার নৌকা ডুবেছে, হাল ভেঙেগেছে, পাল ছিঁড়েছে, অকূলে ভেসেছে—কই তারা আমার লেখায়? আশাহত, ভাগ্যহত, নিরন্ন, আতুর, পথহারা, সকল পরিচয়হারা—কোথায় তাদেরকে আমি হারিয়ে ফেলছি? কিন্তু ওসব থাক এখন। সকালে ও'দের চলে যাবার পর থেকে আমার ভিতরে যেন রবীন্দ্রনাথ ফেনিয়ে উঠেছিলেন, "বোলো তারে আজ/অন্তরে পেয়েছি বড় লাজ/কিছু হয় নাই বলা, বেধে গিয়েছিল গলা/ছিল না দিনের যোগ্য সাজ/আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে/সেদিন দেখেছ শুধু অমা/বারে বারে অর্ঘ্য মম পূর্ণ হবে প্রিয়তম/আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা—"!

দুপুরবেলা পাইস-হোটেল থেকে ফিরে একটু জিরিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলুম। ও-ঘর থেকে হঠাৎ বারীনদা আমার ওপর আক্রমণ করে এগিয়ে এসে হাসছিলেন। বললেন, ও, এবার বুঝি সেজে-গুজে যাচ্ছ সেই জমাদারনীর ওখানে?

জমিদারনী! বারীনদার বাকভঙ্গিতে আমার দুর্বলতার প্রতি ইশারা ছিল। আমি হাসি রাখে থমকিয়ে বললুম জমাদারনী আবার কে? কী যা-তা বলছেন?

—বটে! আমাকে ক্ষেপাবার জন্য বারীনদা আবার হাসিখুশী মুখে বললেন, ওই যে জমাদারনী তোমাকে দেখবার জন্য সকালে ছুটে এসেছিল! ওর মা ছিল সঙ্গে, তাই বেকায়দায় পড়েছিলে, কি বলো?

—ছিঃ বারীনদা, আপনি একদম উচ্ছন্নে গেছেন!

বারীনদা সুন্দর, সরল ও মধুর হাসি হেসে বললেন, কেন উচ্ছন্নে যাব? নির্মলার ঠ্যাং দুখানা আঁকড়ে ধরে আছি, ওই ধরেই ভেসে থাকব।

—ধিক আপনাকে বারীনদা—আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, ওই পেঁচি-পিশাচী হাড়-পাঁজরা সার নির্মলাকে নিয়ে? আপনার রুচি, আপনার প্রবৃত্তি—

রক্তবিপ্লবের অগ্নিঋষি তাঁর পরিচ্ছন্ন দাঁতের পাটিতে হাসলেন। দু' পা কাছে এসে তেমনি হাসিমুখেই বারীনদা বললেন, তুমি তো নজরুল নও, তুমি বুঝবে কতটুকু? পুরুষের কাম টেনে বার করে কামিনীকে! বিশ্বসৃষ্টির সবচেয়ে বড় সংবাদ সেইটি। নির্মলা কালো

কদাকার কঙ্কাল, কিন্তু ওকে আমার দরকার।

—পথ ছাড়ুন বারীনদা—

ও, বুঝেছি! গাঁট্টা-গোঁট্টা ওই জমাদারনীকে তোমার দরকার, কেমন?

—ওঁকে বার বার জমাদারনী বলছেন কেন?

—গায়ে লাগছে, কি বলো? ওকে দেখলে ভয় করে যে! বারীনদা বললেন, জমাদারনী বলছি সাধে? ওর কাছেই যাচ্ছ নাকি?

বললুম, না, আমি যাচ্ছি আপনার ভাইঝি লতিকার কাছে লেখা আনতে। মনে নেই আজ শনিবার?

বারীনদা হাসছিলেন। তিনি আমাকে অভ্রান্ত নির্বোধ, বিশ্বাসভাজন, নির্ভরযোগ্য এবং কোন কোনও বিষয়ে অপদার্থ মনে করতেন। আমার মুখের উপরকার নির্বিকার চাতুরীকে তিনি অমায়িক সরলতা বলে ভাবতেন।

আমি হাসিমুখে তেতলা থেকে নেমে গেলুম।

ভবানীপুরে স্যার আশুতোষের বাড়ির গায়ে তিনতলা বাড়িটা যেমন সরু তেমনি উঁচু—কংগ্রেস নেতা সুবোধ বসুর চেহারার মতো ছিপছিপে ও লম্বা। তিনি রাজনারায়ণ বসুর ভাইপো। লতিকা হলেন রাজনারায়ণ দৌহিত্র কবি মনোমোহন ঘোষের ছোট মেয়ে। বড় মেয়ে মৃণালিনী। পারস্পরিক খোঁচাখুঁচির ফলে লণ্ডনে ছাত্রী অবস্থায় সুবোধ বসুর সঙ্গে লতিকার বিবাহ হয়। উভয়ের সম্পর্ক নাতনী ও দাদামশায়। এই বিবাহের কিছুকাল পর থেকে সুবোধ বসুর বিভিন্ন চারিত্রিক দুর্বলতা লক্ষ্য করে লতিকার মনে স্বামীর সম্বন্ধে অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। ওঁদের সন্তানাদি হয়নি। কালক্রমে কলকাতায় ফিরে লতিকা বসু স্বামীর নিকট নানাবিধ অর্থনীতিক ও সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে থাকেন।

এই অনন্তযৌবনা সুন্দরী লতিকা বসু আপন রূপরাশি নিয়ে যখন ঝলমল করছিলেন, তখন আমরা তাঁকে দেখছিলুম কলকাতার নানা সমাজকর্মে জনপ্রতিষ্ঠানে, "ফরোয়াড" অপিসে এবং স্কুল-কলেজে। নব্য বাঙলার এই প্রথম যুবনেত্রীকে কেউ কোথাও পথেঘাটে হঠাৎ দেখেছে—এটি ছিল সেদিনের সংবাদের মতো। মাঝে মাঝে আমাদের কল্লোল ও কালি-কলমের অপিস এবং আর্য পাবলিশিং হাউস এই রূপবতী নারীর সম্পর্কে সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব ও অবাস্তব নানাবিধ কল্পিত কাহিনী নিয়ে প্রমত্ত কোলাহলে মুখর হয়ে উঠত। আমরা মাঝে মাঝে নির্ভুল সংবাদ পেতুম, তৎকালীন কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক নেতা কেবল মাত্র দৈহিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে লতিকাকে ছোঁ মেরে নিভৃত নিলয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা পেতেন—আজ তাঁদের অনেকেই মৃত এবং কেউ কেউ এখনও জীবিত! জনৈক যক্ষ্মা চিকিৎসক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কোনও এক অট্টালিকার ওঠা-নামার লিফট-এর মধ্যে লতিকার হাত ধরে টানাটানি করেছিলেন।

এই লতিকার গৌরব-গর্বিত চেহারা দেখেছিলুম ১৯২৮-এর শেষ প্রান্তে কলকাতা কংগ্রেসের কালে—শোভাযাত্রার সর্বাধিনায়ক হিসাবে চিরতরুণ সুভাষচন্দ্র যখন সামরিক পোশাকে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর পুরোধা রূপে কংগ্রেসের নব-নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেই বাহিনীর পিছনে পিছনে বিশাল এক নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর সর্বাধিনায়িকা রূপে অগ্রসর হচ্ছিলেন লতিকা বসু। সেদিনের সেই এক মাইল লম্বা বিরাট শোভাযাত্রার মূর্তিমান আপেলার মতো পরম সুন্দর সুভাষচন্দ্র এবং অপরূপ লাবণ্যে ও গরিমায় শ্রীমতী লতিকা বসু—এঁদের দুজনকে নিয়ে সেদিন লক্ষ লক্ষ বাঙালী পরিবার নানা রসকল্পনায় মেতে উঠেছিল। কলকাতার এই কংগ্রেস অধিবেশনের প্রায় দেড় বছর পরে আমি লতিকা বসুর সংস্পর্শে এসেছিলুম। আমার চেয়ে বয়সে তিনি বছর তিনেকের বড়। দুপুরবেলায় নিরিবিলিতে আমি তাঁর ঘরে ঢুকে বসতুম। বাঙলা ভাষায় তিনি কিছু অপটু ছিলেন এবং বারম্বার আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে ইংরেজিতে বলে যেতেন তাঁর বক্তব্যপূর্ণ রচনা, আর আমি টুকে নিতুম। তিনি ছিলেন তখন প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার মতো। তাঁর উজ্জ্বল যৌবনের প্রাণ-বন্যার সঙ্গে এমন একটি সংযম ও শালীনতার মাধুর্য দেখতুম, যেটি আমাকে বার বার আকর্ষণ করে তাঁর কাছে নিয়ে যেত। যেহেতু আমি তাঁর বয়োকনিষ্ঠ, সেজন্য তিনি কোনও বিষয়ে দ্বিধা ও সংকোচ রাখতেন না, এবং আমারও কোন আড়ষ্টতা ছিল না। তাঁর এক সুবেশা পরিচারিকা আমাদের জন্য চা প্রস্তুত করতেন। তাঁর ওখানেই জনবরেণ্য চিত্রশিল্পী লক্ষ্ণৌ-য়ের অসিতকুমার হালদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষও লতিকার বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন।

শ্রীমতী লতিকা রাজনীতিক নেত্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি কবি কন্যা, উচ্চ-শিক্ষিতা, পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁর চিত্তের উৎকর্ষ এনে থাকবে। তিনি শিক্ষাজগতের মানুষ, রুচি-শীলতা তাঁর সহজাত। সম্ভবত শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর অনুরোধে ডাঃ বিধানচন্দ্র লতিকার বিবিধ গুণপনা লক্ষ্য করে তাঁকে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করে, এবং সুবোধ বসুর নানাবিধ বিরূপ আচরণের থেকে লতিকাকে মুক্ত রাখার জন্য চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের নার্স কোয়ার্টারে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ রায় শ্রীমতী লতিকার সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

তারপর আমরা দেখলুম লতিকা বসু নামলেন রাজনীতিতে সুভাষ চন্দ্রের সহচরীরূপে।

সহচরী!—আমি কৌতুকরঙ্গে হাসছিলুম।

লতিকাও হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ আমার মধ্যে বোধ হয় বারুদ ছিল, উনিই ত আমার মধ্যে ছিটিয়ে দিলেন আগুনের ফিনকি। আমি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলুম। কোথায় ছিলেন ছোটকাকা বারীন ঘোষ, কোথায় রইলেন পিসি সরোজিনী আর কোথায়ই বা রইল দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের কুলাঙ্গার সুবোধ বসু। আমি ঝাঁপ দিলুম আগুনে, সুভাষের রাজনীতিতে!

কথার মধ্যেই উজবুকের মতন আমি সহাস্যে ফোড়ন দিলুম, সুভাষবাবু বোধ-হয় আপনার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়?

—হ্যাঁ, তা হবে—লতিকা বললেন, কিন্তু যাঁর সামনে এসে দাঁড়ালুম তিনি ত' তপস্বী, কঠোর প্রকৃতি এক ব্রহ্মচারী, চির-কৌমার্য ব্রতধারী—। আমি ভয়ে দুর্ভাবনায় সংকোচে জড়োসড়ো।

—তারপর?

হাসছিলেন লতিকা। বললেন, পেতলের

হাঁড়ির মতন মুখ করে সেই স্বপেন দেখা রূপকুমার আমার দিকে চেয়ে শুধু বললেন, আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারি শুধু দুটি শর্তে—।

—কি বলুন?

সুভাষচন্দ্র বললেন, প্রথম শর্ত—আমি আমার অপিসে যখন একলা বসে কাজ করব, আপনি আমার ঘরে ঢুকবেন না! আমার মেজবউদির (শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্ত্রী বিভাবতী) ওখানে যাবেন, সেখানেই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলব।

—দ্বিতীয় শর্তটা কি?

—সেটি হল এই, কোনও সভা সমিতিতে বা সম্মেলনে যদি আপনি এবং আমি উভয়ে একই সঙ্গে উপস্থিত হতে বাধ্য হই, তাহলে আমরা যেন কেউ কারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করি, কাছাকাছি না আসি, একত্র কেউ যেন আমাদের ছবি না তোলে, এবং আমরা কেউ কারোকে যেন না চিনতে পারি!

—মেনে নিলেন দুটো শর্ত? —আমি হেসে উঠলুম।

লতিকা বললেন, নিশ্চয়! আমার মধ্যে এসেছিল জোয়ার, ভাবের বন্যা! সে ত' যৌবন জলতরঙ্গ। নিষ্পাপ, শুচিশুভ্র, নীতিপরায়ণ ও চরিত্রবান তরুণ সুভাষচন্দ্র ছিলেন মেয়ে মাত্রেরই আরাধ্য। আমার নিজের কী পরিচয়? বনজন্তুর নখের আঁচড়ে আমার মন তখন ক্ষত বিক্ষত! আমি সুভাষের সকল নির্দেশের ক্রীতদাসী হয়ে গেলুম সেইদিন থেকে। সেদিন থেকে আমার আর কোনও ভয় রইল না। রাজভয় শত্রুভয় সমাজ ভয় নিন্দা রটনার ভয়—সব ঘুচে গেল! ডাঃ রায় আমার জীবন-ব্যবস্থার সব দায়িত্বই তুলে নিয়েছিলেন সেদিন, এবং একটি মাত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন—আমি যেন কখনো কারোকে আমার হাতের লেখা চিঠি বা কোনও লিখিত নোট না দিই। সাবধান, পুলিসের খানাতল্লাসিতে তোমার হাতের কোন চিহ্ন যেন ধরা না পড়ে!— ডাঃ রায়ের এই নির্দেশ ছিল।

লতিকার ইংরেজি প্রবন্ধটি নিয়ে সেদিন সন্ধ্যাকালে ফিরে এলুম।

ঘরে এসে দেখি মোটা একখানা খামের চিঠি আমার নামে। এত মোটা চিঠি কার রে? খুলে দেখি আট পাতা ঠাস-বুনোনো লেখা একখানা প্রেমপত্র! কিন্তু আশ্চর্য, আমার নামে চিঠি, অথচ লিখছে এক মেয়ে অন্য মেয়েকে! শেষের দিকে লেখা, "ইতি তোমার প্রতীক্ষামানা প্রিয়া-প্রতিবেশিনী উমা।"

আমি এমনিই আহাম্মক যে এতক্ষণ দেখিনি চিঠিখানায় স্ট্যাম্পও নেই, পোস্ট আপিসের ছাপও নেই। উটকো কেউ আমার ঘরের জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে পকেটে রেখে ছাদে উঠে গেলুম শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় একটু হাওয়া খাবার জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখি সরোজিনী দিদি, বারীনদার বড়দা বিনয়বাবুর বড় মেয়ে বুলারানী এবং তার ছোট ছোট দুটি ভাই। বুলা এগিয়ে এসে বলল, আপনি বেশ লোক ত? রোজ রোজ আসি, আর আপনার দেখা না পেয়ে ফিরে যাই!

বুলা বেশ সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। বয়স হবে আঠারো উনিশ। বুলার মা আরও সুন্দরী, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। বুলার বাবার বয়স হবে কমবেশী পঞ্চান্ন। তিনি বৃদ্ধ বটে, কিন্তু রেস কোর্সের মাঠে গিয়ে বেশ নিয়মিত জুয়া খেলেন। বৃদ্ধ বিনয়ভূষণ সপরিবারে থাকেন সিকদার বাগানে। তাঁর স্ত্রীর বয়স ঠাহর করা যায় না। তিনি বুলার মা, কি বড় বোন, বোঝা ভার। মনোজ্ঞ সাজসজ্জা ও প্রসাধন পারিপাট্য তাঁর খুবই প্রিয়।

একদিন বারীনদার অনুরোধেই আমি আই সি এস অন্নদাশঙ্কর রায়কে চিঠি লিখে বুলারানীর জন্য ঘটকালি করতে গেলুম। অন্নদাশঙ্কর তখনও অবিবাহিত। কয়েকদিন পরেই অন্নদা চিঠির জবাব দিলেন। বললেন, আমি রায় বটে, তবে আসলে 'ঘোষ'। এক-গোত্রে আমি বিয়ে করব না!

বন্ধুবর সুধীন নিয়োগী পরদিন এসে বেনামী চিঠির কথা শুনে বললেন, মেয়েটো আপনার পাশেই থাকে ও-বাড়িতে। ওর নাম উমা নয়, ঊষা। আমার ছোট বোন মীরার কাছে আপনার গল্প শোনে। মেয়েটো বেথুনের গ্রাজুয়েট। ওর বাবা জগবন্ধুবাবুর অবস্থা বেশ ভাল। যদি রাজি থাকেন, বলুন—ঘটকালি করি। ক্রমশ

কল্যাণী কুমারমঙ্গলম

গত ৩১শে মে যে বিরাট বিমান দুর্ঘটনায় সমগ্র ভারতের মন বেদনায়, ও ঘটনার আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে আছে তারই করাল গ্রাসে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন মোহন কুমারমঙ্গলমকে আমরা হারিয়েছি। শোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। আপামর জনসাধারণ, উচ্চনীচ সকলে সমান দুঃখিত। মোহন কুমারমঙ্গলমের ব্রতই ছিল সবাকার কল্যাণ। গভীর ভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজতন্ত্রবাদে। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিলি ও ভোগের অধিকার ব্যক্তি-গত নয়, সমাজগত—এই মতবাদে নানা সংস্কারসাধনে অংশ গ্রহণ তাঁরই অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। কাজেই প্রবোধ দানের প্রয়োজন এখন প্রত্যেক ভারতীয়কে। আমরাও তা থেকে বাদ যাই না। তবে আমাদের তরফ থেকে গভীর সহানুভূতি জানাই মোহন কুমারমঙ্গলমের সকল সাধনার সাথী, সকল কল্যাণ কর্মের সহকর্মী কল্যাণী কুমারমঙ্গলমকে। ঈশ্বর তাঁকে শক্তি দেবেন ইষ্ট বিয়োগজনিত দুঃখ বহন করবার।

কল্যাণী কুমারমঙ্গলম আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। মুখোপাধ্যায় পরিবারের আদি নিবাস উত্তরপাড়ায় কিন্তু পরে তাঁরা মেদিনীপুরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। অজয়বাবুকে তমলুকের গান্ধী বা মেদিনী-পুরের গান্ধী বলা হতো। তমলুক বা তাম্রলিপ্ত প্রাচীনবঙ্গের পূর্ব সমুদ্রতটের বিখ্যাত বন্দর এবং কারও কারও ধারণা তামিলনাড়ুর সঙ্গে তমলুকের সম্বন্ধ যুগ যুগান্তের এবং অতি ঘনিষ্ঠ। তাম্রলিপ্ত ও তামিল-এর মধ্যে শব্দগত মিলও কম নয়। কল্যাণীর পিতার নাম ছিল ফণীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেস রাজনীতির আবহাওয়ায় কল্যাণীর শৈশব কেটেছে। তিনি বলেন, ত্রিশ দশকের বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ব্যাপক প্রভাবের দিনে মনে পড়ে প্রভাত ফেরীর গান গেয়ে যাওয়ার কথা। গানের গলা তাঁর চিরদিনই চমৎকার। কত স্বদেশী যুগের দেশভক্তির গান, মুকুন্দ দাসের গান প্রভাত ফেরীর কণ্ঠে আকাশে বাতাসে শিহরণ জাগাতো। তখন কল্যাণীর বয়সই বা কত! আট বা নয় বড় জোর। উত্তরকালে শৈশবের সে-দিনগুলির শেষে কিশোরী কল্যাণী কাকা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রভাবিত হলেন।

উভয়ের বিয়ের সময় তোলা ছবি। বসে আছেন উভয় তার স্বামী, মোহন ও কল্যাণী। দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে ললিতা ও রঙ্গরাজন

কমিউনিস্ট পার্টির স্টাডি সার্কল বা পাঠ-চক্রে যোগ দিলেন চঞ্চলা চতুর্দশী। মার্কস-বাদ সাগ্রহে শিক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। সে-গোষ্ঠী তখন ভবানী সেন, নিখিল চক্রবর্তী ইত্যাদির আগ্রহে জমজমাট আয়োজনে পূর্ণ। এদিকে কলকাতায় কল্যাণী আর ওদিকে শত শত মাইল ব্যবধানে মোহন। ধারণা এক, প্রেরণা এক, এক মতবাদে বিশ্বাসী। দেখা হলো ওদের সাগর কিনারায়। ১৭ দিনের ট্রেনিং স্কুল বসিয়েছিলেন বোম্বাইতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। সবেমাত্র মোহন কুমারমঙ্গলমের বিখ্যাত লেখা Why I Become a Conmunist বেরিয়েছে। শিবিরে সবাই সবার সঙ্গে মেলামেশা করছে, কিন্তু অতি সংযতভাবে। সাধারণের জন্য তাদের রাজনীতি, সাধারণ যা দৃষ্টিকটু মনে করে তা কখনই তাঁরা করবেন না বলে অতি সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ছেলেমেয়ে আলাপ আলোচনা করবে, কিন্তু ভাই হলেও হাত ধরে পথ চলবে না। বেলেল্লাপনা বা উচ্ছৃংখল আচরণকে তাঁরা দূরে রাখতেন। ১৯৪২ সালে এ শিবিরে আলাপ হয় দুজনের। '৪৩ সালের শুরুতে মোহন এলেন কলকাতায়। সোজা কল্যাণীর পিতার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন কন্যার পাণি। মহাখুশী ফণীন্দ্রনাথ। বড় আদরের মা-মরা মেয়ে তাঁর। সুযোগ্য পাত্র সাদরে বরণ করতে এসেছে। কি আনন্দ!

সেই এপ্রিলের ২৯শে কল্যাণী মোহনের বিয়ে হলো। কিন্তু ধুমধাম করে নয়। রেজিস্ট্রি বিয়ে। বন্ধুরা উপহার আনলেন ফুল। পিতার একান্ত অনুরোধে পার্টির সহযোগী বন্ধুরা মাত্র পাত পাড়লেন। তখন বাংলার বুকে দুর্ভিক্ষপীড়িতের আর্ত নাদের মাঝে এর চেয়ে বেশী নবদম্পতির মন সায় দেয়নি। কল্যাণী বিয়ের শাড়িখানা পর্যন্ত চেয়েছিলেন সুতোর সাদা ও তাঁতের তৈরী। শাশুড়ী শ্রীমতী রাধাবাঈ সুব্বারায়ণ বধূর ইচ্ছা অবজ্ঞা করেননি। পাঠিয়েছিলেন সামান্য সূক্ষ্ম জরির কাজ-করা সবুজ পাড় একটি তাঁতেরই শাড়ি। রাধাবাঈ নিজেও মহিলা আন্দোলনে সে যুগে পুরোবর্তিনী ছিলেন। ম্যাঙ্গালোরের ব্রাহ্মণ রাধাবাঈ-এর পিতা সেকালে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। রাধাবাঈকে বিবাহ করতে গিয়ে সুব্বারায়ণ সাহেবও ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। দক্ষিণের যে কটি বিখ্যাত পরিবার ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তার মধ্যে ডাঃ পি সুব্বারায়ণের পরিবার একটি।

মোহন কুমারমঙ্গলম কেম্ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। রজনী পাম দত্ত ছিলেন তাঁর গুরু। বোম্বাইতে ফিরে সি পি আই-র কর্মী হয়ে কাজ এবং

All India Student federation -এর প্রেসিডেনট হন। এদিকে আমাদের কল্যাণী ঠিক ঐ ভাবেই ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। রেণু চক্রবর্তী মণিকুন্তল সেন, কমলা চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ছিলেন Student Front বা ছাত্র গোষ্ঠীর মহিলা শাখার উদ্যোগী কর্মী। কল্যাণী মুখার্জী তখন সেই মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী হলেন। ৫০,০০০ ছিল সভ্য সংখ্যা।

১৯৪৩ থেকে ১৯৭৩—ত্রিশ বছরের মিলিত জীবনে মোহন কুমারমঙ্গলমের পাশে ছায়ার মত ছিলেন কল্যাণী। এবারও মাদ্রাজ তাঁরা একত্রই গিয়েছিলেন। জরুরী কাজের তাগিদ। কল্যাণী অনুরোধ করেছিলেন 'আর একটা দিন থেকে যাও'। মোহন থাকেন নি। কল্যাণীর দু চোখে জল ভরে এলো বলতে বলতে। 'কেন যে আমি তাঁর সঙ্গে চলে এলাম না।' কল্যাণী খবর পেয়েছিলেন মাদ্রাজে। তখন তো সব শেষ।

কুমারমঙ্গলমদের তিনটি ছেলেমেয়ে। উমা, রঙ্গরাজন আর ললিতা। উমার বিয়ে হয়েছে। স্বামী ধানবাদের কাছে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। ছেলে রঙ্গরাজন আইন পড়ছে। সোনার টুকরো যেন। কল্যাণী বলেন, ছেলেমেয়ে বয়ে যেন না যায় এজন্য তাঁরা দুজনে সক্রিয় রাজনীতি করেন নি। কল্যাণী ঘরের দেখাশুনো, ছেলেমেয়েকে সুন্দর করে মানুষ করা এসবের জন্য আপনাকে বাইরের জীবনে বেশী জড়িয়ে দেন নি। ছোট মেয়ে ললিতা। নেহাৎ ছোট কিন্তু কি নিষ্ঠার সঙ্গে নানা আগন্তুককে আপ্যায়িত করছে। এমন লোকেও তার কর্তব্যে ত্রুটি নেই বিন্দুমাত্র।

কল্যাণী কুমারমঙ্গলম নিজে সেণ্ট মার্গারেট স্কুলে পড়েছেন কলকাতায়। তারপর আই-এ বেথুনে এবং বি-এ বিদ্যাসাগরে। বিষয় ছিল ইকনমিক্স। মোহন কুমারকুমারমঙ্গলম ছিলেন ইতিহাস ও ইকনমিক্সের ছাত্র। এখানও মিল। মাতৃভাষায় লেখাপড়া শেখায় দুজনেই বিশ্বাসী ছিলেন বলে উমাকে তামিল শিখিয়েছিলেন ভাল করে। বটানীতে সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিল। তারপর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে সগৌরবে শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। কল্যাণী যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে তামিল শিখেছেন। ছেলেমেয়েরা আরও অন্যান্য ভাষার সঙ্গে চমৎকার বাংলা বলে।

রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে এমন মিষ্টি পারিবারিক জীবন কমই দেখা যায়। মোহনকুমারমঙ্গলমও সহজ অনাড়ম্বর ছিলেন। যতটুকু ও যতবার তাঁকে দেখেছি-ঘটা, জাঁকজমক বহুল্য এবং গর্বাববাজিত মানুষটিকে শ্রদ্ধা করতে কষ্ট হয়নি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে কোনদিন মনে হয়নি উচ্চকোটির কারও সঙ্গে কথা বলছি। কল্যাণী কুমারমঙ্গলম বলছিলেন, ঘরেও ছিল অতটাই অমায়িক। তিনি কখনও স্বামীকে পরিহাস করে বলতেন যে তাঁর ইংরাজী বলার কায়দাটি এমন ভাল যে, যাই বলুন শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মোহন তাই বলতেন, "না গো না, ভাঙা বলেছি, ইংরাজীর চটক ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করিনি।" কি সরল সরস সম্পর্ক। রাজনীতির আলোচনাতেও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে না হলে চলতো না। সব সময় হয়তো মতের মিল হতো না, কিন্তু মনের মিলে কখনও বাধা হয়নি।

কল্যাণী কুমারমঙ্গলম নাশনাল ফেডরেশন অফ ইণ্ডিয়ান উইমেনের মস্ত কর্মী। আরও নানা ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ প্রচুর। আমরা আশা করি তাঁর কর্মপ্রেরণা থেকে দুঃখক্লিষ্ট দেশ আরও পাবে। একজনের অভাব, সবটা পূরণ হবে না হয়তো, কিন্তু দেশের মাটিতে তাঁর আরম্ভ করা কাজ ফুরিয়ে যাবে না। কল্যাণীর কল্যাণ হস্তস্পর্শে সজীব থাকবে ধারা।

শ্রীমতী

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, দিলীপকুমার—এঁদের গান গাওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আধুনিক কালের শক্তিশালী সুরকারদের সুরে রচিত কাব্যসংগীতও গাইছেন বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীগণ। একালের কিছুটা মোটামুটি-ভাবে আমাদের চেনা। কিন্তু একালের অব্যবহিত পূর্বে যে কাব্যসংগীত প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ঝাপসা। একালের পূর্বেই বা বলি কেন, একালেই তিরিশ দশকের মধ্যবর্তী অনেক ভাল গান গাওয়া হয় না। এসব গান কিন্তু চিরায়ত সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেক গানের মূল্য এখনও কমে নি। এখনকার মন নিয়ে এসব গানের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করাটা বিশেষ প্রয়োজন বলেই আমার মনে হয়।

পুরাতনী পর্যায়ে যেসব গান আমরা শুনে থাকি তার কোনও ধারাবাহিকতা নেই ;—এলোমেলোভাবে কতকগুলি টপ্পা বা ভক্তিসংগীত করেই আমরা মনে করি গত যুগের সংগীতের প্রতি সুবিচার করা হল। কিন্তু আগের যুগটা আরও অনেক ব্যাপক, সে যুগেও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে—তার একটা মূল্যায়নও তো হওয়া দরকার। নেই নেই করেও বহু স্বরলিপিই এক সময় করা হয়েছিল, অনেক পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থে এগুলি রক্ষিত হয়েছিল। খুঁজে দেখলে আজও তার অনেকগুলি পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে নির্বাচন করে যথার্থ সাংগীতিক মূল্যসম্পন্ন গানগুলি যদি সঙ্কলিত করা যায় তাহলে আমাদের সামনে বাংলা গানের বহু বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠবে —যা আমাদের চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেবে। এই কমপোজিশনগুলিকে আমাদের ভালভাবে জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে এবং আজকের প্রবহমান সংগীতের সঙ্গে তাদের একটা ধারাবাহিকতার সূত্রে যুক্ত করতে হবে। ইতিহাসকে এইভাবেই গড়ে তুলতে হবে নইলে ইতিহাস বলে কিছু থাকবে না, থাকবে সাময়িক কতকগুলি রচনা যা সময়ের সঙ্গে অন্তর্ধান করবে চিরকালের মত।

গত যুগে বহু গান নাটকের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এক সময় নাটক আমাদের সংগীতকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। সেই সব নাটকের বহু গানই আজ লুপ্ত হয়েছে, খুব সামান্য কিছু আছে স্বরলিপির মধ্যে। অবশ্য এই নাটকগুলির বহু গানই জীইয়ে রাখবার মত নয়, কিন্তু কিছু যে মূল্যবান সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই
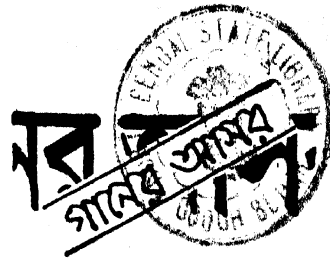
প্রায় নাটকে মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাঁর কয়েকটি গানের সুর পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'এ-জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে' গানটির সুর চিত্তাকর্ষক। এই সুরে বাংলার ঝিঁঝিটের একটি সুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিছুকাল ধরে গিরিশ ঘোষের নাটকের গানগুলি পর্যালোচনা করছিলুম। বহু গানই আজকের দিনে চলবে না ; কিন্তু অনেক গানে সেকালের এমন কয়েকটি ধারার পরিচয় আছে, যা আমাদের জেনে রাখা দরকার এবং যার মধ্যে আমরা একটি সুমিষ্ট সংগীতরসের আস্বাদ পাব। ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত সুবিখ্যাত আলিবাবা নাটকের গানগুলির কথাই ধরা যাক। এসব গানের দিন আর নেই, কিন্তু এদের এমন একটা মাধুর্য আছে যে, এগুলি আমাদের আজও অসামান্যভাবে আকৃষ্ট করে। এই ধরনের আর একটি নাটক গিরিশ ঘোষ রচিত আবুহোসেন। নাট্য সাহিত্যের দিক থেকে এ সৃষ্টি হয়ত ততটা সার্থক নয়, কিন্তু গানগুলির মধ্যে বহু দিক থেকে অসাধারণত্ব আছে। এক সময়ে বাংলা গানে আড়খেমটা, দাদরার কত রকম বিচিত্র প্রচলন ছিল—এসব গান আলোচনা করলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত-উপন্যাসে যে 'ঠুন ঠুন পেয়ালা' গানটির উল্লেখ করেছেন সেটি এই নাটকেরই গান বলে মনে হচ্ছে। এক সময় এটি বিখ্যাত কনসার্ট বাজনায় পরিণত হয়েছিল। এই রকম গিরিশচন্দ্রের আরও অনেক গানের সুরই তখন বাদ্যবাদনে প্রচুর আনন্দের সঙ্গে বাজান হত। খোঁজ করলে গিরিশ-চন্দ্রের জনা, মুকুলমঞ্জরা, মলিনাবিকাশ, বিষাদ, পূর্ণচন্দ্র, পারস্যপ্রসূন প্রভৃতি নাটকের বহু গানের পরিচয় পাওয়া যাবে যাতে গত যুগের বহু সার্থক ধারাই প্রবাহিত হয়েছে। এগুলির স্বরলিপি জোগাড় করা কঠিন হতে পারে কিন্তু আজও অসম্ভব নয়। এই যে বিগত যুগের গানের আবেদন এটি একটি চিরন্তন মূল্য থেকেই আমাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে। এই চিরায়ত বস্তুটিকে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারাটাই হচ্ছে প্রকৃত দেখার সার্থকতা।

গিরিশ ঘোষের নাটকে সুর দিয়েছেন একাধিক ব্যক্তি ; কিন্তু গিরিশবাবুর সংগীত-বোধ ছিল। সুরগুলি তিনিই মনোনীত করতেন। অনেক গানের কাঠামোও নাকি তিনি তৈরি করে দিতেন। একটা জিনিস তাঁর নাট্যসংগীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, সেটি হচ্ছে বাংলায় ভজন তৈরির প্রচেষ্টা। তাঁর বহু গানই যাঁরা ভজনের সুর ভালবাসেন তাঁরা বেছে নিতে পারেন। বাংলা গানের এ একটা স্বতন্ত্র শাখা যার প্রবর্তন তিনি করে গিয়েছিলেন। হিন্দী-বাংলা মিশিয়েও তিনি দু-একটি গান রচনা করেছিলেন। অমৃতলাল বসু এই আদর্শে রচনা করেছিলেন—'কাঁহা জীবন ধন বৃন্দাবন প্রাণ' যা এক সময় সকলের মুখে মুখে ফিরত। 'নিপট কপট তুহু শ্যাম' তাঁর এই ধরনের আর একটি গান যে সুরে রজনীকান্ত সেন 'মা গো এ পাতকী ডুবে যদি যায়' গানটি রচনা করেন।

এইভাবে পুরোনো স্বরলিপিগুলি বিশ্লেষণ করলে অনেক টাইপ-গান বেরুবে যা থেকে বোঝা যাবে একদা বাংলা গানে কত বিচিত্র চিন্তাধারা কাজ করেছে এবং একান্ত সাধারণ্যে সেগুলির প্রকাশ ঘটেছে।

এই কাজগুলি অধুনা করবে কে এবং করলেও তাকে প্রকাশ করবে কোথায়? আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে আকাশবাণী যদি সহায় হন তাহলে যাঁরা এই প্রকার গবেষণায় রত তাঁরা একটা পথ খুঁজে পেতে পারেন। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই রকম একাডেমিক কাজে এগিয়ে আসবেন না, এটা সুনিশ্চিত। এটি একাধারে সাহিত্যিক ও সাংগীতিক যুগ্ম পরিকল্পনা। এর জন্য যাঁরা অগ্রণী হবেন তাঁদের ব্যাপক সাহিত্যবোধ থাকা দরকার,

তার থাকা দরকার গণমানসের সাইকলজি সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শেষেরটি আকাশ-বাণীর সুদীর্ঘ পরিকল্পনা থেকে প্রায় স্বাভাবিকভাবেই অর্জিত হওয়া সম্ভব।

পরলোকে শ্রীসুবল বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকার প্রবীণ কর্মী শ্রীসুবল বন্দ্যোপাধ্যায় গত শনিবার ২ জুন '৭৩ পরলোক গমন করেছেন। সুবলবাবু সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন। বিশেষ করে পদাবলী কীর্তন সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল। সম্প্রতি তিনি কিছু অপ্রকাশিত মহাজন-পদের সঙ্কলন প্রস্তুত করবার কথা চিন্তা করছিলেন—এমন সময় তাঁর মৃত্যু ঘটল। আমরা একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে হারালুম।

শার্ঙ্গদেব

রবীন্দ্র সঙ্গীতে অ-কার উচ্চারণ

মহাশয়,

গত ১২ই মে সংখ্যায় 'গানের আসর-এ রবীন্দ্র সঙ্গীতে অকার উচ্চারণ, এই শিরো-নামায় শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত একটি চিঠি পড়লাম।

চিঠিটি পড়ে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছুই নয়, দুই বাংলার ভাষা-গত বিবাদের ফল। চিঠির বিষয়বস্তুটি রবীন্দ্রভক্ত হিসাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হলেও, অন্তরে যে একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব রয়েছে লেখকের সেটা বেশ মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে পড়েছে।

আমরা বাঙালীরা নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত থেকে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছি; গণ্ডিও সংকীর্ণ হয়ে উঠছে। এখন 'বাঙাল-ঘটির' দ্বন্দ্ব মানে সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা।

পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয় বঙ্গের মধ্যেই কথ্য ভাষার উচ্চারণে ত্রুটি আছে। এটা থাকবেই। ভাষাতে আঞ্চলিক প্রভাব এড়ানো সম্ভব নয়।

আমরা ভালো, ওরা খারাপ কিম্বা আমরা রবীন্দ্রনাথের সঠিক পথ অনুসরণ করছি, ওরা করছে না— এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে এলেই যে রবীন্দ্রনাথের ওপর বেশি শ্রদ্ধা দেখানো হবে তা নয়। বরঞ্চ তো করে রবীন্দ্রনাথকে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা হবে মাত্র।

প্রথম সুধীরবাবু অক্রমণটা শুধুমাত্র কলকাতার উচ্চারণ পদ্ধতি দিয়েই আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্তরের সাপ্ত বিদ্বেষ আর চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না। শেষে সতর্ক খোলাখুলিভাবেই সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ পদ্ধতিকেই আক্রমণ করে বসেছেন। অতএব এটা বেশ বোঝাই যাচ্ছে যে, সুধীরবাবুর এই অন্তরের ক্ষুব্ধ ভাব ঠিক রবীন্দ্রনাথের জন্য ততটা নয় যতটা পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণ পদ্ধতির জন্য।

একথা অবশ্য বলতে চাই না যে পশ্চিমবঙ্গের সব অঞ্চলের কথ্য ভাষাই শুদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন স্থানে বাংলা ভাষা, বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বাংলা কথ্য ভাষা বিকৃত আকার ধারণ করেছে। তেমনি কলকাতাতেও আঞ্চলিক প্রভাবে প্রভাবিত একটি বিশেষ ধরনের উচ্চারণ পদ্ধতি সহযোগে একটি কথ্য ভাষার প্রচলন ছিল এবং আছে। রবীন্দ্রনাথের সময়েও এটির প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথের সময় কলকাতায় প্রচলিত বাংলা কথ্য ভাষায় কিঞ্চিৎ "ও" কার ঘেষা 'অ' কার উচ্চারণের প্রথা ছিল। সেই জন্যই কবি কৃত রেকর্ডের গানে ও আবৃত্তিতে 'ও' কার ঘেষা 'অ' কারের উচ্চারণ পাই। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কলকাতার প্রচলিত কথ্য ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতিকেই মোটামুটি-ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এবং এ কথাও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সময় যদি কলকাতার কথ্য ভাষার উচ্চারণে বর্তমানের ন্যায় 'অ' কারের স্থানে পুরোপুরি 'ও' কার উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত থাকতো তা-হলে রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই সেই উচ্চারণ পদ্ধতিই অনুসরণ করতেন।

আশা করি, সুধীরবাবু এটা জানেন যে, কলকাতার প্রচলিত কথ্য ভাষার রূপটিই সর্বজনস্বীকৃত। সুধীরবাবু নিশ্চয়ই বাংলা-দেশের (পূর্ববঙ্গ) বেতারে প্রচারিত অনু-ষ্ঠানাদি শুনে থাকবেন এবং এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ওই দেশের বেতার প্রচারে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় সেটা সেই কলকাতায় প্রচলিত কথ্য ভাষারই রূপ। সুধীরবাবু যেসব অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি নিয়ে ওকালতি করছেন সেই সব অঞ্চলেও কলকাতার প্রচলিত রূপটিই অনু-সরণ করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা (ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী ছাড়া) সবই ওই কলকাতায় প্রচলিত উচ্চারণ পদ্ধতিকেই অনুসরণ করে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ কোথাও 'ফুটো' 'ঝাল' 'পাকা' 'বেঁকা' এসব শব্দ, ব্যবহার করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি কেন এই সব শব্দ ব্যবহারে কিছু লেখেন নি? নিশ্চয়ই তিনি একমাত্র কলকাতায় প্রচলিত উচ্চারণ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন আঞ্চলিক উচ্চারণ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেননি। নাচেৎ তিনি তো লিখতে পারতেন—

আমার রাইত্ত পুহালো
শরদ প্রাতে.......... ॥

আমি কোন পক্ষপাতিত্ব করছি না। এটাও স্বীকার করছি যে, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের, যেমন—বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ বা ২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চলের কথ্য ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতিকেও standard হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

যদিও সুধীরবাবুর একটা কথা ঠিক যে, বর্তমানে 'ও' কার মিশ্রিত 'অ' কার উচ্চারণের চেয়ে পুরোপুরি 'ও' কার উচ্চা-রণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? বরঞ্চ কতকগুলো স্থানে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এতে শব্দগুলি পূর্বের চেয়ে অনেক মোলায়েম হয়েছে। বিশেষ করে গানে অর্থাৎ লিরিকধর্মী কবিতায় এ ধরনের উচ্চারণেরই প্রয়োজন। কারণ, লিরিকের ভাষা যত মোলায়েম হবে ও সহজ-ভাবে উচ্চারণ করা যাবে গানটি তত সার্থক হয়ে উঠবে। কোন অর্থের বা শব্দের পরি-বর্তন না করে গানের কথাগুলির উচ্চারণ যদি খুব সহজভাবে করা যায় তাতে আপত্তির কি?

রবীন্দ্রসঙ্গীত সর্বদেশের সর্বকালের সম্পদ। এ সম্পদকে উচ্চারণের বাঁধা নির্দেশে প্রবাহিত করার চেষ্টা করলে রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষতিই হবে। এ সঙ্গীত যদি সর্বকালের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে উচ্চারণের বিবাদ আপোস করে সর্বকালের হৃদয় জয় করে কালজয়ী হয়ে বিরাজ করে তাহলে কি সুধীরবাবুর কোন আপত্তি আছে? নাকি তিনি চান বৈদিক গান, চর্যাপদ কিম্বা পালি ভাষায় স্তব-স্তুতি সঙ্গীতের মতোই উচ্চারণের আড়ষ্টতা এবং কচকচি টেনে নিয়ে এসে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাবলীলতা নষ্ট করে লোকের মন থেকে মুছে ফেলা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতকে 'সংস্কৃত-সঙ্গীতে' পরিণত করা।

সম্ভবত সুধীরবাবু কলকাতার বহিরা-গত বাঙ্গালীদের কথা চিন্তা করেই এসব কথা লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে বহিরাগত বাঙ্গালী-দের কলকাতার উচ্চারণ পদ্ধতিকে অনু-সরণ করতে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের অর্থাৎ বর্ধমান, মালদহ, ২৪ পরগণা, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলের অধিবাসীদের ঠিক সেই একই অসুবিধায় সম্মুখীন হতে হয়। অত-এব একটি standard উচ্চারণ পদ্ধতি তো চাই। কলকাতার উচ্চারণ পদ্ধতিকেই যখন standard হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে তখন সব বিভেদ ভুলে এই রীতিকেই অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত।

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বাণীপাড়া, শিলচর।

তুলির কিছু সময়

কণা বসুমিত্র

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ও বেরিয়ে গেল। তুলি প্রথমে বুঝতে পারেনি। ও যখন ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল, তুলি ভাবল, ও বোধ হয় বসার ঘরে গেল কাগজটাগজ পড়তে। সাধারণত রাগটাগ হলে ও যা করে থাকে। তাই তুলি যেমন চুল আঁচড়াচ্ছিল তেমনিই আঁচড়াতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ও শুনল গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করার শব্দ। তুলি অবাক হল। ও কান পাতল। ভাবল, যাকগে যে যায় তাকে যেতে দেওয়াই ভাল। মেজাজ ভাল হলে ঠিকই ফিরে আসবে। এখন ওকে বাধা দেওয়া মানে নিজেকে খেলো করা। তবু গাড়ির স্টার্টটা যখন আরো জোর হল, ও আর পারল না চুপচাপ বসে থাকতে। খাটে ঘুমুচ্ছিল টুনটুন। ওকে ফেলে রেখেই তুলি হন হন করে নেমে গেল নীচে। গাড়িটা তখন বাগানের লাল সুরকির পথটা ধরে এগোচ্ছে। মরিয়া হয়ে তুলি ছুটল। নিলয় গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ও ছুটে গিয়ে চেপে ধরল ওর স্টিয়ারিং। কোন লাভই হল না। জোরে এক্সিলারেটার চেপে বেরিয়ে গেল নিলয়। গেটটা ধরে কাঠের মতন দাঁড়িয়ে থাকল তুলি। ও ভাবছে, নিলয় গেল কোথায়? হয়ত ক্লাবের বারটাতে গিয়েই ঢুকেছে। আজকাল তো আবার নেশার বাতিক হয়েছে সাহেবের। কেন যেন তুলির চোখ দিয়ে একটু জল বেরিয়ে এল। এই রাত্তিরেও ও একেবারে ভিজে স্নান করে উঠেছে। গেটের মাথায় মাধবীলতার ঝাড় থেকে অনবরত জল পড়ছে। টপটপ করে জল পড়ছে ওর এলো চুল বেয়ে। খুব বিশ্রীভাবে ভিজছে ও। ওর কাপড়চোপড় টানটান ভাবে সেঁটে রয়েছে শরীরের সঙ্গে। ঠিক এই অবস্থায় কেউ দেখলে ওকে নিশ্চয় পাগল বলবে। তুলি আড়চোখে একবার দেখে নিল ওপাশের বাড়িটা। না, কেউ দেখছে না তাকে। শুধু ও-বাড়ির মালী কালভার্টের এক কোণে বসে ভিজছে ওরই মত। তুলির খুব শীত করছিল। ও ভিজে কাপড়ের জল নিংড়োতে নিংড়োতে ঘরে ঢুকল। কাপড়চোপড় ছেড়ে ও ভাবল, ক্লাবে কি একটা ফোন করে দেখবে? অস্থির একটা জেদী মেয়ের মত ও ফোনের ডায়াল ঘুরোতে লাগল। পেয়ে গেল নম্বরটা। ওপাশ থেকে যখন বলল, হ্যালো!—ও তখন ফোন ছেড়ে দিল। ভাল লাগল না কথা বলতে আর। তুলি ভাবল, এখন ও কি করবে? কিছু ভাল লাগছে না, কিস্যু না।

ঘুম ঘুমোচ্ছে টুনটুন। ওর ছোট্ট বুকটার নিশ্বাসের ওঠা-নামা অনেকক্ষণ ধরে দেখল তুলি। তারপর ও মুখটাকে কাছে এনে টুনটুনের নরম গালে আলতো করে একটা চুমু খেল। বেশ লাগল ওর, টুনটুনের গায়ের ঘাম মেশানো বেবী পাউডারের গন্ধটা। সারা দিনের চটকানো বিছানাটা চোখে পড়ল হঠাৎ। ও বিছানা ঝাড়লো। ধোপভাঙা একটা চাদর পাতলো। তার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ও সটান শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখে পড়ে গেল টেবিলের ওপরে খোলা একখানা নিষিদ্ধ বই। যার ওপরে নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে রোমের এক

ব্যাভিচারিণী রানী। যিনি এক রাত্রে চল্লিশজন পুরুষকে সঙ্গদান করেও ক্লান্ত হতেন না। ও আর তাকাতে পারল না ওই কামার্ত, উলঙ্গ ছবিটার দিকে। ছবিটা যেন আজ দুপুরে নিলয়ের সামনে দাঁড়ান তারই মডেল। তুলির চোখ জ্বলা করে উঠল। ও বিছানার তলায় সরিয়ে রাখল বইটা। ওর মনে হল, দুর্বল মুহূর্তে মানুষ কত সস্তা হতে পারে। দুপুরে তো ওই বইখানার ছবি দেখতে তার খারাপ লাগেনি। অথচ এখন লাগছে। পাগলের মতন চুমু খেতে খেতে নিলয় যখন বলেছিল, আমায় খুশি করে দাও, প্লিজ......। তখন ওর কথাগুলো ওর রক্তের মধ্যে যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। স্বামীর বুকের মধ্যে পিষে যেতে যেতে শরীরের সবটুকু উত্তাপ দিয়ে ও তো ওকে খুশিই করে দিয়েছিল। কিন্তু বড় অল্প সময়ের সেই মুহূর্ত। নইলে নিলয়ের মন এমন করে বদলে গেল কেন? তুলিও তো মরছে অনুশোচনায়। যদিও অনেক রাতে ঘরে এলে নিলয় আবার বদলাবে। ওকে উত্তেজিত করার জন্য আবার কাছে টানবে। আর তুলি যদি তাতে সাড়া না দেয়, তা হলে ও বলবে, তুমি একটা ফ্রিজ। —ওর কাঙাল চোখদুটো তুলিকে সব ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু কেন? তুলি ভাবলো, সে কি দম দেওয়া স্প্রীংয়ের পুতুল যে নিলয় ওকে যেমন ইচ্ছে তেমনি করে নাচাবে?......খেলার বাঁশি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা। ঘুম ভাঙলে নিলয় বলল, চল, সেনসাহেবের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। সেদিন ওরা ঘুরে গেল। তুলি তখন দুধের বোতল ধরে রয়েছে টুনটুনের মুখে। পাশে টিপয়ের ওপর ঠাণ্ডা হচ্ছে ওর চায়ের কাপ। ও একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, এই বৃষ্টিতে? —নিলয় বলল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব বৃষ্টিতে কি আসে যায়? —তুলির সেরকম তখন একেবারেই ইচ্ছে-টিচ্ছে করছিল না। ও বলল, ভাল লাগছে না এখন কারো বাড়িতে যেতে। —নিলয় বলল, কিন্তু রিটার্ন ভিজিটের প্রশ্ন রয়েছে না!—হাসল তুলি। বলল, মেসিনের মতন অতো নিয়মমাফিক চলা আমার ভাল লাগে না। ওরা এসেছে বলেই যে আমাদের......, ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নিলয় বলল, চটপট তৈরি হয়ে নাও।

যদি না হই? —ভুরু বেঁকিয়ে তুলি বলল, ওরা এসেছে বলেই যে......

নিলয় বলল, আঃ, তুমি কি তৈরি হবে? —তুলি বলল, না। ওরা এসেছে বলেই যে আমাদের যেতে হবে তার কোন মানে নেই। তার চেয়ে চল ব্যারেজ ঘুরে আসি। —নিলয় গুম হয়ে থাকল। কিছু বলল না। —তুলি বাচ্চাদের মতন আদুরে গলায় বলল, জানলে গো, অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে না আমি জলের ডাক শুনতে পাই। —বিরক্তির সঙ্গে নিলয় সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। তেতো গলায় বলল, তোমার শুধু ব্যারেজ আর ব্যারেজ। কি যে মধু আছে সেখানে। যত্তসব একঘেয়ে ব্যাপার। —তুলি মুচকি একটু হাসল। বলল, একঘেয়ে শব্দটা কিন্তু রিলেটিভ, না গো? আমার যেমন একঘেয়ে লাগে তোমার ওই রিটার্ন ভিজিট জাতীয় কথাগুলো শুনলে। —সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে নিলয় বলল, দিলে তো মেজাজটা খারাপ করে? —হাসল তুলি। বলল, তোমার মেজাজ যে কিসে খারাপ হয়, আর কিসে হয় না, তা আমি আজও বুঝলুম না। —চটে গিয়ে নিলয় বলল, এই পাঁচ বছর ধরেও বুঝলে না? —আমি আধ ঘণ্টা সময় দিলুম, এর মধ্যে তোমায় তৈরি হতে হবে। —জুলুম করছ? বলল তুলি। নিলয় বলল, অলবৎ।

আর তুলি ঠাণ্ডা গলায় তক্ষুনি বলল, আমি যাব না। —হাতের সিগারেটটা নাচাতে নাচাতে নিলয় বলল, যাবে না মানে? আমি দেখতে চাই তোমার ইচ্ছের দাম কতটুকু? —বেরিয়ে গেল নিলয়।

কাচের জানলায় বৃষ্টির জলকণাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তুলির কান্না পেয়ে গেল ও ভাবল, নিলয় বড় নিষ্ঠুর। ওর জন্যে কি একটা সন্ধ্যেও খরচ করতে পারত না? রোজই তো থাকে সেই ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরির পরে ক্লাব, নইলে পার্টি অথবা কারো বাড়িতে গিয়ে আড্ডা! আড্ডায়ও তো সেই মাপাজোক কথা, সেই র‍্যাঙ্ক, পজিসন, স্টাটাসের প্রশ্ন মেপে চলা। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, নিলয় একদিন ছবি আঁকত, বই পড়তে ভালবাসত। কোথায় গেল ওর সেই শিল্পীর মন? আসলে, —তুলি ভাবল, মানুষের মেলামেশা, চলাফেরার মধ্যে যখনই সীমিত ভাব এসে পড়ে, তখনই সে হারিয়ে যায়, তার বড় জগৎ থেকে। তুলি আরও কত কি ভাবতে লাগল হিজিবিজি। তুলি ভাবল, এই শিল্পনগরীর আমরা প্রত্যেকে যেন রবীন্দ্রনাথের যক্ষপুরীর একেকজন মানুষ, যাদের পরিচয় নামে নয়, নম্বরে। এখানে কে ভাল ছবি আঁকে, কে ভাল গান গায়, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কে কোন কোয়ার্টারে বাস করে, কার কত মাইনে তা দিয়েই হয় সবার পরিচয়। তুলি অবশ্য আশা করেনি, এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় নিলয় তাকে ঘরে বসে ক্ষ্যাপার মতন কবিতা শোনাবে। তুলি এও আশা করেনি, আজ সন্ধ্যায় সাধারণ শ্রমিকদের পাড়ায় যে গানের জলসা হচ্ছে, সেখানে নিলয় তাকে নিয়ে যাবে, বরং অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই আজ ও পেয়েছিল। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত নিলয় শুধু তারই কাছে কাছে ছিল। সব ছুটির দিনে তো আর পাওয়া যায় না তাকে। ঘন ঘন ফোন আসে সকাল থেকে। হয়ত ফ্যাক্টরির সবচেয়ে

বড় কর্তার পিএ তাকে ডেকে বলেন, গেস্ট হাউসে মিটিং আছে আসুন। নয়ত রোটারী ক্লাবের মিটিং থাকে, নইলে ছুটতে হয় অন্য কোন বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে। কিন্তু আজ সে ধরনের কোন ব্যাপার ট্যাপার না ঘটায়, নিরিবিলিতে ছিল দুজনে। সকালে খেয়াল খুশি মতন রেকর্ড বাজাল ওরা, নাচলো, গাইল, দুজনের হাসি, ঠাট্টা, কথার টেপ করল দুজনে। তারপর মনের আবেগে টুনটুনকে বুকে চেপে ধরে নিলয় উল্লাসে ফেটে পড়ল। টুনটুন ডাকলো, দা-দা-দা। হা হা করে হাসল নিলয়। বলল, বল, বল, আমি তো এককালে তোর মায়ের দাদাই ছিলুম রে। —তুলি হেসে ফেলল। বলল, আমি এখনও তোমায় মাঝে মাঝে দাদা বলে ফেলি জানলে? —ওকে জাপটে ধরে নিলয় বলেছিল, তোমার দাদাদের মধ্যে আমি ক' নম্বর? —বিজ্ঞের মতন হাসল টুনটুন। হেসে ফেলল ওরাও। তারপর লনে চেয়ার পেতে রোদে পিঠ দিয়ে ওরা শুনতে বসেছিল খেলার রীলে। উত্তেজনার মাথায় ট্রানজিসটার ভেঙে ফেলে আর কি! ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের এই দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে নিলয় ছিল ইংলণ্ডের পক্ষে, আর তুলি ভারতের। একজন গ্রীগ, ডেনেস, কট্টামের ভক্ত। অন্যজন, চন্দ্রশেখর, বেদী, ওয়াড়েকরদের। রীলে শুনতে শুনতে দুজনের প্রায় হাতাহাতি হবার মতন অবস্থা। পাখির মতন হালকা লাগছিল আজ তুলির সারাটা দিন। সেই নতুন বিয়ের পর যেমন লাগত, যখন নিলয়কে ছোঁয়া যেত সাধারণ মানুষের মতো। ফ্যাকটরির সবচেয়ে উঁচু কর্তার কাছাকাছি যখন সে পৌঁছোয় নি। এই মুহূর্তে তুলি যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ। বন্ধ শার্সির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের নির্জন রাস্তাটা। কালো সাপের মত ফণা তুলে নাচছে নীচের রাস্তায় জলের স্রোত। তুলি ভাবছে, সুখ শব্দটা বড় কঠিন। একজনকে সুখী করতে হলে নিজেকে যে কতখানি ছাড়তে হয়। ছাড়তে ছাড়তে এমন হয় যে, নিজের আর কিছুই থাকে না। নাইবা থাকলো। কিন্তু বেপরোয়া মনটা যদি হঠাৎ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, সেটা কি দোষের? ওর কথা মতন চলতে চলতে ও যে ওর হাতের তৈরি একটা পুতুল হয়ে গিয়েছে। সেই পুতুল গড়ার আনন্দ নিলয় কতটা পেয়েছে ও জানে না। তুলি শুধু নিজের কথাই বলতে পারে। ও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে নিজেকে একটা মমি মনে করেছে। বাইরে এখন ভীষণ অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে, আর কোন এক ভূতুড়ে পাখির ডাক শিরিষ গাছের মাথায়। তুলি ভাবছে সব থেকে ভাল হয় যে যার ইচ্ছে মতন চললে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটা জিপসী মেয়ে। পরণে ঘাগরা, মাথায় ওড়না। কোমর দুলিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। ও প্রায়ই যায় এখান দিয়ে। বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেলেছে। ওরা যাযাবর। ভাবতে বেশ লাগে তুলির। ওকে ডেকে কি একটু কথা বলবে তুলি? না থাক। নিলয় হয়ত পছন্দ করবে না। কিন্তু কতদিন আর এই বাধা নিষেধের মধ্যে হোঁচট খাবে ও? হাওয়ার দাপট চলছে শালের বনে। বিদ্যুতের আলোয় চোখে পড়ছে তার মধ্যে আঁকাবাঁকা সরু পথ। দুপুরে ওখানে কোকিল ডাকে, ডাহুক। আর দোয়েল যা শিস দেয় না? দারুণ। ওকে যেন জ্বালাতন করে রীতিমতন। তখন তুলির ইচ্ছে করে, ওখান দিয়ে একবার হাঁটতে। এ সব ইচ্ছের কথা নিলয়কে বললে, ও খুব হাসে। নিলয় বলে, তুমি একটা পাগল। ও ওকে মনে করিয়ে দেয়, ও সাহেবপাড়ার বউ, ওসব বেয়াড়া ইচ্ছে ওকে মানায় না। বরং তার চেয়ে

[illegible]

লাইট পোস্টের ভূতুড়ে আলোয় মনে হচ্ছে কে যেন আসছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা লোকটির। মাথায় টুপি, গায়ে বর্ষাতি। তার রবারের গামবুটের মধ্যে জল থেকে আওয়াজ হচ্ছে হুপ্, হুপ্, হুপ্। তুলি অবাক হয়ে দেখল, ওদেরই গেট খুলল লোকটা। ওর ভয় ভয় করল। অচেনা কোন বাজে লোক নয়ত? —ভাবল তুলি যা এই শহরে হামেশাই ঘটে থাকে। এক সময় বেল বাজল দরজায়। তুলি বলল, কে? কোন সাড়া নেই। আবার বাজল বেল। তুলি আবারও বলল, কে? তার উত্তরে বেলটাই বাজল শুধু। তুলি প্রথমে ভাবল, মোহনকে ডাকবে। আবার ভাবল, না থাক। ও দরজার গায়ে লাগানো আই দিয়ে দেখল। ও আশ্চর্য হল বারিদকে দেখে। ওর ছোটবেলার বন্ধু।

এখানেই কোন একটা ফ্যাকটরী-তে কাজ করে, ফোরম্যান না কি যেন। ওকে দেখলে অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যায় তুলির, সেই লেকের জলে সাঁতার কাটা, খেজুর গাছের ডালে বসে পাখির বাসা পাড়া। হাসতে হাসতে দরজা খুলল তুলি। বলল, মারবো এক চাঁটি, অসভ্য কোথাকার। —বারিদ বলল, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম তো। তারপর বলল, দাঁড়া, তোর কর্তাকে বলব, যাকে-তাকে তুই দরজা খুলে দিস। —তুলি ঠোঁট উলটে বলল, বলিস। আমার কর্তার মন অত ছোট নয়। —হা হা করে হাসল বারিদ। হঠাৎ-ই যেন ওর চোখে পড়ে গেল টুনটুনের ঘুমন্ত মুখটা। বারিদ বলল, বাহ্, তোর মেয়ে তো ফার্স্ট কেলাস হয়েছে রে। —ঠিক আমার মত তাই না? তুলির ঠোঁটে কৌতুক। বারিদ বলল, তোকে টেক্কা দেবে। ও হিন্দী ছবির হিরোইন হবে।—কৃত্রিম রাগে তুলি বলল, ইস্ কি আমার উদাহরণ। —বারিদ টুনটুনের গালে একটা টোকা মেরে বলল, আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, তোর মেয়ে ডেসডিমনা, হল তো? ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিল তুলি। বর্ষাতির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ওর হাঁটুতে কাদা, মুখেও কোথাও কোথাও লেগে রয়েছে কাদার ছোপ। তুলি বলল, এবার তোর ধরাচুড়ো খোল তো। তোর গায়ে এত কাদা লাগল কি করে? —বর্ষাতির গামবুট মাথার টুপি খুলতে খুলতে বারিদ বলল, আজ আমাদের ম্যাচ ছিল, ওই তো কলপ-তরুর মাঠে। যা একখানা গোল দিয়েছি না, দারুণ। তুলি বলল, এই বিষ্টিতেও খেলতে বেরিয়েছিস্? তোর শখের বলিহারী। তারপর আবার ফুটবল! আমি তো জানতাম, এই শীতে মানুষ ক্রিকেট খেলে। —বারিদ বলল, দুঃখে খেলছি, ইণ্ডিয়া যেভাবে হারতে চলেছে। তুলি অনামনস্কভাবে বলল, হুঁ। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র একশো একান্ন রান তুলেই সব কটা গেল। —তুলি বলল, তা তুই এ সময় এখানে? আমি তো ভেবে-ছিলুম, তুই এ সময় কলকাতায় থাকবি খেলার মাঠে। —বারিদ সে কথা কানে না তুলে বলল, ইংল্যাণ্ডের টনি গ্রেগ ফেগের মারের তুলনা নেই, আজ তো চার উইকেটে ওদের একশো পাঁচ হয়ে রয়েছে। ইণ্ডিয়া হারবেই। তুলি বলল, বলা যায় না, ক্রিকেটের ব্যাপার তো। বারিদ হাসল। বলল, যাক, তোর সাহেব কোথায়? তিনি কি কলকাতায় খেলার মাঠে লাইন দিচ্ছেন? তুলি বলল, উহুঁ, এখানেই। তবে কোথায় গেছে কে জানে? —সে কি, ভুরু কোঁচকাল বারিদ। বলল, বড় বেরসিক লোক তো। এই বাদলার রাতে বউ ফেলে কেউ পালায়? —তুলি অ্যাশট্রের ছাই ফেলে এসে বলল, হ্যাঁ, ঠিক তোর মত।

বারিদ হেসে বলল, আমার বউ? তিনি এখন কলকাতায় পিত্রালয়ে। রীতিমত আড্ডা দিচ্ছেন কফি হাউস কিংবা বসন্ত কেবিনে। —বাহ্ চমৎকার। তোর কপাল পুড়েছে তো?—তুলি রসিকতা করল। বারিদ হাসল না। বলল, একটা ভালো চাকরী বাকরী না হলে আর চলছে না। ফ্রিজ, গাড়ি, স্কুটার না হলে বউ ঘরে থাকবে না। নরম চোখে তাকাল তুলি। বলল, কি আমার পুরুষ মানুষ রে! বউকে বাগে আনার ক্ষমতা নেই। —হুঁ, হুঁ, অনেকেরই নেই। যেমন নেই চ্যাটার্জী সাহেবের। মুচকি মুচকি হাসছিল বারিদ। একটু সময় তাকিয়ে থাকল তুলি ওর দিকে। তারপর বলল, থাম, থাম, যে ঘর করে সে বোঝে। বারিদ এবার গম্ভীর হল। ও ঘরময় পায়চারি করছে। ওর এক হাত ঢোকানো প্যাণ্টের পকেটে। ও বলল, মেয়েরা স্রেফ চায় টাকা, বুঝলি? —যা, যা, হয়েছে। কটা মেয়ের সম্বন্ধে তোর অভিজ্ঞতা আছে রে? —তুলি জ্বলে উঠল। বারিদ জ্বলল না। ও হাসতে হাসতে বলল, আপাতত আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কথাই বলতে পারি। তুলি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ওহ্! বারিদ বলল, তোর মনে আছে তো, ছেলেবেলায় তোর পুতুল বিয়ের সময় তুই আমায় কর্তা বানিয়েছিলি আর তারপর আমাদের দুজনের একদিন বিয়ে হল খেলা-ঘরে। —বারিদের গোঁফের ফাঁকে হাসি, গলার স্বর কৃত্রিম গাঢ়। তুলি হয়ত কিছু বলত। কিন্তু ওর চোখ দুটো পড়ে গেল দরজায়। ও ঘরে টেলিফোন বাজছে। ও মোহন, মোহন, বলে চেঁচাল। কোন সাড়া পাওয়া গেল না মোহনের। বারিদ বলল, নির্ঘাৎ মা না তোর কর্তা ফোন হয় ডাকছে।

তুলি এগিয়ে এল ফোনের কাছে। সারাদিন এমনি অসংখ্য ফোন আসে নিজামের। স্বামী ভি আই পি হলে যা হয়। এদিকে স্ত্রীর প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি। ও রিসেপ-সনিস্ট মেয়েদের মত মুখে হাসি টেনে ফোন ধরে বলল, হ্যালো। থ্রী টু ফাইভ সেভেন।

—কে তুলি?

—অজন্তা নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি করছো?

—তুলি বলল, এই তো তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে এলুম।

কেন তোমার আয়া?—অজন্তা বলল। তুলি বলল, নেই, চলে গেছে। —সে কি!—অজন্তা বলল, তুমি চালাচ্ছো কি করে? আমি হলে তো হিমসিম খেয়ে মরতুম। এই দ্যাখো না, আমার তো এখন তিনটে লোক, তাও আমার চলছে না। অজন্তা বলল, সব থেকে ভাল হয় কি জানো? হ্যালো, হ্যালো, তুলি। তুলি বলল, বল, আমি শুনছি। অজন্তা বলল, আমাদের ফোনের ভেতরে বেশ গণ্ডগোল হচ্ছে। সবচেয়ে ভাল হয় কি জানো? কলকাতা থেকে একজন আয়া আনিয়ে নাও। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বসে পড়ল তুলি। বলল, ভাবছি, তাই করবো। তারপর, আর কি খবর বল?—অজন্তা বলল। পা দোলাতে দোলাতে তুলি বলল, এই চলে যাচ্ছে এক রকম। অজন্তা বলল, আজকের খেলার রেজাল্ট জানো তো? —তুলি বলল, খুব বাজে খেলেছে

ইঁশিয়ার! —অজন্তা বলল, যা বলেছ। আমার কত্তা তো আবার ওখানেই পড়ে রয়েছে। পঁচাত্তর টাকার টিকিট ব্ল্যাকে কিনেছে তিন শো টাকা দিয়ে। —খুক্ খুক্ করে সামান্য হাসল তুলি। অজন্তা বলল, এই, আমরা গাড়ি বিক্রী করছি। —তুলি বলল, কেন? —অজন্তা বলল, বড় কিনবো ভাবছি। এই ছোটতে আর চলছে না, এত ছোট। হাসল তুলি। ওদেরও ছোট। বুঝল, অজন্তা খুব ডাঁট নিচ্ছে। তুলি বলল, আমার আবার ছোট গাড়ি দারুণ লাগে।—অজন্তা বলল, আরে দূর, বড়োর কাছে কোন গাড়ি দাঁড়ায়? বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়ল তুলি। এত বকতে পারে অজন্তা। ওর বিরক্তি লাগছে। ও বলল, এই, আজ রাখছি, কেমন! —অজন্তা বলল, কেন, এত তাড়া কিসের? শোনো, শোনো, তোমার সংগে আমার অনেক কথা রয়েছে। —তুলি বলল, বল? এই সামনের ছুটিতে আমরা কাশ্মীর যাব ভাবছি, বাই কার। —তুলি জোরে হেসে ফেলল। বলল, পুজোর ছুটি? তার তো এখনও এক বছর দেরী। অজন্তা অপ্রস্তুতের হাসি হাসলো। বলল, বাই দি বাই, আচ্ছা, তুলি, রোববার ক্লাবে যাওনি কেন? জোর জমেছিল পার্টি। মানে বোতলের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো টপ হয়েছিল আর কি। আর আমি যা একখানা মাঞ্জা দিয়েছিলুম না? আগুন।—তুলি বলল, ইস্ খুব মিস করেছি তা হলে। আচ্ছা, এখন রাখছি, পরে কথা বলব। টুনটুনকে নীচে একলা রেখে এসেছি। —অজন্তা বলল, ও রে ব্বাস্, একলা রেখে এসেছ? কেন তোমার মোহন কোথায়? —তুলি নির্বিকার-ভাবে বলল, কে জানে, বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। —সে কি! অজন্তা বলল, তুমি এ সব টলারেট কর? —তুলি বলল, সব সময় করি না। —অজন্তা বলল, তার মানে মাঝে মাঝে কর? থাক্ সেদিন পার্টিতে গেলে না কেন? —হাই তুলল তুলি। বলল, এমনি ভাল্ লাগল না যেতে। —অজন্তা বলল, ভাল না লাগলেও যেতে হয়। হাসব্যান্ডকে সব সময় একা ছাড়তে নেই। অনেক সময় গার্ড দিতে হয়। চাপা হাসির আওয়াজ উঠল অজন্তার গলায়। —তুলি সন্দেহ-জনকভাবে তাকাল ছাদের শিলিংয়ের দিকে। তারপর বলল, কেন, আত্মবিশ্বাস কি আমি হারিয়ে ফেলেছি? —অজন্তা যেন প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, অতটা কনফিডেন্স থাকা ভাল নয়। —অনেকদিন আগে বাগানে একটা সাপ দেখেছিল তুলি, তার হিস্ হিস্ আওয়াজের কথা ওর মনে পড়ে গেল। তুলি রুক্ষ গলায় বলল, আমাদের ফোনের ভেতর বিশ্রী একটা আওয়াজ হচ্ছে, আমি রাখছি। —অজন্তা বলল, হ্যালো তুলি, জাস্ট এ মিনিট প্লিজ। তোমার কত্তাকে সেদিন আমরা যা নেশা করিয়েছিলুম না হুইস্কির মধ্যে চিনি মিশিয়ে! —কিছু না জেনেও তুলি বলল, জানি। —অজন্তা চেপে চেপে বলল, তারপর তোমার মিস্টার তো বাড়ি ফিরতেই চান না। আমরা জোর করে........, হা...হা...হা। —তুলির ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছিল। ও বলল, বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ তো? —মানে, অজন্তা বলল, উনি যা কান্ড করছিলেন মিসেস রাউতের হাত ধরে হা... হা...উনিও খুব টেনেছিলেন কি না। অজন্তা টেনে টেনে হাসতে লাগল। তুলি অধৈর্যের মতন রিসিভারটা ঝাঁকিয়ে বলল, হাত ধরে নেচেছিল তো? শুধু তাই নয়— অজন্তা তখনও হাসছে। বলল, ওঁকে জড়িয়ে ধরে...। ওর কথা কেড়ে নিয়ে তুলি বলল, কিস্ করেছিল? —মাই গুডনেস।— অজন্তা বলল, তুমি জানলে কি করে? —যদিও তুলি হাসছে, তবুও বুকের মধ্যে কাটা মাছের ছটফটানি টের পাচ্ছিল তুলি। তুলি স্বাভাবিকভাবেই বলতে চেষ্টা করল, মিস্টার চাটার্জীর এমন কোন সিক্রেট ব্যাপার নেই, যা তার স্ত্রীর অজানা। একটু যেন থমকে গেল অজন্তা। বলল, তুমি কি কিছু মাইন্ড করলে? —তুলি বলল, আরে না না, বন্ধুর বউদের সংগে ও যদি একটু ঠাট্টা তামাসা করেই থাকে, তা নিয়ে অত মাইন্ড করার কি আছে? আর এ-সবের তো চলই রয়েছে আজকাল? টুনটুন কাঁদছে, [illegible] কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তুলি ঝপ্ করে রেখে দিল ফোনটা। কিছুক্ষণ বসে থেকে বসে রইল তুলি। তারপর সব ব্যাপারটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল। ও খুব স্বাভাবিকভাবে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনল, বারিদ গাইছে, ও ডিয়ার সাচ সাচ আই ল্যাভ ইউ ভেরী মাচ, ভেরী মাচ, ভেরী মাচ। ঘরে ঢুকে তুলি দেখল, বারিদ টুন-টুনকে পিঠে নিয়ে সারা ঘরে ঘোড়া হয়ে ঘুরছে। দৃশ্যটা খুব উপভোগ্য। কিন্তু তুলি অন্যমনস্ক। অজন্তার কথার ধাক্কা তখনো এসে বাজছে ওর বুকে। মিসেস রাউত, অজন্তা, নিলয়, এরা সবাই তাল-গোল পাকিয়ে বিশ্রী একটা যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে। তবুও যন্ত্রের মতন হাসল তুলি। বলল, শেষ পর্যন্ত তুই আমারই মেয়ের প্রেমে পড়লি? —ব্যাঙের সুরে বারিদ বলল, হ্যাঁ, বিলেতে তো শাশুড়ির প্রেমেও পড়ার রেওয়াজ রয়েছে। তারপর ম্যাডামের কথা শেষ হল? তুই কার সংগে অত কথা বলছিলি রে? —তুলি বলল, তা দিয়ে তোর দরকার? —বারিদ হাসল। বলল, একটু কফি টফি কি চলবে? না শুধুমুখেই কোর্টে পড়তে হবে?—তুলি মোহনকে ডাকতে যাচ্ছিল, বারিদ বলল, আবার মোহন কেন? বেগম সাহেবার চিনি দুধ সব কোথায় জানলে আমিই করে খাওয়াচ্ছি। ঘরে করি স্ত্রীর পদসেবা, আর এখানে......। —তুলি
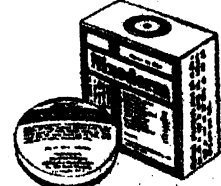
এমন চাউনি ছুঁড়ল যে বারিদের আর কথা শেষ হল না।

কফি করতে করতে তুলি ভাবছে, ও নিজেকে খেলো করেনি তো অজন্তার কাছে? অজন্তা যদি আবার কখনও আসে ও-সব বলতে? বারিদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কোকিলের ডাক ডাকল। তুলির ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি। বারিদ গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল, ও ডিয়ার সাচে সাচ......। তুলি বলল, বাংলা গান কি ভুলে গেছিস? বারিদ বলল, তবু তো চুল বাবরি করিইনি। —তা ওটাই বা বাকি থাকে কেন?—বলল তুলি। বারিদ বলল, তোর মেয়ে বড় হলে রাখবো। তুলি হাসল। ও তাকাল মেয়ের দিকে। দেখল, বারিদের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে টুনটুন। নীচেই ছিল উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা টুনটুনের ছোট্ট খাটটা। ওখানে ওকে শুইয়ে দিল তুলি। বারিদ ছেলেমানুষের মতন বলল, আচ্ছা, তোর মেয়ে বড় হলে আমায় কি বলবে বলত? মামা? —তুলি হাসল। বারিদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, হায়, প্রেয়সীর শিশু মোরে মামা বলে ডাকে। বাবা বলার কথা ছিল যাকে। —যাহ্, ফাজিল! ওর পিঠে একটা চড় মেরে হাসল তুলি। বলল, তুই এখনো ঠিক তেমনি রয়েছিস্? বারিদের তখন আর উত্তর দেবার সময় নেই। ও স্যান্ডউইচে কামড় দিচ্ছে তখন। তুলির বেশ লাগছে ওকে। ও যেন বার বার ফিরে যাচ্ছে ওর সেই ছেলেবেলার দিনে। বারিদ এলেই এমন হয়। তুলি যেন একেবারে বদলে যায়। ছেলেমানুষী করার সুযোগ তো আর সবার সঙ্গে হয় না। তুলির মনে হয়, ওর সেই তাজা নরম ঘাসের মতন সবুজ মনটা আজও মরেনি। বারিদ সেই মনটাকেই টেনে এনে খেলনার মতন দোলায়। বারিদ বলল, বেগম সাহেবা হঠাৎ চুপচাপ? —তুলি বলল, তোর বেগম-সাহেবা নামটা আমার এত বাজে লাগে! বারিদ বলল, তবে মেমসাহেব বলি? তুলি আবার অন্যমনস্ক। ও ভাবছে, নিলয় এখনও আসছে না কেন? ও কি সত্যি সেদিন অত বাড়াবাড়ি করেছিল? আর মিসেস রাউত? তিনিই বা কেমন মহিলা? আচ্ছা নিলয় সব চেপে গেল কেন? ও তো বললেই পারত সেদিনের ব্যাপারটা। বারিদ বলল আচ্ছা, তোর কি হয়েছে বল তো? —তুলি হাসল। বলল, ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে তাই। —রিয়েলি?—বারিদ প্রায় লাফিয়ে উঠল। —তুলি আরও বেশী করে হাসল। বলল, রিয়েলি। কথাটা ঠিক বারিদকে নকল করে। বারিদ বলল, হুঁ। মেয়েদের আবার মন আছে নাকি? —তুলি শান্ত চোখে তাকাল। বলল নেই? সব বুঝি আছে শুধু পুরুষের? ওর চোখে চোখ রাখল তুলি। কিন্তু বারিদের উত্তরটা ও খেয়াল করল না। নিলয়কেই ও ভাবছিল। ওর খুব দুর্বোধ্য লাগছিল স্বামীকে। দুপুরের আদর আবেগের সবটুকু স্পর্শ এখনো লেগে আছে ওর ঠোঁটে। নিলয় ওর সঙ্গে হয়ত লুকোচুরি খেলছে, ওর বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। —ছেলেরা কখনো সিন্যাসিয়ার হতে পারে না, না রে? —তুলি বারিদকে বলল। বারিদ বলল, আমায় কি সে সুযোগ তুই দিয়েছিলি?—বারিদের গলায় কৌতুক। তুলি ঠোঁট উলটে বলল, সুযোগ কেউ কাউকে দেয় না। নিতে হয়। —চোখে এক-রাশ কৌতূহল ছিটিয়ে বারিদ বলল, তাই নাকি? —তুলির চোখ দুটো কাঁচের জানলায়। ও দেখছিল ধুলোর পুরু সর। তুলির খেয়াল হল মোহনটা ফাঁকি দিচ্ছে কাজের। ওর মনে হল, আজকাল বড় বেশী ছাই ওড়ে কোক ওভেনের ফ্যাকটরী থেকে। কাঠের জানলাগুলো বন্ধ। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। তুলি ভাবল, নিলয় বড় ভীতু। ওর সাহস নেই, স্ত্রীকে সত্যি কথা বলার। ওই তো সেবার ও যখন লখনৌ গিয়েছিল নিলয়কে একলা এখানে রেখে, তখন তো ও একজনের সঙ্গে ভাবসাব করেছিল। ওদের এই বাড়িতেই ছিল সে। নিলয়ের এক ডাক্তার বান্ধবী। বারিদ পকেট থেকে একটা চুরুট বার করল। তুলির মনটা এখন এলো-মেলো। বলল, এই, তুই চুরুট খাস্? —বারিদ বলল, এটা আজে বাজে চুরুট নয়, আলকাজার। দেখবি কি ফাইন গন্ধ? চুরুট টেনে বারিদ আয়েশ করে ধোঁওয়া ছাড়ল। তুলি অন্যমনস্ক, সেও যেন গিলে ফেলল ধোঁওয়ার কয়েক টুকরো। তুলির বেশ মনে পড়ছে, লখনৌ থেকে ফিরে এসে ও একদিন দেখতে পেয়েছিল নিলয়ের বিছানার তলায়, অপরিচিত একটা নাইটি। ভদ্রমহিলার কথা ও জেনেছিল অনেক পরে। ও কি তা নিয়ে খুব অশান্তি করেছিল? আরে দূর! বরং স্বামীকে ঠাট্টার হাসি হেসে বলেছিল, কি ব্যাপার? তোমার বন্ধুটি গেস্টরুম ছেড়ে তোমার বেডরুমে আশ্রয় নিয়েছিলেন? নিলয় আমতা আমতা করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। ওকে থামিয়ে দিয়ে তুলি বলেছিল, বুঝেছি বুঝেছি, তুমি নিজে বোধ হয় গেস্টরুমে থেকে ওঁকে এ-ঘরে পাঠিয়েছিলে। নিলয় যেন বেঁচে গেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বারিদের কফি শেষ। ও বলল, নাহ্, শরীরটা আর গরমই হল না। তোর ফ্রিজে মাল-টাল নেই? —মুখ টিপে হাসল তুলি। বলল, নেই। —বারিদ তবু বেপরোয়াভাবে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে বলল আহ্! গ্র্যান্ড। ও টেনে নিয়ে এল ভ্যাট সিক্সটি নাইনের বোতলটা। ও বলল, ফাইন। একেবারে বিলিতী। —তুলি বসে বসে দেখছিল ওর সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া জুলুম। ওর মনে পড়ে যাচ্ছিল, হাফ প্যান্ট পরা ছোট করে চুল ছাঁটা ছেলেবেলার বারিদকে, যে ওর পড়ার ঘরে গিয়ে জোর করে কেড়ে নিত ছবির বই। প্যাচপেচে বৃষ্টিতে ওকে ল্যাঙ্ মেরে ফেলে দিত মাঠের কাদায়। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে জল মেশাল বারিদ। জলের ভাগটাই বেশী। ও হাসছিল। ও বুঝতে পারছিল, পানাসক্তির চেয়ে ওর পানের কায়দাটাই বড়। নিলয় কি আজ মদ খেয়ে ফিরবে? হয়ত তাই। তুলি ভাবল আবার, ও কি শেষ পর্যন্ত মিসেস রাউতের ওখানেই গেল? ও যদি সেখানে গিয়ে থাকে, তবে ওর চোখ দেখলেই টের পাবে তুলি। ও যে ওর জীবন চেনা। হা হা করে হেসে উঠল তুলি। বারিদ অবাক, ও জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল। তুলি বলল, নাহ্, হোপলেস। তুই কোন কাজের না। বারিদ বলল, বেশ তো শেয়ার কর। —তুলি বলল, যদি হেরে যাস? —চুরুটের ধোঁওয়া গিলল বারিদ। বলল, এত দূর! ক্রেডিটটা কার? সাহেবের?—বারিদ নিজেকে দেখিয়ে বলল, না, হতে পারত নায়কের? —কথাগুলো বলেই ও পিট পিট করে একটু হাসল। ও যেন প্রস্তুত হল পরবর্তী আক্রমণের জন্য। কিন্তু তুলি কিছুই বলল না। ও দেখছিল, ওর হাতের চুরুটের আগুন। ওর চোখে চোখ রাখল বারিদ। তুলি একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। ও বুঝতে পারছিল বারিদের দুর্বলতা। ওর একটা হাতের ওপর বারিদের হাত। বারিদের হাতটা বেশ কাঁপছে। হাত সরিয়ে নিল তুলি। ভাবল, কি লাভ? দেশলাইয়ের বাক্সটা এলোমেলো নাড়তে নাড়তে হঠাৎ একটা কাঠি বার করল ও। ফস্ করে ও একটা কাঠি জ্বেলে ফেলল। কাঠিটা পুড়ছে। তুলি তাকিয়ে থাকল। তারপর খানিকটা পুড়ে যাবার পর ও ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। বারিদ বলল, ভয় পেলি? তুলি বলল, না। —বারিদ বলল, তবে? —তুলি বলল, দেখতে ভাল লাগছিল না আগুন। —বারিদ বলল, তাই বলে কি আঙুলপোড়া ভাল? —তুলি অন্যমনস্ক। বারিদের চোখ স্থির, গভীর।

বারিদ চলে গেছে। তুলি দরজা বন্ধ করতে এসে ব্যালকনিতে দাঁড়াল। এখনও বৃষ্টি পড়ছে তেমনি। বাইরে বিদঘুটে অন্ধকার। শালবনের মধ্যে দিয়ে হুইসেল বাজিয়ে চলে গেল কোন এক এক্সপ্রেস ট্রেন। ফ্যাকটরীর আগুন উঠছে দূরের আকাশে। ফসফরাসের মতন কি যেন জ্বলছে। বাতাসে এখনও ভাসছে ভ্যাট সিক্সটি নাইনের সঙ্গে মেশানো আলকাজার চুরুটের গন্ধ। ধোঁওয়া। তুলির ভাবতে ভাল লাগছে এই মুহূর্তে বারিদের মুখের গন্ধটা। যদিও সে এখন অনেক দূরে। শুধু তার গামবুটের আওয়াজ আসছে ছপ্ ছপ্ ছপ্।

বিদেশী সন্ন্যাসী স্বামী পরহিতানন্দ

একতলার কোণের ঘরটি হল বৈঠকখানা। একটা টেবিল। খানকতক চেয়ার। মাঝখানের দেওয়ালে রামকৃষ্ণ-সারদামায়ের ছবি পাশাপাশি টাঙানো। বাঁদিকে পাগড়ি মাথায় স্বামীজীর সে-ই প্রতিকৃতি—সকলের চেনা। তাকালেই মনে হয় কি যেন বলতে চাইছেন। বিপরীত দিকের দেওয়ালে চেরাপুঞ্জির ছোট ছোট পাহাড়ের উপর রাশি রাশি তুলার মত কুন্ডলিপাকানো মেঘ। পাদদেশে দু-চারখানি বাড়ি। পিছনে বাঁধানো ফ্রেমে আঁটা হিমাচল প্রদেশের কোন একটি গ্রামের দৃশ্য।

মৌলালির মোড় থেকে হাঁটা পথে মিনিট দশেকের রাস্তা। সি আই টি রোড ধরে পারক সারকাসের দিকে যেতে ডানদিকে ডিহি এনটালি রোড। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত আশ্রমটি এখানে। সাদা তেতলা বাড়ি। এই বাড়ির এক তলার ওই বৈঠকখানায় বসে আলাপ হল স্বামী পরহিতানন্দ মহারাজের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ মিশনের লনডন বেদান্ত সেন্টারের প্রথম ইংরেজ, বিদেশী এই সন্ন্যাসীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আশ্রমের ম্যানেজার জয়রাম মহারাজ। গেরুয়াধারী এই সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকেই করজোড়ে বাংলায় বললেন : 'নমস্কার।' তখন বিকেল চারটে। পরহিতানন্দ মহারাজ সবে ধ্যান শেষ করেছেন। লক্ষ্য করলাম, এখানে অন্যান্য মিশনের মত পুজোর কোন ব্যবস্থা নেই। প্রশ্ন করতেই মহারাজ বললেন : স্বামীজীর নিজের বিধান অনুসারেই অদ্বৈত আশ্রমে পুজোর কোন ব্যবস্থা না থাকলেও সন্ন্যাসীদের ধ্যানে বসা আবশ্যিক কর্তব্যগুলির অন্যতম। তবে তার সময়টা আমরা সুবিধামত ঠিক করে নিতে পারি। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের প্রধান কার্যালয়েও একই ব্যবস্থা।

পঞ্চাশোর্ধ বিদেশী এই সন্ন্যাসী আজ থেকে তেইশ বছর আগে পর্যন্ত সকলের কাছেই জন স্মিথ নামে পরিচিত ছিলেন। কৈশোরে মাতৃহারা জনকে ওই নামে ডাকবার মত একমাত্র বৃদ্ধ বাবা ছাড়া এখন আর কেউ নেই। জনের এক ভাই ক্রিকেটার। পাহাড়ে ওঠবার সময় পড়ে গিয়ে মারা যায়। ছোট ভাই ডাক্তার। বোন তাই আছে। বোনটির বিয়ে হয়ে গেছে। প্রশ্ন করলাম, আপনার বাবা লনডনের গ্রামে একাকী জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর জন্য কি আপনার মনটা মাঝে মাঝে উতলা হয়ে ওঠে না ?

গেরুয়া রংয়ের ঢিলেঢালা পাঞ্জাবিটার আস্তিনটা খানিকটা টেনে উপরের দিকে সরিয়ে দিলেন পরহিতানন্দ। বললেন, কেন। আপনি সেই গল্প শোনেন নি। বাবা বিশ্বনাথ দত্ত মারা যাবার পর স্বামীজী কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন। পবিত্র মার কাছে ছুটে যান। মা তখন বলেছিলেন : সব ঠিক হয়ে যাবে। বাজে চিন্তা করিস না। বাবার কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পাই। উত্তরও দি।

আমাদের মত জনের সাধ, আহ্লাদ, ভালবাসা সব কিছুই ছিল। দেখতেও সুন্দর। হাসিখুশী। মুণ্ডিত মস্তকটি পাঁচ-ছদিন আগে গজিয়ে ওঠা কালো চুলে ভর্তি। পড়াশুনাও করেছিলেন। কিন্তু তেইশ বছর আগে ১৯৫০ সালে কিংস হলে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর বক্তৃতা তাঁর জীবনের সবকিছু ওলট পালট করে দেয়। কিংস হলের সেই মধুর সন্ধ্যায় জনের জীবনে নিয়ে এল পরিবর্তনের জোয়ার। বাহুর লনডনের হাতছানি তাঁকে আর টেনে নিতে পারল না। টেনে নিল লনডনে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ওই সন্ন্যাসী স্বামী ঘনানন্দ মহারাজ। এমনি করে ত্রিশ বছরের যুবক জন একদিন সকলের অজ্ঞাতে বেদান্তের মধ্যে ডুবে গেলেন। আধ্যাত্মিকতার জগতে ঘনানন্দের কাছেই জনের হাতে খড়ি। ঘনানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর লনডন সেনটারের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

স্বামী পরহিতানন্দের কথায় : সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবকিছুই ত্যাগ করতে হয়। এমনকি নিজের শেষকৃত্যও আগে থেকে সেরে নিতে হয়। এর জন্য সন্ন্যাসীকে কঠিন পথের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। পদস্খলন হলেই পতন অনিবার্য। সংসারে থেকে পাঁচজনের সঙ্গে

মিলমিশে নিজের আত্মার মুক্তির সাথে সাথে পরের সেবায় নিজেকে কেন না কোন ভাবে লাগাতে হবে। এই হল বেদান্তের নির্যাস সত্য।

বিবেকানন্দের মত পরহিতানন্দ মহারাজও সর্বকিছু বাজিয়ে নিতে ভালবাসেন। স্বামী ঘনানন্দকেও বাজিয়ে নিয়েছিলেন। লনডন থেকে একশ মাইল দূরে ডরসেট কাউন্টির ব্রায়নস্টান এবং পরে আমেরিকার কেনট স্কুলের কৃতী ছাত্র যুক্তি দিয়ে সব কিছু বুঝে নিতে চান। হ্যামস্টেডের এক কামরার ছোট ফ্লাট থেকে কিভাবে হল্যান্ড পার্কে অনেকটা জায়গা নিয়ে লনডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার গড়ে উঠল তা তাঁর জানা। শুধু লনডন কেন, সারা ইংলণ্ডে পরহিতানন্দ মহারাজ হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ইংরেজ সন্ন্যাসী। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৮ দীর্ঘ আঠার বছর একনাগাড়ে যুক্ত পরহিতানন্দ মহারাজের সংগে লনডন সেন্টারের যোগাযোগ আজও অম্লান।

'টমাস হারডির নামানুকরণে হারডি কাউন্টির এক কালের বাসিন্দা পরহিতানন্দের উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে। হারডির হলে তো আর কথা নেই। ডরসেসটারই হল হারডির জন্মভূমি। 'দি মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ' উপন্যাসে ডরসেসটারকেই ক্যাসটার ব্রিজ বলে উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক হারডি।

পরহিতানন্দ মহারাজ বললেন : ব্রানফোরড ব্রায়নস্টান স্কুলে পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে আমাদের প্রভাবিত করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সচিব লেনারড এলমহারস্ট ডারটিংটন হল প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকটা শান্তিনিকেতনের মত। ব্রায়নস্টান স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডারটিংটন হলের মত ছেলেমেয়েদের একই সাথে লেখাপড়ার ব্যবস্থা চালু করেন। পাঁচশ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের আশ্রমিক পরিবেশ সত্যি খুব ভাল লাগত। বড় হয়ে একবয়সী মেয়েদের সাথে চুটিয়ে আড্ডা মেরেছি। সিনেমায় গিয়েছি। কারও মনে কোন জড়তা ছিল না। শিক্ষা, শিক্ষা বলে ভারতের মত আমাদের দেশেও অনেক নেতা চীৎকার চেঁচামেচি করে থাকেন। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে কুলিন বলে পরিচিত সেই লনডনেও ব্রায়নস্টানের মত আশ্রমিক পরিবেশ ক'টি স্কুলে আছে বলা কঠিন। অথচ এই পরিবেশই যে মানুষকে সত্যিকারের শিক্ষিত করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে সেই সহজ উপলব্ধিটা রবীন্দ্রনাথের মত আর কজন বুঝেছেন জানি না।
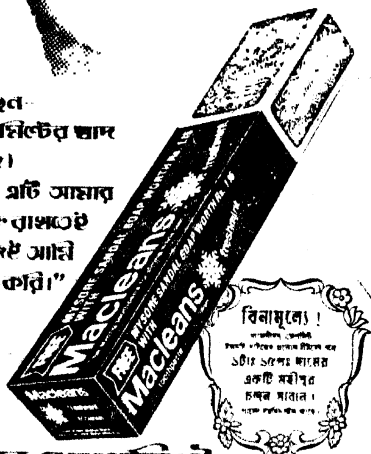
মহারাজ পায়ের রবারের চটিটা খুলে আরও সহজ হলেন। টেবিলের উপর চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বললেন : খেয়ে নিন। পরে লিখবেন। ঠান্ডা হয়ে গেল। কেটলি থেকে খানিকটা চা কাপে ঢেলে দিলেন। স্কুল ছেড়ে ১৯৪০ সনে সেনাবাহিনীতে নাম লেখালেন। দু বছর পর এলেন ভারতে। ১৯৪৬-এ দেশে ফিরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি নিয়ে কিছুকাল বইপত্র নাড়াচাড়া করলেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। কৃষিতে তাঁর মন বসেনি। তাই 'দল চল নিত্য নিকেতনের' রচয়িতা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ তাঁকে টেনে নিল। জানতে চাইলেন, রামকৃষ্ণ এবং হোলি মাদারকে।

প্রশ্ন করলাম, আপনি সন্ন্যাসী হতে চাইলেন আর তার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ পেয়ে গেলেন?

পরহিতানন্দ মহারাজ কথা বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। হাতে ইংরেজি 'প্রবুদ্ধ ভারত'এর একটা কপি। পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন : একি হাতের মোয়া, চাইলেই পাওয়া যায়! এরজন্য আমাকে দীর্ঘ পনেরটি বছর সাধনা করতে হয়েছে। পদে পদে পরীক্ষা। একের পর এক সিঁড়ি অতিক্রম করার পরই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে অবশ্য বার বছর কৃচ্ছ্রসাধনার পর সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের অনুমতি দেবার বিধান আছে। কিন্তু বিদেশীদের ক্ষেত্রে আরও বেশি সময় ধার্য আছে—অন্তত পনের বছর।

সহজ, সরল, সুন্দর বিদেশী এই সন্ন্যাসী কেন নিজ ধর্ম ছেড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে এলেন তা নিয়ে তেমন কিছু বলতে চান না। তাঁর কথায় : ভাল লাগল।

তাই চলে এলাম। কামারপুকুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, মা-পাগল। মামুদবাটি ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের ভিতর ঢুকে অভিজ্ঞতা থেকে বললেন : যত মত, তত পথ। কোন ধর্মকেই তিনি অবজ্ঞা করেন নি। আটটি অক্ষরে এই গভীর উপলব্ধির কথা কজন মহাপুরুষ শোনাতে পেরেছেন। তাইতো আমরা রাম ও কৃষ্ণ—উভয়ের সমন্বয় দেখতে পাই রামকৃষ্ণের ভিতর। ঠাকুরের মত আমরাও কালীবাড়ি গিয়ে মা-মা বলে ডাকি। এই মা কে 'কথামৃত'তে রামকৃষ্ণ একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন : 'A snake in motion and the snake in just.' অর্থাৎ একই সাপ চলমান অথবা বিশ্রাম-রত। চলমান বলতে পৃথিবী সেই সর্বশক্তি-মানের দ্বারাই চালিত হচ্ছে। আবার যখন বিশ্রাম করছেন তখন তিনিই হলেন সর্ব-শক্তির আধারস্বরূপ ব্রহ্ম।

জয়রামবাটি-কামারপুকুর পরহিতানন্দের বড় ভাল লেগেছে। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, পুকুর, ডোবা, ঝিঁঝি পোকার ডাক, বাঁশঝাড়, নাম-না-জানা বুনো পাখি, কাঁচা রাস্তার মাটির গন্ধ সবকিছু মিলিয়ে চারি-দিককার গ্রাম্য পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এরই একটি কুঁড়ে ঘরে জন্মেছিলেন 'হলি মাদার'— সারদা দেবী। সন্ন্যাসী পরহিতানন্দ একজন কবিও বটে। শ্রীমায়ের লীলা নিয়ে সম্প্রতি তিনি পাঁচটি কবিতা লিখেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও অদ্বৈত আশ্রমের বইয়েও তা ছাপা হয়েছে। 'হব্ল্‌ স্পেল—ইন ফাইভ অ্যাক্টস' নামাঙ্কিত প্রথম কবিতাটিতে সারদা দেবীর সঙ্গে রামকৃষ্ণের বিয়ের রাত্রির সেই কাহিনীটি স্থান পেয়েছে। গদাধরের সাথে সারদার বিয়ের অনুষ্ঠানের পর বালিকা বধূ রাত্রে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই ফাঁকে চেয়েচিন্তে ধার করে আনা সোনার গহনা-গুলি আত্মীয়-স্বজনেরা খুব সন্তর্পণে তাঁর গা থেকে খুলে নিলেন। কিন্তু ওই শুভ রাত্রে বালিকা বধূ সারদা 'হৃদয়-স্বরূপ যে গহনা' পেয়েছিলেন তা কেউ চুরি করে নিতে পারেনি। মূল কবিতার দুটি লাইন এখানে তুলে ধরছি :

"After the ceremony they took from
her while sleeping
the jewels borrowed for the occasion;
the jewel who had stolen her heart
they could not take from her".

পরহিতানন্দের কবি-মনের পরিচয় এর ভিতরেই মেলে। ধর্ম সংক্রান্ত নানা ধরনের প্রবন্ধ লেখাতেও তাঁর হাত পাকা।

জয়রামবাটির কাছে কোলপুরে জগদম্বা আশ্রমে জনৈক অপরিচিতা মহিলা তাঁকে 'হলি মাদার'এর মাথার চুল উপহার দিয়েছেন। সেটি তিনি সযত্নে তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন। সময় পেলে তাঁর আবার জয়রামবাটি-কামারপুকুর যাবার ইচ্ছে আছে।

লনডন সেন্টারে থাকবার সময় পরহিতা-নন্দ মহারাজ দেখেছেন, বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের সেন্টার আরও বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। সারা ইংলণ্ডে মাত্র একটি সেন্টার। তাতেও ইংরেজ সন্ন্যাসী এ পর্যন্ত তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। ব্রহ্মচারী অবশ্য তিন-চারজন আছেন। আমেরিকার ১৪টি ছাড়া প্যারিস, সুইজারল্যাণ্ড, আরজেনটিনা, মরি-শাস, ফিজি, সিংগাপুরে মাত্র একটি করে কেন্দ্র। সিংহলে (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) আছে দুটি। রেঙ্গুনের সেন্টারটি এখন একজন ব্রহ্মদেশের মহিলার উপর ন্যস্ত। তার কারণ, ব্রহ্মদেশ সরকারের নির্দেশে স্বামীজীরা সেখান থেকে অনেকদিন আগেই বিতাড়িত। সাধুর অভাবই নতুন সেন্টার খোলার প্রধান অন্তরায়। অথচ প্রতিটি কেন্দ্রই আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধীনে সর্বসাকুল্যে ৭০০ সন্ন্যাসীও হবে না। মিশন এত স্কুল কলেজ চালাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক ছাত্রকে এদিকে আকর্ষণ করা যাচ্ছে না কেন?

পরহিতানন্দ বললেন : ডোণ্ট আস্ক্ মি দিস কোশ্চেন। এ ব্যাপারে মঠের সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজই হলেন যথো-পযুক্ত ব্যক্তি। নিশ্চয়ই তাঁরা এ নিয়ে ভাবছেন।

পরহিতানন্দ মহারাজ কবিতা লিখতে ভালবাসেন। তার পরিচয় আগেই পেয়েছি। অদ্বৈত আশ্রমের 'প্রবুদ্ধ ভারত' ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদনার দায়িত্বও তাঁর উপর যদিও তাতে নাম তাঁর নেই। বাংলা বলতে পারেন। বুঝতে পারেন। সকালবেলায় ধ্যান শেষে রেডিও খুলে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন। মহারাজ বললেন : ভাষা বুঝি না। কিন্তু হৃদয়ের তারে স্পন্দন জেগে ওঠে। মাঝে মাঝে বুদ্ধদেব বসু অথবা কৃষ্ণ কৃপালনির ইংরেজি অনুবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আস্বাদ পাবার চেষ্টা করি। বিদেশী এই সন্ন্যাসীর বড় আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতাগুলির রস তিনি কোনোদিনই হয়ত পাবেন না। এর জন্য অবিলম্বে রবীন্দ্র-নাথের রচনাবলী অল্প 'পয়সা'য় ইংরাজীতে অনুবাদের প্রয়োজন।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালির ইংরেজি অনুবাদ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। পড়তে পড়তে অনেক সময় ডরসেটে তাঁর ছোট্ট বাড়ি, তার পাশ দিয়ে নদীটির কথা মনে পড়ে যায়। শুনেছেন, সত্যজিৎ রায় এই বইয়ের চিত্র-রূপ দিয়েছেন। দেখার খুব ইচ্ছে। এখনও সুযোগ আসেনি। যাত্রা-থিয়েটার তাঁর খুবই প্রিয়। ভাষা না বুঝলেও খবর পেলে যান। দেখেন। ভাল লাগে। আনন্দ পান। মাঝে-মধ্যে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে বিবেকানন্দ সম্পর্কে বক্তৃতা শোনেন। খাওয়া-দাওয়ার কোন শখ নেই। পেটটা ভাল না। ভাতে-ভাত পেলে খুবই খুশী।

পরহিতানন্দের কথায় ফিরে আসি। সকলেই বলেন, কলকাতা নোংরা শহর, দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। এটাই তো কলকাতার সবচেয়ে বড় গর্ব যে এই নোংরা শহরই বিশ্ব-বাসীর কাছে বিবেকানন্দকে উপহার দিয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন রামকৃষ্ণ-সারদা মায়ের অমোঘবাণী। তাঁরাও তো এই বাংলাদেশের মাটিতে জন্মেছেন। শৈশব, কৈশোর, যৌবন কাটিয়ে বেড়ে উঠেছেন। একথা ঠিক, বিবেকানন্দের শহর লক্ষ লক্ষ মানুষের এই শহরকে আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় পরিচ্ছন্ন করে তুলতে হবে। আজ কলকাতা পরিচ্ছন্ন থাকলে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা শহরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আজ আমাদের এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। রাজনীতির আবর্তে আমরা যেন জড়িয়ে না পড়ি। চরিত্র গঠন হলে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

পরহিতানন্দ মহারাজ কথায় কথায় জানালেন, বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে থেকে সমস্ত পর্যায়ে আরও গবেষণা দরকার। এই তো ধরুন বরাহনগর মঠ। এই মঠে স্বামীজী সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। অথচ এখন সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দারা সক্রিয় হয়েছেন জেনে তিনি খুশি। বেলুড় মঠে গেলে গঙ্গার ওপারে দক্ষিণেশ্বর, উদ্যান-বাটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে বরাহনগর মঠের একটা ছবি ভেসে ওঠে। যে ছবি তিনি দেখেননি।

কথা বলতে বলতে রাত্রি হয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে একবার উপরে উঠলাম। জয়রাম মহারাজের অনুরোধে এক কাপ কফি খেতে হল। কফি শেষ করে নীচে নামলাম। পরহিতানন্দ মহারাজও নামলেন। সি আই টি রোডে বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এসে একখানি মিনি বাসে তুলে দিলেন। বাসের জানলায় মুখ বাড়িয়ে কিছু সময় আত্মপ্রচারবিমুখ গেরুয়াধারী ওই বিদেশী সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—সুদেব রায়চৌধুরী

বিদেশ থেকে নেওয়া সাহায্য ও ঋণ পরিশোধ

"ভারত সাহায্য সংস্থা" বা Aid India Consortium ভারতকে প্রতি বছর যে সাহায্য দিয়ে থাকে তার একটি বিরাট অংশ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ অথবা বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারত বিদেশ থেকে যে ঋণ এবং অনুদান পেয়েছিল তার মধ্যে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৬৪৪ কোটি টাকা ও ৮৬ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যে ভারত বিদেশ থেকে মোট ৪,৩৪২ কোটি টাকার ঋণ এবং ২৯৬ কোটি টাকার অনুদান পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে এই ঋণ ও অনুদানের প্রকৃত ব্যবহার করা হয়েছে যথাক্রমে ৪,৩১০ কোটি টাকা ও ৩৫৯ কোটি টাকা। পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে সাহায্য পেয়েছে তার হিসেব এখানে ধরা হয়নি। বছরের পর বছর ভারত বিদেশ থেকে যে সাহায্য গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে যে পরিমাণ ঋণ বিদেশ থেকে নেওয়া হয়েছে সুদে-আসলে তার পরিমাণ এখন এত বেশি হয়েছে যে রপ্তানির মাধ্যমে আমরা যে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করি অথবা বিদেশ থেকে এখন যে ঋণ গ্রহণ করে থাকি তার একটি বিরাট অংশ চলে যায় সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য অথবা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের উপর সুদ প্রদান করার জন্য।

১৯৭৩-৭৪ সালে ভারতকে পুরোনো ঋণের উপর সুদ প্রদান করার জন্য অথবা [illegible] ঋণ পরিশোধ করার জন্য [illegible] ১৯৭ [illegible] সালে ভারতে [illegible] অথবা তার উপ [illegible]

সালে এই উদ্দেশ্যে "ভারত সাহায্য সংস্থা" ১৭৫ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করবে। প্যারিসে ১৪ই ও ১৫ই জুন "ভারত সাহায্য সংস্থার" বৈঠকে বিশ্ব ব্যাংক এই মর্মে সুপারিশ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত এবছর "ভারত সাহায্য সংস্থার" কাছ থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালে ১২০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পেতে পারে। তার মধ্যে ৭০০ মিলিয়ন ডলার হবে প্রকল্প-বহির্ভূত এবং ঋণ মোচনের খাতে সাহায্য; অবশিষ্ট ৫০০ মিলিয়ন ডলার হবে প্রকল্প-সম্পর্কিত সাহায্য। ১৯৭২-৭৩ সালে বিশ্বব্যাংক এই সংস্থা থেকে ভারতকে ১২৫০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেওয়ার সুপারিশ করেছিল; তার মধ্যে ৯০০ মিলিয়ন ডলার বণ্টিত হয়েছিল। আশা করা যায় ১৯৭৩-৭৪ সালে ১০৫০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য বণ্টিত হতে পারে। গত বছর থেকে এ বছর সাহায্যের প্রকৃত বণ্টন যে বেশি হতে পারে এই আশার কারণ হল, এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এ বছর আরও সক্রিয় হবে। তবে প্রশ্ন হল, ডলারের মূল্য যে হারে কমছে তাতে সাহায্য হিসাবে যে ডলার পাওয়া যাবে, তার প্রকৃত মূল্য কি অনেক কমে যাবে না? ডলারের ক্রমহ্রাসমান মূল্যের ভিত্তিতে যদি ঋণ পরিশোধ অথবা ঋণের উপর সুদ প্রদান করা হয়, তবে ১৯৭৩-৭৪ সালে ভারতের দেয় অর্থের পরিমাণ ৬৯০ মিলিয়ন ডলারের পরিবর্তে ৭২৮ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে 'ভারত সাহায্য সংস্থার' অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির কাছে ভারতের মোট ঋণের মধ্যে ৫৪৩ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে। তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণের পরিমাণ হল ১২৭ মিলিয়ন ডলার, পশ্চিম জার্মানীর কাছে ঋণের পরিমাণ হল ১০৪ মিলিয়ন ডলার, জাপানের কাছে ৮৯ মিলিয়ন ডলার, বৃটেনের কাছে [illegible] মিলিয়ন ডলার, ইটালির কাছে ২৭ [illegible] এবং ফ্রান্সের কাছে ২৭ মিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন [illegible] ১৯ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা [illegible] এ বছর ৬৪ মিলিয়ন [illegible] করতে হবে। 'ভারত সাহায্য সংস্থার' বাইরে অন্যান্য দেশের কাছেও ভারতের যথেষ্ট ঋণ আছে। শুধু পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে এ বছর ১০৪ মিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। গত বছর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ভারতকে ৭৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল; আশা করা যায় এ বছর ওই সংস্থা থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ পাওয়া যাবে।

পি এল ৪৮০ অনুযায়ী ভারত খাদ্য-সামগ্রীর জন্য আর ঋণ গ্রহণ করবে কিনা, এটাই এখন ভাববার বিষয়। ১৯৭০-৭১ সাল ভারত নতুন করে পি এল ৪৮০ ঋণ নেয়নি; ১৯৭১-৭২ সালে এ জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকা। তবে ১৯৭০-৭১ সালে আগের অনুমোদিত পি এল ৪৮০ ঋণ-তহবিল থেকে ভারত ৩৪ কোটি টাকা ব্যবহার করেছিল। ১৯৭১-৭২ সালে পি এল ৪৮০ ঋণের ব্যবহার হয়েছিল ১ কোটি টাকার। ১৯৭২-৭৩ সালে নতুন করে পি এল ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী আমদানি না করা হলেও ১৯৭৩-৭৪ সালে এজাতীয় আমদানী করা হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন না বাড়াতে পারলে অথবা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন না করতে পারলে পি এল ৪৮০ অনুযায়ী ঋণ গ্রহণ বন্ধ হবে বলে মনে হয় না, এবং এটা সর্ববিদিত যে যতদিন এই তহবিল থেকে টাকা তোলার ব্যবস্থা থাকবে ততদিন মুদ্রাস্ফীতির একটি কারণও সক্রিয় থাকবে।

ভারতের পক্ষে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের মূলে সমস্যা হল এখন দুটি। একটি হল, যে ঋণ পাওয়া যায়, তার উপযুক্ত ব্যবহার করার সমস্যা। যে সব ঋণ প্রকল্পভিত্তিক ঋণ (Project Loan) হিসেবে পাওয়া যায়, সেগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অপর সমস্যাটি হল বিদেশ থেকে ঋণ ও অনুদান হিসেবে যে বিনিময় মুদ্রা পাওয়া যায়, তার একটি বিরাট অংশ আগেকার ঋণ পরিশোধের জন্য অথবা আগেকার ঋণের উপর সুদ প্রদান করার জন্য খরচ হয়ে যায়। অতীতে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, তার জের মেটাতেই আজ ভারতকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। তবুও সুখের বিষয় এই যে, ভারত অতীতের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে কখনই পেছ-পা হয়নি। তবে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। যতই রপ্তানি বাড়বে অথবা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ বাড়বে, বিদেশ থেকে গ্রহণযোগ্য ঋণের উপরে নির্ভরতাও ততটা কমবে। সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজতে হবে সাহায্যের মধ্য দিয়ে নয়, বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে।

সুব্রত গুপ্ত

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী শান্তনু ভট্টাচার্য, মনোহর লাল, শর্মিলা রায়, চিত্রা মোহান্তী, তড়িৎ ভট্টাচার্য ও অপূর্ব শাউ-এর একটি যৌথ গ্রাফিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রথম জন শিল্পী হিসাবে পরিচিত, বর্তমানে শান্তি-নিকেতন কলাভবনে গ্রাফিক শিল্পে গবেষণা করছেন। মনোহর লাল লখনৌ আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করে এখন রাষ্ট্রীয় বৃত্তি লাভ করে অধ্যাপক সোমনাথ হোড়ের কাছে উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। অন্যান্য শিল্পিগণ কলাভবনে গ্রাফিক শিল্পের বিশেষ শিক্ষা-ধারায় (স্পেসিয়ালাইজড স্ট্রীম) শিক্ষা লাভ করে শেষ পরীক্ষা দিয়েছেন। প্রদর্শনীতে মোট ৩৬টি গ্রাফিক প্রিন্ট নিদর্শন দেখা যায়। গত কয়েক বছর কল-কাতায় অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনী যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, দেশের শিল্পকলা ক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে কলাভবন আজ একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে গ্রাফিক চিত্রকলা যে এদেশে কেন ব্যাপক-ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সে বিষয়ে ইতিপূর্বে বহুবার আলোচনা করেছি, সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বিদেশের অনুকরণে নিত্য নতুন মাধ্যম ও নতুনতর প্রিন্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নানা সূক্ষ্ম ও বিচিত্র কারুকার্য সৃষ্টির প্রবণতাই অধি-কাংশ প্রিন্টে দেখা যায়—মৌলিক আকার তথা যথার্থ শিল্পসৃষ্টি প্রচেষ্টার বিশেষ পরিচয় মেলে না! পরন্তু, কলাভবনের শিক্ষাধারায় প্রিন্ট বৈচিত্র্য বজায় রেখে প্রধানত মৌলিক শিল্প ও রস সৃষ্টি করার ওপরেই প্রাধান্য দান করা হয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে খ্যাতনামা গ্রাফিক শিল্পী সোম-নাথ হোড়ের অবদান অনস্বীকার্য। শান্তনু ভট্টাচার্যের বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত সিল্কস্ক্রীন প্রিন্টগুলিতে আকার ও আয়তনিক রূপ বিশেষভাবে ধরা পড়ে, যেমন স্টিল লাইফ। আকার ও রঙব্যবহার কৌশলে প্রায় প্রত্যেক প্রিন্টেই একটি কোলাজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে বেগুনী, হালকা সবুজ রঙ ও কমলা রঙপ্রধান, কারুকার্য সমন্বিত দি শপ-এর নাম করা চলে। ছাই

স্টিল লাইফ —শান্তনু ভট্টাচার্য

রঙ প্রধান আই অ্যান্ড মাই স্টুডিও-ও উল্লেখ্য। মিশ্র রচনা ও প্রিন্ট পদ্ধতির জন্য মনোহর লালের কয়েকটি নিদর্শন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে কলো-গ্রাফ অ্যান্ড সেরিগ্রাফ-১০। কালো সিল্ক স্ক্রীনের পরিপ্রেক্ষিতে নীল রঙের ডিম্বাকার ও এমবসড্ কারুকার্য সুন্দর নিদর্শন। কাঠের স্বাভাবিক দানা (গ্রেন) সৃষ্টি করে ও আকারসর্বস্ব কারুকার্যের অবতারণা করে শিল্পী উডকাট এম-২-এ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শর্মিলা রায়ের কমপো-জিশনগুলিতে কালো-সাদার চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়, বিশেষ করে নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে সাদা রেখাবৈচিত্র্য সমেত কমপোজিশন-৪ ও সূক্ষ্ম রেখা ব্যবহারের জন্য কমপোজিশন-৩ প্রিন্টের নাম করা চলে। অ্যাকুয়া টিন্টের প্রশংসনীয় নিদর্শন হিসাবে কমপোজিশন-২ উল্লেখ্য। চিত্রা মোহান্তীর এচিং নিদর্শনগুলিতে বিশেষ-ভাবে আকার প্রাধান্য ধরা পড়ে, যেমন এচিং ১ বা এচিং ৩—দুটিতেই শিল্পীর নির্ভুল ও বলিষ্ঠ ড্রয়িং-এর পরিচয় মেলে। তড়িৎ ভট্টাচার্যের উডকাট নিদর্শনগুলি আলঙ্কারিক, তবে লিথো নিদর্শন বিমূর্ত। দুটি প্রিন্ট চোখে পড়ে—ইমেজারিপ্রধান হ্যাপি স্টোন ও লিথোগ্রাফ উইথ এ কম-

লিথোগ্রাফ উইথ এ কমপোজিশন —তড়িৎ ভট্টাচার্য

কোলাজ —শোভন সোম

পোজিশন। অপূর্ব শাউ-এর অধিকাংশ নিদর্শনই সাররিয়্যালিস্টিক, যেমন ইকো। আকার ও ইঙ্গিতপ্রধান মূর্তির অবতারণার জন্য রক্ষকতু সর্বদেবতা অনেকের চোখে পড়ে। দু-একটি প্রিন্ট শ্লেষাত্মক। কুৎসিত দৈত্যাকার কয়েকটি মূর্তির অবতারণা করে শিল্পী যেন সমকালীন সমাজের ওপরই কশাঘাত করেছেন। নিছক চমক ও কারু-কার্যপ্রধান প্রিন্ট দেখতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের কাছে কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের আকার ও রসপ্রধান প্রিন্টগুলির নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য যে সহজেই ধরা পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

※

শিল্পী শোভন সোম অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তেল রঙ, কালি ও প্যাস্টেলে আঁকা কয়েকটি ছবি ও কোলাজ নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পী বহুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষালাভ করেন ও প্রাচীরচিত্রকলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইতিপূর্বে তিনি শান্তিনিকেতন ও নাগপুরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৯৬২ সালে কলকাতায়ও তাঁর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। ভারতের বিভিন্ন শহরে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া এডুকেশন অফিসারস ট্রেনিং কোর্স উপলক্ষে তিনি শিল্পকলার ব্যবহারিক প্রচারবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু ভাষণও দান করেছেন। কল্যাণীর ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড স্টাডি সেন্টার ও জব্বলপুরের শহীদস্মারক ও গভর্নমেন্ট হোম সায়েন্স কলেজেও তাঁর আঁকা প্রাচীরচিত্র দেখা যায়। সম্প্রতি শিল্পী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কন বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। বহুকাল পরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর প্রদর্শনীতে মাত্র কয়েকটি নিদর্শন দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পপ্রতিভার বিশেষ সন্ধান মেলে না। সকলেই জানেন যে শিল্পকলা ক্ষেত্রে কলকাতা আজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে—সারা বৎসরব্যাপী এখানে প্রদর্শনীর নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সুতরাং দীর্ঘকাল পরে কলকাতার মত শহরে প্রদর্শনীর আয়োজনকালে শিল্পী এ বিষয়ে সচেতন হলে ভাল হত। কারণ তুলনামূলকভাবে বিচার করলে মনে হয় শিল্পী এখনও যেন নিজের একটি বিশেষ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ আছেন। অথচ, দু-একটি নিদর্শন দেখে আবার বোঝাও যায় যে, শিল্পী সমকালীন চিত্রকলা ধারার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নন। এক কথায় বিচিত্রতর নিদর্শন সম্ভার নিয়ে তাঁর কলকাতার শিল্প আসরে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল—অন্তত দু-একটি প্রাচীর-চিত্রের নিদর্শনও তিনি রাখতে পারতেন। শিল্পীর রচনাগুলি অধিকাংশ স্থলেই বিশেষ বিষয়মূলক, অর্থাৎ নিজের ছোট্ট মেয়েকে কেন্দ্র করেই তিনি নানা ছবি এঁকেছেন। ঘরে ও বাইরে বিভিন্ন সময়ে মেয়েটি যেভাবে বিচরণ করেছে ও শিশু-সুলভ উচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করেছে—শিল্পী তারই নানা ব্যঞ্জনা ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান যুগের শিল্পধারা সৃষ্টির তুলনায় এই ছবিগুলি সাধারণ স্তরের। তবে, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী জন্য দু একটি চোখে পড়ে। বিশেষ করে যেখানে লম্বমান কয়েকটি প্যানেল রেখে মধ্যে মধ্যে মেয়েটির বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন সেখানে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। ফিল্মের মত এগুলি সিকোয়েন্স প্রধান, সম্ভবত সেজন্যই অনেকের চোখে পড়ে। তবে শিল্পীর দু-একটি কোলাজ নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে তিনি সম-কালীন রচনাপদ্ধতি বিষয়েও সচেতন। বিশেষত একটি কোলাজ খুবই সুন্দর। তিনজন নারীকে অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রয়োগপদ্ধতিতে রচিত কোলাজটির মধ্য দিয়ে শিল্পীর কম্পোজিশন, পরিকল্পনা ও প্রয়োগরীতির পরিচয় মেলে। শিল্পীর ড্রয়িং যে ভাল তা খবরের কাগজের ওপরে কালি মাধ্যমে আঁকা স্কেচ দেখে জানা যায়। শিল্পীর অভিজ্ঞতা আছে, সমকালীন চিত্রকলাধারা বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল

—এ ক্লাউডেড বাস ইন ক্যালকাটা
—অতীশ মিত্র

মনে হয়। সুতরাং বিশেষ নির্দিষ্ট কোনও রীতি ও নিজস্ব কোনও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তিনি যে শিল্পসৃষ্টি করবেন সে আশা করা অন্যায় হবে না। অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পীর কাছ থেকে সেই জাতীয় শিল্পনিদর্শন দেখবার প্রতীক্ষায় রইলাম।

*

ভারতের নানা শহরের বিভিন্ন কর্মচারিবৃন্দের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে শিল্পসচেতনতা জাগানোর উদ্দেশ্যে ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির ঘরোয়া পত্রিকা "পরিচয়"-এর উদ্যোগে গত নয় বছর যাবত একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়ে আসছে। সম্প্রতি নবম বার্ষিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং সুনির্বাচিত কয়েকটি ছবির প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হয় অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে। প্রদর্শনীতে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুনা ও দিল্লীর বিভিন্ন বয়সের ৩৯৮ জন ছেলেমেয়ের শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই পেনসিল ও প্যাস্টেল ব্যবহার করেছে, কয়েকজন জলরঙ ও টেম্পারায় ছবি এঁকেছে। বলা বাহুল্য, ছোটদের বিভাগে (বয়স ৬ বছর পর্যন্ত) সকলেই নানা আজগুবি আকার তথা দৃশ্য এঁকেছে—নিছক সরলতাই দ্রষ্টব্য। অনেকের রেখাব্যবহারে বেশ একটা আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিভাগে যাদের ছবি চোখে পড়ে তাদের মধ্যে সুশীল পাণ্ডে (বঃ ৬, দিল্লী, জলি গুড গার্ল), হিমাংশু রুদ্র (বঃ ৬, কলকাতা, দুর্গাপুজো ও ভিলেজ কর্নার) ও কুমারান বিশ্বনাথানের (বঃ ৬, বোম্বাই, বান্দ্রা ফেয়ার) নাম করা যায়। সাত থেকে নয় বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই জলরঙে ছবি এঁকেছে। এই বিভাগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রিংকু রায়চৌধুরী (কলকাতা, এ রেনি ডে), অনন্থ ল্যাজারস (বোম্বাই রেড বার্ড অব প্যারাডাইজ) ও বিশেষ করে এস ইন্দিরা (মাদ্রাজ, নবরাত্রি গোলু)। দশ থেকে বার বছরের ছেলেমেয়েদের শিল্পকর্মে উন্নত রঙ ব্যবহার রীতির পরিচয় মেলে, দু-এক ক্ষেত্রে সুসম্বন্ধ কমপোজিশন পদ্ধতিও দেখা যায়। এই বিভাগে প্রথমেই চোখে পড়ে যায় অতীশ মিত্রের (কলকাতা) দি হিল স্টেশন। অমৃত শেরগিলের কিছু প্রভাব থাকলেও সুন্দর ও সুনির্বাচিত রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ছেলেটি হিল স্টেশনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। অপরাপর ছেলেমেয়েদের মধ্যে এন নন্দানী (মাদ্রাজ, ভিলেজ সিন), অরুণ কাপুর (বোম্বাই, এ ডিসকথেক) ও লাবণ্য শ্রীনিবাসনের (বোম্বাই, মডার্ন আর্ট) নাম উল্লেখ্য। তের থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের কয়েকজনের নিদর্শনে প্রতিভার সন্ধান মেলে। কয়েকটি ছবি দেখে মনে হয় যে, এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নিয়মিতভাবেই শিল্পচর্চা করে থাকে। এই বিভাগে যারা প্রশংসা দাবি করতে পারে তাদের মধ্যে মধুমিতা চক্রবর্তী (কলকাতা, লিটল সাইক্লস্ট), প্যাট্রিসিয়া পোগানেট (মাদ্রাজ, দি টেম্পল ইন্টারন্যাল), নরেশ প্যাটেল (বোম্বাই, গোলজারস সিজ দি ফোর্ট), অমিত দাস (কলকাতা, অন দি ব্যাঙ্ক অব ডাল লেক, কাশ্মীর) ও সৈয়দা বি-র (বোম্বাই, সেম ওয়ার্ল্ড লেংথ) নাম করা যায়।

চিত্রপ্রিয়

নামের কেরামত্!

নামে কী বা আসে যায়!

নামে কিবা করে, গোলাপ যে নামে ডাকো গন্ধ বিতরে—বলে গেছেন কবিবরে।

কিন্তু যথার্থ তা নয়। একেক সময় নাম নিয়েই বিস্তর যায় আসে। বিশেষত বদনাম যদি হয়।

গোলাপের বেলা কথাটা হয়ত কিছু খাটলেও নামের বেলায় বেশ অপলাপ হয়, বলতে কী!

হরি চরম কথা। তিনিই ধন্য স্বীকার করি। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি—তাঁর এই কীর্তনের কথাও মিথ্যে না। কিন্তু কারো নামের মধ্যে সেই হরির ছড়াছড়ি হলে নামের ছয়লাপ হয়ে যায়।

নামের হাটে হরি ভাঙ্গাট মোটেই সুবিধের না।

প্রেমেনের বেলা যেমনটা হয়েছে।

আমার বন্ধু প্রবোধ, আমার মিত্র প্রেমেনকে তাঁর আত্মকথায় প্রেমেন্দ্রহরি নামে উল্লেখ করায় তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। নামের এই শ্রীবৃদ্ধি তাঁর মনঃপূত হয়নি। তাঁর ধারণায় তাতে নাকি নামের

হানি হয়েছে—আর নামহানি প্রায় মানহানির মতনই।

নামের ভেতরে এই হরি-প্রত্যয় প্রয়োগে, শুধু প্রেমেনেরই ব্যত্যয় হয়নি, মনে হচ্ছে, কল্লোল যুগের একদা-র এই দুই বন্ধুবরের প্রেমেরও ইতরবিশেষ ঘটে গেছে।

যদিও কোনো লেখকের কোনো লেখকের বন্ধু হতে পারে বলে আমি মনে করিনে আর প্রেমের কথায় সংলাপের মতই আত্মচরিতে অপকথা থাকবেই, আত্মকথন কদাচই সত্যকথন হয়ে থাকে, ষোলো আনা তো কখনই নয়। তা হলেও অহৈতুক এই অব্যয় শব্দের অপপ্রয়োগে তারও যেমন অপব্যয়, তেমনি সার্থকতার মাধুর্যের ব্যাকরণে বিপর্যয় হয় বইকি! এমন কি তা পরমাত্মিক অব্যয় হলেও আত্মমর্যাদায় অব্যয় হয়ে আসে নামান্তরে। যায় আসে বেলায়।

তা নইলে তরুণ বয়সেই এক বিশিষ্ট লেখক তাঁর নামের বালাই নিয়ে চুপ করে বসে না থেকে কেন ফুলবনে প্রবেশ করতে গেছলেন? কেনই বা ওই ফুল বনে না থেকে বনফুল হয়ে গেলেন শেষটায়? আর কেনই বা একদিন তারক গাঙ্গুলী সেকালের স্বর্ণলতা স্রষ্টার প্রখ্যাতি অবহেলা করে এমন কি স্বয়ং স্বর্ণসীতা সৃষ্টির পরেও, নামের সেই স্বর্ণমান ত্যাগ করে নারায়ণ লাভ করলেন অচিরাৎ? এবং তাতেও খুশি না থেকে নতুন সংস্করণে নিজের এক সুনন্দিত নামকরণ করলেন শেষ পর্যন্ত?

কলিতে নামই সার, নামই সত্য, সেই তত্ত্ব কথায় না গিয়েও নামসর্বস্ব একালের —একালীনদের মহিমা কীর্তন করা যায়।

উল্লিখিত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সদ্য-পরিচিত সাহিত্য যশোপ্রার্থী এক তরুণ লেখককে একদা আমি বলে থাকব, এ যুগে ওই নামের কেরামত্—জানো ভাই? নাম যদি করতে চাও তো তোমার এই ক্যাবলাগোছের

নামটা তোমায় পালটাতে হবে সব আগে।

আমার সেই কথার মারেই কি না কে জানে, কিম্বা ওই সব মারাত্মক দৃষ্টান্তের জন্যেই হয়ত বা, ধনঞ্জয় প্রহারেণ হয়ে ছেলেটি সাহিত্যজগতে বৈরাগী হয়ে গেল একদিন। এবং দেখলাম, দেখতে না দেখতে দারুণ নাম করে ফেলল বলতে কি!

বেশি কি বলব, নিজের এই নাম নিয়েই বেশ খটকা ছিল আমার এক সময়। এহেন হারাধন মার্কা নাম নিয়ে কি এই লেখকের রাজ্যে দাঁড়াতে পারব কোনোদিন? তার দশটি ছেলের মতই হয়ত একদা হারিয়ে যেতে হবে কোথায়? অবশেষে মাথা খাটিয়ে নতুন এক অভিসন্ধিতে শিব আর রামের মধ্যস্বরলোপী দ্বন্দ্ব সমাস বাঁধিয়ে শিব্রাম হয়ে কোনোমতে একটু পদস্থ হলাম। সন্ধি নিয়ে প্রায়ই যাদের বিড়ম্বিত হতে হয় চিরকালের সেই ছেলেমেয়েদের সহানুভূতি লাভ করলাম একচোটে—আনকোরা এক সন্ধিসূত্রের কেরামতিতে হৃদয় জয় করে নিলাম এক নিমেষে। লেখার গুণে নয়, নামের জোরেই, রাতারাতি নাম করে ফেললাম বলতে কি!

নামে কী না হয়, সত্যিই! নামমাহাত্ম্য মানতেই হয়। লেখকের বেলা তো বটেই! আবার সেই নাম নিতান্ত আধুনিক না হলে সাধুজনের চিত্তগ্রাহী হয় না।

সেদিক দিয়ে প্রেমেনের নাম কেবল আধুনিক নয়, সর্বকালীন। সর্বকালের নিত্য নূতন। এহেন নামের হেরফের হলে সর্বনাশ হয়ে যায় বই কি!

কেবল লেখকের হলেই হয় না, লেখার নামও আধুনিক হওয়া চাই একালে। নইলে পাঠকপাঠিকার মনঃপূত হয় না। সেকালের এক শক্তিমান লেখকের বেলায় এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাঁর নামটা তো সেকেলে ছিলই, বইয়েরও নাম রাখতেন তিনি ছাই-ভস্ম! ফলে ভালো লিখলেও তেমন কাটতি হত না তাঁর বইয়ের। এহেন অবস্থায়, সাহিত্যজগতে যখন তাঁর প্রায় ফেরার হবার দশাই, দৈবাৎ সাগরসঙ্গমে গেলেন, তার পরেই, সেই সাগর থেকে ফেরার পরেই স্বধামে (এবং স্বধর্মেও) ফেরা-র পথ খুঁজে পেলেন; সাহেব বিবি গোলামের খেলায় তিনি টেক্কা মেরে দিলেন সবাইকেই। লিখতেন তো ভালোই, এখন নিজের বইয়ের নয়া নয়া নামের বহরে বই-বাজারে তাঁর নাম বেজায়।

সেকালের এক লেখকের কথা বললাম, এখন একালের এক শক্তিমানকে স্মরণ করা যাক! মণিশঙ্করের কথা ধরুন। নিজের নামের মণি বর্জন করে তিনি মণিও করেছেন আর নামও করেছেন দস্তুর মতন। একালকার লেখকদের মধ্যমণিই বলতে হয় তাঁকে।

প্রেমেনের নাম কিন্তু সাগরসঙ্গমের আগেই, এমন কি সাগর থেকে ফেরার আগের থেকেই। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর এই নামজাহির! সেই শুধু কেরানীর কাল থেকেই তিনি এক রাজা—কাইবারের রাজার আগে, এমন কি রজনী হল উতলা-র যৌবরাজ্য স্থাপনের পরেও, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। লেখার জোর তো রয়েছেই, কিন্তু তা হলেও সেটা কি বেশি করে আরও তাঁর এই নামের জোরেই না?

সত্যি বলতে, আমার বিবেচনায় সেই রাজ মধুসূদনের সময় থেকে (প্রসঙ্গত, অমন বদনামের হাত থেকে তিনি ত্রাণ পেয়েছিলেন স্রেফ ওই মাইকেল যোগের জন্যেই) এই বাবা তারকনাথের আমল অব্দি আমাদের সাহিত্যে প্রেমেনের মতন এমন নাম আর হয়নি।

এমন নাম আর হয় নাকি! কোষ্ঠী-পাঁজি ছুঁই হোক বা পিতৃর মত পৈতৃক সূত্রে পাওয়াই হোক, এ নামের জোড়া নেইকো। এবং বলতে কি, যা একখানা নাম করেছে না! তার জন্যেই হিংসে হবার কথা—সবার না হলেও আমার তো হয় মশাই! ওর সব্যসাচী-শ্রী সামর্থ্যের জন্য নয়, না ওর বহুভাগ্য, বা অর্থসৌভাগ্যও না, ওর শিল্পদক্ষতা বা সাহিত্য কীর্তির হেতুও নয়কো—ওর নামেই আমি ঈর্ষান্বিত। কিন্তু সেই ঈর্ষানলে হাবার আহুতি জ্বলে পুড়ে করব কী!

জীবে প্রেম নামে রুচি......বলে না? শাস্ত্রমতে জীবে রুচি নামে প্রেমও হয়ত বলা যায়) প্রেমেনের মতন প্রেমরুচি রুচিকর নাম আর হয় না। অঙ্কশায়িতে প্রেম টু দ্য পাওয়ার এন্......! (লেখী অঙ্কশায়িনীরাই জানেন!)

কী সাহিত্যলোকে, কি লৌকিক জগতে, এমন নামের তুলনা হয় না—প্রেমের মত, প্রেমেনের মতই তুলনাহীন বুঝি!

এ-হেন নামের হ্রাসবৃদ্ধি কেউ চায় না। এমন নাম-ডাক......হরি! এই দু কথায় কি উড়িয়ে দেবার?

তবুও, একেক সময় আমার মনে হয়, নামের একটু ব্যত্যয় ঘটলেও আমাদের সবার মধ্যেই একটু হরিপ্রত্যয় হলে হয়ত তেমন ভালোই হয়। শুধু প্রেমেন কেন, ধরুন, আমরা সবাই যদি একাদিক্রমে ওই হরিমার্কা হয়ে যাই? শৈলজাহরি, শিব্রামহরি, অচিন্ত্যহরি, প্রবোধহরি ইত্যাদি? তেমনটা মন্দ হয় কি? আমরা সকলেই তো এখন অনিবার্যভাবে ওই দিকেই—পরিণামে ওই হরিনামের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি শনৈঃ শনৈঃ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির আগেই ওই হরি-প্রত্যয়টা হয়ে যাক না!

যদিও আমার ধারণায় আমাদের মধ্যে শ্রীহরির প্রত্যয় কারো যদি হবার হয় তো পরম ভাগবত ওই অচিন্ত্যরই, হয়ত হয়ে থাকবে।

শিবরাম চক্রবর্তী

এই পরিণতি অনিবার্য। কেননা কোন মানুষের তার আসল জায়গায় নেই। এই বড়ো ক্যাথলিক অধ্যাপক মর্যাদার কারবার খুলে বসেছে অথচ আস্তিকতা তাকে করছে বহু দূরের মানুষ। অর্থ সম্মত আরো দূরের। তাই হ্যানসকে স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে, হা ভগবান! মানুষের শরীর আছে, তার সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয় বলে একটা জিনিস আছে। দুটো মিলেই তো মানুষ!

হ্যানস-এর মা জাতি-বৈষম্য দূর করতে চান। অথচ ছেলের সঙ্গে দূরত্ব দিনে দিনে দুস্তর হয়েছে। এই অবধারিত কন্ট্রাডিক-শনের মধ্যেই মানুষ আছে। নীতি দুর্নীতি সম্পর্কেও হ্যানস-এর ধারণা খুব পরিষ্কার। সমাজের তথাকথিত নৈতিকতাবোধ তাকে স্পর্শ করে না। যখন প্রকাশ পায়, তার বাবা দশ বছরের ওপর উপপত্নীর সংসর্গে ছিলেন, তখন শিশু শুনে প্রায় মূর্ছা যায়। তার আজন্মলালিত অসুস্থ নৈতিকতাবোধ তাকে পীড়িত করে। হ্যানসও আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু সেই আঘাত কেন নৈতিকতাজাত নয়। তার অন্য সামাজিক তাৎপর্য ছিল।

লেখক যে উঁচুদরের ভাবুক এই বইয়ের শেষে বিশেষ করে তিনি তার প্রমাণ রেখেছেন। শুধু সমাজচেতনা নয়, লেখকের ইতিহাস চেতনাও এখানে পরিষ্কার পরিস্ফুট। বর্তমান অবস্থায় হ্যানস-এর এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। যুক্তিসংগতও বটে। আর কারুর কাছ থেকে সে কিছু চায় না। বাবার দয়া-দাক্ষিণ্য, বন্ধুবান্ধবের অনুকম্পা—কিছুই সে [illegible] কাছে সে এক [illegible] মর্ত পেয়েছিল। শুনে ভদ্রলোক [illegible] দিয়েছিলেন। [illegible] হয়েছে। [illegible] নেই। [illegible] সে [illegible] [illegible] গান গেয়ে নিজের টুপি পাতল। একটা মুদ্রা পড়ল, একটা নিকেল।

শেষে ক্লাউনের মুখোশ খসে পড়েছে। মুখোশের আড়াল থেকে যে মুখ বেরিয়ে আসে, সেটাই মানুষের আসল মুখ। তাতে ছলনা নেই, কপটতা নেই, কৌতুক নেই—সেই মুখে এক প্রবল যন্ত্রণার আঁকা।

অসিত গুপ্ত

রাজনৈতিক ইতিহাস

গতিবেগ চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব। অমিতাভ গুপ্ত। শরৎ প্রকাশন। ৭১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি-৯। দাম—পঁচিশ টাকা।

অমিতাভ গুপ্ত একদা পাক-রাজনীতির ভাষ্যকার এই ছদ্মনামে একটি বিখ্যাত দৈনিকে লিখতেন। অতএব বলা যেতে পারে তাঁর লেখার সঙ্গে পাঠকের ইতিপূর্বেই পরিচয় ঘটেছে। সম্প্রতি তাঁর একটি বই প্রকাশ পেল।

বাংলাদেশের ইতিহাস দীর্ঘকাল জঙ্গী-শাহীর শোষণের ইতিহাস। বাংলাদেশের ইতিহাস স্বাধীনতাপিপাসু সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। পাক-রাজনীতির গোপন তথ্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে ক্রমাগত পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের নেতাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিল লক্ষ্যের দিকে। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে বইটির শুরু এবং শেষ হয়েছে '৬৬-র ৭ই জুনের ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে। বস্তুত, ছয় দফা দাবি নিয়ে ১৯৬৬ সনের ৭ই জুন যে গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারই পরিণতি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ, বিশ্বের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নজির।

এ ধরনের গ্রন্থ সাধারণত দেখা গেছে অল্পবিস্তর আবেগনির্ভর হয়ে থাকে, কিন্তু এটি সে-রকম নয়। বরং ইতিহাসপিপাসুদের কাছে বইটি সমাদৃত হবে বলে বিশ্বাস। অধিকতর তথ্যপূর্ণ ও রাজনৈতিক যুক্তিনির্ভর বলে কোনো কোনো পাঠকের কাছে বইটি প্রামাণ্যস্বরূপ মনে হলেও হতে পারে। পাক-সামরিক শাসনের ধারা, আয়ুব-ইয়াহিয়ার কূটজাল ও তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম, এ-সবই লেখক যত্নসহকারে বিশ্লেষণ করেছেন।

জননেতা শেখ মুজিবকে বুঝতে হলে তাঁর পার্টিকেও বুঝতে হয়। শ্রী গুপ্ত সে-দিকেও লক্ষ রেখেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে আওয়ামী লীগের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এবং সে-কারণেই আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা থেকে তার ধারাবাহিক কার্যপ্রণালী লেখক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন সোহরাবর্দী—ভাসানীর অন্তর্বিরোধ, ঐতিহাসিক কাগমারী কনফারেন্স এবং ওই প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের দূরদর্শিতার নিদর্শন। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার কালো হাত আওয়ামী লীগের দুই প্রধান নেতার (সোহরাবর্দী ও ভাসানী) পারস্পরিক বিরোধিতার যে ইন্ধন যুগিয়েছিল মুজিব তা সহজেই বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ১৯৪৭ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে গণতন্ত্র পাকিস্তানে যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তাতে আওয়ামী লীগ যে পূর্ববঙ্গে সরকার গঠন করতে পেরেছে, তা পূর্ব বাংলার অবহেলিত, অবজ্ঞাত শোষিত মানুষদের সামনে এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। আর সেই অবস্থায় যদি দুই নেতার অন্তর্বিরোধ না

[illegible], [illegible] জাতি [illegible] যায়, [illegible] পাঠকদের [illegible] মনো-[illegible] ও [illegible]বিরোধী প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার রাজনৈতিক চালকেই মূল-[illegible] বলা। মুজিবর রহমানের এই রাজনৈতিক বিচক্ষণতার উদাহরণ পরবর্তী কালে অনেক ঘটনার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

সংক্ষিপ্তাকারে শেখ মুজিবের জীবনী ও কয়েকটি আলোকচিত্র থাকায় গ্রন্থটির গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে। এ ছাড়া আছে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্তের একটি দীর্ঘ ভূমিকা। তবে এ ধরনের গ্রন্থে একটি পরিশিষ্ট থাকা উচিত ছিল।

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

লেখক কতটা জানাবেন এবং পাঠক কতটা অনুমান করে নেবেন তা অবশ্য স্পষ্ট করে কোনো সাহিত্য-সংহিতায় লেখা হয়নি। কিন্তু এটা ঠিক যে, মাধ্যমভেদে এর একটা মোটামুটি কাঠামো তৈরি হয়ে আছে সৎ পাঠকের মনে কবিতায় তিনি যে-ব্যঞ্জনা ও রহস্যের আলো-আঁধারি আশা করেন। গল্পে নিশ্চিত তার থেকে অন্য ধরনের। উপন্যাসের কথা আলাদা। উপন্যাসে অস্পষ্টতা ব্যাপারটা এখনো তেমনভাবে চালু হয়নি। প্রতীকী রচনাতেও এক ধরনের স্পষ্টতা থেকেই যায়। এক স্তরে কাহিনী বর্ণনা করেন লেখক, অন্য স্তরের অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা আবিষ্কার ক'রে সহৃদয় পাঠক হন যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত।

অতীন্দ্রিয় পাঠকের সে সে (পরিবেশক: অধুনা, পাঁচ টাকা) উপন্যাস হিসেবে বিজ্ঞাপিত হয়েও এক বিচিত্র ভঙ্গির রচনা। কী কাহিনী, কী রচনারীতি—সব ক্ষেত্রেই এক ধরনের সর্বাত্মক বিপ্লব ঘটিয়েছেন শ্রীপাঠক। ফল অবশ্য কী হয়েছে বলা শক্ত নয়। উপন্যাস নামক বস্তুটিতে, আর যাই থাক, দুর্বোধ্যতার ভীতি অন্তত নেই—এই ধারণা সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন তিনি। অনেক কবিতা এবং গল্পের মতো উপন্যাসও এখন থেকে সযত্নে এড়িয়ে চলবেন পাঠকরা।

সে সের মূল কাহিনীর আভাস, যেভাবে নামপত্র সাজানো হয়েছে—তার থেকেই অবশ্য খানিকটা পাওয়া যায়। এর পরও যদি কেউ উৎসাহী হন পুরো বইটি পড়তে, পাতায় পাতায় হোঁচট খাবার মতো চমকের দেখা পাবেন। কখনো বড়ো অক্ষরে ছেপে, কখনো কবিতার মতো লাইন সাজিয়ে, কখনো সংক্ষিপ্ত ও অসমাপ্ত বাক্য বসিয়ে যে গল্পটি বলতে চেয়েছেন, শ্রীপাঠক তাতে বড় জোর ছোট একটি কবিতা লেখা যেত। ছোট গল্পও হত কিনা সন্দেহ, উপন্যাস দূরের কথা। নামপত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে কাহিনীর কিঞ্চিৎ নমুনা দেখানো হল: 'সে সে/সেরীতাওসে/সে রীতা ও সে/সে/ট্রেন থেকে/প্ল্যাটফর্ম স্টেশন চৌপথী বাজার/জনার মাঠ নীনা কুটির জনার মাঠ তিনটি সমান্তরাল লাইন হিসেবে সাজানো ছিল, জানি না পাশাপাশি লিখে কতটা ক্ষতি হল/ [illegible] স্তূপ চুরমার/......প্র তি ধ্ব নি/মহিমা স্টেশন/অশব্দ...../রীতা রীতা/ফেরে না সখি ফেরে না/ট্রেন/ট্রেন উঠে সে।' এর পর, ভরসা করি, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

*

সন্দীপ সেনগুপ্ত সম্পাদিত মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন হো চি মিন ও মাও সে তুঙের কবিতা (পরিবেশক: স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, চার টাকা) যে-উদ্দেশ্যে প্রকাশিত তা সম্পাদকের ভাষায় এই রকম: 'ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি এ ধরনের কাব্য সংকলনের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে এবং তার সম্ভাবনার ক্ষেত্রও অপরিসীম। আশা রাখি বাংলাদেশ ও বাংলা-ভাষায় মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন, হো চি মিন ও মাও সে তুঙের কবিতা ও সাহিত্য-ভাবনা নিয়ে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে আগামী দিনে ব্যাপক গবেষণা শুরু হবে। বর্তমান গ্রন্থ ওই ব্যাপক সম্ভাবনার সূচনা মাত্র।'

সম্পাদকের এই আশা কতদূর বাস্তব হবে সেই প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় যে, তিনি কৌতূহলকর একটি সংকলন-গ্রন্থ উপহার দিতে পেরেছেন। কয়েকটি কবিতা সমর সেন, সুখময় দাশগুপ্ত ও তরুণ মিত্রের অনুবাদ, অন্যান্য কবিতাগুলির রূপান্তর সম্পাদকের। অনুবাদেও তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, এ-কথা অনস্বীকার্য। তবে কিনা, এঁদের মধ্যে 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'—এ-কথাও স্বীকার করা ভাল। কার্ল মার্কসের 'আমরা কি মরাগির ওম দেবার মতো ধ্যানস্থ কবি তৈরী করব/সংহতি স্বীকার করতে?—না তা কখনোই নয়' এর পাশে হো চি মিনের 'এখন আমাদের লোহা ও ইস্পাতের কবিতা লেখার সময়/এবং [illegible] কবির [illegible] হবে আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়া' বক্তব্যে যতই একাত্মক হোক, [illegible] লেনিনের 'এসো ভেঙে ফেলি দাসত্ব/গোলামির লজ্জা ভেঙে ফেলি।' —ধরনের পংক্তিও ব্যঞ্জনাহীন। একই রকম সমতল কণ্ঠস্বর স্তালিনের 'ওগো আমার জর্জিয়াবাসী শিক্ষিত মানুষের দল/তোমাদের কল্যাণে দেশে সুখ ও শান্তি আসুক।' মাও সে তুঙের কবিখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অবশ্য অনেক বেশী এবং তাঁর রচনার কবিত্ব [illegible]। কিন্তু সংকলন-গ্রন্থে [illegible] এঙ্গেলসের কার্ল মার্কস সম্পর্কিত কবিতাটি সত্যি [illegible] করে [illegible]:

কে এত দ্রুত আসে—
যেন চড়েছে শকটে!
ট্রিয়ের থেকে কালো মানুষের প্রেমিক,—
এক দানব।
সে কেবল হেঁটেই ক্ষান্ত নয়,
গোড়ালি উঁচিয়ে সামনে লাফিয়ে চলে
সে একাই বাঁধছে বাঁধ,
[illegible]

আকাশের দিকে সোজা [illegible] দেখত
যেন আকাশকে টেনে
নামিয়ে আনতে চায় মাটিতে।
তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতে শক্তির দোতনা—
সচকিত আহ্বান,
যেন কালসাপ ফুঁসে ওঠে পেছনে।

ক্রিকেট-জনক ডবলিউ জি গ্রেস

[এক]

ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেট লীগের শতবর্ষপূর্তি (১৮৭৩ থেকে ১৯৭৩) উপলক্ষে ব্রিটিশ সরকারের ডাক ও তার বিভাগ ক্রিকেটজনক ডাঃ ডবলিউ জি গ্রেসের চিত্রসহ তিন রকমের ডাকটিকিট প্রচার করেছেন। গত ১৬ মে থেকে স্ট্যাম্পগুলি বিক্রি শুরু হয়েছে। তিন পেন্স মূল্যের টিকিটে ডাঃ গ্রেস উইকেটে দাঁড়িয়ে স্টান্স নিচ্ছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে, সাড়ে সাত পেন্স মূল্যের টিকিটে ডাঃ গ্রেস চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন আম্পায়ারকে, ৯ পেন্সের টিকিটে তাঁর ব্যাট করতে যাবার, না হয় ব্যাট করে ফিরে আসার চিত্র।

খেলাধুলোকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকারের ডাক ও তার বিভাগের টিকিট প্রচার এই প্রথম নয়। কিন্তু খেলাধুলোর টিকিটে কোন ব্যক্তির বিরাটত্ব তুলে ধরার প্রয়াস এই সর্বপ্রথম। অন্যান্য দেশে যদিও ডাকটিকিটে বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের ছবি ছাপা হয়েছে, ব্রিটিশ সরকার প্রথম তাদের রীতি ভাঙলেন।

কাউন্টি ক্রিকেটের শতবর্ষ, যোগ্য উপলক্ষটি বেছে নিয়ে তিন রকমের ডাক টিকিট প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকার অবশ্যই মহা খেলোয়াড় ডাঃ উইলিয়াম গিলবার্ট গ্রেসের স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান দেখিয়েছেন। কিন্তু ওই রঙীন ডাকটিকিটের দ্বারা কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন সেই বিদেহী খেলোয়াড়ের রঙ-রূপ? যিনি ছিলেন বহুবর্ণ, ব্যাপক ও বিচিত্র, ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষের প্রাণের রাজা—ক্রিকেট খেলার রাজা হিসাবেই তিনি সারা পৃথিবীর ক্রীড়ামোদী মানুষের মনের সিংহাসনে বসে আছেন। সাধে কি আর বিলি মার্ডক, যাকে কোন কোন সমালোচক এক সময় গ্রেসের সমস্তরে ফেলতে চেয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, আমার অনুরোধ মরার পরে ডাক্তারের দেহটাকে যেন কবরে শায়িত করে মাটি চাপা না দেওয়া হয়। ওটাকে চিরদিন রেখে দেওয়া উচিত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, সর্বযুগের, সর্বকালের বিরাটতম ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দেহ হিসাবে।

বিলি মার্ডকের সঙ্গে ডাঃ গ্রেসের তুলনা করার চেষ্টাকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে অস্ট্রেলিয়ার সমসাময়িক কালের আর এক কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড় আলেক ব্যানারম্যান বলেছিলেন,—কে বিলি? সারা জীবনে বিলি যা শিখেছে, ডবলিউ জি সেটা বা তার চেয়েও বেশী ভুলেছেন কালক্রমে। মার্ডক নিজে বলেছিলেন, আমি তাঁর মত দেখিনি, দেখবার আশাও করি না।

ডবলিউ জি সম্পর্কে বলার কি শেষ আছে? কতজনই তো কত বলেছেন। রনজির যাদু, ট্রাম্পারের দীপ্তি, উলির লাবণ্য, জেসপের উৎফুল্ল উৎপীড়ন, হবসের পরিমার্জন, হাটনের দক্ষতা; কম্পটনের আনন্দ-সাধনা এবং ক্রিকেট 'দেবতা' ব্রাডম্যানের প্রমত্ত বিক্রম সম্পর্কে আমরা কত কথাই শুনেছি। এদের নিয়েই ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রিকেটের কলহাস্যের পলিমাটির উপর এই সোনার ফসল ক্রিকেটের আদি পিতা উইলিয়াম গিলবার্ট গ্রেসের একক কর্ষণের ফল। তাই ডবলিউ জি ক্রিকেট-জনক। ক্রিকেটকে গ্রাম ও শহরের কাতপরের মধ্য থেকে তুলে রাজকুল থেকে আরম্ভ করে সভ্যসমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ক্রিকেট ছিল ডাঃ গ্রেসের জীবনের অঙ্গ। ক্রিকেটের সঙ্গে জীবনবোধকে মিশিয়ে জাতিরূপকে প্রকাশ করেছেন। মহা খেলোয়াড় এবং মহান চরিত্র সর্বাত্মকভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে ক্রিকেটের মাধ্যমে।

বলা হয়েছে, ব্রিস্টল থেকে মার্গেটের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে রাণী ভিক্টোরিয়া এবং প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন ছাড়া যে মূর্তিটিকে সাধারণ মানুষ এক নজরে চিনে নিতে পারত সে মূর্তি ডাঃ গ্রেসের। দশাসই চেহারার বিরাট শ্মশ্রুলো পুরুষ, যার দেহের ওজন ছিল ১৭ স্টোন। আরও বলা হয়েছে, শেক্সপীয়র এবং বার্নার্ড শ-এর মধ্যবর্তী সর্বাধিক বিখ্যাত দাড়ি ছিল তাঁরই। সে দাড়িও ছিল দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ইংলণ্ডের ল্যান্ডস্কেপের অঙ্গ।

এই যে ডাকটিকিটে ডাঃ গ্রেসের যে ছবি শিল্পীর তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, কি তার অনুপ্রেরণা? না, ভিক্টোরিয়া যুগের কার্টুনিস্ট হ্যারি ফারনিস-এর আঁকা গ্রেসের শত ছবি—এ সেঞ্চুরি অব গ্রেস নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

ক্রিকেটারি, ডাক্তারি হাসি-আনন্দ-কৌতুক, সহানুভূতি, সহৃদয়তা এবং আনন্দে চঞ্চল দুর্বৃত্ততা—নানা গুণের সমন্বয়ে জনপ্রিয়তার চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন ডাঃ গ্রেস। স্টেশনে দাঁড়িয়ে বন্ধুর সঙ্গে কথা বললে ইঞ্জিন ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করত, রেলের কুলী, ব্রিস্টলের শ্রমিক কাজ ছেড়ে ছুটে আসত তাঁর সঙ্গে করমর্দন করার জন্য।

জন্মেছিলেন ইংলণ্ডের এক মধ্যবিত্ত ডাক্তার ও ক্রিকেট পরিবারে। বাবা হেনরি মিলস গ্রেসও ছিলেন ডাক্তার এবং ক্রিকেট খেলোয়াড়, গ্লস্টারশায়ার কাউন্টি ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। গ্রেসরা পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে চার ভাইই ছিলেন ডাক্তার। আর এক ভাইও ডাক্তার হতে পারতেন যদি ডিগ্রী পাবার মুখে মৃত্যু তাঁকে পৃথিবী থেকে ছিনিয়ে না নিত। ই এম, ডবলিউ জি এবং ফ্রেড—তিন ভাই একসঙ্গে ইংলণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলেছেন ১৮৮০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ক্রিকেটের একটি অনন্য রেকর্ড।

গ্রেসদের প্রতিষ্ঠার মূলে কিন্তু মহীয়সী মা মার্থা পিকক গ্রেস। মার্থা গর্ভে ধরেছিলেন ইংলণ্ডের ক্রিকেট ভবিষ্যৎকে। বুদ্ধিমতী মার্থা প্রয়োজনীয় শাসন, শোধন

স্মারক ডাকটিকিটে ক্রিকেটজনক

দেখেছেন সযত্নে, যুক্তিভাবে ছেলেদের প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত করে তুলেছেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ই এম গ্রেসকে ইংলণ্ডের টেস্ট দলে স্থান দেওয়ার সুপারিশ করে ইংলণ্ড একাদশের সেক্রেটারির কাছে তিনি যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা বিখ্যাত হয়ে আছে তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির জন্য। লিখছিলেন—ই এম এখন টেস্ট খেলার উপযুক্ত। কিন্তু তাঁর আর একটি ছোট ছেলে আছে, সে এখনো বড় ম্যাচ খেলার অবস্থায় পৌঁছোয়নি। কিন্তু সে তার মেজ ভাইয়ের চেয়ে অনেক বড় খেলোয়াড়। তার ডিফেন্স নিখুঁত, ব্যাক প্লে অসম্ভব ভাল। বলা নিষ্প্রয়োজন, মধ্যম গ্রেসের এই ছোট ছেলেই পরবর্তী কালের 'গ্রেট' উইলিয়াম গিলবার্ট গ্রেস।

ডবলিউ জির জন্ম তারিখ ১৮৪৮ সালের ১৮ জুলাই। মৃত্যু তাঁকে পৃথিবী থেকে টেনে নিয়েছে ১৯১৫র ২৩ অক্টোবর। সুতরাং খুব দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারেননি। ৬৭ বছরের মধ্যে ক্রিকেট খেলেছেন ৫৪ বছর। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের মধ্যে ছিলেন ১৮৬৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ৪৩ বছর। এই সময়ের মধ্যে তাঁর কি কৃত? —১২৬টি সেঞ্চুরি সহ ৫৪৮৯৬, উইকেটের সংখ্যা ২৮৭৬—গড় ১৭·৯২। ক্যাচ ধরেছেন ৮৭১টি। কিন্তু ২২টি টেস্ট এবং সমস্ত খেলা মিলিয়ে ডবলিউ জির মোট রানের সংখ্যা ৮০ হাজার, উইকেটের সংখ্যা ৭ হাজার। তাই ক্রিকেট লিখিয়েরা বলেছেন—ওপেনিং ব্যাট, স্লো মিডিয়াম বোলার ও ক্লোজ ফিল্ডার, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড় ডবলিউ জি গ্রেসের জীবনের মধ্যে অনায়াসে ডন ব্র্যাডম্যানের দুটি কি তিনটি জীবন পুরে দেওয়া যায়।

ক্রিকেটে পৃথিবীর প্রথম পুরুষের নামের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে 'প্রথম' কথাটি যোগ করা যায়। যেমন, তিনিই প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন, প্রথম একটি ম্যাচে দুটি সেঞ্চুরি করেছেন, প্রথম ৩০০ রানের গণ্ডি পেরিয়েছেন, প্রথম পর পর তিনটি সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এক মরসুমে দু হাজারের উপর রান করায় তিনিই প্রথম খেলোয়াড়। বস্তুত ১৮৭১ সালে করেছিলেন ২৭০৯ রান। মরসুমে হাজার রান এবং শত উইকেট লাভের 'ডাবল' কথাটি ১৮৭৫-এ গ্রেস-এর কৃতিত্ব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। গ্রেসই প্রথম লাভ করেছেন শততম সেঞ্চুরি করার সম্মান।

—মুকুল

লীগ ফুটবল সম্পর্কে আগে যে কথা বলেছি মরশুমের প্রথম চারিটি খেলায় মোহনবাগানের কাছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রথম হার স্বীকারের পরও কিছু বলার নতুন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। অর্থাৎ নামী দামী খেলোয়াড় নিয়ে গড়া বড় বড় ক্লাবগুলিও দম দেওয়া পুতুলের মত মামুলিভাবে খেলে যাচ্ছে। খেলার মধ্যে না আছে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা, না আছে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ওঠ-পড়ার ছন্দোময় দোলা। মোহনবাগান অবশ্য সুপরিকল্পিত কয়েকটি আক্রমণ থেকে দুটি দর্শনীয় গোল করে মহমেডানের বিরুদ্ধে জিতে গেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের পোড়খাওয়া পাড়া সবুজ জার্সির জলুস চোখ পড়েনি। মহমেডানের সাদা-কালো জার্সির রং তো আরও ফিকে হয়ে গেছে। ইস্টবেঙ্গলও ভাল খেলতে পারছে না। উয়াড়িকে হারাতে (৬ মিনিট আগে পরিত্যক্ত খেলা) হিমসিম খাবার পর কালিঘাটের বিরুদ্ধে কোন মতে একটি গোল করে জিতেছে [illegible]। অথচ [illegible]। অবশ্য প্রতি খেলায় [illegible] [illegible] আক্রমণ চালাচ্ছে। কিন্তু খেলার টেকনিক ঠিক ঠিক গোল করার ব্যাপারে বেশীর ভাগ খেলায় বড় ক্লাব ও ছোট ক্লাবের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে জার্সির রংয়ে। খেলার মধ্যে মারামারি এবং অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের আগ্রহও যেন আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল এবং উয়াড়ির খেলাটিতে উভয় দলের খেলোয়াড় [illegible] [illegible] ঘটিয়ে চালিয়েছে। ফলে ৬ মিনিট আগে খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। আইনের প্রতি অবহেলা, এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সুস্থ ফুটবলের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ নয়। কঠিন সাজার ব্যবস্থা না হলে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।

স্মরণীয় ক্রিকেট সংগ্রাম

নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যে মাত্র এক উইকেটে টেস্ট জয়ের অনেক নজীর আছে। মাত্র ৩ রানে, ৭ রানে বা কম রানে টেস্ট জয়ের নজীরও কম নয়। তা ছাড়া যেখানে দুই দলের সমান রানে টেস্ট খেলা টাই হবারও নজীর আছে সেখানে চতুর্থ ইনিংসে চারশোর বেশী রান করে কৃতিত্বপূর্ণ জয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে সংগ্রামের পরিচয় মিলতে পারে, নিশ্চয়ই নজীর [illegible] থাকতে পারে না। কিন্তু চতুর্থ ইনিংসে চারশোর বেশী রান করারও কি বেশী নজীর আছে?

এ দিন মাত্র চারটি ছিল। নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রিজে সদ্য সমাপ্ত প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ড ৪৪০ রান করায় এখন সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচটি। এবং নিউজিল্যাণ্ড উঠে এল নজীরের দ্বিতীয় সংখ্যায়। প্রথম সংখ্যায়ও বলা যেতে পারে। কেননা দীর্ঘ ৩৫ বছর [illegible] ১৯৩৮-৩৯ সালে ডারবান টেস্টে [illegible] ইংলণ্ড চতুর্থ ইনিংসে ৬৫৪ (৫ উইকেটে) রান করলেও সেটা ছিল দশদিনব্যাপী টেস্ট খেলা। পাঁচদিনব্যাপী টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে সদ্য করা নিউজিল্যাণ্ডের ৪৪০ রানই সর্বোচ্চ রান।

নিউজিল্যাণ্ড যদি চতুর্থ ইনিংসে ৪৭৯ রান করে ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্টে ইংলণ্ডকে হারাতে পারত তবে জয়ের দিক দিয়ে ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ডও সৃষ্টি করত। কেননা চতুর্থ ইনিংসে চারশোর বেশী রান করে জয়ের যে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে সে ইনিংসে রানের সংখ্যা ৪০৪।

১৯৪৮ সালে লীডসে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ডন ব্র্যাডম্যানের তারকাখচিত অস্ট্রেলিয়া দলের কীর্তি।

সুতরাং ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্টের তৃতীয় দিনের চা বিরতির সময় ইংলণ্ডের ইনিংস ডিক্লেয়ার-এর পর জয়ের জন্য নিউজিল্যাণ্ডের যখন চতুর্থ ইনিংসে ৪৭৯ রান করার প্রয়োজন দেখা দিল তখন অনেকেই প্রমাদ গণল লক্ষ্যে পৌঁছন অসাধ্য সাধনের নামান্তর বলে। তারপর ১৬ রানের মধ্যে পড়ে গেল ওপেনিং জুটির দুটি মূল্যবান উইকেট। দ্বিতীয় দিনের খেলায় দুই দলের মোট ১৫টি উইকেট পড়ে যাওয়া এবং মাত্র ৯৭ রানে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কি ভাবতে পেরেছিল নিউজিল্যাণ্ড সংগ্রাম করতে পারবে? জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে পারবে?

কিন্তু শুধু সম্ভাবনা সৃষ্টি নয়, অধিনায়ক বেভান কংডন এবং ব্রুক পোলার্ডের দুটি সংগ্রামী স্মরণীয় সেঞ্চুরির ফলে নিউজিল্যাণ্ড প্রায় সাফল্যের কূলে এসে পৌঁছেছিল। একটুর জন্য তীরে এসে তরী ডুবে গেল। ৩৮ রানে প্রথম টেস্টে পরাজিত হয়েছে ইংলণ্ডের কাছে।

জিতলে নিশ্চয়ই নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করত, টেস্ট যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম জয়ের স্বাদ পেত। কিন্তু গৌরবজনক পরাজয়ের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা যে
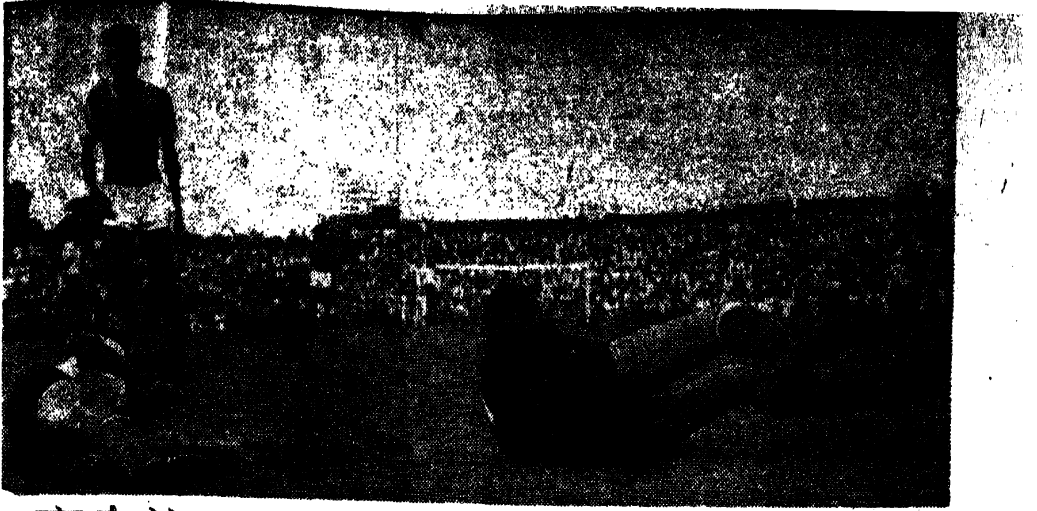
ফুটবল লীগে ইস্ট বেঙ্গলের আকবরের শট থেকে অবধারিত গোল বাঁচাচ্ছে কালিঘাট গোলরক্ষক গোবিন্দ গুহঠাকুরতা

প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার মূল্যই কি কিছু কম? বস্তুত স্মরণীয় টেস্ট খেলার মধ্যে এ খেলাটি চিহ্নিত হয়ে থাকল ব্যাটিং ব্যর্থতা ও ব্যাটিং বিক্রমের সংমিশ্রণে। এ খেলা আশা-নিরাশার দোলায় দুলেছে, নাটকীয় উত্তেজনা ও রোমান্স সৃষ্টি করেছে দর্শক-সমর্থকদের মধ্যে।

বলবার কথা, কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই নিউজিল্যাণ্ডকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। তাদের নির্ভরযোগ্য স্পিন বোলার হেডলি হাওয়ার্থের পায়ে চোট থাকায় এ টেস্ট খেলতে পারেনি। তাছাড়া তৃতীয় দিন বিভান কংডনের চোয়ালে জন স্নোর বল লেগে চোয়াল ফুলে ছিল। হেডলি ভ্রাতৃদ্বয় রিচার্ড এবং ডেল যখন দ্বিতীয় ইনিংসের নবম জুটিতে এক সঙ্গে ব্যাট করছিল এবং তাদের বাবা নিউজিল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াল্টার হেডলি দর্শক আসনে বসেছিল, তখন টনি গ্রীগের বিশাল হাত থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসা তৃতীয় নতুন বল রিচার্ডের তলপেটে লাগায় যন্ত্রণায় নিজের উইকেটের উপরে আছড়ে পড়ে উইকেট হারায়। এ আঘাতকে নিউজিল্যাণ্ড দলের অদৃষ্টের উপর আঘাতও বলা যেতে পারে।

টেনট ব্রিজ টেস্টে ইংল্যাণ্ডেরও অবশ্য কৃতিত্ব কম নয়। মাত্র ২৪ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টি উইকেট হারাবার পর ডেনিস অ্যামিস (নট আউট ১৩৮) ও টনি গ্রীগের (১৩৯) জোড়া সেঞ্চুরি এবং দুজনের পঞ্চম উইকেট জুটির ২২৪ রান জয়ের পথ তৈরী করে দেয়। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়ের পথে পা রেখে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করে নিউজিল্যাণ্ড অধিনায়ক বিভান কংডন (১৭৬ রান) এবং ভিক পোলার্ড (১১৬ রান) যেভাবে সেঞ্চুরি করেছে এবং পঞ্চম উইকেট জুটিতে করেছে ১৭৭ রান, তার তুলনা কম। কংডন খেলেছে ৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট, পোলার্ড সাত ঘণ্টার একটু বেশী। জীবনের ৩০তম টেস্ট পোলার্ডের এটি প্রথম সেঞ্চুরি, সংযম ও শৌর্য মিশ্রিত সেঞ্চুরি।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস ২৫০ (বয়কট ৫১, নট ৪৯, অ্যামিস ৪২; টেলর ৫৩ রানে ৪ উইঃ: ডেল হেডলি ৪২ রানে ৪ উইঃ)

নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ইনিংস ৯৭ (টেলর ১৯; গ্রীগ ৩৩ রানে ৪ উইঃ, স্নো ২১ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস (৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ৩২৫ (অ্যামিস নট আউট ১৩৮, গ্রীগ ১৩৯: পোলার্ড ২ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ৪৪০ (কংডন ১৭৬, পোলার্ড ১১৬, ওয়াডস-ওয়ার্থ ৪৬; আরনল্ড ১৩১ রানে ৫ উইঃ, গ্রীগ ১০০ রানে ৩ উইকেট)

[নিউজিল্যাণ্ড ৩৮ রানে পরাজিত

উইম্বলডন টেনিস

যথারীতি এ বছরও জুন-জুলাইয়ের সন্ধিকালে পক্ষকালব্যাপী উইম্বলডন টেনিসের আসর বসছে। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় নিকি পিলিকের সাসপেনশনকে কেন্দ্র করে টেনিস ক্ষেত্রে আবার ঝড়ের সঙ্কেত দেখা দিয়েছে।

ডেভিস কাপে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে না খেলার জন্য পিলিককে ৯ মাসের জন্য সাসপেণ্ড করেছিল যুগোশ্লাভিয়ার টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। আন্তর্জাতিক সংস্থা শাস্তি কমিয়ে করেছে এক মাস। এর অর্থ পিলিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা উইম্বলডনে খেলতে পারবে না। কিন্তু বেঁকে বসেছে অ্যাসোসিয়েশন অব টেনিস প্লেয়ার্স সংস্থা, সংক্ষেপে যার নাম এ টি পি। এ টি পির অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন নামী খেলোয়াড় বলেছে পিলিকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করলে তারাও উইম্বলডনে খেলবে না। দেখা যাক কি হয়।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়, চারবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রড লেভার আগেই জানিয়ে দিয়েছে, এবারের উইম্বলডনে খেলছি না। গতবারের বিজয়ী স্টান স্মিথেরও ফর্ম ভাল নেই। ফ্রেঞ্চ ও ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে হেরে গেছে নেদারল্যাণ্ডসের টম ওক্কারের কাছে। এবার কোন পুরুষ খেলোয়াড়ের গ্রাণ্ড শ্লাম লাভের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেছে জন নিউকাম্ব অস্ট্রেলীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এবং রুমানিয়ার ইলি নাস্তাসে ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করায়। তবে গ্রাণ্ড শ্লামের জন্য চিহ্নিত ওই দুই প্রতিযোগিতার বিজয়িনী মারগারেট কোর্টের সম্ভাবনা রয়েছে গ্রাণ্ড শ্লাম লাভের।

উইম্বলডনে বিজয় অমৃতরাজ কেমন খেলে এ সম্পর্কেই আমাদের আগ্রহ বেশী। দুই ভাই বিজয় ও আনন্দ সরাসরি উইম্বলডনে খেলার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ভারতের বহু অভিজ্ঞ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি প্রেমজিৎলাল এবং ১৯৭২-এর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন গৌরব মিশ্রকেও উইম্বলডনের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় নেমে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হল, এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল।

একলব্য

অরণ্যদেব লী ফক

খুনিদের সঙ্গে লড়বার জন্য প্রস্তুত হলেন শেরিফ
ব্যাটোরা ভয়ঙ্কর। দেখলেই গুলি চালাবে.....
অস্ত্রের দোকান

তারা দেখল আবহাওয়া শান্ত।
তুমিই তো লিফট চেয়েছিলে। তুমি একাই এদের ঠাণ্ডা করেছ?

হ্যাঁ। এদের বিরুদ্ধে আমি ডাকাতি, মারধর, আর ঐ মেয়েটিকে হরণ করার চেষ্টার অভিযোগ আনছি।
!

এখানে অনেক জিনিস ভাঙচুর হয়েছে। তোমার দলের হয়ে তুমি তার দাম দাও।
উঃ...তুই! ** তুই ঠাট্টা করছিস এখনও? তুই.....
10/29

আমি ঠাট্টা করছি না... ওর টাকাগুলো ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিয়ে নাও। আর সাবান, জল ও একটা ব্রাশ দাও তো।
?
!!

অন্যেরাও যে-যা পার দিয়ে দাও।
এই যে সাবান...

তোমার মুখটা পরিষ্কার করা দরকার। মহিলার সামনে তুমি মুখ-খারাপ করেছ!
গ্লাব গ্লাব গ্লাব...

বিদায় শেরিফ। এবার এদের দায়িত্ব তোমার হাতে।
আমি বলছিলাম...! এক মিনিট, তুমি কে বল তো?

"ফুল্লেশ্বরী" (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) ছবিতে সন্ধ্যা রায় ও অনুপকুমার

ফটো—দেশ

মতামতের মন্তাজ

ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোরড বা চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষৎ গঠিত হল। এই পর্ষৎ গঠনের আর বিলম্ব নেই—এমন আশ্বাস কিছুদিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছিল। রাজ্য সরকার বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য বছরে পঁচিশ লাখ টাকা দেবেন। পর্ষদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী এই সাহায্যের সদ্ব্যবহার হবার কথা!

• • •

পরিচালকরাও এক অর্থে কলাকুশলী, তবুও চলচ্চিত্রের কলাকুশলী বলতে অন্য এক শ্রেণীকে বোঝায়। তাঁদের সংগ্রাম ও দারিদ্র্যের কথা কারো অজানা নয়। এঁরা কাজ করেন নেপথ্যে। এঁরা কারোর উপেক্ষিত। পরিচালকদের সঙ্গে এখানেই কলাকুশলীদের তফাৎ। অবশ্য পরিচালকরা কলাকুশলীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে ওঁরা অভিন্ন। একজন ছাড়া অপরের চলে না। যদিও প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির দিক থেকে ওঁদের অস্তিত্ব দুটি বিপরীত মেরুতে। কাজের ভূমিকাই এইরকম, তা নিয়ে ক্ষোভ করা চলে না। তবে যেহেতু চলচ্চিত্রের পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলী একই পরিবারের মতো, এক অপরের প্রতিনিধিত্ব অনায়াসেই করতে পারেন। একটি প্রশ্ন তবু থেকে যাচ্ছে। উন্নয়ন পর্ষদে কলাকুশলীদের গোষ্ঠীর প্রতিনিধি কি ঢুকতে পারবেন না?

• • •

ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোরডকে এখন বিরাট বিরাট সমস্যার জগদ্দল পাথর সরাতে হবে। এক একটি কঠিন সমস্যায় বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প এখন জর্জরিত। সমস্যা বহুবিধ। কোনটির সমাধান আগে চাই, কোনটির পরে তাও বিচার করে দেখতে হবে। কলাকুশলী ও কর্মীদের বাঁচাতে হবে, বাংলা ছবির প্রদর্শনীর ক্ষেত্র বিস্তৃততর করতে হবে এবং সর্বোপরি হিন্দী চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে হবে। এই সব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চলচ্চিত্রের শিল্পগত মান উন্নত হওয়া দরকার। কারুকর্ম এবং টেকনিক্যাল কাজ আরও সুন্দর ও সুষ্ঠু হওয়া উচিত। তার জন্য স্টুডিওর উন্নতি-বিধান অবিলম্বে করা দরকার। টেকনিক্যাল কাজের দিক থেকে আদর্শ ছবি তৈরি করার মতো সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি কলকাতার স্টুডিওতে নেই। অনেক উঁচু দরের ছবি কলকাতায় তৈরি হয়। সে কৃতিত্ব পরিচালক ও কলাকুশলীদের। স্টুডিওর দীনদশার মধ্যেও তাঁরা যে এত ভাল ছবি তৈরি করছেন সেটা তাঁদেরই অসাধারণ কৃতিত্ব। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ছাড়া ভাল ছবি তৈরির নজির বোধহয় একমাত্র কলকাতাতেই আছে। এই সঙ্গে যদি স্টুডিওর সরঞ্জাম আশানুরূপ হত তবে সাধারণভাবে বাংলা ছবির টেকনিক্যাল মান অনেক উন্নত হত।

• • •

পর্ষৎ-সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছেন, এখানে ভাল হিন্দী ছবি তোলার এবং রঙিন চিত্র তৈরির সুযোগও তলিয়ে দেখা হবে। বাংলা ছবি রঙিন হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। অবশ্য রঙের কদর এখন খুব বেশি। রঙ

ছাড়া সাধারণ হিন্দী ছবি তো দর্শক সাধারণের কাছে প্রায় অপাংক্তেয়। কলকাতায় কালার ল্যাবরেটরি নেই। কালার ছবি বানাবার সময় পরিচালকদের বোমবাই অথবা মাদ্রাজ ছুটতে হয়েছে। কলকাতার চলচ্চিত্র-শিল্পের এটাই এক মস্ত লজ্জার বিষয়। শুধু রঙিন ছবির ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য

সলিল দত্ত পরিচালিত "শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন" ছবিতে অপর্ণা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

টেকনিক্যাল কাজের উৎকর্ষের জন্যও পরিচালকদের প্রায়শই বোমবাই বা মাদ্রাজের ল্যাবরেটরির শরণাপন্ন হতে হয়। এখন যদি কলকাতায় হিন্দী চিত্র বা রঙিন চিত্র বানাবার প্রশ্নই ওঠে এবং বোমবাইয়ের হিন্দী চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাতে হয়, তবে এখানেও, কালার ল্যাবরেটরি অপরিহার্য। আরও অনেক ব্যবস্থাই চাই।

* * *

নবগঠিত চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদের সামনে এখন অনেক কাজ। কোন্ সমস্যার সমাধানের উপর তাঁরা বেশি গুরুত্ব দেবেন তাঁরাই জানেন। কেউ হয়ত বলবেন, বাংলা চিত্র প্রদর্শনীর সমস্যাই সকলের আগে। আবার ছবি যদি মুক্তি পেয়েও একেবারে না চলে বা দর্শকদের কোনরকমেই আকৃষ্ট না করে তখন মনে হবে প্রদর্শনীর সমস্যার চাইতেও আরও একটি বড় সমস্যা রয়ে গেছে। বাংলা ছবির প্রতি দর্শক একেবারেই বিমুখ একথা তো বলা যায় না। অতি সম্প্রতি একাধিক ছবি তো অনেকদিন ধরে দাপটের সঙ্গে চলছে। আবার কোন কোন ছবি তো মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই উঠে যায়। অতএব সংকট যেমন চলচ্চিত্রশিল্পের, সংকট তেমনি চলচ্চিত্রের। একটি শিল্প ব্যবসার সংকট, অপরটি শিল্পকলার সংকট। শেষের সংকটই বেশি ভয়ংকর কিনা কে জানে। অন্তত এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদেরই বা কী করবার আছে।

"ফাঁক" (পরিচালনা : রণু চক্রবর্তী) ছবিতে জয়শ্রী রায় ও আরতি ঘোষ

আরণ্যক

বিভূতিভূষণের আরণ্যক-এর প্রতি পরিচালক আগাগোড়াই বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। লবটুলিয়া বইহার কী আজমবাদের সেই আরণ্যক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরিচালক অজিত লাহিড়ি তাঁর ইউনিট নিয়ে গেছেন সুদূর অরণ্য-অঞ্চলে। আরণ্যক-এর বিষয় ও পরিবেশ বাংলা সিনেমায় নতুন, এই ছবির পিছনে সাহস ও শ্রম প্রচুর।

আরণ্যক ছবিতে বইয়ের ঘটনা প্রায় সবই পাওয়া যায়, পরিবেশও। কিন্তু পড়ার বস্তুকে দেখার বস্তু করতে হলে নতুন ডাইমেনশন বা মাত্রার দরকার হয় বইকি। সে বিষয়ে পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকাররা (সমরেশ বসু ও মৃগাঙ্কশেখর রায়) আর একটু সচেতন থাকতে পারতেন। জংগল-মহলের ম্যানেজার, ছবির নায়ক সত্যচরণের (সৌমিত্র ভঞ্জ) সংগে মজুতদার রাসবিহারীর (দীপক ঘোষ) সম্ভাব্য সংঘর্ষের কারণ যদি না ঘটতো তবে নাট্যরসিক দর্শকের হয়ত ক্ষোভের কারণ থাকত না। ছবিতে ওই সংঘর্ষ পরিণতিবিহীন। বিচিত্র জনের সংস্পর্শে নায়কের মনের প্রতিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা দেখে দর্শক যদি কিছুটা রোমাঞ্চ বা নাট্যরস প্রত্যাশা করেন তবে সেটা দোষের নয়। হয়ত পরিচালক মূল রচনার সংযম অনুসরণ করেছেন; নায়ককে অরণ্যের বিচিত্র জীবনযাত্রার সাক্ষীই রাখতে চেয়েছেন। তবে নায়কের সেই নির্লিপ্ততা প্রকাশ পেল না কেন? সাঁওতাল রাজকুমারী ভানমতীর কাছে যখন সত্যচরণ তখন তো তাকে রীতিমত রোমান্টিক নায়কই মনে হয়। ভানমতীর কাছে তার ছুটে যাওয়ার মধ্যেও তো সেই ব্যগ্রতা।

ছবির ঘটনাগুলি দেখে নাট্যামোদী দর্শক আশার ছলনায় ভুলবেন। এমন হতে পারে যে পরিচালক মোটেই নাটক রচনা করতে চাননি। কিন্তু নতুন অভিজ্ঞতার জগতে সত্যচরণের মুগ্ধতাই বা তেমনভাবে প্রকাশ পেল কই? সৌমিত্র ভঞ্জ নায়কের দরদী মনের পরিচয় নিখুঁতভাবেই দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর আশে-পাশে যে আদিবাসীরা ভিড় করে এসেছে তাদের অদ্ভুত জীবন ও আচরণের মধ্যেই তো স্বাভাবিক নাটক, যা সাজানো নাটকের চাইতে আরও বেশি মূল্যবান ও উপভোগ্য হতে পারত। সে-জগতে সভ্য মানুষের যাতায়াত নেই সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সত্যচরণের যে রোমাঞ্চ অনুভব করার কথা দর্শক ছবিতে তার হদিস পেলেন না। আদিবাসী বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা (বিদ্যা রাও) বাঙালী বাবুজির ধারে-কাছে বার

আরণ্যক: সোনিয়া সাহনী

বার আসতে চেয়েছে। সত্যচরণের মনে তো ভানমতী, ছবি দেখে মনে হয়, পুরোপুরি জায়গাই করে নিয়েছে। বাঙালী ম্যানেজারের মনে বাঈজির মেয়ে কুন্তারও রেখাপাত করার কথা। সকলের কাছ থেকেই সত্যচরণ একে একে বিদায় নিয়েছে। কুন্তা নিয়ে এসেছে স্মৃতিচিহ্ন—ফলের চারা। যে স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে সত্যচরণের অরণ্য থেকে ফেরার কথা তার কোন আভাস বা চমকই যে দর্শক পেলেন না। বিদায়ের পারম্পর্য স্মৃতিচারণার ভুল থাকল কিনা দর্শকের পক্ষে জানা কঠিন।

অরণ্যে অনেক চরিত্রই দর্শক দেখেছেন। তাদের বেশির ভাগ বনের গাছের মতোই যেন সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, নড়ে না চড়ে না। বেনারসের বাঈজির মেয়ে কুন্তা (সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়) তাদের চেয়ে একটু আলাদা। তার রঙও ফর্সা, তার গল্পও পৃথক। কুন্তার জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা বোঝা যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়েও তা স্পষ্ট। কিন্তু অন্যরা অরণ্যবাসী হয়েও কেমন যেন একটু কৃত্রিম। অরণ্য-জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েও কুন্তার মধ্যে যদি কিছুটা শহুরে ভাব থাকে সেটা হয়ত মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু কুস্তী রাসবিহারীর ভিলেনির মধ্যেও শহুরে লক্ষণ। শিল্পীর কথা বলার ভঙ্গি ও তাকানো নাটকীয়। বিদ্যা রাওয়ের চপলতা ও দৃষ্টিপাতের মধ্যেও সিনেমা সিনেমা ভাব। অবাঙালী বলেই হয়ত, সোনিয়া সাহনীকে সাঁওতাল মনে হয়েছে। তবু তাঁর আচরণে আরণ্যক সরলতা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল না, [illegible] বরং সাঁওতাল রাজার [illegible] আচার-আচরণ অনেক [illegible]।

ছবি দেখে কখনও মনে হয় পরিচালক চরিত্রদের চাইতে পরিবেশের প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন। কোন কোন চরিত্রের কৃত্রিমতা যদিও পরিবেশীয় গুণ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে, তবু পরিবেশ সত্যিই আরণ্যক। ছবির লোকেশান বেছে নেওয়ার মধ্যে পরিচালকের কৃতিত্ব আছে। পটভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শকের দৃষ্টিকে নিরন্তর আকৃষ্ট করে রাখে। ক্যামেরা (বিজয় দে-কুত) অরণ্যের রূপ দেখিয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। এবং তারই সাহায্যে পরিচালক কিছু দৃশ্য চলচ্চিত্রের ভাষাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। প্রয়োগের বেশ কিছু কাজ নিপুণ ও শিল্পধর্মী। কুন্তার কাহিনীর ফ্ল্যাশব্যাক চমৎকার, কেবল টেকনিক্যাল কাজের দিক থেকেই নয় রসপরিবেশনের জন্যও তা চিত্তগ্রাহী। কুন্তা ও দেবী সিংয়ের মিলনের দৃশ্যটি সুন্দর। আরও বেশি মনোগ্রাহী এই অংশের গান (বরখা ঋতু বৈরী হামারো)।

ছবিতে গানের সুরকার: কালীপদ সেন, ব্যবহারে সংযম আছে, তাৎপর্যও দেখা গেছে। গানগুলি খুবই সুন্দর গেয়েছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমা ভট্টাচার্য। গানের ভিতর দিয়ে পরিচালক যে আদিরসের পরিবেশ রচনা করেছেন তা মনকে অভিভূত করে। ছবির শেষ হয়ে যাবার পরও দর্শক নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায় বিখ্যাত গানের কলি মনকে নাড়া দিতে থাকে।

হাসতে জখম

গভীর দুঃখেও মানুষ হাসে। প্রযোজক-পরিচালক চেতন আনন্দ হয়ত হাসতে জখম এ ওই কষ্টকর হাসির কথাই বলতে চেয়েছেন। তবে এই ট্রাজেডি চিত্র ওই বিশেষ হাসির চাইতে ক্রাইম দেখার রোমাঞ্চই দর্শক বেশি করে অনুভব করবেন। সাজানো গল্পে প্রেম ও ক্রাইম দুই-ই আছে। প্রেমিক নবীন নিশ্চল, প্রেমিকা অভিনেত্রী প্রিয়া। অভিজাত ঘরের ছেলে নবীন যে কল গার্ল প্রিয়াকে ভালবেসেছে এবং তার জন্য ঘর-সংসার ছেড়েছে ও ট্যাক্সি-ড্রাইভার হয়েছে সেটা মামুলি। এই অবাস্তবতাও কষ্টকর হাসির বিষয় নয়। সাহিত্যকারের হাসির বিষয় হল কন্যা-বদল। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বলরাজ সাহনির মেয়ে হয়েছে কল গার্ল, আর তাঁর মেয়ে বলে যে পরিচিত (সুমন

হাসিতে জখম/নবীন নিশ্চল

সিকন্দর) সে হল এক বারবনিতার কন্যা। ভাগ্যের এই পরিহাসের পথ পরিচালক আগেই পরিষ্কার করে রেখেছিলেন। দুটি মেয়েই এক স্কুলে পড়ত, অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ওরা একের নাম অপরের হাতে লিখিয়ে নিয়েছে। তাই বদমাশ লোকেরা বারবনিতার মেয়ে চুরি করতে গিয়ে পুলিশ সুপারের মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়।

ঘটনার প্যাঁচ অনেক। নায়ক নবীনের সঙ্গে তার প্রিয়া (অভিনেত্রীর নামও তাই) আর মিলতে পারল না। ভিলেনদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে সে নিহত। এই অর্থে ছবিটি ট্র্যাজেডি, নাম বোধ হয় সেকারণেই হাসিতে জখম।

ছবির বিবিধ অবাস্তবতা ও প্রমোদ-প্রকরণ দেখে বিচারশীল দর্শকের অতি কষ্টেও হয়ত হাসি পাবে। তার মধ্যে কিছুটা সুখের বিষয় হল চেতন আনন্দের সংলাপ, যা সত্যিই ভাল। এই সংলাপে প্রাণের স্পর্শ আনতে গিয়ে অভিনেত্রী প্রিয়া হিমসিম খেয়েছেন। ছবির ঘটনাবর্তে নবীন নিশ্চল সর্বক্ষণই সচল, বেশ স্মার্ট। সুন্দর সংলাপ সমেত এই সাজানো গল্পে নাচ ও গান (মদনমোহন সুরারোপিত) পর্যাপ্ত।

নাট্য-সমালোচনা

আধে-অধুরে
(শৌভনিক)

সমকালীন বিষয়ের নাটক প্রযোজনা করে শৌভনিক আবার সাহসের পরিচয় দিলেন। 'আধে-অধুরে'র মতো নাটক প্রযোজনা করে শৌভনিক দেখিয়ে দিলেন, হালকা প্রমোদের ফাঁদ পাতাই তাঁদের একমাত্র কাজ নয়।

আধে-অধুরে নামেই মোহন রাকেশ তাঁর নাটকের বক্তব্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। তাঁর নায়িকা সাবিত্রী আধে-অধুরে-তে তুষ্ট নয়। সে চায় সম্পূর্ণ মানুষ। 'আধে-অধুরে'র মানে অসম্পূর্ণ।

সম্পূর্ণ মানুষ বলে কিছু হয় না। থাকলেও সাবিত্রীর মতো মেয়েরা তাকে খুঁজে পায় না। সাবিত্রীর বয়স চল্লিশ, তার বিবাহিত জীবন বাইশ বছরের। স্বামী মহেন্দ্রনাথ তার কাছে একটি সম্পূর্ণ পুরুষের ভগ্নাংশ মাত্র। সাবিত্রী সেটা বিয়ের দু বছর পরেই বুঝতে পারে। এবং বিশ বছর ধরে তাই সাবিত্রী [illegible] পুরুষ খুঁজে মরে। একে একে তার জীবনে আসে জুনেজা, [illegible], মনোজ প্রভৃতি। সাবিত্রীর কাছে ওরাও খণ্ডাংশ মাত্র।

আধুনিক জীবনের জটিলতা আধে-অধুরের বিশ্লেষণের বস্তু। সে জটিলতা কি এবং কেন সেটা নাট্যকার অতি স্পষ্ট করে তুলেছেন। বিশ্লেষণ করে তিনিই সবটা বুঝিয়ে দিয়েছেন, দর্শকের চিন্তা বা বুদ্ধিগত বিচারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি।

সাবিত্রীর সমস্যা বা যন্ত্রণা আর্থিক অসচ্ছলতার উপর নির্ভরশীল নয়। তার সমস্যা একান্তভাবেই মানসিক। জীবনবেগের তাড়নাতেই সে তার স্বপ্নের মানুষকে খুঁজছে। নাট্যকার হয়তো ভেবেছিলেন, পরিবারের আর্থিক সমস্যা সাবিত্রীর অস্থিরতাতে নতুন মাত্রা যোগ করবে কিংবা তাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে। দুটি প্রসঙ্গ কিন্তু নাটকে স্পষ্টতই আলাদাই রয়ে গেল। এই নাটকে শুধু সাবিত্রী নয়, প্রত্যেকেই এক একটি যন্ত্রণার শিকার। সাবিত্রীর একমাত্র ছেলে অশোক বেকার। বেকার বলেই হয়তো সিনিক কিংবা ফ্রাস্ট্রেটেড। কোনটাই তার হবার কথা নয়, কারণ চাকরির চেষ্টা বা চাকরি পাবার আগ্রহ তার নেই। আত্মসম্মানবোধও তার নেই, কারণ মায়ের রোজগারের উপর বেঁচে থাকাতে সে কুণ্ঠিত নয়। অশোক এবং তার দুই বোন বিনি (বিবাহিতা) ও কিন্নী [illegible] অন্য একটা কারণ আছে। বাবা-মায়ের জীবনের অশান্তি অথবা তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব সন্তানদেরও প্রভাবিত করেছে। ছোট যে মেয়ে কিন্নী তার মধ্যেও এই পারিবারিক অশান্তির প্রতিক্রিয়া বিশেষ প্রকট হয়েছিল। মহেন্দ্র ও নাট্যকার

"আলোর ঠিকানা" (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবিতে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন

ফটো—দেশ
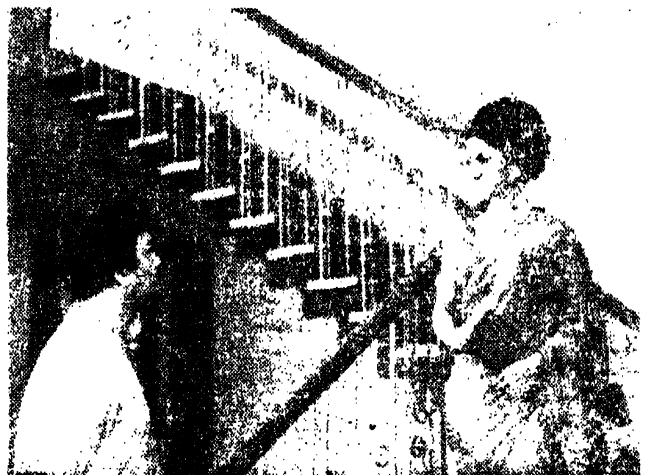
অক্ষম করে রেখেছেন। অক্ষম বলেই বুঝি সে অসম্পূর্ণ। সে সক্ষম হয়েও যদি অসম্পূর্ণ হত তবে নাটকের বক্তব্য বা বিশ্লেষণ আরও সত্য, তীক্ষ্ণ ও রহস্যময় হত না কি? বিনানি কেন বিবাহিত জীবনে নিজকে মানিয়ে নিতে পারছে না তা সে নিজেই জানে না। তার স্বামী মনোজের অভিযোগ, সে পিত্রালয় থেকে এমন কিছু একটা নিয়ে এসেছে যা দুজনকে মিলতে দিচ্ছে না। বিনানি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েই বিয়ে করেছিল, মনোজকে ভালবেসে। পরে একটি কঠিন সত্য বিনানি জানতে পেরেছে। সাবিত্রী একদিন মনোজের মধ্যেও সম্পূর্ণ মানুষ খুঁজেছিল।

নাট্যকার জীবনের কিছু নির্মম সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। নাটকের শেষ মুহূর্তে সাবিত্রী যেখানে জুনেজার কঠোর বিচারে অভিযুক্ত—সাবিত্রীর মানসিকতার রূপ যখন উদ্ঘাটিত—দর্শক তখন নাট্যকারের স্পষ্টবাদিতার পরিচয় পেয়ে স্তব্ধ। সময়ের হিসাবে নাটক সেখানেই শেষ, তবে বিষয়ের গতিতে নয়। নাট্যকার তার কাহিনীতে কোন ছেদ টানতে নারাজ, এর সুষ্ঠু পরিণতিও বুঝি নেই।

'আধে-অধুরে'তে ঘটনার চমক নেই। সাধারণ প্রমোদ-নাট্যও নয় আধে-অধুরে। সংলাপ-নির্ভর এই নাটকে কথার ভিতর দিয়েই অসম্পূর্ণ সব মানুষের পরিচয়। বাংলা সংলাপ তথা অনুবাদ (প্রতিভা অগ্রবাল ও শমীক বন্দোপাধ্যায়-কৃত) সেদিক থেকে সার্থক। 'আধে-অধুরে'কে বক্তব্যময় করে তোলার জন্য সব চাইতে বেশী প্রয়োজন সুষ্ঠু অভিনয়ের। শৌভনিক-গোষ্ঠীর শিল্পীরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরিচালক কৃষ্ণ কুণ্ডু মহেন্দ্রনাথ সহ আরও তিনটি ভূমিকায় (সিংহানিয়া, জগমোহন ও জুনেজা) অভিনয় করেছেন। মহেন্দ্রনাথ ও জুনেজার বেশে তাঁর উঁচুমানের অভিনয় নাটকটির তাৎপর্য ও বক্তব্য অতি সহজেই দর্শকের কাছে প্রকাশ করেছে। অন্য দুটি ভূমিকায়ও তাঁর চরিত্রচিত্রণ চিত্তাকর্ষক। নাটকটির মর্মকথা প্রকাশের গুরুভার বেশিমাত্রায় নির্ভর করে সাবিত্রী-বেশিনী শিল্পীর উপর। কাজল মুখার্জি চরিত্রটির যন্ত্রণা ও অস্থিরতা স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন। অস্থিরতা প্রকাশের জন্য তিনি মঞ্চের এদিক থেকে ওদিক দ্রুত পদচারণা করেছেন। তবে সাবিত্রীর জীবনবাসনার উত্তাপ আরও প্রকাশ পেতে পারত। বাণী বরমার বিনানি ওই অশান্ত পরিবেশে বিভ্রান্ত, নিজের জীবনের শূন্যতার কারণ খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা। শিল্পী চরিত্রটির এই রূপ চমৎকার দেখিয়েছেন।

"আলো আঁধারে" (পরিচালনা : ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে নবাগত তরুণ চক্রবর্তী ও অর্পিতা ভট্টাচার্য

প্রণতি মজুমদারের কিননি স্বাভাবিক। ভূপাল মুখার্জি একটু বেশী অভিনয় করেছেন, তবে তিনি স্বচ্ছন্দ।

পরিচালক কৃষ্ণ কুণ্ডু নাটকটির বক্তব্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, আঙ্গিকের উপর নয়। গাণিতিক শৃংখলায় নাটকের গতি ও অভিনীত মুহূর্ত নিয়ন্ত্রিত। সংগীত (ভাস্কর মিত্র) নাটকের মেজাজ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সব মিলিয়ে শৌভনিকের আধে-অধুরে পুরো দু ঘণ্টা দর্শককে নিবিষ্ট রেখেছে।

অনাদিকুমারের জন্মদিনে 'ইন্দিরা'র অর্ঘ্য

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয়ের বয়স এখন সত্তর। রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ও তার ধারা সংরক্ষণের কাজে অনাদিকুমারের দান স্মরণীয়। অনাদিকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হেতুই ওঁর জন্মদিনে 'ইন্দিরা' সংস্থা গত ৩রা জুন তারিখে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

ইদানীং অসুস্থ হয়ে পড়ায় দস্তিদার মহাশয় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর জীবনের দু'টি-একটি ঘটনার উল্লেখ করে স্মৃতিচারণ করেছিলেন শ্রীমতী কানন দেবী এবং শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। এঁদের কথায় চমৎকারিত্বে একটা নতুন পরিচয় ঘটল অনাদিকুমারের সংগে। মনে হল তিনি যেন সশরীরে উপস্থিত না থেকেও আসরটুকু ছেয়ে আছেন।

অনাদিকুমারের কম-বেশী দেড় শ' স্বরলিপিকৃত গানের গোটা বারো আমরা সেদিনের আসরে শুনেছিলাম। তারই মধ্যে সাজান ছিল কবির ধ্রুপদ-ভাঙা গান টপ্পা আঙ্গিকের গান, কীর্তন-ভাটিয়ালী ভিত্তিক গান, আরও এটা-ওটা। আমার ভাল লেগেছিল সমবেত কণ্ঠের নিবেদন 'রাজ-রাজেন্দ্র জয়, জয়তু হে।' নন্দা চৌধুরীর কণ্ঠে 'পূবে হাওয়াতে দেয় দোলা' বেশ ছন্দবন্ধনে ধরা ছিল। দ্বৈত কণ্ঠে 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি' গানটি তার ভাবের সৌকর্যে একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সম্মেলক নিবেদনে ভাটিয়ালী উপচার 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব' গানটিও রসসিক্ত। সম্মেলক পরিবেশনায় 'অনেক দিনের শূন্যতা মোর' গানটিও রবীন্দ্রসংগীতের তেজী-সাবলীল গঠনটুকুকে ভাস্বর করল।

তবে সেদিন সব চেয়ে বেশী কানে ধরল সুপূর্ণা চৌধুরীর গান। নিভৃত নিবেদন 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে' ওঁর গলার সূক্ষ্ম কাজের আঁচ পেয়েছিলাম। সমস্তটুকু পরিষ্কার হল যখন সুপূর্ণা গাইলেন টপ্পায় ঢালা কবির অনুপম গানটি 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি।'

দু-একটি গানে শিল্পীদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে সে আলোচনা উহ্য রাখলাম আসরের উদ্দেশ্যকে স্মরণ করে।

—সংগীত সমালোচক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-কংগ্রেস পরিস্থিতি বর্তমান সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। রাজ্য কংগ্রেসে শৃঙ্খলা ও ঐক্য ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় মোটামুটিভাবে তিন দফা সূত্র তৈরি করেছেন। তিন দফা সূত্রের প্রথমটি হ'ল রাজ্য কংগ্রেসের শাখা সংগঠন ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস ও শ্রমিক ফ্রন্টের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বেঁধে দেওয়া হবে। ২। কংগ্রেস ও এই শাখাসংগঠনগুলির নেতা ও কর্মীদের জন্য একটি আচরণ বিধি থাকবে। এই আচরণ বিধি অনুসারে একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কোন ক্ষেত্রে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা হ'লে সংশ্লিষ্ট নেতা বা কর্মীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ৩। সমাজ বিরোধী ও দলে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। সরকারী নীতি এবং দলীয় নীতি বাস্তবে রূপায়ণের ব্যাপারে মন্ত্রিসভা এবং প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে সংযোগ রাখতে সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। সর্বোপরি, দল থেকে সমাজবিরোধীদের বের করে দেওয়ার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সহ একত্রিশজন কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে এক যোগে আনন্দের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, এসব ভুল বোঝাবুঝির পুরোপুরি সমাধান হয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে বাইশ দফা আচরণ বিধি পাকা হয়েছে।'

দেশী সংবাদ

৫ জুন—[illegible] বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নাম সই করে [illegible] দেশী ও বিদেশী সব ব্যাংকেই অ্যাকাউন্ট খোলা [illegible]। বাংলা বা অন্য কোনো ভাষা [illegible] এমন কোন বিধি-নিষেধ [illegible] নেই। [illegible] ভারতীয় [illegible] রয়েছে।

[illegible]

৬ জুন—[illegible] তিন [illegible] সি [illegible] সুপারিশ করেছেন। এছাড়া একটি [illegible]

[illegible] কোন [illegible]

৭ জুন—[illegible] কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সোমবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বিদেশ থেকে যে অশোধিত তেল আসছে তার দাম বেড়েছে বলেই এই সিদ্ধান্ত।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত [illegible] বিরোধী দল এই [illegible] বন্ধ [illegible] এবং [illegible] বিক্ষিপ্তভাবে [illegible] ঘটনা ঘটেছে। [illegible] প্রায় ৫০ জন। [illegible]

৮ জুন—সরকার [illegible] শোধনাগারগুলি [illegible] কোটি টাকা [illegible] এই শোধনাগারগুলির মধ্যে [illegible] বিদেশী কোম্পানি।

[illegible] ১৯৭২-৭৩ [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] ঘোষণা করেন। কেন্দ্র এখন এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখছেন। তিনি জানান। পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য [illegible] তিনি তাঁর সুপারিশ [illegible]।

৯ জুন—[illegible] রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হয়েছিল। [illegible] কার্যকর [illegible] বিরোধী মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাস করা। যাঁরা অযোগ্য এবং যাঁদের মধ্যে [illegible] অভাব দেখা যাচ্ছে এমন মন্ত্রীদের বাদ দেওয়ার কথা উঠেছে।

দক্ষিণ কলকাতা জেলা যুব কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী নিয়োগের শতকরা পঁচানব্বইটি ক্ষেত্রে এই রাজ্যের অধিবাসীদের কাজ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, এই রাজ্য চাকুরি প্রার্থীদের অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে শিখতে হবে।

১০ জুন—পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ আজ বলেন : দুর্গাপুরে সিটি সেন্টারে ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথম টয় ট্রেন ও হরিণ উদ্যানের উদ্বোধন করেন। দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয়ে টয় ট্রেন ও হরিণ উদ্যান নির্মাণ করেছেন। এই ট্রেনটিতে ৫০ জন ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে মাইলখানেক প্রমোদ ভ্রমণ করতে পারবে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সুতো সংকটের উদ্দেশ্যে সব রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে এক বৈঠক ডেকেছিলেন। এই বৈঠকে সুপারিশ করেছেন, মোটা সুতোর বণ্টনের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি কিছু শিথিল করা হোক।

১১ জুন—তৈল শোধনাগারগুলি [illegible] পেট্রোল জাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিল, অবশেষে সরকার সে দাবি মেনে নিয়েছেন। এর ফলে সমগ্র তৈল শিল্পে এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হল। এখন আবার পেট্রোল জাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘোষণা করা হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

৫ জুন—বাংলাদেশের [illegible] ভারতীয় দ্রব্য বয়কট করার প্রস্তাব সম্পর্কে ঢাকায় একটি নির্দলীয় দৈনিক [illegible] মন্তব্য করেছে, এমনিতেই ভারতীয় দ্রব্য [illegible] ভারতীয় দ্রব্য বয়কট [illegible]

৬ জুন—[illegible]

৭ জুন—[illegible] চিকিৎসা [illegible]

৮ জুন—[illegible] সম্পর্কে [illegible] দেবেন। জাতীয় পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর ফলে বিরোধী পক্ষের কাছে [illegible] স্বীকার করলেন।

৯ জুন—আগামী ৩০ জুন [illegible] আফ্রিকায় [illegible] পৃথিবীর বহু দেশে। উত্তর আমেরিকা এর আওতায় পড়ছে না।

১০ জুন—[illegible] এক সংবাদে প্রকাশ : মহাকাশের [illegible] জন্য আজ ৫৫২ পাউন্ডের একটি উপগ্রহ চাঁদের পথে রওয়ানা হয়েছে। এই [illegible] ফলে জ্যোতির্বিদরা পৃথিবীর গোড়ার ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

বর্ষ] শনিবার, ২৯ আষাঢ়, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 14th July, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ৩৭

বলুন তো কার মা
খেতে দেন ইন্‌ক্রিমিন*?

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মুখের দুর্গন্ধ মস্ত অন্তরায়
COLGATE
DENTAL CREAM
কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন...
সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পন্থায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশির ভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। কারণ, কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়।
সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিন্টের গন্ধ—তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালবাসে!
মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও উজ্জ্বল দাঁতের জন্য...
দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট!
দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য ব্যবহার করুন
কলগেট টুথ ব্রাশ
১৫ রকমের—প্রত্যেকের উপযুক্ত!
DCG.49 BN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মতি নন্দীর

ফুটবল মাঠের অন্তরালের কাহিনী

স্ট্রাইকার

দাম ৫·০০

দর্শকদের হাততালি, জয়ধ্বনি, ফুলের মালা, কাঁধে নিয়ে নাচানাচি, ক্লাবের কর্তাদের তোয়াজ — সবই শুধু সে কদিনের জন্যে, যে কটা দিন খেলোয় থাকে জৌলুসে, পায়ে যাদু; তারপরেই নিঃশব্দে তলিয়ে যাওয়া — কখনও কখনও বা আবার অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে — বিস্মৃতির অতলে। এ-ই ফুটবল খেলোয়াড়ের জীবন। এরই জন্যে আবাল্যযৌবনের কত কৃচ্ছ্রসাধনা, কত দুঃখবরণ — মহাকালের প্রেক্ষাপটে, হৃদয়হীন দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে কত প্রাণপাত পরিশ্রম! এই বিষাদান্ত অথচ উন্মাদনাময় জীবনেরই এক জীবন্ত আলেখ্য ক্রীড়া-সাংবাদিক লেখক মতি নন্দীর নতুন উপন্যাস 'স্ট্রাইকার'। বাঙালীর সবচেয়ে প্রিয় খেলা ফুটবলকে কেন্দ্র করে ফুটবল ক্লাব, ফুটবল খেলোয়াড়, ক্লাব-কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির পর্দার অন্তরালের সত্যিকারের নাটকটি এ উপন্যাসে যেমন করে ধরা পড়েছে, আর কোনও বাংলা উপন্যাসে এর আগে তেমনটি দেখা যায়নি। বাংলা সাহিত্যের পরিধি বিস্তারে লেখকের এ এক অনবদ্য এবং সার্থক প্রয়াস।

প্রকাশিত হল

সমরেশ বসুর উপন্যাস

অশ্লীল ৫·০০
সওদাগর ৭·০০
যার যা ভূমিকা ৭·০০
সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা ৪·০০

বিমল করের উপন্যাস

কুশীলব ৩·৫০
পরিচয় ৪·০০
গ্রহণ ৪·০০
খড়কুটো ৫·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

পাথরের চোখ ৫·০০
স্মরগরল ৭·০০
আঁধার পেরিয়ে ৬·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

এই তার পুরস্কার ১০·০০
দ্বিতীয় প্রেম ৩·০০
ঝড় ৮·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস

তপন চরিত ৪·০০
অমাবস্যার গান ৩·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস

লোকরহস্য ৫·০০
সারারাত ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ

উত্তম মধ্যম ৫·০০
কল্পকুহেলি ৮·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের উপন্যাস

লোকারণ্য ৪·০০
ভ্রষ্টলগ্ন ২·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলি: ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২ ॥ বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলি: ৯

৪০ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৭
শনিবার, ৩০ আষাঢ়, ১৩৮০
Saturday 14 July 1973

সি এম ডি এ-র খেয়ালখুশি

এক এক পশলা বৃষ্টি আসে আর প্রমাণ করে দিয়ে যায় কলকাতা শহরের রাস্তাঘাটে কত রজ লুকিয়ে আছে। ইতি-মধ্যে তিন চারবার যে জোর বৃষ্টি হয়েছে তাকে ঠিক প্রবল বলা যায় না, অন্তত সেই ধরনের প্রাবল্য প্রতিটি বর্ষণের ছিল না, অথচ আধ ঘণ্টার মতন বৃষ্টি হোক বা ঘণ্টাখানেকের মতন—অবস্থা সেই একই, কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট জল-কল্লোলে কল্লোলিনী হয়েছে। এমন যখন অবস্থা তখন শোনা যাচ্ছে, সি এম ডি এ রাস্তার জল অপসারণ ও ড্রেনেজ স্কিমের জন্যে বরাদ্দ সাড়ে বারো কোটি টাকার কাজ আপাতত বন্ধ করে দিতে চান। কি কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়নি।

সাড়ে বারো কোটি টাকার যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, গত তিন বছরে তার মধ্যে মাত্র একানব্বই লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বরাদ্দ অর্থের নামমাত্র। কাজ কতটুকু হয়েছে তা কল-কাতাবাসী স্বচক্ষেই দেখতে পান। বরাদ্দ অর্থ থাকা সত্ত্বেও এবং কাজের নমুনা হাসাকর হওয়া সত্ত্বেও কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা আমরা জানি না। তবে শোনা যাচ্ছে, সি এম ডি এ-র জনৈক বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারের ধারণা, এতদিন যেসব স্কিম অনুমোদন করা হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ। কাজেই অনু-মোদিত স্কিম আবার পরীক্ষা করতে হবে। নতুন নতুন স্কিম পেশ করার জন্যেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পূর্ত দফতরের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, সাড়ে বারো কোটি টাকার স্কিম কলকাতা কর্পোরেশন আগেই সি এম ডি এ-কে দিয়েছিলেন এবং তা অনুমোদিত হয়েছিল। এখন কি কারণ সেই স্কিম ত্রুটিপূর্ণ হল তা বিস্ময়ের ব্যাপার। তারও বিস্ময়ের বিষয় হল, এখন যিনি কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিসট্রেটর তিনিই যখন আবার সি এম ডি এ-র ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় ছিলেন চেয়ারম্যান তখন স্কিম অনু-মোদন পায়। তা হলে এখন নতুন ত্রুটি কোথা থেকে এল?

নতুন নির্দেশনামা জারি হবার পর বহু প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ কলকাতাকে এখন ফেলে রাখার উপায় নেই। বিশেষ করে শহর থেকে জল অপসারণ ও ড্রেনেজ স্কিমের কাজ। পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন মোটেই চান না এই কাজ কোনোক্রমেই বন্ধ হোক। জল অপসারণ, নতুন ভূগর্ভস্থ পয়ঃ-প্রণালী এবং পাম্পিং স্টেশন—এই তিন স্কিম বাবদ বরাদ্দ সাড়ে বারো কোটি টাকার কাজের এমন হাল কি করে হল? তাছাড়া যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে তা এতই কম যে স্কিমের কাজ প্রায় কিছুই হয়নি। যদি এমন হয়, কাজের নমুনা দেখেই সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং কাজ বন্ধ করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে তবে অন্য কথা; কিন্তু যদি অন্য কোনো গোপনীয় কারণ থাকে তবে এই ধরনের নির্দেশ স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া কিছু নয়। সি এম ডি এ নিজের স্কিমে যে কাজ করেছেন তা কি ত্রুটিহীন?

একশো বিয়াল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে এ-যাবৎ সর্বপ্রকার উন্নয়ন কার্যে সি এম ডি এ মাত্র পঁচাত্তর কোটি টাকা ব্যয় করে-ছেন। যদি দেখা যায় বরাদ্দ টাকায় কাজ হচ্ছে না এবং যে-জন্যে বরাদ্দ তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে না তবে কেন্দ্র কি প্রয়োজনীয় টাকা আর দেবে?

স্পষ্ট করে বোঝা না গেলেও মনে হচ্ছে, কলকাতার সার্বিক উন্নয়নের কাজে একটা অসহযোগিতার মনোভাব এবং এলোমেলো কাজ চলছে। যথার্থ কাজের কাজ হচ্ছে না। এমন কি, যে গুরুত্ব, উদ্যম এবং আন্তরিকতার প্রয়োজন তার বিশেষ কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। না হলে স্কিম কেন অনুমোদন করা হয়, কেনই বা পরে তার মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়ে? একবার 'হ্যাঁ'—এবং তারপর 'না'-র মত যুক্তি কোথায়?

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৬·০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৮·৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯·৫০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৪·০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২২·৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১·৫০

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৭·০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৪৪·০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২২·০০
বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৬০·০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৩১·০০

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক — টাঃ ১৭৪·০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৮৭·৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৪৪·০০

মুদ্রাস্ফীতি
কোথায় পরিণতি?

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের প্রচেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। সি পি আই 'জুলাই মাসের কোনও একদিন" পশ্চিম বাংলা বনধ ডাকবে বলে ঘোষণা করেছে। সি পি এম এবং তার লাল্ত শরিকও ভাবছে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম বাংলা বনধ ডাকবে। আবার দুপক্ষেই এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা মনে করছেন বনধটা যৌথভাবে ডাকাই ভাল। সি পি আই আনুষ্ঠানিকভাবে এই বনধের অন্যতম উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কংগ্রেসের কাছেও প্রস্তাব দিয়েছে।

সি পি আই নেতারা বলছেন, এই বনধ হবে কালোবাজারী, মজুতদারী, মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে। তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে বনধ করার কথা বলছেন না। এমনও বলছেন না যে সরকারী নীতির ব্যর্থতার প্রতিবাদে বনধ। তাঁরা বলছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেও যুক্তফ্রন্ট বনধ ডেকেছিল এবং তাতে যুক্তফ্রন্টের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি।

সি পি এম এবং অন্টবাম কিন্তু "সরকারী নীতির ব্যর্থতার বিরুদ্ধেই" বনধ ডাকতে চাইছেন। তাঁরা বনধের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার কথাই বলছেন। আসুন, আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে বনধ করি—একথা অন্ততঃ অন্টবাম বলছেন না।

আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে বনধ ডাকবই—এই দৃঢ়তা নিয়ে সি পি আই বা অন্টবাম এখন বনধের কথা বলছে কিনা সেটা অবশ্য বোঝা কঠিন। যদি জুলাই মাসের কোনও একদিন বনধ ডাকাতে হয়, তাহলে অবশ্য ইতিমধ্যে সি পি আইকে অনেক দূর এগোতে হয়েছে। সি পি আইয়ের যা শক্তি তাতে এককভাবে বনধের ডাক দিয়ে তাকে সফল করা অসম্ভব ব্যাপার। সি পি আই একা বনধ করতেও যাবে না। সি পি আই সংগে অন্যদেরও পাওয়ার চেষ্টা করবেই। না পেলে বনধই করবে না।

যতটা জানি, সি পি এম বা অন্টবাম এখনই বনধ করার পক্ষে নয়। তাঁরা আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বনধ করার কথা ভাবছিলেন মাত্র। বনধ করবেনই এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেন নি। বনধ একটা হলে তাঁরা খুশী হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বনধের ডাক দিয়ে একটা বড় ঝুঁকি চট করে নিতে চান না।

অন্টবামের নানা ভয়।

এক নম্বর ভয়, এখনই যদি বামপন্থীরা বনধের ডাক নিয়ে পাড়ার পাড়ায় সক্রিয় হতে যায় তাহলে কংগ্রেসে যে ফাটল ধরেছে, কংগ্রেসের নীচের তলা পর্যন্ত যে
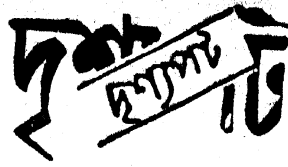
বিরোধ দেখা দিয়েছে, তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কমিউনিস্টরা আবার সক্রিয়—এই ধুয়া তুলে কংগ্রেসীরা একতাবদ্ধ হয়ে যাবে। তাঁরা মনে করছেন, তার চেয়ে বরং কংগ্রেসের ঝগড়াটাকে আরও বেশ কিছুটা বাড়তে দেওয়া উচিত এবং তার আগে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে কংগ্রেসের ঝগড়াটা মিটে যায়।

দু নম্বর ভয়, কতকগুলি এলাকায় আস্তে আস্তে সি পি এমের ছেলেরা ফিরে যেতে পারছে। আপাতত তাঁরা পাড়ায় গিয়েই রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে চান না। প্রথমে তাঁরা চুপচাপ থাকতে চান, তারপর আস্তে আস্তে প্রতিবেশীদের সহানুভূতি পেতে চান, তারপর আঞ্চলিক বা স্থানীয় দাবি-দাওয়া নিয়ে সক্রিয় হতে চান। ধাপে ধাপে এগোনোই তাঁদের কর্মসূচী। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী না এগিয়ে এখন চট করে বনধ করার জন্য সক্রিয় হওয়া উচিত বলে দলের বহু নেতাই মনে করেন না। কারণ, তাহলে ছেলেদের পাড়ায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি হতে পারে এবং যাঁরা ফিরে গিয়েছেন তাঁরাও আবার উচ্ছেদ হতে পারেন। বিশেষ করে সি পি এমের নেতারা এখনই এই ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক।

তিন নম্বর ভয়, বনধ ডাকতে গেলে কতকগুলি এলাকায় হয়ত দলের কর্মীদের এখুনি কংগ্রেসের ছেলেদের এবং পুলিসের সংগে সংঘর্ষে যেতে হবে। নেতারা অনেকেই এখনই সে অবস্থায় যেতে চান না। তাঁরা মনে করেন, দলের পক্ষে সেটা হবে আত্মহত্যার সামিল।

*

তাঁরা বরং প্রথম থেকে যে নীতি অবলম্বন করে এগোচ্ছেন সেই নীতি অনুসারে অগ্রসর হতে চান। সেই নীতি হল, বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলিকে অর্থাৎ ফ্রন্টাল অরগাইনজেশনগুলিকে দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন করানো। যেমন সিটু, কিষাণ সভা, এ বি টি এ সরকারী কর্মী ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলা। তাঁরা আর চান, পাড়ায় পাড়ায় বা অঞ্চলে অঞ্চলে স্থানীয় অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে।

এইভাবে অবস্থাটা অনুকূলে এনে তারপর তাঁরা ব্যাপকভাবে রাজ্য ভিত্তিতে পার্টির মধ্যে আন্দোলনের [illegible]। তার আগে নয়।

*

তাহলে সি পি আই বা সি পি এম প্রভাবিত অন্টবাম এখনই বনধের কথা বলছেন কেন?

দু দলের দুটো উদ্দেশ্য।

সি পি আই দলের মধ্যে কংগ্রেসকে সমর্থন করা না করা নিয়ে এখনও বিরাট ঝড় চলছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমে ক্রমে তাঁরাই বেশি শক্তিশালী হচ্ছেন যাঁরা মনে করছেন এই সরকারকে সমর্থন করে দল অত্যন্ত ভুল করছে। এঁরা এখনই পি ডি এ ভেঙে দেওয়ারও পক্ষে। এঁরা আবার পুরোপুরি বামপন্থী হতে চান।

কিন্তু দলের জাতীয় নেতৃত্ব এখনই তা

করতে রাজি নন। তাঁরা পি ডি এ বজায় রেখেই আরও সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস-বিরোধী ভূমিকা নিতে চান। কিন্তু তা বলে তাঁরা এমন কিছু করতে রাজি নন যাতে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যটা ভেঙে যায়। দলের ভেতরের বামপন্থীদের কিন্তু তাতে আপত্তি নেই।

প্রধানত এই বামপন্থীদের চাপেই পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সঙ্গে আর কেউ না এলেও তাঁরা বন্ধ করবেন এমন কোনও সিদ্ধান্ত তাঁরা নেন নি।

তাঁরা জানেন, এই বন্ধের কথা বলে কংগ্রেসকেও কিছুটা নিরস্ত করা যাবে এবং সি পি এমের মুখোশও কিছুটা খুলে দেওয়া যাবে। সি পি এম যে শুধু মুখে বন্ধ বন্ধ বলছে, কাজে বন্ধ করতে রাজি নয়—সেইটা তাঁরা প্রমাণ করতে চান। আর যদি সি পি এম বন্ধে সামিল হতে রাজি হয় তাহলেও ক্ষতি নেই। সি পি আইয়ের একাংশ মনে করেন, তাতে তাঁদের লাভই। কারণ সি পি এম আবার পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার আগেই তাঁরা সি পি এমকে রণক্ষেত্রে নামাতে চান। যাতে সি পি এম এখনই আবার একটা বড় ধাক্কা খায়।

সি পি আই নেতৃত্ব তাই প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করার জন্য বন্ধের ডাক দেন নি। তাঁদের আসল লক্ষ্য হল, এই বন্ধের ডাকের মাধ্যমে নানা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করে নেওয়া।

সি পি আইয়ের মত সি পি এমের ভিতরেও এখন জোর বিরোধ চলছে। তিনটে মত রয়েছে দলের মধ্যে।

প্রধান মতঃ ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হও। নির্বাচনটা যে জালিয়াতি হয়েছে তা বোঝাও জনগণকে। কংগ্রেস ও সরকারের মুখোশ খুলে দাও। দলকে সংগঠিত কর। এবং জনগণকে আবার সঙ্গে আন। চট করে বড় সংঘর্ষে যেও না।

দ্বিতীয় মতঃ এত নিষ্ক্রিয়তা অসহ্য। পারটিকে এই বন্ধ্যাদশা থেকে মুক্ত করতেই হবে। আরও সংগ্রামী কর্মসূচী নিতে হবে। কংগ্রেস যে কাগজে বাঘ সেটা দলের কর্মীদের এবং জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে। জনগণ এখন কংগ্রেস ও সরকারের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত। এর পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে।

তৃতীয় মতঃ রাজ্য রাজনীতিটাকে স্বাভাবিক করে আনার সুযোগ দিতে হবে। সেজন্য বিধানসভায়ও যোগ দিতে হবে। বিধানসভার সুযোগটা পুরোপুরি নিতে হবে। তার মাধ্যমে জনগণের বক্তব্য দেশের সামনে বলাতে হবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে সংগ্রামে অগ্রসর হতে হবে।

এর মধ্যে বেশি শক্তিশালী হল প্রথম মত-গোষ্ঠী। দলের সরকারী নেতৃত্ব অর্থাৎ প্রমোদবাবুরা প্রথম মতের সমর্থক। দ্বিতীয় মত প্রধানত তরুণদের। তবে হরেকৃষ্ণবাবুরা এদের সঙ্গে কিছুটা আছেন। তৃতীয় মত হল প্রধানত এম এল এদের এবং কিছু প্রবীণ বা মধ্যবয়স্ক পারটি সমর্থক ও কর্মীর। তবে, দলের মধ্যে এদের শক্তি খুব বেশি নয়।

পারটির সরকারী নেতৃত্ব এই তৃতীয় গোষ্ঠী সম্পর্কে মোটেই চিন্তিত নন। তাঁরা চিন্তিত, দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে নিয়ে। প্রধানত, তাঁদের খুশি রাখার জন্যই পারটি নেতৃত্ব বন্ধের কথা বলেন। তবে, মুখে বলেন বলেই যে পারটি নেতৃত্বের এখনই বন্ধ ডাকার মত মনোবল হয়েছে তা নয়। বরং, এখনই বন্ধ ডেকে বড় রকমের বিপদের ঝুঁকি নিতে তাঁরা অরাজি।

*

রাজ্যের সাধারণ মানুষ কি বন্ধ চায়? মনে হয় না। মানুষ কংগ্রেসের ঝগড়াঝাঁটি দেখে, সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনের বহর দেখে অনেকটা হতাশ এবং বিক্ষুব্ধ। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবে, বেকারীর তাড়নায় মানুষ বিরক্ত এবং রেগে গজগজ করছে।

কিন্তু তা বলে এখনই এমন অবস্থা হয় নি যে মানুষ আবার বন্ধের রাজনীতিকে বা বামপন্থীদের স্বাগত জানাবেন।

১৯৬৭ সনের আগ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশের মনোভব এক রকম ছিল। তখনও তাঁরা বামপন্থীদের রাজত্ব দেখেন নি। তখনও মনে করতেন, কংগ্রেসকে সরাতে পারলেই এ রাজ্যের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তখনও তাই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজের একটা বিরাট অংশ বামপন্থীদের যে কোনও বন্ধের ডাক, যে কোনও ধর্মঘটের ডাক সমর্থন করতেন। কষ্ট হচ্ছে জেনেও সমর্থন করতেন।

তারপর ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সনে দু দুবার যুক্তফ্রন্ট রাজত্ব দেখে এঁদের অনেকেরই চোখ খুলে গিয়েছে। কংগ্রেস সরালেই এবং বামপন্থীরা এলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয় না, চরমমূল্য দিয়ে তা তাঁরা বুঝেছেন। বামপন্থী রাজত্বের রূপ কী তাও তাঁরা দেখেছেন। দেখেছেন মারামারি কাটাকাটি। দেখেছেন দল বাড়াবার প্রতিযোগিতা। এবং দেখেছেন যে বামপন্থী রাজত্ব এলেই সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য কমে না বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অঢেল পাওয়াও যায় না।

তাই বামপন্থীদের সম্পর্কে, বামপন্থী রাজনীতির ধারা সম্পর্কে, বন্ধ প্রভৃতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মনোভাব এখন অনেক পাল্টে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ যা সবচেয়ে বেশি করে চায় তা হল গঠনমূলক কাজ। রাজ্যের সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ বুঝে গিয়েছে যে নেতিবাচক রাজনীতি নিয়ে খুব বেশি কিছু হবে না।

এ সব সত্ত্বেও যে কেউ জোর করে বন্ধের রাজনীতি সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না তা নয়। কিন্তু তা করতে হলে করতে হবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। বামপন্থীদের যদি সেই বল প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে তাহলে তাঁরা অনায়াসে এখনই বন্ধ করতে পারবেন। রাজ্যের শতকরা আটানব্বুই জন মানুষ তার বিরুদ্ধে থাকলেও।

কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা এখন পশ্চিমবঙ্গের কোনও বামপন্থী দলের আছে কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নেই। বরং, তাঁদের প্রতিপক্ষেরই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা এখন অনেক বেশি।

২-৭-৭৩।

নবারুণ গুপ্ত

কবি সম্মেলন

কয়েকদিন আগে কলকাতায় বিড়লা অ্যাকাডেমি হলে একটি কবি সম্মেলন হয়ে গেল। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিরা।

এক সময় কলকাতায় কবি সম্মেলন প্রায়ই অনুষ্ঠিত হতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এরকম অনেকগুলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি)—কয়েকটি কলেজেও এরকম উদ্যোগ দেখা গেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা কবি গোষ্ঠীর নেতৃত্বেও বারো মাসে অন্তত তেরোটা কবি সম্মেলন হতে দেখেছি। ইদানীং সেই রেওয়াজে যেন ভাঁটা পড়েছে। রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সময় সামান্য গণ্ডগোল হওয়ায় কেউ নিরুৎসাহ হয়েছেন কিনা জানি না। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে শান্তনু দাস পরিচালিত কয়েকটি কাব্য পাঠের সভা খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। কয়েক মাস আগে প্রেস ক্লাবে শিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অন্য দিন' পত্রিকার পক্ষ থেকে আয়োজিত এক কবিতা পাঠের আসরে প্রায় ষাট-সত্তরজন কবিকে দেখা গিয়েছিল।

কবি সম্মেলনের রেওয়াজ বা হুজুগ খানিকটা কমে এলেও কবিতার প্রতি আগ্রহ কিছু বাড়ছে বলে মনে হয়। বিভিন্ন প্রকাশ্য সম্মেলনে গান বাজনার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা আবৃত্তিরও একটা প্রোগ্রাম থাকা একটি সাধারণ ঘটনা—যাতে অংশ গ্রহণ করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী সব্যসাচী বা প্রদীপ ঘোষ প্রমুখ। গ্রামোফোন রেকর্ডেও আধুনিক কবিতা স্থান পেয়েছে। জীবিত কবিদের রচনার আবৃত্তির রেকর্ড নিয়মিত বের হচ্ছে—এটা কয়েক বছর আগেও ছিল অভূতপূর্ব ঘটনা।

কবিতা আবৃত্তি এবং কবিদের নিজের কণ্ঠে কবিতা পাঠ—এর আকর্ষণ দু রকম। কবিতা পাঠ্য না শ্রাব্য—এ নিয়েও অনেক তর্ক আছে। আমি অবশ্য কবিতার শ্রাব্য-গুণে বিশ্বাসী। যে কারণে আমরা প্রিয় কবিতার লাইন মুখস্থ করি এবং নিরালা মুহূর্তে উচ্চারণ করি, সেই কারণেই অপরের কণ্ঠে কবিতা শুনতে ভালো লাগে। টি এস এলিয়ট, ডিলান টমাস বা কার্ল স্যান্ডবার্গের কবিতা পাঠের রেকর্ড অনেককে মুগ্ধ করে। লণ্ডনে বেশ ঘটা করে কবি সম্মেলন হয়, তাতে অংশ গ্রহণ করেন প্রখ্যাত কবিরা। রাশিয়াতে, শুনেছি, কলকারখানার বিরতির সময় কবিরা এসে কবিতা পাঠ করে যান—শ্রমিকরা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং আনন্দ পায়।

এ কথা ঠিক, অনেক কবি ভালো লিখলেও ভালোভাবে পড়তে পারেন না। অনেকের কবিতা কানে শুনে পুরো রস

পাওয়া যায় না। এর বিপরীত দৃষ্টান্তও অনেক আছে, আমাদের দেশেই। তরুণদের মধ্যে তুষার রায়ের কথাই ধরা যায় যাঁর কবিতা-পাঠ শ্রবণ করা এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

রাজসভায় কবিতা পাঠ ছাড়াও প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের সামনে স্বর ব্যতিরেকেও শুধু কবিতা পাঠের ঐতিহ্য এ দেশে অনেক দিনের। প্রথম এরকম কবি সম্মেলনের উদ্যোগ করেন খুব সম্ভবত ঈশ্বর গুপ্ত। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই লিখেছি। আর একটি ঐতিহাসিক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে (এখন তার অস্তিত্ব নেই)। সেটির উদ্যোক্তা ছিলেন সিগনেট প্রেস কর্তৃপক্ষ, উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলমতনির্বিশেষে সমস্ত উল্লেখযোগ্য জীবিত আধুনিক কবি—জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে থেকে তরুণতম কবি পর্যন্ত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমিয় চক্রবর্তী প্রবাসী হওয়ায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের কবিতা অন্য কেউ পাঠ করেছিলেন। দু দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্মেলন, স্পষ্ট মনে আছে। আমাদের অনুরোধে জীবনানন্দ দাশ পর পর ছ' সাতটি কবিতা শুনিয়েছিলেন। স্বভাব লাজুক তিনি কোনো সভা সম্মেলনে যেতেন না, কিন্তু সেদিন যেন আলাদা একটা অনুপ্রেরণা পেয়ে গিয়েছিলেন শ্রোতাদের আন্তরিকতায়। তাঁকে মোটেই সফল আবৃত্তিকার বলা যায় না, কিন্তু তাঁর কিছুটা বিভ্রান্ত বা আচ্ছন্নভাবে ঝড়ের বেগে কবিতা পাঠ শুনে আমরা এক প্রকার প্রকৃত আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলাম।

সে রকম বিরাটভাবে আয়োজিত কবি সম্মেলন কলকাতায় এ পর্যন্ত আর অনুষ্ঠিত হয়নি। এখন বোধ হয় সে রকম কিছু করার কথা কেউ চিন্তাও করেন না।

কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবি-সম্মেলনেও একটা আলাদা স্বাদ থাকে। কৃত্তিবাস পত্রিকা প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধরে বেরিয়ে বাংলা কবিতার জগতে একটা আলাদা স্থান করে নিয়েছে।

এরা প্রায় প্রত্যেক বছরই একটি করে কবি সম্মেলনের আয়োজন করেন তারাপদ রায়ের পরিচালনায়।

কবি সম্মেলনের ব্যাপারেও এরাই প্রথম কয়েকটি নতুনত্ব প্রবর্তন করেছেন। কবিতা যে একটা গুরুগম্ভীর ব্যাপার নয়, জীবনেরই অংগ, এঁরা সেটা প্রমাণ করেছেন। এঁদের সম্মেলনে কোনো সভাপতি নেই, বক্তৃতা নেই, শুধু কবিতার জন্যই কবিতা পাঠ—যেখানে শ্রোতা ও কবিদের সম্পর্ক খুব কাছাকাছি। এঁদের আগেকার সম্মেলনগুলিতে দেখেছি, কবিরা সব রংচঙে বিচিত্র পোশাক পরে মঞ্চের উপর হুড়োহুড়ি করেছেন, কবিতা পড়া মাঝপথে থামিয়ে শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, কখনো কখনো পুরো সভাকক্ষে হাসির রোল পড়ে গেছে। বেহালা কিংবা হুইসিল নিয়েও কারুকে কারুকে কবিতা পড়তে দেখেছি।

এবার অবশ্য দেখলাম, তাঁরা অনেকটা শান্ত প্রকৃতির হয়েছেন। হায়, কবিদেরও বয়েস বাড়ে!

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে দেখলাম শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়—দাঁড়িয়ে পড়তে চান নি। বসে বসে পাঠ করলেন। আবার কবিতা সিংহ হুকুম করলেন মাইক্রোফোন উঁচু করে দিতে, তিনি দাঁড়িয়ে ছাড়া পড়বেন না। জ্যোতির্ময় দত্ত শান্ত সহজ গলায় তাঁর কবিতার মধ্যে এমন সব কথা শোনালেন, যা শুনে চেয়ারে নড়েচড়ে বসতে হয়। তারাপদ রায় মাইক্রোফোনে অন্যান্য ঘোষণার সময় দারুণ সপ্রতিভ, কিন্তু নিজের কবিতা পাঠের সময় তাঁর হাত ও গলা কাঁপে। এঁরা অবশ্য সব উল্লেখযোগ্য কবিদের তালিকা অনুসরণ করেন নি, কৃত্তিবাসের সঙ্গে অনেক দিন ধরে যাঁরা জড়িত, তাঁদেরই ডেকেছেন। পূর্বোক্ত পাঁচজন ছাড়া এখানে কবিতা শোনালেন আলোক সরকার, নবনীতা দেব সেন, শিবশম্ভু পাল, শংকর চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, সাধেন্দু মল্লিক, সুনীল বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, ফণীভূষণ আচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শংখ ঘোষ, আনন্দ বাগচী, বেলাল চৌধুরী, উৎপলকুমার বসু, দীপক মজুমদার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। আসতে পারেননি অসুস্থতার কারণে বা অন্য কার্য নিবন্ধন, কয়েকজন প্রবাসী। সভাটির আহ্বায়ক দেবকুমার বসু, মিনতি রায় এবং স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছিল আধুনিক কবিতাকে সুর দিয়ে সংগীত পরিবেশন। সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্প্রদায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের কাব্য সঙ্গীত চিত্তাকর্ষকভাবে শুনিয়েছেন।

সনাতন পাঠক

আমি ভাষান্তরী হব

সাধনা মুখোপাধ্যায়

আমাকে লাগিয়ে দাও
কোন এক ভাষান্তর কাজে
আমি খুঁজে খুঁজে দেব
সঠিক অর্থময় অন্তর্নিহিত
বঙ্গ-বর্ণমালা
ইস্কুলে পড়াতে আর ভালো লাগে না যে

নিরুৎসুক চোখ জোড়া থরে থরে
বেঞ্চে সাজানো
বাধ্য-বাধক এক পরিস্থিতি
অভিভাবকের দৃঢ় ভর্ৎসনায়
দশটা থেকে চারটে বাজানো
বন্দিগৃহ, হাজার বুঝিয়ে দিলে
তবুও না-জানো না-জানো
মুখে বসে থাকা সুকুমারমতি
নিজের প্রশ্নটারই
নিজেকে উত্তর দিতে
আলপিন্ নীরবতা ভেঙে যায়
কানে এসে খট্ করে বাজে

ওরা যা চায় না শুনতে
ধরে বেঁধে সে কথা শোনানো
ওরা যা চায় না গুনতে
জোর করে অঙ্কে গোনানো
ভবিষ্যতের ভাঁড়ে কতটুকু মেধা খুঁধি
সঠিক হিসেব কেউ জানো
তার চেয়ে খোলা মাঠে হাওয়া খেতে
ইচ্ছে মতোন ছেড়ে দিলে

হয়তো নীলাভ ফুল দেখে কোন
মুগ্ধ হবে
পয়ার ফেলবে শিখবে
অপটু হাতের কাঁচা মিলে
ব্যাকরণ ক্রমশই অধিগত হয়ে যাবে
পুঁথিতে অরস-ইক্ষু
চর্বণে দন্ত ভাঙে দুগ্ধজাত
মাটিতে সরস হয় মৌমাছিদের পিছু ধাওয়া করে
শব্দময় গুঞ্জনে আওয়াজে
আমাকে লাগিয়ে দাও
সেই এক ভাষান্তর কাজে
আমি কচি কচি সেই
ছন্দ ভাঙা সুন্দর
কলিগুলো তুলে নেব
ওদের খেলার ছুটি
আমারও খেলাই কাজ
সঠিক অর্থময় অন্তর্নিহিত
বঙ্গবর্ণমালা
তাদেরই আহৃত শব্দ
বয়েসের ব্যবধান অনুভবে ভাষান্তরে
দেখব লিপিতে ঠিক
নিক্বণিত হয়ে হয়ে
বাজে কিনা বাজে

আমাকে লাগিয়ে দাও
তেমনই হৃদয়ময়
কোন এক ভাষান্তর কাজে

তুমি ছিলে

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

তুমি ছিলে পৃথিবীর শেষ সম্মোহন
তোমার অভাবে পৃথিবীতে
আমার আগ্রহ বলতে কতটুকু বাকি আর! যত দিন যায়
সকল সঙ্কল্প ইচ্ছা একে একে গ্রাস করে সতর্ক বিষাদ।
অথচ তোমাকে ছাড়া স্বাভাবিক জীবনযাপনে
আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, তবুও
কি করে বুঝি না শুধু অস্থিতে মজ্জায় রক্তে অস্তিত্ব এখন
স্মৃতির ভিতরে শিশু—অসহায়—অশক্ত হাত পা ছোঁড়ে
নিজের বিষ্ঠায়!

মূষিক

ধূর্জটি চন্দ

প্রথমে কথা ও স্বপ্ন এই নিয়ে মেতে থাকে মানুষ
তারপর রোদ কমে টুপি খুলে সম্ভ্রম জানায়,
ভীতু হয়ে পড়ে সে, গৃহঘেঁষা হতে থাকে তখন
সর্বদা বাঘের ভয়ে অগ্নিধর্মী কথা বলে যায়।
ভাঙে সে হাতী ও ঘোড়া উল্টায় মসনদ কথায়,
অতঃপর একদিন লক্ষ্য করে খুলে পড়া চোয়াল,
আয়নায় বসন্ত ফোটে কোনো কথা বলে না সে আর
শুধুই স্বপ্ন দেখে পুনর্বার মূষিক হবার॥

ঘাটতি অর্থসংস্থান ও অর্থ-নৈতিক কর্মসূচী—সমস্যার একটি দিক

১৯৭২-৭৩ সালে ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের পরিমাণ ৮৪৮ কোটি টাকা অনুমিত হয়েছে। এই ঘাটতির মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি সরকারকে যে ঋণ দিয়েছে তা ধরা হয়নি। ১৯৭২-৭৩ সালে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে সরকারী ক্ষেত্রে ৪৯১ কোটি টাকা ঋণ প্রদত্ত হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য সরকারগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৪২১ কোটি টাকা ওভারড্রাফট পেয়েছেন। এই ওভারড্রাফটের পরিমাণও ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের মোট পরিমাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাছাড়া এই ওভারড্রাফট দেওয়া হয়েছিল ১৯৭১-৭২ সালে; মুদ্রা সরবরাহের উপর তার যে প্রভাব হয়েছে তা ১৯৭২-৭৩ সালে তত গুরুত্বপূর্ণ হয়নি।

ঘাটতি অর্থ সংস্থানের প্রভাবে যদি উৎপাদন আশানুরূপ না বাড়ে তবে যে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এ কথা সবাই জানেন; নতুন করে এ বিষয়ে কিছু বলার নেই। জিনিসপত্রের দাম এখন যতটা বেড়েছে অতীতে আর কোনদিনই তত বাড়েনি। ১৯৬১-৬২ সালে পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরলে ১৯৭৩ সালের ২৮শে এপ্রিল ও ২৬শে মে তা দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ২২৫ এবং ২৩২.৭; জিনিসপত্রের দাম এভাবে বেড়ে যাবার অনেক কারণ আছে, তবে ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের বিপুল বোঝা যে তার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ খুবই কম ধরা হয়েছে—চলতি বছরে মাত্র ৮৫ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছে। তবে বাজেট ঘাটতি প্রকৃতই ৮৫ কোটি টাকায় সীমিত থাকবে না। তৃতীয় পে কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর হলে এ বছরেই সরকারের আরও ১৮০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ নীতি চালিয়ে যেতে হলে গম উৎপাদকদের বোনাস দেওয়ার জন্যই প্রয়োজন হবে ৩২ কোটি টাকার। চূড়ান্ত বাজেটে কর ধার্যের ক্ষেত্রে যে রেহাইয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার ফলেও ২ কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হবে। পরিকল্পনা কমিশন যে এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তা নয়। কমিশনের মতে পঞ্চম যোজনার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে যাতে ঘাটতি অর্থ সংস্থানের পরিমাণ যতদূর সম্ভব কম রাখা যেতে পারে সেজন্য যোজনার অন্তর্ভুক্ত কোন কোন প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। "সর্বনিম্ন প্রয়োজনের কর্মসূচী" বাবদ ৩০০০ কোটি টাকা পঞ্চম যোজনার প্রাথমিক দলিলে বরাদ্দ করা হয়েছিল; যত দূর শোনা গেছে,

এই খাতে খরচের পরিমাণ কিছু কম হতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আর্থিক সঙ্গতির কথা মনে রেখে বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে এবং এজন্য শিল্প-প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান উৎপাদনী শক্তির সদ্ব্যবহারের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। চতুর্থ যোজনায় শুরু হয়েছে এমন অনেকগুলি প্রকল্পের কাজ এখনও শেষ হয়নি। এই প্রকল্পগুলির কাজ ত্বরান্বিত করার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। যে হারে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে এবং যে হারে সরকারকে বাধ্য হয়ে নতুন মুদ্রা সরবরাহের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে তা যদি চলতে দেওয়া হয়, তবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। যে কোন বিজ্ঞানসম্মত বিনিয়োগ-পরিকল্পনার মূল সমস্যা হল, উৎপাদন কর্মসূচী, উৎপাদনের পরিমাণ, বর্তমান আর্থিক সঙ্গতি ও ভবিষ্যতে আর্থিক প্রয়োজন—সবগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় যদি এই ভারসাম্য বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়, তবে কোন কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ পরিবর্তিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকার বাজার থেকে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে বাজার থেকে নেওয়া নীট ঋণের পরিমাণ ৩৬১ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু আশা করা হচ্ছে, এই ঋণের পরিমাণ হয়ত আরও ২০০ কোটি টাকা বেশি হতে পারে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, এখন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে এসেছে তাতে সরকারের অনেক হিসেবেরই গোলমাল হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব এসে পড়বে পরিকল্পনার কর্মসূচীর উপর।

এখন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ক্রমবর্ধমান মূল্যান্তরকে প্রতিহত করা। যে মুদ্রাস্ফীতি এখন দেশে দেখা যাচ্ছে, তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বিরাট বাধার সৃষ্টি করছে। শুধু তা-ই নয় সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা এজন্য অসহনীয় হয়ে পড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবিধান করার বহু উপায় আছে। অর্থশাস্ত্রসম্মত সব উপায়ই সরকার অল্প-বিস্তর গ্রহণ করেছেন। এখন যে ব্যবস্থাটি সবচেয়ে জরুরী, তা-হল যে কোন ভাবে উৎপাদন বাড়ানো। পঞ্চম যোজনার জন্য যে বরাদ্দ করা হয়েছে তার হ্রাস-বৃদ্ধি হবে কিনা সেটা নিশ্চয়ই বিবেচ্য। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিবেচ্য বিষয় হল—বিভিন্ন কর্মসূচীকে এমনভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে কিনা যাতে উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত বাড়ে। যতদূর জানা গেছে, এ বছর খাদ্য আমদানির জন্য সরকারের উপর অতিরিক্ত ৩৮০ কোটি টাকার চাপ পড়বে। অথচ তিন বছর আগেও যখন আমরা "সবুজ বিপ্লবের" পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম, তখন খাদ্য আমদানির জন্য ৩৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যাবে তা ভাবতে পারিনি। "গরিবী হটাবার" কর্মসূচী যে সাফল্যের পথে যাচ্ছে না, এটা সবাই বুঝতে পারেন। কিন্তু এখন উৎপাদন বাড়াবার কর্মসূচী যাতে সফল করা যায় সেজন্য সরকার, উৎপাদক ও শ্রমিক সকলেরই একজোট হওয়া উচিত। তা না হলে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল, যে ভারত সরকার বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় মজুরি সংকোচন নীতি গ্রহণ করবেন। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে মজুরি সংকোচন নীতি তখনই কার্যকরী হয়, যখন নীট জাতীয় উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ মজুরি ও বেতন দ্বারা গঠিত হয়। বৃটেনে নীট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৭৫ শতাংশ আসে মজুরি ও বেতন থেকে: সেদেশে মজুরি সংকোচন নীতি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু ভারতে নীট জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ছয় শতাংশ আসে মজুরি ও বেতন থেকে। সুতরাং এদেশে মজুরি ও বেতন নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা খুব সফল হবে না। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনেও মজুরি সংকোচন নীতি যে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে খুব সফল হয়েছে তা নয়। যাহোক, ভারত সরকার মজুরি সংকোচন নীতি গ্রহণ করেন নি। মজুরি সংকোচন না করেও মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করা সম্ভব: অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হতে পারে—যদি ভারত সরকার আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ আরও কমাতে পারেন, কালো টাকার অপ্রতিহত বৃদ্ধি বন্ধ করতে পারেন, কৃত্রিম সঞ্চয়কারী ও মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের কঠোর হস্তে দমন করতে পারেন, সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবার কর্মসূচী আরও জোরদার করতে পারেন এবং একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য নীতি অনুসরণ করতে পারেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের যে নীতি অনুসৃত হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সরকারকে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক নীতির এখন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দুটি—উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ না করতে পারলে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

সুব্রত গুপ্ত

বুকে মাজে। গলায় রুপোর নিরেট হাঁসুলি। কণ্ঠার হাড় একটু দেখা যায় গ্রীবা মাঝারি, চুল পাটির মাথার মাঝখানে চুড়ো করা, মুখের মধ্যে জল কুলকুচা করে, পিচকারির মতো ছুঁড়ে দেয় সামনের একটি ন্যাংটো বালকের মুখে যে সাঁতার কাটে। দিয়ে হাসে খিলখিল, বালক হাত দিয়ে জল ছিটিয়ে দেয়, ফুলবাসিয়ার মুখে। সাহু ফিরে তাকায়, ধূসর চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। সে যোগে আসক্ত তাই দৃষ্টি সন্দিগ্ধ, নাকের পাটা ফুলে ওঠে গাল বুক মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, চিৎকার করে হুকুম দেয়, 'আরো টান।'

মাঝিরা পাটের মোটা দড়ি ধরে টানে, এক সঙ্গে আওয়াজ করে, 'হেঁইয়ো'। দশ মাল্লাই খুঁটিন উঠে আসে আরো ওপরে, পেট বোঝাই তেলের পিপে। ফুলবাসিয়া ফিরে তাকায় না, কিন্তু বেল বুকে আঁচল টানে, উঠে আসে প্রায় হাঁটু জলে, ভাটার স্রোত ধাক্কা খায় জংঘা মধ্যে। আংরির (অঙ্গুর) হুঁট পেতে কাপড় কাচে, দৃষ্টি ফুলবাসিয়ার খোলা পিঠের নিচে, ভারী দলদলে মাজার দিকে। আংরির ভুরু কোঁচকায় শুকনো ঠোঁট বাঁকায়, জলে ঝাঁপাই ঝোড়া ছেলেকে ধমকায়, 'ওরে বিষ্টাখেগো মড়া, এই মাগীর সঙ্গে কী রাজা করিস তুই? ওঠ কোকিল-চোখো, বুকে কফ জমে মরবি।'

সহদেব রায় ফিরে তাকান না, কোমর জলে দাঁড়িয়ে, লম্বা রোগা মানুষ, কানে আঙুল দিয়ে, উপুড় হয়ে ডুব দেন। সকালে বিকালে স্নান করেন, ত্রিদিবেশ জানে, কিন্তু সাধুর তত্ত্বকথা শুনতে ওর ভালো লাগে না।

পাওয়ার হাউসের জেটি থেকে, কয়লার ধোঁয়া উড়িয়ে, ছোট স্টিমার ভোঁ দিয়ে, এঞ্জিনের শব্দ তুলে, দক্ষিণে ভেসে যায়। নির্কারি পাড়ার আংরির ছেলে ভোলো, জলে ভাসতে ভাসতেই, মুখ দিয়ে স্টিমারের ভোঁ বাজায়, যা স্টিমারের ভোঁ শব্দ থেকে অনেক বেশি তীব্র চিলের ডাকের মতো শোনায়। সহদেব রায় ডুব দিতে গিয়ে, বিরক্ত চোখে ছেলেটার দিকে তাকান। ছেলেটা দেখতে পায় না। মধ্যবয়স্কা আংরি এখনো, ভেজা শাড়ির ডোরায় জড়ানো ফুলবাসিয়ার নিতম্ব দেখে, আর ইঁটের বুকে এই অবেলায় ক্ষারের কাপড় কাচে। ফুলবাসিয়ার মাজায় যেন ভারি দর্প, বেল বুকেও তাই, বড় উদ্ধত। দু হাতে খোলা কাঁটি ঘষে ঘষে ময়লা তোলে, আর কাজলা, সামান্য গোল চোখ মেলে মেলে, দক্ষিণে ভেসে যাওয়া স্টিমারের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যায়। সমুদ্র দূরে, দক্ষিণের বাঁকে তট উধাও, নদী রেখাহীন আকাশের সঙ্গে।

নদী এখনো বিশাল। হেমন্তের মুখপাত, শরত গত, তথাপি এখনো আঁচ ভ্যাপসা গরম, জলে টান ধরেনি মোটে। প্রকৃতির বিপাক কোথায়, বা কেন, হঠাৎ ধরা যায় না, ঋতুচক্রের আবর্তে গোলমাল ঘটলে চোখে পড়ে। শরত বোঝা যায় না, হেমন্ত চেনা যায় না, এ আকাশ আর নিশ্চুপ স্থির প্রকৃতির মধ্যে, বর্ষার স্বরূপ নেই। কেবল মনে পড়ে যায়, বর্ষা এসেছিল বিলম্বে। কিন্তু বায়ু কোণে কেন চিকুর হানে? ফুলবাসিয়া যেন ভেসে যায় দক্ষিণে, এমনিই অন্যমনা উদাস। কাঁটি আর ঘষে না, হাত কাটিতেই স্থির। ঋজু তার শরীর, কঠিন কোমল দীর্ঘ পুষ্ট আর উদ্ধত। মুখে ছিটছিট বসন্তের দাগ, অনেক কালের পুরোনো পাথরের মতো, শ্রী নষ্ট করেনি। বয়স? শরীরের সঙ্গে তুলনাহীন ষোল বা সতেরো। কয়েক বছরকে মনে হয়, কয়েক-দিন,—কয়েক দিন আগেও ছিল শীতের শান্ত ছোট নদী, বুঝি এক বসন্তেই। বিপত্নীক সাহু দেশান্তর থেকে কিনে এনে-ছিল তার দেখভালের জন্য। বটের নিচে উঁচু বেদীর ওপর সাধুদের কয়েকটি ঝুপড়ি, তার পুবের দিকে সাহুর ঝুপড়িতে সে থাকে। মনে হয়, এই তো সেদিন—এসেছিল, চোখে ক্ষুধা ভরা, পেট মরা ভয় ভয় নজর রোগা মেয়েটা। এতো ঢ্যালের কজ ঢাকায় ছিল সেই শরীর কারোর নজরে পড়ে নি। সাহুর পড়েছিল কী না কে জানে।

ফুলবাসিয়া এমন উদাস অন্যমনে কোথায় চলে যায়? কী ভাবে?

উত্তরে ইঁটের ভাটার গায়ে, শ্মশানে হরিধ্বনি ওঠে। সহদেব রায় ডাঙায় উঠে বায়ুকোণে তাকান। চোখ কোঁচকানো, গা ভেজা, কোমরে জড়ানো গামছার সঙ্গে মাদুলি দেখা যায়। সাধু বলে, 'ম্যায় তুমকো যোগ দেখায়া।'

হ্যাঁ, কিন্তু ত্রিদিবেশ যোগক্রিয়া দেখতে চায় নি। কেনই বা সাধু তাকে যোগ দেখালো, সে জানে না। সে সাধুর সামনে এসে বসতে চায় নি। সাধু নিজেই তাকে ডেকেছে। সাধু তাকে চেনে, যে কজন সাধু আছে এখানে সবাই তাকে চেনে—নাম জানে না, মুখ চেনে, কারণ ত্রিদিবেশ প্রায় রোজই নদীর ধারে আসে, বসে, বেড়ায়, স্নান করে না। সে সাধুদের সবাইকেই চেনে। ফুলবাসিয়াকে চেনে। ফুলবাসিয়াকে সবাই চেনে। মনে হয়, এই নদী চেনে, নদীর মীনেরা চেনে। ফুলগন্ধা, তাই কি ফুলবাসিয়া নামের অর্থ? ফুলের পরে বাস—বাস মানে তো গন্ধ। মৎস্যগন্ধার কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু এই সাধুযোগীরা কেউ পরাশর মুনির কথা মনে পড়িয়ে দেয় না। এই ঘাটের, সব থেকে বয়স্ক, বৃদ্ধ এই সাধু ত্রিদিবেশকে নিজে থেকে ডেকে অদ্ভুত এক যোগ দেখিয়েছে, আবার একটু আগে যোগ দেখিয়েছে, আবার একটু আগে নিজেই বলেছে, সে যোগভ্রষ্ট। ত্রিদিবেশ জানে না, যোগ কাকে বলে, যোগী কাকে বলে, তার ভ্রষ্টতাই বা কী। জানবার কোনো দরকার নেই, জানতেও চায় না। আপাতত সে ক্ষুধার্ত, নানা কারণে ক্ষুব্ধ, নিজেকে অপমানিত আর সংকুচিত বোধ করছে। দুপুরে সে এখানে এসেছে, তখন ঝকঝকে রোদ ছিল, নদীতে ভরা জোয়ার। তখন অল্প বাতাস ছিল, আকাশ ধোঁয়াটে। একটু একটু করে, আস্তে আস্তে সব বদলিয়ে গেল, ধোঁয়াটে আকাশ ময়লা পড়া টিনের রঙ হয়ে গিয়েছে, বায়ুকোণে বিদ্যুৎ ঝিলিক, মাঝ-খানের বুকে ঝড়ি ঝুড়ি ছাই কে ছড়িয়ে দিল, যেন নিচে গড়িয়ে পড়বে এবং ভরা জোয়ারে এক সময়ে হঠাৎ ভাটার টান চলেছে। ইতিমধ্যে অনেকেই স্নান করে গিয়েছে, কাপড় কেচে, গরু নাইয়ে ফিরে গিয়েছে, অনেকে এসেছে, গিয়েছে, এক সময়ে সাধু তাকে ডেকে কাছে বসিয়েছে, যোগ দেখিয়েছে, বলেছে, 'তুমকো ম্যায় যোগ দেখায়েগা।' অন্য সাধুরা কেউ ছিল না, এখনো নেই, ঝুপড়ি শূন্য, সাধু ম্যাজিক দেখাবার মতো, তার কপনি খুলে, দুই জংঘার মাঝখানে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, যেন শিশির মুখে একটি তামার ছিপি। ছিপি খুলে নেবার পরে, যেন প্রায় ছিদ্রের মধ্যে আঙুলের সাহায্যে, সে তার অঙ্গ বের করে এনেছিল এবং ক্রমে যা অস্বাভাবিক দীর্ঘ আর ঋজু দেখিয়েছিল। ত্রিদিবেশ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল, তথাপি লজ্জা বিস্ময়, গা ঘুলিয়ে ওঠার মতো একটা অনুভূতি, যা একান্ত ঘৃণা না, সব মিলিয়ে সে যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল, কথা ছিল না, নিশ্চল। সেই অদ্ভুতদর্শন অঙ্গ, ডাইনে ফিরেছিল, তারপরে বাঁয়ে, তারপরে ঊর্ধ্বে, তারপরে নিম্নে, তারপরে চক্রাকারে ঘুরেছিল, ত্রিদিবেশেরও যেন মাথা ঘুরেছিল এবং তারপরে আবার যথাস্থানে আগের মতোই তাকে আড়াল করে তামার পাত দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। ত্রিদিবেশ অনেকক্ষণ অসাড় ছিল, যেন সত্যিই সেরকম কিছু ও দেখেনি, কারণ সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। শরীরের বিশেষ অঙ্গের সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে, যোগের কী সম্পর্ক, ওর কোনো ধারণা ছিল না, এবং কেনই বা সাধু ওকে সেই অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়েছিল, ও জানে না। ঘটনার আকস্মিকতা ও চমক এবং সম্মোহন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওকে অসাড় রেখেছিল তথাপি একটা ভয়ংকর দৃশ্য যেন ওর মস্তিষ্কের মধ্যে গর্জন করে চক্রাকারে পাক খাচ্ছিল।

সেই সময়ে সাহু তার মাঝি-মাল্লাদের নিয়ে, খুটোঁন নৌকাকে চড়ায় টেনে তোলবার আয়োজন করছিল। মাস্তুল, গলুই, দাঁড়-বৈঠাগুলোর সঙ্গে কাছি বাঁধছিল, কারণ এখনই নদী স্থির হয়ে গিয়েছিল, জলায় ভাটার টান পড়েছিল। সাধু তখন ত্রিদিবেশকে এক গল্প শুনিয়েছিল, যা

বিশ্বাস করা উচিত কী না, ও ঠিক করতে পারেনি। ওর যেমন সাধুর যোগ দেখতে ইচ্ছা করেনি, সাধুর গল্পও তেমনি শুনতে ইচ্ছা করেনি, কিন্তু সাধুর গল্প বলার মধ্যেও সেই আকস্মিকতার চমক ছিল, খানিকটা সম্মোহনও। যদিচ ওর জীবনের সঙ্গে সাধু, যোগ, সাহু, কোনো কিছুরই কোনো যোগাযোগ কিংবা প্রয়োজন কিছুই নেই।

সাধু বলেছিল, 'এই যে তুমি সাহুকে দেখছো (সাধু হিন্দীতে বলেছিল।) ও অল্প বয়সে সংসারী হয়েছিল। পাটনার কাছে, এক গ্রামে ওর পৈতৃক বাড়ি। বেশ বড়লোক ভুঁইহার ওরা। ওকে এখানে লোকে বলে সাহু, সাহুজী। হয়তো ও নিজেই এ নামটা চালু করেছে। ওর আসল নাম ভরতপ্রসাদ। ওর ধুতির ভিতরে লেঙুটি খুললে, এই রকম তামার পাত দেখতে পাবে।'

ত্রিদিবেশ তখন অবাক হয়ে সাহুর দিকে ফিরে দেখেছিল। সাহু তখন মাঝিদের সঙ্গে নিজে দড়ি বাঁধতে ব্যস্ত ছিল। ও আবার সাধুর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। সাধু বলেছিল, 'হাঁ, আমি মিথ্যা কথা বলিনি। কিন্তু সাহু বিয়ে করেছিল। ওর একটা ছেলে হয়েছিল। ছেলে এখন তাগড়াই যোয়ান, এখানে এসেছে কয়েকবার। সাত দিন আগেও এসেছিল, সে এখন ফেরারী ক্রান্তিকারী, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, আংরেজ ভারত ছোড়ো, লড়াই চলছে। সে লড়াইয়ের কথা তুমি জানো?'

সাধু বলেছিল, 'বেশ ভালো। ছেলের জন্মের পাঁচ বছর বাদে সাহুর বউ সাহুকে ছেড়ে চলে যায়। আমি ওর গ্রাম ঘর বাড়ি সব দেখেছি, ওর বউকে কখনো দেখিনি। শুনেছি বউ দেখতে খুবই খুবসুরত ছিল। তার প্রমাণ সাহুর ছেলে। পাশাপাশি দাঁড়ালে বাপের ব্যাটা মনে হয় না। বাপকে যোয়ান রইস ছেলের নোকর বলে মনে হয়। সাহুর বউ পালিয়ে যাবার এক বছর পরে, আমরা কয়েকজন সাধু ওদের গ্রামে যাই। তোমাদের বাঙালমুলুকে সাধু-যোগীর কদর নেই। বিহারে আজও গ্রামে গেলে, গ্রামের লোকেরা আমাদের সেবা করে। সেইখানে আমি সাহুর প্রথম দেখা পাই। সে আমাদের খুব সেবা করেছিল। সারা দিন আমাদের কাছে পড়ে থাকতো। সে প্রচুর গাঁজা আমাদের দিত, নিজেও গাঁজা টানতো। তার বাড়ি থেকে দুধ ঘি ভাজি আটা রোজ আসতো। মেলা লাকড়ি আসতো আগুন করবার জন্য। তার লোকজন আমাদের কাজকর্ম করে দিত। আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম। এরকম সেবক পাওয়া যায় না। কিন্তু ওর বউ কেন পালিয়েছিল?'

সাধু নিজের মনে দাড়ি কাঁপিয়ে হেসে জটামাথা নেড়েছিল। বলেছিল, 'সন্দেহ। দুরন্ত সর্বনাশ করেছিল। খুবসুরত বউকে ও বিশ্বাস করতো না। কোথাও যেতে দিত না, কারোর সঙ্গে কথা বলতে দিত না, সব সময় আগলে আগলে রাখতো। ছেলে হয়ে যাবার পরেও ওর সন্দেহ যায় নি। ওটা একটা বিমারি। একবার ধরলে ছাড়তে চায় না। সে কথা ও নিজে কখনো বলে নি। আমরা গ্রামের অন্য লোকের মুখে শুনেছি। তারপরে বিমার ওকে নিজেই ছেড়ে গেল। যার জন্য বিমার, সে-ই ওকে ছেড়ে গেল। কিছুতেই তার পাত্তা করতে পারে নি। ওকে দেখে আমাদের কষ্ট হয়েছিল। আমরা প্রায় মাসখানেক ওদের গ্রামে ছিলাম। শেষ দিকে সাহু রাত্রেও আমাদের সঙ্গে থাকতো, বাড়ি যেতো না। মাঘ মাসে আমরা সেখান থেকে প্রয়াগ যাত্রা করি। ও একটা বোঁচকা নিয়ে আমাদের সঙ্গী হয়। সেই থেকে ও আমাদের সঙ্গেই আছে।'

ত্রিদিবেশ আবার সাহুর দিকে তাকিয়েছিল। সাহু তখন নৌকার ওপরে পাটাতনে দাঁড়িয়ে, ডুবিয়ে রাখা প্রকাণ্ড নোঙরটা টেনে তুলতে উৎসাহ দিয়ে চিৎকার করছিল। ত্রিদিবেশ এতদিন লোকটিকে এই নদীর ধারে দেখেছে, তার বিষয়ে কিছুই জানতো না। সাহু খবরের কাগজ পড়ে না, লড়াইয়ের হালচাল জিজ্ঞেস করে। গান্ধীবাবা কোথায় আছেন, আজাদীর যুদ্ধের হাল হালত ইত্যাদি ত্রিদিবেশ বা ওর বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে। ত্রিদিবেশ লোকটির বিষয়ে কখনো কিছু ভাবে নি, কোনো কৌতূহলও ছিল না। ওর ধারণা ছিল, সাহু লোকটি ব্যবসায়ী, ধার্মিক, সাধুসঙ্গ নিয়ে থাকে। তার যে এরকম একটা অতীত থাকতে পারে, কখনো মনে হয় নি।

সাধু আবার বলেছিল, 'ও আমাদের সঙ্গে প্রয়াগে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে কল্পবাস শুরু করে। শুধু কল্পবাস না, সেই দারুণ ঠাণ্ডায় খালি গায়ে আমাদের মতো একটা লেঙুটি পরে ও তপস্যা করতে থাকে। কিন্তু আমাদের সেবাও করতো। আমরা দশনামী দণ্ডী সম্প্রদায়ের নিরঞ্জনী আখড়ার সেবক। আমাদের যে প্রধান ছিল, সে সাহুকে ভালো নজরে দেখতো। সাহু প্রয়াগে কিছু যোগীর দর্শন পায়, হঠ যোগী। যোগের দিকে ওর মন টানে। সে কথা ও আমাদের প্রধানকে বলে। প্রধান ওকে মদত দিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু তখনই না। প্রধান বলেছিল, তোমাকে আমি সময় মতো শিক্ষা দেব। সেই শিক্ষা শুরু হতে এক বছর লেগেছিল। আগেই বলেছি, ও ছিল বড়লোক ভুঁইহার পরিবারের ছেলে। ওর নিজের কোনো ভাই ছিল না। ওর এক কাকা সম্পত্তি সব জমিজমা দেখাশোনা করতো। ও যখন যেখান থেকে চিঠি দিত, সেখানেই ওর নামে টাকা পৌঁছোতো। বাড়ির লোকেরা জানতো ও সাধু হয়ে গিয়েছে। ও চুল দাড়ি রাখতে আরম্ভ করেছিল। মাথায় পরবার জন্য ওকে একটা জটাও দেওয়া হয়েছিল।'

ত্রিদিবেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'জটা?'

সাধু বলেছিল, 'হ্যাঁ জটা। তুমি হয়তো জানো, সব সাধুর জটাই আসল? না, আসল জটা প্রায় কারোরই নেই। আমার মাথায় যে জটা দেখছো, এত বড় জটা আমার এ বয়সের মধ্যে হতে পারে না। তার জন্য বহু বছর বাঁচতে হয়, অনেককাল একভাবে এক আসনে বসে ধ্যান করতে হয়। অন্য এক সাধকের জটা আমার মাথায়।'

ত্রিদিবেশ অবাক চোখে সাধুর জটার দিকে তাকিয়েছিল। কীভাবে জটা সাধুর চুলের সঙ্গে জড়ানো আছে ও বুঝতে পারে নি। মনে হয়েছিল, সাধুর নিজেরই জটাজুট বটের ঝুরির মতো পেঁচিয়ে ধরেছে, ঝুলে পড়েছে। তারপরে ও তাকিয়েছিল সাহুর দিকে। সাহুর কদমছাঁট চুল, গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। পাকানো পেশি, পেটা শরীর, কুচকুচে খালি গা লোকটাকে দেখে সাধুত্বের কিছুই অনুমান করা যায় না, বরং ত্রিদিবেশের মনে হয়েছিল সাহুর চেহারার মধ্যে কেমন একটা জান্তব ভাব আছে এবং নিষ্ঠুর। তার লাল চোখের দৃষ্টি দাঁতালের মতো।

সাধু আবার বলেছিল, 'দশ বছর সাহু একনাগাড়ে আমাদের সঙ্গে ছিল। সারা দেশ ঘুরেছে, এই মুলুকে এখানেও কয়েকবার থেকে গেছে। তখন সাহু ছিল অন্য রকম। তখন ও ছিল যোগীপুরুষ। প্রাণায়াম থেকে শুরু করে অনেক যোগক্রিয়া ও শিখেছিল। তোমাকে আমি যে যোগক্রিয়া দেখালাম, তখন এটাও ওর দখলে ছি[illegible] কিন্তু ওর গোলমাল হলো দেশে [illegible]রে গিয়ে।'

ত্রিদিবেশের ক্ষুধার অনুভূতির তীব্রতা তখন কমে গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী গোলমাল?'

সাধু বলেছিল, 'ওর পতন হয়েছিল। ও ছ' মাস গ্রামে ছিল। বাড়ির বাইরে একটা ডেরা করে সেখানেই থাকতো। দেখি নি, শুনেছি। শুনেছি, সে সময়ে সাহু ওর সম্পত্তির হিসাবনিকাশ করেছিল, চাষ আবাদ দেখাশোনা করতো। ছ' মাস পরে ও ফিরে এল এখানে। এসে খুব কান্নাকাটি জুড়ে দিল। ওর তখন উত্থানশক্তি রহিত হয়ে গেছে।'

ত্রিদিবেশ অবাক হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সাধু বলেছিল, 'না না, তুমি যা ভাবছো তা না। ও বিছানা নেয় নি। ও আগের মতোই তাগড়াই যোয়ান ছিল, কিন্তু তোমাকে আমি যে যোগাধায় দেখালাম, ওর সেই ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হয়ে

গেছলো, ফলে ওর যোগ নষ্ট। পুরুষত্ব-হানিও ঘটেছিল। কোনো যোগী পুরুষের উপায় ছিল না ওকে উদ্ধার করে। তখন ও পাগলের মতো সারা মুলুক ঘুরতে আরম্ভ করলো, বহু যোগীকে গিয়ে ধরলো, কিছুই হলো না। কিন্তু ও নিজের দেশ ঘর বাড়িতেও গেল না। ফিরে এলো এখানে। জটা ফেলে দিল, চুল দাড়ি কামিয়ে ফেললো, ব্যবসা শুরু করলো।'

সেই সময়ে সাধুদের আস্তানার পিছনের ঝুপড়ি থেকে ফুলবাসিয়া বেরিয়ে এসেছিল। ত্রিদিবেশ তাকিয়ে দেখেছিল, সাধুও দেখেছিল, ফুলবাসিয়াও তাদের দিকে তাকিয়েছিল, তার ঠোঁটের কোণে হাসি ছিল। ত্রিদিবেশ দেখেছিল সাধুর দাড়ির ভাঁজে হাসি, চোখের তারায় ঝিলিক। ফুলবাসিয়া ঠোঁট উলটে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, ঘাটের দিকে চলে গিয়েছিল। ফুলবাসিয়ার খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। শাড়ি জড়ানো তার পিঠ, কটি, কোমর, জংঘা উরু, পায়ের গোছা একটা ঢেউ খেলানো দর্পে দুলেছিল। সাধু বলেছিল, 'তারপরে সাহুকে কেউ উপদেশ দিয়েছিল, উদ্ধার পেতে হলে ওকে নিষ্পাপ কুমারী মেয়ের সঙ্গ নিতে হবে। তা হলে ও আবার সব কিছু ফিরে পাবে। তখন ও এই ফুলবাসিয়াকে দেহাত থেকে কিনে নিয়ে এলো। ওর পতনের পরেও, ও বরাবর আমাদের সেবা করে এসেছে, ওর বিশ্বাস সাধুসন্তদের সেবা করলে ও উদ্ধার পাবে। তবু ও এই মেয়েটাকে নিয়ে এলো। দু তিন বছরের মধ্যেই মেয়েটার কী রকম চেহারা ফিরে গেল, তোমরাও দেখছ। কিন্তু লাভ কী হয়েছে? সাহু উদ্ধার পেল না, সাধু অন্ধকারে ডুবে গেল। এখন সাহু আমাদের ঘৃণা করে, ফুলবাসিয়াকে চোখে চোখে রাখে। ফুলবাসিয়ারই বা উপায় কী? তুমি ওকে দেখেছ, সাহুর মতো একটা লোকের সঙ্গে ও থাকতে পারে না। পেটে খাওয়াটাই সব না। তাই যোগীরাই এখন ওর জীবন যৌবন। সাহু সবই জানে, জেনেও ওর কিছু করার নেই। ও ওর এত বড় নৌকা সামলাতে পারে, ফুলবাসিয়াকে কী দিয়ে সামলাবে?'

সাধু চুপ করেছিল। ত্রিদিবেশ সাধুর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চোখে অপার কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। সাধু দাড়ির ভাঁজে হেসে মাথা ঝাঁকিয়েছিল, বলেছিল, 'হুঁ, বেটা।'

ত্রিদিবেশের চোখে ভেসে উঠেছিল সাধুর যোগক্রিয়া। ও নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল। ফুলবাসিয়া তখন পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাটার জলে সাঁতার কাটছিল। তার খোলা পিঠ দেখা যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে ত্রিদিবেশ অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিল।

এখন সাধু বলে, সে যোগভ্রষ্ট। বলে, 'তোমাকে আমি যোগ দেখিয়েছি।'

কেন সাধু এ কথা বলে, ত্রিদিবেশ বোঝে না। ফুলবাসিয়া এখনো জলে, তার মুখ দক্ষিণের দূরে, সে যেন কী দেখে। সাহুর নৌকা অনেকখানি ওপরে উঠে আসে, তবু মাঝিরা কাছি টানে জলে। সাহু নৌকা, ফুলবাসিয়া আর আকাশের দিকে দেখে, দৃষ্টিতে অতৃপ্তি, অসন্তুষ্টি, সন্দেহ। আঙিরের ছেঁড়া জটা এখনো ঝাপাই ঝোড়ে, আঙির কাপড় কাচে। পশ্চিমের আকাশে মরচে পড়া লোহা রঙের গায়ে একটা হালকা রক্তাভা। দলা দলা ছাই ক্রমে নেমে আসে।

'সাহু মুর্দা, আমি ভ্রষ্ট।' সাধু আবার বলে, 'আমি কোনোকালেই খাঁটি যোগী ছিলাম না, আমার চোখে সবই ভ্রষ্ট। শুধু বেঁচে থাকবার জন্য এই ভেক নিয়ে আছি। তোমাকে আমি যোগ দেখিয়েছি, তুমি আমাকে আট আনা পয়সা দাও।'

ত্রিদিবেশ অবাক চোখে সাধুর দিকে তাকায়। সাধু যে পয়সা চাইবে ও বুঝতে পারে নি। এখন ও আর সম্মোহিত না। সাধুর যোগক্রিয়া এখন ওর কাছে অনেকটা ম্যাজিক খেলার মতো। ওর অনুভূতির মধ্যে ক্রিয়াহীন, চিন্তার মধ্যে স্থান নেই। কিন্তু সাধুকে ও বলতে পারে না, ও অক্ষম। ওর আঠারো বছর বয়স। ও অপমানিত, লাঞ্ছিত, নদীর ধারের নিরালায়, গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকতে এসেছিল। তথাপি ও পকেটে হাত দেয়, জানে, ওর কাছে একটি মাত্র ঝকঝকে রাজার ছাপমারা সিকি আছে। ও সিকিটি তুলে সাধুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'আমার কাছে আর কিছু নেই।'

সাধু বলে, 'বেঁচে থাকো বেটা। খুব খারাপ দিনকাল আসছে, বেঁচে থাকার চেষ্টা করো।'

ত্রিদিবেশ বটের দাওয়া থেকে নেমে আসে।

(ক্রমশ

চুলকে নরম ও পরিপাটী রাখার একেবারে নতুন উপায়

হ্যালো কনসেণ্ট্রেট

ময়শ্চারাইজার মেশানো শ্যাম্পু

কয়েক ফোঁটাতেই ষোলআনা কাজ দেয়

New Halo SHAMPOO

সামান্য কয়েক ফোঁটা বাস... রাশি রাশি ফেনায় আপনার চুলের সব ময়লা আর তেলতেলে ভাব ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। ময়শ্চারাইজার মেশানোর ফলে হ্যালো কনসেণ্ট্রেটের কার্য্যকারীতা অন্যান্য শ্যাম্পুর চাইতে বেশী। এই ময়শ্চারাইজার চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগায়, চুলের যে নিজস্ব তৈলাক্তভাব সেটা নষ্ট হয় না। তারফলে কোন সময়েই চুল শুকনো খটখটে না হয়ে নরম ও চিকন থাকে —যাতে সুন্দর করে চুল বাঁধতে কোনও অসুবিধে না হয়। জট পাকাবার ভয় থাকে না। চুলে চিরুণী খেলবে ভালো। যেমনটা চাইবেন—পরিপাটী করে চুল বাঁধতে পারবেন।

হ্যালো কনসেণ্ট্রেট ব্যবহার করুন—খুশীমনে পছন্দমতো চুল বাঁধতে আর কোনো বাধা থাকবে না।

তিনটি সুবিধাজনক সাইজে পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সারা পৃথিবী জুড়ে হ্যালোর জুড়ি নেই!

যেমন খুশী যেভাবে চান... আপনার চুল বাঁধুন

HCON.G.1 BN

বলছ, ঠকিও না বাবা, যখন বলছ মেনে নিলুম। দু টাকাই।

রাজুকে আনত না প্রথম প্রথম। বাজুক বলে। গোঁফের রেখা দেখা দিলে রাজু ঘোড়াটি খুঁটিতে বেঁধে দিয়ে চলে যেত। কখনো কখনো দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখত। পুজনরাম একদিন বলল বেটা বড় হয়েছিস তুই, লায়েক এখন, ব্যবসা পত্তর দেখ না। ওমর হল চারকুড়ি। কেশ পেকেছে পশ্চাশে। আমি আর কদিন আছি?

রাজু বাবার চোখে তাকালে পুজন চিবুক ছুঁয়েছিল। বলেছিল, বাপকা বেটা তুই বাপকা বেটা। কেমন করে ঘোড়াটাকে কাজে লাগাতে হয়, ব্যবসা করতে হয় তা বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, অনাদর করিস না বেটা। মরদ এখন কদর এখন। বুড়ো হলে যেন ফেলে দিস না। তারপর চোখটা রাজুর চোখে তুলে ধরে বলেছিল দেখনা আমায়, সংসারে জঞ্জাল হয়ে বেঁচে আছি।

ছিছি, রাজু জিভ কেটেছিল। তোমার তকলিফ আছে কিছু? বলনা আমার কাছে। কষ্ট আছে কিছু? হিহি করে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে হাসতে বুড়ো বলেছিল, "ঘোড়ার পিঠে চড়ব ঘোড়া, তার বহু বানাবে টাকার তোড়া।" এক বাত রাখিস বেটা, বাবাকে মনে রাখিস, পুজন গলায় দরদ এনে বলেছিল, ও আমাদের অন্নদাতা। অনাদর দিস না। বেটা "নিজে খাবি লাড্ডু চানা, ঘোড়াকে দিবি পানিদানা।" বুঝলি? কথার ভেতর এমনি ছড়া কেটে কথা বলতে ভালবাসত বুড়ো। এসব বলে বুড়ো একদিন চোখ বুজোলো। বলে গেল ওটা মনে করে দিস রাজু, ভিটের ওপর আমাকে ভুলিস না।

সেই থেকে [illegible] ঘোড়া আনত। খুঁটিতে বাঁধত [illegible] তুলে চাপড় মেরে মেরে পরীক্ষা করত। কিন্তু বড় দরকষাকষি করতে হত ইদানীং রাজুকে। ঘোড়ার নাকি বয়েস হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দালালরা যেত অন্য হাটে। বাজু আর ভাল তেমন মেলে না বাজে। তৃতীয়ত, রাজুর চোখের ওপর ছড়িয়ে আছে যে বিশাল অরণ্য, পাহাড় তার ভেতর নাকি খনি পেয়েছে কোম্পানী। মন্দী ঘোড় বেচে দিয়ে খনির দিকে ঝুঁকেছে সবাই।

সব মিলিয়ে রাজুর সেই বুড়ো বাপের মতন ঘোড়াটা অচল এখন। ফলে রাজু একটা ষাঁড় কিনে বসল। ভেবেছিল, ঘোড়ার নামডাকে ষাঁড়ের ব্যবসাটা জমবে ভাল, কিন্তু জমল না। হাটবারে হাটের পেছনে এসে দাঁড়াত। বেলা বড় হত এবং কেউ যখন আসত না তখন ষাঁড়ের গায়ে হেলান দিয়ে কপালের ওপর কাটা দাগটায় আঙুল তুলে ভাবত।

ঘোড়া কেনার প্রথম দিনেই বাঘ হানা দিয়েছিল বাড়িতে। রাজু তখন কত আর? বাবা টাঙি নিয়ে বাইরে এলে রাজুও পেছন পেছন বাইরে এসেছিল। বাবা আর পড়শীরা মিলে বাঘটাকে জখম করেছিল একসময়। কিন্তু মুমূর্ষু বাঘটার থাবা রাজুর কপালের ওপর এখনো স্মৃতি হয়ে আছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে এসব ভাবে রাজু। সেদিনের সঙ্গে আজকের কত ব্যবধান হয়ে গেছে এরি মধ্যে। খনি উঠেছে পাহাড়ের বুক থেকে। লোকলস্কর ভর্তি এখন। হাটবাজার দোকানপসার। সেই সব বনজঙ্গলের চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে কী আক্রোশে যেন শহর সেজে বসেছে জায়গাটা।

রাজু মাথা উঁচু করে রোদ দেখল। তার চোখের ওপর থেকে রোদের সেই আদিম রং যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে আজ। হাটবারে ঘোড়ার পিঠে বসে পাখির ঝাঁক দেখেছে কত। এখন তাকালেই বিরাট দুটো চিমনি চোখে পড়ে। হাওয়ায় পাহাড়ের বুকের ওপর পাতা ঝরার শব্দের বদলে সাইরেনের ভোঁ কানে আসে আজ। ধুলো ধোঁয়ার জটলা এখন পাখির ঝাঁকের মতন উড়ে যায় পাহাড় ডিঙিয়ে।

এই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস? শরীরের ওপর একটা আশ্চর্য ঢেউ তুলে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল।

রাজু তখনো ভাবছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ষাঁড়টাকে কটাক্ষ করল মেয়েটা, করে বলল, ষাঁড়ের আবার ঠমক কত! ঘটা করে সাজিয়েছিস? ষাঁড়টার কপালের ওপর আঙুল তুলে আঁকিবুকি কাটল। কেটে বলল, তোর চেয়ে ষাঁড়ের ঘটে বুদ্ধি বেশি। ময়না হা হা করে হেসেদুলে হাসতে গিয়ে থেমে গেল। ওড়নাটা বুকে তুলে বলল, ষাঁড়ের পিঠে চড়াবি একটু?

রাজু কোন কথা বলল না। তাকাল না।

ওড়নার একটা দিক ষাঁড়ের কাঁধের ওপর লুটোচ্ছিল। হাওয়ায় পিঠের ওপর ফরফর করে উড়ছিল। সেদিকে তাকিয়ে থেকে ময়না বলল, বাব্বা! ল্যাজে পা দেওয়া যায় না। ময়না এবার চোখ তুলে রাজুর চোখে তাকাল। বলল, তা ষাঁড়ের ল্যাজ ধরে ত শুনেছি সগ্গে যায় মানুষ, আমি না হয় তোর ল্যাজ ধরে নরকে গেলুম।

এতক্ষণ পরে রাজু এবার ওর শরীর দেখল। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে দৃষ্টি জড়িয়ে গেলে বলল, কি দিবি? অর্থপূর্ণ জিজ্ঞাসা করল রাজু।

জিভ কাটল ময়না। ষাঁড়ের গা থেকে ওড়নাটা তুলে কাঁধে ফেলল। চিমনির ধোঁয়া এখন বেশ গাঢ়। কুণ্ডলী পাকিয়ে বিক্ষিপ্ত ভাসছিল। ভাসতে ভাসতে পাহাড় ছুঁয়ে ফেলছিল। ছুঁয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল দূরে। পাহাড় পার হয়ে ওপারে।

রাজু চোখ তুলে তাকালে ময়না বলল, ইস্, ভুল বলেছি। এই ক্ষমা চাইছি। ষাঁড়ের কানে হাত ছোঁয়াল ময়না। তোর ল্যাজ থাকতে যাবে কি দুঃখে বল?

রাজু বলল, চল। ওরা হাঁটল। অরণ্য যেখান থেকে শুরু, সেখানে এসে ময়না তাকাল। ভয় গলায় বলল, এই, কোথায় যাচ্ছিস?

ষাঁড়টাকে একটা গাছে বাঁধল রাজু। ঘর।

ঘর? তেমনি খিলখিল করে হাসল ময়না। বনের ভেতর ঘর তুলেছিস? কেমন একটা ভ্রূভঙ্গি করে বলল, তা গাছের ওপর বানালেই ত পারতিস। মানাতো। চলার গতি এবং হাসির এই দু'এর টানাপোড়েনে শরীরের ওপর একটা ঢেউ উঠল ময়নার। বলল, ষাঁড়ের মাথা গরম পানি দে। তোর মাথায় পানি ঢাল ষাঁড়ের মাথা ঠাণ্ডা হবে।

অরণ্যের অনেক গভীরে চলে এল রাজু যেন আক্ষেপ করে এতক্ষণ পরে রাজু বলল, কতদিন পরে এলাম বলত? রাজুর এখন সব মনে পড়ল। বাবার সঙ্গে এই বনের ভেতর কাঠ কাটতে আসত। বাবা চলে যেত আরো গভীরে। মৌ ভাঙতে। তখন রাজু অই ঝরনার ধারে চুপচাপ বসে থাকত। সাদা সাদা নুড়ি খুঁটে ঝরনার জলে ফেলত। সংগী পেলে কখনো কখনো খেলত। জল ছড়াত। আজ সব কে কোথায় হারিয়ে গেছে। কেউ খনিতে। কেউ বাবু হয়ে গেছে। শুধু পড়ে আছে রাজু। এই সব ভাবতে ভাবতে রাজু দাঁড়াল।

থামলি? জড়ান গলায় উচ্চারণ [illegible] ময়না মাথা নিচু করল।

রাজু এবার ময়নার আঙুল কটা নিজের হাতে তুলে নিলে। বুকে আমার জ্বলে।

ময়না ডাগর চোখ আরো বড় করে দেখছিল বন, ঘন অরণ্যঘেরা এমনি পরিবেশ ময়নাও দেখেছে আগে। এসেছে অনেক। ময়ূর দেখাত। ঝরনার জল নিতে সাঙাতদের সঙ্গে। তারপর বোধ হয় এই নিষিদ্ধ এলাকায় এই প্রথম, এল রাজুর সঙ্গে। ময়না হকচকিয়ে অরণ্য পরিবেশ দেখছিল। বনটিয়া চোখ তুলে তুলে খুঁজেছিল। উড়ো পাখির ঝাঁক দেখছিল গাছে গাছে। রাজু এবার জড়িয়ে ধরল।

না!

না? রাজু তাকাল। ওর ঠোঁট লক্ষ করল রাজু। কেন না? রাজু এবার দ্বিধাহীনভাবে বুকের সঙ্গে লেপ্টে নিয়ে বলল, লজ্জা, না ভয়, কি?

ওরা এবার দুজনে এই গভীর অরণ্যের ভেতর বন্দি হয়ে বসে থাকল অনেকক্ষণ।

ময়না মাঝে মাঝে চোখ তুলছিল। দেখছিল অরণ্য। এই আদিম পরিবেশ। পাখি, পাতার আওয়াজ খুঁজছিল। বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে তাকাল ময়না। না। ভয় করে।

ভয়? রাজু এবার ওর ঠোঁটের অনেক কাছে মুখ আনল। ময়নার ঠোঁট কাঁপালে আঙুলের স্পর্শ দিল প্রথমে রাজু, তারপর এক সময় ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, কিসের ভয়?

ময়নার কণ্ঠ কেমন জড়িয়ে আসছিল। কেমন যেন একটা তন্দ্রার ভেতর ডুবে যেতে যেতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, জানি না।

রাজু আরো ঘন হল। আরো কাছে সরে এসে জড়িয়ে নিল শক্ত করে। শরীরটা এবার অনেক যত্ন করে কোলের ওপর শোয়াল প্রথমে। তারপর হাতের কাছে ঝুঁকে পড়া গাছ থেকে বড় বড় সবুজ পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিলে মাটির ওপর। দেহটা তার ওপর শোয়াল রাজু।

গাঢ় অথচ অস্পষ্ট গলায় ময়না আপত্তি করলে রাজু চোখ তুলে বলল, না, কেউ নেই। এই গাছ, পাতার শব্দ, রোদ্দুরের এই নরম স্পর্শ ছাড়া কেউ জানবে না ময়না। রাজু প্রথমে পাশে শুয়ে পড়ল। ছড়ান পাতার একটা মুঠি থেকে খুঁটে নিয়ে নগ্ন বুকে ছোঁয়াল। দু আঙুলে পাতার বোঁটাটা ওড়না নিচে করে মাটির মত স্তনের ওপর ঘোরাল।

ময়না রক্তের ভেতর কেমন একটা উষ্ণতা অনুভব করল। তারপর চোখ বুজল। বুজে রাজুর ইচ্ছার অগ্নিশিখার ভেতর নগ্ন দেহে পুড়ে গেল। ভীষণ বুঁদ হয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকল। নড়ল না।

রাজুর দ্রুত নিঃশ্বাস এক সময় স্বাভাবিক হয়ে এলে ময়না যেন ঘুম থেকে জাগল। আবার হাত ধরল রাজু। কোন প্রতিবাদ না করে ময়না অরণ্য পরিবেশ দেখল। জানিস, রাজু বলল, জানিস ময়না এই বনে কত এসেছি আগে?

জানি।

তখন এত ভয় ছিল না।

ভয়?

হ্যাঁ, খুব ভয় করে এখন।

কি সব ভয়? ময়না তাকাল।

সব বন সাফ হয়ে যাচ্ছে বলে। বাঘ ভালুকের চাইতে হিংস্র অই মানুষগুলো। খালি অর্থ, অর্থ, অর্থ। লালসা। জানিস, মনে হয় সব এদের শেষ করে দিই। আমাদের মত অসভ্য লোকগুলোকে সাজিয়ে গুজিয়ে আরো অসভ্য করে দিচ্ছে। বুকের ভেতর যে খাঁচাটা আছে ওটাই আসল রে ময়না। কেমন বড় পঙ্গু হয়ে পড়ছি। নারে?

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে রাজু আধশোয়া দেহটা তুলল একটা লম্বমান ছায়া রচনা করল। ময়নাকে টেনে তুলে দুজনে জড়িয়ে জাপ্টে একটা সরল রেখার মত ঋজু দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর হাঁটিতে হাঁটিতে ওরা এবার অন্তরঙ্গ গল্প করল। ময়না শুধু শুনছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে একটা গোলাকার দেখতে এমন পাতার গাছ দেখিয়ে রাজু বলল, এর ফল খেয়েছিস কখনো?

না।

আমি খেয়েছি।

কেমন? উৎসুক দৃষ্টি তুলে ময়না তাকাল।

কাঁচায় মিষ্টি, পাকলে টক।

ময়না তাকাল। রাজু এবার হেসে রসিকতা করল, ঠিক তোর মত।

তুইও খুব মিষ্টি এখন, পাকলে ত টক হবি।

আচ্ছা, পাকলে সবাই টক হয়ে যায়, না? কোন কদর থাকে না, নারে?

কী জানি? ময়না লম্বা করে উচ্চারণ করল।

তাই। বাবাকে দেখছি। বয়েস হল যেই কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল সকলের কাছে। করুণার পাত্র হয়ে গেল। টক ফলের মত অবজ্ঞা করত সকলে। বাবা কাঁদত এক এক দিন। বেকায় কাঁদত। রাগ করত কারণে অকারণে। পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে বাইরে চলে যেত আর আসবে না বলে। আবার ফিরে আসত। রাজু হঠাৎ হাসল ময়নার চোখের ভেতর তাকিয়ে। আমাদের পাকতে দেরি অনেক।

ময়না মাথা নিচু করে হাসল। শব্দ হল না।

হাঁটিতে হাঁটিতে রাজু হাত ধরছিল কখনো, কখনো ময়না রাজুর হাত ধরছিল এবং এমনিভাবে হাল্কাচালে হাঁটছিল দুজনে বেরিয়ে আসছিল বন থেকে। আসতে আসতে একটা গাছে হাত দিতেই কমলা রঙের পরাগ লেগে গেল রাজুর হাতে। রাজু সেই গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে ময়নার হাতে দিল। দিয়ে বলল, এই গাছগুলোর গায়ে পয়সা রঙের একরকম সাপ জড়িয়ে থাকে।

চোখ বড় বড় করে তাকালে রাজু বলল, দেখবি? হাত ধরে টানল রাজু। আয় না দেখি?

দুজনে পাতা সরিয়ে সরিয়ে সাপ যখন খুঁজে পেল না তখন আবার হাঁটল। হাঁটিতে হাঁটিতে রাজু আঙুলে তুলে বলল, ওই যে লম্বা গোছের গাছটা দেখছিস, ওই—

যেন দেখতে পাচ্ছিল না ময়না এমনভাবে ঘাড় তুলে দেখল। কই?

উহুঁ। রাজু পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হল। তারপর কোমর জড়িয়ে ময়নাকে নিজের হাঁটু পর্যন্ত উঁচু করে দেখাল। পাশ দিয়ে যাবি?

কেন? মাটিতে নামিয়ে দিলে ময়না হেঁট হয়ে নমস্কার করতে যাচ্ছিল ওর গায়ে পা লেগেছিল বলে। রাজু ধরে ফেলে বলল, ধোৎ। রাজু চুমু খেয়ে বলল, চল না। যেতে যেতে রাজু বলল, একবার গেছি বাবার সঙ্গে, দেখি কি, ধাক্কা দিল রাজু।

ময়না হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলে রাজু আবার জড়িয়ে ধরে বলল, ভয় কিরে? ভয় যেন বেজায় বেড়ে গেছে, না? সাপ ধরবি, বাঘের বাচ্চা চুরি করবি, মৌ ভাঙবি, তবে না?

ও কথার উত্তর না দিয়ে পুরনো কথার জের টানল ময়না। কী দেখেছিলে?

দুটো হায়না। আমরা পাহাড়ের ওপর শুয়ে শুয়ে যা করলাম, তাই করছিল।

অসভ্য। ময়না অইটুকু উচ্চারণ করে চোখ নামাল।

খুব চুপি চুপি পা ফেলে রাজু চুপি চুপি বলল, যাবি, দেখবি? হাত ধরাধরি করে বনজন্তুর মত গভীরে, আরো গভীর বনে চলে গেল দুজনে।

অথচ—

অথচ আজ সে দীর্ঘ ছায়া মরে গেছে। সাফ হয়ে যাচ্ছে বন। কোম্পানী মত হস্তীর মত মোটা হয়ে উঠলে সব কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে চোখের ওপর। আঁচল বুকে দুলতে দুলতে কতদিন ছুটে এসেছে ময়না। ভোঁ বাজতে আর দেরি কত? এখনো আদর হচ্ছে ঘাটের মড়া নিয়ে। ছেড়ে দে না।

যত দিন যাচ্ছে ঘোড়াটা যেন তত লুকিয়ে রাখতে চায় রাজু। চুপি চুপি নিজে হাতে দানাপানি দেয়। কারোকে যেন বিশ্বাস নেই রাজুর। রাজু বলে, বলিস কি, ছেড়ে দেব? বাবার কথা মনে রাখিস ময়না। বেইমানি করতে পারব না।

একদিন খনিতে কাজে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে ময়না ঘোড়াটা তাড়িয়ে দিয়েছিল বাঁধন খুলে। রাজু ফিরে এসে অবাক। ময়না বলে, দেখ, বুড়ো বয়েস ভীমরতি হয়েছে হয়ত। খুঁজে এস বাজারের পেছনে।

কিন্তু খুঁজতে হয়নি রাজুকে। দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই চোখাচোখি। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। কপালটা ভিজে ভিজে।

সেদিন রাত্তিরে রাজু বলেছিল, বাবা কি বলত জানিস?

কি?

নিতান্ত দিন ফুরিয়েছে তাই। বুড়ো হয়ে গেছে ঘোড়াটা। চোখের ওপর সব বদলে গেছে তাই। বাবা বলত, "ঘোড়ার ওপর চড়বে ঘোড়া, তোর বউ বানাবে টাকার তোড়া।"

আলোটা নিবিয়ে দিল হাত বাড়িয়ে ময়না। তুই শো।

শুতে শুতে রাজুর মনে পড়ল, পাছে বাঘ আসে তাই বাবা আগুন জ্বালিয়ে রাখত ঘোড়াঘরের চারপাশে। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল রাজু। অবশেষে যখন ঘুম এল না তখন উঠে এল। ময়না ঘুমোচ্ছে। গলার নিচেটা আলতো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল রাজু। ওর নিঃশ্বাসে আরো ঘন হয়ে অনুভব করল।

উঠোনে নেমে এল রাজু। জ্যোৎস্না। সব কেমন স্পষ্ট হয়ে ভাসছে চোখের ওপর। রাজুর হঠাৎ মনে হল, কাল সকাল হলে একটা সাতরঙের প্রজাপতি খুঁজবে। উড়ো পাখির ঝাঁক। ঝরনার কাছে চলে যাবে। হায়না খুঁজবে চুপি চুপি। বন-ময়ূরের দল তাড়া করে করে খসানো পালক তুলে আনবে।

হঠাৎ কাঁধের ওপর স্পর্শ পেয়ে রাজু চমকাল। ময়নার শরীরে শাড়ি নেই। আদুল শরীরে যেন ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে চুপি চুপি। ময়না জড়িয়ে ধরে হাসল।

চল। প্রায় হাত ধরে টানল ময়না। ভোরের আর বাকি কত? ঘরে চল।

পুতুলের মত সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর এল রাজু। ময়না বলল, আগে বল, ঘোড়াটার চোখ দেখে দূরে গাঁয়ে ঘোড়াটাকে কাল ছেড়ে দিয়ে আসবি?

অন্ধকারে রাজু চমকাল। ময়না ওর বুকের কাছে স্পর্শ দিল বুক ঠেকিয়ে! শুধু শুধু দানাপানি জুগিয়ে লাভ কী বল? সে পয়সা জমালে তবু আমার একটা গয়না হবে। আর তো সে বন নেই যে জন্তু হয়ে থাকব এখন?

রাজু স্পর্শ সুখ অনুভব করতে করতে চোখ বুজল। সেও বুড়ো হবে একদিন। লোলচর্ম। অস্থিচর্মসার। করুণার পাত্র হয়ে যাবে। এই পৃথিবীর ওপর থেকেও, অথর্ব হয়ে দিন গুণবে শুধু। কেবল দুঃসহ হবে। দায়-দায়িত্ব পালন করা এই লোকটার চোখের ওপর দিয়ে মূল্যবোধ দ্রুত হারিয়ে যাবে।

তীব্র আদর ময়নার গলায়। রাজু ওকে একটা অবলম্বন ভেবে হাত বাড়াল ময়না বলল, উঁহু, আগে সত্যি কর, তবে। ছাড়িয়া দেবে? জানো, কৈকেয়ী দশরথকে সত্য করিয়েছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল রাজুর বুক থেকে। কচ্ছপের মত চিৎ হয়ে হাঁটু মুড়ে শুয়েছিল ময়না। হেঁট হয়ে ওকে স্পর্শ করতে হাঁটু ভেঙে ঘোড়া হল রাজু। চোখ থেকে গড়িয়ে-পড়া গরম জলের একটা ফোঁটা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বলল, কাল সকাল হলে দেখিস, আমি দশরথ তুই কৈকেয়ী ময়না।

সৌর একস-রে বিজ্ঞানে ভারতীয় বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব

কয়েক বছর আগে কয়েক মাসের ব্যবধানে সূর্যের দুটি অঞ্চলে প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলন দেখা গিয়েছিল। ইংরেজীতে এ ধরনের প্রজ্জ্বলনকেই বলা হয় 'সোলার ফ্লেয়ার' বা সৌরচ্ছটা। পৃথিবীর ঊর্ধাকাশে মহাকাশ গবেষণাগার পাঠিয়ে ওই দুটি সৌরচ্ছটার উপর ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ চালান হয়। আপনারা অনেকেই হয়ত জানেন, সূর্যের কোন অঞ্চল যখন হঠাৎ কোন কারণে প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সেখানকার পুরো অবস্থাটাই তখন যেন জটিলতর রূপ ধারণ করে। মুহূর্তের মধ্যে সেখানকার চৌম্বক-ক্ষেত্রের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বেতার তরঙ্গ সেখান থেকে বিকীর্ণ হতে থাকে। সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক তেজোদীপ্ত নানা রকমের তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ। এই তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ্য একস রশ্মি। যে দুটি সৌরচ্ছটার কথা এই মাত্র বললাম, পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে বিশেষজ্ঞরা তাদের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। প্রচণ্ড সৌরচ্ছটার কোন্ অঞ্চল থেকে কী পরিমাণ একস-রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছিল মানচিত্র দুটিতে তা দেখান হয়েছিল। পরে শুধুমাত্র তত্ত্ব এবং কিছু তথ্যের উপর নির্ভর করে ওই সৌরচ্ছটার কোন কোন অংশ থেকে কী পরিমাণ একস-রশ্মি বিকীর্ণ হওয়া সম্ভব, দুটি মানচিত্র তৈরি করে সেসব দেখানর আমি চেষ্টা করি। দেখা গেল, পর্যবেক্ষণ-লব্ধ মানচিত্রের সঙ্গে আমার আঁকা মানচিত্র প্রায় পুরোপুরি মিলে গেছে।

সম্প্রতি কলকাতায় এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তরুণ জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ প্রীতিরঞ্জন সেনগুপ্ত ঠিক এইভাবেই তাঁর মূল বক্তব্যটি আমার কাছে উপস্থাপিত করলেন।

কথা বলছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে বসে। ইউরোপে মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষ করে কর্মস্থল ত্রিপুরায় যাওয়ার পথে শহর কলকাতায় কয়েক দিনের জন্য অবস্থান। বর্তমানে ত্রিপুরা রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের তিনি প্রধান অধ্যাপক।

ডঃ সেনগুপ্তের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিকস এবং ইলেকট্রনিকস বিভাগের অধ্যাপক মৃণাল দাশগুপ্ত।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত বললেন, ডঃ সেনগুপ্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে এ ভ্যান অ্যালেনের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। সোলার একস-রে বা সৌর একস-রে সম্পর্কিত তাঁর একটি তত্ত্ব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

—কোন্ ভ্যান অ্যালেন? আমার প্রশ্ন।

ডঃ প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত মনে করেন, পরিকল্পনার কাঠামোটি যদি বাস্তবসম্মত হয় এবং যদি স্পষ্ট করে বোঝান যায়, যে গবেষণা করছি দেশ তাতে করে লাভবানই হবে, আর তার সঙ্গে যদি প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা থাকে, গবেষণা করার ব্যাপারে এ-দেশেও সুযোগের অভাব হয় না

—যার নামে নামকরণ হয়েছে ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট। বললেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত।

খানিকটা চমকে যাওয়ারই কথা। কারণ ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট পৃথিবীর পরিমণ্ডলীয় রহস্য উদ্ঘাটনে এক নতুন সংযোজন। আপনাদের মধ্যে কারোর কারোর হয়ত মনে আছে ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫৮ মার্কিন দেশ তাদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ একসপ্লোরার-১কে মহাকাশে উৎক্ষেপ করেছিল। ওই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করেই জেমস এ ভ্যান অ্যালেন পৃথিবীর ঊর্ধাকাশে নিরক্ষ রেখা বরাবর দুটি বিকিরণ বেষ্টনী আবিষ্কার করেন। যাদের নাম দেওয়া হয় ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট, একটি বেষ্টনী পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার দূরের ঊর্ধাকাশে। দ্বিতীয়টির দূরত্ব প্রায় ১৬০০০ কিলোমিটার। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের টানে মহাকাশ থেকে ভেসে আসা অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন প্রোটন এবং ইলেকট্রোন কণা এই বেষ্টনী দুটির মধ্যে বন্দী হয়ে যায়। ফলে পৃথিবীর জীবজগৎ অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায়।

*

ডঃ প্রীতিরঞ্জন সেনগুপ্তের সোলার একস-রে সম্পর্কে আগ্রহ সম্ভবত আকস্মিক ঘটনা। 'কারণ, পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম ঠিকই। কিন্তু আমার আন্তরিক আকর্ষণ কোন দিনই এ বিষয়টির ওপর ছিল না।' বললেন, ডঃ সেনগুপ্ত।

১৯৫৪ সালে ডঃ সেনগুপ্ত কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বি এস-সি পাশ করেন। সেই সালেই এশিয়াবাসী হিসেবে প্রথম তাঁর প্রথম 'লাইড' বৃত্তি অর্জন। এই উপলক্ষেই বারট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কারণ, রাসেল তখন লাইড স্কলারশিপ কমিটির চেয়ারম্যান। রাসেলের সুপারিশে প্রীতিরঞ্জন গেলেন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেণ্ট অ্যাণ্ড কণ্ট্রোল'-এর উপর স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসেবে যোগ দিতে। এবং ১৯৫৭ সালে ওই বিষয়ের উপরই এম এস ডিগ্রি নিয়ে ভারতের কোন একটি বিখ্যাত বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিচালক পদ গ্রহণ করেন।

—'কিন্তু এখানে কিছুদিন কাজ করার পর মনে হল, গবেষণা এবং শিক্ষণই আমার ভাল লাগে।' বললেন, ডঃ সেনগুপ্ত।

আর এই তাগিদই তাঁকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট লাভজনক সেই পরিচালকের পদটি ছাড়তে বাধ্য করে। চাকরি ছেড়ে পড়াতে এলেন পিলানির বিড়লা কলেজে। ১৯৬২ সালে এখান থেকে ইলেকট্রনিকস-এ এম এস-সি। এম এস-সিতে তিনি প্রথম হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন।

অতঃপর ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণা পর্ষৎ-এর গবেষক হিসেবে দিল্লির আকাশবাণী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং খড়গপুরে ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ইলেকট্রনিকস এবং ইলেকট্রিকেল কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক এবং পরে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ। ১৯৭২ সালে খড়গপুরে কর্মরত অবস্থাতেই সৌর-একস-রে বিকিরণ এবং পৃথিবীর ঊর্ধাকাশের আবহাওয়া পরিমণ্ডলে তার প্রতিক্রিয়া, এই বিষয়ের উপর গবেষণা করে ডক্টর অব সায়ান্স উপাধিতে ভূষিত হন। এর পরই
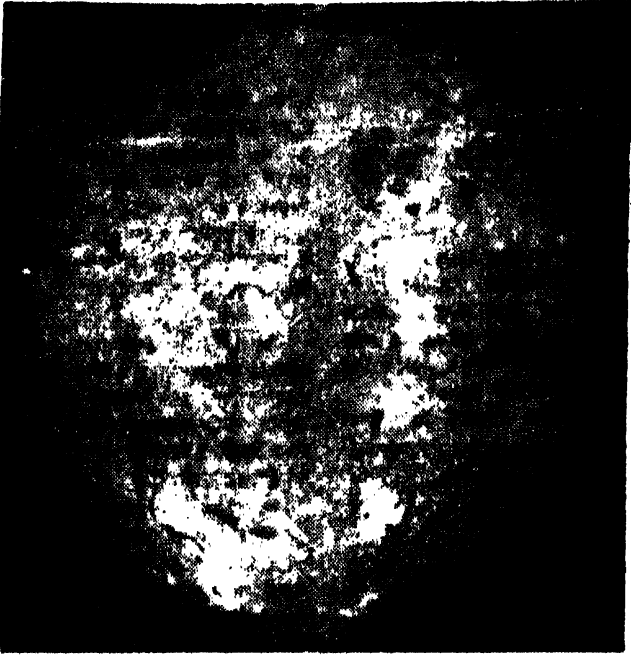
১৯৭১ সালে পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির পর্যবেক্ষকরা সৌরঝঞ্ঝার এই ঐতিহাসিক ছবিটি তুলে অনেককেই তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ছবি তোলার সময় ক্যামেরার সামনে হঠাৎ একটি জেট প্লেন এসে পড়েছিল। ডান পাশে প্লেনটিকে লক্ষ্য করুন। সাদা অংশগুলি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা সূর্যের বুক। কালো দাগগুলি সৌর-কলঙ্ক। মার্কিন দেশের অর্বাবিটিং সোলার অবজারভেটারির তোলা সৌর-ঝলকের ছবি

উনি ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগ দেন।

খড়্গপুরে আসার পর থেকেই প্রীতি-রঞ্জন সূর্য থেকে বিকীর্ণ এক্স-রের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এখানে কাজ করার সময় গবেষক-বৃত্তি নিয়ে তিনি মার্কিন দেশের ন্যাশনাল এরোনটিকস অ্যান্ড স্পেশ অ্যাডমিনিসট্রেশন বা সংক্ষেপে 'নাসা'র প্রকল্প নিয়ে কিছু দিন গবেষণা চালান প্রথমে বোল্ডারে এবং পরে ম্যাসাচুসেটস-এর এরো স্পেশ গবেষণাগারে।

এবং এর পর বিশিষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ভ্যান অ্যালেনের সঙ্গে সহযোগী-রূপে কাজের সূচনা।

প্রশ্ন : ভ্যান অ্যালেনের সঙ্গে কতদিন কাজ করেছিলেন?

ডঃ সেনগুপ্ত : অগাস্ট ১৯৬৭ থেকে জুলাই ১৯৬৯। ওই সময় কৃত্রিম উপগ্রহ অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা, মহাকাশ-পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির উপর তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলাম।

হ্যাঁ, এখানেই তিনি রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হন। উল্লেখ করা যেতে পারে, মহাকাশ গবেষণার ব্যাপারে এটাই তখন বৃহত্তম উদ্যোগ। বর্তমানে ডঃ সেনগুপ্ত এক্সপ্লোরার-৩৩, এক্সপ্লোরার-৩৫, মেরিনার-৫ প্রভৃতি মহাকাশ স্টেশন সংকেত আদানপ্রদান ব্যবস্থা এবং যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যাপারেও জড়িত রয়েছেন। এর জন্যে ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 'নাসা' একটি বিশেষ প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছে। মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত নানা রকম তথ্য নিয়মিত এখানে পাঠান হয়। ওই সব তথ্যের উপর নির্ভর করে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে ডঃ সেনগুপ্ত গবেষণা চালাচ্ছেন। বলা বাহুল্য, ভারতে এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম।

এক্সপ্লোরার-৩৩ এবং ৩৫ কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাকাশে যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান হয়েছিল তাদের উপর নির্ভর করে ডঃ সেনগুপ্ত সূর্য থেকে বিকীর্ণ লম্বা দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ এবং এক্স-রশ্মির ব্যাপারে একটি মৌলিক তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। তত্ত্বটি ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়াও ওই সব বিষয়ের উপর লেখা তাঁর কয়েকটি গবেষণাপত্র অক্টোবর, ১৯৬৯ ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত 'এরোস্পেশ অ্যান্ড এরোনমি কনফারেন্সে' এবং মে, ১৯৭০-এ সোভিয়েত দেশের লেনিনগ্রাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 'সোলার টেরেস্ট্রিয়াল ফিজিকস' অধিবেশনে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল।

*

প্র : ডঃ সেনগুপ্ত, গোড়াতেই আপনি বলেছেন, আপনার তত্ত্ব বা মডেলের সাহায্যে সূর্যের কোন সাময়িক ঘটনা, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় সোলার ইভেন্ট অর্থাৎ সাদা কথায় যাদের সৌর ঝটিকা, সৌরচ্ছটা এই সব বলা হয়, কখন তারা দানা বাঁধবে, আগে থেকেই নাকি বলা যাবে। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডঃ সেনগুপ্ত : এক শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা জেনে আসছিলেন, সূর্যের পরিমণ্ডলে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝড় দেখা দেয়। ওই সময় প্রচণ্ড দীপ্তিমান শিখা নিয়ে সূর্যের কোন অঞ্চল যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। একেই বলা হয় সোলার ফ্লেয়ার বা সৌরচ্ছটা। ঠিক কী কারণে মাঝে মাঝে এই ধরনের পরিমণ্ডলীয় বিক্ষোভ সেখানে দানা বাঁধে, তার সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত অবশ্য অজানা। তবে গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে গবেষণা চালিয়ে ওই সমস্ত ঝড়ের কায়দাকানুন, কোথায় তারা গড়ে উঠল, তাদের বাঁধ এবং হ্রাস বৃদ্ধি সবের উপর অনেক নতুন তথ্য জানা গিয়েছে। সূর্যের পরিমণ্ডলে এ ধরনের স্থানিক ঘটনার উৎপত্তি সম্পর্কে সি ডি জেগার, পিডিংটন এবং আমার নিজেরও ধারণা, পৃথিবী থেকে সূর্যের যে দীপ্তিমান অঞ্চল বা ফোটোস্ফিয়ার দেখতে পাই, তার অনেক গভীর অঞ্চলে সৌর-ঝটিকার উৎপত্তি। জলের গভীর অঞ্চল থেকে বুদবুদ যেভাবে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে, সেই ভাবেই সৌর-ঝটিকা এগিয়ে আসে সূর্যের বাইরের পরিমণ্ডলের দিকে। ঝড়ের সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে আসে অয়নিত কণিকা। প্রচণ্ড তাদের শক্তি। যে অঞ্চলের দিকে তারা এগিয়ে আসে সেখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়, যার মাত্রা কয়েক হাজার 'গাউস'-এর মত। আর ওই সময় ওই অঞ্চলে যে পরিমাণ শক্তির সমাবেশ ঘটে তার পরিমাণ দশের পেছনে ৩৭টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা তৈরি হয় ঠিক ততটা আর্গের সমান।

প্র : প্রচণ্ড এই শক্তিই কি সূর্যের ওই অঞ্চলকে ওইভাবে দীপ্তিমান করে তোলে?

ডঃ সেনগুপ্ত : এটাই আংশিক কারণ। অন্য কারণও আছে। যা বলছিলাম। হ্যাঁ, এইমাত্র যা বললাম, শক্তিশালী অয়নিত কণার ঝাঁক পরিচালন পদ্ধতিতে যখন দ্রুত গতিতে সূর্যের আলোকমণ্ডল বা ফোটোস্ফিয়ার ভেদ করে এগিয়ে আসে, ওই আলোকমণ্ডলের পারিপার্শ্বিকতার তুলনায় তাদের তাপমাত্রা অনেক কম থাকে। ফলে যে অঞ্চলে তারা হাজির হয় সেই অঞ্চলটি

পৃথিবী থেকে অন্ধকার বলে মনে হয়। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাকেই বলা হয় ডার্ক স্পট অভ্ দ্য সান, বা সৌরকলঙ্ক। আর এটাই হল সৌরঝটিকার সেণ্টার অভ অ্যাকটিভিটি বা সৌর-ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু।

প্রঃ সৌর-ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুর মূল তাৎপর্যটা একটু বুঝিয়ে বলবেন, ডঃ সেনগুপ্ত?

ডঃ সেনগুপ্ত ঃ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। ব্যাপার এই, ধরুন পাশাপাশি ওই ধরনের সেণ্টার অভ্ অ্যাকটিভিটিজ-এর চৌম্বক মেরু বিপরীতধর্মী, তখন তাদের চৌম্বক-ক্ষেত্র পরস্পর এমনভাবে প্রতিক্রিয়া করে যাতে করে সেখানকার চৌম্বক-শক্তি ন্যূনতম একটি অবস্থা লাভ করতে পারে। এর ফলে ওই দুই সেণ্টার অভ্ অ্যাকটিভিটিজের অন্তর্বর্তী চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী অয়নিত গ্যাস বা ম্যাগনেটিক ফ্লুইডের চাপ মুহূর্তে ভীষণভাবে বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দারুণভাবে বৃদ্ধি পায় সেখানকার ইলেকট্রন ডেনসিটি। অর্থাৎ প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে ইলেকট্রন কণার সংখ্যা বাড়ে। বাড়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থানকারী ইলেকট্রনের তাপমাত্রা। সম্প্রতি তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করে আমি দেখিয়েছি, সূর্যের বুকে যে সব 'অ্যাকটিভ রিজিওন' বা সৌরঘটনার কেন্দ্রবিন্দু তৈরি হয় তার মূলে এ ধরনের ব্যাপারই কাজ করে। এবং এর ফলেই ওই অঞ্চল থেকে অধিক মাত্রায় নানা রকম বিকিরণ বেরিয়ে আসতে থাকে। বিশেষ করে স্বল্প দৈর্ঘ্যের তরঙ্গবিশিষ্ট রশ্মি যেমন একস-রে, অথবা অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন কণা প্রোটন, ইলেকট্রন, প্রভৃতি বেরিয়ে আসতে থাকে।

ডঃ সেনগুপ্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে এই 'অ্যাকটিভ রিজিওন' বা সৌরঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ব্যাখ্যার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নতুন একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। "আমি এর নাম রেখেছি 'করোনাল অ্যাকটিভ রিজিওন'। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বলা হত 'কনডেনসেশন রিজিওন'।" বললেন ডঃ সেনগুপ্ত।

নিজের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাকাশ থেকে একস-রে সম্পর্কিত যে সব গবেষণা চালান হয়, সেই সব গবেষণালব্ধ তথ্যের সাহায্যে ডঃ সেনগুপ্ত সৌর-ঘটনার একটি ভৌতিক মডেল তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। এই মডেল পৃথিবীর বিশিষ্ট জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রশংসাও অর্জন করেছে।

ডঃ সেনগুপ্ত বললেন, 'তত্ত্বের দিক দিয়ে আমার বিশ্বাস, আমার তৈরি এই মডেল শান্ত অথবা অশান্ত অবস্থায় সূর্যের কোন্ অঞ্চল থেকে ঠিক কোন্ দিনে কী পরিমাণ একস রশ্মি বিকীর্ণ হতে [illegible] দিতে
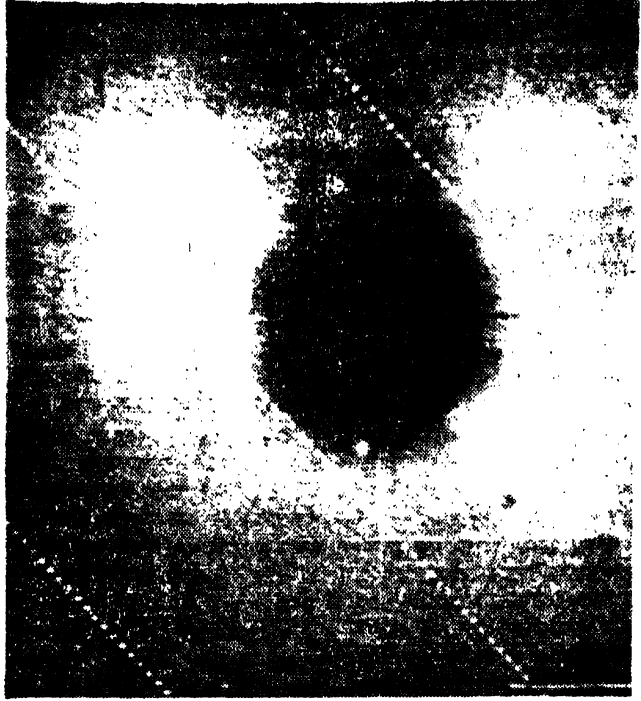
অক্টোবর, ১৯৭১। সৌর-ঝটিকার এমন ছবি এই প্রথম তোলা হয়েছিল। ছবিতে অদ্ভুত ধরনের সব রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে, লক্ষ্য করুন। পর্যবেক্ষকদের হিসেব, সৌর-ঝটিকার সময় ওই রশ্মি সূর্যের বুক থেকে মহাকাশে ৫০ লক্ষ মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে

পারবে। তিনি বললেন, সূর্যের কোন অংশ যখন অশান্ত হতে শুরু করে, প্রথম দিকে সেটা হয় ধীর গতিতে। তারপর চূড়ান্ত অশান্ত দশার পূর্ব মুহূর্তে সেখান থেকে বিকীর্ণ হয় সবচাইতে বেশি তেজদীপ্তি, চৌম্বক শক্তি, শক্তিশালী কণা এবং ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ। মূল ব্যাপারটা চলে কখনও কখনও চৌদ্দ পনের দিন পর্যন্ত।

প্রঃ ডঃ সেনগুপ্ত, যাকে আপনি চূড়ান্ত অশান্ত দশা বলছেন, সে অবস্থায় পৌঁছতে কতটা সময় লাগে?

ডঃ সেনগুপ্ত ঃ চার থেকে দশ দিন। ওই অবস্থায় পৌঁছানর পর দুই থেকে তিন দিন অ্যাকটিভ রিজিওন বা সবচাইতে বেশি সক্রিয় অঞ্চলটি কার্যকর অবস্থায় থাকে। পরে প্রশমিত বা শান্ত হতে সময় লাগে সাধারণত চার থেকে ছয় দিনের মত।

ডঃ সেনগুপ্তের অভিমত, সৌরঝঞ্ঝার সময়

শতকরা ৯০ ভাগ এক্স-রশ্মিই বিকীর্ণ হয় ওই অ্যাকটিভ রিজিওন থেকে।

প্রঃ সূর্যের যখন ওই ধরনের অতি-নৈসর্গিক ঘটনা ঘটে পৃথিবীর বুকে বসে তার অস্তিত্ব জানার উপায় কী কী হতে পারে?

ডঃ সেনগুপ্ত: মুখ্যত পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক বল রেখা বা সাধারণভাবে যাকে বলা হয় চৌম্বক ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রে যখন হঠাৎ কোন চাঞ্চল্য দেখা দেয়, বুঝতে হবে সূর্যের কোন চাঞ্চল্য নিশ্চয় অশান্ত পরিবেশ গড়ে উঠছে! কারণ সৌর-ঝটিকা দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র চৌম্বক শক্তির সৃষ্টি হয়। তার প্রভাব পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র পর্যন্ত এগিয়ে আসে। কতটা প্রতিক্রিয়া ঘটছে সেটা দেখে বলা সম্ভব সৌর-ঝটিকার প্রাবল্য ঠিক কতটা। অবশ্য দূরবীক্ষণেও সৌর-ঝটিকার দৃশ্যমান অঞ্চল দেখে ঝটিকার প্রাবল্য অনুমান করা সম্ভব। অথবা ক্ষুদ্রতরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ, যা ঝলকে ঝলকে সৌরচ্ছটার সক্রিয় অঞ্চল থেকে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে, সেই তরঙ্গের কাঁপনকানুন দেখেও সৌরচ্ছটার স্বরূপ জানা যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল এই, সাধারণ দৃশ্যমান আলো অথবা চুম্বক এবং কখনও কখনও বেতার তরঙ্গ, এদের যে কোনটিকেই আপনি মাপুন না কেন, এমনও তো হতে পারে, তাদের যতটা আপনি মাপলেন তার সবটাই ওই চরম-অশান্ত অঞ্চল থেকে আসছে না? হয়ত বেশির ভাগই আসছে সেখান থেকে, বাকিটা পেছন অথবা ওই অঞ্চলের আশপাশের কোন জায়গা থেকে। যাদের বলা হয়, ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন।

প্রঃ সে-ক্ষেত্রে এক্স-রের উপর নিশ্চয় বেশি নির্ভর করা চলে?

ডঃ সেনগুপ্ত: হ্যাঁ। এক্স-রের উপর বেশি নির্ভর করা যেতে পারে। কারণ অ্যাকটিভ রিজিওন থেকে সব চাইতে বেশি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক্স-রশ্মি বিকীর্ণ হয়, সে কথা একটু আগেই আপনাকে বললাম। ফলে ওই এক্স-রশ্মির মাত্রা যাচাই করে সৌরচ্ছটার শক্তি-বিকিরণ করার ক্ষমতা কতটা সেটা জানা যেতে পারে অবশ্য এই মাপজোকের কাজটা ঊর্ধ্বাকাশে রকেট বা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে সারতে হবে। কারণ অয়নমণ্ডলে এসে এক্স-রশ্মি শোষিত হয়।

প্রঃ ডঃ সেনগুপ্ত, তাহলে আপনার বক্তব্য থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে, সৌর-ঝটিকার সময় কী পরিমাণ এক্স-রশ্মি সূর্যের পরিমণ্ডল থেকে এসে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আঘাত করে সেটা জানা সম্ভব। মানব কল্যাণে এ ধরনের পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা কতখানি?

ডঃ সেনগুপ্ত: এই মাত্র আপনাকে বললাম, এক্স-রশ্মি পৃথিবীর বায়ুস্তরে প্রবেশ করেই অয়নমণ্ডলে শোষিত হয়। এর ফলে সেখানে নানা রকম আলোড়ন সৃষ্টি হতে থাকে। যা আমাদের দূরপাল্লার বেতার সংকেত পাঠানর ব্যাপারটা দারুণভাবে ব্যাহত করে।

ডঃ সেনগুপ্ত বললেন, দূরপাল্লার রেডিও কম্যুনিকেশন, বেতার ব্যবস্থা এদের ভালভাবে চালাতে হলে নিয়মিত সূর্য থেকে বিকীর্ণ এক্স-রশ্মির উপর পর্যবেক্ষণ চালান দরকার। কারণ, আগে থেকে যদি জানা যায়, ঠিক কোথায় এবং কোন সময় পৃথিবীর অয়নমণ্ডল অতিরিক্ত এক্স-রশ্মির প্রভাবে অয়নিত হচ্ছে পারে, তা হলে ঠিক সেই সেই জায়গার ওই সময়কালীন বেতার সংকেত কোন্ কোন্ মিটার ব্যাণ্ডে আদান-প্রদান করলে কাজ চলতে পারে, সেটা আগে থেকে আমরা জানতে পারব। এ ছাড়াও রেডার ব্যবস্থাও যাতে বাধা না পায় সে-দিকেও লক্ষ্য রাখা সম্ভব।

হ্যাঁ, ভারতের মত বড় একটি দেশে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। বেতারে সাধারণ খবরাখবর পাঠান ছাড়াও, বিমান চলাচলের জন্যে বেতার সংকেত, অথবা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রেডার, অথবা রেডারের সাহায্যে ঝড় জল কুয়াশার পূর্বাভাস জানা, এ সবের জন্যেই আজ দরকার সুসংহত বেতার পরিচালনা ব্যবস্থা।

ডঃ সেনগুপ্ত বললেন, দেখুন সৌর এক্স-রশ্মির উপর গবেষণা আমাদের দেশের বেতার পরিচালনা ব্যবস্থাকে আরও সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের গবেষণা দেশের ইলেকট্রনিক শিল্পকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করতে পারে। কারণ, সৌর এক্স-রশ্মি গবেষণার জন্যে অথবা সে ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ-চালানর জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি আমরা গড়ে তুলব তাদের অন্যভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সৌর বিজ্ঞানের অনেক মৌলিক রহস্যই একে একে বলে যাচ্ছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ প্রীতিরঞ্জন সেনগুপ্ত। ওঁর উৎসাহ প্রচুর। পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, প্রায়ই তো বিদেশে যান। ফিরে এসে স্বদেশে বিজ্ঞানের এমন মৌল গবেষণা চালাতে অসুবিধে হয় না?

মনে হল, এ প্রশ্ন তাঁর কাছে খুবই অভাবিত। কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বললেন, বুঝতে পারছি, আপনি কী জিজ্ঞেস করছেন। না। এখানে কাজ করার কোন অসুবিধে আমার নেই। সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা চালালে টাকারও অভাব হয় না। ত্রিপুরা সরকার আমাকে তো যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকেও যখনই বোঝাতে পেরেছি, যা আমি করতে চাই, সেটা জলে যাবে না, তাঁরা অর্থ দিয়ে এবং নানাভাবে সাহায্য করছেন। এখন আমার সঙ্কল্প, ত্রিপুরায় সৌর-বিজ্ঞানের উপর একটি গবেষক দল গড়ে তুলব। কয়েকজন ভাল ছাত্রও পেয়েছি। 'নাসা' থেকে নিয়মিত সাহায্য পেয়েছি। সম্প্রতি সোভিয়েত দেশ আমাদের ওখানে গবেষক ছাত্র পাঠাবেন বলে ঠিক করেছেন। আমার বিশ্বাস, কাজ করা যাবে।

সমরজিৎ কর

—২৮—

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে পণ্ডিত জওয়াহরলালের সভাপতিত্বে স্থির হয়, এবার আর ইংরেজের হাত থেকে দয়ার দান নেওয়া চলবে না—এবারের সংগ্রাম পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম। সুতরাং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তারিখে করাচির কংগ্রেস বৈঠক থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দাবি ঘোষণা করা হল এবং গান্ধীজির নেতৃত্বে কোটি কোটি কণ্ঠের এই দাবি ভারতের সর্বত্র উত্তাল হয়ে উঠল। এর পর গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযান, ভারত-ব্যাপী লবণ সত্যাগ্রহ, পিকেটিং ও সর্ব-প্রকার ব্রিটিশ ভারতীয় আইন অমান্যের আন্দোলন আরম্ভ।

বাঙলায় নতুন করে রক্তবিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে, এবং এই নিয়েই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ শেষ হচ্ছিল।

কিন্তু এই রাজনীতিক ঝঞ্ঝার বাইরে যেটি ঘটছিল, সেটি হল এই শতাব্দীর প্রথম সমাজবিপ্লব। এই বিপ্লব আনে নারী-সমাজ। শুধু বাঙলায় নয় ভারতের সর্বত্র। রক্ষণশীল সমাজের মূলে মেয়েরা কুঠারাঘাত করতে লাগল। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও স্বল্প বিত্ত পরিবারের প্রায় সকল বয়সের মেয়েরা পথে-পথে বেরিয়ে এসেছিল। অনেক মেয়ে ঘর ভেঙে পালালো, বহু মেয়ে তথাকথিত সতীত্ব খোয়ালো, অসংখ্য মেয়ে কৌমার্য হারালো। কিন্তু এই সুযোগে লক্ষ লক্ষ নারী ব্যক্তি-স্বাধীনতা অর্জন করে প্রথম মুক্তির স্বাদ পেল। তাদের পক্ষে ১৯৩০ নিত্য স্মরণীয়। তখন জওয়াহরলাল নেহরুর পিতা, মাতা ও স্ত্রী জীবিত, এবং তাঁর কন্যা ইন্দিরা স্কুলে পড়ে। মেয়েটির বয়স বোধ হয় তখন দশ বারো বছর।

আমি তখন কাঠবিড়ালী। এখানে-ওখানে খাবার খুঁটে খাই, এবং সুবিধা পাবামাত্রই চরিত্র নষ্ট করে ফেলি। আমি তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিক নই যে, গোপনে বিবিধ প্রকার অসৎকর্মে লিপ্ত হবো এবং প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করে হাততালি নেবো। তখন আমার প্রিয় বন্ধুরা বলেই বেড়াচ্ছেন আমি নাকি নষ্ট হতে বসেছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না, পাপ আর প্রবৃত্তি এ দুটো এক বস্তু নয়। আমি যদি গোমাংস বা শূকরের মাংস খাই—ওটা আমার রুচি বা প্রবৃত্তি, কিন্তু ওটা পাপ নয়। দুষ্প্রবৃত্তি শব্দটি রক্ষণশীল সমাজ প্রবর্তিত একটি সংজ্ঞা মাত্র, এটি তর্কের বিষয়। দুষ্প্রবৃত্তি আর দুষ্প্রকৃতি—এই দুটি পৃথক শব্দের নিহিতার্থ অনেকের কাছে বোধগম্য নয়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের শেষে বারীন ঘোষ মহাশয় তাঁর 'বিজলী' সাপ্তাহিকখানি হস্তান্তরিত করলেন। যাঁদের হাতে দেওয়া হলো, তাঁরা দুজনেই আমার তরুণ বন্ধু—দেবজ্যোতি বর্মন ও বীরেন্দ্র মজুমদার। দেবজ্যোতি তখন বার দুই মাত্র দুটি বিষয়ে এম-এ পাস করেছে এবং সে একজন সাংবাদিক হতে চাইছে। 'বিজলী' হাত ছাড়া হবার পর আমি বাঁচলুম। সোজা কাশী গিয়ে দুচারদিন ধ'রে কেদারঘাটে ডুব দিলুম, ভাঙের সরবৎ-সহ খোয়া ক্ষীরের নাড়ু ও কালীতলার রাবড়ি মনের আনন্দে চেটে খেলুম এবং কয়েকদিন সুধাদার ঘরে বসে কাব্য সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের সহিত বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনতে বসলুম। সুধাদা আমাদের কাছে কোনদিন পুরনো হননি। আমরা রসবোধের দিক থেকে তাঁর মধ্যে নতুন-নতুন আকর্ষণের উপকরণ খুঁজে পেতুম। এই সময় আমার মাসতুতো ভাই প্রভাসের তরুণী স্ত্রী শ্রীমতী অনিতা ওরফে আমার দুর্গাঠাকরুন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর পিত্রালয় দেবনাথপুরায় চলে যান। পাছে তাঁর কোনরূপ ভাবান্তর ঘটে সেজন্য আমি তাঁর শয্যাপার্শ্বে গেলুম না। তিনিও বুঝতে

পারলেন আমার যাবার ইচ্ছা কেন নেই। বলা বাহুল্য, তিনি যেমন আমার প্রিয়পাত্রী, তেমনি সম্মাননীয়াও ছিলেন।

শৈলজানন্দ কাশী ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছে। পিছনে পড়ে রয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু কিছু জনশ্রুতি। কিন্তু যাবার আগেই সে জেনে গেছে, পাঁড়েঘাটের ন্যায়রত্ন মশায়ের তৃতীয় পক্ষের নবীনা স্ত্রী শ্রীমতী তপতী আমার প্রতি কি প্রকার আচরণ করতেন। ন্যায়রত্নের পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে। মেয়ে দুটির বিবাহ হয়ে গেছে। দুই পক্ষ মিলিয়ে তাঁর চার ছেলে এবং দুটি পুত্রবধূ। এর মধ্যেও তিনি স্ত্রীবিয়োগের শোকে তৃতীয়বার যাকে বিবাহ করলেন, সেই তপতীর চেয়ে তিনি পঁয়ত্রিশ বছরের বড়,—ঠিক যেমন ওই বারীনদার বড়দাদা বিনয়ভূষণ ঘোষ তাঁর স্ত্রী অপেক্ষা বত্রিশ বছরের বড়। সে যাই হোক, বাঙ্গালীটোলার প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মশায় তাঁর ওই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গোপালবাড়ি প্রভৃতি কীর্তনের আসরে যেতেন—যেখানে তৎকালের খ্যাতনামা কীর্তনবিশারদ রামকমল ভট্টাচার্য মশায় কীর্তন গান করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন গান করার ফলে রামকমলের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কীর্তন গান শুনেছিলেন দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবীর কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা রায় ও এই সব আসরে বসে তৎকালে পাখোয়াজ ও খোল বাজাতেন নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়। ভবানীপুরের সেই কীর্তনের আসর কলকাতার মস্ত আকর্ষণের বিষয় ছিল। পরবর্তীকালে যোগীনবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা ঘটে।

সে যাই হোক, আমার মনে নেই কবে এবং কী প্রকারে তপতী দেবী আমার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের গৃহিণী। আমার শ্রদ্ধেয়া ও নমস্যা। তিনি আমার পক্ষে পাঁড়ে ঘাটে গিয়ে স্নান করাটা এক প্রকার বন্ধই করেছিলেন। ওই ঘাটটা আমার পাঁড়ে-হাউলি বা দেবনাথপুরার বাসস্থানের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি। সুতরাং মধ্যাহ্ন রোদ্রে ওই ঘাটে নেমে ঝুপ করে একটা ডুব দিয়ে এসে খেতে বসে যেতুম। মাথায় তেল ঘষে ঘষতে ঘাটে নামতুম, কাঁধে থাকত গামছা। ভরদুপুরবেলা একটা কি দুটো। এক-একদিন হঠাৎ একটা কাগজের গুলী এসে গায়ে পড়ত। আমি উর্ধ্বমুখে, তাই প্রথম-প্রথম অতটা গ্রাহ্য করিনি। কে কি ফেললো, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গেল—কে ও নিয়ে মাথা ঘামায়? হঠাৎ একদিন আমার পিঠে ওই কাগজের গুলীটা এসে ঠক্ করে লাগল। আরে, বেশ মজা তো? ওটা কুড়িয়ে নিয়ে খুললুম। দেখি মেয়েলি হাতের লেখা! আমার নাম নেই, সম্ভাষণ নেই,—শুধু দু'লাইন লেখা—'রোজ দাঁড়িয়ে থাকি তোমার জন্য। একদিনও তুমি পিছন ফিরে আমাকে চেয়ে দেখছ না। ইতি তোমার—'

পিছন ফিরে দেখি বাড়ির পূর্বদিকের জানলায় আমারই প্রায় সমবয়স্ক এক সুশ্রী মহিলা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। চিনলুম তিনি ন্যায়রত্নের স্ত্রী। আমাকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে তিনি জানলা থেকে সরে গেলেন। আমি অবাক, বিমূঢ়। কিন্তু আমি কাঁপছিলুম সভয়ে। এ সেই বিজলী আপিসের পাশের বাড়ির উষার মতো—যার নাম উষা নয় এবং যে আমাকে 'নারী-সম্ভাষণ' করে সুদীর্ঘ প্রণয়-পত্র পাঠাতো! আমার যৌবন-নিকুঞ্জের লতাবিতানে তখন মধ্যে মাঝে এক আধটা রঙীন পাখি চুরি করে চলে যাচ্ছে! পুরুষের যৌবনোদ্গম ও যৌবনান্তের সংবাদ মেয়েরা বোধ হয় আগে ভাগেই পেয়ে যায়!

কলকাতায় ফিরবার ঠিক আগে একদিন সন্ধ্যার পর কেদারঘাটের কথকতার আসর থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ঘাট ধরে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে আসছিলুম। পথ ওইটুকু মাত্র। কিন্তু ওইটুকুই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত ছিল। বিপরীত দিক থেকে যে মহিলা আসছিলেন, তিনি কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তিনি তপতী দেবী। ঝলমল করছে তাঁর দেহে শাড়িখানার পাড় দেখে করি সোনালী জরির। নিঃশব্দে আমরা সহাস্য নমস্কার বিনিময় করলুম।

কিন্তু তারপর? কী কথা বলব আমরা? এ তো উপন্যাস নয় যে বেশ গুছিয়ে ধারালো সংলাপ তৈরি করব! উনি বললেন, আপনি প্রায়ই কাশী আসেন আর চলে যান। আপনি তো থাকেন সোনারপুরায়, পাঁড়েঘাটে স্নান করতে আসেন কেন?

আমার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল ওঁকে দেখে। তবু সবিনয়ে বললুম, আপনি আমাকে তুমি বলে সম্ভাষণ করছেন

চিঠির গুলিতে এখন 'আপনি' বলছেন কেন?

উনি এদিক ওদিক তাকালেন। কেউ না দেখে, কেউ না জানে। এটা কাশীর বাঙ্গালীটোলা। উনি ন্যায়রত্নের স্ত্রী। পলকের মধ্যে উনি আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, আমি ঠিক বুঝিনি কিছু মনে করবেন না!

—দাঁড়ান—আমি ও'কে বাধা দিলুম এবং যন্ত্র চালিতের মতো বলে ফেললুম, আপনার চিঠির মর্ম আমি ঠিক বুঝিনি! এখন বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?

আমার মুখের চেহারায় উনি বোধ হয় লক্ষ্য করলেন, আমি এক আহাম্মক ও গাড়োল ছাড়া আর কিছু নয়।

—কিছু না!—এই বলে মহিলা পাশ কাটিয়ে থরগতিতে কেদারের দিকে চলে গেলেন, এবং আমি পিছন থেকে এই সুবেশা ও সুন্দরী রমণীর দিকে চেয়ে রইলুম। ও'র ওই দেহসৌন্দর্যের মধ্যেই আরেকজনকে তখন আমি দেখছিলুম, তিনি শ্রীমতী শোভা। সকল নারীর মধ্যেই আমি তখন শোভাকে দেখছিলুম, এবং শোভাকেই খুঁজছিলুম। ও'র স্বভাব সংযম, চরিত্রের শুচিতা, বৈপ্লবিক আদর্শের কাঠিন্য,—এগুলি আমার একান্তই প্রিয়। আমার মনে হত আমি যেন অনন্তকাল ধরে তাঁর পিছনে ছুটছি এবং তাঁর নাগাল পাচ্ছিনে! আমি আপাতত তাঁর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ, কিন্তু আমি যেন সর্বাপেক্ষা দূরে! এও আমি জানি, রবিঠাকুর আমার মাথাটি খেয়েছেন—"একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি/তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।"

সেবার হাওড়া স্টেশনে নেমে সোজা দৌড় দিয়েছিলুম হাজরা রোডের বাড়িতে শ্রীমতী শোভার দরবারে। আমি নিজে দেবী-পূজা করব, স্তব-স্তুতি আরাধনা আমি করব দেবীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে। কিন্তু কোনও মেয়ে যদি আমার পিছু নেয়, সে আমার দু'চোখের বিষ। আমি ওটার মধ্যে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ পাই।

কলকাতায় ফিরে খবর পেলুম, জনৈক বৈদ্যনাথ বিশ্বাস আমার খোঁজ-খবরের জন্য ছুটোছুটি করছেন। আমাকে তাঁর অত্যন্ত দরকার। কে তিনি আমি জানিনে, তবে তিনি তাঁর সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ির ঠিকানা রেখে গেছেন। আমি যেন ফিরেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। সুতরাং তাঁকে আমি চিঠি দিলুম।

একদিন দেখলুম একখানা মোটর গাড়ি এসে আমাদের গলির মুখে দাঁড়ালো এবং তার টুপিওলা ড্রাইভার আমাকে ডেকে নিয়ে তার গাড়িতে তুললো। গাড়িখানা দেখে ভাবলুম, দরিদ্র এক লেখক হিসেবে এর তলায় আমার চাপা পড়ার কথা ছিল, দৈবাৎ এর ভিতর চড়ে বসলুম। দামী গাড়িতে চড়ে যাবার কালে কোনও চেনা লোক আমাকে দেখলে বড়ই পুলকিত হই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই দুপুরে কারও চোখেই পড়লুম না। গাড়িখানা যখন বহুবাজারে এসে লালবাজারের দিকে যাচ্ছে, তখন একবারটি সন্দেহ হচ্ছিল, পুলিসে নিয়ে যাচ্ছে নাকি? কিন্তু প্রায় বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি গাড়িখানা বাঁ দিকে থামল, এবং ড্রাইভার আমাকে বলে দিল উল্টো দিকের তেতলা বাড়িতে উঠে যান, ওখানে দোতলার অপিসে আপনার জন্য ও'রা অপেক্ষা করে রয়েছেন। সামনেই সিঁড়ি। হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ অ্যাসুরেন্স লিঃ। ৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট। দক্ষিণ-মুখো বাড়িখানার দোতলায় উঠে গিয়ে দেখি মস্ত আপিস। সামনে বসে আছেন সৌম্যদর্শন প্রবীণ এক ভদ্রলোক, এপাশে আরেকজন যেমন-তেমন ব্যক্তি। ও'রা বুঝেই নিলেন আমি কে। যেমন-তেমন লোকটির নাম বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, আর ওই যিনি রাশভারী—ও'র নাম পূর্ণচন্দ্র রায়।

যথারীতি অভ্যর্থনার পর ও'রা বললেন, আমার পরিচালিত 'বিজলী' নিয়মিত পড়ে ও'রা খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত। এখানেই 'উপাসনা' মাসিক পত্রের আপিস। কিন্তু 'উপাসনা'র সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এখন আর নেই। সুতরাং আমি উপাসনায় যোগদান করতে পারি কিনা। দ্বিতীয়, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস আরেকখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করতে চান এবং আমি

তার সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিলে তিনি সুখী হবেন। আপাতত আমাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে।

ভেবে দেখলুম কল্লোল, কালি কলম, প্রগতি, ধূপছায়া—একে একে সব কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে। বিজলীরও ভরাডুবি ঘটল বারীনদার কল্যাণে। আমার তত্ত্বাবধানে দুন্দুভি নামক সাপ্তাহিকেরও ভরসা কম। নজরুল আমাকে পরিহাস করার জন্য 'দুন্দুভি' নামটা বিকৃত করে একটি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে। ও-কাগজে আমি 'শাদা চোখে' নাম দিয়ে সম্পাপকীয় লিখি—যেমন লিখতুম বিজলীতে। কিন্তু এবার আমি আর নিজের কথা ভাবব না। অনেক ভেবেচিন্তে আমি বললুম, আপনাদের প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি শুধু একটি শর্তে। আপনারা লেখকদের লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেবেন এবং তার পরিমাণ আমি স্থির করব। শুধু আমার নিজের লেখার জন্য আমি পারিশ্রমিক নেবো না। যদি রাজি থাকেন আমাকে নিয়োগপত্র দিন। ও'রা তখনই রাজি হলেন এবং আমাকে চিঠি দিলেন। ও'দের ইচ্ছা, সামনের বৈশাখেই যেন কাগজ বেরোয় এবং সেই মাসিক পত্রের নামকরণ আমিই যেন করে দিই।

আমি নাম রাখলুম 'স্বদেশ'।

কথাবার্তার পর বৈদ্যনাথবাবু আমাকে তেতলায় নিয়ে গেলেন তাঁর আপিসে। এটা মস্ত বড় একটা হল। একধারে আমার আপিস হবে, এবং আপাতত আমার সহকারী হবে দুজন। একজনের নাম ভোলানাথ বিশ্বাস, অন্যজন কি যেন—নাম ভুলে গেছি। এটি লক্ষ্য করলুম, মাইনে মাত্র পঞ্চাশ টাকা হলেও ও'রা আমাকে একটা উঁচু পজিশন দিতে চান।

কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়ালুম এটি তলিয়ে বুঝবার আগে একটির পর একটি ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল! দিন আষ্টেক পরে আবার এসে দেখি, আমার আপিস একেবারে সুসজ্জিত। লম্বা-চওড়া এক দেরাজওলা টেবিল, খান আষ্টেক চেয়ার, গোটা চারেক র‍্যাক, মস্ত দুটো কাঠের আলমারি, তার পাশে ছোট টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম, আমার বড় টেবিলের ওপর কাচের দোয়াতদান, পেতলের কয়েকটা পেপার-ওয়েট, অ্যাশ-ট্রে, চিঠিপত্রের জন্য কাঠের বাক্স, টেবলের পাশে মেঝেতে নতুন ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট, হাতের কাছে টেলিফোন,—এবং কী নেই? শুধু কি তাই? সবাই আমাকে দেখে একেবারে জোড়হাত! কাচের পার্টিশনের পাশে আমার সহকারী কৃষ্ণকান্ত ভোলানাথ আর সুধীর মিত্তির। একটা ছোকরা বেয়ারা হুকুমের অপেক্ষায় বশম্বদ। আমাকে আর প্রুফ দেখতে হবে না, ছাপাখানায় ছোটবার দরকার নেই, ধার দেনা নিয়ে অন্যলোক ভাববে, বিজ্ঞাপন আসবে অজস্র। আমি কেবল লেখা ও লেখকদের নিয়ে থাকব এবং কেবল হুকুম করে যাব। যখন খুশি চা, পান ও সিগারেটের অর্ডার দেবো। আমার মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, এবং আমার মুখের সামনে দামী টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে। বিজলীতে ছিলুম 'মধো', এখানে আমি 'মধুসূদন'।

এইখানে বসেই আমি স্থির করলুম, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, পরিচয়, বিচিত্রা, উদয়ন—এইসব মাসিক পত্রগুলির উপর আমি টেক্কা দেবো এবং বাঙলার প্রত্যেক আধুনিক লেখককে 'স্বদেশ'-এর সঙ্গে বেঁধে রাখব। যে লিখবে সেই পারিশ্রমিক পাবে। এবার থেকে কবিতার জন্য পারিশ্রমিক দেবো—যা নজরুল ছাড়া কেউ কোনদিন পায়নি! কল্লোল-কালি-কলমের পর নতুন,
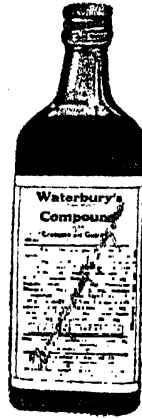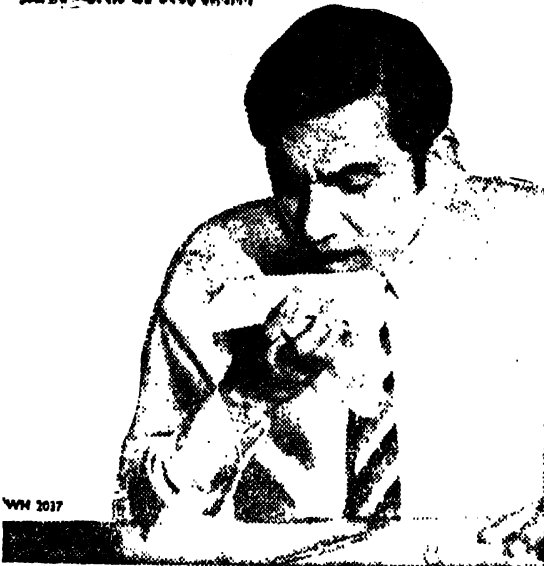
করে আবার দল বাঁধব, আবার নতুন এক গোষ্ঠী তৈরি করব। কাঠবিড়ালী হয়ে সাগর বাঁধব!

প্রগতির বুদ্ধদেব, কল্লোল-এর অচিন্ত্য, ধূপছায়ার পাঁচুগোপাল, প্রণব রায় আর সুনীল ধর, বঙ্গবাণীর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, লিবার্টির প্রমোদ সেন, সত্যেন বসু, নীহাররঞ্জন রায়, নতুন উঠতি লেখক মানিক —এদের সবাইকে ডাকলুম। হাতের তাস ছিল বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সজনী, উদ্ধব, মন্মথ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবদুল কাদের, বন্দে আলী মিঞা, শৈলজানন্দ, মহেন্দ্র রায় প্রভৃতি। রংয়ের গোলাম ছিল নজরুল। দেখি যদি রবি ঠাকুরের দু'একটা আশীর্বাদী কবিতা আনতে পারি। না, শরৎ চাটুয্যেকে বাগানো যাবে না। সেবার নলিনীকান্ত সরকারের মুখে শুনেছিলুম, কবে যেন তিনি শরৎবাবুকে চা খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েছিলেন। অতঃপর চেঁচামেচি হই-চই। অবশেষে জানলায় মুখ রেখে বাইরে থেকে নলিনীদা বললেন, দাদা, আমার কাগজটির জন্য একটি ছোটখাটো লেখা না লিখলে আপনার মুক্তি নেই। ওই ওখানে রয়েছে দোয়াত-কলম আর কাগজ, জানলা গলিয়ে চা দেবো যত খুশি খান।

শরৎবাবু একটা প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যাই হোক, 'স্বদেশ' নামক নতুন মাসিক পত্র বেরোচ্ছে এবং কুখ্যাত অতি-আধুনিক লেখকরা আবার জোট বেঁধে কাগজে যা খুশি লিখবে, এজন্য একটা সাড়া পড়ে গেল। আমি গেলুম আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন মজুমদার ও তাঁর সহকারী তরুণ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অরুণ মিত্রর কাছে। সত্যেনদা রক্ষণশীল সমাজমানের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন, এবং বিবেকানন্দ অতি আধুনিকদেরই একজন উদীয়মান কবি ও সাংবাদিক—সত্যেনদার উপযুক্ত সাকরেদ। অরুণ ছিল মিষ্ট মধুর প্রকৃতি এবং সত্যেনদার মানসপুত্রের মতো। তখনও পর্যন্ত সত্যেনদাকে নিয়ে সাংবাদিক মহলে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসিপরিহাস ছিল। ঘটনাটি বোধ হয় ১৯২৩ কি ২৪ খৃস্টাব্দের। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মফঃস্বলের এক রাজনীতিক সম্মেলনে গিয়েছেন। ফিরবার পথে ঘোড়ার গাড়িতে তিনি ফিরছিলেন। ওই গাড়িতেই উঠেছিলেন তৎকালীন মহিলা নারী সংস্কারক কুমারী সেনগুপ্তা। এই নিয়ে সত্যেন মজুমদার আনন্দবাজারে ঈষৎ পরিহাস করেছিলেন। সেই পরিহাস শ্রীমতী সেনগুপ্তা বরদাস্ত করেন নি। তিনি কলকাতায় ফিরে সোজা মির্জাপুর স্ট্রীটে আনন্দবাজার আপিসে গিয়ে সত্যেনদার গালে একটা না দুটো চড় বসিয়ে দেন। এ নিয়ে চারদিকে হই-চই পড়ে যায়।

অতঃপর একে একে গেলুম লিবার্টি, বঙ্গবাণী, নবশক্তি, অ্যাডভান্স ইত্যাদির আপিসে। এঁদের প্রত্যেকের সম্পাদকীয় দপ্তরে আমাদের বহু বন্ধুবান্ধব ছিলেন। সুতরাং 'স্বদেশ' পত্রিকার প্রচারকার্যের পক্ষে কোনও অসুবিধা ছিল না। আমি কোমর বেঁধে কাজে লেগেছিলুম।

আমার প্রাত্যহিক কর্মে কথাবার্তায় ও সহায়তায় তখন এসে পড়েছিল সাহিত্যবন্ধু ভবানী মুখোপাধ্যায়। সে বয়োকনিষ্ঠ, রেল আপিসের কর্মী, স্বভাবমধুর এবং সুখ-দুঃখের সহচর। তাকে সময় মতো না পেলে অনেক কাজই অসমাপ্ত থাকে। এরই মধ্যে একদিন 'স্বদেশ' আপিসে এসে একখানা চিঠি পেলাম লিখে রেখে গেছেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন, আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বিশেষ দরকার ছিল। আসছে কাল আবার আসব।

সেটা ১৯৩১ খৃস্টাব্দ। সেই প্রথম তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। তখন কলকাতায় কারও সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তার দুটো ছোটগল্প 'রাইকমল' বা 'রসকলি' আর 'হারানো সুর' সম্ভবত প্রচারিত কল্লোলে প্রকাশিত হবার পর থেকে সে নিরুদ্দেশ নয়। কলকাতায় সে কচিৎ কখনো আসে। এখানে তার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। লেখক হলে তাকে কেউ চেনে না। আর পাঁচজন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ,—শৈলজা ও প্রেমেন্দ্রর সমবয়সী। অনেকদিন পরে তারাশঙ্কর বাগবাজারে একটি ছোট্ট পুরনো বাড়ি ভাড়া করে এবং সেখানেই থাকতে আরম্ভ করে। অতঃপর সে একে একে সরোজ রায় চৌধুরী, করুণকুমার রায়, পবিত্র, শিবরাম ও সজনীকান্তর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। সজনী তার প্রতিষ্ঠালাভের জন্য অনেকটা সহায়তা করে। তারাশঙ্কর কতকটা নীতিপরায়ণ, আদর্শান্বেষী ও জাতীয়তাবাদে একনিষ্ঠ ছিল। আমাদের মতোই অভাব-অনটনে তার জীবন বিপর্যস্ত হত।

যাই হোক ফিরে আসি অন্য প্রসঙ্গে। ১৯৩১-এর এই বছরে ২৬ জানুয়ারী তারিখটি 'প্রথম বর্ষে' স্বাধীনতা দিবসরূপে পালন করার জন্য দেশব্যাপী আয়োজন চলছিল। সেদিন লক্ষ লক্ষ লোকের জনতায় সমগ্র এসপ্ল্যানেড কার্জন পার্ক হোয়াইটওয়েলেড-ল-র নিচের চৌমাথা মনুমেন্টের তলার মাঠ,—সমস্ত জনে ছায়। চারিদিকে ঘন ঘন আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছে বন্দে-মাতরম ধ্বনিতে। অহিংস রণসজ্জায় অগ্রসর হয়ে বাঙালী জাতি সেদিন কমিশনার টেগার্টের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর ১৪৪ ধারা ব্যূহ ভেদ করার জন্য এগিয়ে চলেছে। পুলিসের শত শত লাল পাগড়ি যেন শত শত রক্তবিন্দু। ওদের পাশে পাশে রয়েছে অগণিত সংখ্যক কালো কালো

কয়েদীর গাড়ি। অন্য দিকে কর্ডন করে রয়েছে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট—যাদের পিতামহ বা প্রপিতামহরা সেই নীলচাষের আমলে বাঙালী ঘরের বউ-ঝিদের গুণ্ডা লেলিয়ে ধরে নিয়ে যেত আপন আপন কুকর্মের জন্য। তাদেরই উদ্ভূত বংশীয়রা ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে এই সার্জেণ্ট বাহিনীর মধ্যে সাহেবী পোশাকে। চেয়ে দেখছিলুম, এই বিশাল রণক্ষেত্রের একদিকে রক্তমাখা খড়্গহস্তা মহাকরালীর সাধক বাঙালী আজ অহিংস, অন্যদিকে আপন সাম্রাজ্যরক্ষক সশস্ত্র বৃটিশরাজ। নাটকটা বিয়োগান্ত হবে কিনা এখনও ঠিক জানা যাচ্ছে না।

ঠিক এমনি সময়টায় শীতের সেই অপরাহ্ণে সহসা চারিদিক থেকে যেন মহাজীবনের এক মহারোল উঠল, বন্দে-মাতরম। কে যেন আসছে এক মহান নেতা এগিয়ে,—আসছে তার সঙ্গে সমগ্র মিলিটাণ্ট বাঙালী জাতি তার পিছু-পিছু। সে অপরাজেয়, সে সর্বভয় বাধাহীন, সে বিংশ শতাব্দীর বাঙলার দুরন্ত তারুণ্যের প্রতীক—সে আসছে, যার ভয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি থরথরিয়ে কাঁপে। কিন্তু তৎক্ষণ দিগদিগন্ত মুখরিত করে চিৎকার উঠেছে, 'সুভাষ বোস কি জয়।'

দেখতে দেখতে পুলিসের কঠিন ব্যূহ-ভেদ করলেন সুভাষচন্দ্র এবং ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পুলিস লাঠি চার্জ করল। পুলিস আগেই লাঠি বসালো ক্ষিতীশ-প্রসাদের ওপর। তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে লাঠির ঘা পড়ল সুভাষচন্দ্রের একখানা হাতের তালুতে—হাতখানা ফেটে গেল! সেই মুহূর্তে আমার নিত্যসঙ্গী সুধীন্দ্র নিয়োগী সুভাষচন্দ্রকে বাঁচাতে গিয়ে কপালের উপরে লাঠির আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ল এবং তার চশমাখানা ছিটকিয়ে কোথায় গেল। অবশেষে প্রবীণা মহিলা নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী সুভাষচন্দ্রকে যেন আপন সন্তানের মতো দুই হাত দিয়ে আগলিয়ে ধরলেন। টেগার্টের নির্দেশ ছিল, মেয়েছেলের উপর লাঠির ঘা না পড়ে—ওতে দেশী কাগজগুলো বড়ই ঝামেলা বাধায়।

সুভাষচন্দ্র ও ক্ষিতীশপ্রসাদকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিস ধরে নিয়ে যায় লাল-বাজারে। কিন্তু আতঙ্কিত পুলিস সেই দিনই সন্ধ্যায় ওঁদেরকে মুক্তি দেয়। সুধীন্দ্রকে সেই মাথাফাটা অবস্থায় কারা যেন হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার চৌদ্দ বছর পরে জন-বরেণ্যা নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে আমেরিকান মিলিটারী ট্রাকের ধাক্কায় আহত হয়ে মারা যান।

যাই হোক, সুভাষচন্দ্রের উপরে এই লাঠির আঘাত নিয়ে বাঙলায় এবং ভারতের সর্বত্র যখন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ধিক্কার চলছে, তখন কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলে শান্তশিষ্ট এক তরুণী গ্রাজুয়েটের মনে তার স্বভাব-বিরোধী এক প্রতিহিংসা সম্ভবত তাকে স্থির থাকতে দেয়নি। তখন বাঙলার গভর্নর স্যার স্টানলি জ্যাকসন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশন উপলক্ষে চান্সেলর হিসেবে সেনেট হলে উপস্থিত ছিলেন। হাসান সুহরাবর্দি তখন ভাইস-চ্যান্সেলর। এই সুযোগ! খুন-কে বদলা খুন! হঠাৎ পর পর পিস্তলের দুটি গুলী ছুটে গেল জ্যাকসনের দিকে। কিন্তু চিরনিরীহ মেয়েটির হাত বোধ হয় কেঁপে-ছিল—লক্ষ্যভ্রষ্ট হল! সুরাবর্দি সাহেব ছুটে গিয়ে জাপটিয়ে মেয়েটিকে ধরে ফেললেন।

আমার পক্ষে সেদিন অবিশ্বাস্য ছিল, এ মেয়েটি আমাদেরই সুপরিচিতা শ্রীমতী কল্যাণী দাসের কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বীণা দাস। বীণা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কিন্তু তখন অপর একটি ঘটনায় দেশ-বাসীর মন শোকাচ্ছন্ন। যে দুই বিরাট ব্যক্তিত্ব একদা উত্তর ভারতে গান্ধীজির নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করেছিল তাঁরা দু' জন হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। এঁরা দুজনেই ছিলেন অতুল বৈভবের অধিকারী এবং এঁদের ভোগবিলাসের নানা কাহিনী আমরা এক কালে শুনতুম। কিন্তু এঁরা উভয়েই দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য যথাসর্বস্ব দান করে পথে এসে দাঁড়ান। দেশবন্ধুর মৃত্যু ঘটে জুনে, ১৯২৫-এ। এবার পণ্ডিত মোতি-লালের মৃত্যু ঘটল ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১-এ।

'স্বদেশ'-এর প্রথম সংখ্যা বেরোল সগৌরবে। প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় নজরুলের কবিতা ছাপা হল। নাম, স্বদেশ। প্রত্যেক পৃষ্ঠা ওলটালেই একে একে পরিচিত নাম। কাগজের মোটা মলাট, লাল আর সবুজে ছাপা। সামনেই আমার নাম সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত। ইমিটেশন আর্ট পেপারে সমস্ত কাগজ ছাপা এবং লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির পৃথিবী-প্রসিদ্ধ একটি ছবি ইতালীয়ান আর্ট পেপারে খুব সুন্দরভাবে মুদ্রিত। এক মাসের মধ্যে এই কাগজের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হয়। বৈদ্যনাথ বিশ্বাস খরচপত্রের ব্যাপারে কিছুমাত্র কৃপণতা করেননি এবং প্রথম সংখ্যাটি দেখিয়ে তিনি প্রচুর বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি নিজে বীমা কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক।

লেখকদের তালিকায় যারা ছিল তাদের অনেকেই পারিশ্রমিক পেল। যেমন বুদ্ধদেব বসু। সে একটি ধারাবাহিক লেখা আরম্ভ করল। নাম দিল, 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে।' তার লেখার প্রচুর নাম হল। প্রেমেন লিখল তিনটে কবিতা, মজুরি পেল পনেরো টাকা। তার সাহিত্য জীবনে সেই প্রথম কবিতার জন্য পারিশ্রমিক পেল! 'স্বদেশ' সম্বন্ধে তার উৎসাহ এখন প্রচুর এবং সে এখন এখানে প্রায়ই আসে! গ্রন্থ-সমালোচনা লেখবার জন্য সে ছদ্মনাম নিয়েছে 'কৃত্তিবাস ভদ্র।' অচিন্ত্য নাম নিয়েছে 'অভিনব গুপ্ত।' আমি নিজে কিছুদিন থেকে 'কীর্তনীয়া'—এই ছদ্মনামে লিখছি নানা কাগজে। স্বদেশেও ওই নামে কিছু কিছু লিখতে আরম্ভ করলুম। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ওই ছদ্মনামে একটি প্রবন্ধ লিখে-ছিলুম কোন কাগজে যেন। সেটির রচনা-ভঙ্গীতে বোধ হয় কিছু নতুনত্ব ছিল, তাই তিন-চারটি কাগজে ওটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং একই 'মুরগি' বার বার 'জবাই' করার ফলে বেশ কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটে।

যাই হোক, এই সময়ে আমার কিছু খ্যাতি বেড়ে উঠেছিল নানা লোকের কথায় কথায়। আমি তার সুযোগ নিয়েছিলুম। একদিন হঠাৎ গিয়ে গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্সের দোকানে ঢুকলুম। অতি বৃহদাকার ওদের প্রতিষ্ঠান। ওদের ওই অট্টালিকার নিচের তলাকার দক্ষিণ-পূর্বাংশটা হল ছাপাখানা। ওঁরা তখন কলকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য প্রকাশক এবং শরৎচন্দ্রের বই ছাড়া পরবর্তীকালের কোনও লেখকের বই ওঁরা অদ্যাবধি বিশেষ ছাপেননি। ডি-এল-রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারত-

নিয়ে 'পুণ্যাশ্রম' হল। শ্রীমতী শোভার ডাক নাম ছিল পুনি, পুনু, পুণ্যা! আমি ঠিক জানিনে ওই পুনির থেকেই 'পুণ্যাশ্রম' নামটি এসেছিল কিনা, অথবা যে পাঁচশ-টি মেয়ে এখানে আশ্রয় পেয়েছিল তারা সবাই পুণ্যবতী ছিল কিনা। কিন্তু এখন ওটার বিশেষ দরকার হয়েছিল। এসব মেয়ে তাদের বাপ, দাদা বা স্বামীর অবাধ্য হয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছিল, মফঃস্বল থেকে এসে দুরবস্থায় পড়েছিল, যাদের সতীত্ব বা কৌমার্য সম্বন্ধে অভিভাবকদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, যারা স্বামী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল, বাড়িতে ঝগড়া করে বেরিয়ে পড়েছিল, বাড়ির সম্মতি না পেয়ে যারা গা ঢাকা দিয়েছিল, অথবা জেল থেকে বেরিয়ে আর ঘরে ফিরতে চাইছিল না, তাদের উপায়? কোথা যাবে তারা? কে তাদের খাওয়া-পরা যোগাবে? কে তাদের আগলিয়ে রাখবে? এসব নিয়ে মেয়েমহলে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

শ্রীমতী শোভা আমাকে ঘন ঘন 'পুণ্যাশ্রম'-এর দিকে যেতে দেন না। তাঁর ধারণা, আমি অতিশয় চরিত্রবান, স্বভাব সংযত ও বিশুদ্ধচিত্ত। ওই মেয়েমহলের ঘন নিগূঢ় মেয়েলি গন্ধে যদি আমার নেশা লাগে, এই ছিল তাঁর ভয়। তিনি প্রিয়াকে বরং আমার সঙ্গে দিতে চান। প্রিয়া মানে বিষ্ণুপ্রিয়া—চাঁদবংশীকন্যা স্বাস্থ্যবতী বাইশ বছরের [illegible] বিধবা যুবতী। কিন্তু আমি যে প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারি, সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাঁর বিশ্বাস, প্রিয়ার মতো চরিত্রবতী মেয়ে ভূভারতে নেই। আমি সংগোপনে প্রিয়াকে বোধ হয় বলেছিলুম, ওঁর এই বিশ্বাস যেন অটুট থাকে!

শ্রীমতী শোভা তাঁদের পুণ্যাশ্রমের জন্য আমার কাছে একদিন হাত পাতলেন। সুতরাং আমি দিন তিনেক ধরে সাত হাত মাটি খুঁড়ে মোট একশ' টাকা এনে তাঁর হাতে দিলুম। টাকাটা তিনি এমনভাবেই নিলেন যেন এ তাঁর প্রাপ্য। না ধন্যবাদ, না দুটো মিষ্টি কথা, না বা কিছু। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর অঞ্জলি মেলালে আমি সমস্ত প্রদান করতে পারতুম! আমার ছোটবেলায় সেই যে সবাই আমাকে 'রামখোকা' বলত, তার থেকে আমার কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি! আমার মুশকিল ছিল এই যে, এ বাড়িতে পদার্পণ করলেই আমি সব ভুলে যেতুম। আমার লোভ আছে, মোহ আছে, প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আছে, বয়সোচিত যৌনচেতনা আছে, অথবা নারীদেহের প্রতি আসক্তি আছে, এ সমস্তই এক-প্রকার ভুলে যেতুম! এ যেন আমি নিজের বাড়িতেই ঢুকেছি! এ বাড়ির প্রতি ঘরেই বয়স্থা তরুণী যুবতী বালিকা—বহু, রয়েছে ছড়িয়ে, এবং আমি তাদের সকলের প্রকৃতই অন্তরঙ্গ, কোথাও শাসন বা বাঁধন নেই—কিন্তু আমি হয়ে যেতুম অন্য মানুষ! শুনেছি যারা দুর্গাপুজো করে, তারা সকল উপকরণের সঙ্গে বেশ্যাবাড়ির দরজা থেকে ধুলোমাটি তুলে এনে পুজোর বেদীতে দেয়, কারণ পুরুষ তার সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তা এবং তার সকল সদ্গুণগুলি, বেশ্যাবাড়ির দরজার বাইরে রেখে তবে ভিতরে ঢোকে! ওই সদ্গুণগুলি পরিত্যক্ত থাকে বলেই বেশ্যার দরজার ধুলোমাটি অত পবিত্র! আমার পক্ষে এ তত্ত্ব একদম খাটে না, আমি এর বিপরীত! এ বাড়িতে আমি এসে যখন ঢুকি, তার আগে পথে পড়ে থাকে আমার সমস্ত অসৎ চিন্তা, অসংযম, লোভ, লালসা, ও কদর্য প্রবৃত্তি। ভিতরে আসি আমি অন্য মানুষ! আমি আসি যেন [illegible] অগ্নিকুণ্ড পেরিয়ে। আমি নিজের মধ্যে [illegible] যেমন যেন চন্দনগন্ধী [illegible]। আমি যেন সেই মাদক গন্ধেই আত্মহারা হতুম!

আমার দ্বিতীয় কাজ এ বাড়ির [illegible]-ঠাকরাণী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের [illegible] একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করা। [illegible] 'আনন্দমঠ'। এই আনন্দমঠের জন্য শ্রীমতী শোভা একটি ঘরভাড়া নিয়েছেন ভবানীপুরে ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড ধরেই বাঁ-হাতি একটি বাড়ির দোতলায়। ঘরটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। সিঁড়ি ভিতরের দিকে। আমাদের উদ্দেশ্য, সামনের দিকে একটি পাঠাগার—সেখানে থাকবে নানা রকমের বই এবং পড়াশুনোর সুবিধা। দুখানা আলমারি দিয়ে পার্টিশান করা হবে। ভিতরের দিকে থাকবে শুধু একখানা বড় তক্তাপোশ, সেখানে আনন্দমঠের 'সন্তানরা' অর্থাৎ বিপ্লবীরা গোপনে এসে মিলিত হবে। এই আইডিয়াটা পাওয়া গিয়েছিল 'সিমলা ব্যায়াম সমিতির' কল্যাণে। সামনের দিকে বাৎসরিক বারোয়ারি দুর্গাপুজো, ভিতর দিকে সকল দলের বিপ্লবীদের বাৎসরিক সংগোপন সম্মেলন!

পাছে আনন্দমঠের উদ্বোধন অনুষ্ঠান গোয়েন্দা পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেজন্য আমরা স্থির করলুম এর উদ্বোধন করা হবে হাজরা রোডের বাড়িরই নিচের তলায়। এখানে উঠোন ছিল প্রশস্ত যেটি সমাবেশের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। আমি নিজে গিয়ে কাজী নজরুল, নলিনীকান্ত সরকার এবং কাকে কাকে যেন নিমন্ত্রণ করে এলুম। আমাদের মূল উদ্দেশ্য যে পাঠাগার নয়, এটি [illegible] মধ্যে সকলের কাছেই চেপে রাখতে হল। এটি একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজসেবা কেন্দ্র—এইটেই প্রচারিত থাক। নলিনীদা ও নজরুল আমাকে অবিশ্বাস করেননি।

আগের দিন রাত জেগে আমি সভা-নেত্রীর অভিভাষণটি লিখে প্রস্তুত করলুম। [illegible] এটি লাবণ্যপ্রভার ছবি সহ 'স্বদেশ'-এর আগামী সংখ্যায় আমি প্রকাশ করব।

'আনন্দমঠ'-এর উদ্বোধনের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেরকে আনিয়েছিলাম; দক্ষিণ কলিকাতার বহু নেত্রী-স্থানীয়া মহিলা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীত গাইল নজরুল তার [illegible] কণ্ঠে। এই উপলক্ষে সে একটি গান রচনা করেছিল, 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা, জাগো [illegible]—' ইত্যাদি। অনুষ্ঠানটি সর্বাংশে সফল হয়েছিল এবং সকল সংবাদপত্রে বিবরণী ছাপা হয়েছিল [illegible] সংবাদপত্রে। লাবণ্যপ্রভা দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতমা নেত্রী হিসাবে সেই প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

আমি নিজে ভারবাহী পশু। [illegible] হাসপাতালের পাশে [illegible] বাড়ি থেকে ভবানীপুরের দেবেন্দ্র ঘোষ রোডের বাড়ি [illegible]। আমি সেই নতুন পথে [illegible] সঙ্গে ঠেলাগাড়ি করে [illegible] বই—ইংরেজী [illegible] আমার যা কিছু বাংলা আর ইংরেজী সংগ্রহ, যা কিছু প্রাচীন আর নবীন—সব এনে জড়ো করে দিলুম 'আনন্দমঠে'র পাঠাগারে সেই মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণকমলে।

(ক্রমশ)

বনস্পতি বিভ্রাট

পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে শ্রীমতী 'ক' আসতেন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে। তাঁর কাজ ছিল বড় এক কোম্পানীর জমা গোদুগ্ধের প্রচার ও প্রসার। দ্বারে দ্বারে ঘরনীদের মাঝে মন বুঝে মাহাত্ম্য বোঝানো হাত-কলমে প্রদর্শন ইত্যাদি করতেন তিনি ওঁকে আমার খুব ভাল লাগতো। সে-যুগে এমন মহিলা বেশি ছিলেন না। তাঁর প্রথম চাকরির গল্প বলেছিলেন। এক বনস্পতি কোম্পানীর ক্যানভাসার হিসাবে ঘরে ঘরে ঘুরতেন। রক্ষণশীল সংসারে প্রবীণারা তাঁকে অতিশয় সন্দেহের চোখে দেখতেন নবীনাদের তবু যা কিছু কৌতূহল ও ঔৎসুক্য হতো, কিন্তু বয়স্করা ভাবতেন ছলে-কৌশলে শ্রীমতী 'ক' তাঁদের অন্দরে ম্লেচ্ছাচার চালাবার চেষ্টায় আছেন এ হলো ভারতবর্ষে প্রথম বনস্পতির পদক্ষেপ!

বনস্পতির অভিধানগত অর্থ যাই হোক এখন তার চলতি অর্থ দাঁড়িয়েছে উদ্ভিজ তেল। উদ্ভিজ তেল অবশ্য সরষে তেলকেও বলা যায়, কিন্তু সাধারণ ভাষায় আমরা সরষের তেলকে বনস্পতি বলি না। Hydrogenated উদ্ভিজ স্নেহকেই বিশেষ করে বনস্পতি আখ্যা দেওয়া হয়। গত এপ্রিল মাস থেকে হাইড্রোজেনেরেটেড বা উদজান মিশ্রিত তেল এবং যে তেলে উদজান মিশ্রিত হয়নি, তাও হঠাৎ বাজারে তুফান তুলেছে। এবার যে সরষের ফলন শীর্ষে উঠেছে তা সত্ত্বেও বাজারে তার অতি প্রাচুর্য নেই এবং দামও বিন্দুমাত্র ভরসা-দায়ক নয়। চাল, আটা, মাছ তরকারী—সব ভাবনার উপরে তেলের ভাবনা গৃহিণীকে বিপর্যস্ত করছে।

এ অভাবের কারণ কি? কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী বৈঠক ডেকেছেন। বনস্পতি উৎপাদকরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন কি করে দাম কমানো যায়, কি করে বাজারে "উধাও হওয়া" ব্যাপারটি আটকানো যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কারণগুলি প্রায় সকলেরই এখন জানা। ব্যবসায়ীরা বলেছেন, সময় মত আমদানী-করা উদ্ভিজ্জ তেল তাঁদের হস্তগত করার সুব্যবস্থা সরকার করেন নি। খরার দরুন গুজরাত, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদিতে

প্যাচ ওয়ার্ক বা তালি-শিল্পের নিদর্শন

চিনা বাদামের ফলন তেমন হয়নি। অতি প্রচুর তুলোর ফসল হওয়া সত্ত্বেও তুলোর বীজ, যা থেকে তেল হয়, তার দাম নামেনি। তার উপর বিজলীর অভাব, কয়লার অভাব ইত্যাদি লেগে আছে। দেশে প্রায় ৫০,০০০ টন বনস্পতির স্থানে মে মাসে ২৬০০০ টন হয়েছে। এখন আশা করা যায় নানাভাবে আমদানী করা সত্ত্বেও ৪০০০০ টনের বেশি বনস্পতি বাজারে আসবে না। কাজেই ঘরনীদের ভাবনার উপশমও হবে বলে মনে হয় না।

বছর ত্রিশেক আগে যে বনস্পতি ভারতীয় গৃহস্থ অনাদরে অস্বীকার করতে চেয়েছিল, তা-ই মহীরূহের মত শিকড় গজিয়ে সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে। সে শিকড়ের কোথাও ঘুণ ধরলে ঘাবড়াবারই কথা। বাংলাদেশে সরষের তেল অথবা দক্ষিণ দেশে তিলের তেল এরকম ব্যতিক্রম বাদে, বনস্পতির অখণ্ড প্রতাপ। আমরাও লুচি, কচুরি, মেঠাই সমস্ততেই বনস্পতি ব্যবহার করি। খাদ্য তেল হিসবে খাঁটি সরষের তেল অতি উত্তম। খুব গরম করে চপ, কাটলেট ভাজলে কোন গন্ধ থাকে না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান রিফাইন করা গন্ধ বিহীন সরষের তেল বাজারে দেবার চেষ্টাও করছেন। দামও তথাকথিত বনস্পতির চেয়ে এখনও অনেকটা কম। আর একটি উত্তম পথ গৃহিণীরা ধরতে পারেন। খাদ্য তেলের ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার পথ প্রশস্ত করা। ভাজা-ভুজি পাঁচটা ছটা অথবা মেঠাই, লুচি ইত্যাদি কম খাওয়াতে অপকার হবে না।

প্যাচ্ ওয়ার্ক বা তালি-শিল্প

তাকিয়া, কুশন, গির্দা ইত্যাদিতে Patch Work অর্থাৎ তালি দিয়ে রূপ ও রঙের মিশ্রণ সৃষ্টি করলে নূতন করে

আপনার গৃহসজ্জা ঝলমল করবে। Patch work নাকি উত্তর আমেরিকায় প্রথম ইউরোপীয় উপনিবেশের দান। তখন প্রথম প্রবাসীরা অনেক কষ্ট ও অভাবের সম্মুখীন হয়ে কঠোর পরিশ্রমে তাঁদের সচ্ছল জীবনের পত্তন করেছিলেন। মেয়েরাও অনেক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। কাপড় যথেষ্ট পেতেন না বলে ছোট্ট ছোট্ট কুচি যা জড়ো হতো তাই দিয়ে তৈরি করতেন বিছানা-ঢাকা, বালিশের খোল লেপ ইত্যাদি। তালি-শিল্প স্বীকৃতি পেল। অবশ্য নানাভাবে তালি দিয়ে রূপ রচনা আমাদের দেশেও ছিল। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের সূচিশিল্প নানা রং-এর কাপড়ের টুকরো একত্র করে নকশা রচনা করার পদ্ধতি বহুকাল ধরে চলে আসছে। লোকশিল্পের নানা ধারায় বিশেষ করে রঙ্গীন টুকরোর বাহার মেলে। আধুনিক applique বা পট্টি লাগানোর ব্যবস্থাও তালি-শিল্পেরই রকম ফের।

তালি-শিল্প রচনায় ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কখনও বা নমুনা বা নকশাদার কাপড়ের কারুকার্য হিসাব করে টুকরো কেটে পছন্দ মত রেখা হিসাব করে অন্য কাপড়ে তালি দেওয়া হয়, আবার কখনও বা ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ইত্যাদি টুকরো কেটে নমুনা রচনা করা যায়। আপনার গৃহাভ্যন্তরের সঙ্গে মানানসই ভাবে রং ও নকশা মিশে যাওয়া দরকার। প্যাচ ওয়ার্ক খুলবে সাদা মাঠা পটভূমিকায়। তালি-শিল্পের উজ্জ্বলতা এবং বর্ণাঢ্যতা জাঁকালো পটভূমিকায় বিপন্নতা করবে। নানা বিপরীত নকশা, রং ইত্যাদির সংমিশ্রণ প্যাচ ওয়ার্ককে দুর্মুখ করে বলে চারদিকে তার বর্ণবৈচিত্র্যকে আঘাত দেয়—এমন পরিবেশ না থাকলেই ভাল।

খুব সাধারণ জিনিসের উপর তালি-শিল্পের সৌন্দর্য দেখে অনেক সময় অবাক হয়ে গেছি। পাট দিয়ে তৈরি সাধারণ চটে চমৎকার পরদা তৈরী করা যায়। তার উপর পুরনো কাপড় হ'ক বা ব্লক ছাপা নকশা হ'ক, বেশ কের তালি দিয়ে ভালভাবে ইস্ত্রি করে টানিয়ে দেবেন—চমৎকার দেখাবে। কিনারগুলি অর্থাৎ চার পাশ তালির যেটি মুখ্য রং সেই রং-এর কাপড় দিয়ে মুড়ে দিলে আরও ভাল দেখাবে। যেমন ধরুন, যদি টুকটুকে লাল হয় তালির টুকরোর আসল রং, তবে ঐ রকম রং দিয়ে চারপাশ পট্টি-মুড়ে দেবেন। ভাল অবস্থায় আছে এমন কাপড়ের পাড় হলেও চলে।

সেলাই করার সময় তালির টুকরোগুলিও যত্ন করে ইস্ত্রি করে নেবেন। কাগজের ঐ মাপের টুকরো কেটে যে জিনিসে তালি লাগাবেন তাতে সেলাই করুন। তার চারপাশে লাইন টেনে নমুনার পরিলেখ এঁকে নিন। পরিলেখে টুকরো সেলাই করবেন। সেলাই সম্বন্ধেও রচয়িত্রীর পছন্দ মত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। রঙ্গীন সুতোর মানানসই ফোঁড় তালিকে দেবে প্রাণ। ঘন বুনটের মসৃণ কাপড় তালি, এবং তালি যাতে লাগানো হবে দুয়ের জন্যই দরকার।

টুকিটাকি

আসবাবপত্রে, বিশেষ করে আবরণ দেওয়া আসবাবে দাগ হলে যত শীঘ্র সম্ভব দাগ তুলে ফেলবার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তাতে দাগ সহজে উঠবে এবং স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

প্রথমেই দেখবেন দাগ কি জাতীয় এবং আবরণ কি কাপড়ের। কাপড়ের রং পাকা কিনা পরীক্ষা করতে, দেখা যায় না এমন একটি কোণা ভিজিয়ে দেখবেন।

যে দাগ তেলাক্ত নয় তা তোলা সহজ। ঠাণ্ডা হলে কাপড় ভিজিয়ে নিঙড়ে নিয়ে আস্তে চেপে চেপে পরিষ্কার করবেন। যদি দাগ তেলাক্ত হয় তবে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ব্যবহার করবেন। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড জানলা দরজা খুলে রেখে লাগাবেন। এর ধোঁয়া বিষাক্ত হতে পারে।

চামড়া-ঢাকা আসবাবে অর্ধেক ভিনিগার এবং অর্ধেক ঈষদুষ্ণ জল মিশিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে ভিজিয়ে ব্যবহার করবেন। বল পয়েন্ট পেনসিলের দাগ মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়ে প্রথমটা ঘষে নেবেন। তারপর আলতোভাবে ধুয়ে ফেলবেন।

পালিশ করা আসবাবে গরম জিনিসের দাগ অথবা জলের দাগ তিসির তেল ও তার্পিন তেল একত্র করে তাতে নরম কাপড় ডুবিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে ঘষলে উপকার হবে। এক অংশ তিসির তেল এবং এক চতুর্থাংশ পরিমাণ তার্পিন তেল মিশ্রণ হবে। দরকার বোধ করলে এই মিশ্রণ মাখিয়ে রাত্রে রেখে দেবেন। সকালে পালিশ করে ফেলবেন। বাড়তি মিশ্রণটুকু বোতলে ভরে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য রেখে দেবেন।

কাঠের আসবাবে আঁচড়ের দাগ হলে তিসির তেলে পশমী ফ্ল্যানেলের টুকরো ভিজিয়ে ঐ দাগের উপর চেপে দিয়ে দুতিন ঘণ্টা রেখে দিন। এবার ফ্ল্যানেলের টুকরো ভিজিয়ে ঐ দাগের উপর চেপে দিয়ে দুতিন ঘণ্টা রেখে দিন। এবার ফ্ল্যানেল সরিয়ে মোম পালিশ দিয়ে পালিশ করুন। আবার কিছুক্ষণ রেখে হাল্কা হাতে ঝেড়ে ফেলে দেখবেন, দাগ প্রায় মিলিয়ে গেছে।

শ্রীমতী

শিল্পী-পত্নী

স্বকীয় শিল্পনৈপুণ্যের মাধুর্যে বাঙলার ললিতকলা চর্চার ইতিহাসকে যাঁরা সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁদের অন্যতম শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় চুয়ান্ন বছর বয়সে শিল্পী হেমেন্দ্রনাথের পরলোকগমন।

হেমেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী সুধারানী দেবী দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৮ জুন প্রায় একাত্তর বছর বয়সে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সুধারানী দেবীর পরলোকগমনের পর আজ জানা গেল হেমেন্দ্রনাথ রচিত যে চিত্রের আকর্ষণে এক সময়ে কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশ্মীর, পাতিয়ালা, জয়পুর, কোটা, ময়ূরভঞ্জের যে কলা-রসিকেরা উদ্বেল হয়েছিলেন সে চিত্র-সম্ভারের অনুপ্রাণনার মূলে তাঁরই অর্ধা-ঙ্গিনী সুধারানী দেবী। অলোকসুন্দর লালিত্য আর লাবণ্যের অধিকারিণী সুধা-রানী দেবীর রূপ আর দেহ-ভঙ্গিমাকে অবলম্বন করেই হেমেন্দ্রনাথের বঙ্গললনার গার্হস্থ্য জীবনের নানা মুহূর্তের চিত্রায়ণ।

শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী হবার সব যোগ্যতা দিয়েই বিধাতা সুধারানী দেবীকে হেমেন্দ্রনাথের সংসারে পাঠিয়েছিলেন। সংস্কার-স্রোতের গতানুগতিক ধারায় মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে হেমেন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মূর্তিমতী অনুপ্রেরণা হয়ে।

হেমেন্দ্রনাথ প্রচণ্ড দেহবাদী এবং যৌবনের শিল্পী রূপেই তাঁর খ্যাতি। কারণ, তাঁর রচিত অধিকাংশ 'সাবজেক্ট পেন্টিং' নারীদেহাশ্রিত। তাঁর নীলাম্বরী, স্নানান্তে, পল্লীপ্রাণ, মানসকমল, বুকের ঢেউ প্রভৃতি চিত্রের নায়িকা তাঁরই সহধর্মিণী।

যে যুগে রক্ষণশীলতার শৃঙ্খলে গৃহ-বধূর জীবন পায়ে পায়ে বাঁধা ছিল সে যুগে সুধারানী দেবী সামাজিক অনুশাসনের অচলায়তন অতিক্রম করে স্বামীর চারুকলা চর্চার সঙ্গী হয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে সত্যিই তিনি শিল্পীর সহধর্মিণী।

সদালাপী, ধর্মভীরু সুধারানী দেবীর পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হারালাম চারুকলা চর্চায় উৎসর্গিতপ্রাণ এক কৃতবিদ্য শিল্পীর সর্বার্থসাধিকা জীবন-সঙ্গিনীকেও।

—কমল সরকার

সনাতন ঐতিহ্যের ঝলক
পরম্পরাগত 'ঘাঘরা' আর 'দুপট্টা'র অনন্য আকর্ষণ এখন
মফতলাল-এর 'মেক্রিন' ড্রেস মেটিরিয়ালে হয়ে উঠেছে অভিনব সুন্দর।
পলিয়েস্টার ও কটনের অদ্বিতীয় মিশ্রণে তৈরী 'মেক্রিন'
অতীতের স্বপ্নকে আধুনিক ফ্যাশানের অনুকূল রঙ, ডিজাইন ও বুননির
অনবদ্য রূপ ও রেখায় মূর্ত ক'রে তুলেছে!
মফতলাল
গ্রুপ-এর
অনুপম কাপড়
মেক্রিন
পলিয়েস্টার শাড়ী ও
ড্রেস মেটিরিয়াল

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৭১ ॥

হিরোসিমায় যেদিন অ্যাটম বোমা পড়ে, সেদিনও পৃথিবীতে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছিল, প্রায় এক লক্ষ নারী পুরুষ বিয়ে করেছিল এবং অন্তত একশো কোটি লোক নিছক আহার্য সন্ধান ছাড়া আর কোনো কিছু চিন্তাই করেনি। অন্যান্য দিনের মতন সেদিনও যথারীতি সারা পৃথিবী জুড়ে বেশ কিছু নারী পুরুষ আত্মহত্যা করেছে। সেই দিন সেই সময়ে ভাটপাড়ায় এক ভদ্রলোক সনাতন হিন্দু ধর্মকে বাঁচাবার জন্য দারুন উত্তেজিত, নারায়গঞ্জে তখন ইসলাম বিপন্ন বলে ছোট একটি সভা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই আসামের হাফলং-এ প্রত্যন্ত পাহাড় থেকে আসা এক কাছাড়ী আদিবাসী সদ্য খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে জীবনে প্রথম এক টুকরো পাঁউরুটি খেতে পেল এবং হ্যাবাচ্যাকা হয়ে কেঁদে ফেললো। সেই-দিনই দুপুরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা রাজ্যে এক তুলো ক্ষেতে দু-দল খৃস্টান নিছক দুরকম গায়ের রঙের জন্য দাঙ্গা করেছিল।

পৃথিবীতে মানুষের কোনো চরিত্র নেই। প্রত্যেক জন্তু জানোয়ারের চরিত্র থাকে, মানুষ জাতিই শুধু চরিত্রহীন। স্পেনে গত তিনশো বছর ধরে যে ষাঁড়ের মঞ্চে লড়াই খেলা হচ্ছে, তাতে এত-দিনের মধ্যে একটা ষাঁড়ও সোজা ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ ডান দিকে বা বাঁ দিকে বেঁকেনি। মানুষ এরকম নয়। মানুষ কখন কোনদিকে বেঁকবে তা সে নিজেও জানে না। সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে একদল লোক বাঘের পেটে প্রাণ দেয়। আবার একদল লোক সারা পৃথিবীর বাঘ সম্পদ বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমিতি গড়ে। একজন সন্ন্যাসীর হঠাৎ পদস্খলন হয়ে যায়। একজন ডাকাত হঠাৎ কবি হয়ে ওঠে।

মানুষের সুখেরও কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। একদল লোক সারা দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত। ভবিষ্যতের এক সুস্থ সমৃদ্ধ মানবসমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। অবশ্য সেই সমাজের নিয়ন্ত্রণ-ভার তাদেরই হাতে থাকা চাই। আবার একদল লোক খাদ্যশস্য গোপন গুদামে মজুত রেখে হাজার হাজার লোককে না খাইয়ে মারে। দু দলই সুখের সন্ধানী। মন্দিরের দেয়ালে সূক্ষ্ম কারুকার্য সৃষ্টি করায় কারুর আনন্দ, কারুর আনন্দ সেই মন্দির ভাঙায়। কেউ একটি নারীর সামান্য সম্মতি পাবার জন্য পাগল হয়, কেউ টাকা দিয়ে নারীকে কিনে আনে।

সকাল বেলা শুয়ে শুয়ে আমি এই সব কথা ভাবছিলাম। নিতান্তই অলস চিন্তা। এসব চিন্তারও কোনো মূল্য নেই। পৃথিবী আপন খেয়ালে চলবে। আমার এখন কোনো কাজ নেই বলে আমি যা খুশী আবোল তাবোল ভাবতে পারি। দিবাস্বপ্ন দেখতেও কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু একটু বাদে আমার খিদে পেলে আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ আমার খুব পেট ব্যথা করে। তখন আমি যন্ত্রণায় চারদিক অন্ধকার দেখি। সেই সময় পৃথিবীর আর কোনো সমস্যাই আমার কাছে সমস্যা নয়। তখন পৃথিবীটা উচ্ছন্নে যায় যাক্।

মেঘলা মেঘলা দিন, বিছানা ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছে করছে না। খবরের কাগজে চোখ বুলোনো হয়ে গেছে। খানিকটা আগে এক কাপ চা খেয়েছি বটে, কিন্তু জলখাবার খেতে হলে আমাকে উদ্যোগী হতে হবে। এখনো খিদে পায়নি। আর এক কাপ চা খেতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু মায়ের কাছে চা চাইলেই মা বিছানা ছেড়ে ওঠবার জন্য তাড়া দেবে। মার চোখে আমি কুঁড়েদের বাদশা। তার থেকে চুপচাপ থাকাই ভালো। এখনো আমার বিছানা ছেড়ে না ওঠা কেউ লক্ষ্যই করেনি।

আজ সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকলে কেমন হয়? কিছুই তো করার নেই। কোথাও যাবার নেই। এম এ ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। তাছাড়া এম এ পড়া হবে কিনা তারও ঠিক নেই। ওসব আর এখন ভাবতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে শুয়ে থাকা কত ভালো। অসুখ না হলেও কি কেউ সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না!

কিন্তু একবারে চুপচাপ শুয়ে থাকাও সম্ভব নয়। কিছু না কিছু চিন্তা করতেই হয়। জাগ্রত অবস্থায়, কোনো কিছু চিন্তা না করে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তভাব কি কেউ পেতে পারে? আসলে আমি লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে আছি বলেই বিছানায় মুখ গুঁজে আছি। চিন্তার হাত থেকেও মুক্তি চাইছি।

শিয়রের কাছে লাল রঙের মলাট বাঁধানো আমার কবিতার খাতা। হঠাৎ সেটার দিকে তাকিয়ে আমার রাগ হয়ে গেল। ঠেলা দিয়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। পরে ওটাকে ছাই গাদায় ফেলে দিতে হবে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে। কবিতা টবিতা আর লিখবো না। কিছুই লিখবো না।

এতক্ষণে পার্টি অফিসে অনেকে এসে গেছে। মুড়ি আর তেলেভাজা খেতে খেতে নিশ্চয়ই দারুণ আড্ডা জমেছে। কেউ কি একবারও বলবে, বাদল কদিন ধরে আসছে না কেন? কেউ বলবে না। পার্টির ডিসিপ্লিন দারুণ কড়া। মন্টুর সঙ্গে আমার এত বন্ধুত্ব ছিল, মন্টুও কাল সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথা বললো। আমি কি এমন দোষটা করেছি? আদিনাথদার সঙ্গে তর্ক করেছি। তর্ক করাটাও দোষের? যেটা আমি বুঝতে পারছি না, সেটা আমাকে বুঝে নিতে হবে না? বিনা প্রশ্নে চুপচাপ সব মেনে নিলেই কি সত্যিকারের মেনে নেওয়া হয়?

আমার এখন ছুটি, এই সময় আমি পার্টির অনেক কাজ করতে পারতাম। কয়েকজনকে হায়দ্রাবাদ - তেলেঙ্গানায় পাঠানো হচ্ছে, আমিও তাদের দলে যেতে রাজি ছিলাম। কিন্তু আদিনাথদার মতে আমি এখনো যথেষ্ট তৈরী হইনি। আমার মধ্যে এখনো অনেক পেটি বুর্জোয়া সেণ্টিমেণ্ট রয়ে গেছে। আমাকে পার্টি মেম্বারশিপ দেবার এখনো সময় আসেনি। আমি আদিনাথদাকে খুশী করার অনেক চেষ্টা করেছি। তবু আদিনাথদার মন পেলাম না।

ব্যাপারটা হয়েছিল দু' সপ্তাহ আগে। রাজবল্লভপাড়ার একটা বাড়িতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা গল্প পড়ার কথা ছিল। ও'র শরীর অসুস্থ বলে উনি আসতে পারলেন না। তখন আমাদেরই কয়েকজন নিজেদের লেখা পড়লো। আমাকেও একটা কবিতা পড়তে বলা হয়েছিল। আমি কিছুতেই রাজি হইনি। লোকজনের সামনে কবিতা পড়তে আমার জিভ আটকে যায়। তা ছাড়া আমি কোনো লেখাটেখা নিয়েও যাইনি। সব সময়েই তো পকেটে কবিতা থাকে না।

তবু কয়েকজন পেড়াপিড়ি করতে লাগলো। বিশ্বদেব বললো, তোমার একটাও মুখস্ত নেই?

আমি বললাম, আমার অন্যদের কবিতা মুখস্ত থাকে। নিজের কবিতা মুখস্ত থাকে না।

বিশ্বদেব তখন ওর টেবিল ঘেঁটে ফস করে একটা পত্রিকা বার করলো। সেই পত্রিকাটায় আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটি নতুন, বিশেষ কোনো মতবাদ নেই।

বিশ্বদেব বললো, এতে যে কবিতাটা আছে, সেটাই পড়ে শোনাও।

তখন আর এড়ানো গেল না। কিন্তু ঐ কবিতাটা আমার ঐ আসরে একেবারেই পড়ার ইচ্ছে ছিল না—নিতান্তই একটা

ব্যক্তিগত অনুভূতির লেখা।

যাই হোক, আমার কবিতাটা পড়ার পর কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। সাধারণত সবার রচনা নিয়েই পরে কিছু আলোচনা হয়। আমার লেখাটার পর সবাই অন্য কথা বলতে লাগলো। আমি দুরুদুরু বুকে সকলের মুখের দিকে চাইলাম। মনে হলো, কেউই পছন্দ করেনি। বন্দনা সেনগুপ্ত সব আলোচনাতেই অংশ নেন, এখন তিনি মুখখানা বাংলার পাঁচ করে আছেন।

এখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেনট্রাল এভিনিউয়ে আসবার পর আদিনাথদা বললেন, বাদল, তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

পানের দোকান থেকে আদিনাথদা চুরুট কিনলেন, আমিও সিগারেট ধরালাম। আজকাল সবার সামনেই সিগারেট খাই। রেণু ছাড়া।

আদিনাথদা বললেন, কি পড়লি আজকে? ওটা কি কবিতা?

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, না, ভালো হয়নি ঠিক।

—ভালো-মন্দর কথা হচ্ছে না। ঐ সব বস্তাপচা জিনিস নিয়েও এখন কবিতা লেখা হয়?

আমি চুপ করে রইলাম। আদিনাথদা কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক করে বল্ তো, তুই কি বরুণ ঘোষদের সঙ্গে ভিড়ছিস?

আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললাম, মোটেই না। আমি ওদের কাগজে লেখা দিইনি।

বরুণ ঘোষকে নিয়ে কিছুদিন আগে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। বরুণ ঘোষ তরুণদের মধ্যে রীতিমতন নামকরা কবি, ইউনিভার্সিটিতে ইউনিয়নের কর্মী। তার লেখা গান আই পি টি-এ থেকে গাওয়াও হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং বরুণ ঘোষ প্রেমে পড়ে গিয়ে বেশ কিছু প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। স্বীকার করতেই হবে, কবিতা হিসেবে সেগুলো চমৎকার। কিন্তু সেই নিয়ে পার্টির মধ্যে আপত্তি ওঠে। শেষ পর্যন্ত কথাবার্তা অনেক দূর গড়ায়। বরুণ ঘোষ বরাবরই চটাং চটাং কথা বলে। শেষ পর্যন্ত বরুণকে পার্টি থেকে এক্সপেল করা হলো। বরুণ ঘোষও তেজের সঙ্গে বলে গেছে, আমি আলাদা কাগজ বার করবো। আমি দেখিয়ে দেবো, বাংলা কবিতা কোন দিকে মোড় নেয়। বরুণ ঘোষের পত্রিকা সত্যিই এর মধ্যেই বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

স্বাধীনতার ঠিক পরপরই অধিকাংশ লেখকই বামপন্থার দিকে ঝুঁকেছিল। অনেকেই তখন মার্কসবাদী। কিন্তু কয়েক বছর পরে সবার লেখা নিয়ে যখন চুলচেরা বিচার করে দেখানো হতে লাগলো, কে কতখানি মার্কসবাদী, কোনটা লেখা উচিত আর কোনটা লেখা উচিত নয়—এই নিয়ে পার্টি থেকে যখন বেশ জবরদস্তি হতে লাগলো—অনেক লেখকই তখন সরে গেলেন বীতশ্রদ্ধ হয়ে। তাদেরই শেষ উদাহরণ বরুণ ঘোষ।

কিন্তু বরুণ ঘোষদের দিকে যাবার কোনো কারণই নেই আমার। বরুণ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত লেখক, সাহিত্যটা তার জীবন মরণের সমস্যা। আমার তো তা নয়। বাদল মুখার্জির দুটো চারটে কবিতা শুধু এদিক সেদিকে বেরিয়েছে। না লিখলেও আমার কিছু আসে যায় না। আমি কাজ করতে চাই। আমি একটা আদর্শকে বিশ্বাস করেছি, আমি সেটা নিয়েই থাকতে চাই।

বরুণ ঘোষ সংক্রান্ত আলোচনার সময় আমি কোনো মন্তব্য করিনি। পার্টির নির্দেশ মেনে নিয়েছি, বরুণ ঘোষের কাগজে লেখা দিইনি—কিন্তু তাকে আমি এখনো ভালো কবি মনে করি। এখন যে সবাই মিলে তাকে রি-অ্যাকশনারি বলতে শুরু করেছে, তা আমি মানতে পারি না। আদর্শের মিল না হলেই একজনকে শ্রেণী স্বার্থের দালাল বলতে হবে? বরুণ ঘোষ মানুষটা যে খাঁটি, তা জোর করে অস্বীকার করা হচ্ছে।

কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারেও এখন পার্টির নির্দেশ আসছে। রেণুর সঙ্গে আমি এখানে সেখানে বেড়াই সেটা কয়েকজন দেখে ফেলেছে। প্রথম প্রথম এই নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে কেউ কেউ। তারপর আমাকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, রেণুর সঙ্গে যদি আমার মিশতেও হয়—তাহলে আমার উচিত রেণুকে দিয়ে পার্টির কিছু কাজ করানো। আমি তাও চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু রেণু অন্য ধরনের মেয়ে। পড়াশুনো করতেই ভালোবাসে, বেশী লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারে না। এখন আমি রেণুর সঙ্গে যথাসম্ভব গোপনে দেখা করি।

আদিনাথদা বললেন, আজ যে কবিতাটা পড়লি, তাতে কি যেন একটা লাইন ছিল? আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিলে, বারবার ঘামে ভেজা মুখ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসবো?

কবিতার লাইন কেউ ভুল বললে আমার

বিশ্রী লাগে। অনেক মনোবেদনা, অনেক আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা কবিতা লেখা হয়। সেটা ভালো হোক বা খারাপ হোক—তবু তার সংগে সেই দুঃখ জড়িয়ে থাকে। কেউ তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে মনে বড় লাগে। কিন্তু প্রতিবাদ তো করা যাবে না। ছাপা হয়ে গেলে সে সম্পর্কে যা খুশী মন্তব্য করার অধিকার সকলেরই আছে।

ঐ কবিতাটা লেখার আগের দিন দুপুরবেলা রেণুর সংগে দেখা করার কথা ছিল কফি হাউসে। আমি তার আগে মায়ের জন্য জর্দা কিনতে গিয়েছিলাম বড়বাজারে। বড়বাজারের একটা বিশেষ দোকানের জর্দা ছাড়া মার অন্য জর্দা পছন্দ হয় না। ফেরার সময় হঠাৎ ট্র্যাফিক জ্যাম, বিশ্রী বিশৃঙ্খলা, রিক্সা, ঠ্যালা গাড়ি, লরি—এই সবের মধ্যে আবার দু তিনটে ষাঁড়। একটা ট্রামে আমি বন্দী হয়ে বসেছিলাম, অসহ্য গুমটের দিন, এদিকে আড়াইটে বেজে গিয়েছে। রেণু অপেক্ষা করে থাকবে।

ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু বাদেই একটা ঘড়িতে দেখি, তিনটে পাঁচ। আগের ঘড়িটা কি ভুল দেখেছিলাম? আমার নিজের ঘড়ি নেই। আরও দু তিনটে দোকানের ঘড়ি মিলিয়ে দেখলাম। সত্যিই তিনটে বেজে গেছে। রেণু কি এতক্ষণ বসে থাকবে? ও নিশ্চয়ই ভাববে আমি ভুলে গেছি কিংবা অন্য কিছু। রেণু একলা একলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, এই দৃশ্যটা আমাকে মুচড়ে দিল। আমি দৌড়োতে শুরু করলাম। আমাকে গিয়ে বলতেই হবে, আমি ভুলে যাইনি, সময় আমাকে ঠকিয়েছে।

কোনোক্রমে মিনিট দশেকের মধ্যেই কফি হাউসে পৌঁছে দেখলাম, একটা টেবিলে রেণু একলা চুপ করে বসে আছে। রেণু কফি হাউসে এর আগে একবার দুবার মাত্র এসেছে—এখানে বিশেষ কারুকে চেনে না। একলা এতক্ষণ বসে থাকা, একটি মেয়ের পক্ষে, মোটেই সুখকর নয়।

আমি ঝপাং করে রেণুর উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়েই বলতে শুরু করলাম, জানিস, বড়বাজারে...উঃ কি অবস্থা...

রেণু সবটা শুনলো। তারপর হাসতে হাসতে বললো, তুমি না এলেও আমি বসেই থাকতাম। রাত্তির পর্যন্ত বসে থাকতাম।

সেই টেবিল থেকে পাখা অনেক দূরে। হাওয়া এসে পৌঁছোচ্ছে না। আমি তখনও হাঁপাচ্ছি। রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসার জন্য আমার সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। বসন্ত রোগীর মতন আমার মুখখানা ঘামের ফোঁটায় ভর্তি। এদিকে আবার রুমাল আনতে ভুলে গেছি। হাত দিয়ে বারবার ঘাম মুছেও কুল পাচ্ছি না।

এরকম ঘর্মাক্ত তেলতেলে মুখে রেণুর সামনে বসে থাকতে আমার খুব লজ্জা করছিল। রুমাল আনতে ভুলে যাবার জন্য ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের মুখে একটা ঘুঁষি মারি। রেণুর সংগে কথা বলবো কি, আমি শুধু ঘাম নিয়েই চিন্তা করছিলুম।

রেণু কফির কাপে একটু একটু চুমুক দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। একটা হাল্কা নীল রঙের শাড়ী পরে আছে। গলায় একটা সরু হার। ডান পাশে সিঁথি কাটা।

রেণু জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে?

আমি বললুম, রুমাল আনতে ভুলে গেছি।

রেণু অবলীলাক্রমে ওর আঁচলটা এগিয়ে দিয়ে বললো, মুছে ফেল!

রেণু আজকাল বাইরে অন্য লোকজনের সামনে তুমি বলে। আগে ওকে বলে বলেও তুই ছাড়ানো যায়নি। হঠাৎ নিজেই একদিন বদলে ফেলেছে।

কফি হাউসে সেদিন আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ না থাকলেও, অনেকেই মুখ-চেনা। সকলের মাঝখানে বসে একটি মেয়ের আঁচল দিয়ে কি মুখ মোছা যায়? আশেপাশের টেবিল থেকে আওয়াজ দিতে পারে।

তবু দ্বিধা কাটিয়ে আমি কোনোক্রমে ওর আঁচলটা দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ মুছে ফিরিয়ে দিলাম।

রেণু বললো, ভালো করে মুছলে না? ভালো করে মুছে নাও।

আমি লাজুকভাবে বললাম, অনেক লোক রয়েছে যে।

রেণু খুব স্বাভাবিকভাবে বললো, সেইজন্যই তো। লোকজন না থাকলে আমি নিজেই তো তোমার মুখটা মুছিয়ে দিতাম।

এক একটা কথা শুনলে হঠাৎ মনের মধ্যে শিহরণ বয়ে যায়। হঠাৎ আমার মনে হলো, রেণুর আঁচলটা সুগন্ধে ভরা। হয়তো অন্যদের কাছে এই ব্যাপারটা বা এই কথাটা অতি সাধারণই মনে হবে। আমি কি একটু বেশী বেশী রোমান্টিক?

সেদিন রেণুকে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আমি বাসে ফিরছিলুম। অসহ্য ভিড়, তেমনি গরম। সারাদিন বৃষ্টি আসবে আসবে করেও আসেনি। আমার আবার শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। তখন রেণুর আঁচলটা আর একবার পাওয়ার জন্য আমার ভেতরটা ছটফট করতে লাগলো।

পরের দিন, এই বিষয় নিয়েই একটা কবিতা লিখে ফেলি। লেখার পরই মনে হলো, কেন লিখলাম? এই ব্যাপারটা আমার এতই ব্যক্তিগত যে অন্য কারুকে কি বোঝানো যাবে। কিন্তু এক এক সময় নিজেকে প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা থাকে না। কবিতা লিখতে বসে, সেই মুহূর্তে আমার আর কিছুই মনে পড়ছিল না, শুধু রেণুর আঁচলটা ছন্দোময় হয়ে ফিরে ফিরে আসছিল। এ ব্যাপারটা আদিনাথদাকে কি করে বোঝাবো!

আদিনাথদাকে বললাম, আমি চেষ্টা করেও ভালো লিখতে পারি না।

আদিনাথদা বললেন, সুকান্তর মতন লিখতে পারিস না?

—কোনো কবিই অন্য কারুর মতন লেখে না।

—সাহিত্য সম্পর্কে তোর ধারণা কি? সাহিত্য কিসের জন্য?

আমি শান্তভাবে কথা বললেও আমার ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা রাগ জমছিল। কিন্তু সেই রাগের পরিমাণ যে এত বেশী, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম, আপনার সংগে সে বিষয়ে আলোচনা করে কি হবে? আপনি সাহিত্যের কি বোঝেন?

আদিনাথদা একটু অবাক হলেও গলা চড়ালেন না। আমাকে উপদেশ দেবার ভংগিতে বললেন, আমি অন্তত এইটুকু বুঝি, সাহিত্যকে একটা হাতিয়ার করে তুলতে হবে।

আমি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললাম, আপনার সংগে এতদিন মিশে আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার কোনো সাহিত্য-বোধই নেই। যে নিজে সাহিত্য সম্পর্কে কিছুই বোঝে না, সাহিত্য সম্পর্কে তার ফতোয়া দেবার কোনো অধিকার নেই।

আদিনাথদার সংগে এরকম সুরে কথা বলার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। কোনোদিন এরকম করিনি। কিন্তু আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলাতে পারলাম না কিছুতেই।

শেষ পর্যন্ত এমন হলো আদিনাথদা অন্যদের নিয়ে উল্টোদিকে চলে গেলেন, আমি হাঁটতে লাগলাম একা একা। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। সাহিত্য ফাহিত্য নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কোনো মানে হয় না। আমি লেখা ছেড়ে দিতে পারি যে-কোনো মুহূর্তে। কিন্তু আদিনাথদা আমার মনের কথাটা বুঝতে না পেরে কেন খোঁচা মেরে কথা বলছিলেন। একা একা হাঁটতে এত খারাপ লাগছিল যে আমি একটা পার্কে চুপ করে বসে রইলাম।

(ক্রমশ)

কথাচারিতমানস

দুনিয়ার এত এত কথার ভেতর একটি কথাই তুলনী। কই মাছ আর মাগুরের মতই যুগ যুগ জীয়োনোর।

কথাটা মাও সে তুং-এর। তাঁর সব কথার তুঙ্গে।

তিনি বলেছিলেন যে, বেশি বই পড়লে মানুষ গাধা হয়ে যায়—তাঁর সেই কথাটাই।

আমি নেহাৎ মুখ্যু বলেই যে তাঁর এ-কথায় আমার সায় তা নয়। জীবনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত ঐ মুখ্য কথাটায়।

সবার উপর মানুষ সত্য-র মতই মোক্ষম্ কথাটা।

কিন্তু পুঁথি-পড়া প্রজ্ঞানী সারবাহী মানুষের সঙ্গে ভারবাহী প্রাণীর তুলনা করাটা যেন কেমনতর! যদিও খতিয়ে দেখলে দুয়ের মধ্যে কৌলিক তফাৎ থাকলেও মৌলিক তফাৎ বিশেষ নেই। এক-জনের হচ্ছে বোঝার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা, আরেকজনের বেলায় সেই বোঝাকেই শীর্ষ-স্থান দেওয়া। যদিও মাথার ওপরে না বয়ে সেটা মাথার মধ্যেই বোঝাই করা। মগজের মধ্যে গজগজানো—এই যা ইতরবিশেষ।

বাহক জীবের পিঠের বোঝা যদি বা মাঝে মধ্যে হালকা হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিটির মাথার বোঝা নড়তেই চায় না। কেননা, তাঁর বিদ্যা কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।' পরকে তাঁর আহৃত জ্ঞান না দিয়ে না বিলিয়ে, পরম্পরায় বোঝাই না করে তাঁর রেহাই নেই। আদানে প্রদানে সেই বোঝা চক্রবৃদ্ধি হারে নিয়তির চক্রান্তে বেড়েই চলে ক্রমশ। পড়েই ভুলতে পারে এই দুনিয়ায় এমন বিস্মৃতিরত্ন কজনা?

অবশ্য, বিদ্যা সর্বদাই শিরোধার্য। ভুলবার অথবা ফেলবার জিনিস নয়। বই প্রায় বউয়ের নায়ই লেপটে রইলেন আঠার মতন—সেই-বউয়ের চোখে চোখে আর মাথায় করে রাখবার এবং শেষকালে সেই মাথার রতন—সেটাও অনিবার্য মতন বিদ্যাকেও আর ঘাড় থেকে নামানো যায় না, মগজের মধ্যে আর বাইরে দিন রাত্তির গজ গজ করে। সারা জীবন ওতোপ্রোত হয়ে জট পাকিয়ে থাকে। সেই জট জটিল হয়ে জটাজুট হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে সেন্টিনিকসের পটিসস সেই বটের ধারায় বিদ্যার ঝুরি নামে এবং সেই ঝুড়ি ঝুড়ি বিদ্যার বহর দিগ্‌দিকে ছড়িয়ে যায়—তার

পুঁথিপড়া জ্ঞানীগুণী মানুষ

ফলাফল আকাকপক্ষী সকলেই ভোগ করে।

দেখুন, যাঁরই লেখা যে-সন্দর্ভশ্চ হোক না তা অপঠিত থাকলেও কোনো খর্বতা নেই, কোনই হানি হয় না আপনি দেখবেন। যে বই-ই আপনি পড়তে যান, দেখবেন যে তার সব কথাই আপনার আগের থেকে জানা। আপনার অজানা তত্ত্ব তার মধ্যে কিছুই

নেইকো। এ সবই—আপনি জানতেন, কিন্তু জানতেন আপনার মর্মের গভীরতায়, কেবল স্বগোচরে সেটা ছিল না। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা টের পেয়ে গেলেন এই যা। এইটুকুই লাভ।

যদি সেই বইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে আপনার মতের মিল হয় তবে তো তা আপনার মনের কথাই। অযথা সময় ব্যয়ে তার পুনর্মনোনয়নে কী লাভ? আর যদি সেই বইয়ের বক্তব্যের সাথে আপনার মত না মেলে তা হলে তো বৃথাই পড়া, বাজে সময় নষ্ট করা, কেননা কার সাধ্য তার সঙ্গে আপনার মত মেলায়। আপনার ধারণা, মতামত সব ইতিমধ্যেই সংগঠিত হয়ে যায়নি কি? আপনার সেই ব্যক্তিগত মতামত বদলাবার ক্ষমতা আছে কারো?

পার্থিব জ্ঞান-ভাণ্ডারের গুহায় প্রবেশ করলে দেখবেন আপনার মর্মের গভীরে কবের থেকে তার চিচিং ফাঁক হয়ে রয়েছে! উপনিষদ থেকে হিতোপদেশ পর্যন্ত সবটাই লক্ষ করবেন, সবার কথায় আপনি ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছেন, যেথায় দিচ্ছেন না সেখানে আপনার ধরাবাঁধা সায় নেই সেখানে আপনাকে ধরাশায়ী করে সাধ্য কার?

পার্থিব অপার্থিব তত্ত্বের প্রায় সবই আপনার জানা—আপনার ধারণার মধ্যেই। আর তথ্যের যা কিছু আপনার অজানা বা এক আধটু জানা তা না জানলেও চলে। সে সব এই বাহ্য। সেই অর্ধবাহ্য দশার থেকে গ্রন্থান্তরিত আত্মসমাধিতে কী লাভ? বরং পুঞ্জীভূত সেই গ্রহণদশার গ্রন্থিমোচনে

বউএর নাগাই লেপটে রইলেন আঠার মতন

ধাতস্থ থাকাই ত শ্রেয়। এবং বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু জ্ঞান লাভের এই যোঝাইদারিটা, নিতান্ত সোজা না হলেও, অভ্যাসগত প্রথাসিদ্ধ বলেই সহজ মনে করে সবাই। বিদ্যার্জনের কোন রাজোচিত পথ নেই বলা হয়। তাই সকলের রাজপথে, নিত্যকালের দরাজ পথেই সবার গতিবিধি। যথাবিহিত পদযাত্রা সবাইকার।

কিন্তু ও ছাড়াও বিদ্যা লাভের আর কোনো পথ নেই কি? সব কিছুর মতই বিদ্যার্জনেরও মেড্ ঈজি? বিশ্ববিদ্যার আড়তে দ্বার ভেঙে প্রবেশ না করেও সকলের অগোচরে অনায়াসে সেখানে অনুপ্রবেশ করা যায় নাকি?

সেই সহজ পথ হচ্ছে সুড়ঙ্গ পথ। বিদ্যার মন্দিরে যাবার সুন্দর পথ সেইটাই।

আপনি বলবেন, সেটা বড় বিদ্যা। চুরি বিদ্যাই। হ্যাঁ। আমি মেনে নিচ্ছি আপনার কথাটা।

কিন্তু যেমন বিদ্যাপক্ষে, তেমনি কালী-পক্ষেও তার একটা অর্থ রয়েছে।

আমি বলব সেটা ব্রহ্মবিদ্যা। সেটাই আত্মবিদ্যা। এবং ব্রহ্মের চেয়ে বড় বিদ্যা আর কী আছে?

সেই পরম ব্রহ্মকে ঘিরেই ত দশ মহা-বিদ্যার বিস্তার, বিচিত্র পরিণতি।

সেই ব্রহ্মের সঙ্গে চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে, ব্রহ্মচৌর্যে (কিম্বা ব্রহ্মচর্যই বলুন!) তাঁর সাহচর্যে আপন অন্তরের অভ্যন্তর থেকে অফুরন্ত তাঁর যথাসর্বস্ব অপহরণ করুন না!

মনোযোগেই জ্ঞানার্জন করবার। মনের যোগেই সব কিছু জানা যায়। সবার মনের সঙ্গে সকলের মনের সংযোগ। ইহকাল পরকাল পূর্বকাল আর সর্বকালের সবার যা কিছু ভাবিত এবং অনুভাবিত সবই আমাদের অন্তর্নিহিত। পূর্ব পুরুষ আর উত্তর পুরুষের তাবৎ সম্ভাবিত আর সম্ভাবনার উত্তরাধিকার আমাদের।

এই সীমাহীন বিশ্বে অনন্ত কালে একটাই মন। সেই মন যেখানে একান্ত সেই মানস সরোবরে গিয়ে ডুব দিলেই মিলে যায় সব। বিশ্বমনের গোপন সুড়ঙ্গ পথটিই আবিষ্কার করবার। সেই পথেই সর্বাত্মক বিদ্যার মন্দিরে আমরা যাতায়াত করতে পারি।

মনের কথাটাই আসল কথা। সেই কথাটি জানলেই হলো। সেই মানস সরোবরই সবার ব্যক্তি-চরিত্র, সকল ধারা সর্ব ধারণার উৎস। সেখান থেকেই যত কথা আর কাহিনী—শিল্পরূপে আর রূপশিল্প ভূভারত-কাহিনী। সেটাই কথাচরিত মানস।

মনের আলমারির থাকে থাকে স্তরে স্তরে সমস্ত সাজানো রয়েছে। সেখানে হাত বাড়ালেই হলো। চিনে চুনে বেছে নিতে পারলেই হয়। তার জন্য আলমারির বোঝা ঘাড়ে করে বয়ে বয়ে মরবার দরকার করে না।

যখন যেটার প্রয়োজন, এমনকি যখনকার যিনি প্রয়োজন সেখান থেকেই এসে যায়। সহজেই আনা যায়। হাতের কাছে চিনি পেলেই হলো, চিনে নিলেই হলো।

চিনির বলদ হয়ে লাভ নেই। চৈনিক প্রাজ্ঞের চীনে বক্রেতে সেই কথাটিই চিত্রিত।

—শিবরাম চক্রবর্তী

বহুবৈচিত্র্যময় রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' অনন্য, বিস্ময়কর সৃষ্টি। বিভিন্ন আঙ্গিকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চরম শিল্পোৎকর্ষের পরিচয়-বাহী অজস্র শিল্পসৃষ্টির পরেও রবীন্দ্র প্রতিভার অক্লান্ত, অনিঃশেষ শিল্পপ্রেরণা তাঁর জীবনের অন্তিম পর্যায়ে সৃষ্টি করল কাব্য নাটক, সংগীত ও নৃত্যের সার্থক সমন্বয়ে গড়া সম্পূর্ণ অভিনব এই শিল্প-রূপ : নৃত্যনাট্য।

শুরুতে বলে রাখি, এ-সমীক্ষার পরিধি খুব সীমিত, সংকীর্ণ। এই সংমিশ্রিত শিল্প-রূপের বিশ্লেষণ, এর বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বা যথাযথ নিরূপণ আমার সাধ্যের, সুতরাং লক্ষ্যেরও, বাইরে। বিভিন্ন পাঠান্তরের মধ্য দিয়ে এ তিনটি নাটকের বিবর্তন অনুসরণ করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা 'পূর্ণাঙ্গ' আলোচনাও এখানে অভিপ্রেত নয়। সুর, অভিনয় ও নৃত্যকলার সহযোগিতায় মঞ্চে এদের সামগ্রিক যে-রূপ প্রকট—যা বস্তুত এগুলির একমাত্র সম্পূর্ণ ও যথার্থ রূপ—তাও শুধু আংশিকভাবে আমার দৃষ্টিপটের অন্তর্গত। সুরের সঙ্গবর্জিত "কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য" সম্বন্ধে যদিও কবি আমাদের অবহিত করে দিয়েছেন তবু মূলত এগুলির সেই বাণী-রূপের উপরই এখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ। শিল্প-সৃষ্টি হিসেবে এগুলি পাঠক বা দর্শক মনকে যে নিবিড় রসানুভূতিতে আপ্লুত করে, এদের যে নিরুপম শিল্পসুষমা আমাদের চমৎকৃত করে, অথবা যেখানে ত্রুটি বা অভাব অতৃপ্তি জাগায় মনে, সেই নান্দনিক রসবিচারের সামান্য প্রয়াস এ আলোচনা। ভূমিকা দীর্ঘায়িত না করে সরাসরি সেই কর্মেই প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

তিনখানি নাটকে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষণীয়। প্রত্যেকটিতেই প্রধান চরিত্র এবং নাটকের প্রাণকেন্দ্র একটি নারী, যার নামে নাটকের নামকরণ হয়েছে। তিনটি নাটক তিনটি নারীর প্রেমকাহিনী। তিনজনের নাটকীয় পরিস্থিতি অনুরূপ : তিনজনেই প্রেমে অগ্রণী হয়ে ভালোবেসেছে, আত্ম-নিবেদন করেছে প্রেমাস্পদকে, কিন্তু দয়িতকে পাবার পথে তিনজনেরই দুস্তর বাধা, এবং তিনটি নাটকই প্রেমের পথে নায়িকার এই বাধা অপসারণের ইতিহাস। কিন্তু ওই পর্যন্তই। নায়িকাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিস্থিতির রূপায়ণ ও তার পরবর্তী বিবর্তন বিভিন্ন। বস্তুত, মূল পরি-স্থিতির এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রতিটি নাটকের জগৎ বাতাবরণ স্বতন্ত্র, এবং যদিও তিনটি নাটকই নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশিত, প্রতিটির সুরা পৃথক, আবেদন স্বতন্ত্র।

দর্শক বা পাঠকমনে 'চিত্রাঙ্গদার' স্বাক্ষর প্রধানত উজ্জ্বল বর্ণের ও উচ্ছল প্রাণ-হিল্লোলের; 'চণ্ডালিকা' মনে এঁকে যায় রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ রিক্ত মরুভূমিতে আঁধির ঝড় ও তৎপরবর্তী শূন্য শান্তির ছবি; 'শ্যামা' অনেকটা ট্র্যাজেডী-ঘেঁষা, সকরুণ, কিন্তু ট্র্যাজেডীর গাম্ভীর্য ও গরিমাহীন। চিত্রাঙ্গদায় দিকে দিকে বসন্তের রঙীন কেতন সগৌরবে উড্ডীন, 'চণ্ডালিকায়' সবার উপরে এবং সবার শেষে জেগে থাকে মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর বেদনামথিত কিন্তু প্রশান্ত মূর্তি; 'শ্যামায়' জগৎ পরস্বাপহারীর প্রমোদতস্করের অভিশপ্ত জগৎ, সেখানে কারাগারে শৃঙ্খলঝংকার, ঘাতকের খড়্গ বিষিয়ে দেয় বায়ু, প্রেমকে ছাপিয়ে ওঠে অপরাধের গ্লানি।

"চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা" কবি নিজে ব্যক্ত করেছেন 'ভূমিকায়' অনবদ্য কাব্যিক ভাষায় :

> প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
> পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
> সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়।

এই মর্মকথাই আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে 'রচনাবলী' সংস্করণে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের কবিলিখিত সূচনায়, যেখানে এই কাব্যের আদি প্রেরণার কথা স্মরণ করেছেন কবি : সুন্দরী নারীর রূপ-যৌবনের মায়া তার "বাইরের জিনিস, যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।" অন্তরের চারিত্রশক্তি, "মোহমুক্ত শক্তির দানই যুগলজীবনের জয়-যাত্রার সহায়, সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়।" অপর দুটি নৃত্যনাট্য বিনা ভূমিকায় উপস্থাপিত, 'চিত্রাঙ্গদায়' এই ভূমিকা সংযোজনের প্রয়োজন ছিল। কারণ, যদিও এটি রূপক নয় এ-নাটকের মর্মবাণী এই তত্ত্বটি স্মরণে না রাখলে এর পূর্ণ মহিমার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হয় না; অথচ এর অন্তর্নিহিত সত্য কবি নিজে না দেখিয়ে দিলে হয়ত আমরা দেখতেই পেতাম না, এবং মদনবরে রূপান্তরিতা চিত্রাঙ্গদার মতোই এ-নাটকের বহিরঙ্গের এমনই জলুস যে কবিকৃত এই মর্মোদ্ঘাটন সত্ত্বেও এই গভীর তাৎপর্য সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এর বর্ণ-

বৌচিত্র্যের আকর্ষণ শুধু যে "অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত" তাই নয়, বিদগ্ধ চিত্তও অসতর্ক হলে সে-আকর্ষণে অভিভূত হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় শেষ হবে বেশি দর্শকের মনে নাটকের এই মর্মকথা উন্মোচিত হয়ে ওঠে কিনা সন্দেহ, অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভবত এই অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে যায় এর বিচ্ছুরিত বর্ণের সমারোহে, এর যৌবন উন্মাদনার কলোচ্ছ্বাসে। তাতে এমন কী বা ক্ষতি? 'চিত্রাঙ্গদা'র অপরূপ রূপলাবণ্যে আমরা কিছুক্ষণ না হয় মোহিত, অভিভূত হয়ে রইলাম, পরে তার মর্মকথা স্মরণ করে উপলব্ধির আরেক স্তরে আরেকবার পুলকিত হবার অবকাশ তো রইল। কাব্য-নাট্যের কথা যাই হোক, দর্শক পাঠকমনে 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' সামগ্রিক অব্যবহিত যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা মোহভঙ্গের নয়, তা মোহবিস্তারের। আমার মনে হয় নৃত্য-নাট্য চিত্রাঙ্গদার উদ্বোধনী সংগীতের প্রথম কয়টি কথায় সমগ্র নাটকের মূল সুর ধ্বনিত :

মোহিনী মায়া এল, এল যৌবনকুঞ্জবনে।

এ নাটকের প্রধান ঘটনা যৌবনকুঞ্জবনে মোহিনী মায়ার আবির্ভাব। অন্তিমে মায়া অন্তর্হিত হয়ে সহজ সত্যের নিরলংকৃত প্রকাশের কালেও মায়ার রেশ লেগে থাকে আমাদের মনে, মুগ্ধ থাকি আমরা তখনও।

মায়া ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে দূষণীয় কিছু নেই। মদন ও বসন্তের সহায়তায় ব্রহ্মচর্যাশ্রয়ী অর্জুনের নিজের প্রতি আসক্ত করছে চিত্রাঙ্গদা, তার মায়ালাবণ্য অলৌকিক প্রভাবসম্ভূত হতে পারে, কিন্তু প্রেমাস্পদকে পাবার এ পন্থা—প্রসাধনে সাজে সজ্জায়, রূপলাবণ্যে নিজ আকর্ষণ দুর্বার করে তোলা—নারীর সহজাত প্রবৃত্তি, সর্বকালীন নারীধর্মের অঙ্গ। অতিমানবিক প্রভাব সত্ত্বেও এ-মায়া ঠিক শ্রেয়োধর্ম বিরোধী নয়, 'চণ্ডালিকা'র মায়ার অস্বাভাবিকতা, ভীষণতা, নির্মমতার আভাসমাত্র এখানে নাই, বস্তুত সে-মায়ার সঙ্গে এর প্রভেদ সর্বাত্মক। চণ্ডালিকার মায়া অশুচি, অশুভ; 'চিত্রাঙ্গদা'র মায়া কল্যাণকর দৈব বর। আবার, 'শ্যামা'র মতো গ্লানিকর কোনো পাপের ছোঁওয়াও 'চিত্রাঙ্গদা'য় লাগেনি। অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার প্রেম স্বাভাবিক সুন্দর। অর্জুনের ব্রতভঙ্গ এখানে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক পদস্খলন বলে ঠিক না, মনে হয় এই প্রেমের মাধ্যমেই তাঁর কঠোর তপশ্চর্যার স্বাভাবিক পূর্ণতা; স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতি এ নয়, স্বধর্মের নব উপলব্ধি।

'চিত্রাঙ্গদা'র বৈশিষ্ট্য splendour—যাকে বলতে পারি ঐশ্বর্য : বর্ণে উজ্জ্বল সৌরভে মদির। এর মিল বসন্তে প্রকৃতির রঙের উৎসবের সঙ্গে। বসন্তে সমস্ত জীব-প্রকৃতির যৌবন উন্মাদনা, প্রিয়মিলন সংগের দুর্বার উন্মাদনা এ-নাটকের সংগীতে সংলাপে হিল্লোলিত। স্বপ্নোন্মাদনার নেশায় মেশা উন্মত্ততা, মিলন সুখাবেশ, মিলনের তৃপ্তি এবং অবশেষে ক্লান্তি— loves sad satiety সমস্তই এখানে চিত্রিত হয়েছে একটি পরিপূর্ণ সুষমায়, একটি নিটোল নিখুঁত harmony-তে, একটি পূর্ণ ছন্দে। এর অবসাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পঙ্কিলতা নেই, গ্লানি নেই, যেমন আছে চণ্ডালিকা ও শ্যামার প্রেমে। ফাল্গুনের রঙের উচ্ছ্বাস যেমন চৈত্রে রসপূর্ণ ফলের মধ্যে পূর্ণতা চরিতার্থতা লাভ করে, মধুর আবেশ উত্তীর্ণ হয় পর্যাপ্ত ফলসম্ভারে, সব উচ্ছলতা উন্মাদনা স্থির হয় একটি পরিতৃপ্ত প্রশান্তির মধ্যে, এবং তার গভীরে কোথায় অত্যন্ত নম্রভাবে বাজতে থাকে বৈরাগ্যের করুণ কোমল সুর, 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে বসন্তে প্রকৃতির সেই চিরন্তন রূপের প্রতিচ্ছবি। এর আদিতে ফাল্গুনের মদির আবেশ, অন্তে চৈত্রের পূর্ণ পরিণতি।

অর্জুনে দর্শনে চিত্রাঙ্গদার রুদ্ধ নারী প্রকৃতির বন্ধ আগল খুলে গেল, প্রেমের যাদুস্পর্শে তার এই জন্মান্তর অভাসিত হয়েছে একটি মর্মস্পর্শী গানে, রোমান্টিক প্রেম কবিতার সেটি একটি অনবদ্য নিদর্শন : ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতল জলের আহ্বান রবীন্দ্রনাথেরই দুচারটি গান কবিতার বাইরে প্রেম অভিজ্ঞতার এর চেয়ে রোমাঞ্চকর প্রকাশের দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। এ-গানের আগে স্টেজ নির্দেশনা আছে : "সখীসহ স্নানে আগমন"; চিত্রাঙ্গদা নত্যে স্নানের অভিনয়ও করে, কিন্তু এ কি সরোবরের জলে দেহের স্নান? এ-নাটকে উপরি-তলের নীচেই যে গভীর প্রতীকী তাৎপর্য বহমান এ গান তার একটি উদাহরণ। হঠাৎ প্রেমের যাদুস্পর্শে চিত্রাঙ্গদা ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনেছে অতল জলের আহ্বান, বাতাসে অনুভব করেছে কোন উতলা অপ্সরীর উত্তরী হর রোমাঞ্চ, কানে শুনেছে দূরে সিন্ধু-পারে কার মঞ্জীরে গুঞ্জরতান। যে ভরা-জোয়ারে নিজেকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার জন্য তার প্রাণ ব্যাকুল সে কোন প্রাকৃতিক জলস্রোত নয়, সে ওই অতলস্পর্শী প্রেম-সমুদ্র : যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো, এসো মোর হৃদয়নীরে।

চিত্রাঙ্গদা প্রথমে ভেবেছিল শুধু প্রেম শুধু আত্মনিবেদনের দ্বারাই বিমুখ অর্জুনকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারবে : "দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রন্থি দিব খুলিব প্রেমের গৌরবে।" কিন্তু নিজ নারী প্রকৃতিকে দীর্ঘকাল ব্যর্থ করেছে সে, তাই অর্জুন তার মুখে "হেরিল না নারী, ফিরাইল, গেল ফিরে।" নিছক দৈহিক আকর্ষণ, বাহ্যিক রূপলাবণ্য যে উপেক্ষণীয় নয়, সার্থক এবং আদর্শ প্রেমেও তার প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে সে সত্য এ নাটকে সুন্দরভাবে স্বীকৃত, সম্মানিত হয়েছে।

কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যা এ-আলোচনার উদ্দেশ্য নয়, শুধু তিনটি নৃত্যনাট্যের তুলনামূলক আলোচনা করে তাদের শিল্প-সৌষ্ঠবের কয়েকটি দিক তুলে ধরতে চাই। 'চিত্রাঙ্গদা'র আর একটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি : সে এর ভাষা। এর ভাষার ঔজ্জ্বল্য এবং চিত্ররূপের ঐশ্বর্য সহজেই চোখে পড়ে। নায়িকার মতোই এ-

নাটিকা বহিরঙ্গে সুসজ্জিতা, সালংকারা: যেন বিবাহবাসরে সর্বাঙ্গে-জরির-কাজ করা ঝলমলে বেনারসী শাড়ীপরা নববধূ। কিন্তু লক্ষণীয়, ভাষার কারুকার্য কোথাও স্বপ্রধান হয়ে ওঠেনি। এ-নাটকের মর্মকথা এই যে ভূষণ আভরণ বাইরের জিনিস, তার দ্বারা ক্ষণিক যে মোহ সৃষ্টি হয় তা কখনই আত্মার তৃপ্তিকর হতে পারে না। 'চিত্রাঙ্গদা'র ভাষায় তাই ঔজ্জ্বল্য আছে, ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু বাহুল্য নাই। ওই জরিপাড় বেনারসী শাড়ীর আবরণে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ভাস্বর, একটি তীব্র উন্মুখ কিন্তু অপ্রমত্ত চৈতন্যের দীপ্তি পরিস্ফুট। বিরহ-বেদনা কিংশুকে রক্তিমরাগ রাঙানো, বন-মল্লিকা নবপত্রালিকায় সজ্জিত হল, কিন্তু সব রঙ সব সজ্জা ছাপিয়ে উঠল কয়েকটি অতি সহজ, সাধারণ কথায় ব্যক্ত প্রাণের আতুর ক্রন্দন: "দেওয়া হল না যে আপনারে সেই ব্যথা মনে জাগে।" চিত্রাঙ্গদা'র ভাষা নিরাভরণ নয়, কল্পনা রোমান্টিক পর্যায়ে, কিন্তু ভাষার উপরে আছে বাণী, সে-বাণী সর্বত্র ওতপ্রোত এবং ভূমিকা'র কবিতার আকারে সংহত।

'চণ্ডালিকা'র জগৎ চিত্রাঙ্গদার বিপরীত মেরুতে। বাস্তবিক পক্ষে নানা দিক থেকে এদের প্রতিতুলনা ও বৈপরীত্য অনুধাবন করলে উভয়েরই শিল্পোৎকর্ষ আরও ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, এ দুটি কী আশ্চর্যরকম সার্থক শিল্পকর্ম তা আরো নিবিড় ভাবে উপলব্ধি হয়। 'চিত্রাঙ্গদা' মনে আনে ফাল্গুন-চৈত্র, চণ্ডালিকার সাদৃশ্য বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের সঙ্গে। চিত্রাঙ্গদায় বসন্তের মধুর রঙীন আবেশ, চণ্ডালিকায় রৌদ্রদগ্ধ গ্রীষ্মের রূক্ষতা। ওখানে রসের স্রোতে রঙের খেলা, এখানে তৃষ্ণা বিশ্বের বক্ষ জুড়ে, ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়, সন্তাপে প্রাণ মরে পুড়ে। 'চণ্ডালিকা' রূক্ষ, রিক্ত, কিন্তু শক্তি নয় প্রচণ্ড; দর্শক বা পাঠকমনে চণ্ডালিকার অভিঘাত 'চিত্রাঙ্গদা'র থেকে কোনো অংশে ন্যূন নয়, হয়ত বেশি। এর ভাষায় বহিরঙ্গে কোথাও অলংকরণের আভাসমাত্র নাই, গানগুলি বাদে এর সংলাপ আগাগোড়া গদ্যছন্দে, এবং সে গদ্যও নিরাভরণ, বাহুল্যবর্জিত ঋজু ও স্বচ্ছ। 'চিত্রাঙ্গদা'র ভাষা যদি হয়, যেন ঝলমলে বেনারসী শাড়ী, চণ্ডালিকার ভাষা সন্ন্যাসীর গৈরিক উত্তরীয়, তার মধ্যে মনো-লোভা কিছু নাই, আছে চারিত্র শক্তির ইঙ্গিত, আছে সংযম, দার্ঢ্য, আছে সংকল্প ও সংহত শক্তির পরিচয়। 'চিত্রাঙ্গদা' রঙের হোলিখেলা, চণ্ডালিকায় রঙ যদি কিছু থাকে সে গৈরিক; বাস্তবিক পক্ষে রঙ জিনিসটাই এখানে অপ্রাসংগিক, বেমানান। বসনে ভূষণে গতিভঙ্গে চিত্রাঙ্গদা যথার্থই রাজেন্দ্রনন্দিনী, চণ্ডালিকা দরিদ্র চণ্ডাল-কন্যা, আভরণহীনা; তার সমস্ত গৌরব তার আপনাতেই, সে-গৌরব ব্যক্ত হয়েছে এমন একটি গানে যা যুগপৎ ভাবের গভীরতায় ও প্রকাশের সারল্যে বিস্ময়কর, অতুলনীয়: "ফুল বলে ধন্য আমি মাটির 'পরে।" প্রকৃতির মর্মকথা ওই গানে (এবং শুধু এই নাটকে চণ্ডালদুহিতা প্রকৃতির নয়, যেন সমস্ত জগৎ প্রকৃতিরই মর্মবাণী ওই গানে); মাটির ধুলোয় তার জন্ম, কিন্তু "নাই ধূলি মোর অন্তরে", তার গৌরব সে দেবতার চরণে নিবেদিত, সে দেবতার চরণে মূর্তিমতী প্রণাম।

'চণ্ডালিকা' রবীন্দ্র সাহিত্যে এক অভি-নব, অপ্রত্যাশিত, চমকপ্রদ সৃষ্টি। এ শিল্প জগতের এক নতুন প্রদেশে রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। বিপুলে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ রবীন্দ্র সাহিত্য, নানা রসের সার্থক রূপায়ণ করেছেন তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে, কিন্তু 'চণ্ডালিকার' বাইরে আর কোথাও তিনি macabre বা বীভৎস রসের অব-তারণা করেছেন বলে আমার জানা নেই। আমি বলছি না 'চণ্ডালিকা' বীভৎস রসের রচনা, কিন্তু ও জিনিস এতে রয়েছে, এবং সেটাই আশ্চর্য। রবীন্দ্রনাথের অতি সংবেদনশীল মন, তাঁর মূলত লিরিক প্রতিভার পক্ষে বীভৎস রস অসহনীয় ঠেকবে এটাই স্বাভাবিক, রবীন্দ্র মানস-কতার সঙ্গে বীভৎস রস বা তার সম-গোত্রীয় কিছু নিতান্তই বেখাপ। এক্সপেরি-মেন্টের ঝোঁকে 'চণ্ডালিকায় কবি যেন নিজের রুচি ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজে হাত লাগিয়েছেন। যদি ব্যর্থ হত এ প্রয়াস, সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর না হত, অভিযোগ করার কিছু থাকত না আমাদের। কিন্তু চণ্ডালিকায় এ জিনিসের রূপায়ণ বিপুল বিস্ময়কর ভাবে সফল, সার্থক শিল্প-সম্মত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে বা অন্যত্র চণ্ডালিকার অভিনয় অভিনয় দেখার সুযোগ যাদের হয়েছে তাঁরা নিশ্চয় উপলব্ধি করেছেন মা'র সম্মোহনী শক্তির প্রচণ্ডতা, মনে আছে তার ডাইনী নাচ, যোগিনীদের আহ্বান দৃশ্যের শ্বাসরোধ করা, গা-ছমছম করা মুহূর্তগুলি। 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রেমের, মদনের, বসন্তের মোহিনীমায়া তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবতে হয় কোথায় পেলেন রবীন্দ্রনাথ এই ডাইনী যাদুকরীর মন্ত্র? সেই কোন ছেলেবেলায় গুরুমশায়ের তাগিদে অনুবাদ করেছিলেন ম্যাকবেথে'র ডাইনী দৃশ্য। আশ্চর্য সুন্দর সে অনুবাদ, কিন্তু সে তাঁর নিজস্ব জিনিস নয়, এবং দূর অতীতে ওই একবারই অন্য কবির মধ্যস্থতায় নিশাচরী ডাইনীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর; তারপর সুদীর্ঘ-কাল ও জগতের ছায়ামাত্র তাঁর কল্পনাকে স্পর্শ করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ম্যাক-বেথে'র ডাইনী আর চণ্ডালিকার মা' সম-গোত্রীয় নয়। ওরা পুরোপুরি আঁধারের জীব, বিশ্বের অশুভ শক্তির প্রতীক, ওদের কাছে "ভালোই মন্দ, মন্দ যাহা ভালো যে তাই।" অশুচি নোংরা জিনিস নিয়ে ওদের কারবার: "গিরগিটি-চোক ব্যাঙের পা, টিক-টিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।" ম্যাকবেথের তমসাচ্ছন্ন জগতে ওরা বেমানান নয়, কিন্তু স্বরূপত ওরা কদর্য কুশ্রী। ওদের ভাষায় না আছে উজ্জ্বলতা, না আছে তীব্রতা, কোনো শংকার শিহরণ জাগায় না ওদের ভাষা। ভাষার অতুলনীয় যাদুকর শেক্সপীয়র—যাঁর অগণিত চরিত্র প্রত্যেকে যেমন নিজ স্বরে

তেমনি নিজ বিশিষ্ট ভাষায় কথা কয়—তিনি তাঁর ডাইনীদের ভাষায় যাদু দেননি। তারা ডাইনী বলে চিহ্নিত, তাই তাদের সম্মোহনী শক্তি পরিদর্শীকৃত, বাস্তবে প্রমাণিত নয়। দর্শক বা পাঠকমনে তাদের প্রভাব marginal, প্রান্তবর্তী মাত্র। হয়ত ম্যাকবেথের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ওদের ভূমিকা লঘু রাখার উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করেই ওদের ভাষায় মন্ত্রশক্তি সঞ্চার করে দেননি নাট্যকার, ওদের সত্যিকার সম্মোহনশক্তি তাঁর নাটকের মৌল ধারণার পরিপন্থী হত বলেই ওদের ক্ষমতা সীমিত রাখা হয়েছে।

'চণ্ডালিকা'য় মা নিজে ডাইনী নয়, কিন্তু ডাকিনী যোগিনী ও অশুভ সব শক্তি তার বশীভূত। সত্যিকার মায়াবী শক্তির অধিকারিণী সে, অথচ তার আকারে আচরণে বীভৎস বিদঘুটে কিছুই নেই। তাকে হঠাৎ দেখে ভয় পাবে না কেউ, বরং তাকে সাধারণ দুঃস্থ স্ত্রীলোক বলেই বোধ হয়। তার প্রকৃতিও বিশেষ ভাবে কুটিল ক্রূর নয়; যাদুবিদ্যা সে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু সে তার বাইরের জিনিস; অশুচি অশুভকে সে প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু ওসবের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ নেই। বস্তুত, এ-বিদ্যা প্রয়োগ করতে তাকে জীবন পণ করতে হয়, তার প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। যে সম্মোহন সে সৃষ্টি করছে 'ম্যাকবেথে'র তুলনায় তা অনেক বেশি প্রবল, সক্রিয়, জীবন্ত ও বাস্তব। 'মা'র আকর্ষণ মন্ত্র কোনো দুর্বোধ্য হিং টিং ছট নয়, তার ভাষা বা উপকরণে occult বা আধিভৌতিক কিছুই নাই; বস্তুত, এ পিশাচতন্ত্রের কোনো উপচার পৈশাচিক নয়। স্বচ্ছ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় কী প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার করা হয়েছে ভাবতে অবাক লাগে: যেন লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। "কী যাদু বাংলা গানে"—এমন অনেক যাদুর পরিচয় বাংলা গানে পাওয়া গেছে এর আগে, কিন্তু বাংলা গানে আক্ষরিক অর্থে যাদু, ম্যাজিকর যাদুর দৃষ্টান্ত সম্ভবত আর কোথাও নেই।

লক্ষণীয়, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামার তুলনায় সাধারণ অর্থে প্রেমের কথা চণ্ডালিকায় অত্যন্ত বিরল; তথাকথিত প্রেমের দশা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অর্জুনে চিত্রাঙ্গদা মায়ার ভেলা ভাসিয়ে মেতে ওঠে স্বর্গের কৌতুক খেলায়। "প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে বাঁধন খুলে দাও দাও দাও": চরম বিচ্ছেদের পূর্বে ক্ষণিকের জন্যও শ্যামা বজ্রসেন সব বাঁধন খোলা প্রেমের জোয়ারে গা ভাসাতে পারে। 'চণ্ডালিকায়' মুহূর্তের জন্যও সে পুলকাবিষ্ট প্রেম-সুখানুভূতি নাই; নারীর ললিত লোভন লীলা এখানে অসহনীয়রূপে বেমানান, তাই তার আভাসমাত্র নাই। তার পরিবর্তে এ-নাটকের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে—পংক্তির দৈর্ঘ্যে এবং তার চেয়ে অনেক বেশি, আমাদের মনে—'মা'র যাদুর সম্মোহন: রসাতলবাসী অশরীরী প্রেতাত্মাদের আহ্বান এবং তাদের অদৃশ্য প্রভাবে আনন্দের বন্ধন।

রাজবাড়ীর অনুচরের মুখে শোনা গেল যাদু জানে চারণের বউ, মন্ত্র করে-উড়ো-পাখি ফিরিয়ে আনতে পারে; প্রকৃতির হুতাশ, দিশেহারা মন চকিতে খেলে গেল—এই তো উপায়! আবদার ধরলো মার কাছে: "মন্ত্র জানিস তুই মন্ত্র পড়ে দে তাকে তুই এনে।" মেয়ের দুঃখ মা দেখতে পারে না, সে যে তার 'বুকচেরা ধন', তাই তার পক্ষে প্রাণান্তকর হলেও সংকল্প করল: "আনবই আনবই, আনবই তারে মন্ত্র পড়ে।" ডাক দিল তার শিষ্যাদলকে আকর্ষণমন্ত্র যোগ দেবার জন্য, শুরু হল মায়ানৃত্য।

এ-যাদুর ক্রিয়া চলেছে যুগপৎ পাঠক/দর্শকের মনে, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের উপর। আসলে যাদু 'মা'র নয়, যাদু রবীন্দ্র-প্রতিভার, কবি কল্পনার। মা'র সেই মরণ-পণ সংকল্প: "আনবই আনবই, আনবই তারে মন্ত্র পড়ে" তখন থেকেই শুরু হয় আমাদের বুকের ভিতর দুরু দুরু, তারপর প্রতিটি কথা আনে অজানা শংকার শিহরণ, রোমাঞ্চে কণ্টকিত দেহে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা, কী হয়, কী হয়। সম্মোহনের বশীভূত আমরা, আনন্দের চেয়ে বেশি অসহায়রূপে, আনন্দের চেয়ে আরো সম্পূর্ণ রূপে। "রসাতলবাসিনী মায়া-কালী নাগিনী"কে 'মা'র তীক্ষ্ণকণ্ঠ আহ্বান— "পাক দে, পাক দে, পাক দে." আমাদের মাথার মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অর্ধচেতনের মতো যেন আমাদের নিয়ে যেতে পারে যেদিকে খুশি, বাধা দেবার সমস্ত শক্তি অবলুপ্ত হয়ে যায় আমাদের। কিন্তু মা'র মন্ত্রের চেয়ে যা আমাদের বেশি অভিভূত করে সে হচ্ছে আনন্দের উপর সে-মন্ত্রের প্রতিক্রিয়া: মায়া দর্পণে প্রতিফলিত আনন্দের হৃদয়বিদারক বিহ্বল, উদভ্রান্ত অবস্থা, এবং তদ্দর্শনে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া। মার মন্ত্রের যাদু আমাদের স্পর্শ করে ঠিকই, আমরা বুঝতে পারি অপ্রতিরোধ্য এ-মন্ত্রের আকর্ষণ,

কিন্তু এর শক্তির প্রচণ্ডতা, ভয়াবহতা আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না যদি না কবি-কল্পনার সে-ছবি এমন জ্বলন্ত অক্ষরে এঁকে দিত। অগ্নি এবং দহন যুগপৎ অথচ স্বতন্ত্রভাবে এখানে চিত্রিত। কী অভাবনীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে এই দুরূহ কর্মের সার্থক সিদ্ধিতে। 'মায়াদর্পণ' জিনিসটাই এক আশ্চর্য আইডিয়া। 'মা' যে ডাকিনী যোগিনী মায়াকালী নাগিনীদের ডাক দিচ্ছে তাদের তো মঞ্চে উপস্থিত করা যায় না, কোনো সবিশেষ বর্ণনাও দেওয়া যায় না, এদের মঞ্চে নামাবার বা বর্ণনা দেবার চেষ্টামাত্র থাকলে সে-চেষ্টা শুধু অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হত তাই নয়, হাস্যকর grotesque হত, এবং এ-নাটকের বিশিষ্ট রস সম্পূর্ণ নষ্ট হত। কবি সে-চেষ্টা করেন নি, তার পরিবর্তে যেন কল্পনার মায়াবলে সৃষ্টি করেছেন এই 'মায়াদর্পণ', যাতে ফুটে উঠছে কীভাবে কাজ করছে মায়াবিনী 'মা'র অমোঘ যাদুমন্ত্র। যেন দুই জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা : বস্তুবজগৎ ও দর্পণে প্রতিফলিত মায়া-জগৎ। দর্পণে প্রতিফলিত, কিন্তু সেও সাক্ষাত উপস্থাপিত নয়, প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর নয়, মঞ্চে প্রদর্শিত নয়, এ-জগৎ আমরা দেখি প্রকৃতির চোখ দিয়ে, তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করি তার বর্ণনায়, তার ভাবান্তরের দ্রুততায়, উন্মাদনায়। প্রথমে সে উল্লসিত :

মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে—
উড়ে যাবে শুষ্ক সাধনা সন্ন্যাসীর
শুষ্ক পাতার মতন।
নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার,
ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি
সে যে ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে।

পরমুহূর্তে তার লজ্জা : "লজ্জা! ছি ছি লজ্জা!/আকাশে তুলে দুই বাহু/অভিশাপ দিচ্ছেন কারে।/নিজেরে মারছেন রক্তিম বেত্র,/কেন বিঁধছেন যেন আপনার মর্মে।" সে আর দেখতে চায় না তার বুক ফেটে যায় :

কী ভয়ংকর দুঃখের ঘূর্ণিঝঞ্ঝা—

....

আমি দেখব না, দেখব না,
আমি দেখব না তোর দর্পণ—না না না॥

এইটুকু সংকেতই যথেষ্ট। কী নিদারুণ ভয়ংকর নিশ্চয় সে দৃশ্য যা চণ্ডালিনী প্রকৃতি আর দেখতে পারে না, দুঃখে তার বুক ফেটে যায়। 'মা' প্রাণপণে মন্ত্র ফিরিয়ে আনতে বলল। কিন্তু পরক্ষণে প্রকৃতির লোভ আবার দুর্বার হয়ে উঠল : "পথ তো তার নেই বাকি/আসবে সে, আসবে সে, আসবে।" 'মা'র মন্ত্র প্রায় শেষ হয়ে এল, "প্রাণ মোর এল কণ্ঠে।" মায়াদর্পণে দেখা যায়—

ওই আসছে, আসছে, আসছে—
যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,
ওই আসছে, আসছে আসছে।

অবশ্যই আনন্দের এবং প্রকৃতির ভৌগোলিক দূরত্বের কথা এ নয় : উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনার জগৎ থেকে লক্ষ যোজন দূরে সন্ন্যাসীর জগৎ। প্রকৃতি আবার দেখছে :

অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তাঁর অগ্নির আবেষ্টন—

....

তোর মন্ত্রবাণী ধরি কালী নাগিনীমূর্তি
গর্জিছে বিষনিশ্বাসে
কলঙ্কিত করে তাঁর পুণ্যশিখা॥

এইখানে আনন্দের "ছায়া-অভিনয়" আরো মূর্ত করে তোলে প্রকৃতির বর্ণনা, আরো কাছে এনে দেয় তমসাচ্ছন্ন সেই ছায়ালোক যেখানে মায়ামন্ত্রে জেগে উঠছে রসাতল-বাসিনী কালীনাগিনী, চারিদিক থেকে কুম্ভীপাকে ঘিরে ধরছে অসহায় সন্ন্যাসীকে। 'মা'র যাদুশক্তির চরম পরিচয় তার 'শেষনাগমন্ত্র', 'নাগপাশ-বন্ধন-মন্ত্র', সাপের মতোই কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে, একটা শিহরন বইয়ে দেয় শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে, তারপরে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেয় আমাদের : কেমন করে সম্ভব হল প্রেতলোকের ভাষা এমন করে আমাদের কানে পৌঁছে দেওয়া।

রঙ্গমঞ্চে ভয়াবহতার পরিবেশ সৃষ্টিতে সুর ও তালের অবদান কম নয়, কিন্তু ভাষাকেই এই উদ্দেশ্যে আরেকভাবে কবি কাজে লাগিয়েছেন, সে হল এই যে, প্রকৃতি ও মা উভয়েই আতঙ্কিত, অভিভূত তাদের

নিষ্ক্রমণের প্রয়াসের, উল্লাসের তীব্রতায়। "মন্ত্র পড়ে দে তাকে তুই এনে"—প্রকৃতির প্রথম অনুরোধ শুনেই ভয়ে শিউরে উঠে মা বলছে: "ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস—/আগুন নিয়ে খেলা!/শুনে বুক কেঁপে ওঠে, ভয়ে মরি।' আনন্দের ছায়া-অভিনয়ের সময় মা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে: "ওরে পাষাণী, কী নিষ্ঠুর মন তোর/কী কঠিন প্রাণ/এখনও তো অভিশাপ বেঁচে।" অর্থাৎ এ-দৃশ্য এতই ভয়ংকর 'মা' বিস্মিত মেয়ে সহ্য করছে কী করে।

একটা অতর্কিত দুঃস্বপ্নের মধ্যে কিন্তু এ নাটকের শেষ নয়, এর অন্তিমে একদিকে চণ্ডালিকার নম্র আত্মনিবেদন অন্যদিকে বুদ্ধশিষ্যের প্রসন্নতা, ক্ষমা ও করুণা মুছে দিচ্ছে সব ভয়ের রেশ, ধুয়ে দিচ্ছে সব নির্মম নিষ্ঠুরতার গ্লানি: রৌদ্র-দগ্ধ বৈশাখের দাবদাহের পর যেন বৃষ্টিধারায় সব জ্বালার অবসান। 'চিত্রাঙ্গদা'-য় যেমন প্রতিফলিত বসন্তের আদি ও অন্ত রূপ—ফাল্গুনের রঙের সমারোহ যেমন উত্তীর্ণ হয় চৈত্রের পরিণত পূর্ণতায়, 'চণ্ডালিকা'য় তেমনি বৈশাখের রুদ্ররূপ মিলিয়ে যাচ্ছে জ্যৈষ্ঠশেষের করুণাঘন নীল স্নিগ্ধছায়ায়। 'চণ্ডালিকা'র শুরুতে আনন্দের কাতর ভিক্ষা "জল দাও", এ নাটকের দিগন্ত জুড়ে সেই শব্দেই তৃষিত কাতর প্রার্থনা প্রতিধ্বনিত, অন্তে সেই শব্দেই তৃপ্ত জগৎ জলসিঞ্চিত, সেই দাবদাহের অবসানে স্নিগ্ধ শান্তি। আনন্দ ও প্রকৃতি যেন পরস্পরের ভূমিকা বিনিময় করল পরিণামে: অন্তিমে আনন্দ প্রার্থী: "আমি তাপিত পিপাসিত/আমায় জল দাও"; প্রকৃতি তাঁর প্রসারিত করপুটে জল ঢেলে দিয়ে তাঁর তৃষ্ণা নিবারণ করল। কিন্তু সেই একটি "জল দাও" ডাক প্রকৃতির অন্তরে জাগিয়ে দিয়ে গেল পিপাসা, রক্তে তার ধরিয়ে দিল জ্বালা, মরিয়া করে তুলল তাকে, শেষ দৃশ্যে সেই তৃষিত হৃদয়কে তৃপ্ত করলেন আনন্দ পর্যাপ্ত করুণাধারায়।

চণ্ডালকন্যা প্রকৃত, জন্মগোত্রগৌরবহীনা; নারী হিসেবে, প্রেমিকা হিসেবেও সে অন্য জাতের, অন্য ধাতুতে গড়া। তার 'প্রকৃতি' নামের ব্যঞ্জনা সম্ভবত দূরপ্রসারী। সে ব্রাত্য, সে আছে সভ্যসমাজের থেকে দূরে, মাটির, প্রকৃতির কাছাকাছি। সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য শাসন তাকে ফেলে রেখেছে নীচের তলায়, তার নাম যেন তাকে চিহ্নিত করে দিচ্ছে অন্ধ তামসী প্রকৃতির দূতরূপে, সে যেন জড় প্রকৃতির অংশ, জীবপ্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র। যে সন্ন্যাসী সংসারের ভোগসুখলালসার ঊর্ধ্বে মহত্তর জীবনপথের পথিক তাঁকে জোর করে প্রকৃতির দাসত্বে ফিরিয়ে আনা, টেনে নামিয়ে প্রকৃতির সীমা উত্তরণের কাব্য। একটি আনাই যেন তার কাজ, caliban-এর মতো সে যেন of the earth, earthly, ইঙ্গিত যেন প্রচ্ছন্ন। কিন্তু 'চণ্ডালিকা' প্রকৃতির-সীমা উত্তরণের কাব্য। একটি 'জল দাও' ডাক জন্মান্তর ঘটিয়ে গেল তার, প্রকৃতির কবল থেকে তাকে উদ্ধার করে মনুষ্যত্বের মহৎ মর্যাদায় অভিষিক্ত করল তাকে। আনন্দকে সে চাইছে তাঁকে নীচে টেনে নামাবার জন্য নয়, তাঁকে চাইছে নিজের উদ্ধারের জন্য, তার নবজন্ম সম্পূর্ণ করবার জন্য। মায়াটানে যখন টেনে আনল আনন্দকে তাঁর কাছে প্রকৃতির প্রার্থনা:

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,
ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যলোকে।

—এই প্রকৃতির প্রেম। অপমান ঘৃণার ধূলিধূসরিত জগৎ থেকে ক্ষমার, পুণ্যের আলোকিত স্বর্গের দিকে, মনুষ্যত্বের মহান গৌরবময় অধিকারের দিকে বঞ্চিত প্রাণের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস। মাটির ধুলোয়-ফোটা ফুল সে, প্রেমের অমৃতস্পর্শে জানল, ঘোষণা করল নিজেকে: "নাই ধূলি মোর অন্তরে"। সে দেবতার পায়ে ধরিত্রীর প্রণাম। যত ভ্রান্ত কুটিল পথেই যাক না কেন, তার প্রেম সেই প্রণাম, সেই সমস্ত দেহ লুটিয়ে-পড়া, সমস্ত প্রাণ উড়ে-চলা একটি নমস্কার।

'শ্যামা'য় ট্র্যাজেডীর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ট্র্যাজেডী সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি কবি। কোনো মূলত নাট্যপ্রতিভার হাতে 'শ্যামা' হয়ত সার্থক ট্র্যাজেডীতে রূপায়িত হতে পারত। কিন্তু মূলত লিরিক কবি রবীন্দ্রনাথের হাতে এই ট্র্যাজিক পরিস্থিতির লিরিক-সম্ভাবনাই সার্থকভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে; পাত্রপাত্রীর ভাবাবেগের, তাদের বেদনানুভূতির দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে ও সকরুণ গানের মূর্ছনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। 'শ্যামা' মর্মান্তিক বেদনায় রসঘন, কিন্তু করুণা এবং আতঙ্কের যে সমন্বয় ট্র্যাজেডীকে মহত্তম শিল্পসৃষ্টির শিখরে উন্নীত করে 'শ্যামা'য় সেই আতঙ্কের একান্ত অভাব; pity বা করুণ রসই সব। তাছাড়া, সার্থক ট্র্যাজেডীর স্থানকালজয়ী বিশ্বজনীন তাৎপর্যের মহিমা 'শ্যামা'য় মুহূর্তের জন্যও অনুভূত হয় না।

অপর দুটি নৃত্যনাট্যের তুলনায় 'শ্যামা' অনেকাংশে—অন্তত নান্দনিক বিচারে—ন্যূন। 'চিত্রাঙ্গদা'র বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য ও মদির আবেশ—এবং 'চিত্রাঙ্গদা'র অন্তর্নিহিত গভীরতর ব্যঞ্জনা—এতে অনুপস্থিত; আবার 'চণ্ডালিকা'র বহ্নিশিখার তেজ ও দীপ্তি, তাও 'শ্যামা'য় নেই। 'চিত্রাঙ্গদা' মনে আনে প্রকৃতির অঙ্গনে বসন্তের লীলা, 'চণ্ডালিকা' মনে আনে প্রখর তপনতাপে দগ্ধ বৈশাখের রুদ্ররূপ; প্রকৃতির কোনো রূপের সেরকম কোন অনুষঙ্গ 'শ্যামা'র নেই। বস্তুত প্রকৃতি 'শ্যামা'র দূর পটভূমিকাও নয়। এর পটভূমিকায় আছে পৌর জীবন, প্রায় সমস্ত ব্যাপারটা সংঘটিত হচ্ছে পুরসুন্দরীর প্রমোদভবনে এবং কারাগৃহে। 'শ্যামা' মঞ্চে অভিনয়কালে চক্ষুকর্ণের পক্ষে সুখকর প্রভূত আয়োজনে এমন আবেশের সৃষ্টি করে যে, এর ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি আমাদের নজর এড়িয়ে যায়, তখন সাহিত্যিক মূল্যায়নের প্রশ্ন মনে আসে না। কিন্তু মনোমুগ্ধকর এই সব বাইরের জিনিস বাদ দিয়ে নিছক নাটকটিকে বিচার করলে 'নৃত্যনাট্য শ্যামা'র কোন কোন জায়গায় শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্মত গঠন পারিপাট্যের অভাব, কল্পনা ও তার রূপায়ণে কিছু শৈথিল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্যামা'র আদিরূপ, 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' কবিতা কাব্যগুণে

অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক বেশি নিখুঁত, সার্থক সুন্দর। এই বেদনাঘন কাহিনীর সকরুণতা ওখানে উত্তীর্ণ হয়েছে সকল রসের সারাৎসার —সারলাইমে। 'পরিশোধ' পাঠান্তে আমাদের সমস্ত মন ভরে যায়, স্তব্ধ, অভিভূত হয়ে থাকি, যেমন থাকি, বলা যাক্ আলী আকবর খাঁর সরোদ শ্রবণান্তে। 'পরিশোধ' কাব্যে এই বিরাটের স্পর্শ লেগেছে, প্রধানত ঘটনাবলী, বিশেষ, বজ্রসেনের কারামুক্তির পর থেকে, প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত বলে। স্রোতস্বতী বরুণা, বালুতট, ছায়াচ্ছন্ন দূরে বনভূমি দুটি নরনারীর ক্ষণিক মিলন ও মর্মান্তিক বিচ্ছেদের কাহিনীর যেন এক আবহসঙ্গীত রচনা করে। 'শ্যামা'র ঘটনা একই, কিন্তু ঘটনাবলী নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বিরাট কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তার ব্যাপ্তি নেই, সে জন্য তার একটা রূঢ় রুক্ষতা থেকে যায়; কথাগুলি সুরে বসানো, কিন্তু সুর যেন কাহিনীর অন্তর থেকে বিগলিত হয়ে আসে না। তাছাড়া, 'শ্যামা'র ঘটনা পরম্পরা এমন অদ্ভুত, অস্বাভাবিক-ভাবে বিন্যস্ত—অন্যায়, অবিচার, বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড,—সাধারণ সভ্যসমাজরীতি-বিরুদ্ধ সব অস্বাভাবিক ঘটনা বিনা প্রস্তুতিতে এত ক্ষিপ্রগতিতে ঘটে যায় যে, এই 'একুশে আইনে'র দেশের অবাস্তবতা অস্বাভাবিকতা মূলে ট্র্যাজিক আবেদনকে যেন খানিকটা ব্যাহত করে, শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডীর অমোঘ অনিবার্য নিয়তির ভাব জাগায় না মনে।

'শ্যামা'য় আরেকটি জিনিস যা আমাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রেখে দেয় সে হল বজ্রসেনের চরিত্র। বজ্রসেনের অন্তরে প্রবল দুই বিপরীত ভাবাবেগের সংঘাত ঘটছে ঠিকই, কিন্তু সে সংঘাত ঠিক মর্মস্পর্শী দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠেনি। দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ এবং অনেক সময়েই, বিশেষ, আধুনিক সাহিত্যে, এই দ্বন্দ্ব পাত্রপাত্রীর অন্তর্জগতে বিপরীত-মুখী প্রবর্তনার বা ভাবাবেগের দ্বন্দ্ব, তাদের মানসিকতার মধ্যে এর মূলে নিহিত থাকে; এ দ্বন্দ্ব যত তীব্র হয় তার কাব্যিক প্রকাশ হয় তত মর্মস্পর্শী। চিত্রাঙ্গদা ও প্রকৃতির মধ্যে সেই দ্বন্দ্ব। বিমুখ অর্জুনকে পাবার জন্য চিত্রাঙ্গদা মদনপূজো করে অপরূপ রূপলাবণ্য লাভ করল, কিন্তু তার অভীষ্ট-সিদ্ধির মুহূর্তেই অর্জুনের পরাভব তার নিজের কাছেই লজ্জাকর ও অসহ্য মনে হল, এবং নিজের ধার করা মোহিনী মায়াকে সে ধিক্কার দিতে লাগল।

কোন ছলনা এ যে নিয়েছে আকার
এর কাছে মানিবে কি হার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।

প্রেমসুখাবেশের চরম মুহূর্তে অর্জুনকে আবার বলছেঃ—

যাও যাও ফিরে যাও,
ফিরে যাও বীর।
শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়ে—
যাও যাও ফিরে যাও॥

চিত্রাঙ্গদার আচরণে এই আপাত অসঙ্গতি অদ্ভুত ঠেকে না আমাদের। কারণ এটা আমরা তার অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব বলে চিনতে পারি, এর দ্বারা আমাদের চোখে সে আরো মহিমময়ী, অথচ আরো বাস্তব হয়ে ওঠে; এর অন্তর্গূঢ় প্রচণ্ড tension —বিরুদ্ধ শক্তির ভারসাম্য আমরা অনুভব করতে পারি।

'চণ্ডালিকা'য় প্রকৃতির অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র, আরো বেদনাবিক্ষুব্ধ এবং তা প্রকাশ পেয়েছে পর্যাপ্ত তীব্র ভাষায়। ভিক্ষু আনন্দকে মন্ত্র পড়ে এনে দেবার জন্য মাকে মিনতি করছে প্রকৃতি, মাকে প্ররোচিত করছে : "পড় তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র", কিন্তু আনন্দের উপর সে-মন্ত্রের প্রতিক্রিয়া যখন দেখছে মায়াদর্পণে, লজ্জা পাচ্ছে সে : "লজ্জা! ছি ছি লজ্জা!" যন্ত্রণায় তার বুক ফেটে যায়, চিৎকার করে ওঠে : "আমি দেখব না, আমি দেখব না, আমি দেখব না তো দর্পণ—না না না।" শেষ পর্যন্ত নাগপাশ-বন্ধন-মন্ত্র যখন বেঁধে আনল আনন্দকে, প্রকৃতির ইচ্ছার জয় যখন সম্পূর্ণ, সেই মুহূর্তে তার বুকফাটা, স্নায়ুগ্রন্থি বিদীর্ণ-করা আর্তনাদ :

ওমা, ওমা, ওমা, ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র—
এখনি, এখনি, এখনি।
ও রাক্ষুসী, কী করলি তুই,
কী করলি তুই—
মরলি নে কেন, পাপীয়সী।

—এই আপাত স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ একটুও অস্বাভাবিক ঠেকে না, বরং এই সব অংশের শিল্পোৎকর্ষ সবচেয়ে মুগ্ধ করে আমাদের। আনন্দকে সে চায়, একান্ত-ভাবে চায়, সে জানে 'মা'র যাদুমন্ত্রের সাহায্য ছাড়া আনন্দকে পাবার অন্য উপায় নেই; অপরদিকে যে-সন্ন্যাসী তার উদ্ধারকর্তা, একটি "জল দাও" ডাকে যিনি ঘটিয়ে দিলেন তার জন্মান্তর, তাঁর অপমান তাঁর বেদনা, তাঁর পরাভব তার কাছে অসহ্য। একদিকে দয়াহীন, ভয়হীন, লজ্জাহীন ক্ষুধার্ত প্রেম, নিষ্ঠুর পণ তার—"আমি মানব না হার, মানব না হার—/বাঁধব তারে মায়াবাঁধনে"; অপরদিকে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে, আত্মনিবেদনের আকুতিতে বিগলিত সেই প্রেম। সন্ন্যাসী তো শুধু তার বাঞ্ছিত প্রিয় নন, তিনি তার "দীপ্ত সমুজ্জ্বল/শুভ্র সুনির্মল/সুদূর স্বর্গের আলো।" সে-আলোর ম্লানতা, তার বীরের অপমান তার কাছে দুঃসহ। প্রচণ্ড দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব সমস্ত নাটকটির মধ্যে যেন অদৃশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিয়েছে।

বজ্রসেনের চরিত্রে এবং সাধারণভাবে 'শ্যামা'য়, এই tension, এই বিদ্যুৎশক্তির অভাব। নিরপরাধ বালকের প্রাণের বিনিময়ে শ্যামা তাকে মুক্ত করেছে, এই ভয়ংকর সত্য উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রসেনের হঠাৎ চিৎকারঃ

কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে—ভাঙিবে কলুষনীড়
বজ্র-আঘাতে॥

এই কটূক্তি ও অভিশাপ বড়োই বিসদৃশ এবং অসহ্য পীড়াদায়ক ঠেকে। যে সংবাদ তার কাছে বজ্রাঘাততুল্য এই কি তার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া? যাত্রা দলের 'নিয়তি'র মতো পরুষকণ্ঠে এই অভিশাপবর্ষণ? সে যেন নীতিবাগীশের মতো শ্যামার অপরাধের শাস্তিবিধান করছে। অবশ্য, বজ্রসেনের পরবর্তী সব বাক্য ও আচরণ সম্পূর্ণরূপে এই অসঙ্গতিদোষমুক্ত। শ্যামাকে সে দৃঢ় ও রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে, সবলে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করছে, সে কোনো নীতিজ্ঞান থেকে বা বিচার বিবেচনা করে নয়, তার সমস্ত প্রকৃতি, সমস্ত সত্তা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে এরকম বিকট পাপের সামনে। শ্যামার "পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী" তার নিজের জীবনই তার কাছে ধিক্কৃত হয়ে ওঠে, তার অন্তরে প্রেম, কৃতজ্ঞতা সব অবলুপ্ত হয়ে যায় গ্লানিভারে। শ্যামার কৃতকর্মের নিষ্ঠুরতা, ভয়াবহতা, তার পাপের পরিমানহীন বিপুলতা একটি অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাতে নিয়ে গেল তাকে ভাবাবেগের বিপরীত সীমায়, সৃষ্টি করল তার মধ্যে চরম বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা। এ সবই স্বাভাবিক। শ্যামার প্রতি তার আচরণ যতই নির্মম হোক, তা সর্বতোভাবে অনু-মোদনযোগ্য। শ্যামার সঙ্গে মিলিত জীবনের সুখের প্রত্যাশা সে যে এত সহজে, এত নির্দ্বিধায় ত্যাগ করতে পারল, সম্ভোগকামনার উপর এমন অসন্দিগ্ধভাবে তার বিবেকবোধ, তার মনুষ্যত্ব জয়ী হল—এইটাই তাকে আমাদের কাছে মহৎ করে তোলে। শ্যামার পাপের শাস্তি বা ক্ষমার ভার বিধাতার হাতে দিয়ে আবার প্রেমের জোয়ারে গা ভাসাবার প্রবৃত্তি যদি তার হত, তাকে বলতাম পশু প্রবৃত্তি, তাতে তার

প্রেমের মর্যাদা বাড়ত না, মনুষ্যত্বের তো নয়ই। শ্যামার প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ আবার তন্মুহূর্তেই সমান প্রবল ঘৃণা,—তার অন্তরের এই দ্বন্দ্ব পর্যাপ্ত কাব্যিক রূপ পেয়েছে 'পরিশোধ' কবিতায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা, বজ্রসেনের দীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার তেমন স্পষ্ট, তেমন মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠেনি 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে, যেমনটি হয়ে থাকে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিল্পসৃষ্টিতে।

'শ্যামা'র একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি উত্তীয়। 'পরিশোধ' কবিতায় ও 'পরিশোধ' নাট্যগীতিতে উত্তীয়ের নাম একবারমাত্র তার জীবনাহুতি প্রসঙ্গে উল্লেখিত। ওখানে কিশোর বালকের ব্যর্থ-প্রেমে-বেদনাবিধুর ম্লানমুখের কল্পনা মুহূর্তমাত্র আমাদের মনে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যায়, শ্যামা-বজ্রসেনই আমাদের সমস্ত মন জুড়ে থাকে। উত্তীয় অপ্রত্যক্ষ, দৃষ্টির আড়ালে থাকে বলেই তার এই আশ্চর্য আত্মাহুতি সম্বন্ধে সংশয় জাগে না মনে। 'নৃত্যনাট্য শ্যামা'য় উত্তীয় সশরীরে অবতীর্ণ। 'পরিশোধে'র নেপথ্যলোক থেকে উত্তীয়কে 'শ্যামা'র পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসার মধ্যে কবিকল্পনার এক বলিষ্ঠ সাহসিকতার পরিচয় আছে। তার চরিত্রচিত্রণে সামান্য ভুল মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারত সমস্ত নাটকটির পক্ষে। নারীর "ব্যর্থ প্রেমে মত্ত অধীর" প্রেমিক আত্মহত্যা করে অনেক সময় হতাশায়, কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়ীকে রক্ষা করে প্রেমিকার সঙ্গে তার মিলনের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া এমনই অসাধারণ ব্যাপার যে এমন সৃষ্টিছাড়া চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। দ্বিতীয়ত নিরপরাধ কিশোর বালকের হত্যা এমনই মর্মন্তুদ ঘটনা যে তার প্রত্যক্ষ অবতারণায় তারই ট্র্যাজেডী স্বপ্রধান হয়ে ওঠার এবং নাটকের মূল কাহিনীকে খর্ব করার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছে এই দুরূহ কর্ম। বালক, কিশোর প্রেমিক সে, বয়ঃসন্ধিকালের প্রেমাবেশের সমস্ত লক্ষণগুলি তার মধ্যে প্রথম থেকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট : সুকুমার সারল্য, ভাববিহ্বলতা, আত্মোৎসর্গ প্রবণতা। তার প্রেম অনেকাংশে নৈর্ব্যক্তিক। প্রেম, সৌন্দর্য, নারী তার কাছে মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে আছে কল্পনার মায়ালোকে। তার প্রেমিকা 'অলক্ষ্য-অলকাপুরী - নিবাসিনী, 'গহনস্বপন-সঞ্চারিণী', যাকে কায়ারূপে পাবার তার বিশেষ আগ্রহ নাই, যার প্রাণমন দূর হতে অকারণে আকুল করে তোলাতেই এ প্রেমের সার্থকতা।

শ্যামা যাই বলুক, "ব্যর্থ প্রেমে উন্মত্ত অধীর" হয়ে, বা শ্যামার অনুনয়ে উত্তীয় নিজ প্রাণ উৎসর্গ করছে না, সে স্বেচ্ছায় নিজেকে বলি দিচ্ছে প্রেমের বেদীতে—এ-ই তার প্রেমের রীতি। প্রেমিকার কাছে সে কোনোদিন চায় নি কিছু, "নীরবে ছিল করি নয়ন নিচু", কিন্তু তার জীবনপাত্র উপচে-পড়া অপরিমেয় মাধুর্যের দান সে পেয়েছে প্রেমিকার অজানিতেই। সেই ঋণ পরিশোধের সুযোগ সে পেল বজ্রসেনকে নিজ "প্রাণ ঋণ" দিয়ে; এই মৃত্যু সে বরণ করল মরণডোরে চিরদিন প্রেমিকার বক্ষে বাঁধা বইবার উপায়রূপে। উত্তীয়ের মৃত্যুর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, তার হত্যায় শ্যামার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এইভাবে অনেকটা লঘু হয়ে যায়। এই কিশোর প্রেমিকের এইভাবে মৃত্যুবরণ বচনাতীতরূপে বিষাদময় হলেও স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয় আমাদের, তার সম্ভাব্যতা বা বাস্তবতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। তা না হলে উত্তীয়ের ট্র্যাজেডী শ্যামা-বজ্রসেনের ট্র্যাজেডীকে ছাপিয়ে উঠত, শিল্পসৃষ্টি হিসেবে ব্যর্থ হয়ে যেত "নৃত্যনাট্য শ্যামা"।

উত্তীয় তার প্রেমের চরম মূল্য হিসেবে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে শুধু বজ্রসেনকে বাঁচাল না, আরো সার্থকভাবে বাঁচাল এই নাটিকার নায়িকাকে। শ্যামার জীবনের দুঃখবেদনাময় পরিণতি রোধ করতে পারল না বটে, কিন্তু আরো শোচনীয় পরিণাম থেকে বাঁচাল তাকে। শ্যামার চরিত্রে আকর্ষণীয় কিছু নাই, তার প্রেমে এক রকম ঐকান্তিকতা আছে, কিন্তু নাই এমন উদারতা বা ত্যাগ যা তাকে মহৎ বা অন্তত শ্রদ্ধেয় করে তুলতে পারে। বজ্রসেনকে বাঁচাবার জন্য তার ব্যাকুলতা শুধু 'সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে' ঘোচাবার জন্য, শুধু 'নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চোখে' মোছাবার জন্য, শুধু অন্যায় অবিচার রোধ করার নিস্পৃহ আবেগজনিত নয়, তার আকুলতা "মহেন্দ্র-নিন্দিতকান্তি" সুদর্শন যুবকের প্রতি আত্মসুখান্বেষী অনুরাগপ্রসূত। একটি নিরপরাধ কিশোর বালককে সজ্ঞানে ঠেলে দিল মৃত্যুর মুখে—এ হেন নিষ্ঠুর, নির্মম নায়িকার দুঃখে সমব্যথী হওয়া সহজ নয়। 'শ্যামা'র সকরুণতা অনেকটা ম্লান হয়ে যায়, এর ট্র্যাজিক আবেদন অনেকটা ব্যাহত হয় এই কারণে। এর উপর সত্যই যদি শুধু শ্যামার অনুনয়ে প্রাণবিসর্জন করত উত্তীয় তা হলে নিতান্ত হেয়, অনুকম্পারও অযোগ্য হয়ে যেত শ্যামা আমাদের চোখে, এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যেত, 'নৃত্যনাট্য শ্যামা'। সেই ভরাডুবি থেকে এই নাটিকা এবং এর নায়িকাকে রক্ষা করেছে উত্তীয়ের অনেকাংশে স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যু।

'শ্যামা'য় দুচারটি প্রথম শ্রেণীর গান আছে। তবু নাটিকাটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা পাবে কি না সন্দেহ। এর কল্পনায় নাই তেমন ঐশ্বর্য, ভাবের তীব্রতা বা সূক্ষ্মতা, অথবা কোনো গভীর উপলব্ধির বা প্রেরণার স্বাক্ষর এতে পাই না, এর ভাষা বা প্রকাশেও নাই তেমন দীপ্তি বা চমক।

'চিত্রাঙ্গদা' পুরোদস্তুর রোম্যান্টিক কাব্য; কিন্তু লক্ষণীয়, রোম্যান্টিক ভাবনা ভাবাবেশ যে মুহূর্তে চরমে পৌঁচচ্ছে, মর্ত্য জগতের দূরতম সীমান্তে চলে যাচ্ছে তখনই বাস্তবে প্রত্যাবর্তন, বা বাস্তবের সঙ্গে তার সমীকরণ ঘটছে। যা ছিল অনাদৃত উপেক্ষিত, প্রেমের অভিষেকে সেই সত্য যখন আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হল তখন মায়াকুহকের প্রয়োজন অবসিত, তখন, যাকে মনে হয়েছিল স্বপ্ন বা মায়া বা 'সুবর্ণ-কিরণে রঞ্জিত ছায়া' দেখা গেল সে নারী—আপন মানুষী গরিমায় প্রতিষ্ঠিত, সে হতে পারে গৃহিণী সচিব : সখী প্রিয়শিষ্যা ললিতেকলাবিধৌ। 'চিত্রাঙ্গদা' তাই রোম্যান্টিক ও বাস্তবের মিলনের কাব্য। জাতিবিচারে 'চণ্ডালিকা' এবং 'শ্যামা'ও রোম্যান্টিক, কিন্তু সে ভিন্ন ধরনের। 'চিত্রাঙ্গদা' রঙে রসে জাল-বোনা, 'চণ্ডালিকা' প্রমাণ করে কবিপ্রতিভা শুধু রসের কারবারী নয়, বিপুল শক্তির অধিকারী। 'চণ্ডালিকা'য় রবীন্দ্রপ্রতিভার নূতন একটি দিকের, নূতন এক পরিচয়ের উন্মেষ, বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে যার তুলনা অপ্রতুল, যার তুলনা মেলে 'রক্তকরবী'তে, 'প্রান্তিক' ও 'জন্মদিনে'র কিছু কবিতায় (বলা বাহুল্য, সাদৃশ্য বিষয়ে নয়, প্রকাশে)। বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিল্পসৃষ্টির সর্বলক্ষণযুক্ত না হলেও আপন সীমার মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা' সর্বতোভাবে সার্থক এবং একেবারে প্রথম শ্রেণীর শিল্পকর্ম হিসেবে নিশ্চিত আদৃত হবার যোগ্য। 'শ্যামা'র আসন ঠিক ওই স্তরে হয়তো হবে না, তবে বেশি দূরেও হবে না। একটি ঐকান্তিক প্রেমের এই সকরুণ কাহিনী সমস্ত সমালোচনাকে নিরস্ত করে সরাসরি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে এবং আদরণীয় হয়ে থাকবে।

একা এবং কয়েকজন

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ধারাবাহিক লেখা "একা এবং কয়েকজন"-এর ৬৬তম পরিচ্ছেদে (২রা জুন ১৯৭৩ তারিখে "দেশ"-এর ৩১তম সংখ্যা ৫০৭-৫০৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন:—

"......জেলটেল খাটা যেতে পারে কিন্তু গোলমালের সময় সাধারণ ছেলেদের ফ্রন্টে পাঠাতে হবে সামনের দিকে। চিরকালই এরকম কিছু সাধারণ ছেলে মরে—কিন্তু আমি এদের থেকে আলাদা। সূর্যদাকে দেখলুম তো—কত কষ্ট সহ্য করেছে, কতবার লাইফ রিস্ক করেছে—অথচ এখন তাঁকে কেউ চেনেই না। নেতা হতে পারেনি কিনা। ওদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের এক বিখ্যাত নেতা এখন র‍্যাশনিং ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ হয়ে ঘুষের টাকায় লাল হচ্ছেন—তবু কেউ তাঁকে কিছু বলছে না, কারণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যে!"

এই বক্তব্যের শেষ লাইনে সুনীলবাবু যা বলেছেন তা যদি সুনীলবাবু যথাযোগ্য খবর নিয়ে এবং সঠিক বলে সুনিশ্চিত হয়ে লিখে থাকেন তা হলে তিনি অবশ্যই একটি ভাল কাজ করেছেন।

কিন্তু আমরা খুব সঠিক এবং সুনিশ্চিতভাবেই জানি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন "বিখ্যাত নেতা" তো দূরের কথা, কোন ছোটখাট অতি ক্ষুদ্র নেতাও রেশনিং ডিপার্টমেন্টের 'ইনচার্জ' তো বহু দূরের কথা এমন কি কোন তুচ্ছ ছোটখাট অফিসারের পদেও অধিষ্ঠিত নেই। সুনীলবাবুর ঐ লেখাটি প্রকাশিত হবার পর আমরা আরও খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু সুনীলবাবুর বক্তব্যের কোন ভিত্তি বা সমর্থন পাইনি।

তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই সুনীলবাবুর ঐ বক্তব্য আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কুৎসামূলক বলেই মনে হয়েছে। আমাদের এ কথাও মনে হচ্ছে, হয়তো সুনীলবাবু অপরের কাছ থেকে শোনা এই কুৎসামূলক সংবাদ কিছুমাত্র যাচাই না করেই নিজের নামে প্রকাশ করেছেন।

আমাদের এই ধারণা যদি সুনীলবাবু ভ্রান্ত বলে মনে করেন, তা হলে আমরা আশা করব সুনীলবাবু অগৌণে অন্তত "ঘুষের টাকায় লাল হয়ে যাওয়া" 'রেশনিং ডিপার্টমেন্টে'র সেই 'ইনচার্জ'র নাম প্রকাশ করে দিয়ে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার এবং সমগ্র দেশের মানুষের অপরিসীম ধন্যবাদের পাত্রে পরিণত হবেন।

এ কথা সুনীলবাবুকে স্মরণ করিয়ে দেবার নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন নেই যে, গোপনে ঘুষের টাকায় যে মানুষ লাল হচ্ছে সে প্রকাশ্যে যতই "শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি" হোক না কেন, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিলেই দেশ এবং জাতির প্রকৃত সেবা হবে, পরন্তু জানা সত্ত্বেও তার নাম গোপন করে রাখলে পরোক্ষভাবে এই পাপ ও অপরাধেরই সমর্থন করা হয়।

গণেশ ঘোষ
কলকাতা-১২

লেখকের বক্তব্য

শ্রদ্ধেয় গণেশ ঘোষকে প্রথমেই জানাই, চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল সম্পর্কে কোনো রকম কুৎসা রটনা আমার উদ্দেশ্য হতেই পারে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে ঐ বিপ্লবীদের ভক্ত। আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম দিক সে রকম লেখাও আছে। তিনি যেটাকে 'সংবাদ' বলেছেন, সেটা সংবাদ নয়, উপন্যাসের একটি অংশ, একটি বিভ্রান্ত যুবকের উক্তি। উপন্যাসে বর্ণিত যে-কোনো চরিত্রের উক্তিই লেখকের উক্তি নয়।

তিনি উপন্যাসটির পটভূমিকা সম্বন্ধে একটু ভুল করেছেন। তিনি রেশনিং ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে দেখছেন, চট্টগ্রাম বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত কেউই সেখানে চাকরি করেন না। কিন্তু আমি বর্ণনা করেছি ১৯৪৮-৪৯ সালের সময়ের ঘটনা। সেই সময়ে চট্টগ্রামের একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী একটি জনকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে (রেশনিং ডিপার্টমেন্ট নয়) জড়িত ছিলেন এবং তাঁর নামে ঘুষ নেবার অভিযোগ উঠেছিল, সংবাদপত্রেও ছাপা হয়েছিল। তিনি এখন মৃত। আমি ইচ্ছে করেই তাঁর নাম দিইনি এবং বিভাগটি বদলে দিয়েছি। কারণ, আমি ইতিহাস রচনা করতে বসিনি, এটি একটি উপন্যাস মাত্র। কারুকে হেয় করার ইচ্ছে নেই বলেই এখানে আমি সে নাম উল্লেখ করতে চাই না।

শ্রীগণেশ ঘোষ প্রমুখ অনেক বিপ্লবীদের সম্পর্কেই আমাদের শ্রদ্ধা এখনো অম্লান। কিন্তু চট্টগ্রামের বিপ্লবের দু' একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা যে পরবর্তীকালে নীতিভ্রষ্ট হয়েছেন, এ তো সর্বজনবিদিত ঘটনা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বনস্পতির বৈঠক

আপনার পত্রিকায় ১লা আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বনস্পতির বৈঠক' প্রবন্ধে লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন,—"আরেকবার প্রচণ্ড আওয়াজ হল চৌরঙ্গীতে। দুঃসাহসী টেগার্ট কটুপাথ ধরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অপমৃত্যু তাঁর কপালে নেই। ধরা পড়ে গেল গোপীনাথ সাহা'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি হলো—গোপীনাথ বা গোপীমোহন সাহা টেগার্ট ভ্রমে 'আর্নেস্ট ডে' নামে একজন ইংরেজ কর্মচারীকে গুলি করেন। আর্নেস্ট ডে গড়ের মাঠে প্রায়ই বেড়াতেন। সেদিনও (১৯২৪-এর ১২ই জানুয়ারী) সাহেব বেড়িয়ে ফিরছেন, চৌরঙ্গী থেকে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের দোকানের সামনে শো-কেস দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত মিল ছিল টেগার্টের। গোপীনাথ দেখা মাত্র পিস্তল চালালেন। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন ও তাঁর ভুলও ভাঙলো। ১লা মার্চ প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতর ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন। গোপীনাথ যে টেগার্টকে মারতে আর্নেস্ট ডে-কে মেরেছিলেন, আমার মনে হয়, এ ঘটনা সকলেরই জানা।

কৃষ্ণা পাল
দুর্গাপুর-২

॥ ২ ॥

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর বনস্পতির বৈঠক শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমাকে অতি নগণ্য জঘন্য ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু কেন, তার হেতু খুঁজতে গেলে কোন মনস্তাত্ত্বিকের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রবোধকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সংবাদপত্রের কার্যালয়ে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। 'বাংলার কথা'-র প্রথম প্রকাশের সময় প্রেমেন, সরোজ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমিও ঢুকি সাব্-এডিটর রূপে। প্রেমেন ও সরোজ রায়চৌধুরী সহকারী সম্পাদক আর আমরা বাকী সব সাব্-এডিটর। প্রবোধকুমারের এ সব জানা ছিল। কিন্তু এই সত্য চাপা না দিলে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার অসুবিধা হয়। আমার সম্বন্ধে প্রবোধকুমারের উক্তি যে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বিদ্বেষ-প্রসূত তা সহজেই অনুমেয়। কারণ, পঁচিশ টাকা আয়ের লোকের পক্ষে এক বৃহৎ পরিবারের যোগাজন' পোষ্যের ভরণ-পোষণ চালানো কখনো সম্ভব নয়। আমার এই সামান্য আয়ে এতোগুলি লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে যে পরিমাণ

টাকার প্রয়োজন হতো তা কি ঐ পঁচিশ টাকায় চলতো? না, তার উপরে যে টাকা লাগতো তা কি আমি প্রবোধকুমারের কাছে হাত পেতে নিতাম?

প্রেমেন-শৈলজানন্দের নামে তিনি কুৎসা গেয়ে পার পাননি। আমি তাঁদের মতো স্বনামধন্য সাহিত্যিক নই, কাজেই আমাকে আক্রমণ করা তাঁর পক্ষে সহজ। প্রবোধকুমার একটি ছোট নাটিকা লিখে তার অন্তর্ভুক্ত গানগুলি আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন এবং বেতার কর্তৃপক্ষ ওটির অভিনয়কালে তাঁদের বেতারবার্তার পাতায় পাতায় আমাকে সংগীত রচয়িতা বলে প্রচার করেছিলেন। এর নজির রয়ে গেছে। আমি এজন্যে গর্ব করছি না, শুধু বলতে চাই যে, প্রবোধকুমার তখনো আমাকে তুচ্ছ করেন নি। সেটাও অনেকদিন আগেকার কথা।

আমি আত্মপক্ষ সমর্থনে যতো চেষ্টাই করি না কেন, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, প্রবোধকুমারের কথাই মেনে নেবে। কারণ, প্রবোধকুমারের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরা প্রবোধকুমারকে ফেলতে পারবেন না, আমাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। তবু আমার বক্তব্যটুকু বলে রাখা দরকার, ফল হোক বা না হোক।

আমার রচিত 'বারবেলা বৈঠক' পুস্তকের শেষের দিকটা প্রবোধকুমার সম্পূর্ণ বিকৃত করে অপরের নির্দেশনামা আমার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে আমাকে আরো ঘৃণ্যরূপে প্রকট করেছেন। 'বারবেলা বৈঠক' যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবেন।

কিন্তু আমি নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে বহুদিন পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী আছি। চলাফেরার শক্তি হারিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করতে পারি না। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আর বাদানুবাদে তলিয়ে যেতে চাই না। আশা করি, প্রবোধকুমারের এতেই তৃপ্তি হবে।

শশাঙ্কমোহন চৌধুরী
কলিকাতা-১৪

॥ ৩ ॥

"বনস্পতির বৈঠক" পড়ে চলেছি এবং উপভোগও করছি। বলতে বাধা নেই, লেখক প্রায় প্রতি সংখ্যায় বেশ কিছু ভুল খবর পরিবেশন করে চলেছেন। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমিও এর আগে দুবার করেছি। এবারও করতে বাধ্য হচ্ছি।

এ সংখ্যায় 'দেশ'এর ৮৫৩ পাতায় প্রবোধবাবু লিখেছেন, "সুবোধ বসু রাজনারায়ণ বসুর ভাইপো। লতিকা হলেন রাজনারায়ণ দৌহিত্র কবি মনোমোহন ঘোষের ছোট মেয়ে।" এ কথাটা কি ঠিক? আমাদের যতটা খবর ছিল (অবশ্য সেই সময়ে) তাতে জানতাম, ডাঃ সুবোধ বসু রাজনারায়ণ বসুর নাতি, ভাইপো নয়। এ ব্যাপারে আলোকপাত করলে সুখী হব।

এবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ৮৫৫ পাতার প্রতি—যেখানে প্রবোধবাবু সুভাষ বসুর সঙ্গে লতিকা বসুর (ঘোষ বললেই বোধ হয় ভাল হয়) কাজ করতে পারার দুটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে বাইরের লোকের কিছু বলা মুশকিল, কারণ কথা হয়েছিল প্রবোধবাবু ও লতিকা বসুর মধ্যে। তবে দু নম্বর শর্তটি যে প্রতিপালিত হয় নি সে সম্বন্ধে আমি ও আমার সমসাময়িক ছাত্ররা ওয়াকিবহাল। সেটা ছিল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। স্যার জন সাইমনের আগমন উপলক্ষ করে সারা ভারত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল যার ঢেউ আমাদের গায়েও এসে লেগেছিল। আমরা তখন স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। সেখানে ঐ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে এক ছাত্র বিক্ষোভের সূত্রপাত হয় যার নেতা ছিলেন আমাদের শচীনদা ('শচীন্দ্রনাথ মিত্র)। ঐ ব্যাপারে আমরা ১২২ জন ছাত্র কলেজ থেকে 'রাস্টিকেটেড' হই। আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য আমরা সদলে গিয়ে সেই সময়কার তরুণ সমাজের উপাস্য নেতা সুভাষবাবুর শরণ নিই। উনি আহ্লাদে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। হেদোর উত্তর-পূব কোণে আমাদের রোজই মিটিং হত। সুভাষবাবু সভাপতি ও প্রধান বক্তা (তখনও প্রধান অতিথি প্রথা চালু হয় নি)। আরো দুজন বেশ নামকরা লোক আমাদের সভায় যোগ দিয়ে আমাদের উৎসাহবর্ধন করতেন। একজন হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম—যাঁর গানের সুরে ও ছন্দে আমরা উন্মাদনা অনুভব করতাম। আর একজন হলেন এই লতিকা বসু। এঁর সম্বন্ধে প্রবোধবাবু এত লিখেছেন যে, আমার আর লেখার কিছুই নেই। তবে সত্যি কথা বলতে কি, লতিকা বসুর সভায় উপস্থিত ছাত্রমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত। আমাদের তখন এমন অবস্থা ছিল না যে, এঁদের বসার জন্য আলাদা কোন বন্দোবস্ত করি। তাই সুভাষবাবুকেও হেদোর সেই চিরপরিচিত কাঠের বেঞ্চের মাঝখানে বসতে হত। তাঁর ডান দিকে বসতেন লতিকা বসু আর বামে কাজী সাহেব। সামনে একটা টেবিলে কাজী সাহেবের জন্য একটা হারমনিয়াম চেয়েচিন্তে নিয়ে আসতাম। তা হলেই বুঝতে পারছেন সুভাষবাবু এবং লতিকা বসু আমাদের মিটিংয়ে পাশাপাশি বসে তাঁদের তথাকথিত দু নম্বর শর্তটি ভেঙেছেন। কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে নিই—আমাদের যথার্থ ছাত্র আন্দোলনের শুরু হয়েছিল স্কটিশচার্চ কলেজের এই ব্যাপারে এবং এরই কিছু দিন আগে হেরম্ব ভট্টাচার্য মহাশয়ের নেতৃত্বে সিটি কলেজে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে।

একটা অনুরোধ করেই চিঠিখানা শেষ করছি; কারণ, ইতিমধ্যে এটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ভারতপূজ্য শ্রীঅরবিন্দের পিতৃদেবের উপপত্নীর (রাঙ্গামা) সম্বন্ধে এত না লিখলে প্রবোধবাবুর আত্মজীবনী প্রকাশে কোন ত্রুটি থেকে যেত কি?

সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজেন্দ্রনগর, পাটনা-১৬

বনস্পতির বৈঠক প্রসঙ্গে

আমার স্মৃতিচারণের লেখাগুলি পড়ে যাঁরা মাঝে মাঝে আমার ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। স্মৃতিচিত্র সব সময় নির্ভুল হয় না, সেই কারণে যাঁরা ছোট ছোট ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁরা বন্ধুর কাজই করেন।

আমার এই লেখাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও দু'চার ছত্র পাঠ করে আমার দুই প্রিয় বন্ধু শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র দুঃখিত হয়ে আমাকে কিছু কটুভাষণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের এই পরিণত জীবনে আঘাত পাবেন এটি আমার পক্ষে একেবারেই কাম্য নয়। কিন্তু বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে আমার উক্ত দুই বন্ধু বহু সংখ্যক 'অন্তরঙ্গ' পত্রাদি আমাকে লিখেছেন, এবং সেগুলিতে তাঁরা নিজেদের কথা নিজেরাই লিখে বসে আছেন! সেই কারণে তাঁদের কটুভাষণে আমি কিছু কৌতুক বোধ করেছি। তাঁরা আরেকটু সংযত ভাষায় লিখতে পারতেন।

প্রেমেন্দ্র বলেছেন, আমি নাকি তাঁর সঙ্গে 'অন্তরঙ্গতার ভাব' দেখিয়ে তাঁর সম্বন্ধে দু'একটি ঘরোয়া কথা লিখেছি। আমি একটিমাত্র ভাব জানি, যেটি বন্ধুভাব। বন্ধুভাব থেকেই অন্তরঙ্গতা আসে। যাই হোক, আমি এই সূত্রে প্রেমেন্দ্রর কোনো কোনো মিষ্টমধুর পত্র তুলে দিতে পারি যার মধ্যে 'অন্তরঙ্গতার ভাব' ছাড়াও ঈষৎ বন্ধুভাবও পাওয়া যেতে পারে।

শৈলজানন্দর চিঠিগুলি একান্তই ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুদের আমি কোনও প্রকারেই বিব্রত করতে চাইনে। তবে তাঁরা যদি চান,—আমি সর্বপ্রকার প্রমাণাদি সহ সেগুলি আলোচনা করতে প্রস্তুত থাকব।

প্রবোধকুমার সান্যাল
কলিকাতা-১৯

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

গত ৮ অগ্রহায়ণের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসুদেব রায়চৌধুরী মহাশয় বিদেশী সন্ন্যাসী স্বামী পরহিতানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত রচনাটিতে (ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, পৃঃ ৮৬৭) এক জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দ 'মন চল নিজ নিকেতনে'র রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। লেখক মহাশয়কে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 'মন চল নিজ নিকেতনে' এই গানটির রচয়িতা স্বামী বিবেকানন্দ নন, এমনকি এই গানটির সুরকারও তিনি নন। তিনি এই গানটির গায়ক মাত্র। অবশ্য এটি ছিল তাঁর খুব প্রিয় গান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখবার জন্যে নরেন্দ্রনাথ (তখনও তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হন নি) প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে যান তখন তিনি তাঁর সম্মুখে "ব্রাহ্ম সমাজাদৃত 'মন চল নিজ নিকেতনে' এই গানটি গাহিলেন।" (প্রমথনাথ বসু কৃত 'স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০০)। এই বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীতটির রচয়িতার নাম সম্পর্কে যে সংশয় ছিল তার নিরসন হয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৩৩৮ সালের মাঘ মাসে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত একাদশ সংস্করণ 'ব্রহ্মসঙ্গীত'-এ। এতে 'গানের আদির সূচী' বিভাগে 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানের রচয়িতা হিসেবে অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর নাম মুদ্রিত হয়েছে। সুরটা মল্লার (একতালা) রাগিণীতে রচিত, ১৬১৭ নম্বর এই গানটি স্থান পেয়েছে ব্রহ্মসঙ্গীতের (একাদশ সংস্করণ, একাদশ অধ্যায়) ৭৯৭ পৃষ্ঠায়। তথ্যের দিক দিয়ে সতীশবাবুর সম্পাদিত সংস্করণ যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য এ বিষয়ে দ্বিমত নেই।

তথ্যঘটিত আর একটি ভুল চোখে পড়ল রচনাটিতে। সুদেববাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামী পরহিতানন্দ বলেছেন, "বাবা বিশ্বনাথ দত্ত মারা যাবার পর স্বামীজী কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন। পবিত্র মার কাছে ছুটে যান। মা তখন বলেছিলেন সব ঠিক হয়ে যাবে। বাজে চিন্তা করিস না।"

'পবিত্র মা' যে ইংরেজী Holy Mother শব্দ দুটির বাংলা ভাষান্তর তা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়। রামকৃষ্ণ মিশনে এবং মিশনের বাইরে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী সারদামণি দেবীর 'শ্রীমা' বা 'হোলি মাদার' এই আর এক অভিধা। আলাপচারণার সময় পরহিতানন্দও এক জায়গায় বলেছেন, "কুঁড়ে ঘরে জন্মেছিলেন 'হোলি মাদার'—সারদা দেবী।' (দেশ পৃঃ ৮৬৯)

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, পরহিতানন্দ যখনকার ঘটনার কথা বলছেন তখন শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী অর্থাৎ শ্রীমা বা 'হোলি মাদার' দক্ষিণেশ্বরে আসেনই নি। ঠাকুর, স্বামীজী এবং শ্রীমায়ের সব নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য জীবন চরিত্র এ কথাই বলে। আসল তথ্য হচ্ছে এই যে, সদ্য লোকান্তরিত বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত তৎকালে (তখনো তিনি স্বামীজী হন নি) একদিন ছুটে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে। ঠাকুর তাঁকে পর পর তিনবার পাঠিয়েছিলেন ভবতারিণী দেবীর মন্দিরে পার্থিব সম্পদ যাচ্ঞা করবার উপদেশ দিয়ে। কিন্তু তিন তিনবারই যখন ব্যর্থকাম হলেন নরেন্দ্রনাথ পার্থিব সম্পদের জন্য প্রার্থনা জানাতে তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বলেছিলেন, "যা, মার ইচ্ছায় আজ থেকে আর তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।" এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা আছে প্রমথনাথ বসু রচিত স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনী স্বামী বিবেকানন্দ নামক পুস্তকের প্রথম ভাগে। (২য় সং পৃঃ ১১৮-১১)।

আলোচ্য 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' নামক প্রবন্ধটিতে দেখতে পাই নরেন্দ্রনাথের প্রতি পরমহংসদেবের উক্তিও পরিবেশিত হয়েছে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে।

নলিনীকুমার ভদ্র
কলিকাতা-৯

প্রোটিন-ক্যালরি

গত ২৩শে জুন তারিখের দেশ পত্রিকায় শ্রীপ্রতুলনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় "ভারতে প্রোটিন-ক্যালোরি অপুষ্টি জনিত সমস্যা" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে ডিমের প্রোটিনের net utilisation ১০০% ও দুধের প্রোটিনের ৭৫% বলা হইয়াছে।

ডিমের প্রোটিনের ১০০% utilisation তখনই সম্ভব যখন ডিম কাঁচা খাওয়া হয়। আমরা অধিকাংশই সময়েই hard boiled বা ভাজা ডিম ব্যবহার করি। ঐ অবস্থায় protein-এর net utilisation ১০০% হওয়া সম্ভব নয়।

দুধের প্রোটিনের net utilisation-এর শতকরা হার ৯৪% এর কম নয়। ক্রীম-তোলা দুধের প্রোটিনের বেলায় ৯৫% হয়। প্রতুলবাবু ঐ হার ৭৫% বলিয়াছেন।

প্রবন্ধের শেষের দিকে ১৯৭০ সালের মোট খাদ্য উৎপাদন ও ১৯৭৩ সালের মোট চাহিদার যে পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে তাহা বিভ্রান্তিকর। আমার মনে হয় ছাপার ভুল ঘটিয়াছে। নতুবা প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন ১০ হইতে ১২.৫ টন বেশি দেখান হয় কি করিয়া?

বিনয়কুমার দাশগুপ্ত
কলকাতা-১০

নতুন পাঠক্রম

৮ই আষাঢ়ের দেশের আলোচনা স্তম্ভে 'নতুন পাঠক্রমের বিরোধিতা' শীর্ষক ১৯শে জ্যৈষ্ঠের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জবাবে শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যা লিখেছেন তাতে প্রকৃত-তথ্যভিত্তিক নয় এমন কিছু কথা আছে। মোহিতবাবু লিখেছেন '১৯৪০ পর্যন্ত দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ-ক্রমের আবশ্যিক তালিকায় ছিল * * * মোট ৪টি বিষয়।' কথাটি একেবারেই ভুল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রবর্তনের পর থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত স্কুলের শেষ পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিত ছাড়া আবশ্যিকভাবে পড়তে হত আরও দুটি ঐচ্ছিক বিষয়—ইতিহাস, ভূগোল, অতিরিক্ত গণিত বা সংস্কৃত, মেকানিকস প্রভৃতি থেকে নিজের পছন্দমত নির্বাচিত দুটি বিষয়। তার অর্থ মোট আবশিক বিষয় ছিল ছয়টি (৪টি নয়)। তারপরে ১৯৪১ থেকে পরীক্ষার বিষয়সূচীতে ইতিহাস ও ভূগোল আবশ্যিক বিষয় করা হল এবং বিষয় সংখ্যা ছয় থাকলেও বাংলা ও ইংরাজীর পাঠ্যসূচী ব্যাপকতর হল এবং পরীক্ষার পত্রের সংখ্যা বাড়ল এবং পূর্ণ নম্বর বেড়ে ৭০০ থেকে হল ৮০০। এই পাঠ্যসূচীতে অতিরিক্ত (আবশ্যিক নহে) বিষয় হিসাবে ইচ্ছা করলে আরও ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ ছিল। তারপরে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম প্রবর্তনের কয়েক বৎসর পরে একাদশ তথা দশ শ্রেণী স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে সমতা রক্ষা করার জন্য বোর্ডের Sy L/1/62 নম্বরের সারকুলার অনুযায়ী ১৯৬৫ থেকে যে পাঠ্যসূচী চালু হয়েছিল তাতে ছিল আটটি আবশ্যিক বিষয়। যথা—প্রথম ভাষা (বাংলা), দ্বিতীয় ভাষা (ইংরাজী), গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, তৃতীয় ভাষা (সংস্কৃত), অথবা অতিরিক্ত গণিত (বিজ্ঞানের পাঠ-ক্রমের জন্য) এবং আরও একটি অবশ্য পঠনীয় ঐচ্ছিক বিষয়। তখন আটটি আবশ্যিক বিষয়ের জন্য মোট পূর্ণ নম্বর করা হল ১০০০। মোহিতবাবুর একথা সত্য নয় যে নূতন প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীতে বর্তমানে চালু স্কুল ফাইনালের পাঠক্রমের সাপেক্ষে পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়সংখ্যা বা পূর্ণ নম্বর কোনটাই বাড়াবার প্রস্তাব করা হয়নি। বিজ্ঞানের দুটি বিভাগকে দুটি পৃথক বিষয় মনে করবার কোন যুক্তি নেই; কারণ, বর্তমানে পঠনীয় সাধারণ বিজ্ঞানের ভিতরেও অনুরূপ বিভাগ রয়েছে।

প্রচলিত পাঠ্যসূচীর গুরুভারের প্রশ্ন উঠেছে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের পঠিতব্য বিষয়গুলির বিচারে। দশ শ্রেণী স্কুল আবার চালু করে সেই পাঠ্যসূচীর দুরূহতা ও গুরুভার (যা পনেরো বৎসর বয়সে আয়ত্ত করা কঠিন) কমানোর ব্যবস্থা হচ্ছে এ কথা অনস্বীকার্য।

তিনটি ভাষা নিয়ে খুব আপত্তি উঠেছে। কিন্তু গত বাট বৎসর ধরে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় তিন ভাষার পাঠ্যসূচী চালু ছিল ও রয়েছে। নতুন করে এ জন্য এত কলরব কেন?

মোহিতবাবু নতুন পাঠ্যসূচী চালু হলে সপ্তাহে কতগুলি ক্লাসের প্রয়োজন হবে তার একটা সংখ্যা দিয়েছেন। কিসের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হয়েছে যা পাঠ্যসূচীর বিশদ বিবরণ না পেলে এটা কি করে পাওয়া যাবে জানিনে। বর্তমান স্কুল ফাইনাল ও উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর পঠনপাঠন যদি ৩৯ পিরিয়ডের মধ্যে সংকুলান করা সম্ভব হয়ে থাকে তবে নূতন পাঠ্যসূচী নিয়েও কোন সমস্যা হওয়ার সঙ্গত কারণ নেই; কারণ, যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় নূতন পাঠ্যসূচীতে কোন কোন বিষয়ের ব্যাপকতা সীমিত করা হয়েছে।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বহরমপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

॥ ২ ॥

আপনাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "নতুন পাঠক্রমের বিরোধিতা" অভিনন্দনযোগ্য। ধন্যবাদ। আপনাদের বক্তব্য পরিষ্কার। পাঠ-ক্রম সম্পর্কে যে পরিবর্তন আসছে—তা নিয়ে হই-চই শুরু হয়ে গেছে। এবার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন পঃ বঃ প্রধান শিক্ষক সমিতি। এ বি টি এ তো এ বিষয়ে নীরব নয়। তারাও বিরোধী। আপনাদের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য। "পাঠক্রম গুরুভার" হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক সমিতি সে ব্যাখ্যা করেননি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তাঁদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। সকল প্রধান শিক্ষককেই এক-হাত নিয়েছেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষকদের একমাত্র সমিতি প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। ফলে বিভ্রান্তি চরমে উঠেছে। আলিপুরদুয়োরে প্রধান শিক্ষকদের যে সম্মেলন হলো, তাতে এ বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে সংবাদপত্রে দেখা গেল। তাতে দেখা গেছে পর্ষদের দুজন সদস্য শ্রীমতী এস সান্যাল ও শ্রীবাগেশ্বর ভট্টাচার্য পর্ষদ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সমর্থন করেছেন। শ্রী বি ভট্টাচার্য বিরোধিতা করে-ছেন। শ্রী বি ভট্টাচার্য সমিতির সভাপতি। প্রভাবশালী নেতা। ফলে সমিতির সদস্যরা তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারে। সেখানে নাকি তীব্র উত্তেজনা। শ্রীমতী সান্যালকে কোণঠাসা করা হয়েছে। কিন্তু সমিতির বক্তব্য কি তা বলা হয়নি। অন্তত সংবাদপত্রে এখনও তা আসেনি। কয়েকটা বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করে বক্তব্য রাখলেই প্রগতিশীল হওয়া যায়—একথা আজ আর চলে না। বক্তব্য পরিষ্কার চাই। প্রধান শিক্ষকদের সমিতি বলুন—তাঁরা কি চান। তাঁরা 'আন্দোলন' করবেন ঠিক করেছেন। তা হলে এ বি টি এ কি করবেন? তাঁদের কিছুই করার থাকছে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে আবার নৈরাজ্য আসছে কি? এর প্রধান পুরোহিত কি বিদ্যালয় প্রধানগণ?

অপরাজিতা দাশগুপ্ত
কলিকাতা-১৫

বিহারে বাংলাভাষা

মঞ্জুলী ঘোষ বিহারের বাংলার ভাষা-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার জন্য ধন্যবাদার্হ। এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ বিহারে বঙ্গভাষীর সংখ্যা উনিশ লক্ষ। সঠিক পরিসংখ্যান না জানা থাকলেও উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লী অঞ্চলেও বাঙালীর সংখ্যা নগণ্য নয়, একথা সকলেই মানবেন। এই কয়েক লক্ষ লোকের ব্যবহৃত ভাষা যদি নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার ভাষা থেকে ভিন্নরূপ ধারণ করে সেটা স্বাভাবিক এবং হয়ত পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে এই পরিবর্তন ভাষার জীবনীশক্তিরই লক্ষণ। বাংলায় হিন্দীর প্রভাব দেখতে পেলে আমরা হায় হায় করবো, না খোট্টাই বাংলা নিয়ে গতানুগতিক পরিহাস করবো, অথবা এটাকে স্বাভাবিক ভৌগোলিক বিবর্তন বলে মেনে নেবো, বিতর্কমূলক বিষয় হলেও এ বিষয়ে আলোচনার সময় এসেছে।

ইংরিজি নিয়ে এ ধরনের আলোচনা বিভিন্ন দেশে হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে। আমেরিকার ভাষা যে ইংলণ্ডের ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক এটা এখন স্বীকৃত। তেমনি অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরিজির ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব রূপ গড়ে উঠছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় ইংরিজি বলে কিছু আছে কি না এ নিয়ে গত বৎসর হায়দ্রাবাদের সেণ্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইংলিশ বিশেষজ্ঞদের এক সেমিনার হয়ে গেল। সেখানে সমস্যা দেখা দেয় যে, বাঙালী ইংরিজি, তামিল ইংরিজি বা পাঞ্জাবী ইংরিজি ধ্বনিতত্ত্ব ও বাক্যরীতির দিক দিয়ে সহজেই পৃথকভাবে চিহ্নিত করা গেলেও সর্বভারতীয় ইংরিজির জন্য কোন সাধারণ মান তেমন অনায়াসে পাওয়া যায় না। এ নিয়ে বিশ্লেষণ ও গবেষণা চলছে শুনতে পাই।

কোন ভাষায় কতদূর পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিবর্তন স্বীকার্য এবং কোথায় গেলে সেটা বিকৃতির পর্যায়ে দাঁড়ায় এটা অবশ্যই খুব সূক্ষ্ম বিচার, কিন্তু তবুও আমাদের দেশের বহুভাষাগত সংস্কৃতিতে পারস্পরিক প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতার দরকার আছে। মঞ্জুলী ঘোষের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আশা করি, সে বিষয়ে কিছু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়
নিউ দিল্লী-৪৮

১১

অভিজিৎ অফিসে বেরোচ্ছে, পরমেশ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সেদিন।

বললেন, "এই অভি, শোন।"

অভিজিৎ থমকে দাঁড়ালো। —"কিছু বলবে বাবা?"

পরমেশ একবার ছেলের চোখের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলেন দৃষ্টি। টেবিলের ইংরেজি খবরের কাগজটার দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ।"

তারপর একটু থেমে বাকি কথাটা প্রকাশ করলেন পরমেশ।

বললেন, "বলছিলাম, আমাদের ভাগলপুরে ফেরার ব্যবস্থা করে দে। এখানে আর ভালো লাগছে না। তোর মায়েরও সেই রকম ইচ্ছে।"

অভিজিৎ বুঝলো, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর, ঢের চিন্তা-আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে, এই বৃদ্ধ দম্পতি নিজেদের সংকল্প স্থির করেছেন। প্রতিবেশীদের ভরসায় একা ভাগলপুরে বাস করা ওঁদের পক্ষে বিপজ্জনক এখন, তবু পুত্রের সংসারে বহাল-তবিয়তে থাকার চেয়ে তা অধিকতর স্বস্তিকর মনে হয়েছে ওঁদের।

—"বেশ, তাই হবে।" বলে অভিজিৎ সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো। নামতে নামতে এক বছর পেছন দিকে চোখ পড়লো তার। দেখলো, দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন পরমেশ।...

সেলস ম্যানেজারের খাস কামরায় মীটিং বসেছিল সেদিন। বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এসেছেন।

বার্ষিক বাজেট নিয়ে আলোচনা হলো অনেকক্ষণ ধরে। কী কী খাতে বরাদ্দ টাকাটা খরচ করলে বিক্রির দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধে হবে, সে বিষয়ে সকলেই নিজের নিজের মতামত রাখলেন। এবং শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একটা কর্মসূচী অনুমোদিত হওয়ায় শ্রীমান রঞ্জিত চাওলা তো বটেই, অন্য সকলেও সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত। যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা তেমন আয়াসসাধ্য নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়াই সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশেষত, যেখানে একাধিক ব্যক্তির মতামত ও স্বার্থ জড়িত।

বাইরের লোকেরা চলে যাওয়ার পর/ অভিজিৎ উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় রঞ্জিত চাওলা বললো, "একটু বোসো ব্যানার্জি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

চেয়ারের ওপর টান হয়ে বসলো অভিজিৎ। চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ধরলো সামনে। ভাবটা, কী কথা, বলে ফেল চটপট, সময় নষ্ট করে কী লাভ!

চাওলা বললো, "আজকের মীটিং-এ তোমার বক্তব্য আমি ঠিক বুঝতে পারি নি, বন্ধু। তুমি বললে, গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। গত বছর ভার্নাকুলার কাগজগুলোয় বিজ্ঞাপন বিতরণ করা স্থির হয়েছিল। এবং প্রচুর টাকা খরচ করা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। ঠিক। কিন্তু, তুমি তো কোনো বিকল্প প্রস্তাব রাখলে না?"

—"বিকল্প প্রস্তাব কি?"

—"মানে, তোমার মতে, অন্য কীভাবে প্রচার করলে আমাদের মেসেজ প্রতিযোগীদের ছাপিয়ে কনজিউমারের কাছে পৌঁছবে। এই।"

অভিজিৎ বললো, "আমি তোমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই একমত নই। সুতরাং বেশি কথা বলতে চাই নি।"

—"কেন?"

—"কারণ, প্রতিযোগীদের সঙ্গে ঘোড়-দৌড়ের পন্থা যদি অবলম্বন করো, তা হলে খরচ উত্তরোত্তর বাড়বে, প্রচারের ঢক্কানিনাদে দেশবাসীর কানে তালা লাগবে, চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। সত্যিকারের লাভ হবে না, আর কি। এই সব খরচের বোঝা তো সেই কনজিউমারের কাছ থেকেই আদায় করবো আমরা।"

টেবিলের কাগজপত্র নাড়তে নাড়তে রঞ্জিত ওর কথাগুলো শুনছিলো। এবার বললো, "তা হলে, তুমি কী করতে বলো?"

অভিজিৎ এবার নড়ে-চড়ে বসলো।

বললো, "দেখ, আমরা যে প্রোডাক্ট মার্কেট করি, তার বেশির ভাগ অংশ গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের ভোগে লাগে। দেশে এখন সমস্ত ভোগ্যপণ্যের দাম এত দ্রুত বাড়ছে যে তারা আর পেরে উঠছে না। তাদের আয় তো সেই অনুপাতে বাড়ছে না। এমনি সময়, আমার মনে হয়, যতদূর সম্ভব খরচ কমানো উচিত আমাদের, আর প্রোডাক্টের দাম কমিয়ে সেই সেভিং কনজিউমারকে ফেরত দেওয়া দরকার। আমাদের দেশ তো ইয়োরোপ না, আমেরিকা না, এখানে দু-চার পয়সা দামের তফাতেও অনেকের কাছে আকর্ষণীয় করবে আমাদের জিনিস। লোক খুশী হবে। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ড্রাস্টিক কিছু না করলে আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারবো না।"

চাওলা একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরম কৌতুক চেয়ে রইলো অভিজিতের দিকে। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলো হঠাৎ।

বললো, "তোমার প্রস্তাব কিন্তু আত্মঘাতী!"

অভিজিৎ বললো, "নিজে আমি বিপদে পড়বো বলছ? আমার চাকরি থাকবে না বিজ্ঞাপন বন্ধ হলে? না থাকে থাকবে না! আমি বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবছি।"

অভিজিৎকে সিরিয়াস দেখে চাওলা বললো, "জোকস অ্যাপার্ট তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। কেন, বলছি। দেখ আমাদের প্রতিষ্ঠান বিদেশী তার একটা গুডউইল আছে বাজারে। যদিও স্থানীয় মালমশলা

দিয়েই আমাদের প্রোডাকট্ তৈরী হয়, তবে আমাদের তৈরী জিনিসের ইমেজ বাড়ে। মানে অনেকের চেয়ে ভালো জিনিস, অথাৎ দাম বেশি। খুশী হয়েই লোকে বেশি দাম দেয়। দাম কমালে ওরা ভাববে, বাজে এবং এবার খেলো মাল ছাড়ছে বাজারে।

—"না। ওরা ভাববে, এই প্রতিষ্ঠান বিদেশী হলেও সৎ। দরকার হলে, আমরা সততার ব্যাপারটা প্রচার করতে পারি।"

বলে অভিজিত হাসলো এবার।

রঞ্জিত চাওলা আর কিছু চিন্তা করলো না। টেলিফোন তুলে সেক্রেটারিকে ডাকলো। বললো, "আগামীকাল এই সময়ে আবার মীটিং ডাকো।"

সেক্রেটারি মেয়েটি আজকের আলোচনা-সভায় উপস্থিত ছিল। আশ্চর্য হয়ে জিগেস করলো, "তা হলে, আজ যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো......?"

ওর দিকে চোখ না ফিরিয়েই চাওলা বললে, "তার পুনর্বিবেচনা হবে কাল।"

মেয়েটি চলে যাবার পর রঞ্জিত এলিয়ে পড়লো নিজের চেয়ারে।

অভিজিতকে বললো, "লেট আস রিল্যাকস্। একটু অন্য কথা বলা যাক।"

—"এ-দেশটা ইয়োরোপ নয়, ভারতবর্ষ, তুমিই বলেছিলে না একদিন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই তো বলেছিলে! আমরা ভুলে যাই মাঝে মাঝে! তুমি কিন্তু ঠিকঠাক বলেছ, তাই না?"

কেন? অভিজিত চোখ কুঁচকে তাকালো চাওলার দিকে।

জিগেস করলো, "কেন ওকথা বললে হঠাৎ?"

—"আইভি বলছিল সেদিন। আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম।"

—"কী বলছে" প্রসঙ্গটা হঠাৎ পারিবারিক পর্যায়ে নেমে যাওয়ার ফলে অভিজিত গলায় একটু পরিহাসের সুর আনার চেষ্টা করলো।"

—"কী বলেছে আইভি? খুব নোংরা দেশ? রোগ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা কোলাহলে ভর্তি—এই সব সত্যি, ওর খুব অসুবিধে হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করতে!"

একটু চুপ করে থেকে রঞ্জিত জিগেস করলো, "তোমার পেরেণ্টস এখনো আছেন এখানে?"

—"হ্যাঁ, আছেন। ওঁরা চলে গেলে আইভির পক্ষে হয়তো কিছুটা স্বস্তিকর হয় ব্যাপারটা। যদিও আমার বাবা এবং মা দুজনেই ওয়ণ্ডারফুল পিপল। একমাত্র দোষ, ওঁরা বৃদ্ধ, আগের জেনারেশনের মানুষ। কিন্তু যাই হোক, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না তো। কী বলেছে আইভি?"

হাসতে হাসতে চাওলা বললো, "মেয়েদের মধ্যে কথা, তুমি যেন সিরিয়াসলি নিও না। আইভির ধারণা, ও একটা ট্রাইবাল ফ্যামিলিতে এসে পড়েছে। ওর মনে হয়েছে হয়তো, এত বড়ো দেশটা নানান ট্রাইব-এর একটা জোট। যেমন, তুমি বেঙ্গল ট্রাইব থেকে এসেছ, আমি পাঞ্জাব ট্রাইব থেকে—সেই রকম। ওদের দেশে আগে এই রকম ক্ল্যান ছিল। উপজাতি বিশেষ।"

অভিজিত কোনো মন্তব্য করলো না প্রথমটা। তারপর বললো, "আমার মা-বাবা আমার কাছেই থাকবেন, যতদিন তাঁরা বেঁচে আছেন। তার ফলে যা হবার হবে।"

—"হবে আবার কি! কিছুই হবে না।" চাওলা শান্ত করবার চেষ্টা করলো অভিজিতকে।

বললো, "ক্রমশ স-ব ঠিক হয়ে যাবে!"

আবহাওয়া বড়ো গম্ভীর হয়ে গেছে। সহজ করার উদ্দেশ্যে চাওলা যোগ করলো, "একদিন আইভিকে নিয়ে এসো না সন্ধের দিকে। এই উইক-এণ্ড-এই এসো না। আমরা একসঙ্গে কোনাভালা যাবো। সারাদিন কাটিয়ে আসবো। তোমাদের ভালো লাগবে।"

—"দেখি।" সংক্ষেপে উত্তর দিল অভিজিত।

নিজের কামরায় ফিরে এসে অভিজিত চুপ করে বসেছিল অনেকক্ষণ। ভাবছিল নানান কথা। সেই—আইভির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ মধুর মিথ্যে দিয়ে ঘেরা। সেই ছুটির দিনগুলোয় বেড়িয়ে বেড়ানো। দুটো চঞ্চল পাখির মতো খড়কুটো কুড়িয়ে একটু একটু করে ঘরবাঁধার দিনগুলো।

—"না, তুমি বেরোবে না। আমি বলছি, তুমি বেরোবে না।"

হঠাৎ অভিজিতের চমক ভাঙলো।

পাশের ঘরে অমরনাথ আর তার স্ত্রীর মধ্যে কোনো ব্যাপারে বচসা চলছে, ও অনুমান করলো।

শুনলো, অমরনাথ বলছে, "তুমি কী করবে, না করবে, তা আমি জানি। সব ব্যাপারে তোমার মাথা গলাবার দরকার নেই।"

চাপা গলায় নারী কথা বলছে। এরপর আর কিছু শোনা গেল না।

অভিজিত বইয়ের ঘরে বেতের মোড়াটায় বসে আর-একটা সিগারেট ধরালো।

মনে মনে বললো, "কত দম্পতি, এই রকম মনান্তর থাকা সত্ত্বেও কেমন সংসার করে। সারাজীবনটাই কাটিয়ে দেয়। তোমরা পারলে না? ব্যাপারটা তোমার জীবনে বড়ো খাপছাড়াভাবে ঘটে গেল, তাই না? নাকি পরস্পরের প্রতি টান যতদিন অপ্রতিরোধ্য হলে সব সমস্যার কামড় শিথিল হয়ে থাকে, তোমাদেরটা তার চেয়ে কমজোর ছিল?"

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেন অভিজিত নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর দিল।—"হতে পারে। ইতুর চলে যাওয়াটা, বাস্তবিক, বড়ো অ্যাবরাপ্ট।"

না, ইতু নির্বোধ ছিল না। অসৎ ছিল না। সাধারণ মেয়েদের চেয়ে বেশি খামখেয়ালি ছিল না। তবে?

হয়তো তীব্র বিরাগ! ইতুর দিক থেকে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলো অভিজিত।

বৈরাগ্য বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা গল্প মনে পড়লো অভিজিতের। ছোটবেলায় মায়ের কাছে শোনা।

একজনের স্ত্রী তার স্বামীকে একদিন বললো, জানো, আমার দাদা কিছুদিন থেকে সন্ন্যেসী হবার চেষ্টা করছে। খাওয়া কমিয়েছে, মাটিতে শোয়, পরিবারের সঙ্গে কথা কয় না, আবার গেরুয়া রঙে কাপড় ছুবিয়েছে।

শুনে স্বামী বললো, ধুৎ, ওভাবে, একটু একটু করে সন্ন্যেসী হওয়া যায় না। কী করে হয়, দেখাচ্ছি।

ব'লে, নিজের পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে কোপীন করে প'রে বেরিয়ে গেল। আর এল না।

কোনো-কোনো মানুষ আছে, রামকৃষ্ণ বলেছেন, যারা হঠাৎ এইভাবে সর্বস্ব ছেড়ে-ছুড়ে দিতে পারে, সেই মাত্র বুঝতে পারে এই সংসারে লেগে থাকার মতো কোনো রস নেই।

তারা অবশ্য বড়ো একটা কিছুর সন্ধান পেয়ে তবে যায়।

আইভি চলে যাওয়ার দিন অভিজিত গিয়েছিল জাহাজঘাটায়। বিদায় জানাতে। বিচ্ছেদ-বেদন হীন সেই বিদায়ের দৃশ্য। চুপচাপ।

ডাক পড়তে আইভি অভিজিতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। শুকনো গলায় বলেছিল,—"বাই"।

দৃশ্যটা এখন মনে পড়লো আবার। অভিজিত মনে-মনে বললো, ইতু তোমার ছেড়ে যাওয়াটা আমি দেখেছি। কী পেলে, কোনোদিন জানতে পারবো না। তুমি সুখী হও।

বেশ খানিকক্ষণ পরে অমরদার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীও বেরিয়ে এল বাইরের ঘরে। দাড়ি কামিয়ে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে অমরদা প্রস্তুত।

বললো, "চলো অভি। অনেকক্ষণ একা বসে থেকে বোর্‌ড হয়ে গেলে, তাই না? চলো, পুষিয়ে দেবো।"

—"আমি বলছিলাম কি," সাবিত্রী পেছন থেকে কথা বলে উঠলো, অভিজিতকে উদ্দেশ করে বললো, "আপনি এখানে দুপুরে খেয়ে যান না। গল্পসল্প করুন। বাইরে যাবার কী দরকার? আপনার দাদার শরীরটা তো—"

—"সে তুমি বুঝবে না।" অমরদা গম্ভীরভাবে জবাব দিল।

বৃথা প্রতিরোধ, সাবিত্রী জানে। তবু, অভ্যাস চেষ্টা করে। চেষ্টা না করে পারে না।

—"বুঝি, সবই বুঝি। বাড়িতে থাকতে তোমার ভালো লাগে না। উনি একদিন এলেন, ওঁকেও বাইরে নিয়ে যাচ্ছ!"

"কী মুশকিল! সব কিছুতেই তুমি একটা মানে বার করবে! ছুটির দিন সকালে কেউ বাড়ি থেকে বেরুবে না! এতো ভারি আপদ!"

সাবিত্রী সম্ভবত এই ধরনের কথাবার্তায় অভ্যস্ত। ওরা দুজনেই। বললো, "আমিই তোমার আপদ, তা জানি।"

বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠলো। অভিজিত দেখলো, প্রৌঢ়া মহিলাটির জন্যে অমরদার কোনো রকম স্নেহ-প্রীতি আর অবশিষ্ট নেই। কী লাভ এইভাবে একসঙ্গে থাকার!

অমরদার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো এবার। হঠাৎ বললো, "যদি তাই ভাবো, তো তাই। আমারও সহ্যের একটা সীমা আছে।"

এমন একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে, অভিজিত কল্পনা করতে পারেনি। ওর ইচ্ছে করছিল, নিষ্পত্তি হোক, অমরদাকে বলে, থাকোই না বাপু। কী আসে যায়! বাইরে খেতে আমার তেমন আগ্রহ নেই।

কিন্তু বললো না। নিঃশব্দে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো। কারণ, অমরদা আগেই বলে রেখেছে, ও ঠিক ম্যানেজ করবে; করুক। এদের পারিবারিক সমস্যায় মাথা গলাবার কোনো মানে হয় না।

কী যে ব্যারাম অমরদার কিছুতেই অনুমান করতে পারছে না অভিজিত। এত সাবধানতা কিসের জন্যে? হার্ট খারাপ? ডায়বেটিস? নাকি সাবিত্রীর এ সব অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি? অমরদার সঙ্গে বয়সের বেমানান তফাতটা অসুখ দিয়ে পূরণ করতে চায়। জানতে ইচ্ছে করছে অভিজিতের।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা রাস্তায় নামলো।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী জিগ্যেস করলো, "কখন ফিরবে?"

—"ঠিক নেই। সন্ধ্যের পর ফিরবো। তুমি খেয়ে নিও।"

তারপর ওরা বাঁক ঘুরে হাঁটতে থাকে। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো দুজনে।

রাসবিহারী অ্যাভিনুর ট্রামলাইনের কাছাকাছি এসে অমরদার মুখে কথা ফুটলো।

—নাছোড়বান্দা। মুখটা কেমন তেতো হয়ে গেছে। পান খাবে?"

—"খেতে পারি।" ঠান্ডা গলায় বললো অভিজিত।

মোড়ের দোকান থেকে ওরা দুটো পান কিনে খেলো। ডান হাতের চেটোর ওপর জরদা খানিকটা রেখে তারপর ছুড়ে দিল মুখের মধ্যে।

অমরদা বললো, "জানো অভি, এই পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা নানাভাবে বসবাস করে। যেমন ধরো, হিন্দী সিনেমার কপোত-কপোতী। কী, যেমন এক-জোড়া জুতো — সোজা-উল্টো করে — পরস্পরের পরিপূরক। কিংবা, টেবিলের ওপর একজোড়া কাপ-ডিসের মতো ঘনিষ্ঠ। আবার কোথাও দেখবে, কাঁচির দুটো ব্লেডের মতো একসঙ্গে গাঁথা দুজন, সমান মাপে বাঁধা। ওরা নড়াচড়া করলেই কিছু একটা কেটে যাবে কুচ্ করে, চুপ করে থাকলে কোনো বিঘ্ন নেই। আমাদের সংসারটা এখন এই রকম। ব্যালান্স অফ টেরর—বুঝলে না? আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতেও পারি না। ছেড়ে দিতে পারি না।"

অভিজিত জিগ্যেস করলো, "কেন? মানে, বনিবনা না হলে—"

অমরদা বললো, "সাবিত্রী নেই ভাবলে নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হয়, অথচ—"

—"অথচ?"

—"অথচ, অসহ্য লাগে এক এক সময়ে।"

অভিজিত কোনো মন্তব্য করলো না।

ওরা একটা বাসে উঠলো।

প্রায় ফাঁকা বাসটা। ছুটির দিনের সকাল। রোদ বেশ চড়া হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। অমরদা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল সটান। পিছু পিছু অভিজিতও উঠলো। একেবারে সামনের সীটে গিয়ে বসলো দুজনে।

অমরদা বললো, "সত্যি, ভেবেছিলাম, কোনো একটা হোটেলে ঢুকে পানীয় সহযোগে একটু ভালো-মন্দ খাবো আজ। তোমাকে খাওয়াবো। তা, মেজাজটা খিঁচড়ে গেল এমন!"

তারপর একটু চুপ করে থেকে ফের বললো, "যাক গে। চলো তো। এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি তোমায়। ভালো লাগবে।"

—"কোথায়? গঙ্গার ধারে-টারে নয় তো? বা, বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর?"

—"না বাপু, না। চলো না। তুমি শুধু আমায় ফলো করে যাও।"

—"ফলো-ই তো করছি।"

অভিজিত সামনের একটা খাঁজে পা তুলে দিল।

শ্যামবাজারের দিকে চলেছে বাসটা। দোতলা বলে একটু আধটু দুলছে বাঁক নেবার সময়। বিকট শব্দ হচ্ছে কাঁ-চ করে। লোক উঠছে, লোক নামছে।

জানলা দিয়ে চেয়ে-চেয়ে অভিজিত বাইরেটা দেখতে লাগলো। পোস্টার ও বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ডে মোড়া এই শহরের দেওয়ালগুলো। সেই সব দেয়ালের আড়ালে কত রহস্যময় সব জীবন ধুকধুক করে বয়ে চলেছে, বাইরের শব্দে তা টের পাওয়া যায় না।

একটা হিন্দী ছবির পোস্টারে চোখ পড়লো অভিজিতের। চোখ পড়লো নায়িকার উদ্ধত স্তন দুটোর জন্যে।

জিগ্যেস করলো, "তুমি হিন্দী ছবি দেখ অমরদা?"

সে-কথার জবাব না দিয়ে অমরদা বললো, "আচ্ছা অভি, আমার ব্যবহার তোমার কাছে খুব বিশ্রী ঠেকলো, আজ, না?"

কোনো সংকোচ বোধ না করেই অভিজিত বললো, "হ্যাঁ।"

—"কোনো উপায় ছিল না, জানো। খানকির জাতকে একদম প্রশ্রয় দিতে নেই।"

অশ্লীল কথাটা নিজের কানেই কেমন কটু ঠেকলো। অভিজিত চুপ করে আছে দেখে ও বললো, "মেয়েদের সঙ্গে বসবাস করাটাই এক বিষম ঝামেলা। অথচ ওদের ছাড়া চলেও তো না।"

—"তা হোক।" অভিজিত এবার কথা বললো। "তুমি বড়ো কুচ্ছিত ব্যবহার করলে এখন। এটা না করলেও পারতে। খামাকা সাবিত্রীকে কেন অপমান করলে তুমি? আজ ওর কথাটা রাখতে পারতে।"

—"রোজই তো রাখছি। রাখতে রাখতে কথা আর কথা থাকে না। অভ্যাস হয়ে যায়। তা ছাড়া, কতকাল পর তোমার সঙ্গে দেখা, বলো?"

শব্দ করে বাসটা বাঁক নিল আবার।

সামনেই বিশাল শার্সি দেওয়া জানলা। কিন্তু বাইরেটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ঝাপসা। অভিজিত ভাবলো, কলকাতা শহরে বাসগুলোর কাচ পরিষ্কার করার রেওয়াজ নেই অথচ নিশ্চয় এই কাজের জন্যে লোক নিয়োগ করা আছে পরিবহণ দপ্তরে। তারা কাজটি করে না। কিংবা এমন অবহেলা দিয়ে করে যে কাচটা আরো নোংরা হয়ে যায়। পাশের খোলা জানলা দিয়ে এবার ও রাস্তার পাশের বাড়িগুলো দেখতে লাগলো।

বেশির ভাগ খোলা বারান্দার ওপর দড়িতে টানানো বা রেলিঙে ঝোলানো কাপড় শুকোচ্ছে। লুঙ্গি, পেটিকোট, শাড়ি, গেঞ্জি, মেয়েদের ব্রেসিয়ার। লোকগুলোর রুচি বলে কোনো বস্তু নেই।

এমনি একটি বারান্দায় দাঁড়ানো একজন যুবতীর সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। প্রায় এক লেভেলে দুজন, ব্যবধান হয়তো পনেরো-কুড়ি ফুট।

ইচ্ছে হলো, অভিজিত চেঁচিয়ে মহিলাটিকে ডেকে বলে, লক্ষ লক্ষ লোক আপনার কাপ-সাইজ জেনে গেছে আজ। ওটাকে একটু বেশি সাবান দিয়ে কাচবেন, বড্ডোই ময়লা।

—"তোমার ও-বাড়ির কথা মনে পড়ে?"

অমরদার প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরালো অভিজিত।

—"পড়ে না আবার! প্রত্যেক দিনের ঘটনা বলে দিতে পারি। এখনও"।

—"জানো, কর্তা মারা গেছেন।"

—"জানি। আমি তখন ও-দেশে ছিলাম।"

—"জানো ও'র ছেলেরা এখন নিজেদের মধ্যে মামলা লড়ছে? বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মামলা।"

—"লড়বেই তো। জানা কথা। টাকা উপার্জন করতে তো শেখেনি ওরা।

—"ওড়াতে শিখেছে কেনারামের ছেলেরা বেচারাম হয়েছে। এদের জীবন কেটে যাবে এই সব করে। এর পরের জেনারেশন হবে—থাক বলে দুখীরাম।"

—"অভিশাপ দিচ্ছ অমরদা" অভিজিত হঠাৎ বলে ফেললো।

—"দেবো না? কী ভাবে আমায় ও-বাড়ি থেকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিল, তুমি দেখনি?"

অভিজিত বললো, "তোমার জন্যে কিন্তু রাঙাকাকিমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়েছিল অমরদা।

"উল্টোটা," অমরদা দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলো, "ওর জন্যে আমাকে। দেবযানী আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়ে গেছে।

(ক্রমশ)

উদয়শঙ্কর : নৃত্যের নানা ভঙ্গিতে

॥ উনিশ ॥
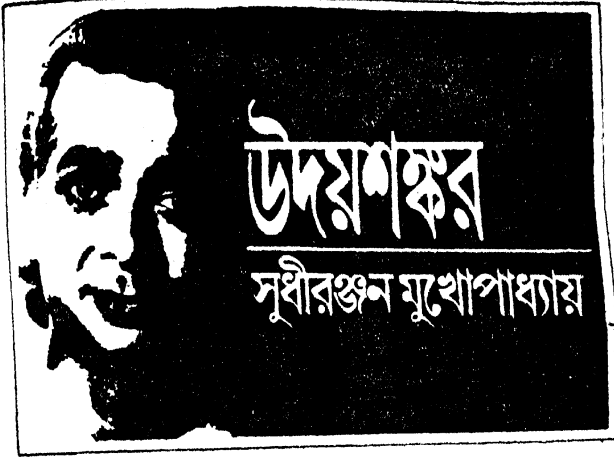
এই বাড়িতেই এসেছিল ভেরা। সে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তাকে দেখল উদয়শঙ্কর। দেখে ভাবল, এই অল্পবয়সী সুন্দরী বিদেশিনী কেন এসেছিল এখানে? কার কাছে এসেছিল? তার খুব ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দুটো কথা বলে।

উদয়শঙ্কর ভেরার কাছে এসে একটু ইতস্তত করে বলল, 'মাপ কর। তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

উদয়শঙ্করের আচমকা প্রশ্ন শুনে ভেরা তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, পরে ফিক করে হেসে পাখির মত মিষ্টি স্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই। কি বলবে বল না!'

উদয়শঙ্কর খুব কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকের মত ভাবভঙ্গি করবার চেষ্টা করতে করতে ভেবে-ভেবে বলল, 'এটা তো ঝালোয়ারের মহারাজার বাড়ি। আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, এখানে তুমি কার কাছে এসেছিলে?'

বিদেশিনী আরও হাসল, 'আমি ইণ্ডিয়ান মহারাজার অফিসে একটা চাকরির জন্যে এসেছিলাম।'

'চাকরি?' উদয়শঙ্কর বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'কি চাকরি?'

'টাইপিস্টের কাজ। আমি স্টেনোগ্রাফি বেশ ভালভাবে পাস করেছি।'

এবার উদয়শঙ্করের হাসবার পালা। সে হেসে বলল, 'এত কম বয়েসে তুমি চাকরি করবে?'

এ কথা শুনে মেয়েটি যেন বেশ দুঃখিত হল। বলল, 'আমার বয়েস আঠার। এ বয়সে আমাদের দেশে অনেক মেয়েই তো চাকরি করে—'

উদয়শঙ্কর বাধা দিয়ে বলল 'তা মহারাজার অফিসে তোমার চাকরির কি হল?'

'কম বয়স বলে হল না।'

'পড়ুওর গাল'!'

কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হেঁটে দুজনে রাস্তায় পড়ল। পথ বড় নির্জন। একটুও রোদ নেই। উদয়শঙ্কর দেখল ভেরার নীল কোট। তার গলায় সম্ভবত নকল মুক্তোর মালা। উদয়শঙ্করের নাকে লাগল বিদেশী সুবাস। ভেরাকে ছেড়ে এখনি চলে যাবার কথা সে ভাবতে পারছিল না, আর কি কথা বলবে তাও ঠিক করতে পারছিল না।

কিছু পরে বাসের শব্দ পেয়ে উদয়শঙ্কর ভেরাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাবে এখন?'

'আমি বাড়ি যাব—' ভেরা উদয়শঙ্করের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল, 'কেন?'

উদয়শঙ্কর সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল, 'কোথায় থাক তুমি?'

'কাছেই। আর্লস কোর্ট। তুমি?' ভেরা হঠাৎ উদয়শঙ্করকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তুমি থাক কোথায়?'

উদয়শঙ্কর হেসে বলল, 'যে বাড়িতে তুমি চাকরির জন্য গিয়েছিলে, আমি সে বাড়িতে থাকি!'

উদয়শঙ্কর
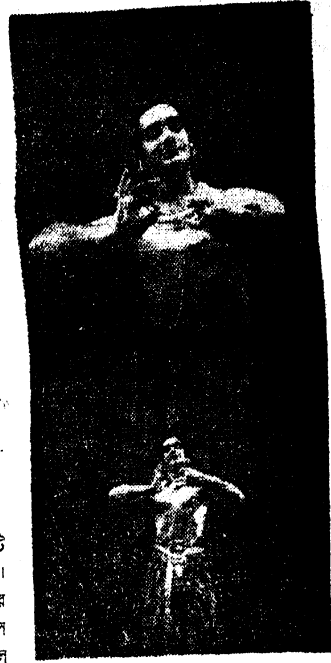
ভেরা প্রথমে অবাক হয়ে উদয়শঙ্করের তীক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখল। পরে অল্প হেসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই কি ভারতীয় যুবরাজ?'

উদয়শঙ্কর মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমার বাবা ঝালোয়ারের মহারাজার দেওয়ান।'

ভেরা অল্পকাল চুপ করে থেকে ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে উদয়শঙ্করকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন এসেছ এ দেশে? বেড়াতে?'

'না। আমি এখানে এসেছি ছবি আঁকা শিখতে। রয়্যাল কলেজ অব আর্টস-এ ভর্তি হয়েছি।'

ভেরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখল উদয়শঙ্করকে। দেখে হাসল, 'তুমি আর্টিস্ট?' সে বলল, 'আমার বাবাও আর্টিস্ট। তিনি গ্লাস মিনিয়েচর পেইণ্টার।'

ভেরার বাবার সম্পর্কে সব কথা বুঝতে পারল না উদয়শঙ্কর, তবে তিনি শিল্পী শুনে সে খুব খুশী হল। বলল, 'তোমার বাবা শিল্পী, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারলে—'

'বেশ তো। এসো না একদিন আমাদের বাড়ি। এই তো কাছেই—' ভেরা তার ঠিকানা বলল, 'বাবাও তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হবে। কবে আসবে বল? চা খেও আমাদের সঙ্গে।'

উদয়শঙ্কর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই যাব। কবে যাব বল?'

'আজ কাল পরশু—' ভেরা বড় মিষ্টি করে হাসল, 'যেদিন তোমার খুশি।'

উদয়শঙ্করের ইচ্ছে হচ্ছিল আজই ভেরাদের বাড়িতে যেতে—তার বাবার সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু এত বেশী আগ্রহ প্রথম দিন দেখালে কি মনে করবে ভেরা!

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে উদয়শঙ্কর বলল, 'যদি কাল যাই?'

'নিশ্চয়ই যেও। খুব খুশী হব।'

ভেরা চলে গেল আর একটু পরে কেনসিংটন হাই স্ট্রীট টিউব স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে। উদয়শঙ্করের ইচ্ছে হচ্ছিল এই ফুটফুটে সুন্দরী অষ্টাদশীকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে, কিন্তু এত অধীরতা অশোভন বলে দিল না।

সে প্রহর গুনেছিল, কখন সময় হবে—কখন আসবে আগামী কালের পরম অপরাহ্ন বেলা!

লণ্ডনের রয়াল কলেজ অব আর্টস অর্থাৎ উদয়শঙ্করের কলেজ খুলল অক্টোবর মাসের শুরুতে। কুয়াশা এখন ঘন হয়েছে, শীতও আরও বেশী করে পড়ল। উদয়শঙ্কর দেখল তার কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষকে। তাঁর নাম স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন। উদয়শঙ্করের মনে হল স্যার উইলিয়মের চেহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত। দেহ খুব দীর্ঘ নয় তাঁর।

স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন বর্তমান ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তা ছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁর গুণমুগ্ধ। স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইনের কথা প্রসঙ্গে শ্যামশঙ্কর বলেছেন উদয়শঙ্করকে যে, দীর্ঘ আট বছর তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছেন ভারতবর্ষে এবং সে দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। উদয়শঙ্করের সৌভাগ্য যে, এমন অধ্যক্ষের অধীনে কাজ করবার সে সুযোগ পেয়েছে।

শ্যামশঙ্কর আরও বলছেন, এই তো জুন মাসে লণ্ডনে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীও ছিলেন সঙ্গে। তাঁরা বোধ হয় এখনো আছেন এখানে—শ্যামশঙ্কর ঠিক জানেন না।

শ্যামশঙ্কর বলছেন উদয়শঙ্করকে, এখান থেকে হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ম ঘুরে রবীন্দ্রনাথ আপাতত আছেন প্যারিসে। সেখান থেকে তিনি চলে যাবেন আমেরিকায়। লণ্ডনে শ্যামশঙ্করের বাড়ির খুব কাছাকাছি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন কেনসিংটন প্যালেসে।

সে সময় স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন রোজই আসতেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। আরও অনেক গুণী ব্যক্তি আসতেন। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে অনেক সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনা হত।

উদয়শঙ্কর : নৃত্যের নানা ভঙ্গিতে

অল্প হেসেছিলেন শ্যামশঙ্কর, 'বুঝলি খোকা, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন তো ব্রিটিশ সরকারকে—তাই এ দেশের অনেকে খুব প্রসন্ন ছিল না তাঁর ওপর—তাঁর দিকে তাকাত সন্দেহের দৃষ্টিতে। এ কথা বুঝতে পেরে দুঃখ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ প্যারিস থেকে সোজা চলে যাবেন আমেরিকায়। লণ্ডনে আসবার এখন আর কোন সম্ভাবনা নেই তাঁর। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উদয়শঙ্করের সঙ্গে এই লণ্ডনেই দেখা হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের।

স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন তাঁর সব ছাত্রছাত্রীদের বললেন, আগামী কাল রবীন্দ্রনাথ আসবেন আর্ট কলেজ পরিদর্শন করতে। প্যারিস থেকে তিনি হঠাৎ এসে পড়েছেন লণ্ডনে। এখান থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি চলে যাবেন আমেরিকায়।

উদয়শঙ্কর পরে শুনল রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর অস্ত্রোপচার হয়েছে লণ্ডনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর খবর পাবার জন্যে প্যারিস থেকে অনেক চিঠি লিখেছেন, টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন—কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেই চলে এসেছেন এখানে।

জীবনে প্রথম উদয়শঙ্কর দেখল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে। তিনি বসে আছেন রয়াল কলেজ অব আর্টসের কমন-রুমে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন। আর তাঁকে ঘিরে আছে স[...] ছাত্রছাত্রী।

অভূতপূর্ব বিস্ময়ে স্থির হয়ে পলকহী[ন] চোখে উদয়শঙ্কর দেখল ঋষিরূপী রবীন্[দ্র]নাথকে। দেখল তাঁর প্রশস্ত ললাট। তা[ঁর] আয়ত নয়ন। তাঁর আজানুলম্বিত ধু[...] বেশ।

বিশ্বকবির অনির্বচনীয় রূপ দেখ[তে] দেখতে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে থাক[ে] সৌন্দর্যপিয়াসী তরুণ শিল্পী উদয়শঙ্কর। সে নামই শুধু জানে রবীন্দ্রনাথের। জানে [না] তাঁর মহিমা। এখন ধীরে ধীরে অনুভ[ব] করছিল উদয়শঙ্কর, যাঁকে এত সম্মা[ন] দিচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী সা[র] উইলিয়ম রদেনস্টাইন—তিনি নিশ্চয়ই ভারত[-] বর্ষের এক মহান ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথকে দেখতে দেখতে উদয়শঙ্করের মনে পড়ে যাচ্ছিল কিশোরকা[লে] গাজীপুর থেকে বিদায়ের সেই দিন অম্বিকাচরণের সেই গান!

'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহপ্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান॥

স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন উদয়শঙ্কর[-] কেই কাছে ডাকলেন। ডেকে রবীন্দ্রনাথ[কে] বললেন, 'এ আসছে ভারতবর্ষ থেকে।'

রবীন্দ্রনাথ দেখলেন উদয়শঙ্করকে। উদয়শঙ্কর মন্ত্রমুগ্ধের মতন হয়ে গেল। এ[ত] ঘর বিদেশী ছাত্রছাত্রীর সামনে সে নিচু হ[য়ে] প্রণাম করল রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রনাথ তাকে আশীর্বাদ ক[রে] বললেন, 'তুমি বাঙালী?'

উদয়শঙ্কর নম্র স্বরে বলল, 'হ্যাঁ'

'কি নাম তোমার?'

উদয়শঙ্কর বলল, 'উদয়শঙ্কর চৌধুরী'

'বেশ, বেশ। মন দিয়ে কাজ করে যাও'

উদয়শঙ্কর দাঁড়িয়ে থাকল রবীন্দ্রনাথে[র] সামনে। তার মুখে আর কথা ফুটল না।

'আমার চিত্তে তোমার দৃষ্টিখানি,
রচিয়া তুলিছে বিচিত্রতর বাণী।
তারই সাথে প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি—
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

আইরিশ অষ্টাদশী ভেরার বাড়ি আর্ল[স] কোর্ট অঞ্চলে। কেনসিংটন থেকে বেশ দূরে নয় আর্লস কোর্ট। উদয়শঙ্করের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হয় সুন্দরী ভেরার। অন্তর[ঙ্গ]তা ঘন হয়। উদয়শঙ্কর প্রায়ই যা[য়] ভেরাদের ফ্ল্যাটে। ভেরাও আসে কেনসিংটন গার্ডেনস-এ। শ্যামশঙ্করও তাকে স্নে[হ]

করেন। আর ভেরার মা বাবা, ছোট ভাই বোন খুবই পছন্দ করে উদয়শঙ্করকে।

ভেরার বাবা মিস্টার সোয়ান সৌম্যদর্শন অমায়িক ভদ্রলোক। তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন না কিন্তু অলঙ্কার ব্যবসায়ীদের ফরমাশমত হাতির দাঁতের ছোট ছোট জিনিসের ওপর বাড়িতে বসে বসেই করেন অপরূপ কারুকাজ। মাঝে মাঝে উদয়শঙ্কর অবাক হয়ে দেখে তাঁর একনিষ্ঠ শিল্পকর্ম।

বাঙালী মায়ের মতনই স্নেহশীলা ভেরার মা। তিনি তাকে যত্ন করে খাওয়ান—জানতে চান প্রবাসে তার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। উদয়শঙ্কর তাকে হেসে বলে যে, তার কোন অসুবিধা হচ্ছে না, সে খুব সুখে আছে এ দেশে।

ভেরার একটি ছোট বোন আছে। ভাইও এর মধ্যেই উদয়শঙ্করের ভক্ত হয়ে পড়েছে। সে এলেই ঘোরাফেরা করে তার আশেপাশে। তাকে ডাকে 'শঙ্কর' বলে।

একদিন উদয়শঙ্করকে ভেরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'বিয়ে করে এ দেশে এসেছ তো?'

উদয়শঙ্কর রহস্য করে বলল, 'কেন বল তো?'

'তোমাদের ইণ্ডিয়ায় তো ছেলেমেয়েদের খুব অল্প বয়েসে বিয়ে হয়ে যায় শুনি!'

উদয়শঙ্কর একটু কৌতুকী চালে ভেরাকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কি শোন আমাদের দেশ সম্পর্কে?'

ভেরা বলল, 'অনেক বাঘ-টাঘ আছে, হাতি আছে—'

'বাঃ, ঠিক শুনেছ তো—' উদয়শঙ্কর হেসে বলল, 'আমার নিজেরই তো একটা বিরাট বাঘ আছে ইণ্ডিয়ায়। তার নাম টিপু।'

উদয়শঙ্করের বাঘের কথা শুনে ভেরার চোখ বড় হয়ে গেল, 'বল কি? মেরে ফেলেনি তোমাকে?'

'মেরে ফেললে আর তোমার সামনে এসে এইরকম কথাবার্তা কেমন করে বলতুম বোকা মেয়ে!' উদয়শঙ্কর একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'ভাগ্যিস টিপু আমাকে মেরে ফেলেনি ভেরা, তা হলে তোমাকে আমার দেখা হত না!'

ভেরা মধুর অস্ফুট স্বরে বলল, 'হাউ লাকি আই অ্যাম!'

উদয়শঙ্কর ভেরার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে তাকে কাছে টেনে কানে কানে কথা বলার মত বলল, 'সো অ্যাম আই!'

বাড়ি ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল উদয়শঙ্করের। সম্ভবত মধ্যরাতও পার হয়ে গেছে। সে পড়ল শ্যামশঙ্করের সামনে। শ্যামশঙ্কর এত রাতে তাকে ফিরতে দেখে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে শুধু ভৎসনা করার মত বললেন, 'এত রাত অবধি কোথায় থাকিস খোকা? একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারিস না?'

উদয়শঙ্কর

শ্যামশঙ্করের কথা শুনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল উদয়শঙ্কর। একটু পরে তাঁকে বলল, 'আজ আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে, আমারও বাবা আছে। বাবা, এত দিন আমি জানতুম না যে, তুমি আছ। ছোটবেলা থেকে এত বছর বয়েস অবধি তুমি তো এক দিনও আমাকে এমন শাসন করনি বাবা।'

নীরবে সরে গেলেন শ্যামশঙ্কর।

লণ্ডনের বিখ্যাত ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা করবেন পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর। তাঁর বক্তৃতার বিষয়, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। লোকে-লোকে পূর্ণ ক্যাক্সটন হল। আর একটি চেয়ারও খালি নেই। এসেছে কত লর্ড! কত ব্যারন! কত ডিউক ও ডাচেস! এসেছে অসংখ্য বিদেশী বিদেশিনী। এসেছে কত ভারতীয় নরনারী!

উদয়শঙ্কর এসে চুপচাপ বসেছে এক ধারে। জীবনে সে প্রথম শুনবে তার বাবার বক্তৃতা। এত লোক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে উদয়শঙ্কর। কত চেনাজানা মানুষ শ্রদ্ধা করে তার বাবাকে।

পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর শুরু করলেন, 'আজ আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি এক খণ্ড দগ্ধ ভূমিখণ্ডের ওপর। আমাদের আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে গেছে। হতাশা আমাদের মনকে বেঁধেছে পাকে-পাকে। আর মনে হয় আমাদের মানবতাবোধও যেন বেশ শিথিল হয়ে পড়েছে।'

উদয়শঙ্কর অবাক হয়ে শুনছে একমনে। চারপাশ একেবারে নীরব। জাতিধর্ম নির্বিশেষে শ্রোতৃবৃন্দের চোখে ফুটে উঠেছে গভীর সপ্রশংস দৃষ্টি।

পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর বলে যাচ্ছেন—'যুদ্ধের আগে আগে এবং যুদ্ধের সময় কিছু কাল আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন দেখেছিলাম সারা য়ুরোপে চলেছে ধ্বংসের প্রস্তুতি—দেশে দেশে তৈরি হচ্ছে মানুষকে হত্যা করবার নানা অস্ত্র। তখন আমি বড় দুঃখের সঙ্গে অনুভব করেছিলাম যে, যন্ত্রসভ্যতার ওপর নির্ভর করছে সারা বিশ্বের ভাগ্য।'

উদয়শঙ্করের মনে হল অপূর্ব ইংরেজী ভাষণ শ্যামশঙ্করের। ছোটবেলা থেকে সে শুনে আসছে তার বাবা বিদ্বান। কিন্তু এত দিন পরে উদয়শঙ্কর বড় স্পষ্ট করে বুঝতে পারল শ্যামশঙ্কর সত্যিই পণ্ডিত। সশ্রদ্ধ চোখে সে তাকিয়ে থাকল তার বাবার দিকে।

'আন্তর্জাতিক সমাজভুক্ত মানবগোষ্ঠী তার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের সমগ্রতা নিয়ে আজও বিদ্যমান। তবু আমরা একেবারে বিপদমুক্ত নই। আমাদের এই মুহূর্ত থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে আত্মরক্ষার জন্য।

'কিন্তু আত্মরক্ষার পথ কোথায়?' পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর অল্প কাল নীরব থেকে পরে বললেন, 'আমাদের পণ হবে মানব-সম্বন্ধের মধ্যে যা কিছু আত্মিক তার সযত্ন সংরক্ষণ।'

(ক্রমশ)

শুভ্র
সতেজতা
যা আপনি পান…
ল্যাকমে
ভ্যানিশিং
ক্রীমের
মুক্তা শুভ্র সতেজতা থেকে
হ্যাঁ, আপনার ত্বক পায় কোমল, মসৃণ দীপ্তি। ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে। পাউডার মাখার আগে বা শুধু মাখুন—তেলাচাব অদৃশ্য হয়ে আপনার ত্বক হবে স্নিগ্ধ, থাকবে নিখুঁত। সকালে মাখুন—আপনার ত্বকে ফুটে উঠবে স্বাভাবিক রূপ। সন্ধ্যেবেলায় আবার মাখুন—সারাদিনের গ্লানি মুছে গিয়ে আপনার ত্বক হবে সতেজ স্নিগ্ধ। ভ্যানিটিব্যাগে এর একটি ছোট শিশি রাখুন—সব সময় থাকুন মুক্তা শুভ্র সতেজ।
Lakmé
Lakmé
VANISHING CREAM
Lakmé
VANISHING CREAM
ASP/L-108
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম।
৩টি সুবিধেজনক সাইজে।

১২৫ বছরের আলোয় মীর মশাররফ হোসেন

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

আজ থেকে ঠিক ১০৮ বছর আগের কথা। সম্বাদ প্রভাকরের রীতিমতো নামডাক। অবিশ্যি দুর্দান্ত ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় তখন ইহজগতে আর নেই। সম্পাদনার ভার তাঁরই ভাই রামচন্দ্র গুপ্তের ওপর। তা রামবাবু সম্পাদকের কাজ ভালমতই বোঝেন। ঈশ্বর গুপ্তের নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করা সম্বাদ প্রভাকরের গুণ্যামের তিনি একটুকু নষ্ট হতে দেননি। উপরন্তু সহকারী সম্পাদকরূপে এ বছর নিযুক্ত করেছেন স্বয়ং ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। ভুবনবাবুর কাজ সম্পাদকীয় লেখা, দু-একটা ফিচার লেখা—এমন কি মধ্যে মধ্যে গরম গরম রহস্যের পাতলা পর্দায় মোড়া "নবনাস"ও চলে। আরও একটা কাজ হলো নতুন নতুন লেখক, যাঁরা সম্বাদ প্রভাকর দপ্তরে লেখা পাঠান, তাঁদের লেখাগুলি আদ্যন্ত সংশোধন করে প্রকাশযোগ্য করা।

কিছুদিন যাবৎ কুষ্টিয়া থেকে এক মুসলমান যুবক মধ্যে-মধ্যেই লেখা পাঠাচ্ছেন। দু-চারটি সম্বাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছে বইকি—লেখকটির নাম মীর মশাররফ হোসেন।

মীর মশাররফ হোসেনের লেখাগুলি খানিকটা 'রিপোর্টাজ' ধরনের। "আমরা জ্ঞাত হইলাম এ বৎসর স্থানীয় গ্রামগুলিতে ডাকাইতি বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে, রাজপুরুষেরা যদি এ বিষয়ে মনোযোগী না হয়েন...।" কিম্বা "এ বৎসর অশ্রান্ত বারিপাতে গ্রামবাসীদিগের কষ্টের আর সীমা নাই। মামুদপুর গ্রামের রমজান শেখ নামক এক কৃষকের পুত্র নদীতে চান করিতে গিয়া......"—এরকম সব লেখা আর কি! অবিশ্যি ওই রিপোর্টাজ ধরনের লেখাগুলি ছাড়া একটি প্রবন্ধ মীর সাহেব লিখেছেন বটে, সম্বাদ প্রভাকরে তা ছাপাও হয়েছে। প্রবন্ধটি হল, মুসলমান বিবাহ পদ্ধতির দোষ-গুণ বিচার। প্রবন্ধটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রচিত বলে উদারপ্রকৃতির পাঠকের তারিফ ও মোল্লাপন্থীদের প্রচুর নিন্দা কুড়িয়েছে।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তরুণ মীর মশাররফের লেখাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিভার সন্ধান পেলেন। তাঁর কাছ থেকে

মীর মশাররফ হোসেন

উৎসাহ বাক্যে ভরপুর চিঠি মীর মশাররফের কাছে ঘন ঘন পৌঁছোতে লাগল। তরুণ মীরও খুবই উৎসাহিত। একটির পর একটি লেখা পাঠাচ্ছেন সম্বাদ প্রভাকর দপ্তরে—ছাপাও হচ্ছে এনতার। এমন কি ভুবনচন্দ্র মীর মশাররফকে "আমাদের কুষ্টিয়ার নিজস্ব সংবাদদাতা" বলে নির্দেশ করতেও দেরি করলেন না। এই প্রসঙ্গে বৃদ্ধ বয়সে রচিত স্মৃতিকথা "আমার জীবনী" গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই মন্তব্যটি করেছেন—

"কলিকাতার সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্রে পত্রে দেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহা আছে। আমি অনেক সংবাদ তাঁহাদের কাগজে লিখিতাম। তাঁহারাও দয়া করিয়া ছাপাইতেন।......সাদাসিধাভাবে লিখিতাম। ভুবনবাবু কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন। আমার কিছু কিছু লেখা একেবারে বাদও দিতেন।......ভুবনবাবু আমার সামান্য লিখাগুলি সংশোধন করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করা আরম্ভ করিলেন।"**

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর মীর মশাররফের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হল। বইটি পড়ি, নেহাত মন্দ লাগবে না, এমন কি বইখানি মোটামুটি উতরেছিল, যদিও সে যুগের পাঠকদের তেমন মনোরঞ্জন করতে পারেনি। চলেওনি ভাল—এক সংস্করণেই ইতি।

স্বীকার করতেই হবে, এ যুগে যদি আমরা একটুখানি সহানুভূতি অন্তরে রেখে বইটি পড়ি, নেহাত মন্দ লাগবে না, এমন কি ভালও লাগতে পারে। সুন্দর মার্জিত বাংলা,

---

** এই প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি হরিনাথ মজুমদার মহাশয় ওরফে কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩—৯৬)। মীর মশাররফের বাড়ির কাছে কুমারখালি গ্রাম থেকে সে যুগে একটি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা" বের হতো। সম্পাদক ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। এই তেজস্বী সাহিত্যিক, দরদী সমাজসেবী ও বাউল শিরোমণি শুরু থেকেই মীর মশাররফ হোসেনকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত বুকের কাছটিতেই রাখতেন। মীরও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন আন্তরিকভাবে। এই "গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা"য় সপ্তাহে সপ্তাহে লিখতেন মীর। হরিনাথ আদেশ দিয়েছিলেন, ঘুরে ঘুরে গ্রামবাংলাকে দেখ। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা কর। তার পর রিপোর্ট পাঠাও। সে আদেশ শিরোধার্য করে মীর মশাররফ হোসেন পায়ে হেঁটে ও নৌকায় কত গ্রাম যে ঘুরেছেন তার ইয়ত্তা নেই। একবার মীর মশাররফ হোসেন যশোরে গিয়েছিলেন। কাঙাল হরিনাথ চিঠি লিখলেন, কপোতাক্ষ নদীর অবস্থা ভাল করে দেখে এসে রিপোর্ট পাঠাও। ভাল কথা! মীর মশাররফ চার পাঁচ দিন নৌকো করে কপোতাক্ষ নদীর অনেকটা ঘুরে ঘুরে দেখে এসে "গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা"য় রিপোর্ট পাঠালেন। মীর যা লিখতেন কাঙাল হরিনাথ খানিক ঘষামাজা করে ছাপতেন। এই কাজ করার ফলে একদিকে মীরের পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন বেড়েছিল, প্রকাশভঙ্গিরও উন্নতি হয়েছিল যথেষ্ট।

কুরুচির চিহ্নমাত্র নেই এবং প্লটেও একটুখানি নতুনত্ব আছে।

যাই হোক, এ বইটি প্রকাশের পর মীর মশাররফ হোসেন দীর্ঘদিন আর কোন বই প্রকাশ করলেন না, অবশ্য সম্বাদ প্রভাকরে একটানা তো লিখে যাচ্ছেনই। দীর্ঘ চার বছর পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এক সঙ্গে তিনখানি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করলেন, ২০শে জানুয়ারি কবিতার বই **"গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু"**, ২ ফেব্রুয়ারি **"বসন্ত-কুমারী"** (নাটক) ও ১লা মে **"জমিদার দর্পণ"**।

এবারে একেবারে কিস্তিমাৎ! এ তিনখানি বই-ই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সে সময়টা বঙ্গসাহিত্যের একটা যুগ-সন্ধিক্ষণ, কারণটা অবশ্যই সুধী পাঠক জানেন—সাহিত্য সম্রাটের "বঙ্গদর্শন" এক প্রচণ্ড জলপ্লাবনের মত বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে অমিতবিক্রমে অনুপ্রবেশ করেছে। বঙ্গদর্শনের অসামান্য প্রভার ঔজ্জ্বল্যে সকলেরই চোখ গেছে ধাঁধিয়ে!

সে-যুগে বঙ্গদর্শনের সমালোচনার মানদণ্ডেই বিচার হতো যে কোন প্রকাশিত গ্রন্থের গুণাগুণ। মীর মশাররফ অনেক ভেবেচিন্তে তাঁর দুখানা বই "গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু" ও "জমিদার দর্পণ" সমালোচনার জন্য বঙ্গদর্শন দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন।

মীর মশাররফ ভাবলেন, যদি বঙ্গদর্শনের অনুকূলে সমালোচনা পান তবে নিঃসন্দেহে পাকাপাকিভাবে "সাহিত্যিক" মর্যাদাটি অর্জিত হবে।

তবে বঙ্গদর্শনে কেমন-না-কেমন সমালোচনা করা হবে ভেবে আতঙ্কিতও হলেন। অবশ্যই এ আতঙ্কের কারণ ছিল।

বঙ্গদর্শনের সমালোচনার প্রচণ্ডতা তো সর্বজনবিদিত। ভয়ংকর সে সব সমালোচনায় কত সাহিত্যিক যে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন, তার ঠিকানা আছে কি?

বঙ্গদর্শনের "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা"-র সূত্রপাত করেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বছরের অষ্টম সংখ্যা অর্থাৎ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে। পর পর ১১টি সংখ্যার সমালোচনার ভার (অর্থাৎ ১২৮০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা অবধি) বহন করেন সাহিত্য সম্রাট। এর পর কার্তিক সংখ্যা থেকে তাঁরই নির্দেশিত পথে সমালোচনার কাজ চালাতে থাকেন আচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

স্মরণ রাখতে হবে, পুস্তক সমালোচনা করতে বসে আচার্য অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের সমালোচনার আদর্শ থেকে একচুলও বিচ্যুত হননি। কি ছিল সে আদর্শ?

কোন লেখকের লেখার মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখতে পেলে তাকে সাগ্রহে সাহিত্য ক্ষেত্রে বরণ করে নেওয়া, তাকে এগিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশ করা।

আর? হাবিজাবি লিখে কেউ যদি আসর জমাতে আসতো?

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।"

"জমিদার দর্পণ" নাটকখানি যথাসময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গিয়ে পৌঁছল। "জমিদার দর্পণ" পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র তো স্তম্ভিত! কে এই মীর মশাররফ হোসেন? কি তার পরিচয়?

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর নদীয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। তাঁদের বংশ-মর্যাদা সৈয়দ ও রাজকর্ষে অত্যন্ত পারদর্শিতার জন্য বংশানুক্রমিক রাজদত্ত উপাধি মীর। লেখাপড়া শুরু করলেন জগমোহন নন্দীর পাঠশালায়। তারপর দু-একবার স্কুল বদলে ভর্তি হলেন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। বছর দু-তিন সেখানে পড়ার পর আর মন বসল না, বাঁধাধরা লেখাপড়ার সেখানেই ইতি। ১৮৬৫-তে কলকাতায় এসে চেতলায় পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের বাড়িতে উঠলেন। ক্রমে ক্রমে নাদির হোসেনের বড় মেয়ের প্রতি প্রেমাসক্ত হলেন—মেয়েটিও তাঁকে ভালবাসলো। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, ঘটনাচক্রে মীর মশাররফ বিবাহ করতে বাধ্য হলেন তাঁর ছোট বোন, অর্থাৎ নাদির হোসেনের দ্বিতীয়া কন্যা আজিজ-উন-নিশারকে। এ বিবাহের আট বছর পরে মীর মশাররফ দ্বিতীয় বিবাহ করেন বিবি কুলসমকে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুবই লক্ষ্যণীয়:

(১) একেবারে বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ দেখা দেয়। রচনা লিখতে ভালবাসতেন খুবই—বিশেষ করে বর্ণনাত্মক ও চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা করে গ্রামের অনেক বয়স্ক ব্যক্তিদের তাক লাগিয়ে দিতেন। অবশ্য পরবর্তীকালে যখন মীর মশাররফ সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন, বাল্যকালের সাহিত্য সৃষ্টির সেই প্রাথমিক চেষ্টাগুলিকে "হাস্যকর ও নিতান্তই বালসুলভ প্রচেষ্টা এবং সম্পূর্ণ ভাবেই মূল্যহীন" বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে সে লেখাগুলোর মাথামুণ্ডু তো কিছুই ছিল না, উপরন্তু যাঁরা বিচারক ছিলেন, গ্রামের সেই মানুষগুলিও ছিলেন "স্নেহে অন্ধ ও সাহিত্যবিচারে অক্ষম।"

মীর মশাররফের বাল্যকালের সেই লেখাগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, ফলে এগুলি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু মন্তব্য করা কঠিন—তবে মীর মশাররফের বক্তব্যে বিনয়ের কিঞ্চিৎ আধিক্য আছে বলে মনে হয়। তাঁর সেই বাল্যকালের লেখাগুলি নিশ্চয়ই একেবারে উপেক্ষা করার মত ছিল না।

পাঁচালী, কবিগান শুনতে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে বেহুলো সংক্রান্ত গানগুলি শুনতে অতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। আর একটু বয়স বাড়লে নিজেই বেহুলো-র গান রচনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন—এমন কি লিখলেনও। সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘ বহু বছর ধরে রচিত বেহুলো সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক গান বিস্তর মাজাঘষা ও ছাঁটকাট করে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন **"বেহুলো গীতাভিনয়"** প্রকাশ করেন তিনি। বইটি দারুণ রকম জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও পর পর কয়েকটি সংস্করণ হয়।

(২) ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। বিষয়বুদ্ধিও কিছু কম ছিল না। আশ্চর্যের কথা, তাঁর সমগ্র রচনাবলীতেই প্রচুর হৃদয়াবেগের স্পর্শ পাওয়া যায় এবং এই আবেগস্পর্শেই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই একেবারে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। তাঁর রচনার দুরন্ত আবেগে বাঙালী আকুল হয়ে কেঁদেছে। মীর মশাররফ ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু ছিলেন একেবারেই শান্ত, আবেগ-বর্জিত প্র্যাকটিক্যাল ধরনের মানুষ—সহজে কিছুতে বিচলিত হতেন না। অত্যন্ত চিন্তাশীল মানসিকতা ছিল তাঁর, নির্মোহ দৃষ্টিতে সব কিছু বিচার করার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল।

কর্মজীবনে প্রথমে ফরিদপুরের নবাব এস্টেটের ম্যানেজার ও পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার পদে আসীন ছিলেন। উভয় কাজেই চমৎকার কর্মদক্ষতার পরিচয় রেখে রাজকর্মচারী হিসেবেও অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মীর মশাররফের সাংগঠনিক ক্ষমতাও ছিল অসামান্য। পরবর্তীকালে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে এগিয়ে এসেছেন। নিরলস কর্মবীর তিনি, তাপ্পিমারা কাজে তাঁর বিশ্বাস ছিল না কোনদিন।

(৩) ছেলেবেলা থেকে মীর মশাররফের চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষতা বোধের উন্মেষ ঘটে এবং কালে তা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্চর্য পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি—লেশমাত্র সাম্প্রদায়িকতার মালিন্য ছিল না। ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন রকম সংকীর্ণতার গোলামী করেননি, ভণ্ডামির মুখে লাথি মেরেছেন।

মোল্লারা তাঁকে সব সময়েই বলেছে, তুমি কাফের, তুমি হিন্দুদের গোলাম। মীর হেসে জবাব দিয়েছেন, আমি আল্লার গোলাম,

হিন্দুরা আমার ভাই—"আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ভাই", তোমাদের মুখে আমি সাত পয়জার মারি।

তাঁর লেখে বই লিখে জবাবও দিয়েছেন, সে বজ্রসম কলমের আঘাতে মোল্লার দল বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বার বার।

মীর মশার্‌রফের জীবনকাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি সেরে এবার আমরা আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাবো।

বলছিলাম, বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনা দপ্তরের কথা। সাহিত্যসম্রাট "জমিদার দর্পণ" পাঠ করে অত্যন্ত প্রীত হলেন। পুস্তকটির কয়েকটি বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেন না বটে, প্রশংসা করলেন অজস্র। মীর মশার্‌রফের কলমের প্রচণ্ডতাকে স্বীকার করে নিলেন, ভাষা, প্রকাশভঙ্গিকে বার বার জানালেন সাধুবাদ, সাহিত্যসম্রাটের অননুকরণীয় ভাষাতেই শুনুন তিনি কি বলছেন :

"জমিদার দর্পণ" নাটক। জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাংলার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাংলার অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাংলা পরিশুদ্ধ।

জমিদারদিগের অত্যাচারের উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা উহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।

এই দর্পণে জমিদারের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহা বিকৃত কি প্রকৃত সে বিষয়ের আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহি না, এ তাহার সময় নহে। বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি, এই পত্র প্রজার হিতৈষী। এবং প্রজার হিতকামনা আমরা কখনই ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জেলায় প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে ওই গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।

কিন্তু সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা আমাদিগের বলা কর্তব্য যে, নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি, এমন কি সেসন আদালতের চিত্রটিও অতি পরিপাটি হইয়াছে। বহু অংশ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, স্থানাভাব প্রযুক্ত পারিলাম না।" [ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শন, ১২৮০ বঙ্গাব্দ]

সাহিত্যসম্রাটের এই অনুকূল সমালোচনার ফলে মীর মশার্‌রফ হোসেন যে রাতারাতি "সাহিত্যিক" মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

একটি জনশ্রুতি এই, সাহিত্যসম্রাটের আদেশ শিরোধার্য করে ৬ মাসের জন্য
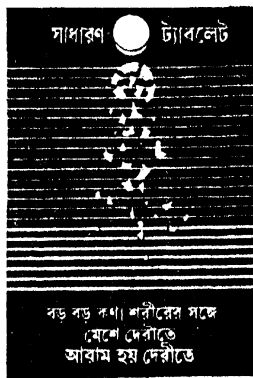
জমিদার দর্পণ নাটকখানিকে বাজার থেকে তুলে নেন মীর মশাররফ। এমন কি ওই সময়ের জন্য তিনি গ্রন্থখানির বিতরণও নাকি বন্ধ রেখেছিলেন।

চার মাস পরেই বঙ্গদর্শনের "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন" বিভাগে মীর মশাররফের "গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু" সমালোচিত হল। এবারে সমালোচক আচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এ সমালোচনাটি সত্যিই অতুলনীয়, আবেদন মর্মস্পর্শী, বক্তব্যটি ধ্রুবতারার মত জ্বলজ্বল করে। আচার্য অক্ষয়চন্দ্রের ভাষাতেই শুনুন তিনি কি বলছেন :

"গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাংলা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। বাংলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। বাংলার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। যতদিন মুসলমানদের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাংলা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাংলা লিখিবেন না বা বাংলা শিখিবেন না—কেবল উর্দু, ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের বাংলা ভাষানুরাগ বাঙালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।" [পৌষ মাসের বঙ্গদর্শন, ১২৮০ বঙ্গাব্দ]

মীর মশাররফের জয়রথ অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে চলে—সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁকে চেনে না কে? রাস্তা দিয়ে চললে সকলে, এমন কি যারা তাঁর বই কটি এখনও পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারেনি, তারাও আঙুল দেখিয়ে বলে— ওই ওই মীর মশাররফ হোসেন সাহেব। বঙ্গদর্শনে ওঁর খুব প্রশংসা বেরিয়েছে জান?

এরই ফাঁকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে **"আজীজন্ নেহার"** নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। হুগলী কলেজের উদার প্রকৃতির হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররাই ছিলেন মীর মশাররফের প্রধান সহায়। চমৎকার মাসিক পত্র, যেমন মার্জিত বাংলা তেমনই পরিচ্ছন্ন রুচি। এডুকেশন গেজেট নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকাতেও এই "আজীজন্ নেহার"-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন জনৈক সমালোচক। আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে সমালোচকটি জানালেন, যতই উর্দু, ফারসী চাপাতে চেষ্টা করুন না ধর্মধ্বজেরা, সুবিধে হবে না। বাঙালীর কলম, কেমন নিখুঁত বাংলা ভাষা দেখ। উর্দু ফারসী জবরদস্তি করে বাঙালীকে আলাদা করতে পারবে না—পারবে না।

দুঃখের কথা খুব বেশীদিন এ মাসিকপত্রটি চালাতে পারেননি মীর। নানা রকম প্রতিকূলতায় অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে মীর মশাররফ "আজীজন নেহার" বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, মাসিক পত্রটির পবিত্র সৌরভময় স্মৃতি বহুদিন পর্যন্ত বাঙালীর হৃদয়ে বেঁচে ছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে সেই ফ্যানটাসটিক ঘটনাটি ঘটে— **বিষাদসিন্ধুর মহরম পর্ব** প্রকাশিত হল ১লা মে ১৮৮৫।

সে এক কাণ্ড! "আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম।" সত্যিই বাঙালীর হৃদয় লুটে নিলেন মীর মশাররফ হোসেন।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তিনি ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২—১৯১৬)। মীর মশাররফের জীবনে তিনি এমনভাবে মিশে রয়েছেন যে, মীরের কথা বলতে গেলেই ভুবনবাবুর কথা আসবে। এ প্রবন্ধের শুরুতেই ভুবনবাবুর নামটিই উল্লেখ করেছি, পরিচয় দিইনি। এবার অতি সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় পাঠকদের সামনে রাখছি।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনটি অতি রহস্যময় ও বিতর্কমূলক। যৌবনের প্রারম্ভেই মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের আমন্ত্রণে পুরোপুরিভাবে সাহিত্য-জীবনে প্রবেশ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে **হুতুম প্যাঁচার নকশার** অনুকরণে **"সমাজ কুচিত্র"** নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেকালে অনেকেই, এমন কি স্বয়ং হুতুম, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ও লেখককে তারিফ করেছিলেন। এবার রেনল্ডস অবলম্বনে **"এই এক নতুন! আমার গুপ্তকথা!!"** ও নবন্যাস **"তুমি কি আমার?"** এবং **"তুমি কে?"**—এই তিনখানি গ্রন্থ তাঁকে প্রভূত সস্তা জনপ্রিয়তা ও প্রচুর অর্থ এনে দেয়। তাঁর **হরিদাসের গুপ্তকথা, প্রেমের বাজার, সয়তানী, চন্দ্রমুখী এবং পারুল বা সেই কি তুমি?** সে যুগে সাধারণ পাঠকের হাতে হাতে ঘুরেছে।

লেখার ধরনটি খুব সুন্দর—কেমন যেন রহস্যের গন্ধ মাখানো—ঠিক ডিটেকটিভ গল্প নয়, কিন্তু পাঠকেরা পড়তো রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। দীর্ঘজীবন সাহিত্য সেবা করেছেন, বইও লিখে গেছেন এন্তার। ভাষার ওপর সত্যিই তাঁর অত্যন্ত দখল ছিল। তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে সম্বাদ প্রভাকরের পাতায় পাতায়। দীর্ঘ ২২ বছর তিনি এ পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটির অর্ধেকের বেশী লেখা তাঁরই কলমের। সব রকমের লেখাই তিনি লিখতে পারতেন। হুতুম প্যাঁচার নকসা সত্যি কার লেখা (!), এই প্রসঙ্গটি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে একটি বিতর্ক চালু আছে। যাঁরা মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহকে হুতুম প্যাঁচার নকসার রচয়িতা বলে আদৌ স্বীকার করেন না, তাঁদের সকলেরই মত 'নকসা'র প্রকৃত রচয়িতা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ নাকি ফাঁকি দিয়ে নাম কিনেছেন। বলাই বাহুল্য, এই বিরোধী দলটি ভুবনচন্দ্রের স্বপক্ষে খুব জোরালো প্রমাণ এযাবৎ সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। বিতর্কটি কিন্তু এখনও অত্যন্ত সজীব রয়ে গেছে। [প্রসঙ্গত সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই, বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের সমালোচক ও প্রবীণ অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় এই মতেরই সমর্থক। তিনি ও তাঁর জনৈক অধ্যাপক ছাত্র কয়েকদিন আগে পর্যন্ত ভুবনচন্দ্রের স্বপক্ষে ও মহাত্মা কালীপ্রসন্নর বিপক্ষে বিস্তর ফাটাফাটি করেছেন।]

মীর মশাররফের প্রথম যুগের প্রায় সমস্ত লেখার ওপরই যথেচ্ছ পরিমাণে কলম চালিয়ে মাজাঘষা করে ভুবনচন্দ্র মীর সাহেবের বাংলাকে একটি সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। প্রধানত তাঁর ও আংশিকভাবে কাঙাল হরিনাথের সুস্পষ্ট প্রভাবে লেখক জীবনের শুরু থেকেই উর্দু-ফারসী বর্জিত বিশুদ্ধ ও সুমধুর সংস্কৃত অনুসারী খাঁটি বাংলা লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন মীর মশাররফ হোসেন। ধর্মান্ধ মুসলমান সমাজে তিনি এজন্য তীব্রভাবে নিন্দিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও তাঁকে এর ফলে অনুতাপ করতে হয়নি।

বিষাদসিন্ধুর পাণ্ডুলিপি নিয়ে মীর মশাররফ প্রথমেই এলেন ভুবনচন্দ্রের কাছে। অনুরোধ করলেন পাণ্ডুলিপিটি ভালো করে সংশোধন করে দেবার জন্য। ভুবনচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ রাজি। পাণ্ডুলিপিখানি ভুবনচন্দ্রের কাছেই জমা রেখে গ্রামে ফিরে এলেন মীর মশাররফ। এর পর কিছুদিন ধরে পাণ্ডুলিপিটিতে কলম চালিয়ে ভুবনচন্দ্র এটিকে আদ্যন্ত সংশোধন করে দিলেন।

আশা করি, এ প্রসঙ্গটি নিয়ে আর বাদানুবাদের ঝড় উঠবে না। ভগবানকে ধন্যবাদ, মহাপ্রাণ মীর মশাররফ হোসেন নিজের মুখেই ভুবনচন্দ্রের কাছে ঋণ স্বীকার করে গেছেন কৃতজ্ঞচিত্তে।

বিষাদসিন্ধুর দ্বিতীয় পর্ব **"উদ্ধার পর্ব"** প্রকাশিত হল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট।

বিষাদসিন্ধুর শেষ পর্ব **"এজিদবধ পর্ব"** প্রকাশিত হল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ।

তিন খণ্ডে ও মোট ৪৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই মহাকাব্যটি সম্ভবত মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এই অতুলনীয় গ্রন্থটির প্রকাশে

বাংলা সাহিত্যে যে কি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন নেই। তৎকালীন প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্রপত্রিকায় এই গ্রন্থটি সমালোচিত ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত হয়। এমন কি একথাও শোনা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে মানুষ মীর মশাররফকে একবার দেখবার জন্য ছুটে আসেন।

বিষাদসিন্ধু সম্বন্ধে কেবল একজন মাত্র বিদগ্ধ সমালোচকের মত উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি। ঘটনাটি ঘটে বিষাদসিন্ধুর প্রকাশের বহুদিন পরে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মীর মশাররফ যখন মারা যান। বিদগ্ধ সমালোচকটি আচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্বয়ং।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে মীর মশাররফের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই চুঁচুড়োয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন আচার্য অক্ষয়চন্দ্র।

অক্ষয়চন্দ্র মীর মশাররফের এক অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও উভয়ের দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেনি। আচার্য অক্ষয়চন্দ্র ভেবেছিলেন এই অধিবেশন উপলক্ষে মীর মশাররফকে চোখের দেখা দেখবেন, প্রাণ ভরে আশ মিটিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু হায়! এ সাধ আর তাঁর পূর্ণ হল না। সেই অধিবেশনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে মর্মস্পর্শী ভাষণটি দিলেন তাতে বোধ করি তাঁর হৃদয়ের সব কটি কথাই বলা হয়ে গেছে।

"বাণীর বিহার ক্ষেত্রে আমাদের জাতিভেদ, জাতিভেদ কিছুই নাই।..........মীর মশাররফ হোসেনকে আমি কখনও দেখি নাই। তাঁহার বিষাদসিন্ধু আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম, এই সম্মেলনে তাঁহাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিব। শেষ সময়ে শুনিলাম, তিনি এখন বেহেস্তবিহারী। যাঁহারা কখনো মুর্শিদাবাদের মহরমের সময় মুর্শিয়াগীতি শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, মহরমের আখ্যানকাব্য বিষাদসিন্ধু কিরূপ প্লাবনী করুণ রসে টলটল করিতেছে। তার সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙালী হিন্দু লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।"

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৮ মার্চ মীর মশাররফের দীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তক "গো-জীবন" প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে ধর্মান্ধ মোল্লার দল ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র গরল উগরে দেয়। মীর মশাররফকে কাফের বলে খুন করার প্রচেষ্টাও হয়। "গো-জীবন" গ্রন্থে মীর মশাররফ গরুর মাংস খাওয়ার বিপক্ষে বক্তব্য রাখলেন। গরুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করবার জন্যও দাবী জানালেন। তাঁর বক্তব্যের দৃঢ়তায় ও যুক্তিনিষ্ঠায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

একথা মনে রাখতে হবে, বর্তমান আধুনিক যুগে গরুর মাংস খাওয়া সম্বন্ধে হিন্দুদের বিশেষত শিক্ষিত হিন্দুদের আগের তুলনায় দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য বেশির ভাগ হিন্দু এখনও গোমাংস খান না—কিন্তু সে জাত যাবার ভয়ে নয়, প্রবৃত্তি হয় না বলেই খান না। সে যুগে গো-জীবন প্রবন্ধে মীর মশাররফ যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা হয়ত এ যুগে আমাদের তেমনভাবে নাড়া দিতে নাও পারে। কিন্তু অসামান্য ঔদার্যে, হৃদয়ের সবটুকু প্রীতি ও ভালবাসায় কলম ডুবিয়ে মীর মশাররফ তাঁর বক্তব্য কেমন করে উপস্থাপিত করেছিলেন তার একটুখানি পরিচয় রাখা হল গো-জীবন গ্রন্থের অতি সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে।

"ভারতের অনেক স্থানে গো-বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে, এ সময়ে অন্য নীরব থাকা উচিত মনে, করিলাম না।

আমি মোসলমান—গোজাতির পরম শত্রু, ধর্মের দোহাই দিয়া গাভী ও দুগ্ধপায়ী গোবৎসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি। কিন্তু ন্যায়চক্ষে যাহা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে

যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জনা করিবেন, মুন্সী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। সুফী সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগৎ পরাধীন—কিন্তু মন স্বাধীন।

শাস্ত্রে একথা লেখা নাই যে, গো-হাড় কামড়াইতেই হইবে গোমাংস গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। গোমাংস না খাইলে মোসলমানি থাকিবে না, একথা কোথাও লিখা নাই। খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি—খাই না। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা—গিলি না। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি—বিধি আছে—ভয়ে তাহার নিকট যাই না।

গোমাংস কি না খাইলেই চলে না? গরুর মাংসের জন্য জিহ্বার জল পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু ও মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক—সংসারকার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে, বিপদে, সুখে দুঃখে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই।

এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি?

এ অবস্থায় গো-হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্মরক্ষা। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয়, সে ত্যাগে ক্ষতি কি?"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯ অগস্ট তাঁর উপন্যাস **"উদাসীন পথিকের মনের কথা"** প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল তাঁর অনন্য সাধারণ গ্রন্থ **"গাজী মিয়ার বস্তানী"**।

এ এক অদ্ভুত বই—সম্ভবত এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন বই বাংলা ভাষায় খুব বেশি নেই। বিষাদসিন্ধু গ্রন্থের আলোচনার সময়ে বলেছি—এটিই সম্ভবত মীর মশাররফের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। "সম্ভবত" কথাটি ব্যবহার করেছি এই কারণেই যে, "গাজি মিয়ার বস্তানী"ও কিছু কম যায় না। স্বীকার করি বিষাদসিন্ধুই মীর মশাররফ হোসেনের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ, সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—এমন কি আজকাল মীর মশাররফ হোসেনের পরিচয় বিষাদসিন্ধুর লেখকরূপে—সেই তুলনায় গাজী-মিয়ার বস্তানী অনেক কম প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এ-যুগের পাঠক একবার পড়ে দেখতে পারেন এই অসাধারণ বইটি। প্রকাশকালে ৪০০ পাতার এই বইটিতে লেখকের কোন নাম ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় গাজী মিয়ার বস্তানীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে পরিশেষে আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বলেছেন :

"গাজী মিয়া কে? পুস্তক পড়িয়া একথা মনে হইবামাত্র দেখিলাম গাজী মিয়ার আত্মগোপন চেষ্টা সফল হয় নাই। পুস্তকের সর্বত্র তাঁহার পরিচয় পরিস্ফুট। তিনি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ, স্বদেশভক্ত মুসলমান সাহিত্যসেবক। মীর মশাররফ হোসেন ভাই সাহেব বাংলা গদ্য রচনার জন্য সুপরিচিত। যে লেখনী হইতে বিষাদসিন্ধু প্রসূত হইয়াছে, "গাজী মিয়ার বস্তানী"ও যে সেই লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এমন ভাষা, এমন ভাব, এমন কাহিনী বিন্যাসকৌশল মুসলমান সাহিত্যসেবকদের মধ্যে এ পর্যন্ত কেবল বিষাদসিন্ধুর রচয়িতাতেই লক্ষিত হইয়াছে।"

গাজী মিয়ার বস্তানী সে-যুগের একখানি সমাজচিত্র—সমাজ দর্পণ। কত বিচিত্র চরিত্রের মিছিল এ উপন্যাসে, আর কি আশ্চর্য স্বাভাবিক তাদের হাবভাব কথাবার্তা। এরই ফাঁকে সামাজিক অত্যাচার, অবিচারের জীবন্ত চিত্রগুলি পাঠকের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। সস্তা স্লোগানের উপস্থিতি নেই বরং দুস্তর সমস্যাগুলিকে অনুধাবন করবার ও সমাধানের প্রয়াস। কি অনায়াস লেখার কায়দা, কখনই ফালতু কচকচিতে আসল বক্তব্য গুলিয়ে ফেলার বা পাঠকের হাই ওঠবার এতটুকুও অবকাশ নেই—সোজা বন্দুকের গুলির মত বক্তব্যগুলি পাঠকের হৃদয়ে এসে আঘাত করছে। কোথাও তীব্র ব্যঙ্গ, কোথাও উচ্চহাসি, কোথাও নির্ভেজাল আনন্দ, আর তার পাশ দিয়েই কুলকুল রবে বয়ে চলেছে অনন্ত করুণা, অনন্ত সহানুভূতি—মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসা।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেনের মৃত্যু হয়। রত্নবতী উপন্যাস দিয়ে যে কলমের শুরু, যে কলম দিয়ে বিষাদ-সিন্ধু, বসন্তকুমারী, জমিদার দর্পণ, বেহুলা গীতাভিনয় ও গাজী মিয়ার বস্তানীর সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনা কোথায়? এমন মধুর, খাঁটি বাংলা গদ্য পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে অদ্বিতীয় **সৈয়দ মুজতবা আলী** ছাড়া আর কোন মুসলমান লেখক লিখতে পেরেছেন?

মীর মশাররফের মৃত্যু নেই। বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

হলদিয়ায় তৈলশোধনাগারের প্রশাসনিক সৌধ রচিত প্রাচীর-চিত্র

গত কয়েক বছর, বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই, শিল্পকলা বিষয়ে আমরা অধিকতর সচেতন হয়েছি। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্র বা ভাস্কর্য-কলার গুরুত্ব ও প্রয়োজন বিষয়ে দেশের সরকার তথা সরকারী ও বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানই আজ চিন্তা করতে শুরু করেছেন। এককথায় দেশের উন্নতিমূলক নানা প্রচেষ্টা প্রকল্পের সঙ্গে সুকুমার কলারও যে একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে আজ তা সকলেই স্বীকার করছেন। ফলে, সরকারী ও বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান আজ সুপরিচিত শিল্পী ও ভাস্কর রচিত বিচিত্র শিল্পসম্ভারে আপন আপন সৌধ তথা কার্যালয় সুসজ্জিত করে যুগোপযোগী রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিচ্ছেন। সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন কার্যালয়, পার্ক, মুক্ত-অঙ্গন, হোটেল, রেল ও বিমান অফিসে আজ সুন্দর সুন্দর শিল্প-ভাস্কর্য তথা প্রাচীর-চিত্র চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য শুধু দেশের নয়, বিদেশের পর্যটকবৃন্দও এগুলি দেখে এদেশের সুরুচির পরিচয় পান। সম্প্রতি হলদিয়ায় ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ইমারতে একটি সুদীর্ঘ প্রাচীর-চিত্র নিদর্শন দেখার সুযোগ হল। এটি বাঁ দিক থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত ৩৫ ফুট চওড়া, উচ্চতা নয় ফুট। শান্তি-নিকেতনের কলাভবনের সুযোগ্য অধ্যক্ষ দীনকর কৌশিকের পরিচালনায়, অধ্যাপক সুখেন গাঙ্গুলী ও এক কে ডেভিড এবং কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত অসিত ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু দাস, শর্মিলা রায়, অপূর্ব শাউ, বোধন ঘোষ, প্রিয়তোষ রায় ও শৈবাল মল্লিক মাত্র এক মাসে এই সুবৃহৎ প্রাচীর-চিত্রটি শেষ করেন, ব্যবহারিক সাহায্যদান করেন ভগত।

স্থায়ী প্রাচীর-চিত্র হিসাবে মোজায়েক একটি প্রাচীন শিল্প। সুদূর অতীত থেকে মোজায়েক প্রাচীর-চিত্রের প্রচলন দেখা যায়, পরে ফ্রেস্কো পদ্ধতির উদ্ভব হওয়ার ফলে মোজায়েক প্রাচীর চিত্রের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ডিজাইন অনুযায়ী দেওয়ালের পর্যাপ্ত স্থানটুকু সিমেন্টে ভরে ফেলে নানা রঙীন পাথর, ও কাচের টুকরো (tesserae) ডিজাইন অনুযায়ী বসিয়ে মোজায়েক করতে হয়। মোজায়েকের সুবিধা এই যে, এটি সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। মোজায়েক ব্যয়-সাধ্যও বটে। ইউরোপের বহু প্রাচীন গীর্জা ও রোম, র‍্যাভেনা, সিসিলি, ভেনিস ও গ্রীসেও অত্যুৎকৃষ্ট মোজায়েক নিদর্শন আছে।

শিল্পকর্ম নিদর্শন হিসাবে হলদিয়ায় রচিত মোজায়েক প্রাচীর-চিত্রটি উল্লেখ্য। প্রতীক প্রধান হলেও মুখ্যত এই প্রাচীর-চিত্রটি অলঙ্কারধর্মী। প্রধানত ড্রাগন, অগ্নি-শিখা, যন্ত্রচালিত চাকা ও উদীয়মান সূর্যকে কেন্দ্র করে এটি রচিত হয়েছে। উভচারী বিরাটাকার জীবের মধ্যে ড্রাগন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, অগ্নির ব্যাপক রূপ সকলের পরিচিত, যন্ত্রচালিত চাকা শিল্প বাণিজ্য প্রসারের প্রতীক এবং সূর্য যে আলোক-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক তা সকলেই জানেন। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশ গ্রাম-প্রধান, শহর ও শহরতলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরাও যাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির অংশীদার হন সেজন্য শিল্পীবৃন্দ একটি প্রতীকমূলক গাছ ও তারার মধ্য দিয়ে গ্রামোন্নতিরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং প্রাচীর-চিত্রের প্রধান গুণ এটি সহজবোধ্য অথচ সম্পূর্ণ আধুনিক রীতিতে রচিত। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শিল্পী-বৃন্দ এই বিভিন্ন প্রতীকগুলিই সুসম্বন্ধ-ভাবে সাজিয়ে অদূর ভবিষ্যতে দেশের শিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ধ একটি অখণ্ড রূপের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রধান আকর্ষণ প্রাচীর-চিত্রের কারুকার্য। গভীর-কালো রঙের অপেক্ষাকৃত বড় বড় ভেনেসীয় টাইলের টুকরোর পরিপ্রেক্ষিতে ছোট বড় নানা আকারের সাদা টুকরো বসিয়ে একদিকে যেমন শিল্পীবৃন্দ তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে তেমন একই আকারের ছোট ছোট চতুর্ভুজ টুকরো সাজিয়ে চমৎকার

চেষ্টাই ভুল। একদিকে আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশগুলি যেমন আছে, তেমনি অন্যদিকে আছে ভারত থেকে সৌদি আরেবিয়া পর্যন্ত বহু দেশ। এদের তুমি স্পষ্ট দুভাগে ভাগ করবে কি করে এতো একটা করাতের মত নেমে গিয়েছে, কোথায় ভেদ রেখা টানবে?

উনি একটু থামতেই আমি আমার প্রশ্নটি গুঁজে দিলাম : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যেসব দেশ স্বাধীন হল, আমি তাদের কথা বলছি। তারা নিজেদের আর্থিক উন্নতির জন্য যে চেষ্টা শুরু করেছে তার মধ্যে কোন্ কোন্ দেশের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য বলে তোমার ধারণা?

সঙ্গে সঙ্গে রুফাসের জবাব : তাই বা বলি কি করে? হাইতি ১৮১০ সালে স্বাধীন হয়েছে। তার অবস্থা তোমাদের থেকে খারাপ। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য অনেক দেশ—প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া এদের অবস্থাও ভাল নয়।

তারা কি পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করেছেন? আমি জানতে চাই। অধ্যাপক উত্তর দেন—বলিভিয়ায় পরিকল্পিত অর্থনীতি শুরু হয়েছে। অন্যান্য বহু দেশ এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে। সেদিক থেকে বিচার করে "আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব, তোমাদের উদ্যমই বিশাল। ভারতেই এখন সব থেকে বড় পরিকল্পিত অর্থনীতি—পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলছে।"

দশ বছর পরে এসে সে চেষ্টার কতটা সাফল্য তোমার চোখে পড়ল—আমার এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন : এই উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও বেশি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতেই এসেছি। যতটুকু দেখেছি, তাতে এখন শুধু এটুকু বলতে পারি : তোমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টার গতি, ক্ষেত্র এবং পরিধি আগের থেকে অনেক বেড়েছে। বেড়েছে বিদ্যুৎ!"

"বিদ্যুৎ! কী বলছ তুমি?" আমি আর নিজের বিস্ময় চেপে রাখতে পারলাম না। ডঃ স্মিথ বললেন, "হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি। আগের থেকে তোমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বেড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে চাহিদা। ঘাটতি যা দেখতে পাচ্ছ তা এই চাহিদা বৃদ্ধির জন্য। এই বিদ্যুৎ সমস্যা আমাদের দেশেও দেখা দিয়েছে।"

এতক্ষণ পরে সুযোগ পেয়ে মাদাম মদেত যেন একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। উত্তেজনায় কোচ থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ডঃ বোলো না, বোলো না। গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ ঘাটতিতে আমাদের কী কষ্ট! দিনকে দিন যত রকম যন্ত্রপাতি বাড়ছে, সব কাজ বিদ্যুতে করা চাই। অত বিদ্যুৎ কোত্থেকে আসবে? সংকট লেগেই আছে।"

ডঃ স্মিথ তাঁর স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে বলতে থাকেন : আধুনিক দুনিয়ায় এ সমস্যার হাত থেকে রেহাই নেই। আমি পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষের সঙ্গে তোমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তার সমস্যা, অগ্রাধিকার, কোন বিষয়ে জোর দিচ্ছ তোমরা—এ সব নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। শুনেছি, তোমাদের কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তারের কাছে। এখানে চাষীরা যেভাবে উন্নত বীজ ও সারের ব্যবহারে অভ্যস্ত হচ্ছে তা আশার কথা কিন্তু এতেও সেচের জন্য বিদ্যুতের কথা এসে যাচ্ছে। এসে যাচ্ছে শহরের অভাবের কথা।

ডঃ স্মিথ কলকাতায় শুধু জানতেই আসেননি। বণিকসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় কিছু অর্থনৈতিক তথ্য জানিয়েও গিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা : ভারতের এখন যা আর্থিক অবস্থা ও শিল্প কাঠামো তাতে একটু চেষ্টা করলে আরও রফতানি বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে।

একটা উদাহরণ দিলেন : যেমন ধর, আমরা আমেরিকায় জুতো আমদানি করছি, স্পেন, কলম্বো, মেক্সিকো, হাইতি থেকে। অথচ তোমরা অনায়াসেই এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারো। তোমাদের যা উৎপাদন ক্ষমতা তাতে এদের হটিয়ে মার্কিন বাজার আয়ত্তে আনতে পার। অবশ্য জিনিসের মান মন জয় করার মত হওয়া চাই।

মাদাম মদেত স্বগতোক্তি করলেন, "আমরা ত আবার একটু চকমকে ফাইন জিনিস বেশি পছন্দ করি কি না।"

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে কথা আর ফুরোতেই চায় না। কারণ মার্কিন সরকারী চাকরি ছেড়ে ডঃ স্মিথ আজ ছয় বছর ফ্লোরিডায় রোলিন্স কলেজে "গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ইণ্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের" ইনচার্জ। এ সম্পর্কে প্রবন্ধও লিখেছেন বিস্তর।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ভারতের উন্নয়নশীল অর্থনীতি ও তার সমস্যা নিয়ে লিখবেন। এখনই এ বিষয় তাঁরা পড়াচ্ছেন। পড়াতে চান আরও বিশদে।

১৯৪১ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে অর্থনীতির ডক্টরেট হয়ে রুফাস যার সেই যে সরকারী চাকরিতে ঢুকেছিলেন এতদিনে তা থেকে ছাড়া পেয়েছেন। ছাড়া পেয়েছেন আরও অবাধে হাত-পা মেলে বেড়ানোর জন্য।

এ পর্যন্ত এসেই আবার আমি যে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম তাই জিজ্ঞাসা করলাম। জানতে চাইলাম "ডক্টর তোমার বয়স কত?" রুফাসজায়া গম্ভীর হয়ে বললেন, "হি ইজ থারটি নাইন।"—"বলেন কি, ৩৯?" আমি অবাক।

—"না না ও তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। আমি একষট্টিতে পড়েছি।" নিজেই কবুল করলেন ডঃ স্মিথ। এবার হো হো করে হেসে উঠলেন, মদেত "উনি এখনও উনচল্লিশের মত।"

'কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের'—আমার এ কথায় ওঁদের দুজনের চোখের কৌতুকের ঝলক। জবাব দিলেন শ্রীমতী স্মিথ : ও, সে কতদিনের কথা। ফিলিপিনে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। বলতে বলতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অতীতের স্মৃতিতে মশগুল হয়ে গেলেন।

উঠে আসতে আসতে প্রশ্ন করলাম, "তোমাদের ছেলেমেয়ে কটি?" প্রশ্ন করেই মনে হল এবার স্বচ্ছন্দ হাসিখুশির পরিবেশকে যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। কান্নার মত হাসি টেনে মাদাম মদেত বললেন, "আমাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই। উই হ্যাভ নো ইস্যু।" নিঃসঙ্গ নিঃসন্তান দম্পতিকে পিছনে রেখে ধীরে ধীরে হোটেলের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বিধান সিংহ

ভূপতির দভূত

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণপুরের কৃষি মঙ্গল সমিতির দেড় চালা অফিস ঘরটা পেরিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়াল ভূপতি। দাঁড়িয়ে আগুপিছু এক নজর দেখে নিল।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এর গেট পেরিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। বলা যায় তারপর এটাই শেষ বাঁক। এরপর থেকে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে কটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম পেরিয়ে সেই ব্যান্ডেল পর্যন্ত।

রাস্তার দু'পাশে বুড়ো এবং ছড়ানো নীচু আম গাছের সার। মাঝে মধ্যে পাকুড় কি বটগাছ অথবা নিম বা তেঁতুল গাছও আছে দু'-চারটে। মানকের চরের মুখে একটা বিরাট শিমুল গাছও আছে। তার বেড়ের চারদিকটা আবার সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। বোঝা যায় আশেপাশে বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। গ্রামে পঞ্চায়েতও আছে।

তবু ভরসা, টানা রাস্তাটার মাঝে-মধ্যে লোকালয় আছে। তেমন বিপদ হলে হাঁক-ডাক করলে দু'-চারটে লোক জুটবে।

একবার পেছনে তাকাল ভূপতি। না, লেভেল ক্রসিং-এর লাল টিমটিমে ময়লা আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না। পাঁচমিশেলী গাছের জটলার আড়ালে হারিয়ে গেছে। এতক্ষণে ভূপতির মনে হল, সে এখন সত্যি সত্যি একা।

দম চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভূপতি।

সময়ের রাস্তারও বিশেষ কিছু দেখা যায় না। চকচকে বাঁধানো রাস্তা। হালে মেটাল করা হয়েছে। এক পশলা বৃষ্টির পর ইচ্ছে করলে মুখ দেখা যায় তাতে এখন অথচ এ সময় রাস্তা বলেই বোঝবার উপায় নেই, এমন ভাবে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ হঠাৎ দু'-একটা চলতি আলো চোখে পড়ে বটে, কিন্তু সে অনেক দূরে, ছাড়িয়ে ছিটিয়ে।

শহরে আসবার সময় সঙ্গে সাইকেল ছিল ভূপতির। ধান-বেচা পয়সায় শখ করে কেনা। পুরো এক বছরও বয়স হয়নি। দেখলে মনে হবে যেন এই তো সবে কিনলো। এমন যত্ন করত তাকে। দিনের মধ্যে অনেকটা সময়ই সে সাইকেলের সেবায় ব্যস্ত থাকত। এক কথায় ওই সাইকেলটাই তার ধ্যান জ্ঞান ছিল। বউ তারপরে।

সেই সাইকেল চড়ে যেন হাওয়ায় উড়ে শহরে এসেছিল গতকাল। উদ্দেশ্য গোটা দিন এবং একটা রাত শহরে থেকে শহরটা ঘুরে, সিনেমাটিনেমা দেখে, ভাল মন্দ শহুরে খানা খেয়ে শেষতক রাতে ফুর্তি-টুর্তি করে, পরদিন সকালে রোদ চড়লে যাবার সময় হাসকিং মেসিনের দর জেনে এবং গাছের সার ও তার পোকা মারার ওষুধ নিয়ে বেলায় বেলায় বাড়ি ফিরবে।

প্রাণ চায় তো মাঝপথে ফুলেশ্বরে শ্বউর বাড়িতে একটা রাত কাটিয়ে পরদিন ভোর ভোর বেলা বাড়ি ফিরবে। লিচু এখন বাপের বাড়িতেই। পুরো নাম লিচুবালা। লিচুর এর মধ্যেই ছেলেপুলে হবে।

কিন্তু তা আর হবার নয়। গত রাত্রের ফুর্তিতে এবং জুয়া-টুয়া খেলায় পকেটের রেস্ত গায় সাইকেলটা অবধি গেছে। যা দু'-চারটে টাকা ছিল তাই দিয়ে বিকেল পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখেছে অন্তত সাইকেলটা ছাড়ানো যায় কিনা। তার বড় সাধের সাইকেল। ভূপতির কাছে তার আকর্ষণ বউর চেয়েও বেশী।

লিচু তাই নিয়ে তাকে কম ঠাট্টা করেনি। শেষ পর্যন্ত সাইকেলটাকে সতীন বলেছে।

সেই সাইকেলটার জন্য এখন ভীষণ মন পোড়াচ্ছে তার। থাকলে, লিচুর সতীন না হোক, তাকে অন্তত এখন এমন বেঘোরে পড়তে হত না।

বলতে কি, শালারা প্রায় ন্যাংটো করে ছেড়েছে তাকে। কোথা থেকে, কেমন করে যে ফুর্তি মারার টাকার দোস্ত জুটে গেল তার, তা সে নিজেই ঠিক মত ঠাওর করতে পারে না। অথচ এখন এক গেলাস চা খাবার পয়সা পর্যন্ত নেই তার পকেটে। সবাই মিলে শালা সাবড়ে নিয়েছে তার টাকা পয়সাগুলি। তবু ভাগ্যি যে, শেষের দিকে এক বাণ্ডিল লাল সুতোর বিড়ি আর একটা দেশলাই কিনে রেখেছিল। অথচ গতকাল এই সময় তার পকেটে সিগারেটের ডবল প্যাকেট ছিল।

ভূপতি খুব সন্তর্পণে একবার নিশ্বাস ফেলল।

মাদপুর হাঁটা পথে বড় কম রাস্তা নয়। অন্তত চার ক্রোশ তো হবেই। বেশী বই কম নয়। তাই এতটা পথ তাকে হেঁটে পার হতে হবে ভেবে প্রথমটা হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছিল ভূপতির।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছিল ব্যাণ্ডেলের বাসে চেপে বসবে, যা থাকে কপালে। কণ্ডাকটারের হাত-টাত ধরে বুঝিয়ে বললেই হবে ব্যাপারটা। ঠগ জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে সে। টাকা পয়সা, সাইকেল, সঙ্গের জিনিসপত্র সব কেড়ে নিয়েছে। তাতে কি লোকটার মন

পারবে না? আপদ-বিপদ তো থাকতেই পারে মানুষের! তার মিনিময়ে বাসে চড়ে বিনি পয়সায় কিছুটা পথ যাওয়া। এই তো।

কিন্তু বাস স্ট্যান্ডে এসে যখন শুনলো আটটা বিশের লাস্ট বাসটা অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে, তখন কান্না পেয়েছিল ভূপতির। হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে ভেবে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছিল তার।

কিন্তু হাঁটু ভেঙে বসে পড়লে তো চলবে না, যেমন করে হোক বাড়ি তাকে ফিরতেই হবে। শহরে থাকবার পয়সা নেই। গাড়ি বারান্দায় বা গাছ তলায় রাস্তার কুকুর মত পড়ে থাকার কথা সে ভাবতেই পারে না। হোটেলে ওঠাও নয়। একে ভরসা থার্ড মেয়েমানুষের বাড়ি! তাও পকেটে মালকড়ি নেই। অতএব রাস্তের মত কেউ তাকে জামাই আদরে রাখবে না, এটা ভূপতির জ্ঞান।

ভূপতি একবার সামনের দিকে তাকাল। তারপর চোখের পলক ফেলে দ্রুত হাতে কাপড় বেঁধে নিল। এবং তারও পরে মা সিদ্ধেশ্বরীর নাম নিয়ে যতটা সম্ভব জোরে পা চালিয়ে দিল।

সামনে মাঝে মধ্যে চকমকির মত ছড়ানো ছিটানো জোনাকির আলো দেখা যাচ্ছে। যেন অন্ধকারের গায়ে হলুদ বুটিদার জামা। হাওয়ায় নড়াচড়া করছে। রাস্তার দু' পাশের গাছের সারি পেরুলেই ক্ষেত্র লম্বা লম্বা ধানের ক্ষেত। শেষ দেখা যায় না তার।

ধান সবে পাকতে শুরু করেছে। সবুজ থেকে রং পাল্টে হলুদ হচ্ছে। ভর দুপুরে হঠাৎ চোখ পড়লে মনে হবে যেন রোদের রং শুষে নিয়ে ধানের ছরা সোনার বর্ণ ঝিলোচ্ছে। সেই ধানে বিকেল হলেই একটা চাপা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। সেই মিঠে গন্ধটা এখন নাকে আসছে। কখনও সেই গন্ধটা চাপা পড়ে যাচ্ছে সজনে কি নিম ফুলের সুবাসে। পাকা পাকুড়েরও একটা মিষ্টি গন্ধ আছে। এই সময় আরো একটা গন্ধ ওঠে গাছ মাটি জড়িয়ে। কেমন ভেজা আর সোঁদা সোঁদা. আল, সেদ্ধর যেমন গন্ধ হয়, তেমনি। ফুরফুরে হাওয়ায় সেটাও নাকে লাগছে এখন।

লিচুবালা মেয়েটা মন্দ নয়। ভূপতি চলতে চলতেই মনটাকে চাঙ্গা রাখার জন্য ভাবল। না, শরীর গতরে নয়। সেদিকে মেয়েটা রসবতী রূপে অনুমান নেই, কিন্তু লিচুর গতর আছে। যাকে বলে 'গায় সোমত্ত'। স্বভাবটাও মিষ্টি। কোন কথায় না নেই। শুধু একটা জেদ ছিল। প্রথম প্রথম 'ছেলেপুলে পেটে ধরবো না' বলে বায়না ধরেছিল। বলেছিল, 'সরকারী হাসপাতালে যাব।' তা, মার আবার নাতি দেখবার বায়না। বলে, এই আছি এই নেই। কবে মরে যাই। না বাবা, তার আগে নাতির মুখ দেখে যেতে চাই। সাধ করে ছেলের বিয়ে দেয়া তো সেই জন্যেই।

তার জন্য পুজো আচ্চা, মানত। শেষ পর্যন্ত বললে, ওমনি না হয় তো বল গুরুদেবকে ডাকিয়ে আনছি। তিন রাত্তির পোহাবে না। গুরুর কৃপা হলে সবই হয়।

কিন্তু তার আগেই কথা রেখেছে লিচু-বালা। সেই লিচুর পেটে এখন ন' মাসের সন্তান। গত হপ্তায় তাই তাকে বাপের বাড়ি দিয়ে গেছে। প্রথম সন্তান ওখানেই হবে। অর্থাৎ ছেলে নিয়ে লিচুর ভূপতির ঘরে ফিরতে ফিরতে এখনও কম করে তিন মাস।

রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়ল ভূপতি একটা কথা ভেবে। গেলে মন্দ হয় না সেখানে। অবশ্য ঘন ঘন শ্বশুর বাড়ি যাওয়াটা সে পছন্দ করে না। ছোট হয়ে যেতে হয়। বাবার তাই মত।

তবে একটা তো রাত। কাক কেন, মাধ-পুরের কাকপক্ষীও টের পাবে না। রাতে যাবে কাল সকাল সকাল উঠে ফের বেরিয়ে পড়বে। শুধু ওই রাতটুকু। রাতটুকুই লিচুর কাছে থাকা।

ভূপতি নিজের মনেই এমন করে হাসল যেন নিজেই নিজের মুখের রসালো হাসিটা দেখতে পেল, এই ক' মাসের মধ্যেই লিচু অনেক ঢং শিখেছে।

আর একটু জোরে পা চালাল সে। ক্রোশ দুয়েক এগিয়ে ডান হাতি রাস্তাটা ধরে নেমে সিকি মাইলটাক মাঠ ভাঙলে তবে বাড়িটা। যেতে বড়জোর ঘন্টা খানেক। সাকুল্য দশটা নাগাদ সে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছাবে তো হলে। তখন অবশ্য সবাই শুয়ে পড়বে। পাড়াগাঁয়ের ওইটাই রীতি। দশটাই অনেক রাত। কিন্তু ভূপতি জামাই বলে কথা। একটা ব্যবস্থা হবেই।

খিদের কথাটা মনে পড়ল তার। বলতে কি গোটা দিনের মধ্যে প্রায় কিছুই পড়েনি তার পেটে। তাই খিদে এখন গলা পর্যন্ত। বিড়ি খেতে খেতে মুখটা তেতো হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যেই বমি বমি ভাব। অথচ মন এত চঞ্চল যে বিড়ি না ফুঁকেও উপায় নেই।

গাছের সারি মাঝে একবার পাতলা হয়েছিল। ভূপতির ভাল লেগেছিল তখন। তারপর ফের যেন গাছের সারির অন্ধকারে পা দিতে অকারণেই গায়ে কাঁটা দিল। একটা লোক নেই কোথাও। যেন শূন্য প্রান্তর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে।

অথচ এটা বড় রাস্তা। বাস চলে লরী প্রাইভেট চলে। এ-টাউন থেকে ও-টাউনে গাড়ি ঘোড়ার পথ এটাই। তবে সবই দিন-মানে। বড়জোর রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত।

শালা পোলতার মিত্র হয়ে ছিল। সঙ্গে ইয়ার দোস্ত। মুখে দু' নম্বরের ভুরভুরে গন্ধ, পকেটে জলের দরে সাইকেল বেচার শেষ ক'টা টাকা। শালা, মাদপুরের জমিদার লক্ষ্মণ আমার।

তা মিথ্যে নয়, গতকাল সন্ধ্যাটা তার এই রকমই ছিল।

শহরে যখন এল তখন বেলা বড়জোর দেড়টা কি দুটো। এই সময়েই গ্রামের চাষী কি দোকানী অথবা গেরস্তরা শহরে কেনা-কাটা করতে আসে। দিনমানে এসে দিন-মানেই ফিরে যায়। তাই বাজারে ভিড় লেগেই থাকে।

কিন্তু ভূপতি শহরে রাত্রিবাস করবে, ঠিক করেই এসেছে। তাই তার বাজার হাটের তাড়া নেই।

বাপকে অবশ্য বলে এসেছে, বন্ধুর বাড়ি রাত কাটুবে। ইচ্ছে ভাগিরথী পেরিয়ে শান্তিপুরটা দেখে আসা। তা দেখতে গেলে আর সেদিন বাড়ি ফেরা যায় না। কিন্তু ভূপতির অন্য উদ্দেশ্য ছিল। শহরে রাত কাটিয়ে একটু ফুর্ত্তি-টুর্ত্তি মারা। এ তার অনেক দিনের শখ।

তাই ভূপতির দুটো একটা দোকানে সারের এবং পোকা মারার ওষুধের খোঁজ-খোঁজ করে ইচ্ছে হল একটা সিনেমা দেখার। মফঃস্বলের সিনেমা হলে সাইকেল রাখার অসুবিধা নেই, অতএব ভূপতির ফুর্ত্তির প্রাণে পুলক এল। সাইকেল জমা দিয়ে সে সিনেমা হলে ঢুকে পড়ল।

সেই সিনেমা দেখে যখন বেরুল, সূর্য তখন পশ্চিমে হেলছে। হিন্দী পিকচার দেখে তখন তার প্রাণে খুশীর জোয়ার। লিচুকে পর্যন্ত সে ভুলে মেরে দিয়েছে।

সেই অবস্থায় নেশার ঘোরে খানিক এদিক-ওদিক ঘুরে, শহরে খানা খেয়ে ভূপতির যখন পুলকে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ঠিক সেই মুখে দুটি ইয়ার দোস্ত জুটে গেল তার। তাদের সঙ্গে ভূপতি গঙ্গার ধার ঘেঁষে হাঁটতে গিয়ে নতুন এক জগৎ দেখল।

বাজারে সে লটারীর খেলা দেখেছিল, এখানে দেখল চাকা ঘুরিয়ে জুয়া খেলা। প্রথম কয়েক খেপ খেলা জিতে তার যেন নেশা চেপে গেল। কিন্তু সেই নেশা যখন ভাঙল তখন তার সাইকেল বাঁধা পড়ে গেছে।

কিন্তু ভূপতির রক্তে তখন নেশা জ্বলছে। জুয়া থেকে সাট্টা, তাই থেকে মদ। শেষ পর্যন্ত সে জলের দরেই সাইকেলটা বিক্রি করে দিল। তখন তার মুখে মদের গন্ধ, পা টলছে, মনে জুয়ার নেশা। সেই সময় একজন ইয়ার বললে, থাকগে যা গ্যাছে। ওর জন্যে দুঃখু করে লাভ নেই। তার চেয়ে চল রাতটা ফুর্ত্তিটুর্ত্তি করে কাটানো যাক।

বলতে কি শহরের মেয়ে মানুষের ঘরে ঢোকার শখ ভূপতির বহু দিনের। এর আগে অনেকবার শহরে এসেছে সে। কিন্তু প্রথমত রাত্রিযাপন সম্ভব হয়নি, দ্বিতীয়ত, পয়সা এবং সাহসে কুলোয়নি। সঙ্গী পেয়ে তাই ভূপতির খুশীর পালে হাওয়া লাগল।

তা হ্যাঁ, সর্বস্বান্ত হয়েছে সে এটা ঠিক, কিন্তু তার নিজের যে নজর আছে এটা মানতেই হয়। গুরুপদ যার কাছে নিয়ে গেল, তার নাম পুটি। নাম পুটি, কিন্তু দেখতে সরপুটির মত। আর হালচালে এমন শউরে যেন হঠাৎ দেখলে মনে হবে, সিনেমার নটী। আর তার সোহাগ কি আদিখ্যেতার কথা যদি বল তো বলবো, লিচু তার কাছে লাগেই না।

সেই নেশা যখন কাটলো তখন সাইকেল বিক্রির পয়সাও প্রায় ফর্সা।

সকালে উঠেই তাই ভাবল, আর নয় বাবা, ঢের হয়েছে। এবার ঘরমুখো হবো।

কিন্তু সাইকেলটা? অত সাধের সাইকেল। গুরুপদ অবশ্য বলেছিল, সাইকেল বেচার পুরো টাকাটা আর সুদ-টুদ দিয়ে লোকটাকে ধরলে মালটা ফেরৎ পাওয়া যেতেও পারে। শত হলেও তুমি হচ্ছ গিয়ে গাঁয়ের লোক, শহরের লোকের কর্তব্য বলেও তো একটা কথা আছে।

সকাল বেলা, কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতেই গুরুপদ বললে, কুছপরোয়া নেই, মা'র নাম করে লড়ে যাও সাট্টায় শেষ রেস্ত দিয়ে।

ভূপতির মনে তখন আরো একটা ভয় ঢুকেছে। বাপের ওপর প্রায় জুলুম করে কেনা সাইকেল। তাই ওটা না নিয়ে বাড়ি ফিরলে বাবার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আর বাপকে, বাপের চণ্ডাল রাগকে তার ভাল করেই জানা আছে।

বাপের লাল চোখ অনুমান করে ভূপতি শেষ পর্যন্ত বাকি সম্বলটুকু দিয়ে জুয়ায় লড়ে গেল।

নেশা যখন ছুটলো তখন চারদিকে অন্ধকার। পকেট একদম শূন্য। ক্ষিধেয় পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। বেলায় বেলায় বোধ হয় চায়ের [illegible] জুটেছিল। তারপর [illegible] মা। [illegible] গিলেছে। চা আর ঐ বিড়ি।

পাশের ছায়াটা এবার যেন [illegible] লম্বা হয়েছে। আড়চোখে একবার তাকে দেখবার চেষ্টা করল ভূপতি।

তা হাঁ, এখন রাত কটা হবে। দশটা? কাল রাত্রে এই সময়, তা তাতিয়ে ছেলের এঁড়ে গরু কেনার মত অবস্থা হলেও, রাতটা কিন্তু ভালই কেটেছিল। এটা তাকে স্বীকার করতেই হবে। পুটি তাকে খাইয়ে দিয়েছিল, একটু আদর-টাদর করেছিল, ঠোঁট ফুলিয়ে মান করেছিল। লিচুর কাছে সে মজা নেই। ভূপতি কাল রাত্রে বুঝেছে, ঘরে বউ থাকতেও মানুষ কেন শখ করে মেয়েমানুষের বাড়ি যায়।

: কাল শালা এই সময় তুমি ইয়ার দোস্ত নিয়ে ফুর্ত্তি-টুর্ত্তি করেছ। আর আজ মাইরী বকনা গাইয়ের মত লেজ তুলে নেংটি পরে ঘর পানে ছুটছো। বলিহারী যাই বাবা শখ। মুখে থুথু শালা তোমার।

কথাটা কানে যেতেই মুহূর্তে মাথায় রক্ত উঠে গেল ভূপতির। মুখ ফসকে বলে ফেলল, তাতে তোর কি রে শালা?

: আমার আবার কি। মরবি তো শালা তুই। শালা চাষার ছেলের যেন পাখনা গজিয়ে ছিল। ছায়াটা এবার খাঁখিয়ে উঠল।

কথা তো নয়, যেন হুল ফোটানো। শুনতে শুনতে ভূপতির পায়ের গতি বেড়েছিল। এবার আরো জোর করে দিল।

: আঁ, মদনা আমার এমন ভাবে হাঁটছেন যেন সোনার মেডেল জিতে বাড়ি ফিরছেন।

: বেশ করেছি, আমার খুশি। ভূপতি চোখ না ফিরিয়েই চাপা ঝঙ্কার দিল। আবার যাবো।

: দুস্-স্ শালা। বেটা কামকাটা শুয়ার।

: আর তুমি কি।

: মারবো লাথি। আবার চোপা নাড়ছো? শহর দেখবো, ফুর্ত্তিটুর্ত্তি

করবো, ইদিকে শালা ঘরে মনে আনতে পাত্তা ফুরোয়। অ্যাঁ। কাল এসে রেডিওটা বেচে ফূর্তি করে যাস।

ঃ যাবোই তো। আমার জিনিস।

ঃ তোমার জিনিস? লজ্জা করে না ট্যামনা কথাটা বলতে? শালা, শউরের গলায় পা দিয়ে কিনিয়েছ—।

বলতে বলতে ছায়াটা হ-হ করে এমন ভাবে হাসতে লাগল যে, ভূপতির মনে হল সেটা বিস্তৃত হতে হতে ক্রমশ ভূপতির চারপাশে একটা প্রচন্ড শব্দের বৃত্ত টেনে তাকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ফেলল।

ভূপতি তখন হাঁটা ফেলে দু'হাতে অসম্ভব জোরে কান চেপে দৌড়চ্ছে যত দৌড়চ্ছে, তত যেন হাসিটা তাকে তাড়া করছে। শেষ পর্যন্ত প্রাণের ভয়ে উর্ধশ্বাস ছুটতে শুরু করল ভূপতি।

মাঠ, জলা, ডোবা, টিলা, পথের দু'-পাশের বুড়ো গাছ, গাছের ঠান্ডা ছায়া তখন খুব দ্রুত, প্রায় স্রোতের মত উল্টো-দিকে ছুটছে ভূপতির।

ভূপতির তখন কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। গোটা দেহটা তার যেন হাওয়ায় উড়ছে। তারপরে তার আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরল, চোখ মেলে দেখল, গুটিকয়েক অচেনা মুখ তার ওপর ঝুঁকে আছে।

প্রথমটা ভড়কাল ভূপতি। তারও পরে রোমাঞ্চিত হল। এরা আবার কারা? একটা ছায়া কি তবে অনেকগুলি ছায়ায় রূপান্তরিত হল?

ভেবেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসলো। তারপর লোকগুলির পায়ের ফাঁক দিয়ে চারপাশে তাকাল।

রাত নেই। আকাশ ফর্সা। বোঝা যায় সদ্য ভোর হয়েছে। ঘাসের ডগায় ধানের শিসে, গাছের পাতায় শিশির টলটল

করছে। সাদা ধোঁয়াটে একটা পর্দা ছড়ানো সব কিছুর ওপর। পাকা মেটাল রাস্তাটার চিহ্ন নেই কোথাও। আশপাশটা তার একদম অচেনা।

ঃ কিগো, একজনের চোখে চোখ লাগতে ভূপতিকে প্রশ্ন করল, এখন কেমন বুঝছো?

ভূপতি সে কথার উত্তর দিল না। যেমন চেয়ে ছিল, তেমনিই চেয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে।

ঃ বাড়ি কোন্ গাঁয়ে? চেনা মনে হচ্ছে না? পাশে দাঁড়ানো বুড়ো মতন একটা লোক এবার প্রশ্ন করল।

কিন্তু সে কথারও উত্তর দিল না ভূপতি। চোখের মণি ঘুরে শুধু তার মুখের ওপর স্থির হল।

এবার লোকগুলি নিজেদের মধ্যেই কথা বলাবলি শুরু করে দিল।

ঃ আমার মনে হয় ঠ্যাঙ্গাড়েরা সব-কিছু কেড়েকুড়ে এখেনে ফেলে দিয়ে গ্যাচে।

ঃ দিশি মাল বেশি খেলেও অমন হয়, পথঘাটের জ্ঞানগম্যি থাকে না।

ঃ আবার অ্যামোনও তো হতে পারে যে, রাত বিরেতে অন্য কিছুর জন্যে বেইরে ছিল, তাড়া খেয়ে এখানটায় এসে পড়েচে।

ভূপতির সব কথাই কানে যাচ্ছে, কোন কোন কথায় হাসিও উগরে আসছে। কিন্তু পারছে না। সে যেন কেমন হয়ে আছে।

কোথা থেকে একটা সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে। খুব চেনা মনে হচ্ছে গন্ধটা। কিসের গন্ধ যেন?

কতকগুলি গন্ধ আছে, যা তার চেনা। আবার এমন গন্ধও আছে যা তার কাছে খুবই পরিচিত, কিন্তু নাম স্মরণ করতে পারে না। এ গন্ধটাও তেমনি।

ঠেলে উঠে বসবার সময় হাত দু'টো তার পেছনেই রয়ে গিয়েছিল। এবার সে হাত দু'টোকে সামনে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর সামনে টান টান হয়ে পড়ে থাকা পা দু'টোকে।

কোন পায়েই জুতো নেই। তার বদলে সেখানে চাপ চাপ মাটি। খানা-খন্দ মাড়িয়ে এলে যেমন হয়। হাত দু'টো অবশ্য তেমন নয়। তাতে শুধুই মাটি। একটু জ্বালা জ্বালা করছে বটে। কিন্তু সে ছড়ে যাওয়ার জন্যও হতে পারে।

নিজের চোখ মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু অনুমান করে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, তার অবস্থাও ভয়াবহ। পরনের কাপড় জামা অবশ্য আছে। কিন্তু শত ছিন্ন।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেবার পর ভূপতির যখন অনেকটা সুস্থ মনে হল, তখন ইচ্ছে হল সামনের লোকগুলিকে জিজ্ঞেস করে, ফুলপুর এখান থেকে কদ্দুর।

কারণ, এই জায়গাটা যদি শউর বাড়ির কাছাকাছি হয়, তাহলে তার আর লজ্জার শেষ থাকবে না।

ভূপতির আরো একটা কৌতূহল ছিল। সেটা হল আশেপাশে আর কোন লাশ পাওয়া গেছে কি না। যে তাকে সারাটা রাস্তা তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল?

কথাটা মনে হতেই ভূপতির গত রাতের দু'টো একটা স্মৃতি মনে পড়ল। যাই বল, শালা কিন্তু রসিক ছিল। পেটের কথা ঠিক টেনে বের করছিল মাইরি। যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছি, অ্যামোন।' কথা-গুলি নিজের মনে ভেবেই নিঃশব্দে হাসল সে। 'বলে কি না, খুব রস করেছো মাইরি। তা রস করেছি বইকি। ঐ জন্যেই তো শহরে যাওয়া। বউ তো বাবা বে করলেই ঘরে আনা যায়। কিন্তু তাকে নিয়ে কি অ্যামোন ফূর্তি হতো?'

ঃ এ শালাকে মাইরি নির্ঘাত ভূতে ধরেচে। এখনও বশ কাটেনি। কে একজন পাশ থেকে বলল।

ভূত? ভূপতি খুব অলক্ষ্যেভাবে চমকে দৃষ্টি ফেরাল লোকটির দিকে। তা বাবা, ভূতই তো। ভূতও বলতে পার, পেত্নীও বলতে পার। কথাগুলি মনে মনেই বলল ভূপতি। সেই সঙ্গে যেন মনে হল, খুব আলতো করে চোখ নাচাল। নাকি রসের চোখ মারল লোকটাকে?

লোকটা যেন তাই দেখে চমকাল। একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে পাশের লোকটার কানের ওপর মুখ নিয়ে বলল, এ ভূতে ধরা না হয়েই যায় না। শালার চোখ নাচানো দেখলে?

ঃ তাহলে বরং কেউ ওঝা ডাক। পাশের লোকটা তার উত্তরে বলল। ভূত না নাবালে ছোঁড়াটাকে সুস্থ করা যাবে না।

কথাগুলি শুনে বুকের ভেতর ভূপতির হাসিতে গুড় গুড় করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল চোখ মটকে হাসে।

কিন্তু তার আগেই, ভূপতি দেখল, দু'জন লোক আল ভেঙে উর্ধশ্বাস ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। তার পেছন পেছন একটা বুড়ো মতন লোকের ফাটা গলার স্বরও ছুটেছে, 'হেই, আসবার সময় ঘর ঠেঙে ঘটিতে করে খানিকটা গরম দুধও নিয়ে আসবি।'

আর তাই শুনে কি হল ভূপতির, দু'পা এবং হাত দু'টো চারপাশে আছড়ে ফেলে প্রচন্ড শব্দে হ হ করে ঢেউ খেলিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'দেখ, শালারা এতেই কি রস পেয়েছে। ফূর্তিটুর্তি বল আর রস-টসই বল, করলুম তো আমি, আর শালারা তার জন্যে ছোটাছুটি করে মরছে হ হ হ।'

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র। প্রথম খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা ৯। দাম ২০·০০

সম্প্রতি কোনো এক বিদেশী পত্রিকায় বড় রসালো একটি কৌতুক-কণা চোখে পড়েছিল।

সব কিছুতে একেবারে আগামীকালের ফ্যাশনের মত ঝকঝকে এক আধুনিকা অনেক সাধ্য-সাধনায় শেক্সপিয়রের একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলেন।

নাটক দেখে ফেরবার পর আধুনিকা যেমন অবাক তেমনি গরম।

হ্যাঁ, অভিনয় ভালোই।—স্বীকার করে তিনি অবজ্ঞাভরে বলেছেন,—কিন্তু সবাই শেক্সপিয়র বলতে অমন অজ্ঞান কেন হয় বুঝি না।—নাটকটা ত দেখলাম আগাগোড়া সব চলতি প্রবচন জুড়ে জুড়ে লেখা।

ব্যখ্যা ও মন্তব্য নিশ্চয় নিষ্প্রয়োজন।

মানুষের মুখের ভাষায় ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দেওয়া স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ধৃতি হয়ে ওঠবার ভাগ্য খুব কম লেখকেরই হয়। যাঁদের হয় তাঁরা সবাই কিন্তু আদৌ এক জাতের নন।

আজকের দিনে আমাদের মুখের কি কলমের আলাপে আলোচনায় যে সব গাঁথা কথার টুকরোর ঝলকানি থাকে তার প্রধান উৎস যে রবীন্দ্রনাথ এ কথা স্বীকার করার সঙ্গে আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ না করে উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের পরই যাঁর বিচিত্র সব কথার ফুলকি আপনা থেকে আমাদের প্রতিদিনের ভাষার অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তিনি এমন একজন লেখক—মাত্র ছত্রিশ বছরেই যাঁর পরমায়ু শেষ হয়ে গেছে, আর এই সংক্ষিপ্ত জীবনে যা কিছু তিনি লিখেছেন, তার সব কিছু জড় করেও একটা প্রমাণ বই-এর আলমারির পুরো একটা তাকও ভর্তি হয় না। মাঝারি আকারের শ' তিন-চার করে পাতার দুটি খণ্ডেই তা সব ধরে যায়।

এই সামান্য পরিমাণ লেখা আমাদের সাহিত্যে ও নিত্যকার ভাষায় এতখানি জায়গা কেন এবং কেমন করে পেয়েছে বুঝতে চেষ্টা করলে মানুষের মনের রাজ্যের একটা বিচিত্র রহস্যেরও বুঝি সন্ধান মেলে।

সে রহস্য এই যে, আমাদের চিন্তা ভাবনা কল্পনার সাজানো গোছানো গোচর জগতের আড়ালে আর একটা এলোমেলো আলোয়-আঁধারে প্যাঁক-খাওয়া ওলটপালট স্রোতের এমন গহন গভীর অতলতা আছে যা না থাকলে আমাদের সব প্রকাশ্য প্রাঞ্জলতার মানেই যায় ফিকে হয়ে।

এ অতলতা আমাদের একেবারে অজানাও নয়।

আদ্যিকাল থেকে অর্থাতীত রহস্য-গভীর এ অতলতার সন্ধান শিশুমন ঠিক মতই রেখে আসছে।

কিন্তু তাদের ছড়ায়, ছন্দে, কাহিনী-কল্পনায় চিরকালই আভাস পেয়ে আসলেও এ অতলতার যথার্থ তাৎপর্য উনিশ শতকের আগে কোনো দেশের কোনো ভাবাতেই সচেতন সাহিত্যে ধরা পড়েছে বলে জানি না।

উনিশ শতকের শেষার্ধই সে হিসেবে

সাজানো প্রাঞ্জলতার অন্য পিঠে পাড়ি দেওয়ার যুগ।

যুক্তি ও অর্থের মামুলি বাঁধন ছিঁড়ে ছড়িয়ে দেবার বিদ্রোহী হিসেবে প্রথমে ও দেশের লুই ক্যারল আর এডওয়ার্ড লিয়রের নামই মনে পড়ে। তারিখ ধরে বিচার করলে লুই ক্যারলের মৃত্যুর দশ বছর আর এডওয়ার্ড লিয়রের মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে জন্মালেও আমাদের বাংলা ভাষার এক ও অদ্বিতীয় সুকুমার রায় সাহিত্যের এই নতুন দিগন্ত উন্মোচনে তাঁদেরই সমকক্ষ পথিকৃৎ। তাঁর সহগামীদের মতই আবোল-তাবোলের ক্ষ্যাপামিতে দুলিয়ে আমাদের সব জানা ও বোঝা-কে তিনি অজানা এক গভীরতায় পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্য ও ভাষায় তাঁর প্রভাব ও প্রতিঘাত তাই তাঁর রচনার পরিমাণের তুলনায় এত বেশী।

লুই ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়র বা সুকুমার রায় যা লিখে গেছেন তার বেশির ভাগই ছোটদের সাহিত্য বলে পরিচিত। ছোটদের তা পরিপূর্ণ আনন্দ যে দেয় সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ছোট-দের খুশি করার ছলে লেখা হলেও এগুলিকে কেবল শিশুদের মনের দিক দিয়ে বিচার করলে লেখকদের প্রতিই শুধু অবিচার নয়, তাঁদের কাছে আমাদের পাওনায় ব্যাপারে নিজেদেরও বঞ্চিত করা হয়।

'সুকুমার সাহিত্যসমগ্র' নামে সুকুমার রায়ের রচনা-সংগ্রহের যে মনোরম গ্রন্থটি আমার সামনে খোলা রয়েছে সাগ্রহে তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সেই কথাটাই নতুন করে আবার বুঝতে পারছি।

কতকাল আগে থেকে কতবার করে পড়া সব ছড়া কবিতা আর গল্প। কিন্তু তাদের আবেদন ত বয়সের সব গণ্ডি ছাড়িয়ে আজও সমান!

যথার্থ শিশু-সাহিত্যিক মাত্রেই অবশ্য শুধু ছোটদের নয়, বয়স নির্বিশেষে সব পাঠকেরই আদরের। কিন্তু এঁদের মধ্যেও জাতের তফাৎ আছে। কোনো কোনো শিশু-সাহিত্যিক বড়দেরও প্রিয় হলেও এমন লেখকও আছেন যাঁকে ছোট বা বড়দের বলে চিহ্নিতই করা যায় না। সুকুমার রায় সেই প্রতিবিরলদের একজন।

তাঁর বেশির ভাগ লেখায় বাইরের কাঠামোটা ছোটদের মত করে সাজানো, কিন্তু তার ভেতরের যা রস তা পড়ুয়ার বয়সের ধার ধারে না।

সুকুমার রায় সেখানে আবার তাঁর সহগামীদের থেকেও স্বতন্ত্র। ছোট বড় সকলের শুধু মাথা গুলিয়ে, কি মুখে একটু হাসি ফুটিয়েই তিনি ছুটি নেন না। নির্বিষ কৌতুকের খোঁচায় আমাদের যত বোকামি, ন্যাকামি, গোঁড়ামি, ভণ্ডামির আমিত্বের ফানুস-ই দেন ফুটো করে।

তাঁর লেখা পড়তে পড়তে সব চেয়ে যা অবাক করে, তা এই যে সময়ের ছাপ কোথাও এতটুকু তাতে লাগে নি। কত রথী মহা-রথীদের লেখার জৌলুসও ত কালের ছোঁয়ায় ম্লান হয়ে আসে, নতুন যুগের কাছে তার স্বাদ বাড় বাসী হয়। কিন্তু সুকুমার রায় এখনো আজকের সকালে তোলা ফুলের তোড়ার মতই সজীব সতেজ।

কে বলবে,
—'অজগুবি নয়

আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা,
ছায়ার সাথে কুস্তি করে
গাত্রে হল ব্যথা।
ছায়া ধরার ব্যবসা করি
তাও জানো না বুঝি!

রোদের ছায়া চাঁদের ছায়া
হরেক রকম পুঁজি।'

—কাজ সবে লেখা হয় নি?

কিংবা,—বাংলায় যার বাড়ি সেই হুকো-মুখো হ্যাংলা সম্বন্ধে দুর্ভাবনা,—

"এই ত সে দুপুরে বসে ওই উপরে
খাচ্ছিল কাঁচকলা চটকে—
এর মাঝে হল কি? মামা তার মোলো কি?
অথবা কি ঠ্যাং গেল মটকে?"

—এতটুকু ফিকে হয়েছে সময়ের ব্যবধানে?

শুধু লেখা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গত করা সব ছবিও নিজস্ব অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিরসজীব। সত্যি কথা বলতে গেলে আকার মৌলিকতায় আর মুন্সিয়ানায় এ সব ছবির জুড়ি ত' আজো পাই নি।

কি গদ্য কি পদ্য কি ছবির এই অজর সজীবতা উপভোগ করতে করতে বিস্ময়ের সঙ্গে গভীর একটা বিষাদেও মন ভরে যায়।

মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে যাচ্ছে বলে সুকুমার রায়ের সব কিছু সৃষ্টিতে সর্বসাধারণের এখন অবাধ অধিকার। কিন্তু নির্ভীক নিভ্রান্ত অক্ষরে না হলে সে অধিকারের চেয়ে আরো বড় সৌভাগ্য কি আমাদের হতে পারত না?

ছত্রিশ বছরে যিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, আজ বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স ছিয়াশি বছরের বেশী হত না। ছিয়াশি এখন আর সব ক্ষেত্রে জরাজীর্ণ অথর্ব বার্ধক্যের বয়স নয়। সুকুমার রায়ের মত প্রতিভা এ বয়সেও নিষ্প্রভ হতেন বলেও বিশ্বাস হয় না। কৌতুকপ্রধান লেখক হিসেবে ওডহাউস নব্বুই-এর কোঠা বহু দিন পার হয়েও এখনো কলম থামান নি। ছত্রিশ বছরে দাঁড়ি না পড়লে সুকুমার রায়ের কলম থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কি পেতে পারত তা আমরা পুরোপুরি ধারণাও বোধ হয় করতে পারি না।

কথা কোনও মন থেকে অসম্ভবের জন্যে এ আফসোস একেবারে মুছে ফেলা বুঝি যায় না। তবে যা পেতে পারতাম তার জন্যে অবুঝ দুঃখ যা পেয়েছি তা সমুচিত মর্যাদায় সঞ্চয় করে রাখবার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাতেই ভোলবার। 'সুকুমার সাহিত্য-সমগ্র' বইটিতে প্রকাশক ও সম্পাদকদের সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় মুগ্ধ করবার মত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি শাশ্বত সম্পদ সাধারণের হাতে তুলে দেবার ব্যাপারে মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে কোন দিকের কোন ত্রুটি তাঁরা রাখেন নি। কমল হীরে বসাবার জন্যে পেতল কাঁসা নয় পাকা সোনার ব্যবস্থাই তাঁরা করেছেন।

এ সংগ্রহটির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ভূমিকা। মাত্র আড়াই বৎসর বয়সে যে পিতাকে তিনি হারিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে আলোচনায় নির্লিপ্ত সাহিত্য বিচারের সততার সঙ্গে ভক্তি ভালবাসায় জড়ানো একটি প্রচ্ছন্ন বেদনার ছায়া ভূমিকাটিকে মহার্ঘ করে তুলেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রবন্ধ সংকলন

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারকগ্রন্থ। সম্পাদক : দেবদাস জোয়ারদার। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটি ৪, এলগিন রোড, কলকাতা-২০। ছ' টাকা।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালীর সাহিত্যভাবনায় এক উল্লেখযোগ্য পালাবদল ঘটেছিল। তত্ত্বগত ভাবনা থেকে আত্মগত প্রেরণায় নিমগ্ন হবার এই নবতম প্রবাহ বিহারীলালের কবিতায় প্রথম স্পষ্টতার সঙ্গে স্পন্দিত হলেও এই প্রবাহের সর্বাত্মক এবং সার্থক সুন্দর বিকাশ ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন এই নবতম প্রবাহের সার্থক অংশীদার। শুধু কবিতায় নয়—সমালোচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের মত তিনি নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন। এবং যেহেতু তাঁর সাহিত্যভাবনা এবং প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যে তাঁর দুর্মর ব্যক্তিত্ব এবং মৌলিকতা স্পষ্টলক্ষ্য,—সেই কারণে বলেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী না বলে সুযোগ্য সহযোগী বললে তাঁর প্রতিভার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রকাশ করা হয়।

উনিশ শ' বাহাত্তর সালে বলেন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটি আলোচ্য স্মারক গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন। বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন থেকে তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই সব আলোচনার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রিয়নাথ সেন, মা প্রফুল্লময়ী দেবী, প্রমথনাথ বিশী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের রচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক দেবদাস জোয়ারদার তাঁর দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গেই পালন করেছেন। প্রতিটি প্রবন্ধ সুনির্বাচিত, ভূমিকাংশ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ এবং আলোচনা শেষে বলেন্দ্রনাথের কয়েকটি মূল্যবান চিঠি এবং গ্রন্থ তালিকা সংযোজিত হওয়ায় বইটির আকর্ষণ বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে, কবি-সমালোচক বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা অবধারণে গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম।

উপন্যাস

অনুশীলার দেহমন। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। জাতীয় প্রকাশক ৬৪/২ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। ছ টাকা।

উপন্যাসখানিতে লেখক একালের প্রেম-ভালোবাসার জটিল সম্পর্কের ওপর নানা-দিক থেকে আলো ফেলতে চেষ্টা করেছেন। দেহের সঙ্গে মনের সঙ্গতি-সম্পর্ক-বিরোধ সচেতন ইচ্ছার সঙ্গে বিপরীতধর্মী বাসনার সংঘর্ষ ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং এ ব্যাপারে উপন্যাস-খানি প্রথমত আকর্ষণীয় এই কারণে যে—এতে বিবাহোত্তর নরনারীর জীবন গ্রন্থের উপজীব্য বিষয় হয়েছে। দ্বিতীয়ত অনেক-ক্ষেত্রেই মামুলি চিত্ররচনার প্রচলিত প্রলোভনে গা না ভাসিয়ে লেখক ভাল-মন্দ প্রত্যেকটি চরিত্রকেই সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যত্নবান হয়েছেন। অনুশীলা মনোতত্ত্বের বিবাহিত স্ত্রী। মনোতোষ অধ্যাপক এবং গবেষক। সেই সঙ্গে আদর্শবান। অথচ গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা নেই তার চরিত্রে। অনুশীলা সচেতনভাবে স্বামীর প্রতি অনুরাগিনী। কিন্তু মনোতোষের সান্নিধ্যের শীতলতা তাকে উন্মার্গ-গামী করে তোলে। তীব্র আধুনিক চণ্ড-জীবনস্পৃহা তাকে কেন্দ্রচ্যুত করে নীতি-ভ্রষ্ট সমরেন্দ্রর দিকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু উচ্ছৃংখলতায় গা ভাসিয়ে অনুশীলা শান্তি

"বিন্দুর ছেলে" (পরিচালনা : গুরু বাগচী) ছবিতে মাধবী চক্রবর্তী ও নির্মলকুমার

কমার্শিয়াল সিনেমা কথাটার সত্যিই হয়ত কোন মানে হয় না। কোন ছবিই বা ব্যবসার জন্য নয়? সব বড় পরিচালকই চান তাঁর ছবি ভাল চলুক। আবার এমন পরিচালকও নাকি আছেন যিনি ছবি ভাল চললে মন খারাপ করেন। ছবি খুব বেশিদিন চললেই নাকি সেটা কমার্শিয়াল ছবি। এটা নিছক ভনিতা। ভাল ছবি চলা আরও ভাল। দর্শকেরা ভাল ছবি দেখছেন এটাই আনন্দের কথা। সব ছবিই কমার্শিয়াল, তবে শ্রেণীভেদও আছে। এমন পরিচালকও আছেন যিনি কোন রকম আপসে বিশ্বাসী নন। দর্শক যা কিছু চান তাই নতুন করে পরিবেশন করার নীতি তিনি মানেন না। মামুলি বা গতানুগতিক যে কোন বস্তুতেই তাঁর বিতৃষ্ণা। তিনি ছবি করবেন নিজের প্রত্যয় অনুযায়ী। তিনি খুশি করবেন শুধু নিজেকে। কী হলে টিকিট-ঘরের আনুকূল্য পাওয়া যায় সেটা তাঁর বিবেচ্য নয়। এমন চলচ্চিত্রকারের সিনেমাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই সব ছবিও ব্যবসার জন্য কিন্তু ব্যবসায় স্বার্থ আছে বলেই শিল্পের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার প্রশ্ন এখানে ওঠে না।

* * *

মতামতের মন্তাজ

বেশির ভাগ ছবি, এই আপসহীন মনোভাব নিয়ে তৈরি নয়। বরঞ্চ আপসটাই বেশি, যেভাবেই হোক বক্স-অফিসে কদর হলেই হল। এ-জাতীয় ছবিকে কমার্শিয়াল সিনেমা আখ্যা দিলে ছবির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য সহজে বোঝা যায়। সে হিসেবেই হয়ত কমার্শিয়াল সিনেমা বা কমার্শিয়াল ছবি কথাগুলি চালু হয়েছে। তবে অনেকেরই এই সব আখ্যায় আপত্তি। কারণ তাতে নাকি এক শ্রেণীর সিনেমাকে ছোট করা হয়। কৌলিন্যের প্রশ্নটাই অনেকে বড় করে দেখেন। কমার্শিয়াল ছবির জাত আলাদা, কুলীন বা অভিজাত নয়—এমন ধারণার সৃষ্টি হয় বলে অনেকের অভিযোগ। অনেকে আবার বলেন, যে-ছবি পয়সা দেয় তা-ই কুলীন। তবে যাঁরা একথা বলেন তাঁরাও জানেন বড় জাতের সিনেমা কাকে বলে। এবং সে সিনেমার গুণের বিচার যে টিকিট-ঘরের বিক্রীর টাকার অংক দিয়ে হয় না সেটাও তাঁরা মানেন।

* * *

দুই শ্রেণীর বা দুই ধরনের সিনেমা সম্পর্কে দর্শকের ধারণা এখন স্পষ্ট। বাংলা সিনেমা কোন পথে যাবে? এই প্রশ্নটাও অবান্তর। যাঁরা উঁচুদরের ছবি করেন তাঁরা চেষ্টা করেও তথাকথিত কমার্শিয়াল ছবি করবেন না। সে শক্তিও হয়ত তাঁদের নেই। তাঁরা বরঞ্চ সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু আপস করবেন না। অন্যদিকে আর্টের স্বার্থে বা শর্তে ছবি করার ক্ষমতা সকলের নেই। চেষ্টা করেও হয়ত তা সকলে করতে পারবেন না। সুতরাং বাংলা ছবি কোন পথে যাবে সে প্রশ্ন উঠছে না। দুটি পথই থাকবে। তবে এক অর্থে পথ একটাই। ভাল ছবি করা ছাড়া অন্য পথ নেই। শিল্পী-পরিচালকদের ছবি দেখে অন্যরা প্রেরণা পেতে পারেন। তাঁদের ছবির সম্মান বা কদর দেখে উন্নত ধরনের ছবির কথাও অনেকেই ভাবতে পারেন। যদি ভাবেন তবেই লাভ। সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে ছবির একটা উন্নত শিল্পগত মান সম্ভব হতে

পারে। কঠিন এক্সপেরিমেন্ট না হোক, সুষ্ঠু এনটারটেনমেন্ট দেবার চেষ্টা সকলেই করতে পারেন।

* * *

বাংলা ছবির মুশকিল কোথায় বোঝা যায়। বাংলা ছবিতে রক্ষণশীলতা আছে। হিন্দী চিত্রের মতো বাংলা ছবি যখন 'খুশি

"অগ্নিভ্রমর" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী) ছবিতে শোভা সেন ও নিমু ভৌমিক

নির্লজ্জ হতে পারে না। এদিকে হিন্দী-চিত্রের সস্তা ও বিকৃত প্রমোদ-উপকরণ দেখে দর্শকরা মশগুল। সাধারণ বাংলা ছবি হিন্দীচিত্র হতে পারছে না। আবার সুন্দর ও সুস্থ রুচি বা বাস্তবসম্মত বিষয়ের উপরও বুঝি বাংলা চিত্রনির্মাতারা ভরসা হারিয়ে ফেলছেন। এই উভয়সংকট আছে বলেই বাংলা ছবির সংকট বাড়ছে। বাংলা ছবিকে বাংলা ছবির মতো করেই বাঁচাতে হবে। দুঃসাহসিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বা আপসহীন শিল্পসৃষ্টির চেষ্টা সকলে না করতে পারেন, কিন্তু সুস্থ বিনোদনের প্রতিশ্রুতি সাধারণভাবে পূর্ণ হোক। এমন উদ্ভট যুক্তিও শোনা যায় যে, বাংলা ছবিকে বাঁচাতে হলে সেকস ও ভায়োলেনস-এর আমদানি দরকার। হলিউডের উচ্ছিষ্টে বোম্বাইয়ের আপত্তি না থাকতে পারে, বোম্বাইয়ের উচ্ছিষ্টে কলকাতার আপত্তি আছে। বাংলার রুচিবান দর্শক তা কোন-মতেই গ্রহণ করবেন না। কলকাতার ছবিকে কলকাতার স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। এ-ছাড়া বাঁচার অন্য পথ নেই।

আমি সিরাজের বেগম

আলেয়া নয়, বেগম লুৎফাই সিরাজের সকল বড় কাজের প্রেরণা। এই বক্তব্যের পিছনে ইতিহাসের সমর্থন যদি নাও থাকে "আমি সিরাজের বেগম" (মূল রচনা: শ্রীপারাবত) নাটকের পক্ষে এ-রকম একটি ধারণাকেই বোধ হয় পরিচালক সুশীল মুখার্জি খুব জরুরী মনে করেছেন। ছবির শুরুতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললিত নেপথ্য ভাষণে জানানো হয়েছে, সিরাজ কাবোর উপেক্ষিতা হয়ে থাকলেও লুৎফার প্রেম ও প্রেরণা সিরাজকে (বিশ্বজিৎ) বড় করেছে। চিত্রনাট্যে অবশ্য কিন্তু লুৎফা (সন্ধ্যা রায়) তেমন প্রাধান্য পেলেন না। বাঁদী থেকে বেগম—লুৎফার জীবনের এই উত্তরণে যে নাটকীয়তা আশা করা গিয়েছিল ছবিতে তা নেই বললেই চলে। বেগম হবার পর লুৎফা গুপ্তচর নিয়োগ করে সিরাজকে সদা দুষমনের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। লুৎফার এই নেপথ্য ভূমিকাকে ঘিরেও নাট্য-রোমাঞ্চ বিস্তারের অবকাশ ছিল। এই অংশে সামান্য ঘটনা যা আছে তা সাজানো। এ নিয়ে দর্শকের রোমাঞ্চিত হবার কথা নয়। এর পর সিরাজ আপন ইচ্ছা অনুযায়ীই চলেছেন। কাশিমবাজারের কুঠি থেকে ফৈজী বাঈকে (অলকা) নিয়ে এসেছেন প্রাসাদে। বাঈজির মোহে তিনি তখন অন্ধ। লুৎফা তখন কাব্যের উপেক্ষিতা।

মুর্শিদাবাদের নবাব-প্রাসাদে প্রধান চরিত্রদের মধ্যে রয়েছেন নবাব আলিবর্দি (পাহাড়ী সান্যাল), বড় বেগম সাহেবা (চন্দ্রাবতী), ঘসেটি বেগম (বাসবী নন্দী) প্রভৃতি। এঁদের সকলকে নিয়েই নবাব-পরিবারের নাটক—এখানেও লুৎফার একক প্রাধান্য নেই। সিরাজ ও লুৎফার বিবাহিত জীবনে মেলোড্রামা রচনার কাজে পরিচালক অবশ্য নাট্যশক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই নাটক সাধারণ অন্য সব মেলোড্রামার মতোই, নবাব-পরিবারের কাহিনী মনে হয় না। সিরাজ-লুৎফার প্রেম এবং তাদের বিবাহিত জীবনে সাময়িক অশান্তি (লুৎফা একবার আত্মহত্যার জন্যও

যখন আবার তাকে পাল্টা বেদম মারতে আরম্ভ করেছে তখন তার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কেও মতলববাজ পিতা-পুত্রের মনে তেমন কিছু সন্দেহ জাগেনি।

দুই নায়ক দেখাতে অবিকল বলে তাদের প্রণয়ের ক্ষেত্রেও কিছুটা ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। পরিচালকরা অবশ্য ছবির অন্তে সব মুশকিলেরই আসান ঘটিয়ে দিয়েছেন। মারামারি যে হিন্দীচিত্রের একটি বড় প্রমাণ-উপকরণ সেটা তাঁরা সর্বদা মনে রেখেছেন। বিনোদ-প্রেমিকা প্রামালকনা রিণা রায়কে দর্শকের মনের মতো করেই সাজানো হয়েছে। তাদের মুখে রাহুল দেববর্মণ সুরারোপিত গানও আছে। হিন্দীচিত্রের দর্শকের কাম্য বস্তু প্রায় সবই রাখা আছে, নেই কেবল যুক্তি ও সঙ্গতি।

"জীবন যে-রকম" (পরিচালনা : স্বদেশ সরকার) ছবিতে ওয়াহীদা রহমান ও রঞ্জিৎ মল্লিক ফটো-দেশ

ভারতীয় সংগীত সমাজের সমাবর্তন

ভারতীয় সংগীত সমাজের সপ্তদশ বার্ষিক সমাবর্তন উপলক্ষে মহারাষ্ট্র নিবাসে সম্প্রতি একটি প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ বিমল রায় কর্তৃক পুরস্কার বিতরণের পর সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করলেন প্রথমে আরতি বাগচী, পরে চিন্ময় লাহিড়ী। দুজনেই একটি ঠুংরীসহ খেয়াল গেয়ে শোনালেন। ওঁদের সঙ্গে তবলাসংগতে ছিলেন যথাক্রমে বিশোকরঞ্জন এবং কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার।

আরতি বাগচী বিলম্বিত অংশে শুদ্ধ সারঙ্গের সুগম্ভীর রূপটি নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। গান্ধারকে ডিঙিয়ে গিয়ে কোড়ি মধ্যমের পথ বেয়ে এই রাগের আরোহী গতির চমৎকারিত্ব তাঁর গানকে, বিশেষত এই বিলম্বিত অংশটিকে, যেমন চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিল তেমনই পরবর্তী অংশে তান আর তেহাই-এর সুসমঞ্জস এবং নিপুণ প্রয়োগে অনুষ্ঠানটি সজীব এবং প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছিল। তবে সুরের স্রোত যেমন সুন্দর বয়েছিল ছন্দের ঢেউ তেমন উঠল না যেন। উঠলে অনুষ্ঠানটি আরও চমকপ্রদ হত সন্দেহ নেই। এ-ব্যাপারে অবশ্য বিশোকরঞ্জনেরও কিছু দায়িত্ব ছিল। ওঁর হাত পরিচ্ছন্ন কিন্তু কিছু নিষ্প্রাণ। আরতি বাগচীর ঠুংরী কিন্তু বেশ জমেছিল।

সেদিন ভারী সুন্দর গাইলেন চিন্ময় লাহিড়ী। রাগ ছিল 'আহীর-ভৈরোঁ'। উনি সময় বেশি নেন নি গানে। কিন্তু স্বল্প পরিসরে একটি রাগের পরিবেশনা যে কতখানি প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত হতে পারে চিন্ময়বাবু তার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন এই অনুষ্ঠানে। তাঁর হলকতানে সেই দাপট নেই কিন্তু আছে শিল্পীজনোচিত মাত্রাবোধ যা তিনি অর্জন করেছেন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায়। দ্রুত অংশের বাণী ছিল 'মোহে ছেড় না গিরিধারী।' মধ্যম-পঞ্চমে ছোট ছোট মুক্তোর মত তেহাই, অন্তরার পর্বে সুরের আকাশ-ছোঁয়া বিস্তার এবং সমগ্রভাবে আহীর-ভৈঁরো রাগের উদাস গম্ভীর ভাবের দরদী অভিব্যক্তির স্পর্শে চিন্ময় লাহিড়ী সেদিনকার অনুষ্ঠানটিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছিলেন। এর পরের ঠুংরীতে কিন্তু সেই দরদ খুঁজে পেলাম না। কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের সংগত ভালই।

—আনন্দবর্ধন

নৃত্যনাট্য "রামায়ণ"

সংগীতকলা কেন্দ্রের সদস্যরা গত ১৯ জুন সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে নৃত্যাচার্য উদয়শংকরকে সম্বর্ধিত করলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র এবং প্রধান অতিথি ডঃ রমা চৌধুরী উভয়েই তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে নৃত্যাচার্যের বিশ্বজয়ী প্রতিভার বন্দনা করলেন। লেডী রাণু মুখার্জিও তাঁর ভাষণে উদয়শংকরের প্রতি দেশবাসীর সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার কথা জানালেন। সম্বর্ধনার উত্তরে অসুস্থ উদয়শংকরের বক্তব্য ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি উদ্যোক্তাদের এবং সমবেত দর্শকদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বসে পড়লেন।

এই উপলক্ষে সংগীতকলা কেন্দ্রের ছাত্রীরা পরিবেশন করলেন 'রামায়ণ' নৃত্যনাট্য। একেবারে গোটা রামায়ণই ছিল নৃত্যনাট্যের বিষয়, কিন্তু সময়ের পরিধিতে তা যে সম্ভব নয় সেটা বোঝা গেল শেষার্ধে। প্রথম দিকে কাহিনীকে যেভাবে এগুতে

দেখা গেল, শেষের দিকে ঘটল তার উলটোটা। নইলে রাবণ বধের সংগে সংগেই সীতার অগ্নিপরীক্ষা কেন? সংকলনের এই সব ত্রুটি বহুলাংশেই ঢেকে দিতে পেরেছে শিল্পীরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাধিক নাট্যমুহূর্ত নৃত্যের দ্বারা রচিত হতে পেরেছে।

প্রধান কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন সুজাতা সেন, আনন্দরূপা নন্দী, দেবকী বোস, চন্দ্রলেখা রায় ও কেয়া রায়। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ভাল নেচেছেন শর্মিলা দাস, মলয়া মন্ডল, অঞ্জনা মিত্র, অলকা ভট্টাচার্য, অমৃতারূপা নন্দী, অনিন্দিতা চ্যাটার্জি, সুজাতা কুন্ডু ও রীতা মুখার্জি। নৃত্যনাট্যের সামগ্রিক উপভোগ্যতার অর্ধেক কৃতিত্ব অবশ্য আলোকশিল্পী শিবনাথ ব্যানার্জির প্রাপ্য। গ্রন্থণায় ছিলেন শম্ভু ব্যানার্জি ও নীতি নন্দী। পরিচালনায় স্মৃতি ঘোষ।

নৃত্যসমালোচক

নাট্য-সমালোচনা

আলিবাবা
(রঙমহল)

ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা অতীতে অনেকবার মঞ্চস্থ হয়েছে। একালেও যে আলিবাবা সমান জনপ্রিয় সেটা রঙমহলে নাটক দেখতে বসলেই বোঝা যায়। গীতবহুল নাটকটিতে গান অনেক। গানের ব্যাপারে শিল্পীদের অস্বস্তি বোঝা যায়। তবু মর্জিনার গান ছি ছি এত্তা জঞ্জাল দিয়ে নাটক শুরু হবার পর দর্শক দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখবার জন্য উদগ্রীব। জহর রায়ের নাট্যপরিচালনার বিশেষ কৃতিত্ব হল, তিনি নাটকটির গতি কোন মুহূর্তেই মন্থর হতে দেননি। প্রয়োগের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন, বর্ণনা ব্যবহার করে ঘটনার ইলিউশান তৈরি। দস্যুদের ঘোড়ায় চড়ে আসার ঘটনাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তা-ছাড়া শুধু আলোকসম্পাতের (অনিল সাহা-কৃত) ভিতর দিয়ে বিশেষ পরিবেশ ও জাঁকজমক দেখানোর কাজটাও সফল। প্রয়োজনার গুণ এই নাটকে অনেক। পাত্র-পাত্রীদের পোশাক তো আছেই, তা-ছাড়া পরিচালক বেশ কিছু নর্তকীও নাটকে রেখেছেন। আলিবাবা নাটকের পাত্রীদের প্রামাণ্য বেশ কী বলা কঠিন। তবে এই নাটকে তাদের বেশ-ভূষার মধ্য দিয়ে যৌন-উপাদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ। পোশাকে চাকচিক্য আছে। অল্প উপকরণে মঞ্চ-সজ্জার কাজটিও সুষ্ঠু। চিচিং ফাঁক পর্বের মঞ্চসজ্জা উল্লেখযোগ্য।

শিল্পীদের গলা ছেড়ে গাইতে অসুবিধা হয়েছে বলে গান দিয়ে আলিবাবা নাটকটি খুব উপভোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়নি।

"আলিবাবা" নাটকে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেন

আবহসংগীত (শৈলেশ রায়-কৃত) অবশ্য নাট্যমর্মানুসারী। গানের অভাবটা অনেক-খানি পুষিয়ে দিয়েছে নাচ। নাচ দেখতে ভাল লাগে—বিশেষ করে মর্জিনা (জয়শ্রী সেন) ও আবদাল্লার (প্রভাত ঘোষ) নাচ। আবদাল্লা লাফ-ঝাঁপ একটু বেশিই দিয়েছেন, তবু চরিত্রের সংগে সেটা মানিয়ে যায়। এবং এই চরিত্রে প্রভাত ঘোষ সব মিলিয়ে প্রাণবন্ত। জয়শ্রী সেনের মর্জিনা-অভিনয় নতুন নয়। তাঁর স্বচ্ছন্দ ও সপ্রাণ অভিনয়ে নাটকটি অনেকাংশে উপভোগ্য।

ফাতিমা-বেশিনী সরযূ দেবীর অভিনয় দেখে দর্শক মুগ্ধ হবেন। হঠাৎ বড়লোক হবার পর ফাতিমার উত্তেজনা ও অস্থিরতার প্রকাশ অসাধারণ। নাট্যপ্রযোজনায় অন্য যদি কোন ত্রুটি থাকেও সেটা শিল্পীদের অভিনয়ে ঢাকা পড়েছে। কালী বন্দ্যো-পাধ্যায়ের আলিবাবা চরিত্র-চিত্রণে নাটকের একটি বড় আকর্ষণ। আলির সরলতার রূপটি শিল্পীর অভিনয়ে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। দস্যুসর্দার রূপে শম্ভু ভট্টাচার্য দাপটের সংগে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয়েই নাটকের রোমাঞ্চ। মুস্তাফারূপী মিণ্টু চক্রবর্তীও প্রশংসা পাবেন। মর্জিনার প্রেমিক হুসেন আশানুরূপ রোমান্টিক—সেটা মনে হয়েছে শ্যামলেন্দু পালের অভিনয়ের জন্য। কাসিমরূপী মৃণাল মুখোপাধ্যায় কিংবা সাকিনাবেশিনী ছন্দা দেবীর অভিনয় আলিবাবা নাটকের চরিত্রানুগ।

নাটকের বিশেষ হাল্কা মেজাজ, যেটা হিউমারের দিক, শিল্পীদের অভিনয়ে পাওয়া যায়। তা ছাড়া চিচিং ফাঁক নাটকচমক তো অক্ষুণ্ণ আছেই। সে-কারণে রঙমহলের আলিবাবা-কে নাট্যদর্শকরা বরাবরের মতোই সাদরে গ্রহণ করবেন।

ল্যাংগুয়েজ

বম্বে শহরে প্রবাসী বাঙালীরা একটি অসাধারণ বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করল, নিজেদের এক বিশেষ সমস্যা নিয়ে। নানা কারণে এই নাটকটি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। বঙ্গদেশের বাইরে বসবাসকারী বাঙালীদের মধ্যে নাটকটির বহুল প্রচার খুবই কাম্য।

বম্বের বাসিন্দা শ্রীদিব্যেন্দু গুহ রচিত এই নাটক—নাম "ল্যাংগুয়েজ"। মঞ্চস্থ করলেন শহরের নবগঠিত নাট্যসংস্থা 'মাট মহল', তাঁদের প্রথম প্রয়াস রূপে বাংলা নাট্য-মঞ্চের শতবার্ষিকী বছরে। প্রথম অভিনয় অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় এবং দর্শক-

"কাঞ্চনলতা" (পরিচালনা : বিকাশ রায়) ছবিতে অপর্ণা সেন ও শমিত্রা বিশ্বাস

দের প্রশংসা পাওয়ায় এঁরা এখন আরও কয়েকটি অভিনয়ের আয়োজন করেছেন।

বঙ্গদেশের বাইরে যে সব বাঙালী বহু কাল ধরে বাস করছে, তাদের পুত্র কন্যারা সে অঞ্চলের বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে নানান কনভেনট স্কুলে শিক্ষালাভ করে মাতৃভাষার পরিবর্তে অতি নিম্নস্তরের ইংরাজীকেই মাতৃভাষা স্বরূপে করে নেয়। নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ হয়ে পরে এই সব ছেলেমেয়েরা যখন জীবনের সম্মুখীন হয়, তখন কি ধরনের সমস্যার মধ্যে তারা পড়ে তারই খুব মর্মস্পর্শী বাস্তবধর্মী আলোচনা রয়েছে এই উদ্দেশ্যমূলক নাটকে। খুবই সমসাময়িক এই সব সমস্যা যা আমরা রোজ চোখের সামনে দেখছি, এই শহরের বাঙালীদের মধ্যে।

বাঙালী রমেন চৌধুরী ও তাঁর পরিবার—স্ত্রী, এক বিবাহযোগ্যা মাতৃভাষাজ্ঞানহীনা ইংরাজী শিক্ষিতা ও পাশ্চাত্যভাবাপন্না কন্যা এবং দুই পুত্র বম্বের বাসিন্দা। রমেনবাবু ও বাণিজ্য সংস্থায় বড় চাকুরে, সাহেবীভাবাপন্ন ছেলেমেয়েদের ভাল কনভেনট স্কুলে ভাল শিক্ষা দিয়েছেন বলে গর্ব। পুত্র কন্যাদের মাতৃভাষা না জানার জন্য, দেশের নানা বিষয়ে অনভিজ্ঞতার জন্য কীভাবে নানান অস্বস্তিকর অবস্থা ও সমস্যার মধ্যে তাদের পড়তে হচ্ছে এবং শেষে কীভাবে এরাই পিতামাতাকে দোষী করছে তাদের এই করুণ অবস্থার জন্য—তা নাটকে দেখান হয়েছে খুবই হৃদয়স্পর্শীভাবে।

নাটকটির প্রয়োগকৌশল ও সুপরিচালনার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব পরিচালক ও অন্যতম প্রধান অভিনেতা জ্যোতির্ময় মুখার্জির। প্রতিটি চরিত্রের অভিনেতাদের তিনি এমনভাবে বাছাই করেছিলেন যে, প্রত্যেকেরই অভিনয় জীবন্ত হয়েছিল। বম্বের অপেশাদার বাংলা নাটকের প্রযোজনায় এরকম সুপরিচালিত সুঅভিনীত নাটক সচরাচর দেখা যায় না।

বিশেষ প্রতিনিধি

হারানো আত্মার কাহিনী

(রঙ্গায়ণ)

সম্প্রতি মুক্তাঙ্গন মঞ্চে অভিনীত হল রঙ্গায়ণ নাট্য সংস্থার 'হারানো আত্মার কাহিনী'। শ্রীকান্ত রানাডের লেখা একটি মারাঠী কাহিনীকে ভিত্তি করে এর নাট্যরূপ দিয়েছেন বীরেন চক্রবর্তী।

সরকারী আমলাদের তৈরী লাল ফিতের ফাঁদে পড়ে দরিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিদেহী আত্মা, মৃত্যুর পরেও শুধুমাত্র পেনসনের টাকার জন্য, জীবিতকালে তাঁর নিজের হাতে লেখা দুশো দরখাস্তের ফাইলের মধ্যে চাপা পড়ে কেমন মুক্তির জন্য ছটফট করে, সেটাই এ নাটকের প্রধান উপজীব্য। সিরিও-কমিক ধরনের এই নাটকটিতে বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গিটি সাবলীল। তিন অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটির প্রথম অঙ্ক তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে চিত্রগুপ্ত (অসিত দাশগুপ্ত—ইনি পরিচালকও বটেন) এবং নারদকে দর্শকদের ভালো লাগবে। যমরাজ (তমাল রায়চৌধুরী) বরাবর গলা অত উঁচু পর্দায় বেঁধে না রেখে মাঝে মাঝে ভঙ্গিমা পাল্টালে ভালো করতেন।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে যমপুরী থেকে নারদের কলকাতা আগমন এবং দরোয়ানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের অংশে, নারদ (সন্তু মুখার্জি) ও দরোয়ান (অমর দে) উভয়ের অভিনয়ই সহজ, সাবলীল। এই অঙ্কে উল্লেখযোগ্য ফ্লাশ-ব্যাকের অংশটি। আলোকসম্পাতের (আলো : পিন্টু বসু) কাজ এই অংশে প্রায় নিখুঁত বলা যায়। শিক্ষকরূপী অলোক ব্যানার্জির অভিনয় [illegible]। মৃত্যুর দৃশ্যে আবহ-সংগীতও কিছুটা প্রাণ সঞ্চারে সহায়ক হতে পারত। এই অঙ্কে আর যাঁরা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন, তাঁরা হচ্ছেন বিপ্লব চক্রবর্তী, গৌতম বন্দোপাধ্যায়, বিজয় চক্রবর্তী, আদিত্য মিত্র প্রভৃতি।

তৃতীয় অঙ্কে হারানো আত্মার খোঁজ নিয়ে নারদের যমপুরী গমনের পর নাটকের গতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে যমরাজের সংলাপে। শেষ পর্যন্ত 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই নীতিটি মেনে নিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক বেগারামের আত্মার আন্দোলনে সামিল হবার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের যবনিকাপাত।

নাটকটির মঞ্চ পরিকল্পনা যথাযথ। দুটি গানের (দুটিই নারদের মুখে) প্রয়োগ, কথা এবং সুর উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ভীমপলশ্রী রাগের উপর শেষের গানটি (সুরকার কেষ্ট বসু) ভাল লাগে।

নাট্য-সমালোচক

হঠাৎ নেতা

কোম্পানি ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সপ্তদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান এ বছর অনুষ্ঠিত হল অ্যাকাডেমী মঞ্চে। বছরের এই একটি আনন্দময় সন্ধ্যাকে স্মৃতিকে সমবেত দর্শকদের কাছে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য সংস্থার সদস্যদের বিরামহীন চেষ্টা এইদিন কার্যত সফল। বক্তৃতা, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ, সংগীতানুষ্ঠান এবং নাটক—এতগুলি উপচারে সাজানো উৎসবের এই সন্ধ্যাটি আকর্ষক। সংগীতের আসরে অংশ নিয়েছিলেন শ্যামল মিত্র, সুমিত্রা সেন, নিশীথ সাধু, প্রতিমা মুখার্জি। এই সন্ধ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল নাটক। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অভিনয় করলেন জোছন দস্তিদারের 'হঠাৎ নেতা'। সুখের কথা, শিল্পীরা সকলেই নাটকে বাঞ্ছিত গতিবেগ সঞ্চার করতে পেরেছেন। দলগত অভিনয় ঐক্য নাটকের একাধিক মুহূর্তকে উপভোগ্য করে তুলতে পেরেছে। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন গৌর ঘোষাল, কনক রায়, নরেন চৌধুরী, সরোজ ঘোষাল, শচীন ভট্টাচার্য, রাখাল মজুমদার, জে এন পানিগ্রাহী, রণজিত সরকার, মলয় কাহালী, শুভেন্দু মল্লিক, পান্নালাল সরকার, নীতিশ গুপ্ত, বলাই দাস ও নাট্যনির্দেশক প্রশান্ত ব্যানার্জি।

নাট্যসমালোচক

অরণ্যদেব
লী ফক

বাঁচাও.. বাঁচাও..
?
মরুভূমির রাস্তার ওপরে

আমায় রক্ষা করুন। ওঃ.....
কী ব্যাপার?
?

কী হয়েছে? কোন গণ্ডগোল?
জানি না। মেয়েটি 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এখন বোধহয় জ্ঞান ফিরছে...
উঃ...

ওঃ... সেই দৈত্যের মতন বিরাট... পাখিগুলো!
এখন তো আর কোন ভয় নেই, আপনি বরং একটু জিরিয়ে নিন।
ঘটনাটা খুলে বলুন।

?!
'গতকালের ঘটনা... আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম... হঠাৎ দেখলাম বাজপাখির একটা ঝাঁক আমার দিকে উড়ে আসছে!'

'ওরা গাড়ি থেকে আমায় তুলে নিল!'

'তারপর উড়ে চলল দূর আকাশে... এখন ভাবলে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

তারপর? তারপর কী হল?
আর কিছু মনে পড়ছে না।
হুম্‌ম্‌... ঘটনাটা ঠিক কোথায় ঘটেছে বলুন তো?
বেচারীর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে দেখছি।

বিহার প্রদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। বিহার কংগ্রেস পরিষদীয় দল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পান্ডেকে দলের নেতৃত্ব থেকে বিদায় দেওয়ার ফলে তিনি পদত্যাগ করেছেন। ১ জুলাই বিহার আইনসভা দলের নেতৃত্বের প্রশ্নের ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পান্ডের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিহার বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীআবদুল গফুরের নাম অনুমোদন করেছেন। বিহার কংগ্রেসে আইনসভা দলের নেতারূপে শ্রীআবদুল গফুর খানের মনোনয়নকে কংগ্রেস ও বিরোধী দলের অধিকাংশ নেতাই স্বাগত জানিয়েছেন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসী এম এল এ শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ অবশ্য এই মনোনয়নে সন্তুষ্ট নন। খুশী হতে পারেননি সি পি আই ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ। সি পি আই-এর বিহার রাজ্য পর্ষদের সম্পাদক বলেন দুর্ভাগের কথা আবার একবার উপর থেকে নতুন নেতা চাপিয়ে দেওয়া হল। এদিকে রেল মন্ত্রী শ্রী এল এন মিশ্র এবং বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পান্ডে (এঁরা দুজন বিহার কংগ্রেসের দুটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর নেতা) দুজনে যুক্তভাবে কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পত্রে পরবর্তী নেতা হিসাবে শ্রীআবদুল গফুরের নামই প্রস্তাব করেন।

দেশী সংবাদ

২৫ জুন—কেন্দ্রীয় গুদাম থেকে চাল দিতে আমোদ রাজি নন। খাদ্য করপোরেশনের গুদাম থেকে রাজ্য সরকার যদি চালের সরবরাহ না পান, তাহলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। [illegible] কলকাতাতে [illegible] রেশন [illegible] সহ দার্জিলিঙের পার্বত্যাঞ্চলে আংশিক রেশন [illegible]।

দার্জিলিং এবং শিলিগুড়িতে [illegible] [illegible] ১ লক্ষ [illegible] টাকার এবং ১১০০ টাকা [illegible] পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ [illegible] চাচ্ছেন এবং এ সম্পর্কে বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ওই টাকা ছাড়াও শিলিগুড়িতে [illegible] বাকির কাছে ১০০ রাউন্ড রাইফেলের গুলি পাওয়া গিয়েছে।

২৬ জুন—আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বর্ধমান বীরভূম, পশ্চিম দিনাজপুর ও মেদিনীপুরের জেলা শাসকদের ডাক পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী [illegible] পঞ্চাশ হাজার টন চাল সংগ্রহ করতে বলেন।

[illegible] এখন থেকে [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর রেল টিকিট কিনেছেন [illegible] এক ভদ্রলোক। ১০ টাকা [illegible] ১ [illegible] দিল্লি-কলকাতা [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর একখানি [illegible] রিজার্ভেশন-এর জন্য টিকিট কেনা হয়। তাঁর যাত্রার তারিখ আগামী ২০২৩ সালের ২ অক্টোবর। তিনি যাবেন দিল্লিতে।

১৭ জুন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রায় দু'কোটি টাকা বিক্রয় কর ফাঁকি দেওয়ার এবং ভুয়া সেলস্ট্যাক্স ডিক্লারেশন ফরম চালু করার এক চক্র ধরা পড়েছে। এই চক্রান্তের সঙ্গে ৩০টি ভুয়া ফার্ম জড়িত। এবং এই ভুয়া কারবারে অসাধু ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার জন্য বেলেঘাটার বিক্রয়কর অফিসের একজন কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারকে সাসপেনড করে মিশা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক শ্রী বি বি ব্যানার্জি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] পরীক্ষার [illegible] পরীক্ষার্থীদের [illegible] অসদুপায় অবলম্বন [illegible] ২৬ জুন থেকে [illegible] উক্ত পরীক্ষা বিজ্ঞপ্তি [illegible] পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

২৮ জুন—খাদ্য করপোরেশনের কাছে [illegible] এককোটি টাকা [illegible] পরিবহণ এজেন্সিরা আগামী পয়লা জুলাই থেকে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন। এর দরুন যে কোন মুহূর্তে রেশন ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আজ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে [illegible] অসুবিধা সত্ত্বেও গম ও চালের পাইকারী ব্যবসা সরকারের [illegible] নীতি [illegible] প্রশ্ন ওঠে না। গম সংগ্রহ জোরদার করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে ওয়ার্কিং কমিটি রাজ্যগুলিকে অনুরোধ জানান।

২৯ জুন—আসামের উত্তরাঞ্চলের [illegible] [illegible] বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। একমাত্র গোয়ালপাড়া জেলার [illegible] ১ লাখ মানুষ বন্যা কবলিত। আসাম সরকার ত্রাণের কাজে সাহায্য করতে সেনাবাহিনীকে ডেকেছেন।

বাংলাদেশ থেকে মাছ আমদানী রাজ্য সরকার শুধুমাত্র সরকারী স্তরে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। কারণ সরকারী প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে ঠিকমত কাজ করতে পারছে না। রাজ্য সরকার আবার তাই ওপেন জেনারেল লাইসেন্স প্রথায় ফিরে যেতে চান।

৩০ জুন—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের পদত্যাগ করা সম্পর্কে যে কথা শোনা যাচ্ছে, সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন: এমন কথা তো আমি জানি না। কাশীবাবু তদন্তের প্রস্তাব দিয়ে যে চিঠি দিয়েছেন তার একটা কপি তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে চালের সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং যোগানের পরিমাণ যা দাঁড়িয়েছে তাতে আবার রেশনের চালের বরাদ্দ হ্রাস [illegible] আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত আগামী ৫ জুলাই রাজ্য মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে আলোচনার পর স্থির হবে।

১ জুলাই—সারা ভারত জুড়ে [illegible] কেবল চুরি চলছে, কলকাতায় গত তিন মাস [illegible] কেবল চুরি হয়ে গিয়েছে। ফলে সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশী টেলিফোন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। [illegible] কঠোর শাস্তিবিধান ও কেবল চুরি যাতে না হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৫ জুন—[illegible] পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে পাক জাতীয় পরিষদে একটি বিল পেশ করা হবে। [illegible] পাকিস্তান [illegible] পার্টির [illegible] এ খবর দিয়েছে।

২৬ জুন—[illegible] [illegible] [illegible] মুসলিম লীগের [illegible] [illegible] [illegible] মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট [illegible] দলের [illegible] পার্টি থেকে মুসলিম লীগের [illegible] ছিঁড়ে [illegible]।

২৭ জুন—প্রেসিডেন্ট নিক্সনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২০ ডলার [illegible] ছিল।

২৮ জুন—পাকিস্তানের [illegible] হল। এবার থেকে রেডক্রস শব্দটি আর উচ্চারিত হবে না। বলা হবে রেড ক্রেসেন্ট। যার অর্থ লাল রঙের অর্ধচন্দ্র। গতকাল পাক সরকার তার এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে: এবার থেকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হবে [illegible]।

২৯ জুন—আজ চিলির প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে সেনাবাহিনী গোলাবর্ষণ করে। [illegible] [illegible] [illegible] আত্মগোপন করেন। মনে করা হচ্ছে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাসাদটি সেনাবাহিনী দখল করতে পেরেছে।

৩০ জুন—মার্কিন ধনপতি রকফেলারের সঙ্গে গতকাল পিকিংএ চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাইয়ের কথাবার্তা হয়। বেশ খোলাখুলিভাবেই উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়।

১ জুলাই—বাংলাদেশ সরকার রফতানী বাণিজ্য পুরোপুরি এবং আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৮২ ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধন এবং পণ্য দ্রব্যাদির ঘাটতি দূর করাই এর উদ্দেশ্য বলে আজ ঘোষণা করা হয়।

Cover Printed by Ananda Offset Private Ltd.—Calcutta - 54

৪০ বর্ষ] শনিবার, ৫ শ্রাবণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 21st July, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ৩৮

C.. .er Printed by Ananda Offset Private Ltd.—Calcutta

C.. .er Printed by Ananda Offset Private Ltd.—Calcutta

সূচীপত্র

C...er Printed by Ananda Offset Private Ltd.

সূচীপত্র

যাও কন্যা, নিয়ে এসো জীবনসাথী মীন,
চোখ ধাঁধানো রঙের নেশায় রাখবে চিরদিন—
লালভাইয়ের গোলাপী সবুজ রঙ!

CMLB-17-333 BN

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইরান
নেকড়ে-পালিত শিশু
ইরান জানিয়েছে, পাকিস্তান আক্রান্ত হলে সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।

বৈঠক হলেও, এমনকি রফা হলেও, পাকিস্তান লড়াইয়ের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে

আবার ভারত-পাক বৈঠক বসছে। কবে বসবে তা অবশ্য এখনও পাকা হয়নি। পাকিস্তান প্রথমে প্রস্তাব করেছিল, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই বৈঠক বসুক। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। কারণ, ভারত পাকিস্তানের প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা না করে কিছু বলতে রাজি ছিল না।

তারপর ভারত প্রস্তাব করল জুলাই মাসের মাঝামাঝি বৈঠক হোক দিল্লিতে। পাকিস্তানের আবার তাতে আপত্তি। আপত্তি দিন নিয়েও। আপত্তি স্থান নিয়েও। দিন নিয়ে আপত্তি এইজন্য যে ওই সময় ভুট্টো সাহেব বিদেশে থাকবেন। তিনি যাচ্ছেন আমেরিকা ও ইটালি। তাঁর অনুপস্থিতির সময় পাকিস্তান কোনও আলোচনায় বসতে রাজি নয়। স্থান নিয়ে যে আপত্তি সেটা এই যুক্তিতে যে, এর আগের বৈঠকটা হয়েছিল ভারতে। সুতরাং, এবারের বৈঠকটা হওয়া উচিত পাকিস্তানেই। পাকিস্তান রাজধানী ইসলামাবাদ বা ইসলামাবাদের নিকটতম শৈলবিহার মারিতে বৈঠকটা করতে চায়। আর, দিন সম্পর্কে পাকিস্তানের বক্তব্য, জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে হলেই ভাল হয়। তখন ভুট্টো সাহেব দেশে ফিরে আসবেন।

এখন ভারত বাংলাদেশ আলোচনার পর দেখা যাচ্ছে, ওই সময় আবার ভারতের অসুবিধা। কারণ, ওই সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান দেশে থাকবেন না। শেখ সাহেব থাকবেন কানাডায়। টেলিফোনে আলোচনার জন্যও তাঁকে পাওয়া কঠিন হবে। ভারত চায় এই বৈঠকটা হোক ভারতেই। দিল্লিতেই। কারণ, না হলে আলোচনাকালে বাংলাদেশের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করা যাবে না। পাকিস্তান এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তাই, বাংলাদেশের প্রতিনিধি পাকিস্তানে যেতে পারবেন না। ভারত-পাক বৈঠকের সময় ভারতীয় প্রতিনিধি দল আলোচনার জন্য হাতের কাছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের পাবেন না।

স্থান ও দিন নিয়ে এই তর্ক-বিতর্ক চললেও মনে হয় এবারের আলোচনাটা হবে। হয় আগস্টের প্রথম সপ্তাহে হবে, না হয় জুলাইয়ের শেষ দিকে হবে।

এটা অবশ্য শিখর শীর্ষ বৈঠক নয়। যেমন হয়েছিল সিমলায়—প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর। এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠকও নয়—অর্থাৎ দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা নয়। এটা [illegible] অফিসার পর্যায়ের আলোচনা—
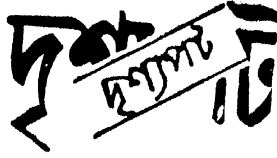
একদিকে থাকবেন আজিজ আহমদ, আর একদিকে পি এন হাকসর। দু' পক্ষেই সঙ্গে আরও অফিসার থাকবেন।

✻

কিন্তু অফিসার পর্যায়ের আলোচনা হলেও এ আলোচনার গুরুত্ব কম নয়।

পাকিস্তান কথাটা স্বীকার করতে চাইছে না, আসলে এই বৈঠকটা হবে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ঘোষণার ভিত্তিতে। পাকিস্তান সেই ঘোষণার কাগজটা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চায়।

আসলে ভারত ও বাংলাদেশ যে যৌথ প্রস্তাব পাকিস্তানের কাছে রেখেছে তাতে ব্যাখ্যার তেমন কোনও সুযোগ বা প্রয়োজন নেই। প্রস্তাবটা খুব পরিষ্কার। এক নম্বর বক্তব্য, বাংলাদেশ বিচারের জন্য অল্প কিছু পাক যুদ্ধবন্দীকে আটকে রেখে আর সবাইকে ছেড়ে দিতে রাজি। দু' নম্বর বক্তব্য, পাকিস্তানে আটক সব বাঙালীকে দেশে ফিরতে দিতে হবে। তিন নম্বর কথা, বাংলাদেশে যেসব অবাঙালী নিজেদের পাকিস্তানী বলে ঘোষণা করেছে, তাদের পাকিস্তানে নিতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার গোড়ায় বলেছিলেন, যতক্ষণ না পাকিস্তান বাংলাদেশকে মেনে নেবে ততক্ষণ যুদ্ধবন্দীদের ছাড়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বাংলাদেশ সরকার প্রথমে আঁচ দিয়েছিলেন, বহু যুদ্ধবন্দীকে তাঁরা বিচার করতে চান। কিন্তু পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের স্বার্থ বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার অনেকটা নেমে এসেছেন। তাঁরা সামান্য কিছু যুদ্ধবন্দীকে বিচার করতে চান। আর সবাইকে এখুনি ছেড়ে দিতে রাজি।

পাকিস্তান যেন এই ব্যাপারে অনমনীয়। বাংলাদেশে একজনও যুদ্ধবন্দীর বিচার হলে পাকিস্তান তাতে রাজি নয়। পাকিস্তানের বক্তব্য, যুদ্ধবন্দীদের বিচার করার কোনও অধিকারই বাংলাদেশ সরকারের নেই। তাদের বিচার করতে হলে তা করবে পাকিস্তান সরকার।

পাকিস্তান এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালতে একটা মামলাও দায়ের করেছে। সেই মামলায় পাকিস্তানের দাবি : ভারত যাতে বিচারের জন্য কোনও যুদ্ধবন্দীকে বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে না দিতে পারে তেমন হুকুম জারি করা হোক। পাকিস্তান শুরু থেকে কখনও পাক যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বাংলাদেশকে মানতে রাজি নয়। পাকিস্তানের বক্তব্য, এরা ভারতের বন্দী—বাংলাদেশ আবার এর মধ্যে কোথা থেকে এল! পাকিস্তান এখনও বলছে, একজনও যুদ্ধবন্দী আটকে থাকা পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব না। একজন যুদ্ধবন্দী বিদেশে থাকা পর্যন্ত কোনও মীমাংসা হতে পারে না।

এদিকে, বাংলাদেশ সরকারও বলছেন, তাঁরা কিছু যুদ্ধবন্দীর বিচার করবেনই—সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সুতরাং, যুদ্ধবন্দী বিচারের প্রশ্নে এখনও জোরতর বিরোধ আছে। কিছুটা বিরোধ আছে বাংলাদেশের পাকিস্তানীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও। পাকিস্তান তাদের সবাইকে নিয়ে যেতে রাজি নয়। ওদের নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখা হবে সেইটাই পাকিস্তানের একটা বড় সমস্যা। কারণ, পাকিস্তানের কোনও প্রদেশ এখন আর মোজাহেদদের ঠাঁই দিতে রাজি নয়।

কিন্তু এত সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বৈঠকে বসছে—ভারত ও বাংলাদেশ বার বার এ কথা বলা সত্ত্বেও যে, যুক্ত ঘোষণায় তারা যা বলেছেন তার চেয়ে নতুন করে আর কিছু বলার নেই। এর নানা কারণ।

এক নম্বর কারণ, আন্তর্জাতিক মনোভাব। পাকিস্তান দেখেছে যে বিশ্বের বহু রাষ্ট্র ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। বিশ্ব জনমত ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় কারণ, যুদ্ধবন্দীদের আত্মীয়স্বজনের চাপ। ছাড়া পাবে, ছাড়া পাবে এই আশায় এরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছে। ক্রমে ক্রমে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। পাকিস্তান সরকার জানে, ভারত ও বাংলাদেশের এই বক্তব্য যতই প্রচার হবে যে পাকিস্তানই ইচ্ছা করে ৯৮ হাজার বন্দীকে ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করছে না, ততই পাকিস্তানে গণ্ডগোল বাড়বে। ওই ৯৮ হাজারের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব চায় কিছুর আগে এদের মুক্তির ব্যবস্থা [illegible]।

তৃতীয় কারণ [illegible] চীনের চাপ। চীন এখন বাংলা[illegible] সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে চায়। চীন আর বেশি দিন বাংলাদেশ থেকে সরে থাকতে চায় না। থাকলে বাংলাদেশে চীনের যে প্রভাবটা ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। চীন বরং বাংলাদেশের [illegible] অংশটা চীনের বন্ধু তাকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। এবং, সেই জন্যই চায় ঢাকায় দূতাবাস খুলতে।

কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী করতে আগ্রহী হলে চীন এখনই পাকিস্তানকে ত্যাগ করতে চায় না। বরং পাকিস্তান ও পাকিস্তানীদের চীন দেখাতে চায় যে, সে আমেরিকার মত নয়, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে সে কিছুতেই বাংলাদেশকে মানছে না।

অথচ বাংলাদেশকে মানার ব্যাপারে চীনের পক্ষে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করাও ক্ষতিকর। চীন এখন বুঝেছে, বাংলাদেশ বাস্তব সত্য। তাই, পাকিস্তানের উপর চীন এখন নিজ স্বার্থেই বাংলাদেশকে মেনে নেওয়ার চাপ দিচ্ছে।

কিন্তু যে কারণেই স্বীকৃতির পক্ষে বা মিটমাটের পক্ষে যত চাপ থাকুক, পাকিস্তানে আবার উগ্র বাংলাদেশ বিরোধীদের চাপও প্রবল। তারাও কম শক্তিশালী নয়। সেনাবাহিনীর বড় একটা অংশের মতও বাংলাদেশ বিরোধী।

ভুট্টো তাই বলছেন, বাংলাদেশকে মানতে পারি, তার সঙ্গে রফা করতে পারি যদি সব যুদ্ধবন্দীকে ছাড়া হয়। তাহলে পাকিস্তানে আটক সব বাঙালীকেও ছাড়া হবে।

পাকিস্তানের আশা, বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত সব যুদ্ধবন্দীকে ছাড়তে রাজি হবেই। এবং, ভুট্টো দেখাতে পারবেন এটা তাঁর একটা বড় জয়।

*

কিন্তু এই সব বৈঠক প্রভৃতির কথা শুনে আমরা যেন মনে না করি যে পাকিস্তানী মনোভাব পাল্টাচ্ছে। পাকিস্তান আসলে আর একটা লড়াইর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। পাকিস্তান ১৯৭১-এর লড়াইয়ে পরাজয়ের গ্লানি দূর করতে চায় আর একটা লড়াই করে এবং সেই লড়াইয়ে জিতে। পাকিস্তান চাইছে ১৯৭৪ সালে এই লড়াই করতে। কিন্তু দ্রুত প্রস্তুতি নিতে পারলে পাকিস্তান চলতি বছরের শেষ দিকেও লড়াই শুরু করে দিতে পারে।

সেজন্য সে পাগলের মত অস্ত্র সংগ্রহও শুরু করেছে। অস্ত্র আসছে ইরান থেকে, ইউরোপ থেকে, আমেরিকা থেকে, চীন থেকে এবং পৃথিবীর আরও কিছু দেশ থেকে।

পাকিস্তানের "বন্ধুরও" অভাব নেই। দুটো কারণে এই সব "বন্ধুরা" পাকিস্তানের পক্ষে।

একটা কারণ, পাকিস্তানই ভারতের একমাত্র প্রতিবেশী যাকে দিয়ে ভারতকে ব্যতিব্যস্ত রাখা যায়। ভারতের উন্নতি মন্থর করার একটা বড় উপায় হল ভারতকে নিয়মিত লড়াইয়ে বা লড়াইয়ের আশংকার মধ্যে জড়িয়ে রাখা। পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর স্বার্থে এই কাজ সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারে পাকিস্তান। সেজন্য পাকিস্তানকে কিছু অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিলেই হয়ে যায়। ভারত যাতে দ্রুত উন্নতি করতে না পারে এ লক্ষ্য পৃথিবীর একাধিক বড় রাষ্ট্রের।

দ্বিতীয় কারণ, মধ্য প্রাচ্যের তেল। পৃথিবীর সব বড় দেশের দৃষ্টি এখন মধ্য প্রাচ্যের তেলের দিকে। এ নিয়ে নানা খেলা চলছে। আমেরিকার ভয়, রাশিয়া এই তেলের খনির দিকে এগোচ্ছে। তারা ইরাককে কবজা করেছে। আফগানিস্থানেও বেশ ভালভাবে উপস্থিত। আমেরিকার ভয়, পাকিস্তান ভেঙে গেলে বালুচিস্তানেও রুশদের প্রভাব বাড়বে। এবং তাহলে রাশিয়া তৈল এলাকাকে তিনদিক থেকে চেপে ধরতে পারবে। এবং ইরানে যে প্রায় ১৪।১৫ লক্ষ বালুচ আছে তাদের মাধ্যমে ওই তেল সমৃদ্ধ এলাকায়ও প্রতিনিয়ত গণ্ডগোল পাকিয়ে রাখবে।

পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখা এই কারণেও পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর একান্ত প্রয়োজন। পাকিস্তান ভাঙলেই ওখানে ছোট [illegible] রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। এবং নানা নতুন শক্তি দাঁড়িয়ে যাবে। তার চেয়ে আমেরিকার পক্ষে রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান অনেক ভাল।

পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠী এই দু কারণেই পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। এবং প্রধানত এই সাহায্যে বলীয়ান হয়েই পাকিস্তান আবার ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আগামী বৈঠক সত্ত্বেও সেই প্রস্তুতি চলবে। বৈঠক যদি সফল হয়, এমন কি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে যদি ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরোধ মিটেও যায় তাহলেও এই বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি চলবে। পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে এবং গুজরাট রাজস্থানের মরুভূমি এলাকা নিয়ে বড় রকমের বিরোধ পাকিয়ে তুলবেই। তারপর চাইবে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে।

৮।৭।৭৩।

নবারুণ গুপ্ত

মুখ্যমন্ত্রীর টি-ভি অনুষ্ঠান

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম টেলিভিশন শো-এর অনুষ্ঠান আজ, ১৯৭৮ সালের ৩ সেপটেম্বর, শুরু হল। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের সর্বজনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে উপস্থিত করতে পেরে নিজেদের কৃতার্থ মনে করছি। আমাদের বরাবরই ইচ্ছে ছিল, "মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক সন্ধ্যায়", এই অনুষ্ঠান দিয়েই আমাদের টি-ভি চালু করব। দেখুন, আমরা আমাদের কথা রেখেছি! মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও যে আজ আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য খানিকটা সময় দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে আমরা প্রথমে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে এবং পরে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে না পেলে গোটা ব্যাপারটাই শিরহীন যজ্ঞে পরিণত হত। তাই আপনার নাগাল পাবার জন্য আমরা দু বছর ধৈর্য ধরে আপনাকে ধরার চেষ্টা করেছি। এবং আমাদের চারজন প্রতিনিধি আপনার নাগাল পাবার জন্য ট্রেনে প্লেনে এবং মোটর গাড়িতে দু বছরে মোট ছাব্বিশ হাজার দু শ আটাত্তর কিলোমিটার ভ্রমণ করেছে। আপনার মত ভ্রাম্যমাণ মুখ্যমন্ত্রী এই ভূমন্ডলে আর দ্বিতীয়টি নেই। এই শোনা গেল আপনি কলকাতায়, কলকাতায় খোঁজ নিয়ে শোনা গেল আপনি জলপাই-গুড়ি, সেখানে গিয়ে শোনা গেল আপনি ঝাড়গ্রাম, সেখানে গিয়ে শোনা গেল আপনি বেলমুড়ি, সেখানে গিয়ে শোনা গেল আপনি কটকে, কটকে গিয়ে শোনা গেল আপনি মাদ্রাজে, মাদরাজে শোনা গেল আপনি পাটনায়, পাটনায় গিয়ে শোনা গেল আপনি দিল্লি। আমাদের প্রতিনিধিরা দু বছর ধরে এইভাবে আপনার অনুসরণ করেছে। টি-ভি কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হবার পরও তা চালু করতে সেই কারণেই দু বছর দেরি হল। কিন্তু আমাদের সংবাদপত্র, পত্রিকা প্রভৃতি সকলেই দেখা গেল, আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুগত। তাই আপনাকে দিয়ে টি-ভি উদ্বোধন করানো হবে শুনে তাঁরা এই দিনটির জন্য দু বছর ধরে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে। মহাত্মন্, এবার আপনি কিছু বলুন।

মুখ্যমন্ত্রী : আজ পশ্চিমবঙ্গে টেলিভিশন কেন্দ্র চালু হল। এটা আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা। এতদিনে আমরা পাটনা, কটক, শ্রীনগর, কানপুর, লখনউ, অমৃতসর প্রভৃতি অগ্রসর ও উন্নত শহরগুলির সমকক্ষ হলাম। এ আমাদের গর্ব। আমরা যে এগিয়ে চলেছি, এই টেলিভিশন কেন্দ্রই তার প্রমাণ। এখন অবশ্য টেলিভিশনের সুযোগ সকলে নিতে পারবেন না। যাঁদের হাতে পয়সা আছে তাঁরাই টি-ভি সেট কিনতে পারবেন। পরে আমরা সে-সব সেট রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেব এবং তার সুবিধা যাতে গরিবরা পায়, তার ব্যবস্থা করব। আমরা এমন—

টি-ভি সাংবাদিক : ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়। আপনারা যাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনলেন যে, টি-ভি শুধু বড়লোকের ড্রইং রুমেই শোভা পাবে না, পরে রাষ্ট্রায়ত্ত করে তা গরিবদের ঘরেও পৌঁছে দেওয়া হবে, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার মতই পুলকিত বোধ করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী : রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যাপারটা শুধু টি-ভিতেই সীমাবদ্ধ রাখিনি। ওটা আমাদের জাতীয় নীতি। আমরা ব্যাংক, জীবন বীমা, কয়লা, লোহা, ভূমি, খাদ্য-শস্যের পাইকারী ব্যবসা সবই তো রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি। ফলে আমাদের দেশ প্রগতির দিকে এগুচ্ছে।

টি-ভি সাংবাদিক : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, ১৯৭২ সালে আপনি কয়েক লক্ষ বেকার যুবককে চাকরি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আশা করি আপনার সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী : অবশ্যই। আমি বলেছিলাম, বেকার যুবকদের চাকরি দেব। কয়েকটা দফতরের জন্য লোক নেবার বিজ্ঞাপনও বের হয়েছিল। এবং কয়েকটা মাত্র পদের জন্য লক্ষ লক্ষ দরখাস্ত জমা পড়ল। চারটে গুদামঘরই ভাড়া করতে হল দরখাস্ত-গুলো গুছিয়ে বেছে ফাইলে রাখবার জন্য। এখনও সব দরখাস্ত খোলা হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ এক সঙ্গে এত দরখাস্ত এল যে ফাইল শর্ট পড়ে গেল। সারা ভারতে টেন্ডার দিয়ে ফাইল আনাতে আনাতেই কয়েক লক্ষ দরখাস্ত উই এবং ইঁদুরের অত্যাচারে নষ্ট হয়ে গেল। সেজন্য আমরা সরকারীভাবে দুঃখ প্রকাশও করেছি। এতদিনে আমরা সেই দরখাস্তের স্তূপ থেকে—

টি-ভি সাংবাদিক : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, কতগুলি দরখাস্ত পড়েছিল, তার সংখ্যা কি আপনার পক্ষে বলা সম্ভব?

মুখ্যমন্ত্রী : নিশ্চয় বলতে পারি। আমাদের স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোর স্যাম্পল সারভে অনুসারে দরখাস্তের উর্ধ্বসংখ্যা পঁচিশ লাখ এবং নিম্নসংখ্যা সাতাত্তর হাজার।

টি-ভি সাংবাদিক : উর্ধ্ব এবং নিম্ন সংখ্যার মধ্যে এতটা ফারাক হবার কারণ কি?

মুখ্যমন্ত্রী : পরিসংখ্যান নির্ভুল রাখতে গেলে এই ব্যবধান রাখতেই হয়। যাই হোক যা বলছিলাম, সেই দরখাস্তের স্তূপ থেকে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে আমরা তাদের ইনটারভিউতে ডেকে পাঠাই। প্রথম ব্যাচে আটাশজন, দ্বিতীয় ব্যাচে তেত্রিশজন এবং শেষের ব্যাচে সাতজনকে ইনটারভিউতে ডাকি। তাতে দেখা যায় শতকরা আশীজনই আর যুবক নেই, প্রৌঢ় হয়ে পড়েছে। অতএব তাদের আমরা চাকরি দিতে পারিনি। কারণ আমি বেকার যুবকদের চাকরি দেব, এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলাম, বেকার প্রৌঢ়দের চাকরি দেব এমন কথা বলিনি। আর শতকরা যে কুড়িজন তখনও যুবক ছিল, তাদের কেসগুলো পুলিস ভেরিফিকেশনে পাঠাই। কারণ সরকারী সারভিস কনডাকট রুল অনুযায়ী সরকারী চাকরিতে পুলিস ভেরিফিকেশন লাগেই।

টি-ভি সাংবাদিক : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এই পুলিস ভেরিফিকেশনের রিপোরট সংশ্লিষ্ট দফতরে আসতে কত দিন সময় লাগে?

মুখ্যমন্ত্রী : শতকরা তিরিশ ভাগ রিপোরট আসেই না।

টি-ভি সাংবাদিক : কেন?

মুখ্যমন্ত্রী : ফাইল হারিয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়ি যে রিপোরট পাওয়া যায় তাতে পাঁচ বছর সময় লাগে। বেশী হলে—

টি-ভি সাংবাদিক : তা হলে তো এরাও প্রৌঢ় হয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী : ধরেছেন ঠিকই। কিন্তু তাতে আমার করণীয় কিছু নেই। আমার প্রতিশ্রুতি ছিল বেকার যুবকদের কাজ দেবা। দেশে যদি বেকার যুবকই না থাকে, তা হলে চাকরি দেব কাকে? আচ্ছা, চলি। আমার আবার প্লেনের টাইম হয়ে এল। দিল্লি যেতে হবে। নমস্কার।

দেবরাজ

ও ষড়যন্ত্রী মশাই

রীতিমত একটা নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে ইরাকে পয়লা জুলাই। দেশের পুলিশের বড়কর্তা কর্নেল নাজিম কাজার ও-দিন ভুরিভোজে নেমন্তন্ন করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল হামাদ শিহাব আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেফটেনান্ট জেনারেল সাদুন ঘাইদানকে। নেমন্তন্ন হয়েছিল আরও বিস্তর ফৌজী পুলিসী আর গোয়েন্দা বাহিনীর হোমরাচোমরাদের। আসর বসেছিল বাগদাদের শহরতলির একটা বাগানবাড়িতে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটার উদ্দেশ্য খানাপিনা কী দহরম-মহরম করা নয়। ফাঁদ পেতেছিলেন ক্ষমতা দখল করার—কাজার আর তাঁর দলবল। বিদ্রোহী কিছু ফৌজও জুটে গিয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। ভোজের টোপ ফেলে দুই মন্ত্রীকে নিজের ডেরায় নিয়ে এসে তাঁদের বন্দী করেছিলেন কর্নেল কাজার। তাঁর মতলব ছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাগে এনে সরকারকে উৎখাত করা। তাঁর চক্রান্ত সফল হলে যে বাথ দল ১৯৬৮ সনে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ইরাকে ফৌজী শাসন চালু করেছে, ক্ষমতা তাদের হাতছাড়া হয়ে যেত।

ষড়যন্ত্রীদের আশা কিন্তু পোরেনি। কাজার যখন ফন্দি আঁটেন সরকারকে কাটে তোলার, রাষ্ট্রপতি আহমেদ হাসান আল-বকর তখন বিদেশে। ভোজের ভোজবাজি যেদিন করতে চেয়েছিলেন কাজার সেদিনই রাষ্ট্রপতি বকর পোল্যান্ড আর বুলগেরিয়ায় সফর সেরে পা দিয়েছেন দেশের মাটিতে। তিনি যখন বিমানবন্দরে তখনই খবর এলো পুলিসের বড়কর্তা কাজারের বেইমানীর। উপরাষ্ট্রপতি সিদাম হোসেন গিয়েছিলেন সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তিনি কাজারকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলেন। দেখা গেল কাজারের লোকেরা দলে এমন ভারী নয় যে সরকারী পুলিস কী ফৌজের সঙ্গে সমানে সমানে লড়তে পারে। বেগতিক দেখে তিনি চম্পট দিলেন ইরানী সীমান্তের দিকে যদি পালিয়ে জান বাঁচাতে পারেন। বেশ কিছু লোকলস্করও তাঁর সঙ্গে ছিল। জামিন হিসেবে তাঁরা ধরে রেখেছিলেন দুই মন্ত্রী শিহাব আর ঘাইদানকে। সরকারী দলের তাঁরা দুই প্রধান।
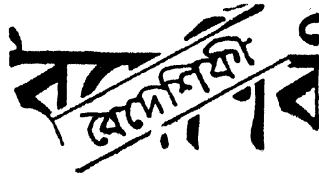
খণ্ডযুদ্ধ একটা এর আগে হয়েছিল সরকারী ফৌজ আর বিদ্রোহীদের সঙ্গে। তাতে হার হয় বিদ্রোহীদেরই। উপায় না দেখে কাজার পাড়ি দিলেন ইরান সীমান্তের দিকে, তাঁর পেছনে পেছনে ধাওয়া করল সরকারী পল্টন। সে সীমান্তের কাছে জারবাতিয়া শহরে কাজারের দলের সঙ্গে তাদের মোকাবেলা হলো। সরকারী দল বাথের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও যোগ দিলো ফৌজের সঙ্গে। শেষ রক্ষে হলো না বিদ্রোহীদের, ধরা পড়লেন তাদের চাঁই কাজার। কিন্তু তার আগে তিনি খুন করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিহাবকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘাইদানও জখম হলেন গুলিতে। কাজারের বিদ্রোহের বেলুন চুপসে গেল দেখতে দেখতে। তিনি কয়েদ হলেন সরকারী ফৌজের হাতে। এর পরিণাম যে কী তা কাউকে বলে দিতে হবে না। বিদ্রোহীদের জীবনের শেষ হয় সব দেশেই ফাঁসিকাঠে। আরবদের কানুনে বিদ্রোহীদের ক্ষমা নেই। কাজার নিজেই এর আগে আদালতের এক বৈঠকে ৪২ জন বিদ্রোহীর জীবন নেবার হুকুম দিয়েছিলেন আরও দুজন বিচারপতির সঙ্গে একমত হয়ে। তাঁর নিজের ভাগ্যলিপি তো আর ভিন্ন হতে পারে না। শেষ সংবাদ, ষড়যন্ত্রের নায়ক কাজারকে বাইশজন সঙ্গী সহ গুলি করে মারা হয়েছে।

ইরাক শাসন করছে বামপন্থী বাথ দল ১৯৬৮ সনের জুলাই থেকে। তারা কম্যুনিস্ট নয়, উগ্র জাতীয়তাবাদী। সব আরব রাজনৈতিক দলের মতোই তারাও ইস্রায়েলের ওপর হাড়ে চটা, ইস্রায়েলের মুরুব্বি আমেরিকার ওপরও অপ্রসন্ন। রুশিয়ার সঙ্গে দোস্তি সব আরব দেশেরই কারুর বেশী, কারুর কিছু কম। সিরিয়ার মতো ইরাকের সঙ্গেও সোভিয়েট দেশের ঘনিষ্ঠতা। এককালে পশ্চিমী কম্যুনিস্ট-বিরোধী শক্তিদের আড্ডা বাগদাদ মস্কোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর বিষ নজরে পড়েছে পশ্চিমীদের, বিশেষ করে আমেরিকার। ইরাকে প্রচুর মেলে পেট্রোল যা এতদিন তাকে বোকা বানিয়ে লুট করছিল পশ্চিমী তেল কোম্পানিগুলো। ইদানীং চোখ খুলেছে ইরাক সরকারের। শাসক বাথ দল উদ্যোগী হয়ে সরকারী তাঁবে নিয়ে এসেছে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে। বিদেশী কোম্পানিগুলো ইরাকের এ চাল বানচাল করার চেষ্টায় ছিল তাদের বিশেষজ্ঞদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু ইরাককে বাঁচিয়ে দিয়েছে রুশীরা তার লোকজনদের শিখিয়ে পড়িয়ে, তেল তোলার কাজ যাতে ভণ্ডুল না হয় তার ব্যবস্থা করে।

এমন সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে ইরাকের ওপর চটে আছে পশ্চিমী দেশগুলো যাদের আঁতে ঘা দিয়েছে সে-দেশের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা। তারা কাজে লাগাতে চাইছে ইরাকের ঘরোয়া ঝগড়াকে আর তার প্রতিবেশীর সঙ্গে অবনিবনাকে। ইরাকের উত্তর এলাকায় বসবাস করে কুর্দরা। অনেক কাল ধরেই সেখানকার একদল লোক মতলব ভাঁজছে আলাদা একটা কুর্দিস্তান গড়ে তুলতে। তাদের মদত দিচ্ছে বিদেশীরা। মিটমাটের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে গেছেন রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন নিজে ইরাকে এসে মাস চারেক আগে। তাতে কিন্তু হাল ছাড়েনি বাইরের শত্রুরা। তারা উস্কানি দিয়ে চলেছে বিভেদকামী কুর্দদের। তাদের চাঁই মোল্লা মুস্তাফা বারাজানি স্পষ্টই বলেছেন, বাথ সরকারকে উচ্ছেদ করবার জন্যে যে কোনও দেশের সাহায্য নিতে তিনি রাজী। রুশিয়ার ওপরও তিনি চটা। পারলে ইরাকের সঙ্গে রুশিয়ার যে চুক্তি হয়েছে তা তিনি বাতিল করে দেবেন এই তাঁর সাফ কথা। এ তো গেল ঘরের শত্রু। বাইরে সীমান্ত নিয়ে মন-কষাকষি ইরাকের ইরানের সঙ্গে।

বিদ্রোহ করতে কাজারকে কে তাতিয়েছিল? বাইরের লোক, না ঘরের? এমন ইঙ্গিতও কেউ কেউ করেছেন, তাঁর পেছনে ছিলেন খাস দলের শক্ত মানুষ, উপরাষ্ট্রপতি সিদাম হুসেন। কাজার নাকি তাঁরই পেয়ারের লোক। ক্ষমতা দখল করার জন্যে চক্রান্ত করেছিলেন হুসেন নিজেই। কাজার তাঁর শিখণ্ডী। এ সব সম্ভবত ঘরে কথা, শত্রুপক্ষের রটনা। তবে ইরানের এ ব্যাপারে যে হাত আছে সে সন্দেহ অনেকেরই। সীমান্ত নিয়ে ইরাকের সঙ্গে তার ঝগড়া তো আছেই, রুশিয়ার সঙ্গে ইরাকের গলাগলিও ইরানের পছন্দ নয়—তার মুরুব্বি আমেরিকারও নয়। ইরান এখন চাইছে পারস্য উপসাগর এলাকার মাতব্বর হয়ে উঠতে। কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র সে কিনছে নানা দেশ থেকে। ইরাক তার পথের কাঁটা। আশে-পাশের ছোটখাট দেশগুলোকে ভজাতে গেলে ইরাক হয়তো বাধা দেবে। তাদের পরামর্শ দেবে ইরান-আমেরিকার ফাঁদে পা না দিতে। তা হলে ইরান যা চাইছে তা হবে না। তাই সে হয়তো ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে ইরাকে যে প্রগতি বাথ সরকারের আমলে এসেছে তা নষ্ট করার, এই অনেকের অনুমান।

'বিশুদ্ধতম কবি'

ঢাকার 'নলেজ হোম' থেকে বেরিয়েছে এই বইটি, জীবনানন্দ দাশের কবিতা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি আলোচনা গ্রন্থ, লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। ইনি স্বয়ং একজন বিশুদ্ধ কবি এবং এ'র কবিতা বিষয়ে আলোচনা আগেও আমাদের কাছে দু'একটি এসে পৌঁছেচে। এই বইটি খুব মন দিয়ে ও খেটেখুটে লেখা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ সাহেব আগাগোড়া বইখানির কোথাও নিছক ভাবালুতা বা উচ্ছ্বাসের প্রশ্রয় দেন নি। আজকাল অনেকে জীবনানন্দকে 'রূপসী বাংলার কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করেছেন। ইনি প্রকৃত সমালোচকের মতন খুব সংগত কারণেই 'রূপসী বাংলা' বইটির ওপর আলাদা কোনো জোর দেন নি। তবে এ'র ভাষা বড় বেশী সংস্কৃত ঘেঁষা—এইটুকুই যা দোষের। কবিতার ভাষা যাই হোক, কবিতা-আলোচনার ভাষা আমার মতে খুব ঝরঝরে সুবোধ্য হওয়াই ভালো। 'প্রাতিস্বিকতা', 'উপর্যুক্ত নিস্তীর্যমানতা', 'প্রতিন্যাস'—এই ধরনের শব্দ ব্যবহারে আজকাল একটু হোঁচট খেতেই হয়। মনে হয় যেন রীতিটি অধ্যাপকীয়, অমনি গা ছমছম করে কেননা কবিতা আলোচনায় অধ্যাপকীয় রীতিটি এখনও আমাদের কাছে তেমন সুখস্মৃতি আনে না। যেমন, 'সাবার্বিহিত' একটি শব্দ দেখে থমকে গিয়ে ভাবলুম, কথাটার ঠিক মানে কি? আজ মনে পড়লো, 'অব্যবহিত' বলে একটি শব্দ কখনো সখনো দেখেছি বটে, সেইদিক থেকে একটা মানে করা যায়। পড়াশুনোর সময় এই প্রক্রিয়া কি খুব আরামদায়ক? বিশেষত কাছে, দূরে এই রকম সব চমৎকার চেনাশুনো শব্দ যখন রয়েইছে। এহ বাহ্য।

আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দের কবিতার অনেকগুলি নতুন দিক আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। যেমন, এই কবির বর্ণ, শব্দ, ছন্দ এবং বিশেষ একটি অব্যয়ের ব্যবহারের ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছিলেন চিত্ররূপময়। তারই স্বপক্ষে সৈয়দ সাহেব দেখিয়েছেন, চ, জ এবং শ এই উজ্জ্বলতাজ্ঞাপক বর্ণ এবং ন, ম এবং ল—এই কোমলতাবোধক শব্দগুলি জীবনানন্দ কত কৌশলে ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'হিজলের জানলায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা'—এই পংক্তিতে প্রকট অনুপ্রাশ না ঘটিয়েও 'ল' বর্ণটি ছ'বার ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর 'হায় চিল' নামের বিখ্যাত কবিতাটিতে মাত্র দুটি যুক্ত বর্ণ, কান্না আর রাজকন্যা—আমরা আগে কেউ লক্ষ্যই করিনি। আর শব্দ

ব্যবহারে জীবনানন্দ তো একটি নতুন দেশের রাজা। পুরোনো শব্দকে নতুনভাবে ব্যবহার করতে যেমন জানতেন, তেমনিই এ যাবৎ কবিতায় অব্যবহৃত শব্দকেও সরাসরি নিয়েছেন মাঠ ঘাট থেকে। 'হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ধারা মেয়ে তার' কিংবা 'ছিঁড়ে গেছি ফেড়ে গেছি পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে'—এইসব ক্রিয়াপদ রবীন্দ্র-নাথের না হোক, নজরুল-সত্যেন দত্তর চোখের সামনেই তো ছিল!

'তবু' শব্দটি ছিল জীবনানন্দের বাতিক জাতীয়। যেখানে সেখানে এর ব্যবহার। 'তবু' নামেই একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলেন তাতে তবু শব্দের ছড়াছড়ি একেবারে। তবে বিশেষ কয়েকটি শব্দের বারংবার ব্যবহারে অনেক কবির স্টাইলের নিজস্বতাটি গড়ে ওঠে। তা ছাড়াও এই সমালোচকের মতে জীবনানন্দের কোনো প্রতিষ্ঠিত স্থির বিশ্বাস ছিল না—পৃথিবী সম্পর্কিত অভিজ্ঞতায় তাঁর মনের মধ্যে দ্বিধা দ্বৈরথ সব সময়ই প্রকাশ পেত—সেই কারণেই তবু শব্দের এত অনিবার্য ব্যবহার। আমাদের মনে হয়, ইনি ঠিক কারণটিই নির্দেশ করেছেন।

একটি অধ্যায়ে তিনি কবির কয়েকটি কবিতার প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি পংক্তি ধরে চুলচেরা বিচার করেছেন। এই অধ্যায়ের যেমন, তেমনি এই বইয়ের প্রায় সবত্রই ভাষার গুরু গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তাঁর বিশ্লেষণ প্রকৃত কবিরই মতন, একটুও অধ্যাপক সুলভ নয়। প্রথাসম্মত সমালোচকরা এই প্রকৃতিতে আগে কখনো কবিতার আলোচনা করতেন না। আবদুল মান্নান সৈয়দ একটি নতুন পন্থা দেখিয়েছেন এবং তিনি নিশ্চিত কবিতা পাঠকদের ধন্যবাদ-ভাজন হবেন।

'ইংরেজি কবিতা ও জীবনানন্দ' নামের অধ্যায়টিই এই বইতে একমাত্র দুর্বল রচনা। এক-আধ শতাব্দী আগে মৃত কোনো কবির দু'দশ লাইন কবিতা উদ্ধৃত করে তার সঙ্গে পরবর্তীকালের কোনো কবির রচনার মিল খোঁজার কায়দাটা অতি পুরোনো এবং অচল—সৈয়দ সাহেব এটি পরিহার করলেই পারতেন। এতে সমালোচকদের পাণ্ডিত্যের জাহির হলেও হতে পারে—(ছাত্রদের কাছে), কিন্তু কবিতা বিষয়ে কিছু সুরাহা হয় না। 'বস্তুত তাঁর কবিতার যে-সুর যে-ছন্দস্পন্দ তা ইএটস থেকে প্রাপ্ত'—এই বাক্য যার সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়, সে কি বড় কবি? যে নিজের কবিতার সুর ও ছন্দস্পন্দ সবই পেয়েছে অন্য একজনের কাছ থেকে, তাকে "শুদ্ধতম কবি" আখ্যা দিয়ে কোনো বই লেখা যায়? এই অধ্যায়ে সৈয়দ সাহেব এরকম দুএকটি অসাবধানী কথা বলেছেন। কবিতায় প্রভাবের ব্যাপারটা অতিশয় গোলমেলে, এর বিচার প্রায় একটি নতুন কবিতা রচনারই মতন দুরূহ—পংক্তিতে মিল খুঁজতে গেলে অতি সরলীকরণের দোষ এসে যায়! কীটসের 'শ্বেততম বাহু' জীবনানন্দে হয়েছে 'চাল ধোয়া স্নিগ্ধ হাত' এটা কি একটা হাস্যকর উদাহরণ নয়? কোনদিন শুনবো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডিকশনারি থেকে টুকেছেন!

এই বইয়ের ক্রোড়পত্র হিসেবে জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কয়েকটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তাতে এই মূল্যবান বইটির মূল্য অনেক বেশী বেড়েছে। এর মধ্যে 'কবি' নামের দুর্বল কবিতাটি থেকে কয়েকটা লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি, মৃত্যুর কিছু আগে জীবনানন্দের মানসিকতা বুঝবার জন্য :

কবিকে দেখে এলাম
দেখে এলাম কবিকে
আনন্দের কবিতা একাদিক্রমে লিখে চলেছে
তবুও পয়সা রোজগার করার দরকার
আছে তার
কেউ উইল করে কিছু রেখে যায় নি
চাকরি নেই...
'শেয়ার মার্কেটে নামলে কেমন হয়',
জিজ্ঞেস করলে আমাকে...
লাইফ ইনসিওরেন্স এজেন্সি নিলে হয় না...
এক হাজার আরব রজনী ঘুরেও
এক হাজার টাকার কেস সে
দিতে পারবে না ওরিয়েন্টাল কিংবা
হিন্দুস্থানকে...
আনন্দবাজারে একটা কাজ জুটিয়ে দাও
তাকে...
অবাক হয়ে ভাবি : কবি কিছু পয়সা পেল?
পেল না হয়তো
কিন্তু উপন্যাস লিখে পায়
যাক—এসো আমরা তার কবিতা পড়ি
অজস্র আশাপ্রদ কবিতা
টইটুম্বুর জীবনের স্লট মেশিনে তৈরি
এক একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের মতন।

সনাতন পাঠক

হায়, তুমিও পরাধীন

শংকর চক্রবর্তী

জানালার কাছে মুখ তুমি বসেছিলে
পেছনে ছিল সুদীর্ঘ সময় ঘুমন্ত শিশু ও মৃত পরিবারবর্গ
অথচ তুমি ছিলে পারদর্শী
জটিল পশম বোনায়
পিয়ন কখন চলে যায় তুমি খোঁজ রাখো না
কখন হঠাৎ বেলা শেষ হয় খোঁজ রাখো না তুমি
বরং খুব ভোরে স্নান হাতে দাঁত ঘষে আসো
সুপুরি গাছের আড়ালে
এভাবে পবিত্র জলের ফোঁটা টিক টিক করে ওঠে তোমার
[illegible] শরীর
তুমি জানো না এভাবে হাঁ করে বসে থাকা
সারাটা দুপুরে
অর্থহীন পশম বোনা
দুঃখের দুঃখের কাছে নেমে আসে ক্রমশ বিষম উৎসব
এভাবে কখন নিবিড় অরণ্যে ঝড় তুলে নাভির কাছেই থেমে যায়
তোমার পিচ্ছিল শরীর
তুমি জানো না এভাবেই জলের বদলে [illegible] যায়
[illegible] আয়োজন
এবং স্বাধীনতার জন্য তুমি ভুল করেও দাঁড়িয়ো না হঠাৎ
গর্বিত ঝুলবারান্দায়

কেন তুমি

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

কেন তুমি হঠাৎ ক্ষমার শিক্ষা ভুলে গেলে?
এত ক্রোধ
ভালো নয়, নেহাত নির্বোধ, সে-ও জানে।
কেন তুমি কণ্ঠ থেকে যজ্ঞ-উপবীত ছিঁড়ে ফেলে
ভাসালে গঙ্গায়?

যা কিছু তোমার পাশে যায় আসে
সবই তার তোমার রচনা, ইচ্ছাধীন?
তা তো নয়।
একা তুমি কতটুকু পারো?
আছে ধারে-কাছে ঢের অপ্রিয় আত্মীয় প্রতিবেশী
সম্ভবত পরার্থবিদ্বেষী, হীনমন্য, কিন্তু তুমি তাই বলে
ক্রোধী হবে, আরো ক্রোধী হবে?
মানুষ কী অনন্য বিষণ্ণ জীব
কী পরনির্ভর
তুমি পূর্বেও দেখেছ, দেখ নাই?

তবে কেন হঠাৎ ক্ষমার শিক্ষা ভুলে গেলে
কেন তুমি কণ্ঠ থেকে যজ্ঞ-উপবীত ছিঁড়ে ফেলে
ভাসালে গঙ্গায়?

মানবখরায়

সামসুল হক

জাগরে কলঙ্কের ফুল লাগ ভেলকি মানবখরায়
যত্নে যা ফুলের স্বেদ স্বপ্নক্ষেতে স্বেদজলে সমাজবপন
কিশোরীর ভুলভাল কবিতার ভুলছন্দ জেগে থাক তার প্রহরায়
জাগরে কলঙ্কের ফুল পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন
রতনের ব্যবহার পেটে ও হৃদয়ে
মনু বা আদম তবে উপহার পেয়েছিল আমাদের ধার নীলদহে

জাগরে মেধার কেউটে লাগ ভেলকি মানবখরায়
হয়ে যা বিষের ফণা ছায়াতরু তরুতলে হাটুরে জীবন
রাখালেরা পৃথিবীর মহিষের পিঠে চড়ে অমরার মহিষ চরায়
জাগরে মেধার কেউটে পাইলে পাইতে পারে অমূল্য রতন
রতনের ব্যবহার স্বপ্নে ইতিহাসে
গৌতম বুদ্ধই তবে উপহার পেয়েছিল তাহাদের রক্তরাজহাঁসে

শ্মশানছবি

রণজিৎ দাস

শ্মশানবন্ধুরা জানে কতোটা সময় নেবে তোমার শরীরটাকে পুড়ে
ছাই হতে।
'ঘণ্টা তিনেকের বেশী নয়'—তারা বলে, তাদের প্রাচীন অভিজ্ঞতা,
ক্রন্দনধ্বনির থেকে অল্প দূরে গোল হয়ে বসে তারা মদ খায়;
তারা জানে
যে শোককাতর বোন মাতৃহীন তরুণের দুঃখ মুখ ছুঁয়ে আছে
তাকে এই ভস্মভূমি কিছুক্ষণ পরে ঠিক গ্রাস করে নেবে।
তার আগে তুমি—চিরবিদায়ের শিখা দাউদাউ করে জ্বলে
চরাচর জুড়ে তার লেলিহান আক্রমণে কতো দ্রুত পুড়ে যায়
তোমার শরীরজোড়া গৃহস্থালি, গান, মাটি, পুণ্য ভালবাসা
শুধু পড়ে থাকে ছাই, যেন জ্ঞান, যেন শেষ কালো অট্টহাসি; আর
সেই শ্মশানের বুকে নীলমোহরের মতো জেগে থাকে সেই দৃশ্য:
মায়ের মুখাগ্নি করে সন্তানের অকৃতজ্ঞ হাত।

গল্প

শেখর বসু

লোকটা কি যেন বলছিল আর সবাই খুব মন দিয়ে শুনছিল। আমি ঢুকতেই কথা থেমে গেল। প্রত্যেকেই আমাকে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল। টেবিলের কোণের দিকে একটা চেয়ার খালি ছিল।

বসবার পর বেশ, স্কার্ট-পরা একটা মেয়ে এগিয়ে এল। বললাম—কাটলেট। হাত-চারেক দূরে নিচু মেঝেয় খোলা কিচেন। পরপর তিনটে গ্যাসের উনুন। উনুনের সামনে কিছুটা সিমেন্ট বাঁধানো জায়গা। মেয়েটা তার ওপর ছোট একটা কাঠের তক্তা রেখে ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটতে লাগল।

সেই লোকটা কথা শুরু করতেই সবাই আবার খুব মনোযোগী হয়ে উঠল। আমাকে কেউ তেমন দেখছিল না। আমি বেশ আর ঘরের সবকিছু দেখতে লাগলাম।

এখানকার রেস্টুরেন্টগুলো এই রকমই। ঘর সংসার আর রেস্টুরেন্ট একসঙ্গে মিশে আছে। না জানা থাকলে ঢুকতে সাহস পেতাম না। ঢুকতাম না যদি-না বৃষ্টি নামত। এখানকার বৃষ্টিও অদ্ভুত। হঠাৎ-হঠাৎ নামে; তার প্রচণ্ড জোরে দূর পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টি দাঁড়িয়ে না—এই বাঁচোয়া।

আমি যেখানে উঠেছি সেই বাংলো হোটেলটা এখান থেকে মিনিট কুড়ির হাঁটা

পথ। পথে মাথা বাঁচাবার আর কোনো জায়গা নেই। রেস্টুরেন্টের সামনে যদি বৃষ্টি না নামত তাহলে কপালে খুব দুর্ভোগ ছিল।

গরম তেলে কাটলেট ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বেড়ে গেল। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ আর কাটলেট ভাজার শব্দ ছাপিয়ে লোকটার কথা শোনা যাচ্ছিল।

লোকটা সমানে কথা বলে যাচ্ছিল। বোধ হয় গল্প বলছিল। কি গল্প কে জানে—এদের ভাষার একটা বর্ণও বুঝতে পারি না। ঘরের আর সবাই লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে একমনে গল্প শুনছিল। রোগা স্কার্ট-পরা মেয়েটা কাটলেটের প্লেটটা আমার সামনে রেখে প্রায় ছুটে একটা টুল নিয়ে লোকটার পাশে বসে পড়ল। বিচিত্র ভাষায় কি সব জিগেস করল—বোধ হয় গল্পের খেই জেনে নিল।

লোকটার কথা ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কোনো শব্দ ছিল না। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। হাওয়ায় টিনের চাল মাঝে মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে আরামের শীত ঢুকছিল ঘরের ভেতর।

কাটলেটটা চমৎকার ভেজেছে। শুধু একটু নুন কম। মেয়েটা লোকটার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গল্প শুনছিল। লোকটার গলার ওঠা-নামা আর হাত-নাড়া দেখে মনে হল গল্প খুব জমে গেছে। এই অবস্থায় মেয়েটাকে আর ডাকতে পারলাম না। উৎসাহের করে কম নুনের কাটলেটই খেতে শুরু করে দিলাম।

ঘরটা বেশ বড়। একদিকে পাশাপাশি দুটো খাট পাতা। একটা বড় একটা ছোট। ছোট খাটটায় ফিকে-নীল রংয়ের নেটের মশারি খাটানো। মশারির মধ্যে ছিটের জামা পাজামা পরা একটা খুদে বাচ্চা ঘুমাচ্ছিল। অন্য খাটটায় বই খাতাপত্তর ছড়ানো। বই খাতাপত্তরগুলো বোধ হয় এই বাচ্চা দুটোর। লোকটার ডানদিকের বড় চেয়ারটায় বসে হাঁ করে গল্প শুনছিল।

ঘরের মাঝামাঝি দেয়ালের দিকে একটা বড় কাঠের আলমারি। আলমারির মাথায় চারটে মদের বোতল আর খুব কারুকার্য করা আদ্যিকালের একটা হুঁকো।

কিচেনের কোণের দিকে দেয়ালে ঝোলানো একটা ফ্রাইপ্যান আর তিনটে চকচকে চপার। একটা চপারের হাতলে মুর্গি কিংবা অন্য কোনো পাখির পালক লেগে ছিল।

কিসের পালক খুঁটিয়ে দেখার মুহূর্তেই সেই রোগা, স্কার্ট-পরা মেয়েটা উঠে এসে ইঙ্গিতে জিগেস করল—আর কিছু লাগবে? আমি আলমারির মাথার দিকে আঙুল তুলে দেখালাম।

মেয়েটা একটা আস্ত রামের বোতল, সোডা আর গ্লাস টেবিলে সাজিয়ে রেখে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। লোকটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে কথা বলা থামিয়েছিল—মেয়েটা বসতেই আবার শুরু করে দিল।

কথা বলতে বলতে লোকটা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারপর মেঝে থেকে একটা বন্দুক তুলে নিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গি করল। লোকটা আপন মনে কি সব বলে যাচ্ছিল—একটা বর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু যারা শুনছিল তাদের চোখ মুখে উৎকণ্ঠা আর কৌতূহলের চিহ্ন দেখে এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে ঘটনাটা যাই হোক না কেন, খুবই রোমাঞ্চকর। সাধারণ রাইফেল শুটিংয়ের গল্প কেউ এভাবে বলেও না, আর কেউ এ রকম মুখ করে শোনেও না।

গ্লাসে চুমুক দিলাম। বৃষ্টি বোধ হয় একটু কমেছে। তবে বেশ ঝোড়ো হাওয়া। আগের মত শব্দ উঠছিল না। তবে হাওয়া বেশ ধারালো হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে দমকা হাওয়া ঢুকছিল। দমকা হাওয়ায় ঝোলানো লণ্ঠন দুলতে লাগল। ঘরের ছোট ছোট ছায়াগুলো এপাশ থেকে ওপাশে—প্রত্যেকের মুখে—মুখ থেকে কাঁধ বুক।

লোকটার গায়ের রং ফ্যাকাশে-হলুদ। একটু বেঁটেই তবে বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা। ছোট চোখ—থ্যাবড়া নাক। মাথায় খামা ছোট চুল। কপালে একটা লম্বা কাটা দাগ। গায়ে হলুদ রংয়ের হাওয়াই শার্ট। শার্টে বড় বড় দুটো পকেট। দুটো পকেটই ফুলে আছে।

লোকটা বেঁটে বেঁটে আঙুলগুলো নাড়িয়ে গল্প বলে চলেছিল সমানে। ছোট চোখের মণিদুটো জ্বলজ্বল করছিল। কখনো কখনো ছোট চোখ আরও ছোট হয়ে যাচ্ছিল।

লোকটা এবার জলে ঝাঁপ দেবার ভঙ্গি করল। তারপর সাঁতারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন স্পষ্ট হয়ে উঠল। লোকটা নির্ঘাৎ শিকারী। শিকারের গল্প বলছে।

অথচ লোকটার ভাষা আমার কাছে আগের চাইতেও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। একটা শব্দও চেনা নয়। এ রকম শব্দ আর কখনো শুনিনি। কিন্তু লোকটা যে শিকারী আর শিকারের গল্প বলছে এই ধারণাটা আমাকে কেমন পেয়ে বসল।

সারা জীবনে দুবার মোটে জংগলে গিয়েছি। তাও রিজার্ভড্ ফরেস্ট-এ। হাতির পিঠে চড়ে। সঙ্গে গাইড ছিল। দূর থেকে গণ্ডার গণ্ডার দেখেছি আর কয়েকটা হরিণ বাস এই পর্যন্তই। কোনো বিপদে পড়িনি কিংবা সারা জীবন মনে রাখার মত কোনো ঘটনাও দেখিনি। অথচ সেই কয়েকবার জংগল তার ঘন গাছপালা—দুর্ভেদ্য মানুষ সমান ঘাস—নুড়ি ছড়ানো সরু নদী নিয়ে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

গ্লাসে আর একটা চুমুক দিলাম। অসাবধানের চুমুক। একসঙ্গে অনেকটা গলায় চলে গেল। গলা-বুক জ্বালা-জ্বালা করে উঠল। লোকটা সমানে গল্প বলে যাচ্ছিল। গল্প আরও জমে উঠেছে। লোকটার চোখমুখের ভঙ্গি, হাত-নাড়া আর গলার স্বরই তার প্রমাণ।

ওপাশে মোটাসোটা মধ্য-বয়সী ভদ্রমহিলার চোখের পলক পড়ছিল না। উৎকণ্ঠা আর কৌতূহল ফোলা-ফোলা গাল দুটোকে আরও হলুদ করে তুলছিল। কাঁধের একপাশ থেকে লাল স্কার্ফ খসে পড়ল—ভদ্রমহিলা খেয়াল করল না।

লোকটা কি একটা খপ করে ধরার ভঙ্গি করল। অন্য হাতের ভঙ্গিতে বুঝতে পারলাম সেটা তার হাত পেঁচিয়ে ধরেছে।

আমি হঠাৎ লোকটার হাতের মুঠোয় সাপের ফণা আর হাতে পেঁচানো সাপের লেজ দেখতে পেলাম। লোকটা ভয়ংকর

বিপদের মুখোমুখি। একটু অসতর্ক হলেই মৃত্যু। যন্ত্রণায় অবশ হয়ে মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যু। সঙ্গে কেউ নেই যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। চেঁচালে বনো জন্তু ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না।

সাপটা বেশ বড়। এত জোরে জড়িয়ে ধরেছে যে হাতের হাড় যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। আর হাতের মুঠো শিথিল হলেই জংগলের হিংস্র সর্প— এক মুহূর্ত দেরী করবে না।

বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটো, রোগা, স্কার্ট-পরা মেয়েটা আর মোটাসোটা লম্বা-বিনুনি ভদ্রমহিলার মুখে উৎকণ্ঠা ফেটে পড়ছিল। আমি গ্লাস শেষ করে ফেললাম। এবার আর গলা জ্বালা-জ্বালা করল না। শুধু হাতের তালু গরম হয়ে উঠল। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত উত্তেজনা। আমার বারবার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল—তারপর? তারপর?

লোকটা কোমর থেকে ছুরি বার করার ভঙ্গি করল—তারপর ছুরি মারল। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে দেখতে পেলাম—সাপের ফণা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সাপের শরীর, লেজ কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে খসে পড়ল। খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারার শক্ত ভাবটা কেটে গেল। গরম হাতের তালু এখন অনেকটা স্বাভাবিক। বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটো, আর রোগা স্কার্ট-পরা মেয়েটা নড়েচড়ে বসল। মোটাসোটা লম্বা-বিনুনি ভদ্রমহিলা মেঝে থেকে স্কার্ফ তুলে গায়ে জড়িয়ে নিল।

আমি হঠাৎ রামের বোতলটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিলাম। সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। ইশারায় লোকটাকে খেতে বললাম। উত্তরে ও যা বলল তার একটা বর্ণও বুঝতে পারলাম না। তখন আমার মনেই ছিল না। অথচ এই তো একটু আগেই ভাষা না জেনেও লোকটা যা বলছিল আমি কেমন পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। বোধহয় সবার চাইতে ভালই বুঝতে পেরেছিলাম। সবাই শুধু গল্পই শুনছিল, আমি সাপটাকে দেখতেও পাচ্ছিলাম।

সাপটার গায়ের হিম এখনো আমার গায়ে। আমার চোখের সামনেই সাপটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল। এ রকম একটা ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে বেঁচে ফিরে আসার জন্যে লোকটার জন্যে আমার কিছু একটা করা দরকার।

রামের বোতলটা আর একটু ঠেলে দিয়ে আবার ওকে ইশারায় খেতে বললাম। আমার ইশারা এবারে খুব স্পষ্ট আর অর্থময় হয়ে উঠেছিল। লোকটা বোতলটা টেনে নিল। সেই রোগা স্কার্ট-পরা মেয়েটা লোকটাকে একটা গ্লাস এনে দিল।

বৃষ্টি ধরে এসেছিল। আবার শুরু হল। বেশ জোরে। টালির চালে বৃষ্টির শব্দ প্রথম বেড়ে উঠতে লাগল। ঘরের মধ্যে দমকা হাওয়া ঝুলন্ত লণ্ঠনটাকে আবার দুলিয়ে দিল। লণ্ঠনটা দুলতেই নিচের স্থির ছায়াগুলো এদিক-ওদিক ছিটকে গেল। ছিটকে গিয়ে দুলতে লাগল সমানে।

মেঘ ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ফিকে-নীল নেটের মশারির মধ্যে থুথুড়ে বুড়িটা উঠে বসল। উঠে বসে টেবিলের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

লোকটা গ্লাসে গোটা কয়েক চুমুক দিয়ে আবার গল্প শুরু করে দিল।

হঠাৎ লোকটা বাঘের মত মুখ করল। হাত দুটো টেবিলের ওপর এমনভাবে রাখল যেন থাবা। থাবা দুটো একটু একটু করে এগোতে লাগল।

আমি পরিষ্কার বাঘ দেখতে পেলাম। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাঘটা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছিল। একটাও শব্দ উঠছিল না। শুধু ঘাসগুলো আস্তে আস্তে হেলে পড়ছিল। বাঘের মুখটা প্রকাণ্ড। দু চোখে দু টুকরো আগুন। আগুনের টুকরো দুটো শিকারের দিকে তাকিয়েছিল। ওই চোখে চোখ পড়লে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। মাটি থেকে পা ওঠানো ভয়ংকর কঠিন হয়ে পড়ে।

রোগা স্কার্ট-পরা মেয়েটা, বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটো আর লম্বা-বিনুনি মোটাসোটা ভদ্রমহিলার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা চাপ বেঁধে উঠেছিল। যেন এক্ষুনি ফেটে পড়বে।

বাঘটা নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছিল। দু চোখের দু টুকরো আগুনে একবারও কাঁপছিল না। আগুনের টুকরো পলক পড়ছিল না। আর কয়েক মুহূর্ত— তারপরই—

হঠাৎ মাথার ওপর এক ঝাঁক পাখি তীক্ষ্ণ গলায় কিচমিচ করে উঠল। সেই শব্দে একদল হরিণ সন্ত্রস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে লম্বা লাফে গভীর জংগলে মিলিয়ে গেল।

অভিজ্ঞ শিকারীর পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। বাঘ আর লোকটা মুখোমুখি। লোকটার হাতে বন্দুক—ট্রিগারে আঙুল।

বাঘটা মরল না। জখম হয়ে ঘাসের জংগলে অদৃশ্য হল। যে কোনো শিকারীর কাছেই জখম-বাঘ ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বী। দুজনেই দুজনকে শিকারের জন্যে সব সময় ওঁৎ পেতে থাকে। কে জিতবে কিছু বলা যায় না।

লোকটা উত্তেজিত গলায় গল্প বলে চলেছিল। ওর গল্প যে এতক্ষণ ধরে শুনছি কিন্তু কথাগুলো আগের মতই অচেনা থেকে গেল। অথচ লোকটার চোখ, চোয়াল, চিবুক আর হাতের ভাষা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছিল না। শুধু বোঝা নয় দেখতেও পাচ্ছিলাম সবকিছু—খুঁটিনাটি সমেত।

এখন যদি একজন দোভাষী পেতাম আমি প্রমাণ পর্যন্ত দিতে পারতাম। আমি বলতে পারি—সাপটার রং কালো—গায়ে হলুদের ছিট ছিট—আর লম্বায় আড়াই হাত। বলতে পারি, মাথাটা টুকরো হয়ে ঘাসের ওপর পড়বার পরও কয়েক বার লাফিয়ে ছিল। আর বাঘের বুকটা সাদা—গায়ে হলদে রং বেশী। যে কোনো অংকের টাকা আমি বাজি

ধরতে পারি। আমি জানি—আমি জিতবই।

বাঘ আর সাপ দুটোকেই আমি দেখেছি—এই তো দেখলাম। সাপের গায়ের হিম আমার গায়ে, বাঘের শরীরের উৎকট গন্ধ এখনো আমার নাকে লেগে আছে। আমার বর্ণনার সঙ্গে সাঁতাকারের ওই সাপ আর বাঘের বর্ণনা মিলবেই। অথচ লোকটার মুখের কথা আমি একটা বর্ণও বুঝতে পারছি না। ভাষাটা দুর্বোধ্য আর ধাক্কা-দেওয়া। ধাক্কা-দেওয়া শব্দগুলো টেবিলের মাথায় ঝুলন্ত লণ্ঠনের চারপাশে উড়ছিল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল অঝোরে। দমকা হাওয়া আর বিদ্যুতের আলোয় লোকটা আবার মেঝে থেকে বন্দুক কুড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি সব কিছু দেখতে পেলাম। লম্বা লম্বা ঘাস, বুনো গাছ-পালায় ভর্তি আবছা-অন্ধকার জঙ্গল।

লোকটা জখম-বাঘের পায়ের ছাপ ধরে এগোচ্ছিল। ছাপগুলো বড় বড়—নরম মাটিতে চেপে বসেছিল। লতাপাতায় ঠাসা বেঁটে গাছগুলোর সামনে এসে পায়ের দাগগুলো মিলিয়ে গেল। লোকটা বন্দুক তুলে সতর্ক চোখে জঙ্গলের দিকে তাকাল। বাঘটা হয়ত সামনেই কোনো গাছের আড়ালে ওৎ পেতে আছে। লোকটা আর একটু এগোলেই......

কিন্তু সামনে নয়, পাশের জঙ্গলে বাঘটাকে দেখা গেল। লোকটার আগে বোধ হয় আমিই দেখলাম। গাছের পাতার ফাঁকে দু টুকরো আগুন। লোকটার দিকে স্থির হয়েছিল।

আমার বুকের ওপর শরীরের সমস্ত রক্ত আছড়ে পড়ল। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না।

লোকটা এর মধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। দু টুকরো আগুন লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড জোরে বন্দুকের শব্দ সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে দিল। গাছগুলোর মাথা থেকে জঙ্গলের আকাশে ছিটকে গেল হাজার হাজার পাখি।

বাঘটা মাটিতে পড়ে কয়েকবার কেঁপেই স্থির হয়ে গেল। গুলিটা ঠিক মাথায় লেগেছিল।

লোকটা গল্পের শেষ গ্লাসের বাকিটা এক চুমুকে শেষ করল। ঘরের মধ্যে এখন বেশ স্বস্তি ফিরে এসেছে। বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটো নড়ে চড়ে বসল। মোটাসোটা লম্বা-বিনুনি ভদ্রমহিলা মট মট করে আঙুল ফোটাল। রোগা স্কার্ট-পরা মেয়েটা হাসিমুখে কি যেন বলতে বলতে স্কার্টের সেফটিপিন ঠিক করে নিল।

আমার উৎকণ্ঠা আর বুকের অস্বস্তিও কেটে গিয়েছিল। শরীরে রক্ত চলাচল এখন স্বাভাবিক। হাতের তলার অস্বাভাবিক গরম ভাবটাও নেই। মুখের ভেতরটা শুকনো আর জিবটা খসখসে হয়ে উঠেছিল—এখন সব ঠিক।

গল্পের শেষের দিকটা আমার চোখের সামনে ভাসছিল। লোকটাকে এর মধ্যেই কেমন ভালবেসে ফেলেছি—ওর বীরত্বে আমি রীতিমতো গর্ববোধ করছিলাম। ওকে কিছু একটা বলা দরকার—যাকে বলে অভিনন্দন জানানো। কিন্তু কি করে জানাবো? ও তো আমার ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারবে না। তাহলে?

বৃষ্টি বোধ হয় থেমে গেছে। টিনের চালে আর শব্দ উঠছিল না। এবার আমি উঠব। কিন্তু যে লোকটা এত চমৎকার একটা গল্প শোনাল—তাকে কিছু না বলে উঠে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বুঝবে না তাহলেও বলব—তোমার গল্প আমার দারুণ লেগেছে। এ রকম গল্প আমি জীবনে শুনিনি।

শুনিনি না দেখিনি! দেখিনি বলাই বোধ হয় ঠিক। এক বর্ণ ভাষা বুঝি না কিন্তু গল্পের ঘটনাগুলো আমার চোখের সামনে কি অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছিল।

উঠে দাঁড়ালাম। সবাই আমাকে দেখতে লাগল। সবার চোখের সামনে আমি লোকটার কাছে এগিয়ে গেলাম। তারপর ওর হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, চলি। আপনার গল্প আমার চিরকাল মনে থাকবে। উত্তরে লোকটা আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। যা বলল তার একটা বর্ণও বুঝতে পারলাম না।

ভারতবিদ্যাবিদ্ স্যার চার্লস উইলকিন্স

গোরাচাঁদ মিত্র

বিদেশীয় ইংরেজদের মধ্যে ভারতবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই বহু নিন্দিত ব্যক্তিত্ব প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি স্মরণীয় সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেলতে সহায়তা করেছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হেস্টিংস সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতবর্ষ শাসিত হবে তাঁদের নিজস্ব প্রাচীন রীতিনীতি অনুযায়ী। হেস্টিংসের নির্দেশে এদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ অনূদিত হল ফারসী ভাষায়। ফারসী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী নাথানিয়েল ব্রেসী হালহেড। [illegible]-এ কোড অব জেন্টুস। বইটি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দেই লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। শুরু হল নতুন অধ্যায়। সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা শেখার আবশ্যকতা ইতিমধ্যে হালহেড সাহেবকে উদ্বুদ্ধ করল বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায়। রচিত হল এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ। বইটি সরকারীভাবে মুদ্রণের জন্য হালহেড সাহেব হেস্টিংসের কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু তখনও বাংলা টাইপের সৃষ্টি হয়নি। বইটির বাংলা দৃষ্টান্ত মুদ্রণকালে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিল দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যা। উইলিয়াম বোল্টস নামে এক ইংরেজ লণ্ডনে বিশিষ্ট কারিগরদের সহায়তায় বাংলা অক্ষর প্রস্তুতের কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুরোধে এগিয়ে এলেন এক দুঃসাহসী যুবক—উইলকিন্স।

কোম্পানী শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অনেক ইংরেজ তরুণ সামান্য বেতনে কোম্পানীর চাকরী নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসতেন। বিভিন্ন কারণে স্বদেশে স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন তাদের কাছে ছিল দুরাশামাত্র। নতুন দেশে এসে সাহসে বুক বেঁধে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাই অনেকেই মনে মনে পোষণ করতেন। চার্লস উইলকিন্সও তাঁর তরুণ বয়সে এই প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সামান্য রাইটারের চাকরী নিয়ে তিনি এদেশে চলে এলেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র কুড়ি। তাঁর জন্ম ইংলাণ্ডের সমারসেট শায়ার জেলার অন্তর্গত ফ্রুম-এ। জন্ম সাল ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দ, কারও মতে ১৭৫০।

চার্লসের মা ছিলেন বিখ্যাত শিল্পীকার রবার্ট বেটম্যান রের নিকটসম্পর্কীয়া। বাবা ওয়াল্টার উইলকিন্সের আর্থিক অনটনের দরুণ চার্লসের পড়াশুনো বেশীদূর এগোতে পারেনি। এদেশে এসে প্রথম কিছু দিন চাকরী করলেন নগর কলকাতায়। দু বছর পর মালদা জেলায় বদলী হন। সেখানে তিনি কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষের সহকারী নিযুক্ত হন। ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে ইতিমধ্যে তিনি বাংলা ও ফারসী ভাষা শিখতে শুরু করেন। এই সূত্র ধরে পরিচয় হল হালহেড সাহেবের সঙ্গে। ক্ষোদাই কার্যে তাঁর আগ্রহ হালহেড সাহেবের অগোচরে রইলো না। বাংলা টাইপ সৃষ্টির গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হল।

নিজের হাতে ছেনি-হাতুড়ি ধরে অক্ষর তৈরী শুরু করলেন উইলকিন্স। পঞ্চানন কর্মকার নামে একজন বাঙ্গালীকে সহকারী হিসাবে পেলেন। অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একপ্রস্থ বাংলা হরফ প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন তিনি। এই হরফের সাহায্যে হুগলী জেলার এণ্ড্রুজ ছাপাখানা থেকে উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে
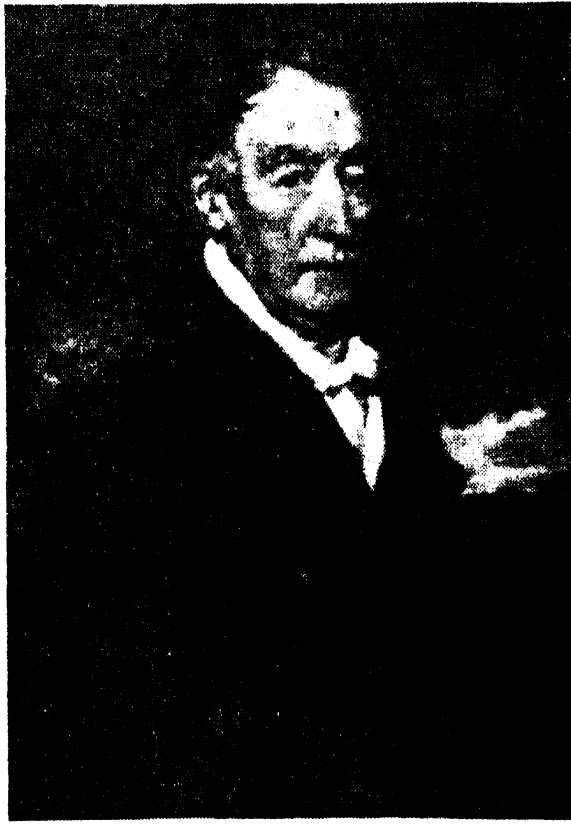
ভারতবিদ্যাবিদ্ স্যার চার্লস উইলকিন্স

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশিত হল। উইলকিন্সের অভূতপূর্ব কারিগরী দক্ষতায় ভারতবর্ষে বাংলা অক্ষর সম্বলিত বই প্রকাশিত হল। উইলকিন্সের কৃতিত্ব সম্বন্ধে হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখলেন — 'কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে কর্মরত মিঃ উইলকিন্স নামীয় এক ব্যক্তিকে একপ্রস্থ বাংলা টাইপ প্রস্তুত করার জন্য গভর্নর জেনারেলের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। তিনি এই কাজে সফলতা লাভ করেন এবং তাঁর সাফল্য আমাদের প্রত্যাশাকেও অতিক্রম করেছে। য়ুরোপীয় আর্টিস্টদের সাহচর্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই দেশে উইলকিন্স নিজেই ধাতু-বিদ্যাবিশারদ, খোদক, ঢালাইকর এবং মুদ্রকের ভূমিকা পালন করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁকে শারীরিক পরিশ্রমও নিয়োগ করতে হয়েছে। একটি কঠিন শিল্প-বিষয়ক সৃষ্টির সূত্রপাতে যে সকল প্রতিরোধকারী বাধা অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়, উইলকিন্স য়ুরোপে অজ্ঞাত অসামান্য দক্ষতায় একক্রমে সেই সকল বাধা জয় করেছেন।' (অনুবাদ লেখক কৃত) শুধুমাত্র বাংলা টাইপ সৃষ্টিতেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ রইল না। ফারসী, দেবনাগরী, মারাঠী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় তিনি অক্ষর তৈরী শুরু করলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী জেনারেল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীকে লেখা তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী হজসন সাহেবের এক চিঠি থেকে জানতে পারি, গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। হেস্টিংসের এই স্বপ্ন তখন সফল হয়নি। অবশ্য পরবর্তীকালে কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে উইলকিন্সই ছিলেন তার সর্বেসর্বা। কোম্পানীর সমস্ত রকম দলিল-দস্তাবেজ তাঁর রচিত ফারসী অক্ষরেই ছাপা হত। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ইতিমধ্যে মুদ্রণশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। তাঞ্জোরের রাজা সরফোজী ভোঁশলে তাঁর শিক্ষাগুরু ও উপদেষ্টা জনৈক ড্যানিশ ধর্মযাজক ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডেরিক সোয়ার্টজ-এর অনুপ্রেরণায় তাঞ্জোরে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করলেন। এই প্রেসে ব্যবহৃত সকল দেবনাগরী অক্ষরের নির্মাণকর্তা ছিলেন চার্লস উইলকিন্স। এখান থেকে প্রকাশিত তাঁর খোদিত দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত কয়েকটি বইয়ের নাম হল—যুদ্ধকাণ্ড (১৮০৯), শিশুপাল বধ (১৮১২), মুক্তাবলী (?) বালবোধ-মুক্তাবলী (১৮০৬?) ইত্যাদি। সম্পূর্ণ মারাঠী ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বই 'পঞ্চোপাখ্যান'-এরও টাইপ উইলকিন্সের তৈরী। বইটি ১৮২২ সালে বোম্বাইয়ের কুরিয়র প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। তখন অবশ্য তিনি স্বদেশে ফিরে গেছেন। মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তক যথাক্রমে বিদুর-নীতি ও বত্রিশ সিংহাসন তাঁর সৃষ্ট হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসে উইলকিন্স একটি অবিস্মরণীয় নাম। কিন্তু অনেকের ভিড়ে তিনি আজ হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির গভীরে।

মুদ্রণযোগ্য অক্ষর তৈরীর সাথে সাথে ভারতীয় সভ্যতার অপার্থিব রত্নসম্ভারের দিকে মুখ ফেরালেন উইলকিন্স। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্য-বিদ্যা চর্চার ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ স্যার উইলিয়াম জোন্স ভারতবর্ষে এলেন। সংস্কৃত ভাষায় উইলকিন্সের দক্ষতা তাঁকে আশ্চর্যান্বিত করল। তাঁর সহায়তায় জোন্স সংস্কৃত শিখতে শুরু করলেন। দু বছরের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা তাঁর রপ্ত হল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী জোন্স সাহেবের উদ্যোগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল প্রাচ্য-বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটী। সোসাইটী স্থাপনে তাঁকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন চার্লস উইলকিন্স (সেণ্টিনারী রিভিউ অব দি এশিয়াটিক সোসাইটী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ-২)। সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই উইলকিন্স ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অপরিমেয় জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ করলেন। কোম্পানীর খরচে এই অনূদিত গ্রন্থ মুদ্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের কাছে পাণ্ডুলিপির এক কপি পেশ করলেন। হেস্টিংস সরকারী কাজকর্মের শত ব্যস্ততার মধ্যেও সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করার অবসর খুঁজে পেলেন। এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বোর্ড অব ডিরেক্টার্স-এর চেয়ারম্যান ন্যাথানিয়েল স্মিথকে এক দীর্ঘ পত্রে এই অনুবাদ গ্রন্থ কোম্পানীর ব্যয়ে মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য অনুরোধ জানালেন। প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি হেস্টিংসের এই উদার পৃষ্ঠপোষকনীতি আমাদের বিস্মিত করে। হেস্টিংসের সুপারিশ মঞ্জুর হল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হল 'দি ভগবদ্গীতা'। দাম এক সোনার মোহর। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় এই অনূদিত গীতার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল উইলকিন্সকে লেখা ডিরেক্টর সভার চেয়ারম্যান ন্যাথানিয়েল স্মিথের একটি চিঠি। এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তাই সম্পূর্ণ চিঠিটি নীচে উদ্ধৃত করলাম।

Sir,

The Court of Directors, at the recommendation of the late Governor-General, published the ancient Oriental treatise the Geeta, which you had translated from the Sankskreet Language, as an inducement to you to pursue your labours and furnish the world with remainder.

The profits from the sale are to be yours and the copy-right reserved to you.

One hundred copies, in two boxes, addressed to you, go by the E. Talbot, and fifty more in another box, to Fort St. George, addressed to Mr. Porcher, at the recommendation of Major Manle, to be disposed of on your account. More, will be sent to you by the ships of the season. The perusal has afforded me much satisfaction, and the translation will do you great credit. This I can assure you not from my opinion alone, but from much superior judgments. There can be no doubt of its meeting with the approbation of the literary world and of your receiving from the public the tribute due to your well-earned reputation.

I sincerely wish your health and inclination to pursue your labours, and bring from their obscurity some more of those curious and valuable works which you have given a specimen of in the excellent translation,

East India House, Nath. Smith.
24th April, 1785.

কৃতজ্ঞ উইলকিন্স তাঁর গীতাগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসকে। এই গ্রন্থের ভূমিকাটিও তিনি লিখেছিলেন। ভূমিকায় হেস্টিংস লিখছেন—'গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা উহা বহু শতাব্দী যাবৎ মনুষ্যজাতির এক বৃহদংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে তাহার দ্বারা গীতা সাহিত্য জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। উহার সাহিত্য গুণাবলী জগতে অননুকরণীয়। গীতাপাঠে শুধু ইংরেজ কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতাধর্মের অনুশীলনে মানবজীবন শান্তিধামে পরিণত হইবে' (উদ্বোধন প্রকাশিত গীতা, পৃঃ ১৫-১৬)। য়ুরোপীয় ভাষায় গীতার সর্বপ্রথম অনুবাদকের দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হলেন উইলকিন্স। ন্যাথানিয়েল স্মিথের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হল না। বিপুল সমাদর পেল 'দি ভগবদ্গীতা'। ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অসংখ্য কপি অনূদিত হল। বিখ্যাত প্রাচ্য-বিদ্যা পণ্ডিত স্যার গ্রেভস চ্যাম্নি হটনের ভাষায়—'১৫৬ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি ইংলণ্ড ও য়ুরোপের বিদ্বৎসমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এর আবির্ভাবকে সকলেই উত্তরকালে স্যার উইলিয়াম জোন্স, মিঃ কোলব্রুক, অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি সুখ্যাত প্রাচ্য পণ্ডিতগণের সৃষ্টির উজ্জ্বল আলোকচ্ছটার শুভ সূচনারূপে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। এশীয় ও য়ুরোপীয় ভাষাসমূহের শব্দতত্ত্ব বিষয়ে গ্রীক ও হিব্রু পণ্ডিতগণের বহু পণ্ডিতাপসৃত অন্ধকারকে দূরীভূত করেছিল এই দীপ্যমান আলোকরশ্মি' (এশিয়া-

টিক জার্নাল, ১৮৩৬, জুলাই অনুবাদ লেখক কৃত)।

উইলকিন্সের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ—কয়েকটি প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার। এশিয়াটিক সোসাইটী তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুঙ্গের জেলার ধ্বংসাবশেষ থেকে খৃষ্টপূর্ব তেইশ বছর আগের একটি তাম্রলিপি উদ্ধার করা সম্ভব হল। স্বভাবতই ভারতীয় ভাষাচার্য উইলকিন্সের ডাক পড়ল। এই লিপির পাঠোদ্ধারে তিনি সক্ষম হলেন। এটি ছিল পালবংশের প্রথম রাজা বিগ্রহ পালদেবের একটি দানপত্র। পরবর্তিকালে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকার ১ম খণ্ডে (১৭৮৮ খৃীঃ) এই লিপির অনুবাদ দীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশিত হয় (পৃঃ ১২৩-১৩০)। কিছু দিনের মধ্যেই বুদ্দল শহরে (দিনাজপুরে) প্রাপ্ত আর একটি প্রস্তরলিপিরও তিনি পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন। এটিরও আলোচনা এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ লিপিটির উদ্ধারকর্তা ছিলেন উইলকিন্স স্বয়ং। হর-গৌরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট্ট মন্দিরের কাছে একটি স্মৃতি-সৌধের উপর এই লিপি ক্ষোদিত করা ছিল। ২৮টি ছন্দোময় স্তবক সম্বলিত লিপিটি ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এর ক্ষোদাইকার্য সম্পাদন করেছিলেন 'বিষ্ণুভদ্র' নামে এক শিল্পী। এটিও পালদেব বংশের। এ ছাড়া তিনি বিন্ধাপর্বতে প্রাপ্ত দুটি এবং বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই চারটি প্রাচীন লিপির আলোচনা ছাড়া তাঁর লেখা আর একটি আলোচনা আমরা এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় দেখতে পাই। শিরোনাম —অন দি শিখস অ্যাণ্ড দেয়ার কলেজ'। পাটনার শিখ কলেজ পরিদর্শন করে এটি লেখা। উইলকিন্সের পূর্বে আধুনিক ভারতবর্ষে প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে কেউই নিজেকে নিয়োজিত করেননি। তাই তাঁকে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার জনক বলা যায়। এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় স্যার উইলিয়াম জোন্স এ বিষয় উইলকিন্সের পারদর্শীতা সম্বন্ধে লিখেছেন—

"No man has greater respect than myself for the talents of Mr. Wilkins who, by deciphering and explaining the old Sanskrit Inscription lately found in these provinces, has performed more than any other European had learning enough to accomplish, or than any Asiatick had industry enough even to undertake."

ইতিমধ্যে দীর্ঘ ষোলো বছর কেটে গেছে এদেশে এসেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। এদেশে এসেছিলেন সামান্য কেরানীর চাকরি নিয়ে। জীবনে প্রতিষ্ঠাও এ সঙ্গে। এতগুলি বছর নিজেকে একাত্মভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এদেশের জল-বায়ু-ভাষার সঙ্গে। এবার ঘরে ফেরার পালা।

A

GRAMMAR

OF THE

SANSKRĬTA LANGUAGE

BY

CHARLES WILKINS, LL.D. F.R.S.

अयुक्तं यदिह प्रोक्तं प्रमादेन भ्रमेण वा ।
[illegible] ॥

LONDON:

PRINTED FOR THE AUTHOR,
BY W. BULMER AND CO. CLEVELAND-ROW, ST. JAMES'S;
AND SOLD BY BLACK, PARRY, AND KINGSBURY, BOOKSELLERS TO THE
HONOURABLE THE EAST INDIA COMPANY, LEADENHALL-STREET.

1808.

চার্লস উইলকিন্স রচিত ও নিজের তৈরি টাইপে মুদ্রিত ইংরাজীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ পুস্তকের টাইটেল পৃষ্ঠা

১৭৮৬ খৃীঃ স্বদেশে ফিরে গেলেন উইলকিন্স। তাঁর প্রথম অস্থায়ী আবাসস্থল হল বাথ নগরী। কিন্তু ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধন ছিন্ন হল না। অবসর সময়ে বিষ্ণুশর্মা প্রণীত 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ শুরু করলেন। ১৭৮৭ খৃীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর বাথ থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। অবশ্য এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে কীর্তিটি য়ুরোপীয় ভাষায় হিতোপদেশ অনুদিত হয়েছিল—প্রায় সবগুলিতেই বহু পাঠান্তর লক্ষিত হয়। কিন্তু উইলকিন্সের গ্রন্থ মূল বইয়ের হুবহু অনুবাদ। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৪; শেষ ৪৪ পৃষ্ঠা হিতোপদেশে উল্লিখিত প্রত্যেকটি অপরিচিত শব্দের অর্থ। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাথানিয়েল স্মিথকে—'দি ভগবদ্গীতা' প্রকাশের নেপথ্যে হেস্টিংসের পরেই যাঁর নাম উল্লেখ্য। হিতোপদেশের পর উইলকিন্স মহাভারতের শকুন্তলা আখ্যান অংশ অনুবাদ করেন। প্রকাশকাল ১৭৯৩ খৃীষ্টাব্দ।

এই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের একটি পাবলিক লেটারের (২৫শে মে, ১৭৯৪) প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এই পাবলিক লেটারে ডিরেক্টর-সভা বললেন—'গত কয়েক বৎসর যাবৎ কোম্পানীর কর্মচারিগণ বিশেষ করে বাংলাদেশে কর্মরত যাঁরা, তাঁদের মধ্যে প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি। এবং এই সকল দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির অনেকগুলিই এদেশে আনা হয়েছে। কালের হস্তক্ষেপ এবং বিদেশে স্থানান্তরকরণের ফলে এই পাণ্ডুলিপিগুলি নষ্ট হতে থাকবে এবং ইংল্যাণ্ডকে সমৃদ্ধশালী করার পরিবর্তে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানের সাহিত্য-সংগ্রহ দুর্বল হয়ে পড়বে। এই সাংস্কৃতিক ক্ষতি রোধ করার মানসে প্রাচ্যবিদ্যার জন্য এদেশে একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করা প্রয়োজন।......... প্রস্তাবিত

সংগ্রহশালার জন্য ইন্ডিয়া হাউস উপযুক্ত স্থান বলে আমরা মনে করি' (অনুবাদ লেখক কৃত)। এই রকম একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন উইলকিন্স। প্রস্তাবিত সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক পদের জন্য তিনি আবেদন জানালেন। ডিরেক্টর-সভা তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ সংগ্রহশালার স্কেচ চেয়ে পাঠালেন। উইলকিন্স তাঁর পরিকল্পনায় সংগ্রশালাকে চারভাগে ভাগ করতে চাইলেন—(১) গ্রন্থাগার, (২) প্রকৃতিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী, (৩) শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী, (৪) উপরোক্ত শ্রেণী বহির্ভূত দ্রব্যের প্রদর্শনী। স্মারকলিপিতে তিনি আরও লিখলেন—'এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হলে প্রাচ্য-বিদ্যা প্রেমী মানুষের কাছে তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হবে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরূপ একটি সোসাইটী যদি ডিরেক্টর সভার আনুকূল্যে এখানে স্থাপিত হয় ও তাঁদের অনুমতিক্রমে যদি এই সোসাইটীর সভা প্রস্তাবিত লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং সভ্যগণ যদি তাঁদের গবেষণামূলক কর্মে এই সংগ্রহশালা ব্যবহারের সুযোগ পান, তাহলে তা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে' (অনুবাদ লেখক কৃত)। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠার বীজও এই পরিকল্পনায় লুকিয়ে ছিল। ডিরেক্টর-সভা কিন্তু দীর্ঘদিন এ চিঠির উত্তর দিলেন না। পুরোনো বন্ধু হেস্টিংসের মারকত উইলকিন্স আবার আবেদন জানালেন। এবারও সাড়া পাওয়া গেল না। এর কারণ বোর্ড সভাপতি ডান্ডাসের বিরোধিতা। ১৮০১ সালে উইলকিন্স আবার আবেদন জানালে তাঁর আবেদন মঞ্জুর হল। ডান্ডার্স ততদিনে সভাপতির পদ ত্যাগ করেছেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী উইলকিন্স বাৎসরিক ২০০ পাউন্ড বেতনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন। ঐদিনই লাইব্রেরীর গোড়াপত্তন হল। তিল তিল করে তিনি গড়ে তুলতে লাগলেন এই গ্রন্থাগার। তাঁর অধীনে কর্মী নিয়োগ শুরু হল। মহীরুহের আকার ধারণ করলো এই লাইব্রেরী। বর্তমানে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ভারতবর্ষীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এবং এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল সেই ভারতহিতৈষী পুরুষ উইলকিন্সের উৎসাহে। আমৃত্যু তিনি এই লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সিভিলিয়ানদের ভারতীয় বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হল হেলবেরী কলেজ। উইলকিন্স এই কলেজের প্রাচ্য-বিদ্যা পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হন। কলেজের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষা দেওয়া—বিশেষতঃ সংস্কৃত। কলেজ পরিদর্শকরূপে উইলকিন্স ইংরেজী ভাষায় রচিত একটি সংস্কৃত ব্যাকরণের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করলেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রচনা করলেন — 'এ গ্রামার অব সংস্কৃত ল্যাংগুয়েজ'। 'ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই অবশ্য তিনি এই ব্যাকরণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর এই মহৎ সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকায় এ বিষয়ে তিনি লিখছেন—'১৭৯৫ সালের শুরু। আমি তখন গ্রামে থাকি—হাতে প্রচুর অবসর। এই সময় আমি আমার লেখাগুলো সাজাতে আরম্ভ করি এবং প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করতে থাকি। আমি নিজের হাতে ইস্পাত ক্ষোদাই করে অক্ষর তৈরী করলাম। ম্যাট্রিক্স তৈরী করলাম। এবং এ থেকে এক-প্রস্থ দেবনাগরী হরফও প্রস্তুত করে ফেলি। মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পল্লীগ্রামের মিস্ত্রীদের সহায়তায় আমি ইতিমধ্যে অতি দ্রুত প্রস্তুত করলাম। ঐ বছর দোসরা মে আমি ষোলো পৃষ্ঠার প্রুফও রচনা করি।...সেদিন দুপুর দুটো পর্যন্ত সমস্ত কাজই আমার প্রত্যাশামত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য! যখন দেখলাম বাড়িতে আগুন লেগেছে। আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল যে, তা নির্বাপিত করা অসম্ভব ছিল—সমগ্র বাড়িটি আগুনে পুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সুখের বিষয় এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার মধ্যে আমি আমার সমস্ত বই, পাণ্ডুলিপি এবং অধিকাংশ ম্যাট্রিক্স ও পাঞ্চ আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলাম। কিন্তু টাইপগুলি লনের চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার দরুণ হয় সেগুলি হারিয়ে গেল নতুবা আর ব্যবহারোপযোগী রইল না। সাধারণত একটি দুর্ঘটনার পর যেমন আরেকটি দুর্ঘটনা এসে উপস্থিত হয়, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। বিভিন্ন প্রতিকূল ঘটনা, যার বিবরণ দেওয়া অপ্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি (এই দুর্ঘটনার পর স্ত্রীর সঙ্গে উইলকিন্সের বিবাহবিচ্ছেদ হয়) আমার অসমাপ্ত কাজ নতুন করে শুরু করতে বাধা সৃষ্টি করল। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে ডিরেক্টার-সভার বিজ্ঞনীতির ফলস্বরূপ হার্টফোর্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা আমার মন পরিবর্তনে সাহায্য করল' (অনুবাদ লেখক কৃত)। উইলকিন্স আবার ম্যাট্রিক্স থেকে অক্ষর তৈরী করলেন। নিজের হাতে গড়া অক্ষরে ১৮০৮ সালে ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হল। বইটি উৎসর্গ করলেন ডিরেক্টর-সভাকে, অনুপ্রেরণ দাতা হিসেবে। এ বইটি ১১টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং চৌদ্দ পৃষ্ঠার ভূমিকা সমেত মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৬২। ইতিপূর্বে ১৮০৫ সালে কোলব্রুক সাহেবের সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হলেও, উইলকিন্সের ব্যাকরণ অধিক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। এই ব্যাকরণ রচনায় তিনি প্রধানত ছয়টি বই অনুসরণ করেছিলেন—অনুভূতি-স্বরূপাচার্যের সরস্বতী-প্রক্রিয়া, বোপদেব রচিত মুগ্ধবোধ, পুরুষোত্তমের রত্নমালা, পাণিনির সূত্র, ভট্টজী দিক্ষীতের সিদ্ধান্ত কৌমুদী ও রামচন্দ্র শর্মার সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা। ১৮১৫ সালে উইলকিন্স 'র‍্যাডিকেলস অব সংস্কৃত ল্যাংগুয়েজ' নামে আর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

'হিতোপদেশ' প্রকাশের পর থেকেই উইলকিন্সের অগাধ পাণ্ডিত্য দেশে বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করল। ১৭৮৮ সালে তিনি রয়েল সোসাইটীর সদস্য নির্বাচিত হলেন। ১৮০৫ সালের ২৬শে জুন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত 'ডক্টর অব সিভিল ল' উপাধিতে ভূষিত করলেন। ১৮২৫ সালে 'রয়াল সোসাইটী ফর লিটারেচার' তাঁকে বিশেষ পদকে ভূষিত করলেন। পদকের উপর ক্ষোদাই করা ছিল—'Carolo Wilkins Literaturae Sanscritae Principi'. ১৮৩৩ সালে এল অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। আর্ল অব মনস্টার অনারেবল সি ডব্লিউ, উইলিয়ামস-উয়েন-এর প্রস্তাবে রাজা চতুর্থ জর্জ চার্লস উইলকিন্সকে স্যার উপাধি প্রদান করলেন।

১৮৩৬ সালের ১৩ই মে সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জায় উইলকিন্স পরলোকগমন করেন। শিক্ষার প্রথম সোপান বর্ণমালা পরিচয় পর্ব থেকে শুরু করে সাহিত্য রস সম্ভোগ তৃপ্ত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকার মনে কখনও কি এই প্রশ্ন জেগেছে—কে সেই পুরুষ যাঁর নিরলস সাধনার ফলস্বরূপ আমরা বিভিন্ন ভাষার শব্দ মুদ্রিত আকারে দেখতে পাচ্ছি? কার প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের জ্ঞান বৈচিত্র্যকে এক নতুন আধারে আরও দ্রুত প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি? ভারতবিদ্যাবিদরূপে পরিচিত হয়েও স্যার চার্লস উইলকিন্স ভারতবাসীর কাছ থেকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাননি। ত্রৈমাসিক ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত 'অন দি এফেক্ট অব দি নেটিভ প্রেস ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি—"The ardour and perseverence with which he prosecuted his undertaking amidst much discouragement, entitle him to the best thanks of India, and future ages when they recur to the interesting period which ushered in the dawn of imrpovement, will turn to him a reverential eye, and recognise in him one of those superior beings who by the benefits they have conferred on their species, have obtained a name which the progress of time and development of the energy they have put into motion, will adorn with increasing lustre." (1820, September, Page 133-34).

বনস্পতির বৈঠক

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ২৯ ॥

ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রদ করবার জন্য গান্ধীজী প্রচুর চেষ্ট-চরিত্র ও আবেদন-নিবেদন করেছিলেন। তাঁর রাজনীতিক নীতিধর্ম অহিংসা, কিন্তু বিপ্লবীরা কোনদিনই তাঁর অপ্রিয় ছিল না। তারা হয়ত অহিংসাবাদের বিরোধী, কিন্তু দেশের শত্রু নয়।

সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এসব নীতি-বিশ্লেষণ ছিল না। তাঁর কথা সোজা। যে দুষ্কৃত-কারী স্রেফ গায়ের জোরে আমাদের ওপর চেপে বসেছে সেই 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী,' সুতরাং তার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করা দরকার। যদি ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি হয়, তাহলে মনে রেখো, লক্ষ লক্ষ ভগৎ সিং মাথা তুলবে আমাদের দেশে এবং প্রতিটি ইংরেজকে এর উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে!

সুভাষবাবুর চোখ দুটো চশমার ভিতর দিয়েও দেখা যাচ্ছে টসটসে রাঙা। কী সুন্দর মুখশ্রী, বলবান স্বাস্থ্যের উপর ঝলমল করছে তারুণ্য! উনি চমৎকার হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন গ্যাঁড়াতলার ময়দানে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে। ওই ময়দানটা ছিল একটু উঁচু, ওর চারদিকে ছিল অবাঙালী মুসলমানদের খোলা-খাপরার বস্তি। ও-অঞ্চলে রাতের দিকে ভয়ে কেউ হাঁটাচলা করত না। পরে কবে যেন ওই উঁচু মাঠটার চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ওর নামকরণ করল 'মহম্মদ আলি পার্ক'। গান্ধীজীর আমলে অনেকগুলো মহম্মদ আলির মধ্যে এই মহম্মদ আলি ছিলেন প্রধান। ওঁর সহোদর ভাইয়ের নাম ছিল সৌকত আলি। দুজনেই মোটা, দুজনেরই মস্ত ভুঁড়ি এবং দুজনেরই ঘাড়ে-গর্দানে এক। ওঁদের সঙ্গে শৌকত গান্ধীজীর ভাব হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের কালে। ওঁরা দুজন মধ্যপ্রাচ্যের কোন্ খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীজীর নাম জড়িয়ে রেখেছিলেন, এবং এই সূত্র ধরেই বুঝি কিছুকাল পরে ওঁরা দুই ভাই গান্ধীজীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন কিনা সেটা ইতিহাসই জানে। তবে তাঁর বড় ছেলে হীরালাল একদা কলমা পড়েন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন এবং 'আবদুল্লা' গান্ধী নামে পরিচিত হন।

শোনা যায়, এই ধর্মান্তরিত হবার জন্য পুরস্কারস্বরূপ হীরালালজী হাজার পঞ্চাশেক টাকা 'ইনাম' গ্রহণ করেন। আবদুল্লা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় সুধাদার বন্ধুত্ব ছিল। হীরালাল কলকাতার এক বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বাঙলায় কথা বলতেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল উচ্ছৃঙ্খল, তাই বোধ করি তাঁর ব্যবসার গণেশ উলটিয়ে যায়।

তখন বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাঙলায়। বাঙলা দেশ মনে-প্রাণে অহিংসা-বাদকে গ্রহণ করেনি, বোধ হয় করবেও না। বাঙালী একটুখানি রক্তের ভক্ত। কালীঘাটে পাঁঠা বলি দিয়ে তার রক্তের টিপ কপালে তুলে নেয় বাঙালী। মাথায় সিঁদুর, কপালে রাঙা টিপ, ঠোঁটে রাঙা পানের রস, পরণে রঙাপাড় শাড়ি, হাতের রাঙা শাঁখা, পায়ে আলতা—এই হ'ল বাঙালী মেয়ে! এ মেয়ে সর্বাপেক্ষা উৎপীড়িতা ও নির্যাতিতা, সর্বাপেক্ষা কোমলা, দুর্বলা, অবলা; এ মেয়ে রোগে দুঃখ-দারিদ্র্যে অভাব-অনটনে বিশীর্ণা—কিন্তু এই মেয়েরই জঠরে জন্মায় দিগ্বিজয়ী বড় বড় প্রতিভা। প্রতাপাদিত্য,

কেদার রায়, নন্দকুমার, রানী ভবানী, রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশ—কে আসেনি ওই জঠরে? শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক শ্রেষ্ঠ সাধক—কে নয়?

১৯৩০ থেকে বেশ কোমর বেঁধে সাম্রাজ্যরক্ষী ইংরেজের সঙ্গে বিপ্লববাদী বাঙালীর 'ক্রিকেট' খেলা আরম্ভ হয়েছিল। আমরা চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম কে কাকে আউট করে এবং কার কত রান্ হয়। বিপ্লবীরা যদি একটা ইংরেজকে মারে, ইংরেজ অমনি দুটোকে ফাঁসিতে লটকিয়ে দেয়! পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট ছিল ইংরেজ পক্ষের নাটের গুরু, কিন্তু ওই লোকটিকে কোনমতেই বাগে পাওয়া যাচ্ছে না, এই দুঃখ। লোকটা আবার নাকি বিভিন্ন ছদ্মবেশে এখানে-ওখানে যখন-তখন ঘুরে বেড়ায় এবং ঘরের শত্রু বিভীষণদের রাখে সামনে ও পিছনে। লোকটার চেষ্টা ছিল, যেখানে যত গহ্বর ও গর্ত আছে, সেগুলোর মধ্যে খোঁচাখুঁচি করে বিপ্লবীদের খুঁজে বার করা। সন্দেহ নেই, লোকটা ছিল অসমসাহসিক।

আমি 'স্বদেশ'-এর সম্পাদকীয় লিখতুম বেশ উগ্র মেজাজ নিয়ে। কিন্তু আমার চেষ্টা কাগজখানা যেন বাঁচে। সন্ন্যাসী সাধুখাঁ নামক হাওড়ার এক লেখককে দিয়ে জগৎ-প্রসিদ্ধ নর্তকী ইসাডোরা ডানকানের সদ্য প্রকাশিত 'মাই লাইফ'-এর অনুবাদ করাচ্ছিলেম। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন দার্জিলিংয়ে, নজরুলও তখন সেখানে। দুই কবির দেখা সাক্ষাৎ ও উভয়ের আলাপ-আলোচনার বিবরণ 'স্বদেশ'-এ ছাপছিলুম। অন্নদাশঙ্কর তখন ম্যাজিস্ট্রেট, এখানে ওখানে তাঁর পোস্টিং হয়। কিন্তু নিজের নামে তিনি তাঁর কোনও রচনা কোনও সাময়িকপত্রে ছাপতে পারতেন না। ইংরেজ আমলে কারণটা সুস্পষ্ট। তখনকার কালে আরেকজন জাতীয়তাবাদী আই সি এসের নাম শুনেছিলুম, তিনি শৈবাল গুপ্ত। তাঁর আবার এমনই দুঃসাহস, তিনি নাকি খদ্দরও ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে আমার জ্যোতিদি ওরফে সুলেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কন্যা শ্রীমতী অশোকার সঙ্গে মিঃ গুপ্তের বিবাহ হয়। যাই হোক, অন্নদাশংকর একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন, 'লীলাময় রায়'। সবাইকে লুকিয়ে [illegible] নিজের কাগজে একটি পর্যন্ত অনেকে দিয়ে [illegible] তাঁর লেখা ছাপতুম সাময়িক পত্রে। সেই সব লেখা কিন্তু সাহিত্যেরই লেখা, তাতে রাজনীতির গন্ধও নেই—কিন্তু তবু বৃটিশ আমলের আতংক ও নিষেধ অন্নদাশংকরকে সতর্ক করে রাখত।

এমনি একটা সময়ে একটি সাহিত্যোৎ-সাহী ও সুশ্রী তরুণী লেখক সমাজের মধ্যে কোথা থেকে যেন ছটকিয়ে আসে। মেয়েটির দেহলাবণ্য ও নবীন তারুণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওর মিষ্ট মুখশ্রী, মধুর হাসি, ভদ্র ব্যবহার এবং প্রত্যেক লেখক-লেখিকার প্রতি ও'র আন্তরিক অনুরাগ—ও'কে অল্পকালের মধ্যে সকলের প্রিয় ক'রে তোলে। মেয়েটির নাম জাহানারা বেগম চৌধুরী। সাংবাদিক আলতাফ চৌধুরী ওর ভাই কিনা আমি জানিনে, এবং ওই চৌধুরী পদবীটি বগুড়ার প্রাক্তন নবাব, নবাব আলী চৌধুরীর থেকে নেমে এসেছিল কিনা তাও আমার অবিদিত। জাহানারার জননীও সুদর্শনা, এবং হিন্দু বাঙালীর কন্যা বলে শুনেছি। জাহানারার সর্বাপেক্ষা যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতৈষী ছিল, সেও আমাদের বন্ধু দেবু চৌধুরী। দেবু বিশেষ অমায়িক ও সজ্জন। যাই হোক, জাহানারার বয়স তখন আর কত হবে? বছর ষোল সতেরো!

শ্রীমতী জাহানারা ছোট বড় মাঝারি প্রবীণ—সব লেখক, কবি, শিল্পী, সমালোচক, সাংবাদিক এবং বিজ্ঞাপন-দাতাদের সঙ্গে তার এই সুন্দর যৌবনশ্রী, মিষ্ট ভাষণ ও অত্যাধুনিক প্রসাধন সজ্জা নিয়ে একখানা নতুন মোটরে চ'ড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কেননা সে তার নতুন এক সাহিত্যপত্র প্রকাশ করবে। কাগজের নাম রেখেছে 'বর্ষবাণী'। এই বর্ষবাণীর জাল ফেলে সে যেমন গভীর জল থেকে চিতল-বোয়াল, রুই-কাতলা তুলবে, তেমনি আমাদের কয়েকজনের মতন অল্প জলের শফরিকেও বাদ দেবে না। ও-মেয়ের চেহারায় রয়েছে "কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা।" সুতরাং ও-মেয়ে যে রবিঠাকুরের কাছে যাবে না, এ কি কখনও হয়? তা ছাড়া কিশোরী-কবি মৈত্রেয়ী দেবী যদি কবি সম্রাটের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে থাকেন, জাহানারা কি দোষ করল?

অল্পকালের মধ্যে কবি ও লেখক মহলে জাহানারা ঝড় তুলল। অনেক লেখকের বউ ঈর্ষা ও সন্দেহে জরজর হতে লাগল, এবং ওই বালিকা জাহানারা অলক্ষ্যেই জানল, প্রতি লেখক সম্বন্ধে তার শরসন্ধান ব্যর্থ হবে না! জাহানারা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করল। আমি ওর খ্যাতি লক্ষ করে প্রথমটা ঘাবড়িয়ে গিয়ে-ছিলুম। কেননা তখনকার দিনে খানদানী কোনও সুন্দরীর সঙ্গে ভাব-আলাপ বা ঘন পরিচয় ঘটলে খুব সহজেই কানাকানি রটে। আমার চোখের সামনেই রয়েছেন সুন্দরী লতিকা বসু ও পরম সুন্দর সুভাষ বসু। ও'দের দুজনের কথা নিয়ে অকারণে কলকাতায়, বাঙলায় ও ভারতের সর্বত্র কানাকানি ও জনশ্রুতির অন্ত নেই। এইটি মনে রেখে আমি খুবই সতর্ক থাকতুম। দেবুর সামনেই একদিন আমি জাহানারাকে বলতে বাধ্য হয়েছিলুম, দেখো, আমার নামের পাশে শুধু 'দা' বসিয়ো না, বলবে 'দাদা।' লেখা নেবে, পারিশ্রমিক দেবে। নইলে তোমার ঘরের ওই আলমারি থেকে খানকয়েক শাড়ি নিয়ে সরে পড়ব! সাবধান বলছি—

জাহানারা হেসে অস্থির হয়েছিল। মেয়েটা নাকি শুনেছিল, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ছয়শ'খানা ধুতি ছিল, সুতরাং তাকেও অন্ততপক্ষে ছয়শ'খানা শাড়ি জমাতেই হবে!

যে-কয়জন ব্যক্তি জাহানারার প্রিয় ছিল, তাদের মধ্যে দেবু, নজরুল ও কালিকা প্রেসের মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর নাম মনে পড়ছে। এরা এদের ভদ্র ব্যবহার ও মিষ্ট প্রকৃতির জন্য জাহানারার সকল কর্মে সহায়ক হয়েছিল। জাহানারা এখন কোথায়, জীবিত না মৃত, তাও আমার জানা নেই। কিন্তু পরবর্তী ত্রিরিশ বছরেরও বেশি কাল অবধি সে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছিল। তার দু'তিনটি বিবাহ, এবং বিভিন্ন দুর্দশা ও দুর্গতি, এবং তার অবস্থার বিলম্বিত পরিণতি—কিন্তু এসব সত্ত্বেও সকল সময়েই সে আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছে। বোধ হয় আমার ওই কথাটা সে মনে রাখত, আমি নির্মোহ।

১৯৩০ থেকেই মেয়েরা বহু ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিল। ঘরে বন্দিনীর জীবন তারা চাইছে না, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কোনও কাজও খুঁজে পাচ্ছে না। মেয়েদের লেখাপড়া করাটা তখনও আবশ্যিক হয়ে ওঠেনি। মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত সমাজে তখনও নারী শিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন হয়নি। আবার যেসব মেয়ে সুশিক্ষিত, তারা উপযুক্ত কাজ না পেয়ে বিয়ে করে বসে যাচ্ছে। অন্যদিকে আবার উচ্চশিক্ষিত মেয়েকে চট করে ঘরে আনতেও গৃহস্থরা ভয় পাচ্ছিল। গত বছর 'বিজলী'তে যখন ছিলুম, তখন শ্যামবাজারের কাপড়পটির এক গলিতে ছিল 'হিন্দু অবলা আশ্রম'। এই আশ্রমের পরিচালক ছিলেন পংকজ তৈল। একজন ব্যবসায়ী হয়ে ইনি হঠাৎ অবলা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন কেন, আমি জানিনে। বিজলী আপিস থেকে এই আশ্রম বোধ হয় মিনিট তিনেকের পথ। এক-একদিন ভর-দুপুরে এই আশ্রম থেকে একটি অথবা দুটি, কখনও বা তিনটি যুবতী মেয়ে বিজলী আপিসের তিনতলায় সোজা উঠে যেতো আমাদের ঘরে—যেখানে অনিল ভটচায, রতিকান্ত পালিত ও আমি

আড্ডায় মশগুল থাকতুম। হঠাৎ মধ্যে হঠাৎ মেয়েছেলের আবির্ভাব—আমরা আড়ষ্ট হতুম। জনাতিনেক মেয়ে এলে একজন ওদের মধ্যে থাকত বয়ীয়সী। ওরা কাজ চাইত—যে কোনও কাজ। আশ্রয় চাইত—যে কোনও শর্তে। শুধু তাই নয়, যেটা ওদের মুখে চোখে আভাসে ইঙ্গিতে অনুভব করতুম, সেটি কিছু অন্য প্রকার! আমার ধারণা, একটা কোনও অছিলায় ওদেরকে আমাদের কাছে পাঠানো হ'ত! আমার তৎকালীন বন্ধু ধ্যানেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন, ১৯৩০ সালে করাচিতে কংগ্রেসের এক বৈঠকের কালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সময়ে কতগুলি বাঙালী হিন্দু মেয়ে রামানন্দবাবুর কাছে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বলে, কলকাতার 'অবলা আশ্রম'-এ তাদেরকে নানা আশ্বাস দিয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে এনে এখন করাচী থেকে তাদেরকে আরব দেশে দলে দলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারা বাঙলাদেশে ফিরে যেতে চায়! মেয়েরা কান্নাকাটি করতে থাকে।

রামানন্দবাবু মেয়েদের এই করুণ আবেদন শুনে কি প্রকার প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন আমার মনে নেই। তবে এ নিয়ে মস্ত এক আন্দোলন হয়েছিল। এর মধ্যে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন ছিল।

এ ছাড়া রাজনীতির নেতারা পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায়, শহরে, গ্রামে ও গঞ্জে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছেন এবং ছেলেমেয়েদেরকে উৎসাহিত করেছেন। অতঃপর ১৯৩১-এর মার্চের প্রথমে যখন গান্ধী আরউইন প্যাক্টের ফলে সাময়িক কারাবাস ... আইন অমান্য আন্দোলন ... কলিকাতার এই নবাগত ... ... দেশে ফিরে যেতে চায়নি। ... মধ্যে এমন শত শত ছেলে ও মেয়ে ছিল, ... কারাবরণ করতে পারলে খুশী হ'ত—কারণ তাদের সামনে ছিল অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় সমস্যা।

এই ধরনেরই কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে শ্রীমতী লোতিকা, কল্যাণী ইত্যাদিরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'পুণ্যাশ্রম'—যার ফলে আমার পকেটে মাঝে মাঝে হাত পড়ত। তখন আমি লোতিকার প্রতি অন্ধ অনুরাগে ও শ্রদ্ধায় বিভোর। তাঁর সামান্য অঙ্গুলি হেলন বা ঈষৎ অনুরোধ আমার কাছে যেন দৈববাণী! আমি তখন আর অন্য কিছু দেখছিনে, কিছু আমার চোখে পড়ছে না, কোনও কিছুর প্রতি আমার মন যাচ্ছে না, দিনরাত অন্বেষণ-অনুরাগে আমি যেন তন্দ্রাতে ডুবিয়েছি। আমি তখন যেন সেই গিরীশ ঘোষের বিল্বমঙ্গল। আর সেই 'চিন্তামণির' চিন্তাতে অভিভূত হয়ে আমি যেন কোন্ পরম চিন্তামণির সাধনায় দিন কাটাচ্ছিলুম এবং একেবারেই আত্মবিস্মৃত ছিলুম। অপর কোনও মেয়ের প্রতি আমার না আছে চোখ, না মন—যদিও অল্পবয়সী মেয়েরা তখন আমার দৃষ্টি-সীমানার মধ্যে গিজগিজ করছিল। বিশেষ করে 'আনন্দ-মঠ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমি একজন 'হিরো।' কোনও মেয়ের চোখে মধুর হাসি, কেউ বা দেহলাবণ্যে, চলাফেরায় করছে, কেউ পরিহাস ছুঁড়ে মারছে আমার প্রতি, আবার কেউ বা অসময়ে এক পেয়ালা চা এনে দিয়ে আমাকে খুশী রাখছে। ওরই মধ্যে একদিন শ্রীমতী হঠাৎ আমার হাতখানা ধরে হিঁচড়িয়ে টেনে লোতিকা দিদির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, দিদি, দ্যাখ ত' ভাই, এ কি পুরুষ মানুষের আঙ্গুল? মোটা থেকে একদম সরু হয়ে এসেছে, এত নরম আঙ্গুল ত' মেয়েদের! আপনি ত' মেয়ে। কেউ আপনাকে পুরুষ বলবে না!

সকলের সঙ্গে উমাদিদিও হেসে অস্থির। আমি তাঁর একান্তই স্নেহের পাত্র।

পূর্বোক্ত 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শ্রীমতী লোতিকা একদা আমাকে পাঠালেন শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবীর কাছে। তখন রাসবিহারী অ্যাভেনু তৈরি হয়েছে কিন্তু ওই চওড়া রাস্তার দুই পাশে মাঝে মাঝে দু'চারখানা বাড়ি সবেমাত্র তৈরি হচ্ছিল। যেগুলো দুদিকের সাইড স্ট্রীট, সেগুলোর ভিতরে-ভিতরে ফাঁকা মাঠ। লেক-এর দিক সন্ধ্যার থেকে ঘন অন্ধকার। সাদার্ন অ্যাভেনু তখন স্বপ্নবৎ। গড়িয়াহাট মার্কেট অভাবনীয়। মনোহরপুকুর পল্লীতে তখনও আশ-সেওড়ার জঙ্গল। ওরই একাংশের নাম দেওয়া হয়েছে বুঝি হিন্দুস্থান পার্ক—অর্থাৎ নলিনীরঞ্জন সরকার ও সুরেন ঠাকুরের সেই হিন্দুস্থান লাইফ ইনস্যুরেন্সের নামানুসারে। ওইখানে জমি কিনেছেন নরেন্দ্র দেব এবং বাড়ি করেছেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ওঁর ওখানে

মাঝে মাঝে অসত্তম বউদিদির হাতের চানাচুর আর চায়ের জোড়ে, আর যতীনদা সেই সুযোগে ওঁর কবিতা আমার মুখ দিয়ে আবৃত্তি করিয়ে নিতেন। তখন সন্ধ্যার পর সমগ্র নতুন বালীগঞ্জ অন্ধকারে আর ঝিঁঝিঁর ডাকে গমগম করত।

কিন্তু বিমলপ্রতিভার বাড়ি ছিল লেক-মার্কেটের এদিকে দক্ষিণ ফুটপাথে। ওঁর স্বামী হলেন ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দেশকর্মী এবং খুবই ভদ্র ও মধুরভাষী। কিন্তু শ্রীমতী শোভা আমাকে পুরুষ অপেক্ষা যেহেতু স্ত্রীলোক বলে কল্পনা করতেন, সেই হেতু আমি যে-কোনও বাড়ির কর্তা অপেক্ষা গৃহিণীদের নিকট বেশি অন্তরঙ্গ ছিলুম।

শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা তখন অন্যতম সুন্দরী মহিলা হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর একখানা মোটরকার ছিল। আর্থিক অবস্থা তাঁদের খুবই ভাল। তিনি বোধ করি তখন লতিকা বসুরই সমবয়সী। বিমলপ্রতিভা যখন আমাদের আমন্ত্রণে সভায় এসে উপস্থিত হতেন এবং যখন তাঁর অতি মূল্যবান ও মিহি খদ্দরের রাঙাপাড় শাড়ির সঙ্গে চিত্তাকর্ষক প্রসাধন পারিপাট্য দেখতুম, তখন অনেকের মতো আমারও ভাবান্তর ঘটত। এঁদের অনেকের দেহশ্রী ও রূপ-মাধুর্যের জন্য এঁদের দেশকর্মের খ্যাতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ত এবং সংবাদপত্রে এঁদের ছবি ছাপা হ'ত। শ্রীমতী শোভার নির্দেশক্রমে আমিই ওঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে 'আনন্দমঠ'-এ টেনে এনে-ছিলুম। কিন্তু তার পরে যে ঘটনা ঘটেছিল সে কথা পরে বলব।

'স্বদেশ' মাসিকপত্র নিয়ে আমি তখন ডুবে রয়েছি। সম্প্রতি হিন্দু মিউচুয়াল বীমা কোম্পানির শ্রদ্ধেয় পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় যিনি আধুনিক লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায়ের পিতা, তিনি আমাকে 'উপাসনা' মাসিকপত্রটিও দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে আমি খুব সতর্ক। কারণ আমার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয়বন্ধু সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কতটুকু স্বার্থ এখনও পর্যন্ত এই উপাসনার সঙ্গে জড়িত, সেটুকু আমার দেখার দরকার ছিল। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সাময়িক পত্রের প্রকৃতি যদি গতিশীল না হয়, তবে সেই কাগজের অপমৃত্যু অনিবার্য। সাবিত্রীপ্রসন্ন মূলত কবি এবং সাহিত্যরসের কারবারী। তিনি ভদ্র, বন্ধুবৎসল, সুলেখক,—কিন্তু সাপ্তাহিক বা মাসিক-পত্রের পরিচালনা অন্য জিনিস। সেখানে ভিন্ন প্রকার যোগ্যতার কথা থাকে। প্রতি মাসিক সংখ্যায় পাঠকদের মনকে নাড়া দিতে হয়, ঘুম ভাঙাতে হয়, উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করতে হয়, নতুন চিন্তাধারার চাবুক মারতে হয়! সাবিত্রীপ্রসন্ন হয়ত সে বিষয়ে কতকটা অসতর্ক ছিলেন বলেই উপাসনার অন্তিম ঘনিয়েছিল! যে রোগী আধপেটা খেয়ে মরতে বসেছে, যার এ জীবনে পুষ্টিকর খাদ্য জোটেনি, তাকে মরণকালে সহস্র আঙুর-বেদানা, ফলমূল বা দুধ-মাখন গোগ্রাসে গেলাও, তার মরা-নাড়িতে কোনটাই ধরবে না! তার মৃত্যু ঘটে দুরারোগ্য ব্যাধিতে। উপাসনাকে বাঁচাবার সাধ্য আমার নেই। পাঠক সমাজ উপাসনাকে আর চায় না।

সেক্ষেত্রে আমারই হাতে উপাসনার যখন মৃত্যু ঘটছে এবং খাবি খাচ্ছে ও তারই শিয়রে বসে প্রবীণ ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় যখন তারক ব্রহ্মনাম জপ করছেন, তখন আমারই হাতের 'স্বদেশ' তার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে সমগ্র পাঠক সমাজে প্রবল ঝড় তুলেছে! প্রতি মাসে উদ্গ্রীব পাঠকসাধারণ নতুন একটা জীবনের স্বাদ পাচ্ছে, নতুন সাহিত্যের প্রবল চেতনায় তারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। দুর্ধর্ষ কবিতা লিখছে নজরুল, দুঃসাহসিক উপ-ন্যাস লিখছে বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যের গল্প এবং কবিতায় নতুন নতুন চিন্তার উদ্দীপনা,—আর প্রেমেন? সে তার কবিতার জন্য 'স্বদেশ' থেকে প্রথম টাকা পেয়ে তার এক মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করেছে, 'অর্থশন আখরে আকাশে যাহারা লিখছে আপন নাম, চেনো কি তাদের ভাই?' দুই তুরঙ্গ

অমর বললো, "চলো, আগে একটু মাংস কিনে নিই।"

—"মাংস? কাঁচা মাংস?"

—"হ্যাঁ। ভয় নেই, রান্না করিয়ে তোমায় খাওয়াবো। চলো না আমার সঙ্গে।"

বাজারে ঢুকে পাঁঠার দোকান থেকে একটা সামনের রাং নামাতে বললো অমরদা। অভিজিৎ দেখলো, অমরদা খুব নিখুঁত-ভাবে মাংসটা পরিষ্কার করিয়ে কাটালো। তারপর কিনলো পিঁয়াজ, আদা, রসুন, টোম্যাটো—এই সব।

এক সময় বললো, "এই অবধি থাক। বাকিটা জোগাড় হয়ে যাবে।"

মোড় থেকে একটু হেঁটে একটা গলির মুখে দাঁড়ালো ওরা।

জায়গাটা চেনা-চেনা লাগছে। এখান থেকে জগদীশ কুটির খুব দূরে না। অভিজিতের মনে পড়লো, এই সব রাস্তা দিয়ে গলি দিয়ে কতো অজস্র বার হেঁটে গেছে ও এককালে। রাস্তার পাশের কল, ময়লা ফেলার জায়গা, ছোট ছোট দোকান-গুলো—সব যেন তেমনই আছে। অটুট, স্থির, নির্বিকার। মাঝখান থেকে অভিজিতের মনে হল, আমার জীবন থেকে কুড়িটা বছর ফসকে বেরিয়ে গেছে।

অভিজিৎ বললো, "অমরদা, চলো না, আমাদের সেই পুরনো জায়গাটা, আস্তানাটা একবার দেখে আসি।"

—"জগদীশ কুটির?" অমর ভ্রু-দুটো তুলে জিজ্ঞেস করলো।

—"কতদিন ছিলাম সেখানে! বাড়িটার ওপর মায়া পড়ে গেছে।"

অভিজিতের কাঁধে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে অমর বললো, "কোনো মানে হয় না। বাড়িটার নাম এখন বদলে হয়েছে 'বিহানি লজ'। কোনো এক মিস্টার বিহানি বাড়িটা কিনে নিয়েছে।"

—"সে কী! বেচারামেরা সম্পত্তিও হাত দিতে পারে, কারোর উইলমতো?"

—"কী মুশকিল! তোমায় বললাম না, ওরা নিজেদের মধ্যে মামলা করছে। ফোকটে মামলা চালানো যায় নাকি?"

অমরদা কী ভেবে একটু হাসলো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, "কলকাতা শহরে কতগুলো কোর্ট, ভেবে দেখো! হাই কোর্ট, সিটি সিভিল কোর্ট, ব্যাংকশাল কোর্ট, শেয়ালদা-আলিপুর কোর্ট। এই সব কোর্টে কত হাজার হাজার উকিল-মোক্তার-ব্যারিস্টার কাকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে রোজ। মামলা না চললে ওরা খেতে পাবে কী করে বলো!"

নিজের রসিকতায় অমরদা আবার হাসলো। অভিজিৎ ওর পাশে পাশে হাঁটছে, নিঃশব্দে।

অমরদা বললো, "কলকাতার সমস্ত প্রপার্টি ওরা বেচে দিয়েছে। এখানে নাকি নকশালদের বড় উৎপাত। ওদের মতে, শহরটা আর ভদ্রলোকের বাসযোগ্য নেই।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা বাড়ির সামনে গিয়ে থামলো। পাশে আর একটা গলি। গলিটার ভেতরে ঢুকলো ওরা।

সবুজ রঙের দরোজাওলা একটা পুরোনো, পলেস্তারা-খসা বাড়ি। অমরদা অবলীলায় বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে থামলো। অভিজিৎ নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করছে, প্রশ্ন করছে না। ভাবছে, দেখাই যাক না, কী দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।

কড়া নাড়লো অমরদা।

—"গীতা, গীতা আছো?"

খুট করে শব্দ হল দরোজায়। খুলে গেল পাল্লা দুটো। অভিজিৎ দেখলো, বেশ ফিটফাট একজন মহিলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। দু হাতে পাল্লা দুটো ধরা। গম্ভীর মুখ কিন্তু চোখদুটো থেকে যেন ঈষৎ কৌতুক ঝরছে।

—"কী, ঢুকতে দেবে না?" অমর জিজ্ঞেস করলো।

—"না।"

—"কেউ আছে নাকি ভেতরে?"

—"না।"

—"তবে? কী অপরাধ করেছি?"

মহিলাটি ঠোঁট খুলে হাসলো এবার।

অভিজিৎ বুঝলো ব্যাপারটা। অথচ মহিলাটিকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। বেশ ভদ্র চেহারা। পরিষ্কার সুরুচি-সম্পন্ন বেশবাস, সদ্য-স্নান করে উঠেছে, মনে হলো। পরনে সাদা খোলের লাল চেক-ডুরে শাড়ি। সিঁথি সাদা, কিন্তু কপালে একটা লাল টিপ।

মহিলাটি বললো, "এতদিন পরে মনে পড়লো? আমার কিন্তু খুব রাগ হয়েছে।"

"হতেই পারে হতেই পারে।" অমরদা বললো "দোষ তো আমার। তবে তুমি তো বোঝো, সব দিক সামলে চলতে হয় আমাদের

মতো মানুষদের। আসতে ইচ্ছে করলেই তো আসা যায় না।"

গীতা ঝাড় ঘুরিয়ে অভিজিতের দিকে তাকালো।

—"এঁকে তো চিনলাম না।" ভ্রূদুটো তুলে জিগ্যেস করলো গীতা।

—"আমার বন্ধু। এর নাম অভি।" অমর পরিচয় করিয়ে দিল।

বললো, "আগে ঢুকতে দাও ভেতরে, তারপর কথা হবে।"

দরোজা ছেড়ে দাঁড়ালো গীতা। অভিজিতের দিকে চেয়ে বললো, "আসুন, ভেতরে আসুন।

এক চিলতে প্যাসেজ প্রথমে। তারপর একটা বড় ঘর। প্যাসেজটার শেষ দিকে রান্নার ব্যবস্থা। বাসন-কোসন, তোলা উনুন। তার পাশেই সম্ভবত পায়খানা-জাতীয় জায়গাটা। চৌকাঠের বাইরে একটা পাপোশ পাতা রয়েছে।

অভিজিত হঠাৎ যেন ধূপের গন্ধ পেল। অনুমান করলো, আনাচে-কানাচে কোথাও একটা ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার আছে। লুকোনো।

গীতা জিগ্যেস করলো, "তোমার হাতে ওটা কী?"

অমর বললো, "মাংস। তুমি রাঁধবে, আমরা সবাই মিলে খাবো আজ। অভিকে বলেছি, তোমার মাংস, মানে তোমার রান্না মাংস, রবি ঠাকুরের চেলারা যাকে বলে—কী যেন কথাটা? হাঁ, অনির্বচনীয়!"

হাতের জিনিসটা নামিয়ে রাখলো অমর।

বড় ঘরটাতে গিয়ে বসলো ওরা। ঢুকতে যাবে, এমন সময় একটি পনেরো-ষোলো বছর বয়সের ছেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পরনে হাফ শার্ট, হাফ প্যান্ট, টেরি-কাটা চুল। অভিজিত লক্ষ করলো, ছেলেটা যাবার সময় নিচু করে ছিল মাথাটা। যেন ইচ্ছে করেই ওদের মুখের দিকে চায়নি।

গীতা নিজে থেকেই বললো, "ও পঞ্চু, আমার ছেলে।"

ঘরটার মধ্যে জিনিসপত্র যা আছে, সবই বেশ গুছিয়ে রাখা। মাঝারি সাইজের একটা তক্তপোশ, তার ওপর তোশক পাতা। নীল বেড-কভার ঢাকা। বিছানার ওদিকটা উঁচু হয়ে আছে বালিশে।

তক্তের পাশে একটা টেবিল, কাপড় দিয়ে ঢাকা। তার প্রায় সবটা জুড়ে একটা রেডিও। এ ছাড়া, আসবাবপত্রের মধ্যে আছে একটা বড়ো আয়না, আর একটা কাঠের চেয়ার।

অমর জিগ্যেস করলো, "তারপর? কেমন আছো গীতা?"

—"তোমরা যেমন রেখেছ।"

—"আর ওরা? তোমার ডুগি-তবলা জুটো? যা জ্বালাচ্ছে বাজে না!"

অমর নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হাসতে লাগলো। বুকের ওপর, ওর একটু অতিরিক্ত বড়ো স্তনদুটোর ওপর কাপড়টা সরিয়ে নিল গীতা।

অভিজিতের দিকে চেয়ে অমরদা বললো, "গীতা একটা রিয়াল মেয়েমানুষ।"

—"অসভ্যতা কোরো না, প্লীজ! ভদ্রলোক কি ভাবছেন বলো তো।" গীতা অভিজিতের দিকে চেয়ে একটু সলজ্জ হাসি হাসলো। বললো, "কিছু আনাবেন, বিয়ার-টিয়ার?"

তারপর অমরের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলো, "পঞ্চুকে ডাকছি, ও নিয়ে আসুক।"

অমরদার কোনো আপত্তি নেই, বোঝাই যাচ্ছে। যদিও নিয়মিত ও মদ্যপান করে না, মাঝে-সাঝে বিশেষ উপলক্ষে খায়, তা অনুমান করা কঠিন নয়। আনা হলে গীতাও হয়তো এক-আধ গ্লাস খাবে। তবু অভিজিত বললো, "না, না, থাক।"

কোথায়, কোন্ গভীর বোধের মধ্যে, ওর খটকা লাগছে।

অমর সোজা গিয়ে বিছানার ওপর বসেছে। অভিজিত চেয়ারটায়। একটু তফাতে।

গীতা এক সময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সম্ভবত রান্নার যোগাড় করতে। ওর অনুপস্থিতিতে অভিজিতের মনে হলো, মেয়েটা বেশ। আচরণে ওর চমৎকার একটা পারিবারিক সুগন্ধ আছে। অন্তত, সেই মেয়েটার সঙ্গে তুলনা করলে—কী যেন নাম ছিল সেই পিক্-আপ করা ছুঁড়িটার? পুতুল। হাঁ, পুতুলটা একেবারে রাস্তার ভিখিরি ছিল। এই মেয়েটার সম্ভ্রমবোধ আছে।

অনুমান করতে কষ্ট হলো না, অমরদা

এখানে মাঝে মাঝে আসে। অন্যরাও আসে।

কত বয়েস হবে গীতার? তিরিশ-চৌত্রিশ? পুষ্ট, শক্ত চেহারা। খুব সুশ্রী না, কালো। তবে, গলার স্বর বেশ মিষ্টি। এবং ওর চেহারায় একটা লাবণ্য জড়িয়ে আছে আলগাভাবে।

—"বেশ একটি সুখী গৃহকোণ খুঁজে বার করেছ তো!" অমরদার উদ্দেশে বললো অভিজিত।

—"যা বলেছ। খাওয়া থেকে শোওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ তুমি ওর যত্ন পাবে। তবে, মুশকিল হচ্ছে, ওর ছেলেটাকে নিয়ে। বুঝতে পারে তো সব। তাই তো গীতা ঘ্যান ঘ্যান করে, ওকে একটা চাকরি জুটিয়ে দাও কোথাও। ক্লাস নাইন অবধি পড়েছে। বেয়ারা-টেয়ারার কাজ—যা হোক। অন্তত ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাক। নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিক।"

অমরদা তারপর যোগ করলো, "কিন্তু অভি, কলকাতা শহরে বেয়ারার কাজ পাওয়াও কি সহজ! পাওয়া গেলেও এই রকম একটা কেস সুপারিশ করা যায়!"

কথাটা বলে অমরদা উঠে দাঁড়ালো। রান্নার জায়গাটার দিকে এগোলো আস্তে আস্তে।

কত রকমভাবে মানুষ বাঁচে! অভিজিত ভাবলো। না কোনো সস্তা নীতিবোধ আমার নেই। একজন মেয়ের সঙ্গে একজন পুরুষের শোয়া-বসার মধ্যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, এমন গুরুতর দোষের কিছু দেখি না। কিন্তু—

নিজের চিন্তাটাকে একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলো অভিজিত। কিন্তু—যেটা অস্বস্তিকর অমরদা, সেটা হলো তোমার নির্বিকার মনোভাব। তোমার আচরণে কোনো উত্তেজনা নেই। অনায়াসে তুমি মানুষও খুন করতে পারো, আমার ধারণা।

—তোমার সংস্কারে বাধছে?

একদম না। তবে, মন বলে একটা কিছু তো মানুষের থাকে। একেবারেই পাথরের তৈরি তো ওটা নয়।

—কিন্তু, তুমিই না বলছিলে, একটা মানুষ জন্ম, তার মধ্যে কোনো ব্যর্থতাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। এই পৃথিবী থেকে, পৃথিবীর প্রতিভূ আপাতত এই কলকাতা শহর থেকে আমার প্রয়োজনীয় সব রস আমি শুষে নেবো। কেউ ঢেলে না দিলে চুষে খাবো। মন দিয়ে কী কাজ হবে! তুমি কি মনে করো না, তোমাকে নিয়ে লোকে যা-খুশি খেলা খেলবে, আর মন খারাপ করে তুমি তা সহ্য করে যাবে, দেখে যাবে, তা হয় না।

বড়ো আয়নাটার ভেতরে অভিজিত যেন অমরদার প্রতিবিম্ব দেখলো। বলছে, জীবনের কাছে মার খেয়ে তুমি চুপ করে থাকতে চাও, থাকো, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

একদিক থেকে কথাটা হয়তো সত্যি। অভিজিত স্বীকার করে।

একবার যা ধরেছি, তা ফসকে গেছে হাত থেকে। সেই ছোটবেলায় ভাগলপুরের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, আর আমার বাড়ি ফেরা হয় নি। একটা জেলখানা থেকে আর একটা জেলখানায় কেউ আমায় সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। ঠিক। কিন্তু, অমরদা, তোমার মতো কয়েদখানাকে ঘর-বাড়ি বানিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যা মিথ্যে, তার সবটাই মিথ্যে।

—"কী ভাবছেন?" গীতার কণ্ঠস্বরে ওর চমক ভাঙলো।

—"না, কিছু না।" অভিজিত নড়ে-চড়ে বসলো। বললো, "একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।"

—"চা খাবেন?"

অভিজিত অমরদার দিকে চাইলো।

অমরদা বিছানার ওপর এলিয়ে শুয়েছে এখন। একটা সিনেমার পত্রিকা পড়ছে মন দিয়ে। পত্রিকা থেকে মুখ না সরিয়েই বললো, "মাংস রান্নার দেরি কত? একেবারে ভাত খেয়ে নেবো। তারপর—আঃ এই চমৎকার দুপুর!"

—"নিজেই তো দেখে এলে বাপু। সেদ্ধ হতে দেরি আছে এখনও। ততক্ষণ—"

সিনেমা-পত্রিকাটা উল্টে করে বিছানায় রেখে অমর উঠে বসলো এবার। একবার অভির দিকে, একবার গীতার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইল।

তারপর হেসে বললো, "ততক্ষণ তুমি এখানে এসে বোসো না একটু।"

অনুগত স্ত্রীর মতো প্রসন্ন মুখে গীতা গিয়ে বসলো অমরের পাশে।

অভিজিত দেখলো, মাথায় টাক, গোলগাল চেহারার একজন প্রৌঢ় লোকের পাশে গীতাকে মানাচ্ছে না। বিছানার ওপর একজন কুৎসিত, লোভী ও কামুক পুরুষের পাশে যেন টাটকা সুস্বাদু খাদ্যের মতো বসে আছে একটি সুন্দরী যুবতী।

অমরদা গীতার একটা হাত ধরে টান দিল।

—"দেখি, তোমার হাতটা। দেখি, তোমার ভাগ্যে কী আছে।" সমস্ত মুখমণ্ডলে হালকা হাসির আভা ছড়িয়ে—অমরদা তাকালো একবার অভিজিতের দিকে। হাসলে ওর দাঁতের মাড়ি দেখা যায় এখনো।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর হাত দেখতে লাগলো অমরদা।

বললো, "তোমার যখন ষোলো বছর বয়েস, তখন বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলে ঠিক? সচ্ছল গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—বাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে নীড় বাঁধবে ভেবেছিলে, ঠিক? তারপর ড্রাইভারদাদা তোমায় একজনের কাছে জমা দিয়ে নিজে উধাও হয়ে যায়। অন্য কোনো রাস্তা খুঁজে না পেয়ে তুমি তখন কী করলে? পঞ্চানন-বাবুকে গর্ভে ধারণ করে এক মারোয়াড়ীর আশ্রয়ে চলে এলে, ঠিক বলেছি? না, না,

মারোয়াড়ীবাবুর আশ্রয়ে থাকার সময়েই— কী যেন গল্পটা? গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার!"

গীতা হঠাৎ হাতটা সরিয়ে নিল।

বললো, "কতো হাত দেখতে জানো। এ সব তো আমার মুখেই শোনা।"

—"আচ্ছা, হাত না দেখেই বলছি। কপাল দেখেও বলতে পারি।" অমরদা ওর মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো, "তারপর সেই মারোয়াড়ী কিছু দিন তোমায় পুষলো। রস-টস চুষে খেয়ে তারপর ছিবড়েটা ফেলে দিয়ে গেল এখানে। এখন আমার মতন অপদার্থ দু-একজন তোমার ছিবড়ে থেকে রস চুষছে।"

—"ছিবড়ে? ইস্!"

গীতা চোখ পাকিয়ে বললো, "আচ্ছা অভিবাবু, ভালো করে চেয়ে দেখুন তো, আমার শরীরটা ছিবড়ে মনে হয়?"

অভিজিত্ উত্তর দিল না।

কথাটা লুফে নিল অমর।

—"লোভ দেখাচ্ছ ওকে?"

তারপর ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ফেলে দিল বিছানায়। হঠাৎ ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সশব্দে ওর ঠোঁটে চুমো খেলো।

বললো, "উঃ, ঠোঁট তো নয়, কমলা লেবু!"

—"তোমার লজ্জা করে না? একজন ভদ্রলোকের সামনে কী অসভ্যতা করছো বলো তো? কী ভাবছেন উনি আমাকে!"

গীতা বিছানায় উঠে বসলো।

—"ও ভাবছে তুমি একটি বাঘিনী। কত পুরুষ মানুষের মাথা খেয়েছো, খেয়ে-খেয়ে মুটিয়েছ এরকম। আজ দুপুরে কিন্তু আমরা দুজন মিলে তোমায় খাবো। খুঁটে খুঁটে, তারিয়ে তারিয়ে—কী বলো অভি?"

এবার কথা বললো অভিজিত।

—"তুমি একা খেয়ো, আমি শুধু মাংস-ভাত।"

—"দেখছ তো", অমরদা গীতাকে বললো এবার, "বুঝলে তো এতক্ষণে, তোমাকে ওর পছন্দ হয় নি। খুব খুঁতে-খুঁতে স্বভাব ওর। তোমার মতো কুচ্ছিত মেয়েকে ও ছোঁবে কেন? জানো, ও মেম-সাহেবের টকটকে লাল শরীর ঘেঁটে এসেছে বিলেতে। এখন ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাঙালীবাবু সেজে বসে আছে বলে ওকে হেঁজিপেঁজি ভেবো না।"

ভুল! ভুল! অভিজিতের বুকের ভেতর থেকে কেউ যেন প্রচণ্ড আপত্তি করে উঠলো। মেমসাহেব নয়, ও আইভি। বিশেষ একজন। ও ইতু। বিশ্বাস করো, আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো অশ্লীলতা ছিল না। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতাম। ভালো বসে-ছিলাম এক সময়। অনেকগুলো বছর।

অভিজিতের ইচ্ছে হলো, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে অমরদার মুখের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুষি কষিয়ে দিয়ে আসে। পরমুহূর্তেই সংযত করলো নিজেকে।

বললো, "অমরদা, আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। আমার ভালো লাগছে না।"

অমর সংযত হলো এবার। বোধ হয় অভিজিতের মনের কাতর অবস্থাটা অনুমান করতে পেরেছে।

গীতাকে বললো, "এই শোনো, এ সব এখন থাক। ওর রুচিতে বাধছে।"

গীতা বললো, "তখন থেকে তো আমি তাই বলছি। সব মানুষ কি এক রকম?"

তারপর অভিজিতের দিকে চেয়ে, যেন অপরাধীর মতো বললো, "আমারও আর ভালো লাগে না এ সব। নেহাত পেটের দায়ে—। পঞ্চুটার একটা হিল্লে হয়ে গেলে আমি ছেড়ে দেবো।"

—"যাক গে ওসব কথা", অমরদা বাধা দিল এবার। "দেখ, অভি আমার অতিথি। ওকে বাদ দিয়ে আজ কিছু হবে না এখানে। বরং এমন কিছু করো, যা ওর ভালো লাগবে।"

অভিজিত জিগ্যেস করলো, "তুমি গান গাইতে পারো? তোমার গলা তো বেশ মিষ্টি।"

শুনে কেমন ছলছল করে উঠলো গীতা।

—"আমায় আপনি গান গাইতে বললেন?"

—"কেন, পারো না?"

—"পারতাম। খুব ভালো গান জানতাম আমি। মাস্টার রেখে গান শিখেছিলাম। গান গাইলে মন ভালো থাকে।"

গীতা যেন তার অতীত থেকে কথা বলে উঠলো। জিগ্যেস করলো না, কোথায় শিখেছ? নিজের বাড়িতে, ছেলেবেলায়? না, সেই মারোয়াড়ীর বাড়িতে। গল্পটা যদি সত্যি হয় অবশ্য। অর্থহীন প্রশ্ন করা উচিত নয়।

গীতা বললো, "কতদিন গাই না। কেউ গাইতে বলে না আমাকে।"

তারপর জানলার দিকে চেয়ে চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ। হয়তো চোখের জল বেরিয়ে না পড়ে সেই চেষ্টা। কান্নাকাটি করলে লোকের মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়, তা ও জানে।

একটু সামলে নিয়ে মুখ ফিরে চাইল আবার।

বললো, "সকলের নজর এই পচা শরীরটার দিকে।"

অভিজিত বললো, "তা হলে গাও এখন। গাও একটা গান।"

—"কী গান শুনবেন?"

—"যা খুশি তোমার।" অভিজিত উৎসাহ দেয়।

—"হয়তো পদ ভুলে গেছি, জানি না পারবো কিনা শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ইচ্ছে করছে খুব। হারমোনিয়মটা আবার ইঁদুরে কেটেছে।"

—"খালি গলায় গাও।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল গীতা। টান হয়ে বসলো। ছাত্রীর মতো। বুঝি ওর অন্তর থেকে আর একটা মানুষ গেয়ে উঠতে চাইছে।

একটু গুনগুন করে তারপর গাইতে শুরু করলো।

সমস্ত গানটা চমৎকার গেয়ে গেল গীতা। কোথাও থামলো না। সুর কাটলো না কোথাও। দুটো লাইন অভিজিতের মনে গেঁথে গেছে : পরাণে লাগলে ব্যথা, ভাবি তুমি আমায় ছুঁলে, বঁধু আমার, আর কত কাল থাকবো বসে দুয়ার খুলে!

অভিজিত ভেবেছিল এ লাইনের মেয়েরা যা হয়, হয়তো একটা চটুল ফিলমি গীত শোনাবে গীতা। তার বদলে এ কী! ব্যথা পেলে মনে হয়, তুমি বুঝি ছুঁয়েছ আমায়! কার লেখা এ গান, কে জানে। কিন্তু কী দরদ।

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল অভিজিত্। সম্পূর্ণ অকারণে ওর চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল জলে। কিংবা, হয়তো সমবেদনায়। অনেকক্ষণ ধরেই বাষ্প জমছিল ওর বুকের মধ্যে, এক সময় টপটপ করে ঝরে পড়লো।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বার করে শান্তভাবে ও মুখ মুছলো।

গানটা শেষ হতেই অমরদা বলে উঠলো, "ধুৎ, গানটা জমলো না। একটু ঠুংরি-টুংরি গাও না। ফুর্তির গান।"

—"শাট আপ, ব্লাডি সোয়াইন", হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো অভিজিত। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সটান। গীতার পাশ কাটিয়ে ক্ষিপ্রবেগে অমরদার কাছে গিয়ে ওর গলাটা দু হাত দিয়ে চেপে ধরলো।

রুক্ষ স্বরে বললো, "তুমি একটা আস্ত পাষণ্ড। ইউ হ্যাভ নো রাইট টু লিভ!"

এতক্ষণ নিজের স্থূল রসিকতায় নিজেই বিভোর ছিল অমর—এই আকস্মিকতার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। আচমকা গলায় চাপ পড়তে কোঁক কোঁক করে শব্দ করলো দুবার। তারপর ঢলে পড়লো বিছানায়।

অমরদার নরম গদির মতো মাংসল গলাটা একটু জোরেই টিপেছিল অভিজিত। তারপর ছাড়াতে একটু দেরি হয়ে গেছে। ওর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সকাল থেকে ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল ওর বিরক্তি, ও বুঝতে পারে নি। বা, বুঝতে দেয় নি। হঠাৎ ছাড়ালো সহ্যের সীমা, খসে পড়লো ধৈর্যের পশমী আবরণ।

—"এই যাঃ, মরে গেল নাকি?"

অভিজিত হাত দুটো ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বেশ ঘাবড়ে গেছে। অসহায় চোখে গীতার দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

গীতাও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে।

—"এটা কী করলেন আপনি?" কাঁদো কাঁদো স্বরে জিগ্যেস করলো, "বন্ধু হয়ে আপনি ওকে মেরে ফেললেন?"

—"কী হবে এখন।"

অভিজিত অনন্দার শোয়া শরীরটার দিকে এগিয়ে গেল আবার। নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলো। না, নিশ্বাস পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে, মরেনি।

বললো, "রোসো, একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। কী কাণ্ড, ছিঃ! হঠাৎ আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল।"

গীতাকে বললো, "চোখে-মুখে একটু জল দাও ততক্ষণ, আমি এখুনি আসছি।"

বলে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। তরতর করে নামলো সিঁড়ি দিয়ে। দ্রুতবেগে গলিটা পার হয়ে একেবারে বড়ো রাস্তায়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ইন্দিরা শিক্ষায়তনের স্মারক পুস্তিকা

আজকাল যে কোনও অনুষ্ঠানে বেশ খরচপত্তর করে একটি করে স্মারক-পত্রিকা বের করা হয়। এগুলি চড়া দামে হলে বিক্রীও করা হয়ে থাকে। এগুলিতে প্রায়ই চকচকে মলাটের অন্তরালে যা থাকে তা হচ্ছে উদ্যোক্তাদের এবং পৃষ্ঠপোষকদের ফটোগ্রাফ, বহু বিজ্ঞাপন (যা থেকে খরচ-পত্রের টাকা উঠে আসে), অনুষ্ঠানের কার্য-সূচী এবং এক-আধটা প্রবন্ধ যাতে পড়বার মত বস্তু কমই থাকে। বিয়ের পদ্য যেমন একদা না বের করলে চলত না, অথচ তার বিশেষ কোন মূল্য থাকত না, এও সেই ব্যাপার। তফাৎ এই যে, বিয়ের পদ্য বিনা-মূল্যে বিতরণ করা হত, এক্ষেত্রে সেটার পরিবর্তে চড়া মূল্য ধার্য করা হয় এবং চক্ষুলজ্জার খাতিরে অনেকে সেটা কিনতে বাধ্য হন। অথচ এইসব পত্রিকা যদি ভাল করে বের করা হয় তাহলে তার একটা যথার্থ মূল্য থাকে এবং ইতিহাসের দিক থেকেও তার একটি প্রয়োজনীয়তা থাকে। ব্যতিক্রম যে নেই তা অবশ্য নয় এবং একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হচ্ছে ইন্দিরা শিক্ষায়তন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি। বিষ্ণু-পুরের রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁদের অনুষ্ঠানে যে পুস্তিকাটি প্রচারিত হয়েছিল সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল এবং সঙ্গীত-সাহিত্যে একটি সংরক্ষণের উপযুক্ত "ডকুমেণ্ট" বলে গণ্য হয়েছিল। সম্প্রতি ৩ জুন, ১৯৭৩ রবীন্দ্রসঙ্গীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয়ের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁরা যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন সেটিও একটি মূল্যবান প্রকাশন বলে বিবেচিত হবে। অনুষ্ঠানটি সাময়িক কিন্তু যে শ্রদ্ধা এই পুস্তিকাটির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সেটি চিরায়তত্বার এই পুস্তিকাটির মধ্যেই নিহিত হয়ে রইল। পুস্তিকাটি বিশ্ব-ভারতীর প্রকাশনার আদর্শে রচিত এবং সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক; এতে একটিও বিজ্ঞাপন নেই। গ্রন্থনা চমৎকার।

অনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয় সম্বন্ধে আমরা আগেই আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এই পুস্তিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত "বায়ো-ডেটা" আছে, যা তিনি নিজেই লিখেছিলেন এক সময়। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে সমসাময়িক আর একজন প্রতিভাবান সুরকারের বন্ধুত্বের উল্লেখ করি। ইনি হচ্ছেন হিমাংশুকুমার দত্ত। অনাদিকুমার হিমাংশুবাবুর কথা বহুবার লেখকের কাছে

নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। হিমাংশুবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং প্রগাঢ় যত্নে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলন করতেন। এ সম্পর্কে অনাদিকুমারের সঙ্গে তাঁর বহু আলোচনা হত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির আদর্শে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং নিজেও সেই-ভাবে গানের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে স্বরলিপি করতেন।

এই পুস্তিকার সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র। বোধ করি এই পত্রগুলি এর আগে প্রকাশিত হয়নি। এই পত্রগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তার কিছু বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২০ সালে একটি পত্রে তিনি লিখছেন:—

"প্রতি মাসে ১৫টি করে গান শিখতেই হবে, এমন একটা পণ করে রেখো। তাছাড়া স্বরলিপি তোমার এমন অভ্যাস করা কর্তব্য যে বই পড়ার মত স্বরলিপি থেকে যাতে গান গাইতে পার। অর্থাৎ প্রতিদিনই কিছু কিছু স্বরলিপি তোমাকে অভ্যাস করতে হবে।"

ঐ বৎসরই আর একটি পত্রে বাইরে থেকে তিনি লিখছেন:—

"স্বরলিপি এমন শেখা চাই যাতে দেখে দেখে বই পড়ার মত গান গাইতে পার— এদেশে অনেকেই তা পারে, সুতরাং এ কেবল অভ্যাসসাপেক্ষ। আর একটি কাজ করো। দিনুর কাছ থেকে ইংরেজী সঙ্গীতের স্টাফ নোটেশনও শিখে নিয়ো। ঐ নোটেশনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্যে ঐ নোটেশনের দরকার হবে।

......স্বরলিপি যদি তোমার আয়ত্ত হয় তাহলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে লৌকিক সঙ্গীত তুমি সংগ্রহ করে আনতে পারবে—সেই একটি মস্ত বড় কাজ আমাদের সামনে রয়েছে এই কাজের ভার তুমি নেবে বলে সঙ্কল্প কর। যদি একথা তোমার মনে লাগে তাহলে ইতিমধ্যে বিশেষ অধ্যাবসায়ের সঙ্গে তোমাকে সুরের কান দোরস্ত করে নিতে হবে, যাতে অতি সূক্ষ্ম সুরও তুমি শোনবামাত্র ধরে নিতে পার। আমাদের দেশের সঙ্গীতব্যবসায়ীরা সঙ্গীতের মজুরি করে মাত্র, তোমাকে সঙ্গীতের আচার্য হতে হবে—সে রকম কোনো লোকই আজ ভারতবর্ষে নেই।"

১৯২০ সালে যখন স্বরলিপি সম্বন্ধে তেমন আস্থা জাগ্রত হয়নি সেই সময় রবীন্দ্রনাথ স্বরলিপির গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন গানের যথার্থ সুর স্বরলিপিতে রক্ষা করাই একমাত্র সম্ভব। তাই তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। আমাদের ছেলেবেলাতেও আমরা স্বরলিপি সম্বন্ধে অত্যন্ত

যুগ যুগ জীয়ে

সমরেশ বসু

॥ ২ ॥
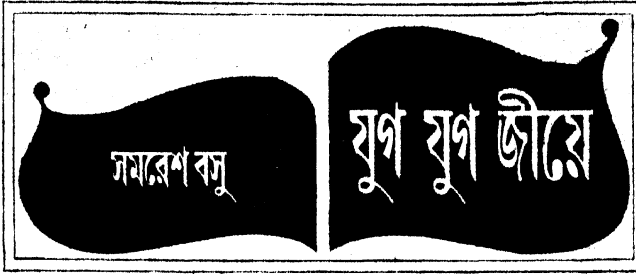
ত্রিদিবেশ ঘাটের দাওয়া থেকে নেমে, নদীর দিকে তাকায়। ফুলবাসিয়া জল থেকে উঠে আসে। তার বুকে এক ভাঁজ ভেজা শাড়ি, এবং কোমরে। উদ্ধত শরীরের সঙ্গে, দৃষ্টির কোনো মিল নেই, অনমনস্ক উদাসী। সহদেব রায়, পার দিকে চলতে আরম্ভ করেন। আড়ুরি হাঁক দেয়, 'ওরে মুখপোড়া, জল থেকে উঠলি? না উঠিস তো, ডুবে মর্, হাড় জুড়োয়।'

ভোলা মাহুর দিকে ফিরে তাকায় না। ফুলবাসিয়া ভোলার দিকে ফিরে চায়। ত্রিদিবেশর চোখে পড়ে, সাহু আর মাঝিরা সবাই একসঙ্গে জড়ো হয়ে, দক্ষিণে মুখ ফিরিয়ে, বিষকাটারির জঙ্গলের দিকে কী দেখে। তাদের সকলের চোখে যেন একটা ভয় আর বিস্ময়। ত্রিদিবেশের কৌতূহল হয়, এগিয়ে যায়। কাছাকাছি গিয়ে ও থমকে দাঁড়ায়। ওর চোখেও ভয় ফোটে এবং বিস্ময়। অবিশ্বাস্য মনে হয় ওর, বিষকাটারির ঝোপের ফাঁকায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। সাপ বেজিতে লড়াই করে। ফণা তোলা গোখরো, গায়ে পিঙ্গল রং নেউল। গোখরা যেন প্রায় লেজে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে নাচিয়ে ফণা দোলায়। বেজি বিদ্যুৎগতিতে ডাইনে বাঁয়ে ফেরে। এখন ওর মানুষকে নিয়ে কোনো ভয় নেই, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। গোখরা ডাইনে হেলে, ছোবল মারে। বেজি লাফিয়ে ওঠে উঁচুতে, ঝাঁপিয়ে পড়ে গোখরার ওপর। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই, আবার দুজনে মুখো-মুখি। গোখরা গর্জায়, তার ফণার নিচে গলার কাছে রক্তের দাগ। বেজির পিঙ্গল লোম খাড়া।

ত্রিদিবেশর মনে হয়, ও পাথরের মূর্তি, সম্মোহিত। সাহু আর মাঝিদের অবস্থাও এক রকম। কেবল সাহুর গলায় শোনা যায়, 'হে বাবা বাসুকি!' তার দু হাত জোড়া, পুজোর ভঙ্গিতে। গোখরা আবার ছোবল মারে। বেজি বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওপরে উঠে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে গোখরার ওপরে। আবার চোখের পলকে সরে যায়। গোখরা একটু নিচু হয়ে আসে, তার ফণার নিচের দু পাশে রক্তের রেখা। দেহখানি একটু শিথিল। বেজি এবার একটু দূরে। কিন্তু চার পা যেন এক বিন্দুতে স্থির, পিঠ উটের মতো উঁচু আর বাঁকা। গোখরা হঠাৎ নিচু হয়ে ডান দিক থেকে ছোবল হানে। বেজি যেন সেই অপেক্ষাতেই ছিল। ঝটিতি শূন্যে লাফ, লক্ষ্যভেদী ঝাঁপ, গোখরার মাথায়, এবং বিদ্যুৎগতিতে সরে যায়। গোখরার বাঁ চোখের পাশে, ফণার মাঝখানে রক্তের দাগ। গোখরার মাথা নত, সে বিষকাটারির ঝোপের দিকে দ্রুত সরে যেতে থাকে। বেজি ঝটিতি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চকিতেই দূরে সরে যায়। গোখরা আবার ফণা তোলে, ফিরে দাঁড়ায়। ওর ফণা চোখ ফণার নিচে গলদেশ রক্তাক্ত।

সাহুর গলায় গোঙানি শোনা যায়, 'হে বাবা বাসুকি, দুজনরা বাঁচাও।'

ত্রিদিবেশ এক পলকের জন্য সাহুর দিকে তাকায়। ও বুঝতে পারে, সাহু গোখরার পক্ষ নিয়েছে, সে বাসুকির ধ্যান করছে; কারণ তার বিশ্বাস গোখরা বাসুকির প্রতীক, যে পৃথিবীকে মাথায় করে রেখেছে। ত্রিদিবেশ আবার ফিরে তাকাবার আগেই, গোখরা ছোবল মারে এবং চকিতে কী ঘটে যায়, বোঝবার আগেই দেখা যায়, বেজির সামনের পায়ের নখ জড়িয়ে গিয়ে গোখরা কুণ্ডলী পাকায়। বেজি পিছনের দু পা এগিয়ে গুটিয়ে যায়, মুহূর্তের মধ্যেই গোখরা ছিটকে পড়ে। তার রক্তাক্ত শরীর শিথিল আর সরলপ্রায়। বেজি ছিটকে পিছনে যায়, আবার তৎক্ষণাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোখরার পেটের দিক একবার দেখা যায়, এবং সে ধীরে চলবার চেষ্টা করে। কিন্তু বেজি তাকে সে সুযোগ দেয় না। নখাগ্র দাঁতের সুদীর্ঘ টানে, পিঠের দিকে লম্বা করে চিরে দেয়। একবার না, বারে বারে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গোখরাকে ছিন্নভিন্ন করতে থাকে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, যেন এই প্রতিজ্ঞায় সে অটল।

সাহু হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে, 'হে বাব

কালু হালদারের মেয়ে না, বুঝলি ?'

প্রতিপক্ষী নরেশ তাড়াতাড়ি আশেপাশে দেখে, ভুরু কুঁচকে বলে, 'একবার বেড় ফেলেছিস বলে ? কিন্তু কালু হালদারের মেয়ের কথা আসছে কেন ?' শেষের কথায় স্বর নেমে যায়।

মোহন অব্যর্থভাবে একটি কালোকে পকেটে পাঠিয়ে হাফপ্যান্টের ওপর স্ট্রাইকার ঘষতে ঘষতে বলে, 'সে তুই ভালোই জানিস, কী বলিস রে সন্টু ?'

পার্টনার সন্টু হেসে নরেশের দিকে তাকায়, ইঁদুরের মতো ছোট ছোট দাঁত বেরিয়ে পড়ে, বলে, 'কালু হালদার যখন গরিলার মতো চারদিকে তাকাতে তাকাতে মেয়েকে ইস্কুলে নিয়ে যায়, নরেশ তখন নেড়িকুত্তার মতো নিজেদের রকের কোণে বসে থাকে।'

শীতল—নরেশের পার্টনার রেগে বলে, 'নেড়িকুত্তা বলছিস কেন ?'

সন্টু আঙুল দিয়ে নরেশকে দেখিয়ে বলে, 'জিজ্ঞেস কর নরেশকে, নেড়িকুত্তার মতো কী না ?'

নরেশকে কেমন বিব্রত আর অসহায় দেখায়। কালো মোটা ওর শরীর, কালো কুচকুচে তেলতেলে চুল। ইতিমধ্যেই মুখে গোঁফ দাড়ি আর গায়ে চুল গজিয়ে গিয়েছে। এ বছর ম্যাট্রিক দেবে। বলে, 'মোটেই নেড়িকুত্তার মতো না। তা বলে কালু হালদারের নাম করছিস কেন। ছোটন পাশের ঘরে লুডো খেলছে, যদি শুনতে পায় ? এদিকে বলাইরাও শুনতে পেলে কী হবে বল দিকিনি ?'

মোহন একটি কালো ঘুঁটিতে ব্যর্থ আঘাত করে স্ট্রাইকার ছেড়ে দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, মল্লিকা বলবো।'

নরেশের দৃষ্টি রীতিমতো ভয়ার্ত। আশেপাশে একবার দেখে ও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে, 'যাঃ শালা, আমি খেলবো না, বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

মোহন তাড়াতাড়ি বলে, 'আচ্ছা, বোস্ বোস্, আর বলবো না।'

নরেশ বসে। শীতল বলে, 'রতনদা দারুণ গাইছে।'

মোহন সামনের ঘরের দিকে উঁকি দিয়ে বলে, 'পন্ডিতদা আমার ওপর খুব রেগে যাবেন।'

সন্টু জিজ্ঞেস করে, 'কেন ?'

মোহন জবাব দেয়, 'কথা ছিল, স্টেশন থেকে আজকের জনযুদ্ধ আমি নিয়ে আসবো। বৃষ্টি দেখে বেরোতে ইচ্ছা করছে না।'

শীতল ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে ওঠে, 'তুই তো আবার এখন কমিউনিস্ট হয়ে গেছিস, ইংরেজের দালাল।'

সন্টু রেগে জিজ্ঞেস করে, 'কমিউনিস্টরা কি ইংরেজের দালাল ?'

শীতল স্ট্রাইকার বসাতে বসাতে বলে, 'সবাই তো তাই বলে। দেশের লোক যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, কমিউনিস্টরা তখন ইংরেজদের সাহায্য করছে।'

মোহন শীতলকে একটা খিস্তি ছুঁড়ে দেয়, তারপর বলে, 'চামচামো করিস না। যা বুঝিস না, তা বলিস না। ফ্যাসিজম কাকে বলে, তা জানিস ?'

শীতলরা সদ্গোপ ও গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, 'চাষামো বললি কেন ? তোদের পার্টি তো চাষা মজুরের পার্টি।'

মোহনও নাকের পাটা ফোলায়, বলে, 'উজবুকের মতো কথা বললে, ওইরকম শুনবি। চাষা মজুরের পার্টি হতে পারে, তোর মতো কংগ্রেসী চাষার পার্টি ওটা না।'

শীতল রীতিমতো চিৎকার করে ওঠে, 'মুখ সামলে কথা বলবি মোহন। তুই আমার বাবা তুলে বলছিস।'

শীতলের বাবা স্থানীয় কংগ্রেসের একজন নেতা, কোর্টের উকীল। শীতল ওর বাবাকে বিশ্বাস করে, বাবার মতামত আর আদর্শকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু মোহন নির্ভীক, ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'তোর বাবা তুলে মোটেই কথা বলি নি আমি। মুখ সামলে আবার কী ? কী করবি তুই আমার ?'

আর একটি বোর্ডে যারা খেলছিল, তাদের মধ্য থেকে রঞ্জন বলে ওঠে, 'এই মোহন, কী হচ্ছে কী ? চন্দরদা বলে দিয়েছে না, এখানে ওসব বাজে বাজে কথা নিয়ে ঝগড়া করা চলবে না ?'

মোহন বলে, 'দ্যাখ না, কথা হচ্ছিল আমার সন্টুর মধ্যে, ও আমাদের ইংরেজের

দালাল বলছে।'

শীতল বলে, 'তুই যে চাষা বললি?'

মোহন জবাব দেয়, 'চাষা বলিনি, চাষামো বলেছি।'

শীতল শান্ত হতে পারে না, বলে, 'কংগ্রেসী চাষা বলার মানে কী?'

মোহন বলে, 'ইংরেজের দালাল বললে, ওসব শুনতে হবে।'

রঞ্জন বলে, 'ছাড় তো ওসব কথা, খেলবি তো খেল।'

মোহন শীতল সন্টু নরেশ, সকলেই একটু গম্ভীর। সকলেই একটু অস্বস্তি বোধ করে। এবার নরেশ প্রথম মুখ খোলে, 'নে শেতল, মার।'

শীতল স্ট্রাইকার বসিয়েছিল, এবার ঘুঁটি তাগ করে। মোহন উঠে দাঁড়ায়। রঞ্জনদের বোর্ডের কাছে বসে সুকুমার খেলা দেখছিল। মোহন ডাকে, 'এই সুকুমার, এখানে আমার জায়গায় বোস তো, আমি চট করে ঘুরে আসছি।'

বলেই ও শীতলের কাঁধে হাত রেখে বলে, 'এই শেতল, তোর সাইকেলটা দিবি? ইস্টিশন থেকে ঘুরে আসছি।'

শীতল মোহনের দিকে কটমট করে তাকায়। বলে, 'কেন, কংগ্রেসী চাষা বলবি না?'

মোহন হেসে বলে, 'কেন রাগ করছিস মাইরি। কাগজ কটা নিয়ে আসি, পন্ডিতদা তা না হলে চটে যাবেন।'

শীতল হাফপ্যান্টের পকেট থেকে দড়িতে বাঁধা একটা চাবি মোহনের দিকে ছুড়ে দেয়। মোহন চাবিটা নিয়ে ছোটে। শীতল বলে, 'শালা খচ্চর!'

সুকুমার মোহনের জায়গায় বসে। সামনের ঘরে রতন তখনো গেয়ে চলে।

*

একেবারে পিছনের ঘরে, চারজন ঘরের এক কোণে, গোল হয়ে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে কী যেন দেখে। মেঝের মাদুরের ওপর লুডোর ঘর পাতা। বোঝা যায়, লুডো খেলা বন্ধ করে, সকলে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ততা আর কিছু না। ওদের হাতে কার্ড সাইজের কয়েকটা ফটো। কোনো সুন্দরী বিদেশিনী, যাকে মেমসাহেব বলে, তার ফটো। গোপনীয়তার কারণ, সুন্দরীর গায়ে কিছু নেই, দুই উরুতের মাঝখানে এক গুচ্ছ ফুল, তার একমাত্র লজ্জা নিবারণ করছে। অভাবনীয়, অভূতপূর্ব, উত্তেজনাকর। সুন্দরীর ঠোঁটে মদির হাসি, নিটোল বুক পেট, কোমর, নাভির দিকে তাকালে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সকলের মুখেই বিন্দু বিন্দু ঘাম। ছোটন, অরুণ, শঙ্কর, বিলু, সকলেরই বয়স চৌদ্দ পনেরোর মধ্যে। দেওয়াল ঘেঁষে আলমারির তলায় প্রথম অরুণের চোখ পড়ে, একটা ময়লা খাম। মুহূর্তে ওর মস্তিষ্কে ঝিলিক হানে। মনে পড়ে যায়, বকুলতলা ক্লাবে কয়েকদিন ধরে, এক অদ্ভুত ভুতুড়ে খেলা চলেছে।

ভুতুড়ে খেলাটা আর কিছু না, এই খাম, আর ছবিগুলো। কে প্রথম এই খাম ক্লাবে আনে কেউ জানে না। ছোটনদের গ্রুপ শুনেছিল, কে কতগুলো খারাপ ছবি ক্লাবে রেখে গিয়েছে। প্রথম আবিষ্কৃত হয়, মাঝের ঘরের জানালায়। প্রথম চোখে পড়ে রঞ্জনের। সে চন্দ্রকান্তকে দেখায়। চন্দ্রকান্ত দেখে বলেছিলেন, যেখানকার জিনিস, সেখানেই থাকবে। অতএব, খাম আবার ফটোসহ জানালায় ফিরে যায়। সেই রাত্রেই খাম উধাও হয়। পরের দিন আবার সামনের ঘরের তাকিয়ার নিচে দেখা যায়। চন্দ্রকান্তের নির্দেশ মতো সেখানেই থাকে। আবার উধাও, আবার ফিরে আসে, এবং কয়েকদিন ধরে আবির্ভাব আর অদৃশ্য হওয়ার খেলা চলছে। কিন্তু কে নিয়ে যায়, কে দেখে, কেউ কারোকে বলে না। যেন কেউ-ই কিছু জানে না।

আজ লুডো খেলতে খেলতে হঠাৎ অরুণের চোখে পড়ে, তৎক্ষণাৎ খারাপ ছবির কানাঘুষো ওর মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে, খেলা ছেড়ে নিচু হয়ে, খামটা টেনে নেয়। খুলতেই ফটো। মেমসাহেবের ফটো, যার নাভির নিচে এক গুচ্ছ ফুল ছাড়া আর কিছু নেই। যে নিজের বুকে নিজের হাত রেখেছে, যে ফুলের গুচ্ছে হাত রেখে, চোখের কোণে তাকিয়ে আছে, যে দু হাত তুলে একটা পা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, ফুলের গুচ্ছের দিকে তাকাতে ভয় করে। ভয়, উত্তেজনা—উত্তেজনা, ভয়, দ্রুত নিশ্বাস, ঘাম।......কে যেন এ ঘরে আসে।

সবাই ছিটকে যায়, অরুণ তাড়াতাড়ি সব ফটো খামে ভরে। ওর হাত কাঁপে। দরজার কাছ থেকে শব্দ ফিরে যায়, কেউ ঢোকে না। অরুণ এক লাফে আলমারির সামনে যায়, পাল্লা খুলে, খাম ঢুকিয়ে দেয়। তারপর চারজনেই লুডোর ছকের চার পাশ ঘিরে বসে। চারজনে চারজনের দিকে তাকায়। অরুণ ছকের ঘুঁটির কৌটো হাতে তুলে নিয়ে বলে, 'খবরদার, কেউ যেন জানতে না পারে।'

কাঁপা হাতে চাল দেয়। কেউ তা দেখে না। ছোটন বলে, 'ওগুলো বিলিতী ছবি, না?'

শঙ্কর জিজ্ঞেস করে, 'কে আনলো এখানে?'

'বলা বারণ, 'চন্দরদাও জানেন না।'

চন্দ্রনাথ হঠাৎ এ ঘরে ঢোকেন। ভুরু কুঁচকে অবাক স্বরে বলেন, 'এ কি, তোরা এখনো খেলছিস? পড়া নেই? সন্ধে হয়ে গেছে তো। কাল তো ইস্কুল আছে।'

তাড়াতাড়ি সবাই উঠে পড়ে। লুডো তুলে না রেখেই সবাই চলে যাওয়ার উদ্যোগ করে।

চন্দ্রনাথ বলেন, 'লুডোর ছক তুলে রেখে যা।'

বলে আবার চলে যান। ওরা তীব্র অপরাধীর মতো, নিজেদের মধ্যে চোখা-চোখি করে। ছোটন লুডো গুটিয়ে তুলতে থাকে। নরেশ ঢোকে। ঢুকে থমকে দাঁড়ায়, সকলের দিকে তাকিয়ে ফিরে যাবার আগে, চোখের কোণে আলমারির তলায় একবার দৃষ্টিপাত করে। আবার ফিরে যায়। ওরা চারজন পরস্পরের দিকে তাকায়, কৌতূহল—সন্দেহ—জিজ্ঞাসা। নরেশের আসা এবং যাওয়া, কোনো কথা না বলা, রীতিমতো সন্দেহজনক।

শঙ্কর বলে ওঠে, 'বুঝলি?'

অরুণ বলে, 'বুঝেছি!'

ছোটন আলমারি খুলে লুডোর ছক রাখে। ওর চোখ চকচক করে। আলমারির পাল্লা খুলে রেখেই, কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে, তারপরেই ফটোর খাম ছোঁ মেরে তুলে নেয়। জামা তুলে, পেটের কাছে প্যান্টের মধ্যে গুঁজে রেখে, সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। অরুণ ডেকে ওঠে, 'ছোটন।'

ছোটন জবাব দেয় না। সামনের ঘর দিয়ে, গলির মধ্যে নেমে, রাস্তায় চলে যায়। বাকী তিনজন ওকে অনুসরণ করে। বাইরে বৃষ্টি—অন্ধকার, ঠুলি পরানো রাস্তার আলোয় কিছুই দেখা যায় না, আকাশে চিকুর হানা ঝিলিকে বাজ ডাকে। দোকান পাটের আলোগুলো টিমটিমে, বাইরে কোনো রেশ পড়ে না। পাড়ার, শান্তি, কারণ শত্রুপক্ষকে সাহায্য করা হয়। চারজন এ আর পি ওয়ার্ডেন বুটের শব্দ তুলে এগিয়ে আসে। একজন হেঁকে ওঠে, 'কী হয়েছে রে ছোটন?'

ছোটন ছুটতে ছুটতে বলে, 'কিছু না।'

চারজন ওয়ার্ডেন দাঁড়িয়ে পড়ে। শঙ্কর অরুণ বিলুকে ছোটনের পিছনে ছুটে যেতে দেখে। এ আর পি ওয়ার্ডেন নরসিং বলে, 'ওদের কোনো খেলা হচ্ছে, চলে আয়।'

দূর থেকে শব্দ ভেসে আসে, 'ছোটন দাঁড়া বলছি, না হলে সব বলে দেব।'

ওয়ার্ডেনরা বুটের শব্দ তুলে হাঁটতে থাকে। ওদের গায়ে বর্ষাতি, মাথায় টুপি। ছোটনের কোনো উত্তর শোনা যায় না।

ক্রমশঃ

॥ কুড়ি ॥

ঝালোয়ারের মহারাজা একদিন তাঁর লণ্ডনের দপ্তর আপাতত গুটিয়ে পারিষদ-বর্গ এবং লোকজন নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে গেলেন। তিনি সম্ভবত কোন একটি জরুরী কাজের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামশঙ্করকে। তা সম্পূর্ণ করতে আরও কিছু সময় লাগবে বলে মহারাজার দল-বলের সঙ্গে শ্যামশঙ্করের দেশে ফেরা হল না। কিছু দিনের জন্যে তিনি থেকে গেলেন লণ্ডনে।

কিন্তু কেনসিংটন গার্ডেনস-এর অত বড় বাড়ি তো আর তাঁর একার জন্যে রাখা যায় না, সুতরাং শ্যামশঙ্কর কেনসিং-টনেই আর এক জায়গায় বাস করতে গেলেন। আর উদয়শঙ্কর চলে এল আর্লস কোর্টে মিস্টার ড্রামণ্ডের বাড়িতে থাকতে।

একটা ঘর পেল সে। আর পাবে প্রাতরাশ আর রাতের খাওয়া। অর্থাৎ ব্রেক-ফাস্ট আর ডিনার। ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিন, এ দেশের নিয়মমত লাঞ্চ বাইরে খেতে হয়। সেটা উদয়শঙ্কর সেরে নেয় তার আর্ট কলেজের কমনরুমে। সেখানে খাবার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

মিস্টার ড্রামণ্ডও একজন শিল্পী। তিনি প্রকৃতির দৃশ্যাবলীই আঁকতে ভাল-বাসেন বেশী। তাঁর স্ত্রী আছে। এক খুড়তুতো বোনও থাকে এ বাড়িতে। ড্রামণ্ডের বাড়ির পরিবেশ বেশ ভালই লাগল উদয়শঙ্করের।

তার আর্লস কোর্টে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন শ্যামশঙ্কর। শিল্পী ড্রামণ্ডের যাতায়াত আছে মহারাজার কাছে। কেননা মহারাজা স্বয়ং শিল্পের ভক্ত। বিদেশী শিল্পীর অনেক ছবি তিনি কেনেন। সেই সূত্রেই ড্রামণ্ডের সঙ্গে শ্যামশঙ্করের পরিচয়। ড্রামণ্ড ঝালোয়ারের মহারাজার কাছে বিক্রি করেছেন তাঁর আঁকা অনেক ভাল ভাল ল্যাণ্ডস্কেপ।

শিল্পী ড্রামণ্ডের বাড়িতে আর্লস কোর্টে থাকতেই এক রাতে উদয়শঙ্কর পড়ল মহা মুশকিলে। সে ফিরেছে একটু দেরি করে। চারপাশ একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে। একটি লোকও নেই রাস্তায়। আলো টিমটিম করছে। চাবিটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। দরজা কিছুতেই খুলতে পারে না উদয়শঙ্কর।

এত রাতে দরজার ঘণ্টা টিপে বাড়ির লোকের ঘুম ভাঙিয়ে বিরক্ত করা খুবই অভদ্রতা। তেমন কেউ করেও না এ দেশে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই গভীর ঘুমে অচেতন ড্রামণ্ড পরিবারের সকলে। এখন কি করবে উদয়শঙ্কর! বারবার চাবি ঘুরিয়ে সে দরজা খোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

এই সময় এই নির্জন পরিবেশে উদয়শঙ্কর অবাক হয়ে দেখল, হঠাৎ কোথা থেকে আর একজন এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। পুলিস। সে তাকে অতি বিনীত স্বরে বলল, "আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি স্যার?"

উদয়শঙ্কর তার বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে নিয়ে চটপট জবাব দিল, "আমি কিছুতেই দরজা খুলতে পারছি না।"

"আপনার চাবিটা আমাকে দিন তো একবার দেখি স্যার—" উদয়শঙ্করের কাছ থেকে চাবি নিয়ে পুলিস ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। দেখে সে-ও দরজা খোলবার চেষ্টা করল। পারল না। তখন পকেট থেকে পুলিস বের করল নানারকম চাবির বড় একটা গোছা। এবং অন্য দু-একটা চাবি ঢুকিয়ে অল্প চেষ্টা করতেই দরজা খুলে গেল।

উদয়শঙ্কর খুশী হয়ে বলল, "অনেক ধন্যবাদ।"

পুলিস তার কাজ করে হেসে চলে গেল। কিন্তু উদয়শঙ্কর বেশ কিছুক্ষ

গজাসুর বধ নৃত্যে উদয় শঙ্কর ও দেবেন্দ্রশঙ্কর

শিবনৃত্যে উদয়শঙ্কর

তার কথা ভুলতে পারল না। সে ভাবছিল তার আকস্মিক আবির্ভাবের কথা। উদয়শঙ্কর চোর-ডাকাত হলে কি তার অবস্থা হত এতক্ষণে!

অঙ্কনবিদ্যায় স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলে রয়্যাল কলেজ অব আর্টসের ক্লাসে খুব মন দিয়ে কাজ করত উদয়শঙ্কর। পাশ্চাত্য শিল্পকলার মূল রীতি-নীতি এবং ভাবধারার পরিচয় সে এর মধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল। তার চোখ ছিল খোলা, মন ছিল জানবার আগ্রহে উন্মুখ।

এখানেও ক্লাসে দাঁড়িয়ে কাজ করতে করতে এক-এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যেত উদয়শঙ্কর। তাঁর মনে পড়ত অম্বিকাচরণের কথা। শিল্পগুরুর মত তিনি এখনো বিরাজ করছেন তার মনে। তাঁকে চিঠিপত্র লেখার কথা প্রায়ই ভাবে উদয়শঙ্কর, কিন্তু শেষ অবধি লেখা আর হয়ে ওঠে না।

এই কলেজের এক ইংরেজ সহপাঠীর সঙ্গে এর মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে উদয়শঙ্করের। তার নাম হিণ্ড ক্লিফ। সে ল্যাঙ্কাশায়ারের ছেলে। লণ্ডনে থেকে শিল্পকলার ক্লাস করে। হিণ্ড ক্লিফের চেহারা বড় সুন্দর। তার চোখ দুটো নীল।

আস্তে আস্তে উদয়শঙ্কর আর হিণ্ড ক্লিফের এত বন্ধুত্ব গেল যে, ওদের সাজপোশাক দেখে সকলে বুঝতে পারত ওদের অন্তরঙ্গতার কথা। দুজনে স্যুটের অর্ডার দিত এক রঙের। জুতো পরত একরকম। দুজনের টাই-এর রঙও এক।

মাসে মাসে উদয়শঙ্কর তার লণ্ডনের খরচ পেত তিরিশ পাউণ্ড। তখনকার দিনে সেটা অনেক টাকা। উদয়শঙ্কর স্যুট করিয়েছিল প্রায় তিরিশটা। এক-একটা স্যুটের জন্যে সে খরচ করত খুব বড়লোকদের মত পাঁচ গিনি অর্থাৎ পাঁচ পাউণ্ড পাঁচ শিলিং। আর স্যুট-টুট সে তৈরি করাতে দিত ওয়েস্ট এণ্ডের দুর্মূল্য বড় বড় দোকানে।

ছেলেবেলা থেকে রাজকুমার আর রাজা-মহারাজা দেখে-দেখে কতগুলো রাজড়ে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল উদয়শঙ্করের। তার মধ্যে একটি হল বিশেষ মার্কা সিগ্রেট সেবন। লণ্ডনে গিয়ে দেশী রাজা-মহারাজারা টানতেন দামী রোজ টিপ্‌ড আবদুল্লা সিগ্রেট। তাঁদের দেখাদেখি উদয়শঙ্করও তাই চালিয়ে যেত মাঝে মাঝে। রোজ টিপ্‌ড আবদুল্লা সিগ্রেট শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ তার গোলাপ-গোলাপ মধুর গন্ধ ভুরভুর করে যেন খেলা করে যেত চারপাশে।

ক্লাসে দাঁড়িয়ে কাজ করতে-করতে একটু আগে একটা সিগ্রেট শেষ করেছে উদয়শঙ্কর। এমন সময় হঠাৎ অধ্যক্ষ স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন এসে ঢুকলেন। তাঁর নাকে লাগল রোজ টিপ্‌ড আবদুল্লার গন্ধ। সম্ভবত এমন মধুর ঘ্রাণ বেশ ভাল করে উপভোগ করবার জন্যে নাক কুঁচকে তিনি পর-পর দু-তিনবার নিশ্বাস নিলেন।

একটু পরে ক্লাসের সব ছাত্রকে উদ্দেশ করে ধীর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "ক্লাসে কে সিগ্রেট খাচ্ছিল?"

কোন উত্তর নেই। ছাত্রছাত্রীরা সব চুপচাপ। এ ওর মুখের দিকে দেখছে। স্যার উইলিয়ম আবার বললেন, "বল, কে?"

এবার বলল উদয়শঙ্কর, "স্যার, আমি স্মোক করছিলাম।"

"তুমি!" স্যার উইলিয়ম কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে খুব নরম সুরে উপদেশ দিলেন উদয়শঙ্করকে, "ক্লাসে সিগ্রেট খাওয়া নিয়ম নেই। কাজটা তুমি ভাল করনি চৌধুরী। যা হোক, আর কখনো ক্লাসে সিগ্রেট-টিগ্রেট খেও না।"

উদয়শঙ্কর মাথা নিচু করে বলল, "আই অ্যাম সরি স্যার। আর কখনো আমি এমন কাজ করব না।"

রদেনস্টাইন তার নম্র বিনয়ী ভাব দেখে খুশী হয়ে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

কিন্তু একটু পরেই একটা বড় মজার ব্যাপার ঘটল। লাঞ্চের সময় হয়েছে। উদয়শঙ্কর বেরিয়ে পড়েছে ক্লাস থেকে। একটু হেঁটে যেতে হয় খাবার ঘরের দিকে। যেতে-যেতে হঠাৎ চমকে উঠল উদয়শঙ্কর। কে যেন পরম বন্ধুর মত একটা হাত রেখেছে তার কাঁধের ওপর। উদয়শঙ্কর ফিরে দেখল তার অধ্যক্ষ, রদেনস্টাইন।

"হ্যালো ওল্ড ম্যান" রদেনস্টাইন হেসে বললেন, "দাও তো প্লীজ তোমার একটা রোজ টিপ্‌ড আবদুল্লা, টেনে দেখি কেমন।"

উদয়শঙ্কর ভীষণ লজ্জা পেয়ে ইতস্তত করতে লাগল। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে অধ্যক্ষ মহাশয়কে দিতে তার হাত উঠল না। তখন স্যার উইলিয়ম তার সব সঙ্কোচ কাটাবার জন্যে আরও অন্তরঙ্গ স্বরে তাকে বললেন, "আরে ওল্ড ম্যান, ব্যাপার কি? দাও প্লীজ—"

তখন অগত্যা সিগ্রেট দিল উদয়শঙ্কর তার অধ্যক্ষ মহাশয়কে। এবং তাঁর অনুরোধে ধরিয়েও দিল। মৌজ করে ধূমপান করতে করতে চলে গেলেন স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন।

শিব পার্বতী নৃত্যে উদয়শঙ্কর ও সিমকী

উদয়শঙ্কর অবাক হয়ে ভাবল, সেই এক লোক—ক্লাসে যিনি তার অধ্যক্ষ, বাইরে তিনি বন্ধুর মত।

শুধু বিশ্বমৈত্রী সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর মুগ্ধ করতেন না অসংখ্য বিদেশী-বিদেশিনীকে, ভারতের সংস্কৃতির একটা রূপও তিনি তাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করতেন নানা সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। লণ্ডনের ছোট বড় হলে এবং প্রেক্ষাগৃহে শ্যামশঙ্করের পরিচালনায় ও প্রযোজনায় মাঝে মাঝে হত এইরকম অনুষ্ঠান।

মূলত নৃত্যই ছিল প্রধান। অংশ গ্রহণ করত ইংরেজ মেয়েরা। মিসেস ড্রামণ্ড ও তার ননদ আসত। তারা নিয়ে আসত তাদের বান্ধবীদের। বান্ধবীরা আনত তাদের চেনাশোনা মেয়েদের। কিছু-কিছু ছেলেও আসত। কি হবে না-হবে তার একটা ধারণা দিতেন শ্যামশঙ্কর। স্চীও তৈরি করতেন। রিহার্স্যাল হত সুবিধমত এখানে-ওখানে—হলে, প্রেক্ষাগৃহে আর বেশির ভাগ সময় শ্যামশঙ্করের ফ্ল্যাটে।

এই সময় তিনি প্রায়ই ডাকতেন উদয়শঙ্করকে। ডেকে বলতেন, "নাচ-টাচ কি হবে একটু দেখিয়ে দে তো খোকা। আর শাড়ি কিংবা ঘাগরা কিভাবে পরবে—মোটামুটি কস্ট্যুম, মুভমেণ্ট, এক্সপ্রেশন—এসব কি রকম হবে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দে মেয়েদের। এ দেশের মেয়ে তো। ভারতবর্ষ কখনো যায়নি। বুঝতে বেশ বেগ পেতে হবে এদের।"

এই রকম একটা কাজ পেয়ে খুব উৎসাহী হয়ে উঠল উদয়শঙ্কর। সে ভেবে-ভেবে বিদেশী মেয়েদের শেখবার চেষ্টা করল তার ছেলেবেলায় দেখা রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের লোকনৃত্য। শাড়ি কিম্বা ঘাগরা কেমন করে পরতে হয় তাও বলে দিল। আর নিজে শিল্পী বলে প্রদর্শনীর সময় সুন্দর করে মঞ্চসজ্জাও করে দিত উদয়শঙ্কর।

আবহসঙ্গীত তা-ও রচনা করত সে-ই। কেননা সব বাজনার ওপরই তার অল্প-বিস্তর দখল ছিল। সে সেতার, হারমোনিয়ম বাজাতে পারে। বাঁশি বাজাতে জানে। পিন্টো সাহেবের কাছে ক্যালোয়ারে বেহালাও শিখেছে কিছুদিন। তবুও এক তবলচি এসে জুটল।

তবলচির নাম রামস্বামী। মোটাসোটা বেঁটে। কুচকুচে কালো তার গায়ের রঙ। বয়েসে উদয়শঙ্করের চেয়ে বেশ বড়। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক রামস্বামী। লণ্ডনে তার দেশী মসলা, আচারের দোকান আছে। আগে তার এই ব্যবসাই ছিল প্যারিসে।

"তারও আগে—" একটু ইতস্তত করে বলে রামস্বামী, "আমি তবলা বাজাতাম মাতাহারির নাচের সঙ্গে।"

"কার নাম বললে?" রামস্বামীকে ব্যাকুল প্রশ্ন করে উদয়শঙ্কর।

"মাতাহারি, মাতাহারি—" রামস্বামী মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, "নাম শোননি বিখ্যাত মহিলা গুপ্তচর মাতাহারির?"

"খুব শুনেছি—" উদয়শঙ্কর আগ্রহ প্রকাশ করে বলে, "তার তো ফাঁসি হয়ে গেছে!"

"হবে না? শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের প্রাণদণ্ডই তো হয়!"

উদয়শঙ্কর রামস্বামীকে ধরে বসে, "কি কি জান বল মাতাহারির গুপ্তচরবৃত্তি সম্বন্ধে? আমার শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।"

"আরে বিশ্বাস কর, আমি কিছুই জানি না—" রামস্বামী অসহায় মানুষের মত বলে, "কোন দিন কল্পনা করতে পারি নি যে, মাতাহারি গুপ্তচর। খুব সুন্দর দেখতে ছিল সে। নটরাজের মূর্তির সামনে নাচত—"

উদয়শঙ্কর কৌতূহল দমন করতে না পেরে রামস্বামীর কথার মাঝেই চঞ্চল হয়ে বলে ওঠে, "তারপর?"

রামস্বামী বলে, "বেশী সময় মাতাহারি থাকত প্যারিসে। অনেক বড় বড় লোক আসত তার নাচ দেখতে। নাচ দেখাবার ছুতো করেই মাঝে মাঝে সে প্যারিসের বাইরে যেত। কোথায় যেত, কেউ জানে না।"

উদয়শঙ্কর আবার বলে, "তারপর?"

রামস্বামী হাসে, "তারপর আর কি? আর তো আমি কিছু জানি না—"

রামস্বামী একটু ভেবে বলে, "কার মুখে যেন শুনেছিলাম মাতাহারির বাবা হল্যাণ্ডের লোক—ওলন্দাজ। আর তার মা ছিলেন বর্মা মুলুকের মেয়ে—মন্দিরের সেবাদাসী। সম্ভবত সেই কারণেই মাতাহারি প্রাচ্যের নৃত্যকলা আয়ত্ত করতে পেরেছিল।"

যা হোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশ্ব-বিখ্যাত মহিলা গুপ্তচর মাতাহারিকে

শিব পার্বতী (নৃত্য স্বপ্ন) নৃত্যে উদয়শঙ্কর, সিমকী ও অন্যান্যরা

মাঝখানে রেখে তবলচি রামস্বামীর সঙ্গে প্রথম থেকেই বেশ ভাব হয়ে গেল উদয়শঙ্করের। শুধু রামস্বামীর সঙ্গে নয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে লণ্ডনের অনেক পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল তার। সকলের কাছ থেকে সে পেত সাদর আমন্ত্রণ—প্রীতি, স্নেহ আর ভালবাসা। তার নম্র স্বভাব, নিরহঙ্কার মন এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্যে লণ্ডনের বহু পরিবারে অতি প্রিয় হয়ে উঠল উদয়শঙ্কর—যেন সে-ও তাদের বাড়ির একজন।

একা থাকলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি সংরক্ষণশীল ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হত না উদয়শঙ্করের, তার যাতায়াতের পথ অনেকটা সুগম হয়েছিল পণ্ডিত শ্যামশঙ্করের জন্যে। তাঁর পরিধি বিশাল। লণ্ডনে তিনি সম্ভ্রান্ত এবং সম্মানিত ভারতীয়। উদয়শঙ্কর তাঁরই সন্তান। সুতরাং বহু বিদেশীর দ্বার তো খোলা থাকবেই তার জন্যে!

সে সময় লণ্ডনের ভারত দপ্তরে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেন। তাঁর স্ত্রী রানী মৃণালিনী উদয়শঙ্করকে ধরে বসলেন, ইণ্ডিয়া ডে-তে তাকে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে লণ্ডনের ওয়েমব্লে স্টেডিয়ামে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ যোগদান করবে এই উৎসবে। এক-এক দেশের জন্যে নির্ধারিত হবে এক-এক দিন। ভারতবর্ষ যেদিন আয়োজন করবে সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের সে-দিনের নাম, ইণ্ডিয়া ডে।

ওয়েমব্লে স্টেডিয়ামে ভারত-দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার বড় বেশী আগ্রহ ছিল আর একজনের। তাঁর নাম লেডী ডোরাবজী টাটা। বলা বাহুল্য, অমিত বিত্তশালী টাটা পরিবারের সঙ্গে সমগ্র য়ুরোপের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। এবং ব্রিটিশ সরকারও যে এই পরিবারের আনুকূল্য স্বীকার করে নিয়েছিল, ডোরাবজী টাটার 'লেডী' উপাধিই তার প্রমাণ।

লেডী ডোরাবজীর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করলেন নির্মলচন্দ্রের স্ত্রী রানী মৃণালিনী সেন। লণ্ডনে তাঁরও বসবাস দীর্ঘ দিনের। এই দুজন মহিলা ধরে নিলেন যে, ভারত-দিবসের অনুষ্ঠানের সাফল্য কিংবা অসাফল্য—সব দায়িত্ব তাঁদেরই। সুতরাং ওয়েমব্লে স্টেডিয়ামের প্রদর্শনীর, উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্যে উদয়শঙ্করের মত একজন সুদর্শন যুবকের প্রয়োজন সব চেয়ে আগে।

লেডী ডোরাবজী এবং রানী মৃণালিনী দুজনেই উদয়শঙ্করকে অনুরোধ করলেন, "তুমি ছাড়া নাচ করবার কোন ইণ্ডিয়ান নেই এখানে। কাজেই ও ভারটা তোমাকেই নিতে হবে।"

উদয়শঙ্কর কিছু সময় অবাক হয়ে থেকে পরে বলল, "দেখুন, নাচ-টাচ তো আমি কখনো করি না। অত লোকের সামনে কি করব! কত ভাল ভাল লোক একজিবিশন দেখতে আসবেন—আমাকে নাচতে দেখলে হাসাহাসি পড়ে যাবে। আপনাদের ফাংশন একেবারে পণ্ড হয়ে যাবে যে মিসেস সেন।"

রাণী মৃণালিনী হেসে বললেন, "তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। ওসব আমরা বুঝব।"

লেডী ডোরাবজী টাটা উদয়শঙ্করকে অভয় দিয়ে বললেন, "ওয়েল, ইয়ং ম্যান, আই আম সিওর যে, তুমি ভালই করবে। তোমার বাবার প্রডাকশন তোমারই জন্যে তো এত সুন্দর হয়। ভারতবর্ষের এত বড় ব্যাপারে একটু সাহায্য করবে না আমাদের?"

উদয়শঙ্কর একটা উচ্ছ্বাসের ঘোরে তখুনি বলে উঠল, "নিশ্চয়ই করব।"

তার কথা শুনে লেডী ডোরাবজী

টাটা ও রানী মৃণালিনী সেন খুশী হয়ে চলে গেলেন।

মুখের কথা তো খসিয়ে দিয়েছে উদয়শঙ্কর যে, সে নাচবে ইণ্ডিয়া ডে-তে ওয়েমব্লে স্টেডিয়ামের প্রদর্শনীতে। কিন্তু কি নাচ নাচবে সে? কার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে মঞ্চে? সময় আর বেশী নেই। কথা যখন দিয়েছেন তখন তাকে তা রাখতেই হবে।

কিন্তু কি করবে সে?

আর্লস কোর্টে শিল্পী ড্রামণ্ডের বাড়িতে ফিরে এসে ভেবে-ভেবে হঠাৎ কিছু ঠিক করতে পারল না উদয়শঙ্কর। জীবনে যত নাচ দেখেছে প্রত্যেকটির কথা সে ভাবল। নফরতপুরের মাতাদীনের কথা তার মনে পড়ল। গাজীপুরের নাওটাংকী, বোম্বাই-এর গরবা—এখন, তার নিজের ক্ষেত্রে কিছুই মনে ধরল না উদয়শঙ্করের। তার নৃত্য হবে একক, লোকনৃত্য নয়। সাজসরঞ্জাম কম হলেই ভাল হয়। বেশী কোথায় পাবে!

কৃষ্ণের আর এক নাম নৃত্যগোপাল। তার কথাও ভাবল উদয়শঙ্কর। তার কানে বেজে উঠল ভজনের কত করুণ সুর, কত মধুর কথা! কিন্তু রাধা বিনা কৃষ্ণ যেন বেশ ম্লান। তাকে রূপ দেওয়ার কথা এখন আর ভাবল না উদয়শঙ্কর।

নটরাজ! শিবের আর এক নাম। আপনভোলা ক্ষ্যাপা এক দেবতা। পরনও তার নামমাত্র বস্ত্র। আপন খেয়ালে নৃত্য করে শিব হিমালয়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায়। হর হর বম বম! শঙ্কর! নটরাজ!

আমি হব শিব! উদশঙ্কর বলল মনে মনে। তার চোখে ফুটে উঠল অভিব্যক্তি। নৃত্যের ভঙ্গিমায় হাত দুটো আন্দোলিত হল আপনা-আপনি।

এইটুকুই আপাতত উদয়শঙ্কর শুধু জানে শিবের বিষয়ে। দেখতে কেমন ছিল শিব? মাথায় জটা, চোখে গভীর ব্যঞ্জনা, গলায় সাপ। রবি বর্মার আঁকা ছবির মতন। উদয়শঙ্করও হয়ে ওঠবার চেষ্টা করবে ঠিক সেই রকম সেইদিন।

ওয়েমব্লে স্টেডিয়ামে দুপুরবেলা শুরু হল ভারত-দিবস। প্রেক্ষাগৃহ ভরে গেছে লোকে লোকে। বড় ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন রানী মৃণালিনী আর লেডী ডোরাবজী। উদয়শঙ্কর শিবের বেশ পরে তৈরী। আর একটু পরেই তাকে যেতে হবে মঞ্চে।

একটা ধুতি অনেকটা তুলে পরেছে উদয়শঙ্কর, শিবের মত।, খালি গা, শিবের মত। এবং মাথার চুলকে সে করেছে শিবের জটার মত। বাস, আর কিছু না।

উদয়শঙ্করের শিবনৃত্যের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবে সেই রামস্বামী। তবলা ছাড়া আর কোন বাজনা বাজবে না। এখানেই রিহার্সাল দিয়ে নিয়েছে। তবুও থেকে থেকে বুক দুপদুপ করছে উদয়শঙ্করের। কি বলবে দর্শকরা।

তার শিবের বেশ দেখে রানী মৃণালিনী প্রশংসা করে বললেন, "ইয়ং শিব লুকস ভেরি হ্যাণ্ডসাম ইনডীড!"

যে ভয়, যে সংকোচ থরথর করছিল উদয়শঙ্করের মনে সকালের অলক্ষ্যে, পরে সে যখন অবতীর্ণ হল মঞ্চে তখন কোন জড়তাই আর রইল না। পর্বতবিহারী মুক্ত স্বচ্ছন্দ শিবের মত উদয়শঙ্কর দাঁড়াল অগণিত দর্শকের সামনে।

রামস্বামীর তবলার দ্রুত তালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে সঞ্চারিত করল তার বাহু। শুরু হল তাণ্ডব। চোখের অভিব্যক্তি ক্রমশ ইঙ্গিতময় করে তোলবার জন্য সে মুখ ফেরাল এদিক-ওদিক, টেনে-টেনে ঝাঁকাল তার দু কাঁধ। একটা ভাবের ঘোরে উদয়শঙ্করের সমস্ত দেহমন লীলায়িত হয়ে উঠল ছন্দের সুষমায়। মঞ্চের ওপর সে থাকল মাত্র সাত মিনিট।

কিন্তু উদয়শঙ্করের সাত মিনিটের শিবনৃত্যের পর মুষলধারে বৃষ্টিপাতের মত দর্শকদের হাততালি যে কতক্ষণ চলেছিল তার কোন হিসেব নেই।

তবে নিজের প্রশংসা শোনবার জন্য উদয়শঙ্কর আর অপেক্ষা করেনি সেখানে, কাজ শেষ করেই জিনিসপত্র গুছিয়ে সে সেদিন সরে পড়েছিল ওয়েমব্লে স্টেডিয়াম থেকে।

সেদিন উদয়শঙ্করের পক্ষে কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব ছিল, শিবনৃত্যের যে অঙ্কুর আজ সবে ফুটে উঠল তার মানসকাননে তা অদূর ভবিষ্যতে এক দিন পল্লবিত হয়ে উঠবে অপরূপ শিল্প-সৃষ্টিতে।

বস্তুত, উদয়শঙ্করই তো অদ্বিতীয় নৃত্যনায়ক, পরবর্তী কালে যার এই শিবনৃত্য দেখে বিদেশী সমালোচক উক্তি করেছিল, "Shankara is Shankara himself".

উদয়শঙ্করের সে-পরিচয়ের আর খুব বেশী দেরি নেই।

(ক্রমশ)

চিত্র প্রদর্শনী

দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে হৃতসর্বস্ব হয়েও যে একটি জাতি আত্মবিশ্বাস ও আপন ঐতিহ্যের ওপর আস্থা রেখে পুনর্জীবন লাভ করতে পারে, বাংলাদেশ তার একটি অকাট্য প্রমাণ। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে একদিকে যেমন শত শত দেশপ্রাণ যুবক স্বাধীনতার যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমন দেশরক্ষার কাজে ব্যাপৃত থেকেও বুদ্ধিজীবি দল সাহিত্য এবং শিল্পরচনার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রেরণা দান করেছেন। স্বাধীনতা লাভ করলেও বাংলাদেশে আজও বহু সমস্যা, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্যিক ও শিল্পীবৃন্দ আপন আপন ক্ষেত্রে নিত্য নতুন ফসল ফলিয়ে চলেছেন। এই দেশের শিল্প চেষ্টার একটি পরিচয় সম্প্রতি পাওয়া গেল। পিকাসোর স্মৃতিকল্পে ঢাকার শিল্পী সংস্থা পেন্টারস গ্রুপ-এর উদ্যোগে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ গ্যালারীতে শিল্পীসভ্যদের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে তরুণ শিল্পী অলক রায়, কে এম এ কাইয়ুম, চন্দ্রশেখর দে, নজরুল ইসলাম, রফিকুল হক, মনসুর-উল করিম ও হাসি চক্রবর্তীর ২৩টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায় ও সেই সঙ্গে থাকে পিকাসোর আঁকা ছয়টি ছবির প্রতিলিপি। এই উপলক্ষে একটি সুন্দর পরিচিতি-পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্যের জন্য পুস্তিকাটি বিশেষ আকর্ষণীয়। পরিচিতি-পুস্তিকার প্রচ্ছদপটে গোয়ের্নিকার প্রতিলিপি ছেপে শিল্পীবৃন্দ যোগ্য কাজই করেছেন। ভূমিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম : "গোয়ের্নিকা" শুধুমাত্র একটি ছবি নয়, গোয়ের্নিকা যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, শান্তির জাগ্রত প্রতীক ......বাংলাদেশ নৃশংস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পেরিয়ে এলো, কোন "গোয়ের্নিকা" আজও প্রকাশ পায়নি। শিল্পীমনে হয়ত ছাপ পড়েছে, এখনও তা রূপ দেয়নি। হয়ত তেমন শিল্পী নেই, সমাজের প্রয়োজন নেই, হয়ত বা আতঙ্ক এখনও কাটেনি। একদিন বাংলাদেশের শিল্পী হয়ত গোয়ের্নিকার চেয়ে শক্তিশালী সৃষ্টি নিয়ে হাজির হবেন।" বলা বাহুল্য, খ্যাতনামা শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার লিখিত ভূমিকার সঙ্গে সকলেই একমত হবেন। পরিচিতি-পুস্তিকায় প্রত্যেক শিল্পীর একটি করে সুনির্বাচিত ছবি প্রকাশিত করে কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, ছবিগুলি দেখে এক একজন শিল্পীর চিন্তাধারা তথা রচনাবৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে।

স্টিল লাইফ —মনসুর-উল করিম

প্রতিলিপিগুলি দেখে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের শিল্পীগণ প্রকৃতিবাদী ও বিশেষ করে আকার নিরপেক্ষ শৈলে নানা রঙের ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়েই বক্তব্য প্রকাশ করতে চান। বাংলাদেশের তরুণ ও উৎসাহী শিল্পীবৃন্দ যে নতুন ও বিচিত্রতর শিল্পসৃষ্টির জন্য সাধনা করে চলেছেন তা রঙ ব্যবহার রীতি দেখে বোঝা যায়। বিশেষ করে রফিকুল হক-এর ইমেজারির প্রধান, চন্দ্রশেখর দে-র বিমূর্ত ও কে এম এ কাইয়ুম-এর গাঢ় রঙের প্রতীকপ্রধান নিদর্শনগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

*

ম্যাক্স ম্যুলর ভবনে শিল্পী মৃন্ময় মুখার্জি ও তপনকুমার বিশ্বাসের শিল্প-

শায়িত তরুণী —মাধব ভট্টাচার্য

দ্বয়ের একটি যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনীতে প্রথম জনের ২৩টি ও দ্বিতীয় জনের ২০টি শিল্প নিদর্শন দেখা গেল। দুজনেই তরুণ, মাত্র ২।৩ বছর আগে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন। মৃন্ময় মুখার্জি এখন আ্যাকাডেমি পরিচালিত স্টুডিওতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের অঙ্কনবিদ্যা শেখান এবং শিল্পী হিসাবে বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও যোগদান করেন। তপন বিশ্বাসও ইতিপূর্বে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, তাছাড়া অন্যান্য প্রদর্শনীতেও তাঁর শিল্পনিদর্শন দেখা গেছে। উভয়েই পশ্চিমবঙ্গ ইয়ং আর্টিস্ট ফেডারেশনের সভ্য। দুই শিল্পী একই স্কুলের ছাত্র হলেও দুজনের কাজে পার্থক্য দেখা যায়। মৃন্ময় মুখার্জির জলরঙে আঁকা দু-একটি নিসর্গ দৃশ্য মন্দ লাগে না, বিশেষ করে লাল ও নীলরঙ সুকৌশলে ব্যবহার করার জন্য দু' একটি চোখে পড়ে, যেমন ৯ নং ল্যান্ডস্কেপ। পুরোভাগে দুটি গাছ ও মধ্যস্থলে দুটি নারীমূর্তি অবলম্বনে লালরঙের পশ্চাৎপটে আঁকা ছবিটির সারল্য সহজেই ধরা পড়ে। কালিকলমের ড্রয়িং নিদর্শন হিসাবে ৩ নং অনেকের চোখে পড়ে। কমপোজিশনগুলির দু-একটিতে শিল্পী সুনীল দাসের কিছু প্রভাব দেখা যায়। শেষ একটি কমপোজিশনের জন্য (১৫ নং) শিল্পী কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন—বিশেষত প্রান্তিক জাতীয় কারুকার্য রচনার জন্য এটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তপন বিশ্বাসের রচনায় বেশ ও বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়। লোকচিত্রভিত্তিক সরল আকারগুলি সূক্ষ্ম রেখায় এঁকে তিনি অবশিষ্ট স্থানটুকু নানা রঙে যোজনা সুষ্ঠুভাবে ভরে ফেলেছেন, ফলে অধিকাংশ ছবির আবেদনে যেন সকলেই সাড়া দেন, যেমন গড়েস কালী। তবে দু' এক স্থানে আবার আকারগুলি তিনি উপযুক্তভাবে অবতারণা করতে পারেননি, যেমন যশোদা ও গোপাল। বলা বাহুল্য গোপালের মধ্যে শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। একটি কমপোজিশন (এ-১৮) অনেকের চোখে পড়ে—পরিকল্পনা ও বিশেষ করে রচনারীতির দুর্বলতা। ড্রয়িং-এর মধ্যে রমণ ও গণ্ডী এবং মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড-এর নাম করা যায়।

*

উত্তর কলকাতায় চিত্রকলা পরিষদের উদ্যোগে বরাহনগরে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ১৭ জন শিল্পীর ৩০টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। উত্তর কলকাতার বাসিন্দাদের শিল্পকলা বিষয়ে অধিকতর সচেতন করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন শিল্পী ও শিল্পপ্রেমিক যুবক তিন বছর আগে, প্রথমভাবে উত্তর কলকাতা চিত্রকলা পরিষদ স্থাপন করেন এবং গত দু' বছর দুটি বার্ষিক প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান করেন। শুধু তাই নয়, গত দু' বছরে পরিষদ কর্তৃপক্ষ দেশের শিল্পকলা বিষয়ে নানা আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করেন এবং দুপেরি চক্ত শিল্পী ও কলাসমালোচকও সেই আলোচনায় যোগদান করেন। এটি পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী। যোগদানকারী শিল্পী তালিকা দেখে বোঝা যায় যে পরিষদের উদ্দেশ্য বহুলাংশে সাধিত হয়েছে, অর্থাৎ এই বার্ষিক প্রদর্শনীটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের কোনও শিল্পনিদর্শন কোনও প্রদর্শনীতে দেখা যেত না, তেমন কয়েকজন শিল্পীও এই প্রদর্শনীতে যোগদান করে নিজেদের শিল্পীসত্তা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। পরিচিত শিল্পীদের অনেকের নিদর্শন প্রদর্শনীতে চোখে পড়ে—তবে অধিকাংশই পুরানো রচনা। তা হোক, ক্ষতি নেই, তবে বেশির ভাগই সুপরিচিত। বিশেষত ধর্মেন্দ্রকুমার চৌধুরী, গণেশ হালুই ও নির্মল দত্তর ছবি দেখে অনেকেই খুশি হন। আলো ও ছায়ার সুন্দর সমাবেশের জন্য প্রথম জনের বনজ্যোৎস্না, হলুদ ও নীলরঙ প্রধান দ্বিতীয় জনের সরলতার প্রতীক দুই বোন ও ইমেজারির চমৎকার নিদর্শন হিসাবে তৃতীয় জনের কম্পোজিশন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিজে কাগজের উপর রঙ ব্যবহার করে কি ধরনের কম্পোজিশন হয় তাঁরা দেখিয়েছেন। অমল চাকলাদার শিল্পী হিসাবে কালাহস্তী—বৃন্দাবনের ভ্রমণপথে রচনা পর্যন্ত দেখে অনেকেই আনন্দ লাভ করেন। কেবলমাত্র নিদর্শন হিসাবে অনেকে সোনার বিস্ফোরক প্রশংসা দাবি করে। ছোট হলেও এটির রচনাবৈচিত্র্য চোখে পড়ে। ছোট বেশ প্রধান রচনার (জীবনপাত্র) মধ্য দিয়ে বিমলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রদর্শনীতে কাঠ ভাস্কর্য নিদর্শনও দেখা যায়। মাধ্যম ব্যবহার বা গঠনপদ্ধতির দিক থেকে বিশেষ কোনও নতুনত্ব না থাকলেও পরিকল্পনার জন্য দু-একটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন মাধব ভট্টাচার্যের শায়িত তরুণী (কাঠ)। এটির সাবলীল ছন্দোবদ্ধ রূপ দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে এই ভাস্করের জ্যামিতিও উল্লেখ্য। ছোট হলেও পরিকল্পনার দিক থেকে বিমল কুণ্ডুর মুখ ও ষাঁড়-এর নাম করা চলে। চন্দ্রনাথ দত্ত-র যুগল-এর (কাঠ) নামও এই প্রসঙ্গে করা যায়, এটির পুতুলজাতীয় সরলতা সহজেই ধরা পড়ে। প্রদর্শনীর অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে কানাই বসুর ভাস্কর্য জাতীয় রচনা টর্সো ২ ও মানব বড়ুয়ার প্রতীকপ্রধান বলিষ্ঠ ড্রয়িং আত্মদর্শন-এর নাম করা চলে।

চিত্রপ্রিয়

কলকাতায় অবৈতনিক ডাচ কনসাল জেনারেল
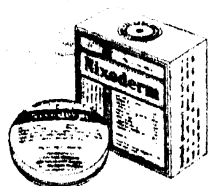
'তিন মেয়ে, স্ত্রী ও একটি ঘোড়া, এই নিয়েই আমার সংসার। বড় মেয়ে সিজনের টপ জকি।'—হাসতে হাসতেই বললেন ফন লেয়ার। আমি কিন্তু হাসতে পারলাম না। হল্যান্ডের অবৈতনিক কনসাল জেনারেল রেসের ঘোড়া রাখেন? এ কেমন কথা?

আমার মুখে বোধ হয় অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ ভঞ্জন করে দিলেন ফন লেয়ার। ঘোড়া আমার ব্যবসা নয় শখ। পরিবারের সবাই ঘোড়া চড়া শিখবে বলে ছোট একটা পানকাবী ঘোড়া কিনেছিলাম, এখন ও-ই আমাদের পরিবারের একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর শেখার কথাই যদি বল, বাপ-মা-মেয়ে সবাই রাইডিং করছি। বড় মেয়ে তো দেখতে দেখতে এত এক্সপার্ট হয়ে উঠলো যে, ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো টালিগঞ্জের অ্যামেচার রেসে।

অ্যামেচার হলেও চতুর্দশী ডাচ দুহিতা ফিলিপিনস যখন টালিগঞ্জের রেসে ঘোড়া ছোটান তখন পেশাদার জকির সঙ্গে তাঁকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু তাঁর বাবা টালিগঞ্জ পেরিয়ে টার্ফ ক্লাবের রেস-কোর্সে যেতে চান না। কারণ, এটা তাঁর কাছে নিছকই স্পোর্টস।

রাইডিং নিয়ে এত কথা হতে ফন লেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম, হল্যান্ডে তোমরা সবাই কি রাইডিং-এর অনুরক্ত? তিনি বললেন—ঠিক ব্রিটিনের মত অতটা নয়। তবে ঘোড়া আমাদেরও খুব প্রিয়।

তোমাদের সব থেকে বড় জাতীয় স্পোর্টস তা হলে কি?

আমার এ প্রশ্নের জবাবে ফন লেয়ার বললেন, ফুটবল। জানো, পর পর তিনবার আমরা 'ইউরোপ কাপে' চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।

খেলার কথা বলতে বলতে তিনি ছোট ছেলের মত উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তাঁর কূটনৈতিক পরিচয় যেন ভুলেই গেলেন। নিজের চেয়ার ছেড়ে আমার কাছে এসে বলতে লাগলেন: ফুটবলে কনটিনেনটের সব দেশের সেরা আমার দেশ। কনটিনেনটাল ট্রফি আজ আমাদের ঘরে।

তুমিও কি ফুটবল খেলতে?—আমার এ প্রশ্নে তাঁর উৎসাহ মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। তিনি ফুটবলার হতে পারেন নি, এ যেন পরম লজ্জার কথা। খুব আস্তে বললেন, 'না, ফুটবল নয়, আমি হকি খেলতাম। তাও তেমন ভালো নয়।'

নিজে প্লেয়ার হতে পারেন নি সেই খেদ মেটাতেই বোধ হয় মেয়েদের স্পোর্টসে পারদর্শী করছেন। কলকাতায় সে সুযোগও আছে। তাই তাঁরা খুব খুশী।

কিন্তু এখানেই হয়েছে মুশকিল। একটু বিব্রতভাবেই বললেন কনসাল জেনারেল। দেখ, আমার বদলির সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। যে-কোন দিন চলে যেতে হবে। কিন্তু আমার মেয়ে ও স্ত্রী কিছুতেই কলকাতা ছেড়ে যেতে চায় না। বলে এত সুন্দর অ্যাসোসিয়েশন, ক্লাব, স্পোর্টস—এ ছেড়ে যাবো না। কি যাদু আছে তোমাদের এ শহরে। বল তো? এলে আর যেতে ইচ্ছা করে না।

আমি প্রশ্ন করলাম, তোমাদের নতরদামের লোকসংখ্যা কত?

—আট লক্ষ।

—আমস্টারডামের?

—দশ লক্ষ।

তা হলে অত কম লোকের শহর থেকে এসে এত ভিড়ের কলকাতায় তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে না?

আমার এ প্রশ্নে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে তিনি জবাব দিলেন: প্রথমে আমরাও তাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম কষ্ট হবে। কিন্তু এসে দেখলাম এ বেশ মজার শহর। পারক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী, লোয়ার সার্কুলার রোড, নিউ আলিপুর—এইটুকু এলাকা নিয়েই আমাদের আসা-যাওয়া থাকা-খাওয়া। এর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গাড়িতে যেতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। আমাদের মেলামেশার খুব সুবিধা। আর যাও তো নিউইয়র্কে! কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হলে তোমাকে এক ঘণ্টা গাড়ি চালাতে হবে।

পাশের দেওয়ালে টাঙানো ছিল একটি ফটো। বড় একটি ইমারতের পাশে খোলার বস্তি, খোলা নর্দমা—কলকাতার টিপিক্যাল চিত্র। ছবিটির দিকে হাত দেখিয়ে বললাম, তা হলে এ ফটো দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছ কেন?

এবার কনসাল জেনারেলকে একটু দ্বিধা করতে হলো। তারপর এলো তাঁর উত্তর: ওটা আমাদের কারখানার ছবি। পাশে দেখছো বস্তি। এ ছবি আমার খুব পছন্দ।

কারণ, এতে যেমন দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের বৈষম্যকে পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি এর একটা ভাবগত অর্থও আছে। তা হলো চেষ্টা করলে এই গরীবি থেকে এই সম্পদে আসা যায়।

ব্যাখ্যাটা নিছক কূটনৈতিক সৌজন্য কিনা মনে মনে তা বোঝবার চেষ্টা করছি, ফন লেয়ার বললেন, "কলকাতাকে ভালো লাগার আর একটা কারণ আছে—তোমরা বাঙালীরা খুব ইজি গোইং।"

বাঙালীর ক্রুদ্ধ মূর্তি কি তুমি দেখো নি? কৌতুকের সঙ্গে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়ে বললাম।

কনসাল জেনারেল আরও অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন—হাঁ হাঁ, তাও দেখেছি। মাঝে মাঝে তোমরা বেশ হট। কিন্তু মজা কি জানো, তোমাদের রাগ ও উত্তেজনা বেশীক্ষণ থাকে না। একটু উত্তাপ বেরিয়ে যেতে দিলেই আবার সেই ঠাণ্ডা ভাবটি এসে পড়ে। তোমাদের এই কলকাতার সঙ্গে যোগও আমাদের আজকের নয়। ব্রিটেনের আগেই ডাচ নাবিকরা এখানে এসেছেন। সমুদ্র মোহনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত ১২০ মাইল গঙ্গা নদীর জাহাজ চলাচল পথের নকশা তৈরিতে তিন শ বছর আগে পর্তুগীজদের মত ডাচ নাবিকদের দানও কম নয়।

কথায় কথায় পুরানো ফাইল ওলটান কনসাল জেনারেল। বলেন, এই সেদিনও হুগলি (গঙ্গা) নদীতে ড্রেজিং করতে গিয়ে ১২ জন ডাচ নাবিক প্রাণ হারিয়েছেন। এই দেখ, তা নিয়ে আমাদের দেশের পারলামেন্টের প্রশ্নোত্তর।

এই বলে ১৩ বছর আগের ডাচ পারলামেন্ট রিপোর্ট টেনে বের করলেন।

সেদিন সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে হল্যান্ডের লোকসভায় তাঁদের মন্ত্রী কলকাতার ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানাচ্ছেন, কলকাতা বন্দর রক্ষার জন্য ডাচ কাটার সাকার ড্রেজার 'লেক ফিতিয়ান' গঙ্গার পলি সরাচ্ছিল ডায়মণ্ডহারবার পেরিয়ে। হঠাৎ ড্রেজটি উল্টে যায়। নিমেষে তলিয়ে যায় জলের নিচে। ১২ জন ডাচ ছাড়াও ১ জন সিংহলী এবং ৪ জন ভারতীয়—মোট এই ১৭ জন মারা যান।

আবার সমুদ্রের কাছে হলদিয়ার জন্য গঙ্গার পলি সরাতে একটি ডাচ ড্রেজিং দল আসছে—এ খবর জানেন কিনা জানতে চাইলে কনসাল জেনারেল বললেন, তাঁরা এখনও খবর পান নি। তবে আসাটা বিচিত্র নয়। দুনিয়ার সর্বত্র আমরা ড্রেজিং করে বেড়াই। তুমি জানো নিশ্চয়ই, আমাদের রটারডাম হল পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় বন্দর।—জাতীয় গৌরবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ৩৭ বছরের এক ডাচ নাগরিকের গৌর আনন।

তিনি বলতে থাকেন, আমরা জলের জীব। দেশটাও অনেকটা তোমাদের মত। চারদিকে খাল, নদীনালা, সমুদ্র। বাংলা দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য খুব বেশী। আমাদের এখানেও বছর বছর বন্যা।

তোমাদের দেশের অনেকটাই তো সমুদ্রের জলস্তর থেকে নিচু। বাঁধ দিয়ে সমুদ্রকে ঠেকিয়ে রেখেছো তোমরা—আমাকে আর শেষ করতে দিলেন না ফন লেয়ার। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ঠেকিয়ে রেখেছো মানে? প্রতি বছর আমরা সমুদ্রকে দূরে সরিয়ে তার জায়গা দখল করে নিচ্ছি। বাঁধ দিয়ে দিয়ে সমুদ্রকে ঠেলে দিচ্ছি। এখন দেশের এক-পঞ্চমাংশই সমুদ্রের লেভেলের নিচে।

এ পর্যন্ত বলেই কি যেন তাঁর মনে পড়ে গেল। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। বইপত্র ঘেঁটে আবার একটি ফাইল বের করলেন। বের করলেন একটি ম্যাপ। ম্যাপটি এনে আমার সামনে মেলে ধরতেই দেখি সেটি হলো আমাদের সুন্দরবনের বিশদ নকশা। অজস্র খাঁড়ির মুখে মুখে সবুজ দাগ দেওয়া।

ম্যাপটি দেখছি, কনসাল জেনারেল তারই মধ্যে উল্টে চলেছেন আর একটি পুরানো ফাইলের পাতার পর পাতা। তারপর ফাইলের একটি পাতা খুলে দিলেন আমার সামনে। বললেন, এই দেখ, তোমাদের গ্রেট ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাদের গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করছেন : যাতে সমুদ্রের লোনা জল ঢুকে সুন্দরবনের জমি আর নষ্ট না হয় তার প্রতিষেধক বাতলাতে। ফাইলের পর ফাইল তিনি দেখাতে থাকেন। আমার চোখের সামনে ১৪ বছরের অতীত যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। দেখতে পাই ১৯৫৯ সাল থেকে ডাঃ রায় একনাগাড়ে চেষ্টা করছেন। চিঠির পর চিঠি—সুন্দরবন বাঁচাও। সমুদ্রের জল ঠেকাও। খাঁড়িগুলির মুখ বন্ধ করে সুন্দরবন উন্নয়ন কর।

এর পর এক ডাচ বিশেষজ্ঞ দল এসে ফিজিবিলিটি স্টাডি করলেন। রিপোর্ট দিলেন। এ পর্যন্ত দেখে আমি কনসাল জেনারেলকে জানালাম, ইদানিং পরে আবার আমাদের সরকার এ নিয়ে তৎপর হয়েছেন।

তাঁর জবাব : হলেই ভাল। আবার ফাইলে ডুব দিলেন। এই দেখ, তোমাদের পাতাল রেল সম্পর্কেও শুরুতে আমরা স্টাডি করেছি। আমাদের রটারডামে কিছু দিন হল পাতাল রেল চলছে। এখন তাকে আরও বাড়াচ্ছি আমরা। আমস্টার্ডামে পাতাল রেলের কাজ চলছে চার বছর ধরে। এখনও শেষ হয় নি। অন্যান্য দেশের মত আমাদের পাতাল রেল পুরানো নয়। কারণ আমাদেরও মাটি তোমাদের মত নরম এবং জলো। দু দেশের অবস্থা এক হওয়ায় আমরা তোমাদের পাতাল রেল সম্পর্কেও খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলাম। শুধু জমি নয়—দীর্ঘকাল পাতাল রেলের কাজে জনবহুল রাস্তা আটক থাকার সমস্যাতেও আমরা আমস্টার্ডামে এবং
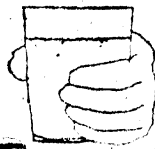
নড়বড়ে দশায় ভুগছি। তোমরাও ভুগবে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, রুশদের সঙ্গে তোমরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছ। তাই আর আগ্রহ দেখালাম না। কিন্তু আমাদেরও কারিগরি জ্ঞান ছিল। ছিল যন্ত্রপাতি।

বলতে বলতেই আবার ফাইল উল্টে অতীতে ফিরে গেলেন ফন লেয়ার। এই দেখ, ডাঃ রায় লবণ হ্রদের কাজেও আমাদের ডেকেছিলেন। আচ্ছা, কেমন লোক ছিলেন তোমাদের এই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়? তাঁর দেখছি কত বড় বড় আইডিয়া। ফাইল খুললেই দেখতে পাই বি সি রায় এবং তাঁর নতুন কাজের স্বপ্ন। হি ওয়াজ এ ম্যান অব আইডিয়া। ফাইলের মাধ্যমেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ হল। ভারতের এক কর্মযোগীর কাজের ও ভাবাদর্শের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন সাগরপারের এক বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার। ডাঃ রায়কে যিনি চোখে দেখেন নি।

কারণ ফন লেয়ার কলকাতা এসেছেন মাত্র চার বছর। ১৯৬১ সালে হল্যান্ডে গ্রাজুয়েট হলেন। তারপরই ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাস্টার ডিগ্রি নিলেন। সঙ্গে কমবিনেশন 'বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।'

আজ আমরা টেকনোক্র্যাট বনাম ব্যুরোক্র্যাট নিয়ে মুখে-সারবিদ দ্বন্দ্ব মশগুল। কে বড় তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। ওরা কিন্তু এ সমস্যার বেশ একটা সমাধান বাতলেছেন। ইঞ্জিনিয়ারদেরই ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং দিয়ে কমপ্লিট কোরস করেছেন। ফলে যাঁরা এভাবে বিশেষজ্ঞ হয়ে বেরোচ্ছেন তাঁরা একাধারে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্টেও দক্ষ হয়ে উঠছেন। ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নিজে কাজ করার জন্যে কারখানা পরিচালনায়ও সুবিধা হচ্ছে।

এজন্যই ফন লেয়ারদের আজ এত চাহিদা। মাস্টার ডিগ্রি নিয়েই তিনি যোগ দেন ফিলিপস কোম্পানিতে হল্যান্ডে। তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে যান বেলজিয়ামে। সেখানে থাকেন এক বছর। তারপর তাঁদেরই প্রতিনিধি হয়ে এখানকার ইলেকট্রিক ল্যাম্প ম্যানুফ্যাকচার (ইন্ডিয়া)র পরিচালনভার নিয়ে আসেন কলকাতায়। এর উপর দু বছর হলো কলকাতায় নেদারল্যান্ডের অবৈতনিক কনসাল জেনারেল। আজ তাঁর দেশে ফিরে যাবার সময় এসেছে।

বিদায় নেবার আগেই তাই এই শহরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা ঘটনার স্মৃতিচারণে ডুবে যান তরুণ ইঞ্জিনিয়ার-পরিচালক শ্রী এ জে ফন লেয়ার। বলেন, দেখ, কত সময় আমাদের নাগরিকরা এখানে কত রকম সমস্যায় পড়েন। কারও টাকা ফুরিয়ে যায়। কেউ কোথাও যেতে চান। যখনই কোন অসুবিধার কথা নিয়ে তোমাদের গভর্নমেন্টের কাছে গিয়েছি আমি পেয়েছি পূর্ণ সহযোগিতা। কনসাল জেনারেল হিসাবে আমার কাজে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু...

এই বলেই থেমে যান ফন লেয়ার। আর বলতে চান না। আমার পীড়াপীড়িতে শেষে খুব কুণ্ঠার সঙ্গে বলেন, কিন্তু বাণিজ্যিক বা ব্যবসাগত কাজে তোমাদের এখানে বড় বেশী নিয়ন্ত্রণ। আমরা আমাদের তারাতলা কারখানা সম্প্রসারণের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম কিন্তু তা নাকচ হয়েছে। সরকার বলেছেন, তোমাদের কারখানা যথেষ্ট বড়।

কথা শেষ করার আগেই কনসালের সেক্রেটারি ঘরে ঢুকলেন। কি যেন বললেন। আমার তখন খেয়াল হলো অনেকটা সময় গড়িয়ে গিয়েছে। উঠতে চাইলাম। কনসাল বললেন, না না বোসো বোসো। তাড়া কি?

সেক্রেটারি বেরিয়ে যেতেই ঘরের রাজা-রানীর ফটোর দিকে হাত দেখালাম তোমাদের দেশের রাজা-রানী?

ফন লেয়ার বললেন, আমাদের রাজা নেই। রানী আছেন ব্রিটেনের মত। উনি হলেন রানী জুলিয়ানা। ওঁর স্বামী জারমান। প্রিন্স বারনহার্ট। এই তো দেড় মাস আগে উনি নিউজিল্যান্ড থেকে ফেরার পথে দমদমে নেমেছিলেন। আমি গিয়েছিলাম অভ্যর্থনা জানাতে। গিয়েছিলেন তোমাদের অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ। প্রিন্স সেদিন চলে গেলেন নেপালে। তিনি যে আবার 'ওয়ারলড ওয়াইলড লাইফ প্রিজার-ভেশন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কিনা। তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে নেপালের রাজার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন।

রাজার গল্প আর থামতেই চায় না। আমি বলি—তোমরাও দেখছি ব্রিটেনের মত রাজ—না না, রানীভক্ত। এদিকে তো বলছ তোমাদের দেশে গণতন্ত্র!

ফন লেয়ার বলেন, ইংলন্ডের মত আমাদের রানীও আনুষ্ঠানিক রানী। হাঁ, ভালো কথা, তুমি কি জানো না আমাদের হল্যান্ডের প্রিন্স উইলিয়াম থ্রি ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড-স্কটল্যান্ডের রাজা হয়েছিলেন। আয়রল্যান্ডের যুদ্ধ জিতেছিলেন। রাজত্ব করেছিলেন ১৭০২ সাল পর্যন্ত।

রাজভক্তিতে ডাচ কিছুতেই ব্রিটেনের পিছু হটবে না!

বিধান সিংহ

ভয়

মানসী দাশগুপ্ত

তেমন মস্ত উঁচু না হলেও বড়ো ফ্ল্যাট বাড়ি, সব মিলে আট-দশটি পরিবার থাকে এদিকে ওদিকে, বার বার বাল্ব চুরির উপদ্রবে সিঁড়িতে অবশ্য কতকটা আলো-আঁধারি রয়ে যায়, অম্বুজাক্ষ প্রথম যখন বউকে এনে বাসায় তুলেছিল, জিজ্ঞাসা করেছিল, গা ছমছম করবে না তোমার একা একা যদি থাকতে হয় খানিক?

পান্টু বলেছিল, ওমা ভয় আবার কিসের? অম্বুজাক্ষর ভাবনার কারণটা সে ধরতে পারেনি তখনো। ভেবেছিল মফঃস্বলের মেয়ে বলে অম্বুজাক্ষ তাকে বাজিয়ে দেখছে। পান্টুর স্বাভাবিক সাহস কিছু বেশিই, আরো বেশি করে দেখিয়েছিল সে, আশে-পাশের কারো সাড়া না নিয়েও যে সে দিব্যি নিজের মনে নির্বিঘ্নে দিন কাটাতে পারবে তা যেমন বড়াই করে বলেছিল, কাজে করেও দেখিয়েছিল তেমনি। ক্রমে অবশ্য অম্বুজাক্ষের ব্যাপারটা জানা হয়েছে তার বউয়ের। কি-সব যেন একটা অস্বস্তি আছে অম্বুজাক্ষের—প্রথম প্রথম মজাই লাগতো তার বউয়ের, তারপর রাগ অভিমান, এখন গা সওয়া হয়ে এসেছে প্রায়। উৎপাত করতে ছেলেপুলেও তো নেই তার, ঘরের মানুষটার একটু আধটু উপদ্রব সইবে এ আর বেশি কথা কী। এ কথাই সে বলে মাঝে মাঝে তাদের নিরিবিলি সংসারের নিত্য-অতিথি অনলকে। নিজেকেও বোঝানো হয় বোধ হয় ওভাবে বলতে বলতে। আর সত্যি কমেছে তো অনেক অস্বস্তি এখন অম্বু-জাক্ষের, শুধু একটা—একটাতে গিয়ে বড্ড ঠেকা ঠেকেছে সে।

এই পরশু সকালেই কথা হয়েছিল একবার, বিকেলে বেরোবার কথা ছিল টাকা নিয়ে, বেরিয়েছে কি বেরোয়নি মনে পড়েনি অম্বুজাক্ষের। কাল তাই সকালেই নিজে হাতে রুমালে গিঁট বেঁধে দিয়েছিল টাকাটা তার বউ। আজ এই রাত্রিকালে খেয়েদেয়ে সবে একটু আয়েশ করে শুতে যাবে বউটা, অম্বুজাক্ষ বলে উঠলো, আচ্ছা, আমি অনলকে টাকাটা ফেরত দিয়েছিলাম কাল?

অম্বুজাক্ষের বউ ভিতর থেকে মশারি গুঁজে নিতে নিতে বললো, নিয়ে তো গেলে আমার কাছ থেকে, তা ধার শোধ দিলে নাকি ঢাকুরিয়া লেকের জলে করকরে নোট দুটো ডুবিয়ে দিয়ে এলে সে কি আর আমি দেখতে গিয়েছি?

এতক্ষণ শুয়ে ছিল অম্বুজাক্ষ, এবারে উঠে বসে বললো, এইরে, কী হবে? আমার পরিষ্কার মনে হচ্ছে দিইনি।

—একবারে পরিষ্কার মনে হচ্ছে? তবে দেখগে দিয়েছ।

—তুমি ঠাট্টা করছো নাকি পান্টু?

অম্বুজাক্ষের বউয়ের হঠাৎ রাগ হয়ে গিয়েছিল একটু, টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে বললো, মাথা খারাপ? তোমার কাতিক নিয়ে ঠাট্টা করবো আমি, বাব্বা, বনবাস হয়ে যাবে না আমার?

অম্বুজাক্ষ গুম হয়ে বসে রইলো। বউ নিজের রাগ নিজেই গিলে ফেলে নরম করে বললো, হ্যাঁগো তা কাল সকালে গিয়ে শুধিয়ে এসো। দিয়ে থাকলে তো অনল ঠাকুরপো মিছে করে বলবেন না যে টাকা পাইনি, সে রকম সম্পর্ক তো তার সংগে তোমার নয়—

অম্বুজাক্ষ বলতে লাগলো, না তা নয়—

তার বউ মটকা মেরে রইলো। এমনিতেই অম্বুজাক্ষের কথা আজ রাতে থামবে কি না, কখন থামবে কে জানে, তার উপরে কথার পিঠে কথা পড়লে মনসার সম্মুখে ধুনোর গন্ধ উঠে ধোঁয়াবে সারা রাত্তির, দু চোখের পাতা আর এক করতে হবে না। ঐ রকমই হয় অম্বুজাক্ষের, কেবলই তার মনে হয় কোন পাওনাদারের দেনা শোধ করা হয়নি, আর সে কথা তার মনে পড়ে নিতান্ত অসময়ে, আচমকা; একবার মনে পড়লে কথাটাকে আর মাথা থেকে বের করতে পারে না সে কিছুতেই। আরো দুটো একটা ছোটখাটো বাতিক তার যা ছিল—যেগুলি গেছে বলে তার বউ খুশি—সেগুলি যাওয়ার পরে এই এক বাতিক দিনে দিনে যেন বেড়ে যাচ্ছে তার। অম্বুজাক্ষ তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে এই বাতিক আর ওই নিজের মস্তো ভারি নাম—এই দুটি চিহ্ন দিয়ে। পল্টু তার ছোট নামটি দিয়ে ঘেরা সংসারী অস্তিত্ব দিয়ে অম্বুজাক্ষকে বুঝতে পারে কিনা কে জানে, সামাল দিতে পারে ঠিকই। কারো কাছে পাছে ধার ধারতে হয় এ ভয় থেকে অম্বুজাক্ষকে বাঁচাবার জন্য পল্টু তাকে পর্যাপ্ত হাত-খরচ দেয় দৈনিক, সমস্ত রকম সম্ভাব্য ধার দেনার দায় থেকে বাঁচায়, কিন্তু অনলকে পেরে ওঠা যায় না। অনল শুধু বন্ধু নয়, দূর সম্পর্কের খুড়তুতো ভাইও হয় অম্বুজাক্ষের। সে প্রায়ই বলা নেই, কওয়া নেই, চারিটি শো কি অমনিই কোনো সিনেমা থিয়েটারের টিকিট গছায়, কিছুতেই কোনো অজুহাত শোনে না, বলে, যখন পারবে দিয়ে দিও দাম। পল্টু মাঝে মাঝে বলেছে, কেন, দেবই এমন কী কথা? কিনে এনেছ টিকিট নিজে দেখবে বলেই তো? —কিন্তু প্রত্যেকবার তো সত্যি তা বলা যায় না। অম্বুজাক্ষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দেখে অনল বলছে, ব্যাপার কি বলো তো অম্বুদা? ভুলে গেলে আমি মনে করিয়ে দেবো। এত ব্যস্ত কেন?

এসব বলে কোনো লাভ হয় তা নয়, এই একটি ব্যাপারে ভালোমানুষ অম্বুজাক্ষ বিষম গোঁয়ার, কোনোবার তর্ক না করে সে ছাড়ে না, বলে, যদি মনে করিয়ে দিলেও মনে না পড়ে?

অনল হ্যা হ্যা করে হাসে, বলে, দিও না তাহলে।

অম্বুজাক্ষের বউ একদিন যোগ দিয়েছিল তাদের কথায়, বলেছিল, ঐ তো, ভয় তো ওইটেই খাতক হয়ে শেষে আসছে জন্মে মহাজনের ধার শুধে মরতে হবে।

অনল বলেছিল, মহাজনেরা পরের জন্মে কী করে খাতককে চিনে বের করে বলো তো বউদি? এ প্রশ্নে কেন যেন ভারি সংকোচ বোধ হয়েছিল অম্বুজাক্ষের বউয়ের। মুখে অবশ্য হেসে বলেছিল, ওমা, তা জানো না, মহাজনেরা মরে সব খাতকের ঘরে ছেলেমেয়ে হয়ে এসে জন্মে যায় যে পটাপট, বিধাতা বন্দোবস্ত করে দেন। বলতে বলতে তার মনে হয়েছিল কে জানে অম্বুজাক্ষ আগের জন্মে কারো কাছে ঋণী হয়ে আসতে পেরেছে কিনা। অনল তার কথার উত্তরে মুখ টিপে হেসে বলেছিল, আসছে জন্মে তবে আমার ভালো বাবা-মা পাওয়ার একটা চান্স আছে বলো অম্বুদা। —তখন এইসব কথা উল্টোপাল্টা ভাবছিল বলে রীতিমত লজ্জা পেতেও ভুলে গিয়েছিল অম্বুজাক্ষের বউ। এখন এই রাত-দুপুরে কথাটা মনে পড়ে গা ছমছম করলো তার, শুধু শুধু কেন কে জানে? তার পাশে বসে অম্বুজাক্ষ ফিসফিসিয়ে আপন মনে বলে যাচ্ছে, বললাম আমার দরকার নেই সেলে-টেলে কেনার, পরে হবে, তা না ঐ এক কথা; নিয়ে যাও বউদির জন্যে এ-জোড়া, যা মানাবে। আচ্ছা, তা তুই দে না, দিতে সাধ চায়, তুই দে, আমাকে দিয়ে দেওয়া করিয়ে ঋণ রেখে মরি এখন।

ঘুমের ভান ত্যাগ করে অম্বুজাক্ষের বউ বললো, ও কাপড় আমি অংগে ঠেকাইনি তো, তুমি দিয়ে দিও ফেরত সকাল বেলায়।

অম্বুজাক্ষ কর্ণপাতও করলো না কথাটায়। সেল সেল বলে যারা ফুটপাথে কাপড় যাচায়, তাদের কাছে তিনদিন আগে কেনা কাপড়—অংগে লাগুক চাই না লাগুক—ফিরিয়ে দিতে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উঠলেও সে চিন্তা মনে স্থান দিতো না অম্বুজাক্ষ। বউকে একজোড়া শাড়ি দেবে কি না এটা তো তার সমস্যা নয়, তার কেন মনে থাকে না অনলের ধার সময় মতো শুধে দেওয়ার কথাটা—এই সমস্যা নিয়েই সে ফের শুয়ে পড়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকে। ঋণ যদি থেকে যায়, পরিশোধে ভুল হয়—কী হবে? বউ গা ঘেঁষে আসছে দেখে সে চমকে সরে এলো মশারির ধারে, নেয়ারের ফাঁক দিয়ে মশা কামড়াবে তাকে, কামড়াক গে, কী মনে করে খানিক পরে বললো, ধারদেনার ঘরে যারা আসে সেসব মানুষ রাগী লোভী হয়, জানো? তারা নিজেরা বাঁচতে আসে না, অন্যকে মারতে আসে, দেখছ না চারদিকে?—এমন গভীর বিশ্বাসের সংগে এ কথাটা অম্বুজাক্ষ বলেনি বউকে আগে, বলতে বলতে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যেন গুরুর দেওয়া গোপনমন্ত্র উচ্চারণ করছে। বলে শুদ্ধ থাকতে হয়, নিজেকে খুব শুদ্ধ রাখতে হয়, তবে সংসার বৃদ্ধির অধিকার হয়।

অম্বুজাক্ষের বউ অন্ধকারে শূন্য-চোখে চেয়ে রইলো। সকালে টাকাটা ফেরত দিয়ে আসতে পারলে কিছুদিন স্বাভাবিক থাকবে অম্বুজাক্ষ, আবার যতদিন না অনল কিংবা অন্য কেউ—না, অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয় অম্বুজাক্ষের সাবধানতার দ[illegible] পেরিয়ে এসে তাকে ঋণী করে যাওয়া। শুধু অনল—জ্ঞাতিশত্রু আবার অম্বুজাক্ষকে বিপন্ন করে। তাহলে আবার রাত্রি জাগবে অম্বুজাক্ষ, সরে যাবে একেবারে বিছানার একপ্রান্তে। একটা নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয় অম্বুজাক্ষের বউ, বাঁ হাতে চাপ পড়ে তার, তবু আর নড়তে ইচ্ছে করে না বলে সেই-ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ে। শোওয়ার দোষেই বোধ হয় খুব খারাপ স্বপ্ন দেখে সে: অন্ধকার রাস্তায় কে যেন পিছু নিয়েছে তার, ভয়ে ভয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে দেখে সামনে লম্বা মত একটা মানুষ ঠিক তার আগে আগে যেন তারই হাত থেকে পালাবার জন্য বেগে হাঁটছে, আর পিছু ফিরে ফিরে দেখছে সে আর কতো দূরে। তার মনে হচ্ছে পিছনে আর সামনে দুটো লোকই আসলে এক, তাহলে

কেন যে সে নিজে পালাচ্ছে কার কাছ থেকে পালাচ্ছে বুঝে উঠবার আগেই অম্বুজাক্ষের বউয়ের ঘুম ভেঙে গেলো, শুনতে পেলো অম্বুজাক্ষ বলছে, শুনছো, ওই দেখো, পালিয়ে গেলো।

বউয়ের বুক টিপটিপ করছিল তখনো ভাঙা স্বপ্নের রেশে; কী পালিয়ে গেল সে বুঝতে পারলো না। উঠে বসে চোখ কচলে দেখলো অম্বুজাক্ষ কাঁদছে। আর যা করুক মনের কষ্টে কেঁদে ফেলেনি এর আগে অম্বুজাক্ষ তার বউয়ের সামনে কোনদিন। বউ ভালো করে বুঝতেই পারলো না তার দুঃস্বপন এখনো চলছে, না সত্যিই সে সকালে জেগে উঠেছে। ঘরভরা রোদ্দুরে মানুষটা কোথায় বলবে 'চা দাও এবার' —অনুযোগ করবে বউয়ের বেলায় ওঠা নিয়ে রোজকার মতো, তা নয় কাঁদছে। খুব আস্তে আস্তে বললো, চা খেয়ে অনল ঠাকুরপোর কাছে যাবে তো?

অম্বুজাক্ষ চোখ মুছে ফেলে ভাঙা গলায় বললো, সেই কথাই তো বলছি, যাচ্ছি এখন হাসপাতালে, ওখান থেকে ওকে ফেরাতে পারবো কি আর—কক্ষনো পারবো না। দেখছ তো কেন কাল আমার মন অস্থির অস্থির করছিল?

—কী? অনল ঠাকুরপো? কী হয়েছে তার?

অম্বুজাক্ষ বললে, স্ট্রোক, আবার কি, বিশ্বাস করবে, বলো? এই বয়সের ছেলে—নিজেকে বিশ্বাস করাতে না পেরেই বোধ হয় বিহ্বল হয়ে কথা থামিয়ে চুপ করে গেল অম্বুজাক্ষ। বউ তার পিঠে হাত রাখলো তাকে শান্ত করার জন্য। সাবধানে সে-ছোঁয়া থেকে সরে গিয়ে অম্বুজাক্ষ বললো, কপালে যা থাকে কেউ খণ্ডাতে পারে না। খবর দিতে এলো লোকটা—আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

অম্বুজাক্ষের বউ আস্তে আস্তে বললো, ভাগ্যিস বিয়ে করেনি, আমরা আবার সবাই বলতাম, করো করো। রাঙাকাকার মেয়ের কথা তো সেদিনও তুলেছিলাম।

অম্বুজাক্ষ দাঁড়িয়ে বললো, করলে হয়তো বউয়ের ভাগ্যে বেঁচে যেতো, বলা যায় কী। এই কি স্ট্রোকের বয়স? বউ নেই মা নেই, কারো পুণ্যি থাকলে এ সব রোগে ধরতে পারতো কি আর?

এমনভাবে কথা বলছে তারা . যেন অনল মরেই গেছে। কে জানে হয়তো গেছে? বউয়ের পুণ্য থাকলে যেতো না? এ সব পুরোনো সংস্কারের কথা . স্বামীর মুখে অন্য সময়ে শুনলে হাসতো অম্বুজাক্ষের বউ এখন হঠাৎ তার কান্না পায়। ওই একটা মানুষ আসতো, আসতো, কথা বলতো, কতকটা যেন ভোলাতো অম্বুজাক্ষকে। ওর বাতিকের উষ্মা সয়েও তাদের সঙ্গ দিতে আমার আর কেউ রইলো না। এত বড়ো বাড়িটায় কতো মানুষ, কারো সঙ্গে তো মোটে মেলামেশা করেনি এতদিন অম্বুজাক্ষ কিংবা তার বউ। অম্বুজাক্ষ বেরিয়ে চলে গেলে আজ এই জনাকীর্ণ শহরের মাঝখানে আঁটোসাঁটো বাড়ির ভিতরে বসে নিজেকে নির্জন অরণ্যে পরিত্যক্ত বোধ হয় অম্বুজাক্ষের বউয়ের। এখন রাত্রি নয়, উজ্জ্বল আলোয় তাদের একখানি ঘর অন্তত সম্পূর্ণ আলোকিত। তবু আর দুটো ছোটো ঘরে—যেখানে দিনের আলোর প্রবেশ কতকটা অল্প—বিদ্যুতের আলো জেবলে দেয় পটু—নিতান্ত অকারণে। গা ভার হয়ে ওঠে তার। দরজায় ঠিকে ঝি টোকা দিলে

শ্মশানে গিয়ে থেমে গেল সে—যদি অনল-ঠাকুরপো এসে থাকে? ভেবে নিজের মনে হালকা করতে চেষ্টা করলো সে কথাটাকে, এসে আসবে, ভীতু হয়ে গেল না কি সে সত্যি শেষকালে? অনল শুনলে কতো হাসতো, হাসতো কেন হাসবে। এ কথা মনে করার কী হয়েছে যে সে নেই, স্ট্রোক তো হয় কতো মানুষের আজকাল. ওর আর বয়স বলেও যেমন কিছু নেই, হলেই লোক মরে যাবে এমন কথাও নেই। তবু, এত মন বুঝিয়েও. রান্নার ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে করে না পণ্টুর একটুও আজ, আজ যেন একটা বিশেষ দিন, ওই যে কী যেন বলে অম্বুজাক্ষ—শুদ্ধ হয়ে. হ্যাঁ, শুদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে হবে অম্বুজাক্ষের বউকে, কিসের জন্যে কে জানে। অম্বুজাক্ষ এলে জানা যাবে। কিংবা হয়তো অনল এলেও—যদি অনল সারে। আর, যদি না সারে? মৃত্যুর পরে সত্যি আর কিছু হয়? সত্যি হয়? মরে গেলে জীর্ণবস্ত্র ছেড়ে যাবে অনল. কোথায় আবার নতুন কাপড় পরবে সে?

নিঃসঙ্গ সকাল যখন মধ্যাহ্নে পৌঁছায়, বসে বসে আপনমনে অম্বুজাক্ষের বউ ভেবে যায় অনল জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে গেছে। কী উপায়ে তার এ নিশ্চিত প্রত্যয় আসে কে জানে। আপনার মনে অনেকক্ষণ কেঁদে নিয়ে সে এক সময়ে উঠে পড়ে, অম্বজাক্ষ ফিরলে তার ছোঁয়ার জন্য আগুনের ব্যবস্থা করতে মালসা খোঁজে। অম্বুজাক্ষ যখন এলো, সন্ধ্যে গড়িয়ে. তখন বউকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বেড়াতে যাওয়ার জন্য তৈরি। স্নান সেরে নতুন কাপড়খানি গায়ে জড়িয়ে সে মালসায় করে আগুন এগিয়ে দিল অম্বুজাক্ষকে শুদ্ধ হয়ে নেওয়ার জন্য, নিমপাতা দিল হাতে ধরিয়ে—দাঁতে কাটবার জন্য। অম্বুজাক্ষ বললো, তোমায় খবর দিয়ে গিয়েছিল ওরা এর মধ্যে আর?

—না. আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অম্বুজাক্ষ নির্দেশ দিল, আমার বিছানার শিয়রে লোহা রেখে দিও।

—ছুঁয়ে বসেছিলে নাকি দেহ?

—না। তা হোক, দিয়ে দিও। নেই নাকি লোহা?

—আমার হাতে আছে নোয়া. ওতেই হবে।

—তোমার হাতে থাকলে আমার কী হবে, আমার শিয়রধারে চাই বললাম না।

অম্বুজাক্ষের বউ উঠে গিয়ে পেরেক ঠোকার ছোট হাতুড়িটি এনে রাখে শয্যা শিয়রে। গুরুদশা তো ঘটেনি অম্বুজাক্ষের, সতর্ক সংযমে রাত কাটানোর প্রয়োজন তার নেই আজ। তবু, তার শিয়রে লোহা চাওয়ার ঘটা দেখে মনে হচ্ছে তাকে এ দুর্বহ অশৌচদশা থেকে মুক্ত করা যাবে না সহজে. অন্তত আজ তো নয়ই। অথচ আজ তাদের মহাজন হাওয়ায় হাওয়ায় অশরীরী হয়ে ভাসছে, তাদের জ্ঞাতি, বন্ধু, নিত্য সঙ্গী অনল আসতে চাইছে তাদের কাছে, তাকে আশ্রয় দেবার দায়িত্ব কি স্বীকার করে নেওয়া উচিত নয় অম্বুজাক্ষের? আজকে সময় বইতে দেওয়া ঠিক হবে না তার। ঘরের বড় আলোগুলি নিবিয়ে দিয়ে নরম মোম জেবলে দিল অম্বুজাক্ষের বউ। ঠান্ডা আলোয় ভরে গেল ঘর।

অম্বুজাক্ষ সায় দিয়ে বললো, থাক বাতি জ্বালানো সারারাত. মোম আছে তো বাড়িতে যথেষ্ট?

তার বউ কথা বললো না, মাথা নেড়ে জানালো, আছে। অম্বুজাক্ষ গলা নামিয়ে বললো, আমার কেবল মনে হচ্ছে ও একবার আসবে।

বউ গলা নামিয়ে বললো, আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয় আসবে।

অম্বুজাক্ষ বললো, ভয় পাচ্ছ নাকি তুমি? ভয় নেই। আমিও ভয় পেয়েছিলাম, জ্ঞাতি, তার উপরে খাতক করে রেখে চলে গেল। খুব ভাবনা হয়েছিল। কথার উত্তেজনায় অম্বুজাক্ষ টের পাচ্ছে না বউ তার কতো কাছটিতে ঘেঁষে এসেছে, কেমন করে চেয়ে আছে তার দিকে। নিজের ঝোঁকে সে বলে যেতে লাগলো, তারপরে শ্মশান-ঘাটে আমায় ভট্টাচার্যমশাই বলে দিলেন পুরো টাকাটা শ্রাদ্ধকৃত্যে খরচ করে দিলে আর দায় রইবে না আমার। ও খরচ তো ওরই দেয়, ছেলে কি মেয়ে কি কাউকে রেখে যায়নি তো ও ওর হয়ে খরচ করবার জন্য? আমি দিলে দেব ওর হয়ে, ব্যস্ত, শোধ হয়ে যাবে। মা গঙ্গা সাক্ষী, এ সব বলেছে. সত্যি না হলে কেন বলবে বলো।

অম্বুজাক্ষের বউ ক্ষীণভাবে বললো, শ্মশানের কাজ যারা করাতে যায় তারা ওরকম বলে অনেক রকম, তুমি তাদের চেয়ে কম বোঝো নাকি? জন্মশোধের ঋণ কখনো ওভাবে মৃত্যুর পরে শোধ হয়?

অম্বুজাক্ষ বউয়ের মুখের দিকে চে[illegible] কী যেন ভাবলো, বললো, হোক না [illegible], শ্রাদ্ধের আগে পর্যন্ত সাবধানে [illegible]কতে হবেই তো। এতোদিনের টান—

বউ তার বুকের কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসে বললো, টানই তো, খরচা ধরে দিলে অমনি বন্ধন সব কেটে যায় কখনো?

অভ্যাসমতো সরে যাবার চেষ্টা করছিল অম্বুজাক্ষ. হঠাৎ বউয়ের বুকে টিপটিপানি টের পেল সে নিজের বুকের পাশে. সত্যি হয়তো ভয় পেয়েছে তার বউটা, ঠেলে দিলে যদি তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়? অম্বুজাক্ষ তাই অপেক্ষা করতে লাগলো কখন বউয়ের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়। বউ বলতে লাগলো, তুমি ভয় পেও না, যা হবার হবেই তো। মহাজনকে ভয় পেয়ে কী হয়? জানো, মহাজন যখন নিতে আসে তখন দেয়ও আবার, জানো?—এমন ফিসফিস করে বলে সে এসব কথা যেন সে ষড়যন্ত্র করছে। কে জানে এ সব কথা পণ্টুই বলছে না, বলাচ্ছে তাকে দিয়ে কোনো বিদেহ শক্তি। অম্বুজাক্ষ পৈতেটাকে কোটের কাছে খুঁজে পেয়ে জপ শুরু করে দেয় পৈতে ধরে। বিপদে জপের আবার সময় অসময় কী?

১৮৯৮ সালে ভারতের কোদাইকানাল অ্যাস্ট্রোফিজিকেল অবজারভেটরি থেকে তোলা সূর্য গ্রহণের ছবি।

সূর্যগ্রহণ
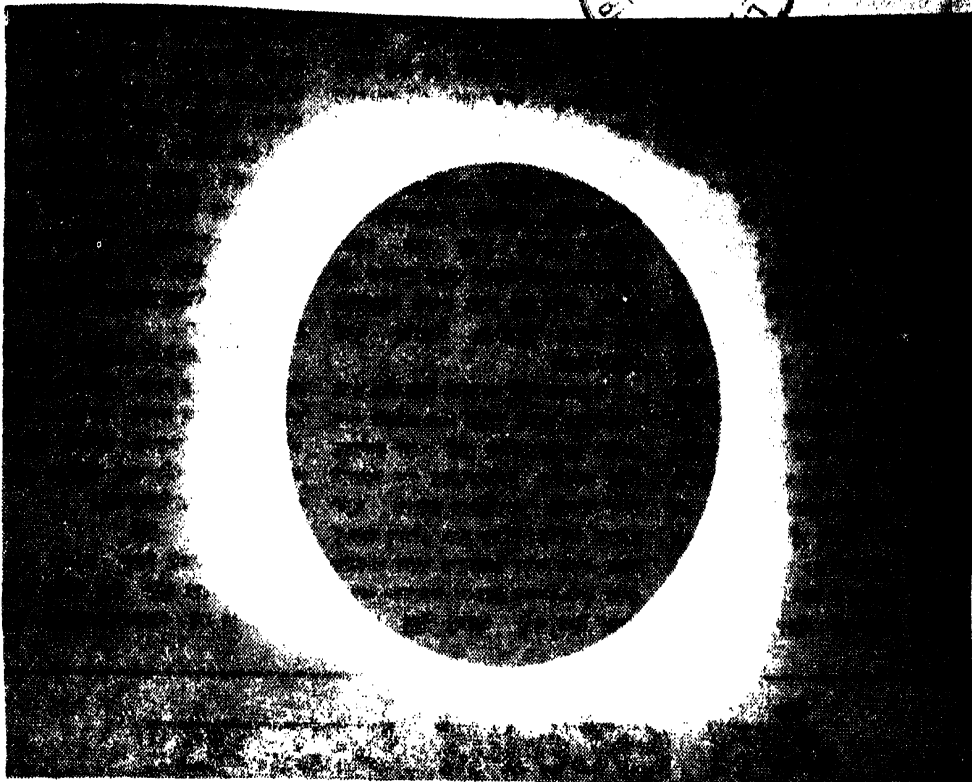
৩০ জুন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী চাঁদ ওইদিন যথা সময়ে পৃথিবী এবং সূর্যের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে এসে সূর্যকে আড়াল করে পরিক্রমন করতে থাকে। এর ফলে যে ছায়া-কোণের সৃষ্টি হয় সেই ছায়া-কোণ পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলকে পুরোপুরি গ্রাস করেছিল। মহাশূন্যের যাত্রাপথে চাঁদ প্রতি মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করে বলে ওই ছায়া-কোণও একটি নির্দিষ্ট গতিতে পৃথিবীর ওই সব অঞ্চলের উপর দিয়ে এগিয়ে যায়। এবং যে যে অঞ্চলের উপর দিয়ে অগ্রসর হয় সেই সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের চোখে সূর্য সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে পড়ে। অবশিষ্ট যে সব অঞ্চলে চাঁদের উপচ্ছায়া গিয়ে পড়ে সে সব অঞ্চলে সূর্যের আংশিক গ্রহণ দেখা দেয়। বলা হয়েছিল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ কেরালা, বোম্বাই প্রভৃতি জায়গা থেকে আংশিক গ্রহণ দেখা যাবে। কিন্তু গ্রহণের সময় কোথাও কোথাও আকাশে মেঘ থাকায় সেই সম্ভব হয়নি। উত্তরাঞ্চলের বিজ্ঞানীরা [illegible] কয়েকটি ছবি তুলতে অবশ্য সক্ষম হয়েছেন। [illegible] বিজ্ঞানীদের হিসেব, এবার পূর্ণগ্রাস গ্রহণের দরুন যে ছায়া-কোণের সৃষ্টি হয় ওই ছায়া-কোণ পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ১৫০০ মাইল বেগে অগ্রসর হয়েছিল। এবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের তীর্থভূমি ছিল পশ্চিম আফ্রিকার [illegible] প্রজাতন্ত্রের একটি প্রাচীন শহর এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের প্রথম সাতটির অন্যতম তীর্থক্ষেত্র চিংগুয়েটি।

না। সূর্যগ্রহণ কোন অলৌকিক অথবা [illegible]-দর্শন ব্যাপার নয়। বছরে কম করেও দুবার সূর্যগ্রহণ ঘটে থাকে। তবে এবারকার সূর্যগ্রহণ অনেকটা ব্যতিক্রম। কারণ এবার পূর্ণগ্রাসের স্থিতিকাল ছিল ৭ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। অর্থাৎ ৭ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সূর্য পুরোপুরি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমান শতাব্দীতে এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী পূর্ণগ্রাসের স্থিতিকাল মাত্র একবারই ঘটেছিল। সেটা ১৯৫৫ সাল। সময় ৭ মিনিট ৭ সেকেণ্ড। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে এ ধরনের গ্রহণ ২১৫০ খৃষ্টাব্দের আগে আর ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই।

এবং এর জন্যেই কৌতূহলী বিজ্ঞানীদের এবার ভিড় হয়েছিল চিংগুয়েটিতে। কারণ মালি, আলজিরিয়া এবং নাইজেরিয়ার ভৌগোলিক সীমার মিলনক্ষেত্র এই চিংগুয়েটি থেকেই পূর্ণগ্রাসের স্থিতাবস্থাকে সবচাইতে বেশি সময় ধরে দেখার কথা আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়। যার অর্থ, একমাত্র এখান থেকেই এবারের গ্রহণ ৭ মিনিট ৪ সেকেণ্ড ধরে পর্যবেক্ষকরা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।

গ্রহণ লাগার কয়েকদিন আগে থেকেই জোর প্রস্তুতি চলছিল। সাহারা মরুভূমির পশ্চিম সীমায় অবস্থিত চিংগুয়েটিতে ভিড় করেছিলেন নানা দেশের বিজ্ঞানী। গ্রীষ্মের প্রকোপ, তাপমাত্রা ১৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, একটা জলের কুয়া খুঁজতে যেখানে এক মাইলেরও বেশি পথ ছুটোছুটি করতে হয়, ঠিক এমন দুঃসহ পরি-

ঘেনাকে উপেক্ষা করে সূর্য রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত হয়ে ছিলেন আগে থেকেই। সব চাইতে বড় দলটি ছিল মার্কিন দেশের। এই দলে কম করেও ১০০ জন পর্যবেক্ষক যোগ দেন। তাঁরা এসেছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগার থেকে। পাছে পর্যবেক্ষণের সময় নৈসর্গিক সুযোগের অভাব হয় তার জন্যে এই দলটিকে দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। একটি দল ছিলেন মরিসানিয়ার নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে। ওঁরা ভেবেছিলেন মরিসানিয়ার শুকনো পরিবেশে গ্রহণের পুরো ব্যাপারটা ভাল-ভাবে দেখা যাবে। কারণ, অনেকেই হয়ত জানেন, শুকনো বাতাস মানেই বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম। এছাড়া শুকনো এবং গরম বাতাসের ঘনত্বও কম হয়। ওই ধরনের বাতাসের মধ্যে দিয়ে চলার সময় আলোর শোষণ হয় কম। ফলে সব কিছুই স্পষ্টভাবে দেখার সম্ভাবনাটাই বেশি। এর জন্যেই মার্কিন দলটি মরিসানিয়ার কথাটা বেশি করে ভেবেছিলেন।

কিন্তু আশংকাও কিছুটা ছিল। কারণ, গত কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত খরার দরুন মরিসানিয়ার ভূ-ভাগ প্রায় জ্বলে পুড়ে শুকনো হয়েছিল আগে থেকেই। ঠিক সেই মুহূর্তক্ষণটি যখন চাঁদের অন্ধকার সূর্যকে গ্রাস করবে, ঠিক তখন পাছে শুকনো ধূলি ধূসর প্রান্তরে ধূলি ঝড় উঠে সমস্ত কিছু ঝাপসা করে ফেলে সেই আশংকার কথা ভেবেই মার্কিন বিজ্ঞানীরা বিকল্প একটি দলকে আফ্রিকার আর এক প্রান্তে পর্য-বেক্ষণের কাজে নিযুক্ত রেখেছিলেন। বিকল্প এই জায়গাটি কেনিয়ার সোইয়েনগাল নির কাছাকাছি রুডলফ হ্রদের পশ্চিম বরাবর অবস্থিত। মানব সভ্যতা থেকে প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে পৌঁছনোর জন্যে যথেষ্ট দুর্ভোগও সহ্য করতে হয়েছিল দ্বিতীয় দলের বিজ্ঞানীদের।

ভাগ্যবান শুধু সাতজন বিজ্ঞানী। ওঁরা এসেছিলেন ফ্রান্স, বৃটেন এবং মার্কিন দেশ থেকে। সুপারসোনিক জেট প্লেন কনকর্ড নিয়ে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের লাস পামাস থেকে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন গ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। চাঁদের ছায়া এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কনকর্ড চেপে আকাশে ওঠেন এবং চলমান ছায়াকে অনুসরণ করতে করতে চিনগুয়েটি পর্যন্ত উড়ে আসেন ঘণ্টায় ১৩০০ মাইল গতিতে। সৌভাগ্যবান এই কারণে বলছি, চাঁদের ছায়া এই ভাবে অনুসরণ করার ফলে, ওই বিজ্ঞানীরা অনেকক্ষণ ধরে সূর্য গ্রহণের উপর পর্যবেক্ষণ চালাতে সক্ষম হন। অবশ্য, গাড়ির হুনে করেছিলেন কম করেও ৮০ মিনিট ধরে ওঁরা সূর্যকে পূর্ণগ্রাস অবস্থায় দেখতে পারেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতটা সময় ধরে দেখা সম্ভব হয়নি। ওঁদের মোট পর্যবেক্ষণ সময় প্রায় পঁচাত্তর মিনিট। বলা বাহুল্য এতটা সময় ধরে এক নাগাড়ে সূর্যগ্রহণের উপর পর্যবেক্ষণের ঘটনা এই প্রথম, এবং সেটা সম্ভব হল একমাত্র দ্রুতগামী কনকর্ড জেট প্লেনেরই কৃপায়।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদন : অনিবার্য কারণে আফ্রিকায় কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষক পাঠান সম্ভব হয়নি। যা কিছু ওঁরা করেছেন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই করেছেন। এবং সেটা শুধু আংশিক গ্রহণের ছবি তোলা আর কিছু নয়।

*

অথচ অনেকেই হয়ত জানেন, সূর্যের মূল রহস্য এবং তার বহু জটিল ব্যাপার সম্পর্কে যে সব খবরাখবর জানার জন্যে

বিজ্ঞানীরা সূর্য গ্রহণের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকেন, আংশিক গ্রহণ সে সব ব্যাপারে তেমন কিছু সাহায্য করে না। একমাত্র পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়ই সূর্যের বহিরাংশের উপর মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব। কারণ, এই সময় সূর্যের চাকতির মত অংশ ফটোস্ফিয়ার বা উজ্জ্বলতম আলোমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আকাশ অপেক্ষাকৃত অনালোকিত হয়। অস্পষ্ট সেই আলোর মাঝখানে দেখা যায় সম্পূর্ণ আবৃত কৃষ্ণকালো সূর্যের পরিমণ্ডল থেকে হাল্কা উজ্জ্বল কতকগুলি অংশ সুতোর মত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের জন্ম সম্ভবত সূর্যের ক্রোমোস্ফিয়ার বা আবহাওয়া মণ্ডলে। হয়ত ওইসব অঞ্চলে ওই আবহাওয়া মণ্ডল থেকে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়া বাষ্পের সমাবেশ ঘটে থাকে। কখনও বা ওই বাষ্প সূর্যের পরিমণ্ডল ছেড়ে বেরিয়ে এসে সেখানকার ঊর্ধ্বাকাশে দশ হাজার মাইল দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ওই বাষ্পের মূল উপাদান, তার চাপ এবং তাপমাত্রা সে সবের উপরে মৌলিক তথ্যাবলী একমাত্র সূর্য গ্রহণের সময়ই ভালভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব।

ইতিপূর্বে কোন কোন পর্যবেক্ষক অন্যান্যবারের সূর্য গ্রহণের সময় লক্ষ্য করেছেন, চাঁদের আড়াল যে মুহূর্তে সূর্যকে স্পর্শ করে, অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় যাকে বলা হয় ছায়া যখন সূর্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে শুরু করে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা আলোর স্ফুলিঙ্গ ওই ছায়ার কাছাকাছি দীপ্ত হয়ে ওঠে। ওই স্ফুলিঙ্গ বা উজ্জ্বল ছটার বর্ণালী পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা সূর্যের আবহাওয়ার মধ্যেকার কিছু কিছু মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের ধারণা, সূর্যের আবহাওয়া মণ্ডলে এমন কিছু কিছু পারমাণবিক কণা বিরাজ করে যাদের ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম। যেমন ধরুন কোন একটি পদার্থের পরমাণুতে স্বাভাবিক অবস্থায় ইলেকট্রন থাকে ত্রিশটি। কিন্তু ওই একই পদার্থের যেসব পরমাণু সূর্যের মধ্যে রয়েছে তাদের মধ্যে ঠিক তেমন ত্রিশটি ইলেকট্রন থাকে না। উদাহরণ : লোহার কথা, সেখানে কিছু কিছু লোহার পরমাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের কারোর মধ্যে নয়টি ইলেকট্রন কম, কারোর দশটি বারোটি বা কখনও কখনও তেরোটি ইলেকট্রন কম, ওই ধরনের কিছু কিছু ক্যালসিয়াম এবং সিলিকনের পরমাণুও সেখানে দেখা গেছে।

বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, কম ইলেকট্রন বিশিষ্ট ওই সব পদার্থের পারমাণবিক চালচলন বিশ্লেষণ করে সূর্য থেকে বিকীর্ণ একস-রশ্মির কার্য কারণ অথবা মাঝে মাঝে সৌরঝড়ের সময় সূর্যে কোন কোন 'অ্যাকটিভ রিজিওন' বা সক্রিয় অঞ্চল থেকে প্রচণ্ড তীব্রতা নিয়ে ঝলকে ঝলকে কেন একস-রশ্মির বিকিরণ ঘটে সে সব সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা সম্ভব হবে। আবহাওয়া বিজ্ঞানী এবং বিশেষ করে দূরপাল্লার বেতার সংকেত নিয়ে যাঁদের কাজ করতে হয়, সূর্য থেকে বিকীর্ণ একস-রশ্মির জন্যে অনেক সময় তাঁদের অসুবিধের পড়তে হয়। কারণ, একথা অনেকেই জানেন একস-রশ্মিকে পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তর শুষে নেয়। শুষে নেয়ার ফলে সেখানকার বাতাস নিরত অয়নিত হয়ে পড়ে। এর জন্যেই ওই বায়ুস্তরের নাম অয়নমণ্ডল। সৌর-ঝটিকার সময় একস-রশ্মির অতিরিক্ত বর্ষণ অয়নমণ্ডলের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। এর ফলে দূরপাল্লার বেতার তরঙ্গ, যাদের বলা হয় মাইক্রোওয়েভ, [illegible] তরঙ্গের চলাচল বিশেষভাবে [illegible]। এ ছাড়াও সূর্য থেকে [illegible] আবহাওয়া মণ্ডলেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সূর্যের একস-রশ্মির বিকিরণের উপর যথাযথ তথ্যাবলী পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর আবহাওয়া, অথবা কখন একস-রশ্মির দরুন দূরপাল্লার বেতার সংকেত বিঘ্নিত হতে পারে সে সম্বন্ধে পূর্বাভাস অনেক আগে থেকে এবং সুষ্ঠুভাবে যোগান সম্ভব হতে পারে।

পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আরও নানা কারণে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। যেমন ধরুন, দীর্ঘকাল ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে আসছেন, তাঁরা নাকি সূর্যে নতুন এক ধরনের মৌলিক

কলকাতা আমার আর ভালো লাগছে না। তাই অনেক দূরে চলে গেলাম। আমি যত দূরেই থাকি, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি। তুমি ভালো থেকো।

—দীপ্তিদি

এ রকম নিরলংকার সাদাসিধে চিঠি তবু সূর্যর মনে হতে লাগলো, এটা যেন হেঁয়ালির ভাষায় লেখা। প্রতিটি অক্ষর সে থেমে থেমে পড়তে লাগলো বারবার, যেন ওদের কোনো আলাদা মানে আছে। এবং সে কল্পনা করার চেষ্টা করলো, কোন অবস্থায় দীপ্তিদি চিঠিখানা লিখেছেন। চেয়ার টেবিলে বসে, না বিছানায় শুয়ে শুয়ে? মাথার চুল খোলা ছিল, না খোঁপা বাঁধা? একবারেই চিঠিটা শেষ করেছেন, না আগে আরো কয়েকটা লিখে ছিঁড়ে ফেলেছেন? এ সব কথা জানা যেন সূর্যর বিশেষ দরকার।

সূর্য বাড়ির প্রধান দরজার কাছে চিঠিখানা হাতে দাঁড়িয়েছিল, এই সময় বাদল ফিরলো। সে জিজ্ঞেস করলো, সূর্যদা, কখন ফিরলে?

সূর্যর সুটকেসটা তার পায়ের কাছে রাখা। সে বললো, এখনো ফিরিনি তো?

—ওটা কার চিঠি?

—দীপ্তিদির।

—তুমি তো দীপ্তিদির সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলে? দেখা হলো না?

—না রে।

সূর্যর মাথাখানা খুবই শান্ত। তার ব্যবহারেও কোনো চাঞ্চল্য নেই। চিঠিখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো। তারপর সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললো, যাই, একটু ঘুরে আসি।

—আবার কোথায় যাচ্ছো?

—জলপাইগুড়ির দিকে যাবো।

—এক্ষুনি? বাড়িতে ঢুকবে না? কিছু খেয়ে টেয়ে যাবে না?

—না।

—কখন ট্রেন?

—সেইটাই তো জানি না। সেই জন্য দেরি করতে পারছি না।

বাদল সূর্যর সঙ্গে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত এলো। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

বাদল ফিরে আসার পর চিররঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কোথায় গেল? তোর সঙ্গেই কথা বলছিল না?

—আবার তো চলে গেল!

—আবার চলে গেল? কোথায়?

—জলপাইগুড়ি।

চিররঞ্জন একেবারে আঁতকে উঠলেন। বললেন, একবার বাড়ির ভেতরে পা-ও দিল না? অনেকগুলো দরকারি কাগজপত্র সই করাতে হবে। এখন এ সব সামলাবে কে? সব উড়েপুড়ে গোল্লায় যাবে! যাক, আমার কি!

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ছ' মাইল দূরে একটা গ্রামের মধ্যে সত্যেন গুহর বাড়ি। বাড়িটাকে তিনি এখন আশ্রম বানিয়ে ফেলেছেন।

সত্যেন গুহ বরাবরই গান্ধীবাদী। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালি সফরে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী নিহত হবার পর তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে সর্বোদয়ের আদর্শ গ্রহণ করেছেন।

তাঁর ভাগ্নী দীপ্তিকে তিনি এক সময়ে অহিংস সত্যাগ্রহে যোগ দেবার জন্যই টেনে এনেছিলেন। আস্তে আস্তে সে অবশ্য গুপ্ত বিপ্লবীদের দলে চলে যায়। সে কথাও অনেক দিন টের পাওয়া যায় নি। টের পেয়ে তিনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। এখন দীপ্তি আবার তাঁর আদর্শ গ্রহণ করার জন্য ফিরে এসেছে বলে তিনি খুব প্রসন্ন।

নিজের বাড়িতেই তিনি একটি আবাসিক প্রাথমিক স্কুল খুলেছেন। ছাত্রেরা অধিকাংশই নিম্নবর্ণের বা অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে এসেছে। খাবার কোনো মাইনে লাগে না, কিন্তু কাজ করতে হয়। সংলগ্ন ক্ষেতে শাক-সবজী চাষ, হাঁস, মুরগী, গরু পালন এবং তাঁতের কাজ—এর থেকেই সব কিছুর খরচ তুলতে হয়। সরকার থেকে কিছু সাহায্যের প্রস্তাব এসেছিল, সত্যেন গুহ তা নিতে চান নি। দেশের মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলাই তাঁর ব্রত।

সারা দিন ধরে মিহিন বাতাসের সঙ্গে উড়ছে বৃষ্টির গুঁড়ো। দূরের পাহাড়গুলোর চূড়া থেকে নেমে আসছে হালকা হালকা মেঘ। রাস্তার দু পাশের গাছগুলি স্নান-স্নিগ্ধ রূপসী। ঝরে পড়া সবুজ পাতা গুঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে গরুর গাড়ি।

একটা গরুর গাড়ি থেকে সূর্য নামলো।

গাড়োয়ানকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে তার নির্দেশিত সরু পথটা ধরে হাঁটতে লাগলো দ্রুত পায়ে। হাতের স্যুটকেসটা খেলাচ্ছলে দোলাচ্ছে।

টিনের বড় ঘরটার সামনের দরজা বন্ধ। সূর্য ডাকাডাকি করলো না। ঘুরে এলো অন্য দিকে। উঠানের চার পাশে কঞ্চির বেড়ার ওপর লকলক করছে মালতী লতা। সূর্য স্যুটকেসটা বেড়ার ওপর রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

দুটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দীপ্তিদি উঠানে বসে কাপড় কাচছিলেন। একটা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে আছেন, সাদা ব্লাউজ, অযত্নে রুখা চুল এসে পড়েছে কপালের ওপরে। এমন সামান্য সাধারণ পোশাক হলেও দীপ্তিদিকে এখানে মনে হয় বিদেশিনী। এই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী রমণী অন্য কোনো দেশ থেকে যেন এখানে বেড়াতে এসেছেন। গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে এত উৎসাহে কাপড় কাচলেও এখনো এই পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে যান নি।

সম্ভবত একটি ছেলের চোখ অনুসরণ করে দীপ্তিদি পেছন ফিরে তাকালেন। সূর্যকে দেখে একটুও চমকে উঠলেন না। ঠাণ্ডাভাবে বললেন, এসো, ঐ দিক দিয়ে ঘুরে এসো, ভেতরে ঢোকার জায়গা আছে।

সূর্য ভেতরে এসে দীপ্তিদির মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে রইলো। দীপ্তিদি একটি ছেলেকে বললেন, এই, ভেতর থেকে একটা মোড়া নিয়ে আয় তো!

ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে একটা মোড়া নিয়ে এসে পেতে দিল। দীপ্তিদি সেটা দেখিয়ে সূর্যকে বললেন, এখানে বৃষ্টির মধ্যে বসবে, না ভেতরে গিয়ে বসবে?

সূর্য বললো, এখানেই বসি।

দীপ্তিদি কাপড় কাচা বন্ধ না করে বললেন, খেয়ে এসেছো?

সূর্য হাসিমুখে বললো, না।

—এখন এই ভর দুপুরে তোমাকে কি খেতে দেবো? এখানে একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত উনুন জ্বলে না।

—তা বলে কি মুড়ি চিঁড়েও কিছু থাকতে নেই?

দীপ্তিদিও এবার হাসিমুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, খুব খিদে পেয়েছে? একটু বসো তা হলে। হাতের কাজটা সেরে নিই।

—এই বৃষ্টির মধ্যে কাপড় কেচে কি লাভ?

—এইটাই নিয়ম। রোজ এখানে এরকম হয়।

—তার মানে, কাজ হোক বা না হোক, নিয়মটা মানতে হবেই।

—নিয়ম মানাটাই তো একটা কাজ।

—একটা কাজ না একমাত্র কাজ?

—কোনো কোনো সময় এইটাই একমাত্র কাজ হওয়া ভালো। নইলে জীবনটা বড় ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

—বাচ্চা দুটোকেও বৃষ্টিতে ভেজাচ্ছো কেন? ওদের যদি অসুখ করে?

—ওরা এত বেশী বৃষ্টিতে ভিজেছে যে, এ জন্য ওদের আর অসুখ হয় না।

—এটাও প্রকৃতির নিয়ম? যারা জীবনে খুব বেশী দুঃখ পায়, তাদের কি দুঃখের অনুভূতি থাকে না?

—দুঃখ তো প্রকৃতি দেয় না। মানুষ নিজে তৈরি করে বেশীর ভাগ সময়।

কাপড়গুলো নিংড়ে তারে মেলে দিতে দিতে দীপ্তিদি বললেন মাথা নাড়া করে তোমাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে।

—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতন? একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল কয়েক দিন আগে।

—প্যান্ট শার্ট পরা সন্ন্যাসী? তোমাকে কক্ষনো সন্ন্যাসী মনে হয় না।

—তা ঠিক।

—তুমি এখানে কেন এসেছো?

—দীপ্তিদি, তুমি জানতে না আমি আসবোই?

—জানতুম। তবু জিজ্ঞেস করছি, কেন এসেছো?

—তোমাকে নিয়ে যেতে।

—তুমি কি জানো যে আমাকে আর নিয়ে যেতে পারবে না?

—না।

—যদি চলেই যাবো তা হলে কলকাতা ছেড়ে চলে এলাম কেন?

—কেন চলে এলে, সে কথা তো বলোনি এখনো?

—আমি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাই।

—অথচ তুমি বলেছিলে, চিঠিতেও লিখেছো, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে।

—তা তো আছিই। কিন্তু তার জন্য কাছাকাছি থাকা দরকার নেই।

—আছে।

—না।

—তুমি বুঝতে পারো না, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়? আমি এক মুহূর্তের জন্য অন্য কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না।

—আস্তে আস্তে অভ্যেস করতে হবে।

—আমি পারবো না।

—তোমাকে পারতেই হবে, সূর্য। কারণ সেইটাই স্বাভাবিক। তুমি এখন যা চাইছো, সেটা স্বাভাবিক নয়।

—মোটেই না!

—সূর্য, এখানে কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না। তুমি যদি বাড়াবাড়ি করো, তা হলে আমাকে এ জায়গা ছেড়ে আরও অনেক দূরে চলে যেতে হবে।

—দীপ্তিদি, তুমি কত দূরে যাবে? তুমি জানো না, তুমি হিমালয়ের শেষে কিংবা কন্যাকুমারিকায় চলে গেলেও আমি তোমাকে সেখানে তাড়া করে যাবো?

দীপ্তিদি হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। মনে হলো, তাঁর চোখে জল এসে গেছে। ধরা গলায় বললেন, তুমি কেন আমাকে এরকম উতলা করে দিচ্ছ? আমি এখানে খুব শান্তিতে আছি।

সূর্য বললো, আমিও এখানে থাকবো। তারপর সে নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো।

(ক্রমশ)

আজকের সৌন্দর্য চর্চায়
অতীত গরিমার ছোঁয়া লাগুক।
শিঙ্গার কুমকুম লাগান
শিঙ্গার কুমকুম - ভারতীয় সৌন্দর্যের প্রতীক
শিঙ্গার সুন্দর সুন্দর কুমকুম তৈরী করে· সোনালী ও রূপোলী থেকে আরম্ভ করে মোট ১৫ রকমের মনোহর রং পাওয়া যায়···যা আপনার সাজ পোষাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে·· আর আপনার মন জয় করে। সিঁদুর পাউডার ও পেস্ট—ম্যাট ও গ্লসী ফিনিশের মধ্যে যা পছন্দ বেছে নিন।
প্যারামাউন্ট প্রডাক্টস্
বোম্বাই-৪০০ ০০৪
শিঙ্গার
everest/595/SP-bn
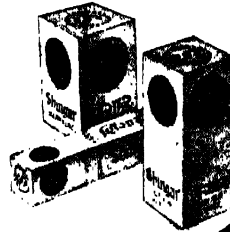
কোরিয়ার কামিনী

উত্তর আর দক্ষিণ—সংবাদ যাই রচনা করুক না কেন, আমাদের কিন্তু কোরিয়ার

কামিনীদের খবরে বেশী আগ্রহ। মহিলা মহলের ঘটনা আমাদের বিশেষ লক্ষ্যসন্ধান তাই কুমারী সু ইয়ং-হি আমাদের কাছে অতি আদরনীয়া। আপত্তি এইটুকু যে, অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য তিনি ভারতে এসেছিলেন। সাংবাদিকদের বললেন, রবীন্দ্রনাথের দেশ তাঁর স্বপ্ন ছিল। গান্ধীর ভূমি পবিত্রতার প্রতীক ছিল। কাজেই টেগোর আর গান্ধীর টানে এসেছেন এখানে। আমরা বললাম "তবে এত কম সময় কেন হাতে?" হয়তো আগামীবারে আর একটু বেশী সময় নিয়ে আসবেন তিনি।

ছোটবেলায় এশিয়ার ম্যাপে কোরিয়া দেখতে মজা লাগতো। পাখীর ঠোঁটের মত উপ-দ্বীপটি যেন চীন আর জাপানের মাঝে সেতু একটি। এই সেতু দিয়ে এশিয়ার ভূমি থেকে যুগে যুগে জাপান বৌদ্ধ ধর্ম কনফুশিয়াসের বাণী গ্রহণ করেছে। কোরিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় ভিক্ষু। মহাযান মিশেছিল কোরিয়ার কৃষ্টিতে আনুমানিক ৩৭২ খৃষ্টাব্দে।

উত্তর দক্ষিণ মিলিয়ে কোরিয়া গ্রেট-ব্রিটেন বা পশ্চিম জার্মানীর কাছাকাছি। দক্ষিণ কোরিয়া আলাদা ধরলে আইস-ল্যাণ্ডের আয়তনের মত হবে। কোরিয়ার জন্মকাহিনী ভারী সুন্দর একটি রূপকথা। স্বর্গের রাজা হোয়ান ইন-এর ছেলে ছিলেন হোয়ান উং। হোয়ান উং কোরিয়ার উত্তর দিকের এক পাহাড়ে নামলেন। তাঁর তিন মন্ত্রী, বৃষ্টি, বাতাস এবং মেঘ—মর্ত্যধামের মানুষকে কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদি শেখালেন। সেকালে এক গুহায় এক বাঘিনী আর ভাল্লুকী থাকতো। তারা হোয়াং উং-এর কাছে বর প্রার্থনা করলো যাতে তারা মানবরূপ ধারণ করতে পারে। রাজা বললেন, একশ' দিন সূর্যালোকে আসবে না, তবেই মানবী হতে পারবে। বাঘিনী বেচারা নিয়ম মানেনি, কিন্তু ভাল্লুকী একশ' দিনের দিন সুন্দরী যুবতী হয়ে গেলো। হোয়াং উং তাকে বিয়ে করলেন। পুত্র সন্তান তাঁদের হ'লেন টান গুণ ওয়াংগম। তিনিই কোরিয়ার মানুষের জনক। সত্য হোক বা না হোক, কোরিয়াবাসী সবাই তাঁর পূজো করে।

টান গুণ ওয়াংগম থেকে কুমারী সু ইয়ং-হি চার হাজার বছরের ইতিহাস।

কিন্তু ইতিহাসের প্রথম প্রভাতেও রমণীর প্রাধান্যের খবর পাওয়া যায়। সিলা রাজ্যের রাণী চিন ডোক আর সন্ ডাক বুদ্ধিমতী বলে পরিচিত ছিলেন। আবার রাণী চিন্সোং-এর দোষে শাসনযন্ত্র বিকল হ'য়েছিল।

কুমারী সু সুন্দরী মহিলা। বয়স অল্প। ১৯৩৯-এর ১০ই ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। ১৯৬১ সালে কোরিয়ার রাজধানী সিউলের এক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। তারপর তাঁর আগ্রহ পড়ে রেডিওতে। ঘোষক এবং রিপোর্টার হিসাবে সিউলে KBS অর্থাৎ কোরিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমে যোগদান করেন। '৬৩ সালে KBS-এর টেলিভিশনে প্রোডিউসার নিযুক্ত হন। তারপর মার্কিন দেশের মিসৌরীতে সাংবাদিকতার শিক্ষা নিতে যান। পরে দেশে ফিরে সাংবাদিকতার অধ্যাপকতা করেছিলেন কিছুদিন। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে জাতীয় অ্যাসেম্বলির অর্থাৎ কোরিয়া পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন।

সু ইয়ং-হি মহিলা আন্দোলনে বিশেষ আগ্রহী। বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভারতের মহিলা আন্দোলনের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। তাঁর বিশ্বাস মেয়েরা রাজনীতিতে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে না বলে তাঁরা এখনও অধিকতর সংখ্যায় এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছে না। ঘর সংসার শিশু সন্তান সামলিয়ে ক'জন বা তেমনভাবে রাজনীতি করতে পারেন?

কোরিয়ার রাজনীতি বা সমাজকল্যাণ—সর্বত্র সু ইয়ং-হির সমান সুনাম। আশা করা যায় উত্তরোত্তর তাঁর উন্নতি তাঁকে দেশের জীবনধারার শীর্ষে নিয়ে যাবে।

ফাউটুকু

মূল্যের বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তার অতিরিক্তটুকুকে আমরা বলি ফাউ। ফাউ পরম উৎসাহদায়ক প্রাপ্য। মনে হয় যেন শত মূল্য দিয়ে যা কেনা যায় তার চেয়ে বেশী। বর্তমান কেনাকাটায় ফাউ হয়েছে incentive। বেশী কিনতে খদ্দেরকে প্ররোচিত করে।

এ প্ররোচনা কিন্তু আজকের নয়। আমার মনে আছে, দার্জিলিংএ একবার কোন এক 'কাটরা' অর্থাৎ সারবন্দী ঘরের অংশ নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে স্বাস্থ্যান্বেষণে গিয়েছিলাম। নীচে পানের দোকান। আহারান্তে এক আনায় দুটি পান মা-বাবার

জন্য কিনতে যেতাম। পানওয়ালা ছোট্ট একটু পানের টুকরোতে মশলা সংযোগ করে আমাকে ফাউ দিত। সেই incentive-এর লোভে বর্ষা, ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে ছুটতাম রোজ তার দোকানে। ফাউ-এর এমনি টান। পানওয়ালার Salesmanship-এর বাহাদুরি বটে।

আমাদের কেনাকাটায় এখন নানা মন ভোলানো ফাউ-এর আগমন সম্বন্ধে সতর্ক হবার সময় এসেছে। প্লাস্টিকের বালতি, মশলার কৌটো ইত্যাদি এসেছে খদ্দেরকে তার ব্যয়ের হিসাব ভুলিয়ে দিতে। আবার কাপড় কাচা গুঁড়োর সঙ্গে চামচ অথবা গায়ে মাখার সাবান সামান্য ফালতু পয়সা দিলে মেলে। ঘরনীরা কি মেপে দেখেন সত্যই তাতে লাভ হয় কিনা। কতটুকু গুঁড়ো কমিয়ে বা দাম কতটা বাড়িয়ে ফালতু পরিবেশনের প্ররোচনা রচিত হয় সে খবর আমরা রাখি কি?

বিদেশের বাজারে বিশেষ করে সুপার মার্কেটের কুপন দেখেছি। কেনাকাটা হিসাব করে কুপন দেওয়া হয়। পরে ওই কুপন দিয়ে আবার কিছু কেনা যায়। সেও এক ধরনের incentive বইকি। তবে তাতে ঠকবার ভয় নেই। যা কিনবেন তার সঙ্গে কোন গোঁজামিল নেই। মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে incentive-এর যোগ কোথায় কিভাবে বিভ্রান্ত করে বলা কঠিন। এমনও দেখছি, বাজারে যে কোন একটি জিনিসের মূল্য যেন কমেছে। পরম আনন্দে কিনে আনলাম। ও হরি, ঘরে ফিরে মোড়ক খুলে মনে হয় আয়তনে এবং ওজনে জিনিসটি প্রায় অর্ধেক! এ ধরনের নয়ন-ভোলানো মায়া যে মাত্র ছোটখাটো ব্যাপারী চালাচ্ছে তা' নয়। মস্ত সব নামকরা প্রতিষ্ঠান নিত্য নূতন ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করছে। বিভ্রান্ত খদ্দেরের হবারই কথা।

ফাউ পাওয়া মন্দ নয়। ফাউটুকু সত্যি ফাউ কিনা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। বাজার অর্থনীতির মস্ত বড় অঙ্গ। গৃহস্থালির টানাটানির বাজেট নিয়ে ঘরনীরা যখন বিপর্যস্ত তখন বাজার করবার সময় মনে রাখবেন কোন্ ইন্দ্রজাল কতটুকু কপটতা আর কতটু সত্য।

টুকিটাকি

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা রাখুন। দরকার বোধ করবার আগেই ডেন্টিস্টকে মাঝে মধ্যে দাঁত দেখাবেন। সুন্দর সুস্থ দাঁত রূপসীর রূপকে তাজা রাখে।

শরীরের যত্ন হঠাৎ একদিন নেওয়া যায় না। নিত্য স্নানের মতই শরীর ভাল রাখার জন্য যা করণীয় তা' নিত্য করবেন। রূপ-চর্চাও নিত্য করণীয়। অবহেলার দাম আখেরে দিতে হয়।

মাথা ঘষা নিয়মিত দরকার। চুল চট চট করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। তার আগেই ঘষে ফেলবেন।

রাতের ঘুম আপনার ত্বককে সজীব রাখতে সাহায্য করবে। যদি কোন কারণে রাত জাগা দরকার হয়, পরে সে ঘুম পুষিয়ে নেবেন। একদিন দেরিতে শুতে গেলে, পরদিন সময়মত বিছানায় যাবেন।

বই বা ম্যাগাজিন পড়বার সময় চিবুক বা থুতনি নীচু করে রাখবেন না। তাতে থুতনির তলায় ভাঁজ চট করে হবে না। double chin থেকে বাঁচবার এ একটি উপায়।

রাতে মুখের সমস্ত প্রসাধনী সযত্নে তুলে ফেলে মুখহাত ধুয়ে বিছানায় যাবেন। ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে বিবর্ণ মলিন প্রসাধন প্রলেপ কখনই রাতের বিশ্রামের সময় রাখবেন না। ত্বকের লোমকূপ তাতে আবর্জনার আকর হয়।

সপ্তাহে একবার আপনার চিরুণী এবং যদি ব্রাশ ব্যবহার করেন তবে ব্রাশ পরিষ্কারক বস্তু অর্থাৎ detergent দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। তারপর হালকা বীজানুনাশক মিশ্রিত জলে ডুবিয়ে শুকিয়ে নেবেন।

কড়া রোদ বা অত্যন্ত গরম hair drier ব্যবহার করবেন না। তাতে চুল বিবর্ণ, নির্জীব দেখাবে। চুলের স্বাস্থ্যও খারাপ হবে। চুলের তেলাক্ত পদার্থ কমে যাবে, রুক্ষ দেখাবে আপনার কেশসজ্জা।

শ্রীমতী

রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমাদের উন্নয়ন সমস্যা

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ বিভাগের প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে যে ১৯৭২-৭৩ সালে ভারতের অভূতপূর্ব রপ্তানি বৃদ্ধি হয়েছে। এই তথ্য অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ হয়েছে ১৮৮০ কোটি টাকা; ১৯৭১-৭২ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৬০৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এই তথ্য অনুযায়ী এক বছরে রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ২৭৪ কোটি টাকা। যদি এই তথ্য প্রকৃতই ঠিক হয়ে থাকে তবে ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে ১৫৪ কোটি টাকা বেশি হয়েছে; কারণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ ধরেছিলেন ১৭৬০ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ ১৭ শতাংশ হারে বাড়বে বলে ধরা হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে অর্থাৎ চতুর্থ যোজনা শুরু হবার আগের বছর আমাদের রপ্তানির পরিমাণ ১৩ শতাংশ বেড়েছিল; তারপর থেকে এ বছরের মত আর কোন বছর রপ্তানি এত বাড়েনি বলে জানা গেছে। যদি এ বছর রপ্তানি প্রকৃতই ১৭ শতাংশ বেড়ে থাকে তবে চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার প্রথম চার বছরে রপ্তানির পরিমাণ গড়ে ৮ শতাংশ বেড়েছে বলে ধরা যেতে পারে।

কিন্তু, প্রকৃতই কি রপ্তানির পরিমাণ ১৮৮০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে? সরকারী মহল এখনও এ বিষয়ে নীরব। এই নীরবতার কারণ বুঝতে অসুবিধা নেই। দু বছর আগে এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত পরিসংখ্যান এবং রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার সংগৃহীত পরিসংখ্যানের মধ্যে বিস্তর গরমিল দেখা গিয়েছিল। সেজন্য ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ কত হয়েছে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুধু এ কথাই বলা হয়েছে যে ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ ১৭৬০ কোটি টাকার লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে।

যে জিনিসগুলির রপ্তানির পরিমাণ গত বছর খুব বেড়েছে তার মধ্যে আছে সামুদ্রিক জিনিস (যার পরিমাণ ১৯৭১-৭২ সালে ৪১ কোটি টাকা থেকে ১৯৭২-৭৩ সালে ৭১ কোটি টাকা পর্যন্ত বেড়েছে) কাজু বাদাম, বস্ত্র সামগ্রী, চামড়া এবং পরিশোধিত চামড়ার জিনিস। চামড়া ও চামড়াজাত জিনিসের দাম বিশ্বের সর্বত্র বেড়ে যাওয়ায় ভারতেরও এক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্য অনেক বেড়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রীর রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে বটে—তবে তা আশানুরূপ নয়। ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যাবার আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। যদিও বাংলাদেশে যা রপ্তানি করা হয়েছে তার একটি বড় অংশ হল সাহায্য বাবদ রপ্তানি, তবুও তা বাদ দেওয়ার পরেও ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ যা বেড়েছে তা মোটেই উপেক্ষনীয় নয়।

সম্প্রতি লণ্ডনে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে বৃটেনের মন্ত্রী মিঃ রিচার্ড উড বলেছেন, ভারতের বর্তমান আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে রপ্তানি বাড়াবার দিকে আরও বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার প্রাথমিক খসড়ায় রপ্তানির পরিমাণ ৭ শতাংশ হারে বাড়বে বলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা করতে পারি চতুর্থ যোজনায় যদি ৭ শতাংশ হারে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব হয়, তবে পঞ্চম যোজনায়ও ৭ শতাংশ হারে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব না হওয়ার কোন কারণ নেই। মিঃ রিচার্ড উড যে কথা বলেছেন তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে অগ্রসর হতে হলে যে কোন উন্নতিকামী দেশকেই সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবার উপর বেশি নির্ভর করতে হয়। এই আলোচনা-চক্রে নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর টিনবারজেন ভারতের পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার প্রতি যেভাবে পদক্ষেপ করা হচ্ছে তা ঠিকই হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার সার্থক রূপায়ণের জন্য আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রকল্পগুলি আরও জোরদার করতেই হবে। ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে সেটা খুবেই আশার কথা।

কিন্তু যে বৈদেশিক মুদ্রা আমরা অর্জন করেছি তার একটি বড় অংশ এ বছর খাদ্য-সামগ্রী আমদানির জন্য খরচ করতে হবে। যদি কৃষি-উৎপাদন আমরা আরও বাড়াতে পারি তবে চূড়ান্ত পর্যায় রপ্তানির পরিমাণও বাড়বে এবং আমদানির পরিমাণও কমবে। সেই সঙ্গে কলকারখানায়ও উৎপাদন বাড়াবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো দরকার। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তা ঠেকাতে হলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবার জন্য জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।

ইউরোপের কোন কোন দেশে এবং এশিয়ায় প্রধানত জাপানে আমরা রপ্তানিচলিত উন্নয়ন (export-led growth) দেখতে পেয়েছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইটালির দ্রুত উন্নয়ন রপ্তানি-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। পশ্চিম জার্মানী যে এখন পশ্চিম ইউরোপে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে তা-ও রপ্তানি সম্প্রসারণের দরুনই সম্ভব হয়েছে। জাপান যে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন অর্জন করতে পেরেছে তা একদিকে যেমন রপ্তানি সম্প্রসারণের দরুন সম্ভব হয়েছে অপর দিকে তেমনি কৃষি, বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের যুগপৎ উন্নয়নও এজন্য বিশেষভাবে দায়ী। অথচ জাপান বা পশ্চিম জার্মানীতে আমরা আমাদের দেশের মত অথবা অন্য কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেখতে পাই না। আমাদের দেশে যখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে তখন পরিকল্পিত উপায়েই আমরা অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে এগোতে পারি। এজন্য যে শর্তগুলি পূরণ হওয়া দরকার তার মধ্যে একটি হল রপ্তানি সম্প্রসারণের হার খুব উঁচুতে রাখা। কিন্তু তা ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আছে যেগুলি পূরণ করা না হলে আমাদের পক্ষে উন্নয়নহার দ্রুত বাড়ানো সম্ভব নয়। তার মধ্যে আছে, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রুত বাড়ানো, আমদানির বিকল্প জিনিস যতদূর সম্ভব বেশি করে তৈরি করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো, দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ আরও সুসংহত করে জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়ানো এবং মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। দেশের শিল্পগুলির বর্তমান উৎপাদনী শক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারলে এবং নতুন শিল্প প্রকল্পগুলিকে যতদূর সম্ভব শ্রম-নিবিড় (labour intensive) করতে পারলে বেকার সমস্যার মোকাবিলায় আমরা কিছুটা এগোতে পারব। এজন্য ভোগ-সামগ্রী উৎপাদন, উৎপাদক সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য—সব-কিছুরই একটি সুসংহত কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার এবং এই কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্য দেশের ভিতরেই যতটা সম্ভব আর্থিক সম্পদ আহরণ করা দরকার। সরকারী উদ্যোগগুলির ব্যয়ের মাত্রা আরও কমাতে পারলে আর্থিক সম্পদ আরও বেশি আহরিত হতে পারে। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাবহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণও কমানো অসম্ভব কিছু নয়। দেশের লক্ষ্য যদি হয় সুষম উন্নয়ন অর্জন করা, তবে উন্নয়ন কর্মসূচীর একটির সঙ্গে অপরগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। দেশের খরা পরিস্থিতি হয়ত ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হলে যা করা দরকার তা হল উৎপাদন বাড়ানো এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যেই যোজনায় সার্থক রূপায়ণ করা।

সুব্রত গুপ্ত

নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র

'দেশ'-এর ৩৩ সংখ্যায় 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' নামে একটি সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়েছে। এর নায়ক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু।

অষ্টাশি বছরের প্রবীণ বৈজ্ঞানিক স্মৃতিচারণ করতে বসেছেন। শ্রীসুদেব রায় চৌধুরী তাই আমাদের উপহার দিয়েছেন।

কিন্তু মনে হয়, একটি ক্ষেত্রে ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বয়সের ভারে প্রতারিত হয়েছেন।

ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা সম্পর্কে কিছু বললে তাকে যথেষ্ট প্রামাণ্য মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু আমরা আপাতত বিপরীত সাক্ষ্য দেয় এমন কতকগুলি তথ্যের তাপে তাপিত। আর এই তথ্যগুলি আহৃত এমন একখানি গ্রন্থে যাকে অস্বীকার করা সহজ নয়। গ্রন্থখানির রচয়িতা অধ্যাপক শংকরী-প্রসাদ বসু, গবেষণামূলক রচনায় যিনি বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর লেখা 'নিবেদিতা লোকমাতা' আকারে এবং প্রকারে গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বলেছেন, "এক সময় মামার ইংরেজীতে বিভিন্ন লেখাগুলি পড়ে অনেকে আড়ালে সন্দেহ প্রকাশ করতেন নিবেদিতাই এগুলি লিখে দিয়েছেন। তার একটা কারণ ছিল। মামা বেশির ভাগ লেখা-পড়ার কাজ বাগবাজার বোসপাড়ায় নিবেদিতার ওখানে বসেই করতেন। এই সন্দেহের নিরসন হল দীর্ঘ আট বছর পর ১৯১৯ সনে।"

লক্ষণীয়, এত দিন ধরে একটি নিতান্তই অমূলক সন্দেহ অনেকের মনেই বদ্ধমূল ছিল এবং তা এক দিনেই হঠাৎই অপ্রমাণিত হয়ে গেল।

ডঃ দেবেন্দ্রমোহনের জবানিতে ঘটনাটি এই : "ওই বছরে কলকাতায় একটি আলোচনা-চক্রে 'লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং বিইংস' সম্পর্কে জগদীশ বসু ইংরেজীতে যে ভাষণ দেন তা সত্যিই উপস্থিত শ্রোতা-দের মুগ্ধ করেছিল। সহজ, সরল, সুন্দর, সুস্পষ্ট সেই বক্তৃতাই প্রমাণ করে দিল যে, জগদীশচন্দ্র এ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছেন তা তাঁর নিজেরই।"

প্রমাণ করতে ঠিক পারেনি। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে এ জাতীয় সন্দেহ অমূলক হলে অনেকের মনেই বদ্ধমূল হয়ে থাকে না, আর থাকলেও এক দিনের ঐ ঘটনাতেই তা ফুৎকারে অপ্রমাণিত হয় না।

কিন্তু ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বলেছেন, এবং ডঃ দেবেন্দ্রমোহন অষ্টাশি বছরের প্রবীণ বৈজ্ঞানিক, জগদীশচন্দ্রের স্নেহধন্য পুত্রতুল্য ভাগিনেয়।

'অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের ৫৯২ পৃষ্ঠার পর পর-

পর কয়েকখানি চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। তারই পঞ্চম চিত্র জগদীশচন্দ্র বসুর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা। তা নিবেদিতারই হাতের লেখা। জগদীশচন্দ্রের লেখাও ছিল উল্টো পিঠে, কিন্তু তা কেটে দেওয়া।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার নেপথ্যে নিবেদিতার অবদান সম্পর্কে অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু বলেছেন : "সে প্রয়াস নানামুখী। ডঃ বসুর জন্য চাকুরি সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ, বন্ধু সংগ্রহ, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে অংশগ্রহণ, সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে প্রচার—সব কিছু তাঁর কর্মতালিকার অংশ হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি তিনি বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে উপযুক্ত ভাষায় লিখে দিতে শুরু করেছিলেন।" [৬১৫ পৃঃ]

জগদীশচন্দ্রের Plant Response (১৯০৬) গ্রন্থ প্রসঙ্গে : "জগদীশচন্দ্রের এই দ্বিতীয় কীর্তির প্রতি পৃষ্ঠায় যাঁর হস্তাক্ষর, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয় নি মুদ্রিত অক্ষরে, কারণ তা করলে মিথ্যাচার করা হত। এই গ্রন্থ যতখানি জগদীশচন্দ্রের ততখানিই নিবেদিতার—অন্তত অনুভূতির দিক থেকে। নিবেদিতা গ্রন্থটিকে (এবং গ্রন্থগুলিকে) 'আমাদের বই' বলেছেন। আবিষ্কার অংশ জগদীশ-চন্দ্রের, প্রেরণার প্রধান অংশ নিবেদিতার, রচনাংশ তাঁরই, নকশা প্রভৃতিও বহুলাংশে তিনিই করেছেন, প্রকাশের এবং প্রচারের ব্যবস্থাতে তাঁরই মুখ্য ভূমিকা।" [৬৬০ পৃঃ]

নিবেদিতার লেখা কয়েকখানি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ :

১। "এখন যদি বোটানি বইটি লিখে ফেলতে পারা যায়! তারপর আমরা আবার ফিজিক্স-এ ফিরে যেতে পারব।" [৬৬৭ পৃঃ]

২। "যে পর্যন্ত আমরা প্ল্যান্ট রেসপন্স লিখেছি সে অবধি তার বাইরে কোনো কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।" [৬৮৪ পৃঃ]

৩। "গত এক বছর ধরে আমরা যা লিখেছি তা একেবারে বোমা! প্রায় মাসে মাসে একটি করে পেপার।......ভেবে আনন্দ হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতের দান তার মূল রূপে যেমন তেমনি লেখার প্রকাশের ক্ষেত্রেও সামান্যতম ত্রুটিযুক্ত থাকবে না। এই দিক থেকে আমরা আশা করতে পারি, সর্বকালে এটা ক্লাসিক হয়ে থাকবে।" [৬৬৮ পৃঃ]

৪। "আগামী মে মাসে একটি নতুন বিজ্ঞানের বই আরম্ভ করার ইচ্ছা। তার আগে শুরু করতে গররাজী" হয়েছি। [৬৭৩ পৃঃ]

এবং সর্বশেষে নিবেদিতার মৃত্যুর ২০ বছর পরে লেখা জগদীশচন্দ্রের একখানি পত্রের অংশ :

"And then the book which she was helping me to write is staring me in the face. I have not at present the strength to do anything with it". [৭৪৫ পৃঃ]

অধ্যাপক বসুর গ্রন্থে এ সম্পর্কে তথ্যাদি সহযোগে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা আছে। আমরা তারই থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত করলাম।

অধ্যাপক বসু এক জায়গায় বলেছেন যে, জগদীশচন্দ্রের এবং নিবেদিতার বহু পত্র বিনষ্ট এবং অনাবিষ্কৃত। সে সব থাকলে হয়ত আরো স্পষ্ট প্রমাণ মিলতে পারে। আশা করি 'দেশ'-এর বিদগ্ধ পাঠক-মণ্ডলীর মধ্য থেকে কেউ এগিয়ে এসে এ সম্পর্কে আরো প্রখরভাবে আলোকপাত করবেন।

শতদ্রুশোভন চক্রবর্তী
হাওড়া-১

বিহারের বাংলা

গত ৩৩ সংখ্যা (১লা আষাঢ়, ১৩৮০) শ্রীমঞ্জুলী ঘোষের 'বিহারের বাংলা' নামে নাতিদীর্ঘ লেখাটি বেশ কৌতূহল নিয়ে পড়া গেল। কেবলমাত্র বিহারের হিন্দী-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও, এলাকা হিসেবে কথ্য-ভাষার পার্থক্য দেখা যায়। পাটনা-গয়া এলাকায় মগধী বা মগহী, শাহাবাদ-ত্রিহুত এলাকায় ভোজপুরী, দ্বারভাঙ্গা-সাহারসা এলাকায় মৈথিলীর প্রভাব বেশী। 'তোহর নাম কা হৈ ?' পাটনা-গয়া এলাকার ব্যবহৃত বাক্য, দ্বারভাঙ্গায়—'অপনেকে কি নাম ছে ?' এবং তারপর ভোজপুরীতে 'রৌয়া, তোরে কা নাম বাড় ?'—গিয়ে দাঁড়ায়। ফলে, বিহারে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের কথায়

এলাকা বিশেষের হিন্দি উচ্চারণের প্রভাব দেখা যায়। শ্রীঘোষ ঠিকই বলেছেন, বিহারের বাসিন্দা বাঙালী শুধু বাংলা বললেও তাঁর উচ্চারণে সহজে ধরা পড়ে—তিনি বিহারের বাসিন্দা।

'আমার মামা না ছাপড়ার ডাক্তার হচ্ছেন'—এই বাক্যের উচ্চারণ হবে 'আমার ছোট মামা না—' না শব্দটি কিছুটা টেনে নিয়ে 'ছাপড়ার ডাক্তার হো-চ-ছেন—' হো-এ বিলম্বিত, চ সংক্ষিপ্ত এবং ছেন-এর ন দীর্ঘ বিলম্বিত। 'হচ্ছেন' শব্দটি বলা বাহুল্য 'হ্যায়'-এর প্রতিরূপ।

এখন, অবশ্য দেখা যাচ্ছে হিন্দী শব্দ অবলীলায় বাংলায় মিশে যাচ্ছে। কাগজ খুললেই চোখে পড়ে—সমঝোতা, বাতাবরণ, মজদুর......

বিহারের [বিশেষ করে পাটনার] বাঙালীদের কথাবার্তায় হিন্দীকে কিভাবে গ্রাস করা হয়েছে, তার কিছুটা নমুনা দেওয়া যাক:—

১। আমি স্টেশনে যাচ্ছিলুম, তো, ওর সঙ্গে রাস্তায় ভেটিয়ে গেল। (ভেট হোনা=সাক্ষাৎ হওয়া)

২। তুই একটু খিসকিয়ে বস। (খিসকনা=সরে বসা)

৩। ওকে আমি পাট্টি পাড়িয়ে ছেড়েছি। [পাট্টি পড়ানা=বোকা বনানো]

৪। জল্দীবাজি করে কোন কাজ করো না। [জল্দীবাজী=তাড়াতাড়ি]

৫। মার খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে সিসকাচ্ছিল। [সিসকানা=ফোঁপানো]

৬। লোকটা খুব সুস্তাচ্ছে গেছে। [সুস্তানা=ঝিমানো]

৭। ওর এই সব আদত পড়ে গেছে। [আদত=অভ্যাস]

৮। ওরা নিজেদের মধ্যে বতিয়াচ্ছিল। [বতিয়ানা=কথা বলাবলি]

৯। আমার কথা শুনে একব্যাক উঠে ভাগলো। [একব্যাক=অকস্মাৎ, ভাগনা=পালানো]

১০। ওকে কোনরকমে কান্নি কাটিয়ে এলাম। [কান্নি কাটানা=পিছু ছাড়ানো]

১১। তোদের এত কানাফুসী কিসের? [কানাফুসী=কানাকানি]

১২। সব কাজে টাঙ্গ-আথরে দেয়। [টাঙ্গ অথড়না=ল্যাং মারা]

১৩। ওর চঙ্গুলে বেচারা ফেঁসে গেল। [চঙ্গুল=পাল্লায়]

১৪। বেকার তোরা এই নিয়ে ছিনাঝাপটি করছিস। [অর্থহীন কাড়াকাড়ি]

১৫। খৈর, ওসব বাদ দাও। [যাকগে]

এ ছাড়া আরও শব্দ আছে যেমন মানা করা, ছুড়পনো, পিকচার দেখা, ইত্যাদি।

সুবিমল বসাক
কলকাতা-৫৬

চলচ্চিত্রে কবিতা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্রে কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব পড়ার পর আমার কিছু বক্তব্য বিনীতভাবে জানাতে চাই।

প্রথমত—সুব্রতবাবু কি চান—কবিতার গুণসম্পন্ন সিনেমা, না কবিতা হিসাবে গৃহীত কোন রচনার সিনেমা-রূপ, তা খুব স্পষ্ট নয়। তবে মনে হয় শেষেরটির প্রতিই তাঁর আসক্তি বেশী। এটি ধরে নিয়েই আমি এগোচ্ছি।

আমি সুব্রতবাবুর সঙ্গে একমত নই যে, কোন সার্থক কবিতাকে সার্থকভাবে সিনেমায় রূপান্তরিত করা যায়। এ কথা ঠিকই যে, চলচ্চিত্রে এমন কিছু মুহূর্ত সৃষ্টি করা সম্ভব যখন সে কাব্যের সুষমা অর্জন করে কিন্তু তাই বলেই কি সব অর্থে কবিতা এমন কোন রচনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন সিনেমায় সম্ভব? বর্ণনামূলক পদ্যরচনা, কাহিনীই যেখানে প্রধান, অবশ্য চলচ্চিত্রে রূপায়িত হতে পারে অতি সহজে ('দেবতার গ্রাস')। কিন্তু সমস্যা এ ধরনের রচনাকে নিয়ে নয়, আমাদের বিতর্ক প্রধানত লিরিক ধর্মী কবিতা নিয়ে। আসলে কবিতা যেখানে ছবি (বা কাহিনী) সেখানেই সিনেমার সঙ্গে তার আত্মীয়তা, কিন্তু কবিতা তো শুধু ছবি নয়। সুব্রতবাবু যাই বলুন, চিত্রধর্মিতাকেই কবিতা হওয়ার একমাত্র শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। জাপানী ছোট্ট কবিতাকেই যদি আদর্শ কবিতা বলে স্বীকার করতে হয় তবে তো ছবি আর কবিতার মধ্যে কোন পার্থক্যই নির্দেশ করা চলে না। তা ছাড়া সিনেমায় উপস্থাপিত যে-কোন সুন্দর মুহূর্তকেই 'কবিতা' হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করলে সেটা শিল্প হিসাবে সিনেমার প্রতি অপমান করা হয়। যেন কবিতা ছাড়া আর কোন সৃষ্টির নিজস্ব ভঙ্গিতে সুন্দর হওয়ার অধিকার নেই। ঋত্বিক ঘটকের মতো সিনেমাকে 'আগাগোড়া সর্বাঙ্গীণ লিরিক' বলে মেনে নিতে হলে তার আগে কবিতার সংজ্ঞাকে নতুন করে লেখা উচিত।

সুব্রতবাবু পছন্দমতো কিছু লাইন উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছেন সিনেমার পক্ষে এগুলি কি বিপুল সম্ভাবনাময়। এরকম বিচ্ছিন্ন উদাহরণের সাহায্যে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। তা ছাড়া সুব্রতবাবুর উদ্ধৃতিগুলি সবই আসলে ছবি। নিছক ছবি। বিপরীত উদাহরণ হিসাবে অসংখ্য পঙ্‌ক্তিকে দাঁড় করানো যায়। লেখকেরই উদ্ধৃত একটি লাইন ধরা যাক—টি এস এলিয়ট-এর

"... the evening is spread out
against the sky
Like a patient etherised
upon a table."

কোন চলচ্চিত্রকারের পক্ষেই কি এ লাইনের অনুবাদ সম্ভব? কিংবা বাংলা কবিতার যে-কোন লাইন যদৃচ্ছভাবে মনে করা যাক—জীবনানন্দের বহুপরিচিত সেই "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য" অথবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "আমার গোলাপগাছে একটি ফুল ফুটেছিল ঠিক গোলাপের মতো/চোখের মতো চোখ খুলে দেখি ভোরবেলার মতো ভোর বেলা"—এগুলিও তো এক অর্থে ছবিই। কিন্তু পাঠক এই কবিতা থেকে যা পাবেন দর্শক সিনেমা থেকে কিছুতেই তা পাবেন না, যেভাবেই এগুলির চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া হোক না কেন।

সুব্রতবাবু নিশ্চয়ই জানেন, কবিতার একটি মহৎ ঐশ্বর্য তার অস্পষ্টতা। যতটা সে বলে তার চেয়ে অনেক বেশী সে আভাস দিয়ে যায়। এই অস্পষ্ট আভাস থেকে মনে মনে একটি অস্পষ্ট প্রতিমা গড়ে তোলার মধ্যেই কবিতাপাঠের আনন্দ। কিন্তু ক্যামেরার চোখ বড় তীক্ষ্ণ। সে সব কিছুই বড় খুঁটিয়ে দেখে। তাই অস্পষ্ট যে ছবিটি কবিতার মধ্য দিয়ে এসে আমাদের মুগ্ধ করে সেটিকে ক্যামেরার চোখ দিয়ে দিনের আলোয় দেখতে গেলেই সব মাধুর্য নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেলুলয়েডেও কাব্যিক সৌন্দর্য নিশ্চয়ই সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু সেটা সিনেমার নিজস্ব ভাষার দ্বারা, কবিতার অনুবাদের মধ্য দিয়ে নয় ('পথের পাঁচালী'র কয়েকটি মুহূর্ত স্মরণ করুন)।

আসলে এটা আমরা আজও সহজে মেনে নিতে পারি না যে, সিনেমা একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম, তার ভাষা স্বতন্ত্র। নিজের খুশিমতো চলতে দিলেই তার কাছ থেকে সার্থক সৃষ্টি পাওয়া সম্ভব। পরিবর্তে তার কাছ থেকে গল্প, উপন্যাস বা কবিতার দাবি করলে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক অনেক কিছুই হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে গল্প উপন্যাস কবিতা বা সিনেমা কারোই কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে এটা বলাই ভালো যে, সিনেমা সিনেমাই হোক। অথবা কবিতা কবিতা।

ভাস্কর মিত্র
বহরমপুর

হিন্দুকলেজ সম্পর্কিত ঈস্টপত্রপঞ্চক দ্বিতীয় বক্তব্য

সুবর্ণা ঘোষ
অশোকলাল ঘোষ

ঈস্ট পত্রপঞ্চকের ঘোষিত প্রাপক কলকাতা সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের বিচারপতি, তৎকালে ইংলন্ড-বাসী জন হার্বার্ট হ্যারিংটন। পূর্ববর্তী আলোচনায় ['দেশ' ২৭-১-৭৩] আমরা দেখেছি, ঈস্টের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কালে হিন্দু কলেজ বিষয়ে হ্যারিংটনকে ঐরূপ পত্র লেখা improbable অর্থে ও সে-পত্র জাহাজী ডাকে পাঠানো impossible অর্থে অসম্ভব, কারণ উক্ত হ্যারিংটন হিন্দু কলেজ উদ্যোগের সঙ্গে প্রথমাবধি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, এবং লেখক ও প্রাপক সংশ্লিষ্ট কালে একই কলকাতা শহরের পাশাপাশি পাড়ায় [যথাক্রমে ওলড পোস্টাপিস স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী এলাকায়] বাস করতেন।

কথা উঠতে পারে [শ্রীমতী নন্দিতা মজুমদার, 'দেশ' ১৯-৪-৭৩], পত্র প্রাপক রূপে হ্যারিংটনের উল্লেখ লর্ডস কমিটির রিপোর্টের যে-অংশে পাওয়া যায় তা ঈস্ট পত্রালাপের অন্তর্ভুক্ত নহে, কাজেই হ্যারিং-টনের নাম ব্যবহার অবাস্তব প্রমাণের ফলে মূল পত্রালাপ নির্ভরযোগ্যতা হারায় না। আরো এক দিক থেকে আপত্তি ওঠা সম্ভব। ঈস্ট দলিলটি যদি আদৌ বাস্তবে পত্র-সমষ্টি না হয়, সেটি যদি পত্রের আকারে লিখিত প্রবন্ধমাত্র হয়, তবুও তা ঈস্ট-স্বীকৃত কিছু তো বটে। ঈস্ট কর্তৃক পরবর্তী কালে লিখিত, প্রচারিত আত্মচরিতের প্রাপ্য সম্মান আলোচ্য দলিলটিও অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দাবী করতে পারে। আমরা এই সকল আপত্তিও মনে রেখে আমাদের ঈস্ট-পত্র সম্পর্কিত দ্বিতীয় বক্তব্য পেশ করছি।

ঈস্ট-পত্র স্বীকারে কয়েকটি বাধা এক-বারে মূলের, সেগুলো প্রথমে পরিবেশিত হচ্ছে; অন্যান্য বাধা যথাস্থানে আলোচ্য।

অ-ব্যবহার

ঈস্ট-পত্র যে-কথা সবচাইতে বড় গলায় প্রচার করে, তা হল—হিন্দু বিত্তবানেরা তো বটেই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভে বিশেষ আগ্রহী। এই সাক্ষ্যটি প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন অন্ততঃ দুবার এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে দেখা দিয়ে-ছিল, যথাঃ—

১। আমহার্স্ট আমলের [১৮২৩—২৮] প্রাচ্যবাদীরা যখন ঘোষণা করলেন, ভারতবাসী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা চায় না, they continue to hold European literature and science in very slight estimation.... The Maulavi and Pundit....are not disposed to regard the literature and science of the West as worth the labour of attainment. [Gen. Com. of Pub. Instruction, GCPI, 18.8.1824, WB Archives]. এবং এই সত্যের ভিত্তিতে প্রাচ্যমুখীন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করলেন।

২। বেন্টিঙ্ক আমলের [১৮২৮—৩৫] প্রাচ্যবাদীরা যখন মেকলে-ট্রেভেলিয়ান প্রভৃতি প্রতীচ্যবাদীদের বাধা দিচ্ছি-লেন এই যুক্তিতে যে ভারতবাসী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত নয়,—The whole question rests upon two points, first whether English or Arabic and Sanskrit literature is best calculated for the improvement of the people of India; and secondly, whether, supposing English literature to be best adapted for that purpose, the Natives are willing to cultivate it. [Trev. Br Ed &c, 1938, p, 50].

এই উভয় পরিস্থিতিতে [বিশেষ করে ১৮২৪ সালে প্রতীচ্যবাদের শোচনীয় পরাজয়ের সময়] ঈস্ট-পত্রালাপের মত কিছু প্রচারের বড় প্রয়োজন ছিল। ওই দলিল সংশয়াতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত যে, এ-দেশীয়রা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা চায় এবং অবিলম্বে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা চায়। কিন্তু দেখা যায়, ১৮১৬—২১ সালে ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-বিস্তারে সদা-সক্রিয় ঈস্ট যেমন ১৮২৪-এ তেমনি ১৮৩৫ সালে অন্ধ-মূক-বধিরের পার্ট করেছিলেন।

ঈস্ট পত্রালাপের ন্যায় একটি মূল্যবান দলিলের এরূপ শোচনীয় অবহেলা মধ্য-বর্তী পরিবেশকে ট্রেভেলিয়ানের হাতেও ঘটেছে। দুটি দৃষ্টান্ত এইরূপ।

১। ১৮৫১—৫৫ সালে এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আরেকবার গুরুত্ব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং সেজন্য ১৮৫২-৫৩ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, আদি নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয়ক একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। ট্রেভেলিয়ান এই প্রয়োজনের কথা জানতেন মনে করার সঙ্গত কারণ বর্তমান। অথচ দেখা যায়, শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা মোয়াট, হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত রচনায় ট্রেভেলিয়ান কর্তৃক ১৮৪৮ সালের পূর্বে সংগৃহীত উক্ত মূল্যবান দলিল থেকে, আদৌ কোন সাহায্য পাননি। মোয়াট লিখেছেনঃ There are no records in the books of the Hindoo College showing the grounds on which hereditary and other privileges are claimed by Managers. They rest upon the provisions of an original code of rules of which there is no authentic copy in existence. তার জন্য মোয়াটকে Calcutta Christian Observer-এ প্রকাশিত পুন-র্মুদ্রণের ওপর নির্ভর করতে হয়, অথচ সংশ্লিষ্ট কালে ট্রেভেলিয়ানের নিকট উক্ত original code-এর ঈস্ট-সম্পাদিত প্রতিলিপি ছিল এবং ওই জাতীয় কাগজপত্র ঈস্ট,

ট্রেভেলিয়ানকে দিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের ইতিহাস রচনায় ব্যবহারের জন্য।

২। লর্ডস কমিটির ৩০ জুন ১৮৫৩ তারিখের বৈঠকে নিম্নোক্ত প্রশ্নটির উত্তরে সাক্ষী বার্ড, ট্রেভেলিয়ানের মারফৎ প্রাপ্ত ঈস্টের পত্র-দলিল দাখিল করেন :—

7079. Will you state to the committee the ground of the prescription of the scriptures [in Indian Government schools] ? বার্ডের সাক্ষ্য, ট্রেভেলিয়ান এইরূপ স্থলে ব্যবহারের কথা মনে রেখেই উক্ত দলিলটি তাঁকে দিয়েছিলেন।

লর্ডস কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, বার্ডের এই সাক্ষ্য দানের মাত্র ৯ দিন পূর্বে স্বয়ং ট্রেভেলিয়ান এই সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হন :—

6592. Will you state what progress has been made in Native education upto the present time ? [Ans.... In the year 1816 the Hindoo gentlemen of Calcutta, assisted by Mr. David Hare and ....East....established the Hindoo College....]

6593. ....That Hindoo College was originally established by voluntary subscription on the part of the natives ? [Ans. Yes, in 1816 and so continued till 1828].

6598. ....Did you find that amongst the best informed natives ....there was a desire to extend English instruction rather than Oriental ?

এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটির উত্তরে সাক্ষী ট্রেভেলিয়ান [সাক্ষী বার্ডের তুলনায় বহুগুণে বেশি প্রাসঙ্গিকভাবে] ঈস্টের কাছ থেকে হিন্দু কলেজের ইতিহাস রচনার জন্য প্রাপ্ত ১৮ মে ১৮১৬ তারিখের প্রথম পত্রটি ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু করেন নি। উক্ত পত্রের নির্ভরযোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে ট্রেভেলিয়ানের এই আচরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

২। পত্রলেখক-পত্রপ্রাপক

পত্রলেখক ঈস্টের বাইরের পরিচয় পূর্বে আলোচনায় দেওয়া হয়েছে। ভেতরের পরিচয়—অর্থাৎ কি চোখে তিনি দেখতেন আমাদের, কি আশা করতেন আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, ইত্যাদি জানাও বর্তমান আলোচনার পক্ষে আবশ্যক।

প্রথম পত্রে এক জায়গায় আছে, This frank mode of dealing with them, I have often before had occasion to remark, is the best method of gaining their personal regard and confidence. চিঠিটি ঈস্টের পক্ষে সদাশয়তার পরিচায়ক, আমাদের পক্ষে খুবই সুখকর। কিন্তু এই প্রীতি সুখ লাভ করার সন্দেহের পক্ষে কিছু বাধা বর্তমান। খোলাখুলি ব্যবহারের মাধ্যমে যাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জনের কথা এমন উচ্ছ্বসিত করে বলা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে ঈস্টের সর্বপ্রথম [৪ ডিসেম্বর ১৮১৩] উক্তি:— My own short experience in the place has but too fully confirmed the general expression which I have often heard of the prevalence of these offences [perjury, forgery].. [Cal. Gaz. 9.12.1813] ভাবতে বিস্ময় লাগে কোটি কোটি জনের বাসভূমি ভারত-বঙ্গদেশ সম্পর্কে প্রকাশ্যে এরূপ মন্তব্য করতে বিচারপতি ঈস্টের মাত্র ২৮ দিনের [৭ নবেম্বর—৪ ডিসেম্বর ১৮১৩] অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের বাইরে ঈস্টের পরিচয়, তিনি এদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম খ্রীষ্টীয় সভ্যতা বিস্তারকামী ছিলেন। শুধু যে তৎকালীন বিভিন্ন খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সংস্থার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাই নয়; হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি ইত্যাদির মাধ্যমেও তিনি খ্রীষ্টীয় স্বর্গরাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতেন। এ সম্পর্কে তাঁর কথা:— Moral and useful education will be the best hand maid to sounder doctrines. As....the intellect is exercised in useful knowledge the mass of the people will be... led to the true knowledge of God [৪র্থ পত্র]। বলা বাহুল্য, sounder doctrines, true knowledge of God বলতে কেরী-মার্শম্যান-ঈস্ট-হ্যারিংটন আদি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকামীরা খ্রীষ্টীয় মতানুগ বিশ্বাসই বুঝতেন।

যে সরল মন-খোলা ব্যবহারের দ্বারা ঈস্ট পৌত্তলিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সে-সরলতার ঈস্ট-পত্র নির্দেশিত মান নিম্নরূপ:—

১। হিন্দু-প্রধানের পত্র I hope there is no intention to change our religion-এর উত্তরে ঈস্ট তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন: আমি join my endeavours to theirs [হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা] to make them good Hindoos [১ম পত্র]।

২। ওই একই মূল প্রসঙ্গে তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বন্ধুদের ভরসা দিয়ে বলেছিলেন—এই ই পত্র, এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই এদের খ্রীষ্টধর্মে আনা যাবে [পূর্বোদ্ধৃত বাক্য moral and useful education ইত্যাদি, ৪র্থ পত্র]।

এবং ঈস্টের বক্তব্য হল, I have always dealt frankly and candidly by them ! এই সকল উক্তি আমাদের জানতে সাহায্য করে যে ঈস্ট শুধু বিধি বিধানের নিগড়-বদ্ধ বিচারকই ছিলেন না, তিনি মুক্ত-পক্ষ রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। প্রয়োজন বোধ করলে তিনি সব কিছু না হোক, অনেক কিছু করতে পারতেন।

পত্রপ্রাপক। পূর্ব আলোচনায় ছাড়া পরিচয়ের বাইরে, ঈস্ট-পত্রের [illegible] প্রাপকের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে এদেশ সম্পর্কে কৌতূহলী, এদেশীয়দের কল্যাণকামী, উক্ত পত্রালাপের আয়তন, আলোচিত বিষয়বস্তুই তার প্রমাণ। পৌনে দু'হাজার শব্দ বিশিষ্ট প্রথম পত্রটি অন্তত যাকে-তাকে লেখা যায় না। তিনি এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আগ্রহী ছিলেন [৪র্থ পত্র]। তিনি সংশ্লিষ্ট কালে এমন স্থানে বাস করতেন যেখানে কলকাতা থেকে জাহাজী ডাকে চিঠি পাঠানো যায় [২ পত্র]। তিনি ওই সময় ইংলণ্ড-বাসী ছিলেন [৩য় পত্র,—হিন্দু কলেজের জন্য ইংলণ্ডে অর্থ সংগ্রহে তাঁর সহায়তা চাওয়া হয়েছিল।] প্রথম পত্রের পূর্বোদ্ধৃত বাক্যাংশ I have often before had occasion to remark ইত্যাদি ইঙ্গিতে, পত্র-প্রাপক, লেখক ঈস্টের কলকাতা বাসের গোড়ার দিকে [১৮১৪-১৫ সালে] কলকাতায় থাকতেন। [এই বাক্যাংশের প্রতি শ্রীমতী মজুমদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।]

এরূপ একজন পত্র-প্রাপক যদি বিচারপতি হ্যারিংটন নাও হন, ঈস্ট তাঁকে স্বাভাবিক ভাবে ঘোষিতরূপ পত্র লিখতে পারতেন না। ১৮১৪-১৫ সালের কলকাতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন ইংরেজ, হ্যারিংটনের ন্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বঙ্গদেশ-কলকাতা সম্পর্কে, হিন্দু-মুসলমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, [তাঁর অভিজ্ঞতা ১৮১৬'র প্রথম পাদ অবধি প্রসারিত হলে] রামমোহনের খ্রীষ্টানুরাগ ও তৎসম্ভূত সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর অনেক কিছু জানবার কথা। সে ক্ষেত্রে ঈস্টের পক্ষে তাঁকে ঘোষিত রূপ পত্র লেখার অস্বাভাবিকতা স্বতই পরিস্ফুট। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তের জন্য পূর্ববর্তী [২৭-২-৭৩] আলোচনা দ্রষ্টব্য। উক্ত আলোচনার বাইরের দুটি দৃষ্টান্ত এই।

১। ঈস্ট প্রথম পত্রের কথা, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে যে লোক ১৮১৬ মে'র গোড়ার দিকে ঈস্টের কাছে আসেন, তিনি ছিলেন intimate with many of our own gentlemen of distinction. ১৮১৪-১৫ সালে কলকাতাবাসী ঈস্টের সঙ্গে প্রায়শ কথালাপের সুযোগ ছিল এমন যে কোন ইংরেজ-বন্ধুর উক্ত বার্তাবহকে ব্যক্তিগতভাবে চেনবার কথা; সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁর নামোল্লেখ স্বাভাবিক ছিল এবং মাত্র তিনটি শব্দেই [অমুকচন্দ্র অমুক] তাঁকে সনাক্ত করা যেত। দেখা যায়, ঈস্ট তিনটি শব্দের স্থলে মোট ৩৪টি শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তা সত্ত্বেও বন্ধুকে জানতে দেন নি কে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এনেছিলেন:— a Brahmin of Calcutta, whom I knew and who is well known for his intelligence and active interference among the principal Native inhabi-

tants and also intimate with many of our own gentlemen of distinction."

২। হিন্দু কলেজ ও তার সহায়ক স্কুল-বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় ঈস্ট ছিম আরো বহু য়ুরোপীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে উক্ত বন্ধুর ব্যক্তিগত ভাবে জানবার কথা। ঈস্ট-পত্রে কারুর উল্লেখ নেই। পত্রপ্রাপক [কল্পিত না হয়ে] কোন বাস্তব মানুষ হলে, তাঁর জিজ্ঞাসা করে পাঠাবার কথা, "এই সকল শুভ উদ্যোগে আমার পরিচিত কেউ সাহায্য করছেন কি না।" ঈস্টের পরবর্তী কোন পত্রে এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর নেই। এবং ঈস্ট-পত্রের সাক্ষ্য, সংশ্লিষ্ট কালের কোন পত্র খোয়া যায় নি।

নিম্নোক্ত বাধা দুটি যে-কোন প্রাপকের ক্ষেত্রেই [অর্থাৎ প্রাপক কলকাতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন না হলে] বর্তমান:—

১। রামমোহন সম্পর্কিত প্রথম পত্রটি ইংলণ্ডে পৌঁছবার কথা ১৮১৬ অক্টোবরে—নবেম্বরে। ওই সময় লণ্ডনের নানা পত্রিকায় রামমোহনকে নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, ভবিষ্যংবাণী প্রকাশিত হয়। ['দেশ' ২৭-১-৭৩]। ইংলণ্ডস্থ বন্ধুর পত্রে রামমোহন বিষয়ক দু-একটি প্রশ্ন অবশ্যই স্থান পাবার কথা। ঈস্টের কোন উত্তরে তাঁর কুতূহল নিবৃত্তির সাক্ষ্য নেই।

২। তৃতীয় পত্রের সাক্ষ্য, ঈস্ট তাঁর বন্ধুকে হিন্দু কলেজ ও স্কুলবুক সোসাইটির সাহায্যকল্পে ইংলণ্ডে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই পত্রের ১১ মাস পর চতুর্থ পত্র ও তার ৪৷৷ মাস পর পঞ্চম পত্র পাঠানো হয় এবং মধ্যবর্তী কোন পত্র খোয়া যায় নি। আমরা দেখি, বন্ধুকে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানানোর পর ঈস্টের ন্যায় দায়িত্বশীল এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে অর্থসংগ্রহ চেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে একবারও বিন্দুমাত্র কুতূহল প্রকাশ করেন নি।

এই সকল অস্বাভাবিকতা গুরুত্বপূর্ণ: ইংলণ্ডে অর্থসংগ্রহ সম্পর্কিত দৃষ্টান্তটি আমাদের বিবেচনায় 'প্রায় অসম্ভব'-এর পর্যায়-ভুক্ত। এবং এ সকল বাধা 'হ্যারিংটন প্রাপক ছিলেন না', 'প্রাপক-পরিচয় বার্ডের ভুল' ইত্যাদি ব্যাখ্যার দ্বারা খণ্ডনীয় নয়। 'কিন্তু 'হ্যারিংটন প্রাপক ছিলেন না' এরূপ বলার সুযোগই বা আমাদের কোথায়।

ঈস্ট-পত্র সকল যে হ্যারিংটনকে লিখিত, তা শুধু লর্ডস কমিটির ৩০ জুন ১৮৩৩ তারিখের সাক্ষী বার্ডের কথা নয়, উক্ত কমিটির ২৮ জুনের বৈঠকে সাক্ষী ট্রেবিলিয়ানও একই দাবি করেছেন; তৃতীয় পত্র সম্বন্ধে তাঁর কথা: "East wrote as follows to Mr. Harington on the 28th May, 1817 . . . ." লক্ষণীয়, "মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল" একমাত্র এই পরিচয় ও ইতিহাসে ব্যবহারের প্রয়োজন নেই ঈস্ট তাঁর ব্যক্তিগত পত্রালাপ বাইরের লোককে সংরক্ষণের/ব্যবহারের জন্য দিতে পারতেন, এবং বার্ড পরিবেশিত ট্রেবিলিয়ানের কথা, ঈস্ট ঠিক এই পরিচয়ে ও প্রয়োজনেই উক্ত পত্রালাপ ট্রেবিলিয়ানকে দিয়েছিলেন [in order that the information it contains might not be lost to the world]. একথা একেবারেই অবিশ্বাস্য যে এরূপ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি দলিলে তিনি পত্র প্রাপকের নাম উল্লেখ করেন নি; কিংবা এরূপ একটি দলিল ইতিহাস রচনায় ব্যবহারের জন্য নেবার সময় ট্রেবিলিয়ান "পত্রগুলো কাকে লেখা" জানতে চান নি।

এই সঙ্গে মনে রাখবার, ঈস্ট তাঁর পত্রালাপ গুচ্ছ শুধু addressed to Mr. Harington লিখেছিলেন, অর্থাৎ প্রাপকের বিচারক - পরিচয় অংশ [who was the senior judge &c.] বার্ড বা ট্রেবিলিয়ানের সংযোজন,—এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। নামের প্রথমাংশ তথা পরিচয়রহিত হ্যারিংটন নাম ঈস্ট শুধু এরূপ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করতে পারেন যেখানে 'Mr, Harington' এই মাত্র বললেই মানুষটিকে চেনানো যায়। এবং কলকাতা সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের প্রধান বিচারপতি জন হর্বার্ট হ্যারিংটনের ন্যায় সুপরিচিত ও ঈস্টের বন্ধু স্থানীয় এক 'হ্যারিংটন' কাছাকাছি থাকায় অন্য যে-কোন হ্যারিংটনকে বোঝাতে হলে ঈস্টের পক্ষে 'দ্বিতীয় হ্যারিংটনের নামের প্রথমাংশ, পদাধিকার ইত্যাদি যোগ করা অত্যাবশ্যক ছিল।

সম্ভবত ঈস্ট-পত্রের জন্য আমরা যদি লর্ডস কমিটির সমর্থন ব্যবহার করি, প্রাপক রূপে হ্যারিংটনকে গ্রহণ করতেই হয়। তার অর্থ, ঈস্ট পত্রালাপ একটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে অবাস্তবতা দোষ-দুষ্ট ['দেশ' ২৭-১-৭৩]। অন্য দিকে, উক্ত রিপোর্টের সমর্থন যদি আমরা ব্যবহার না করি, ঈস্ট-পত্রালাপের অন্য কোন দাঁড়াবার ভূমি থাকে না।

প্রাপক রূপে হ্যারিংটনের নাম ব্যবহারের সূত্রে যে কয়টি প্রশ্ন উত্তর দাবি করে তার মধ্যে সর্বপ্রথম:—ঈস্ট কখন এরূপ একটি পত্র-দলিল তৈরি করার কথা ভাবতে পারেন? এক দিকের সীমানা ৯ এপ্রিল ১৮২৮, ওই তারিখে হ্যারিংটন পরলোক-গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঈস্ট, হ্যারিংটনকে ১৮১৬-১৮ সালে লণ্ডনে অবস্থিত কল্পনা করে তাঁকে ওই সকল পত্র লেখার ঝুঁকি নিতেন না। এমন হতেই পারত যে, ঈস্ট আগে মারা গেলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর কোন সূত্রে উক্ত পত্রালাপ প্রকাশিত হলে হ্যারিংটন তার সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করলেন। সেরূপ পরিস্থিতি কারুরই কাম্য হতে পারে না। অন্য দিকের সীমানা ৮ জানুয়ারী ১৮৩৭, ওই তারিখে ঈস্টের মৃত্যু ঘটে। বার্ডের সাক্ষ্য, ঈস্ট তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ট্রেবিলিয়ানকে ওই পত্র-দলিলটি দেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ঈস্ট কি করে ভাবতে পেরেছিলেন যে প্রাপক রূপে হ্যারিংটনের নাম ব্যবহারের অবাস্তবতা ইতিহাসের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, ঈস্ট যদি তাঁর কল্পিত পত্রাবলীর প্রাপক রূপে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে ব্যবহার প্রয়োজন মনে করে থাকেন, বহু দিকের বিচারে উক্ত হ্যারিংটনই সর্বোত্তম নির্বাচন। এরূপ মনে করার কারণগুলো এই:

১। হ্যারিংটন সমবয়স্ক, সমপদাধিকারী, ভারত-ভারতীয়ের কল্যাণকামী। ভারতীয় কোন বিষয়ে তাঁকে বিস্তারিত লেখা ঈস্টের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

পাঠকের মনে কোন সন্দেহ না জাগার কথা। হ্যারিংটন তখন মৃত, ঈস্ট-ঘোষণার সত্যতা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না।

২। হ্যারিংটন সংশ্লিষ্ট কালের [১৮১৬ মে—১৮১৮ সেপ্টেম্বর] কয়েক মাস পর [জানুয়ারী ১৮১৯] থেকে ভারতের বাইরে ও তার কিছুকাল পর থেকে ইংলণ্ডে ছিলেন। ২৫।৩০ বৎসর পরের পাঠকের মনে না পড়ার কথা ওই ব্যক্তি ঠিক কোন্ সময় ইংলণ্ডে যান।

৩। তৃতীয় পত্রে প্রাপককে ইংলণ্ডে হিন্দু কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। ঐ বিশেষ দায়িত্ব ১৮১৯-২০ সালে তৎকালে ইংলণ্ড-বাসী হ্যারিংটনের ওপর ন্যস্ত ছিল [Sch. Bh. Soc. Rep. 1817-23]। ২৫।৩০ বৎসর পরের পাঠকের এ সম্পর্কে সাল তারিখ মিলিয়ে বিচার করার কথা নয়।

৪। ১৮৩০ সালের গবর্নমেণ্ট গেজেট, ১৮৩২ সালের ক্যালকাটা খৃীশ্চিয়ান অবজারবর ইত্যাদি একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত নানা মন্তব্য থেকে ঈস্টের ভরসা পাবার কথা যে হিন্দু কলেজের আদি ইতিহাস কেউ জানে না [প্রথম সভার তারিখ, আদি অধ্যক্ষসভার সদস্যদের নাম, হেয়ারের ভূমিকা ইত্যাদি বহু বিষয়ে অনিশ্চয়তা বর্তমান।]

আমাদের সার্ধশত বৎসরের আচরণ প্রাপক নির্বাচনে ঈস্টের বিচক্ষণতার অকাট্য প্রমাণ। আমরা বার বার হিন্দু কলেজ, স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি ইত্যাদি সূত্রে বিচারপতি হ্যারিংটনের এদেশীয় কর্মতৎপরতার কথা শুনেছি, কিন্তু ১৮১৬—১৮ সালের ঈস্টকে ইংলণ্ডীয় ঠিকানায় হ্যারিংটন বরাবরে চিঠি পাঠাতে দেখে ১৯৭২-শেষ অবধি কারো মনে প্রশ্ন জাগেনি, একই সময় কালে কলকাতায় সক্রিয় হ্যারিংটন কি প্রকারে ইংলণ্ডে চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে পারেন!

৪। অন্যান্য সন্দেহভাজন

এই সন্দেহজনক দলিল তৈরির প্রশ্নে আরো দুই ব্যক্তির নাম মনে আসে। এমনও তো হয়ে থাকতে পারে যে, ঈস্ট কোন পত্র-গুচ্ছ দিয়ে যাননি, যে-সংগ্রহ আমরা দেখি সেটি তাঁর মৃত্যুর পর ট্রেবলিয়ান বা বার্ড কর্তৃক রচিত, প্রচারিত হয়েছিল। ঈস্ট-পত্র সম্পর্কিত আলোচনা অতি সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্নের উত্তর দাবি করতে পারে।

বার্ডকে বেশিক্ষণ আসামীর কাঠগড়ায় রাখা অনাবশ্যক। বার্ডের সাক্ষ্যদানের সময় ট্রেবলিয়ান জীবিত, লণ্ডনে উপস্থিত। 'ট্রেবলিয়ানের মারফৎ প্রাপ্ত' এই পরিচয়ে উপস্থাপিত কোন দলিলে ট্রেবলিয়ান-পরিবেশনের বাইরের কিছু যোগ করা বার্ডের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বার্ড-ট্রেবলিয়ান মিলিতভাবে একটি মিথ্যা না হোক, সন্দেহজনক দলিল প্রচার করেছিলেন, —এরূপ ভাবা কঠিন।

অপর দিকে ট্রেবলিয়ান বার্ডের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। ঈস্ট-হ্যারিংটনের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁর মনগড়া কোন বক্তব্যকে ঈস্ট কর্তৃক হ্যারিংটনকে লিখিত পত্রালাপরূপে চালাতে পারতেন। ট্রেবলিয়ানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা, বিবেকের বাধা। এ বাধা অনতিক্রম্য নাও হতে পারে। ট্রেবলিয়ানের সমসাময়িক জনৈক প্রসিদ্ধ শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের সাক্ষ্য, তাঁর অনৃত-ভাষণের শক্তি অসাধারণ ছিল [Maclagan : Clemency Canning, 1962.]

ট্রেবলিয়ানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাধা, ঈস্ট পত্রালাপে এমন অনেক কথা আছে যা সমসাময়িক সাক্ষ্য-সমর্থিত এবং যা পরবর্তীকালের মানুষদের জানা ছিল না। যেমন প্রাথমিক সভার তারিখ ১৮১৬ সালের ১ বা ৪ মে নয়, ১৪ মে। বর্ধমানরাজের দানের পরিমাণ পরবর্তীকালে প্রচারিত ৫০০০্ বা ১০,০০০্ নয় ১৮১৬ সালের জুলাই মাসে ঘোষিত ১২০০০্ ইত্যাদি। ট্রেবলিয়ান সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, সরকারী নথিপত্র থেকে এ সকল তথ্য সংগ্রহ করলে, হ্যারিংটনকে সংশ্লিষ্টকালে কলকাতায় অবস্থিত ও হিন্দু কলেজ উদ্যোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ যুক্ত দেখতে পেতেন। মৃত্যুমুখীন ঈস্ট মৃত্যু-পরবর্তী প্রচারের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি নিতে পারেন, তৎকালে [১৮৫৩] ৪৬ বৎসর বয়স্ক ট্রেবলিয়ান নিজ কর্মজীবনের উজ্জ্বলতর অংশ সম্মুখে রেখে জেনেশুনে সেরূপ ঝুঁকি নিতে পারতেন না।

তৃতীয় বাধা, উপযুক্ত উদ্দেশ্যের অভাব। ১৮৩৫ সালের ট্রেবলিয়ান এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে এরূপ মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিলেও নিতে পারতেন, ১৮৫৩ সালে সে-জাতীয় কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

এরূপ পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত উদ্দেশ্য আবিষ্কার সাপেক্ষে আমরা ঈস্টকে সন্দেহ-ভাজনদের মধ্যে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

এই স্তরের অনিবার্য প্রশ্ন, ঈস্ট কেন এরূপ একটি পশ্চাৎ-তারিখ ও মিথ্যা পরিচয় যুক্ত দলিল প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন? ঈস্টকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি এ বিষয়ে আমাদের কোনরূপ ধাঁধার মধ্যে রাখেন নি। লর্ডস কমিটিতে ঈস্ট-পত্র পরিবেশক বার্ড-এর সাক্ষ্য,—It was given by Sir Edward Hyde East....a short time before his death in order, he said, that having been principally instrumental in establishing that institution [Hindoo College] the information it contains might not be lost to the world, অর্থাৎ, ঈস্টের লক্ষ্য ছিল ঐতিহাসিক অমরত্ব লাভ।

বার্ড-সাক্ষ্যের এই অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এর মধ্যে আমরা ঈস্ট-প্রয়াসের মূল উৎসের সন্ধান পাই। ঐতিহাসিক অমরত্ব লাভের জন্য বহু অধিকতর মানসম্পন্ন ব্যক্তি বহু ঘৃণ্যতর কাজ করে গেছেন। আশ্চর্যের কথা, এরূপ একটি সুস্পষ্ট উক্তি পাঠের পরও ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় ঐতিহাসিক লিখতে পেরেছেন—"East cannot be accused of any motive of distorting the truth"! [On RmR p. 38].

ঈস্ট-পত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঈস্ট তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দ্বিমুখী সাঁড়াশী অভিযান চালিয়েছিলেন। ঈস্ট-পত্র মতে:—১। য়ুরোপীয়দের মধ্যে ঈস্ট ভিন্ন আর কেউ হিন্দু কলেজের জন্য কিছু করেন নি; ২। ভারত সরকার এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য কিছু করেন নি।

ঈস্ট-পত্রে ঈস্ট ভিন্ন অন্যান্য য়ুরোপীয়

ঈস্ট-পত্রের বক্তব্য, এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় য়ুরোপীয় মহলে উদ্যোগী ছিলেন ঈস্ট এবং একমাত্র ঈস্ট। হিন্দু কলেজ সম্পর্কিত আলোচনায় সরকারের [অনুমোদন নয়] অনাপত্তি জ্ঞাপনের পর [They saw no objection to my permitting the parties to meet at my house], ঈস্ট-পত্রে আর একবার মাত্র অপর কোন রাজপুরুষের কোন প্রকার কর্মতৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা শুনি, বড়লাট পরিষদের জনৈক সদস্যের অসহযোগিতার ফলে হিন্দু কলেজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। [The completion of the Institution has been retarded in deference to the opinion of one of the members
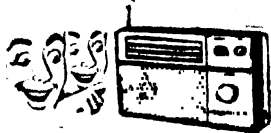
in Council.... [২য় পত্র]। হিন্দু কলেজের সহায়ক প্রতিষ্ঠান স্কুলবুক সোসাইটির বেলায় আমরা শুধু পাই, এ ব্যাপারে দেশীয়রা united with English gentlemen [৩য় পত্র]।

বাস্তব অবস্থা অন্যরূপ ছিল। ঈস্ট ভিন্ন একাধিক সরকারী কর্মচারী এদেশে শিক্ষাবিস্তার চেষ্টার সহিত যুক্ত ছিলেন, যথা:—হ্যারিংটন [স্কুল সোসাইটির সভাপতি], বেইলী [স্কুল বুক সোসাইটির সভাপতি]। বড়লাট পরিষদের বাকী তিনজন সদস্যের মধ্যে দুজন [স্টুয়ার্ট, রিকেট] ব্যক্তিগত উপস্থিতির দ্বারা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উৎসাহিত করেছিলেন। বড়লাট সহ প্রায় যাবতীয় উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী স্কুলবুক সোসাইটির সাহায্যকল্পে এককালীন ও বার্ষিক উভয় খাতে মুক্তহস্তে দান করেছিলেন [Gov. Gaz. 15.5.1817, 1.1.1818].

ঈস্ট পরিবেশিত চিত্র যে সত্য নয়, তার সাক্ষ্য স্কুলবুক সোসাইটির রিপোর্টে [১৮১৭-২৩] বর্তমান, যথা:— From this period [May 1816] the Natives showed a greater anxiety to receive that degree of knowledge and information which many European gentlemen... thought could not be safely indulged but within **twelve months** [**mid 1817**] these gentlemen were convinced... of the groundlessness of such fears... and had since come forward to give the cause their personal aid and encouragement. এবং এই পরিস্থিতি যে ঈস্ট জানতেন, তার প্রমাণ: উদ্ধৃত মন্তব্যটি তিনিই করেছিলেন।

ফলশ্রুতি, বেইলী-হ্যারিংটন দীর্ঘকাল যাবৎ নিজ নিজ কর্তৃত্বাধীন সংস্থার সভাপতি-পদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অন্যদিকে হিন্দু কলেজের সভাপতি ঈস্টের সরল প্রচারিত candid, frank dealings [২য়, ৩য় পত্র] ইত্যাদির মারফৎ দেশীয়দের আস্থা অর্জন এমনই ফলপ্রসূ হয়েছিল যে তাঁকে যাবতীয় য়ুরোপীয় সদস্যগণ সহ নির্বাচনের ২১ দিনের মধ্যেই পদত্যাগ করতে হয়। [Hin. Col. Procs. Mouat, Bagal.]

[হিন্দু কলেজ উদ্যোগে স্বেতাঙ্গীয় অংশ গ্রহণ সম্পর্কে ঈস্ট সাধারণভাবে অনেকেরই আগ্রহের কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁদের একজনকেও স্বনামে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন নি।]

ঈস্ট-পত্রে সরকারী শিক্ষানীতি

এ প্রসঙ্গে ঈস্টের পরিবেশন আরো গুরুত্বপূর্ণ, এবং বাস্তব অবস্থার একেবারে বিপরীত। ঈস্ট-পত্রে আমরা পাই, ১৮১৬ মে মাসের গোড়ার দিকে হিন্দু-প্রধানেরা ঈস্টের কাছে একটি উচ্চমানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য চান। ঈস্ট এ বিষয়ে বন্ধুকে লিখেছেন: Wishing to be satisfied how the Government would view such a measure I did not at first give him a decided answer....I communicated to the Governor General what had passed....the Supreme Council ....approved of the course I had taken and signified through his Lordship that they saw no objection to my permitting the parties to meet at my house [প্রথম পত্র]।

ঈস্ট-পত্রের এই অংশের ভিত্তিতে ডক্টর মজুমদারের সিদ্ধান্ত—১। হিন্দুদের বিশেষ আগ্রহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হোক; ২। ঈস্ট বুঝতে পারছেন না উৎসাহ দেবেন কি দেবেন না; কারণ ৩। তিনি তখনো জানেন না সরকার ব্যাপারটা কিভাবে নেবে। [On RmP. p. 34].

বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ঈস্ট তাঁর প্রথম পত্রে ১৮১৩ চার্টার অ্যাক্টের শিক্ষা বিষয় সংক্রান্ত ধারাটি উল্লেখ করেছেন। আরো যা প্রসঙ্গে বলা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু ঈস্ট বলেন নি, তা এই:

১। কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স তাঁদের ৩ জুন ১৮১৪ তারিখের পত্রে বড়লাট ময়রা [পরে হেস্টিংস]-কে নির্দেশ দেন:—

* এদেশে শিক্ষা বিস্তারে বারাণসীর টোল পণ্ডিত ও বঙ্গীয় গ্রামীণ শিক্ষকদের সহায়তা নেওয়া হোক; * এ বিষয়ে সরকারের আগ্রহের কথা দেশীয় মহলে প্রচার করা হোক [causing it to be made known that it is in the contemplation of the British Government to introduce and establish amongst the natives a gradation of honorary distinction as the reward of merit....as may be deemed most grateful to the natives who should be invited to communicate their ideas to you ....

* তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে রচিত একটি পরিকল্পনা লন্ডনে পেশ করা হোক। [H. Com. 1831-32, Vol. 9].

২। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ২ অক্টোবর ১৮১৫'র বিবৃতিতে বড়লাট ময়রা শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী চিন্তাকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকার দেন:—

* [অধ্যাপক পণ্ডিত গৃহে টোল নয়] প্রতি জেলা শহরে হিন্দুদের জন্য একটি ও মুসলমানদের জন্য একটি করে স্কুল স্থাপন করা হোক; এবং আপাতত নীতিশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হোক, সাহিত্য আদি পরে আসতে পারবে [The moral duties require encouragement and experiment. The arts which adorn and embellish life will follow in ordinary course—Sharp, Ed. Records, 1919].

মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক ২২ মার্চ ১৮১৬ তারিখে [অর্থাৎ কলকাতার ১৮১৬ মে প্রস্তাবের মাত্র ৩৯ দিন পূর্বে] [ময়রা বিবৃতি] অনুরূপ মর্মের এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়

[The remedy....First.—The establishment of a Seminary in every district for the education of Native public servants....with the view of improving their moral principles]. এই বিজ্ঞপ্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; এ থেকে দেখা যায়, ১৮১৬ সালের প্রথমার্ধে এদেশীয়দের শিক্ষাদান পরিকল্পনা সরকার তরফে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে করা হচ্ছিল; শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারটা কোন সরকারী বিভাগের প্রধান বা অপ্রধানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সীমাবদ্ধ ছিল না।

ঈস্ট-পত্রে ঘোষিত হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য, পাঠক্রম [The principal objects....morals ....and in time as the fund increased, English belles letters.... ১ম পত্র] ও ময়রা বিবৃতির [The moral duties require encouragement....the arts which adorn and embellish life will follow in ordinary course] মধ্যে নিকট সাদৃশ্য প্রমাণ করে ঈস্ট ময়রা সরকারের শিক্ষা-নীতির সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন। সাধারণভাবেও তৎকালীন সরকারের পঞ্চম সম্মানিত ব্যক্তি ঈস্টের সরকারী শিক্ষানীতি অন্ততঃ মোটামুটিভাবে জানবার কথা। তা ছাড়া, আমরা যদি ঈস্ট-পত্রানুযায়ী মেনে নিই ঈস্ট ময়রা সরকারের শিক্ষা বিষয়ক মতিগতি জানতেন না এবং ঈস্টের মারফৎ হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেয়েও তাঁরা ঈস্টকে সে বিষয়ে কিছু বলেন নি, শুধু তাঁর বাড়িতে আলোচনা বৈঠক ডাকায় তাঁদের 'অনাপত্তি' [no objection] জানিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্তর দাবী করে। তবে কি ঐ they saw no objection to my permitting the parties to meet at my house -এর ভিত্তিতেই এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট ২১ মে ১৮১৬ তারিখে হিন্দু কলেজ বৈঠকে, সভাপতিরূপে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে, সহ-সভাপতিরূপে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের প্রধান বিচারপতিকে, সদস্যরূপে ৮ জন [মতান্তরে ৯ জন] সামরিক-অসামরিক সরকারী কর্মচারীকে উক্ত হিন্দু কলেজ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন? মনে রাখবার যে, ঈস্ট সরকারকে জিজ্ঞাসা না করে বাড়িতে স্কুল বিষয়ক আলোচনা করবার পর্যন্ত ভরসা পান নি। এ ধরনের পরিণতির [development-এর] স্বাভাবিক ব্যাখ্যা,—সরকার যেরূপ চেয়েছিলেন হিন্দু প্রতিক্রিয়া অন্ততঃ মোটামুটিভাবে সেই-রূপই হয়েছিল, এবং ঈস্ট তা জানতেন, তাই সরকারকে না হোক, প্রায় এক ডজন সরকারী কর্মচারীকে হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত করার সাহস পেয়েছিলেন। ভাষান্তরে বলা যায়, স্টুয়ার্ট-রিকেট-বেইলী-হ্যারিংটন ইত্যাদি অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের ন্যায়, ঈস্টও মোটামুটিভাবে পূর্ব নির্ধারিত স্ক্রিপ্ট [script] অনুযায়ী পার্ট করে গেছেন।

ঈস্ট-পত্র প্রচারে ঈস্টের উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু কলেজের মুখ্য উদ্যোক্তা হিসাবে ঐতিহাসিক অমরত্ব লাভ। উক্ত উদ্যোগ যদি সরকার পক্ষের হয়, ঈস্টের গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পায়। তাই আমরা ঈস্ট-পত্রে ১৮১৩ চার্টার অ্যাক্টের কথা শুনি, কোর্ট অব ডাইরেকটরস-এর ১৮১৪ জুনের পত্র বা ময়রার ১৮১৫ অক্টোবরের বিবৃতি অবধি পৌঁছাই না; তাই আমরা হিন্দু কলেজ সম্পর্কে অনাদি হাজারো খবর শুনি, কিন্তু ঈস্টকে যে সভাপতি পদ ত্যাগ করতে হয়েছিল তার আভাসমাত্রও পাই না। অপর দিকে, অন্যান্য রাজপুরুষদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে শুধু বড়লাট পরিষদের জনৈক সদস্যের অসহযোগিতার কথা শুনি, বড়লাট সহ প্রায় যাবতীয় উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ যে স্কুল বুক সোসাইটির সাহায্যকল্পে মুক্ত-হস্ত হয়েছিল সে কথা শুনি না। তাই আমরা ঈস্ট পরিবেশিত হিন্দু কলেজ নাটকে উক্ত কলেজের জনক রূপে ঈস্টকে দেখি এবং একমাত্র ঈস্টকেই দেখি।

এবার মূল প্রশ্নে আসা যেতে পারে।—ঈস্ট-পত্রের ন্যায় নানা দিকের ত্রুটিযুক্ত একটি দলিল ইতিহাস রচনার নির্ভর হতে পারে কি না। প্রশ্নটি বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে বিবেচ্য। উক্ত দলিলে যে-সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়, সে-সকল গুরুতর বটে, কিন্তু চিঠিপত্র জাতীয় প্রায় কোন পুরাতন দলিলই এ ধরনের ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। পত্রকারের ব্যক্তিগত পত্র ভবিষ্যতের গবেষককে মনে রেখে লেখা হয় না। তাতে এমন কথা থাকে যা অবান্তর, এমন কথা বাদ পড়ে যা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন। ব্যক্তিগত পত্রে লেখকের, প্রাপকের পছন্দের মানুষ 'না হক্' প্রশংসা পায়, অপছন্দের মানুষ অযথা নিন্দিত হয়। এবং এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা ইতিহাস রচনায় পুরাতন চিঠিপত্র ব্যবহার করে থাকি। আমাদের বিবেচ্য,—ঈস্ট-হ্যারিংটন পত্রালাপ অন্যান্য পত্র-সংগ্রহের ন্যায় ইতিহাস রচনায় ব্যবহৃত হতে পারে কি না।

দ্বিতীয় কথা, ঈস্ট-দলিল যদি 'খাঁটি ব্যক্তিগত পত্রালাপ' নাও হয়, তা যদি পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ-বিশেষ হয়, তবুও তা ঈস্ট কর্তৃক সজ্ঞানে রচিত ও প্রকাশের জন্য প্রদত্ত কিছু তো বটে। এখানে প্রশ্ন, ঈস্টের এরূপ রচনা ১৮১৬—১৮ সালের না হয়ে ১৮২৮—৪৭ সালের হলে, আমরা তা ইতিহাস রচনায় ব্যবহার করতে পারি কি না। এই উভয় প্রশ্নই একত্র বিবেচিত হচ্ছে।

নিতান্ত অসতর্ক পাঠকেরও খেয়ালে আসবে, ঈস্ট-পত্রের মিথ্যা ও অন্যান্য পুরাতন চিঠিপত্রের মিথ্যার মধ্যে একটা মৌলিক ভেদ বর্তমান। অন্যান্য পত্রের মিথ্যার ন্যায় ঈস্ট-পত্রের মিথ্যা লেখকের তৎকালীন প্রেম-বিদ্বেষ-অসূয়া প্রসূত মিথ্যা নয়। ঈস্ট-পত্রের মিথ্যা ঐ সকল পত্রের ঘোষিত তারিখের বহু বৎসর পর লেখক কর্তৃক এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচারিত মিথ্যা; এবং লর্ডস কমিটির রিপোর্ট মতে লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য, হিন্দু কলেজের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করা। আমাদের বিবেচনায়, ইতিহাস এরূপ সাহায্য স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারে না।

এই সূত্রে আরো একটি কথা অবশ্য মনে রাখবার। আমরা এতকাল উক্ত পত্রালাপকে অন্যান্য চিঠিপত্রের ন্যায় শুধু প্রয়োজন মত তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করিনি, ব্যবহার করেছি অপর যাবতীয় সাক্ষ্য বিচারের কষ্টিপাথর হিসাবে। সেরূপ ব্যবহারের দিন আজ গত। আমাদের প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তসকল গ্রহণযোগ্য হোক আর নাই হোক, ঈস্ট-পত্র দলিল সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন আমরা তুলেছি, তাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সুযোগ আর নেই। কোন ব্যক্তি যখন পশ্চাৎ-তারিখ দিয়ে, মিথ্যা কুশীলব সাজিয়ে, ইতিহাস-রচনায় ব্যবহারের জন্য কোন দলিল প্রচার করেন, তাঁর উদ্দেশ্য যে শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করা নয়, তা প্রমাণের [illegible] দায়িত্ব তাঁর বা তাঁর পক্ষের। এর পর অন্য কোন দলিলের, এমন কি কোন কিংবদন্তীরও, সত্যাসত্য নির্দেশক কষ্টি-পাথর হিসাবে ঈস্ট-পত্র ব্যবহারের পূর্বে তাকে বলিষ্ঠতর যুক্তির দ্বারা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে-ভাবেই দেখা হোক না কেন, ঈস্ট-পত্র পঞ্চক আজ শিথিল-মূল।

পুনশ্চ

ঈস্ট-পত্র আলোচনা সূত্রে বহু প্রাসঙ্গিক তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। সে-সকলের কোন কোনটি প্রায় হ্যারিংটনকে ১৮১৬—১৮ সালের কলকাতায় আবিষ্কারের মতই চমকপ্রদ, এবং তার তুলনায় বহু গুণে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সকল সাক্ষ্যের মূল্যায়নে যদি আমরা ভুল না করে থাকি, এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারে রাধাকান্ত দেব আদির ভূমিকা এ-যাবৎ প্রচলিত বিশ্বাস থেকে ভিন্নরূপ ছিল

অনুবাদ

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন। এরিক ফন দানিকেন। অনুবাদ, অজিত দত্ত। লোকায়ত প্রকাশন, ৫৩, নীলকমল কুণ্ডু লেন, হাওড়া-২। মূল্য দশ টাকা।

বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীরচনা অনেককাল ধরেই চলছে। সেগুলির গোত্র আলাদা, রস পৃথক। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রসের কথা বলেছেন, আমরা বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী থেকে বিজ্ঞান রস আহরণ করি। যদিও বৈজ্ঞানিক এসকল রচনাকে গ্রাহ্য করবেন না। শ্রীযুক্ত দানিকেন বিজ্ঞানকাহিনী রচনা করেন নি কিন্তু তাঁর পরিবেশন পদ্ধতি কাহিনীর মতই চিত্তাকর্ষক।

লেখক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে প্রেরণা বা স্বপ্নকে স্বীকার করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের স্বীকারোক্তি দিয়ে তিনি নিজের বক্তব্য প্রমাণ করেছেন। আগামী যুগের মানব ইতিহাসের ভূমিকা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের সাহায্যে নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তনের কথা লেখক কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় বলেছেন। লেখক কল্পনা আশ্রয়ী। কিন্তু এই কল্পনার মূলে কি অপরিসীম নিষ্ঠা এবং অধ্যয়ন। এ-যাবৎ যে জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়েছে। দানিকেন তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি নৃতত্ত্ব, পুরা কাহিনী, পৌরাণিক উপাদান অন্বেষণ করে ফেলেছেন। তাঁর কাছে বাইবেল, বেদ, মহাভারত, কাব্বালা অথবা তিব্বতী 'ধ্যান' পুস্তকে বর্ণিত দেবতাদের বিবরণ নিছক গল্পকথা বা অধ্যাত্মসমীক্ষা মনে হয়নি। এগুলি থেকে দানিকেন হারিয়ে-যাওয়া মানব-ইতিহাস গঠন করেছেন। কোনো এক সময়ে নক্ষত্রলোকের মানুষের এই পৃথিবীতে যাতায়াত ছিল এরকম অনুমান করেছেন। দানিকেনের বক্তব্য হচ্ছে তেয়ার দ্য শার্দ্যাঁর মত, 'বিজ্ঞানে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু বিজ্ঞান যে পৃথিবীটাকে শুধু ওপর ওপরই দেখছে। কখনো কি তাকে খুঁটিয়ে, তলিয়ে, নিখুঁত করে দেখবার চেষ্টা করছে?'

এই খুঁটিয়ে, তলিয়ে দেখবার প্রেরণা থেকেই দানিকেন প্রায় বিশ্ব পরিক্রমা করেছেন। অতীত-সমস্ত-ভবিষ্যতের ত্রিবেণী-রহস্য উদ্ঘাটনে দানিকেনের কৃতিত্ব অপরিসীম। অবশ্য একটি অভিপ্রায়ে দানিকেন গ্রন্থরচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আমরা যখন অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান জীবদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারব তখন আমাদের মধ্যে থেকে ভৌগোলিক সীমা অন্তর্হিত হবে। 'নানা দেশের, নানান গ্রহের বিজ্ঞজনেরা সেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান করবেন একটিমাত্র ভাষায়। সে ভাষা এক মহান রাষ্ট্রভাষা'।

এই গ্রন্থের চিত্রগুলি অমূল্য সম্পদ। মানব সংস্কৃতির মূল্যবান দিশারী। বাংলা ভাষায় এই বই অনুবাদ করে শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত মহাশয় সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। অনুবাদ শুধু ঝরঝরেই নয়, আশ্চর্য হৃদ্য এবং মনোহর। বইটির ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ মুদ্রণশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সঙ্গীত

তবলার ইতিবৃত্ত। শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, বিল্ডিং লজ, কলিকাতা-১২। দশ টাকা।

গ্রন্থটি তবলা এবং তবলাবাদনের ইতিহাস। গ্রন্থকার প্রধানত সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থে বারটি অধ্যায়ে পাখোয়াজ ও তবলার পরিচয়, বর্ণ, বোল, পারিভাষিক শব্দ, বিবিধ ক্রিয়া, ঘরাণা, বাজ, তালপদ্ধতি, লয়, অঙ্ক, তাললিপি, কতিপয় তবলাবাদকের জীবনী ও কতিপয় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। তবলা সম্বন্ধে দু'একটি গ্রন্থ আগে প্রকাশিত হলেও ব্যাপক আলোচনা কমই হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপলক্ষ্য করে গ্রন্থকার তবলা সম্বন্ধে যে বিস্তারিত এবং সহজবোধ্য বিবরণ দিয়েছেন তা এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু সকলেরই চিত্তাকর্ষক হবে। গ্রন্থটি নিঃসংশয়ে সংগীতানুরাগী মহলে সমাদৃত হবে।

শঙ্খ-বেণু। শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায়। বীণাপাণি সঙ্গীত শিক্ষাশ্রম, চাঁকময়রা গলি, চুঁচুড়া। সাড়ে সাত টাকা।

চুঁচুড়ার সঙ্গীতাচার্য সংগীতসুধাকর শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায় সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত। তিনি বহু সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এবং সেগুলি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থকার ধ্রুপদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ এবং বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধারক। কিন্তু তিনি সঙ্গীতের অপরাপর শাখাতেও কম পারদর্শী নন। স্বরলিপিসম্বলিত দশখানি গ্রন্থে তিনি তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। আলোচ্য স্বরলিপি গ্রন্থে তিনি প্রধানত তাঁর রচিত ভক্তিগীতিগুলি প্রকাশিত করেছেন। এর মধ্যে আগমনী ও শ্যামা সঙ্গীতই প্রধান। রাগাশ্রয়ী রাগ সঙ্গীত কিন্তু সুরকারের যথেষ্ট স্বকীয়তাও এই সুরগুলিতে বর্তমান। বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে অমলের রাগ সঙ্গীতের রস ও আমেজকে তিনি যুগোপযোগী করে প্রচার করতে যত্নবান হয়েছেন।

মীরার ভজন। শ্রীনীহারবিন্দু চৌধুরী। সাম্প্রতিক প্রকাশনী, পোস্ট বক্স ১৬২২৬, কলিকাতা-২৯। চার টাকা।

অধ্যাপক শ্রীনীহারবিন্দু চৌধুরী সঙ্গীত সমাজে সুপরিচিত। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সংগেও এর নিবিড় পরিচয় আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তিনি চোদ্দটি সুবিদিত মীরার ভজনের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন। সুরগুলি সহজ ও সরল এবং শিক্ষার্থীরা যাতে অনায়াসে স্বরলিপি অনুসরণ করে গাইতে পারেন গ্রন্থকার সেই চেষ্টা করেছেন এবং সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছেন। এই ভজনগীতিগ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ভারতীয় সঙ্গীতে গ্রাম-শ্রুতি-মূর্ছনা। শ্রীরবি গুহমজুমদার। ডাক পাবলিশার্স, ১।১।১ হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। দু টাকা।

গ্রন্থটি ছোট্ট, কিন্তু আলোচনার দিক থেকে অতিশয় মূল্যবান। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে যে বাইশটি শ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে সেটি যে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত এবং শ্রুতি বিভাগগুলির যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে এ বিষয়টি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন গ্রন্থকার। বর্তমানে অনেকে বাইশটি শ্রুতি বিভাগ সম্বন্ধে সন্দিহান এবং এর বিরুদ্ধে যুক্তিও প্রদর্শন করে থাকেন; কিন্তু রবিবাবু যেভাবে নানা দিক থেকে বিচার করে যুক্তি সমর্থিত উপায়ে বাইশটি শ্রুতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন সেটি যথার্থ প্রণিধানযোগ্য। তিনি একটি সহজ স্বরলিপির পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছেন যাতে সকলেই সহজে গানগুলি তুলতে পারেন। বইটি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের সকলকেই পাঠ করতে অনুরোধ করি।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'পথি নারী বিবর্জিতা' কথাটা যে কত দূর সঙ্গত তা ইদানীং বেশির ভাগ ভ্রমণকাহিনী পড়লেই যথাযথভাবে টের পাওয়া যায়। এই সব ভ্রমণকাহিনীর লেখকরা উৎসাহের আতিশয্যে মাঝপথেই দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কোত্থেকে আমদানী হয় এক উদ্ভট নারীচরিত্র, আর তাকে ঘিরে গল্পের গোরু অকস্মাৎ গাছে চড়ে বসে। ভ্রমণকাহিনীর যে একটা আলাদা স্বাদ আছে এবং ঠিকমত লিখতে পারলে সে রচনার সাহিত্যমূল্যও কিছু কম হয় না—এ কথা তাঁরা কেন যে মনে রাখেন না কে জানে। ব্যর্থ সাহিত্যিকদের পক্ষে কোনো কিছু লেখাই সম্ভব নয় এ কথাও জেনে রাখা ভালো।

অমূল্য সেনগুপ্তের **হিমতীর্থ হিমাদ্রি** (রূপরেখা, আট টাকা) অবশ্য সেদিক থেকে দুর্লভ ব্যতিক্রম। শ্রীসেনগুপ্ত পেশায় ডাক্তার, নেশায় ভ্রমণবিলাসী। সাহিত্য করার বাসনা নিয়ে তিনি কলম ধরেন নি, এ কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। এবং সেই কারণেই সম্ভবত তাঁর এই ভ্রমণকাহিনীটি সুন্দর পাঠযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর উদ্দেশ্য অকৃত্রিম, অনুভূতি আন্তরিক, অভিজ্ঞতাও প্রত্যক্ষ। এই তিনের সংমিশ্রণ সহজ বিবরণীকেও যে মনোজ্ঞ করে তুলতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর গ্রন্থটিতে।

বছর দুই আগে একটি পর্যটন-সংস্থা আয়োজিত তীর্থযাত্রার দলে ভিড়ে শ্রীসেনগুপ্ত গিয়েছিলেন কেদারনাথ-বদরীনাথ ভ্রমণে। হরিদ্বার থেকে বাসে এবং পায়ে হেঁটে এই তীর্থপরিক্রমার একটি জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। ডাক্তার হলেও ইতিহাসেও তাঁর আগ্রহ কম নয়। যাত্রা পথের উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলির ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যেমন শুনিয়েছেন তেমনি লৌকিক কাহিনী, পুরাণ-প্রসঙ্গ ও স্থানীয় জীবনযাত্রার টুকরো-টুকরো ছবিও উপহার দিতে ভোলেন নি। যোশীমঠের প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের জীবনী যেমন শুনিয়েছেন তেমনি রুদ্রপ্রয়াগের কাছে এসে জিম করবেটের গল্পও স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়েছে তাঁর। অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসু পর্যটকের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক সমস্ত কিছুর বর্ণনাই 'হিমতীর্থ হিমাদ্রি'র অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যৎ ভ্রমণকারীরা যেমন উপকৃত হবেন তেমনি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাও স্মৃতিরোমন্থনের সুযোগ পাবেন শ্রীসেনগুপ্তের বইটি পড়ে এ কথা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য।

*

ইংরেজীতে যাকে বলে সায়েন্স-ফিকশন, বাংলায় সেরকম রচনার সংখ্যা কিছু কাল আগে পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। অতি সম্প্রতি এদিকে নজর পড়েছে, এবং তার ফলে বেশ কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস রচিত হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ এবং এর দ্বারা বাংলা সাহিত্যের পরিধি আরো ব্যাপক হবে আশা করা যায়।

চিত্তরঞ্জন ঘোষালের **ছোটদের বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প** (কিশোর সাহিত্য সংঘ আড়াই টাকা) এই ধরনের সাতটি গল্পের সংকলন। সন্দেহ নেই যে, শ্রীঘোষাল খুব সময়োচিত কাজ করেছেন। ছোটদের জন্য এ ধরনের বই যত রচিত হয় ততই ভালো। বিজ্ঞানে যে কালকালাম আবিষ্কার ঘটে যাচ্ছে গল্পের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে পরিচিত করানোই এই গল্পগুলির উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান-নির্ভর গল্পের প্রধান শর্ত হল, গল্পগুলি গল্প হবে এবং বিজ্ঞানের একটি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাও সেই গল্পে অন্তর্নিহিত থাকবে। অর্থাৎ সাধারণভাবে যা মনে হতে পারে অলৌকিক বা অসম্ভব তার বৈজ্ঞানিক যুক্তিটি সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার কাজও লেখককে নিতে হয়। কাজটি সহজ নয় এবং সকলের জন্যও নয় বলাই বাহুল্য। শ্রীঘোষাল কিন্তু আশ্চর্য কৃতিত্বের সঙ্গে এই শর্ত পালন করেছেন।

সাতটি গল্পের অধিকাংশ গল্পই মহাকাশ-রহস্যকে কেন্দ্র করে রচিত। 'মারণাস্ত্র হলুদরশ্মিগুচ্ছ' তিন বন্ধুর শনিগ্রহ অভিযানের রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত, 'মন্দারের ঝরনাতে' শুক্রগ্রহের এলাকায় মন্দার-উপগ্রহের জরাবিজয়ী এক আশ্চর্য ঝরনায় জলের উল্লেখ, 'গ্রহের আতঙ্ক', 'পল্টুর রকেট', 'শত্রুর ঘাঁটি' ও 'মঙ্গলের বন্দী' গল্পগুলিতে বিভিন্ন গ্রহের রকেটের নানান অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা যেমন বিস্মিত করবে তেমনি কৌতূহলীও করে তুলবে। 'আলোর সময়' তুলনায় বড়ো গল্প, কিন্তু গল্প হিসেবে এই গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা সন্দেহ নেই। আলোর গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অতীতকে জীবন্তভাবে ছবির মতো হাজির করা যায় চোখের সামনে—এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে একজন বিজ্ঞানীর আত্মত্যাগের যে কাহিনী শুনিয়েছেন তিনি তা যেমন বিষণ্ণ-করুণ তেমনই চমকপ্রদ।

*

ডঃ দিলীপ মালাকারের **পাবলো পিকাশো** (পরিবেশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, দু টাকা)—এই যুগন্ধর শিল্পীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-আলেখ্য ও শিল্পকর্ম-পরিচয়। আজীবন নতুন পরীক্ষায় নিরত পাবলো পিকাশোর জীবন এক দুর্ধর্ষ শিল্পীর অবিরাম সংগ্রাম ও সাধনার জীবন্ত ইতিহাস। শিল্পজগতে পিকাশো আজ শুধু একটি একক প্রতিভাময় ব্যক্তিত্ব নয়, তিনি আজ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত। একানব্বই বছর বয়সী এই শিল্পীর মৃত্যু হয়েছে গত বৎসর এপ্রিল মাসে।

ডঃ মালাকার বেশ দক্ষতার সঙ্গে শিল্পী পিকাশোর একটি সর্বাঙ্গীণ পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর আলোচনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যই যাতে স্থান পায় সেদিকে লক্ষ্য ছিল তাঁর। সাধারণ পাঠকের পক্ষে পিকাশো সম্পর্কে ধারণা তৈরীর কাজে তাঁর আলোচনাটি বিশেষ উপযোগী। পিকাশোর বিভিন্ন পর্যায়ে আঁকা বেশ কয়েকটি ছবি গ্রন্থটির আকর্ষণ অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

কবিতা

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা। রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত। সাহিত্যতীর্থ। ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৬.০০।

কবি নরেন্দ্রদেব স্মরণিকা। রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত। সাহিত্যতীর্থ। ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৫.০০।

লোকান্তরিত দুজন কবির স্মরণে আলোচ্য গ্রন্থ দুটি। যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রন্থ দুটি সম্পাদিত। কবি কুমুদরঞ্জন মানুষ হিসেবে কতো বড়ো ছিলেন, বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাজ্ঞাপক রচনাগুলি থেকে তা জানা যায়। এঁদের মধ্যে আছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, কুমারেশ ঘোষ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বিভূতি-

ভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রামেন্দ্রনাথ মল্লিকের 'কবি কুমুদরঞ্জন ও তাঁর কাব্য-চৈতন্য' আলোচনাটি কুমুদ-কবিতানুরাগী-দের কাছে মূল্যবান।

কবি নরেন্দ্র দেবের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বনফুল ও আরো অনেকে। আমাদের পড়তে ভালো লাগে নবনীতা (দেব) সেনের 'পিতৃস্মৃতি', বাণী রায়ের 'স্মরণ পূর্ণিমা'। কবি রাধারাণী দেবীর 'জন্মান্তর' সনেটগুচ্ছ কবি পত্নীর শোকাচ্ছন্ন মনের পরিচয় বহন করে।

পত্রিকা

মৃণাল (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮০)। সম্পাদক—মদনমোহন বৈতালিক ও হরিপদ ভৌমিক। মৃণাল কার্যালয়, তমলুক, মেদিনীপুর থেকে শ্রীমতী স্মৃতিকণা বসু কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

পশ্চিম বাংলায় সাময়িকপত্রের প্রাণকেন্দ্র অবশ্যই কলকাতা, কিন্তু মফস্বল থেকেও মাঝে মাঝে এমন কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যা আমাদের সপ্রশংস অভিনন্দনের দাবি রাখে। আলোচ্য মাসিকপত্রটিও সেই প্রশংসার দাবিদার। বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব তেমন কিছু না থাকলেও রচনাগুলি সুনির্বাচিত ও সুখপাঠ্য। সম্পাদকদের আন্তরিকতার প্রমাণ পত্রিকাটির সর্বাঙ্গে। সাজানো-গোছানোর ব্যাপারে আর একটু নজর দিলে পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে। আলোচ্য সংখ্যায় কবি বাসুদেব দেব রচিত একটি একাঙ্ক নাটক পাঠকের ভাল লাগবে। মায়া বসু ও আবদুল জব্বারের দুটি গল্পও উল্লেখযোগ্য। কবিতা লিখেছেন সুখেন্দু মল্লিক, সামসুল হক, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ বিশিষ্ট কবিরা। চিরঞ্জীব-এর খেলাধুলো সংক্রান্ত আলোচনাটিও বেশ বলিষ্ঠ।

সংসদ। সম্পাদক : শ্রীকালীপদ সেন। ১৩ রাষ্ট্রগুরু অ্যাভিনু, কলিকাতা-২৮। মূল্য এক টাকা।

দমদম সংস্কৃতি সংসদের এই মুখ-পত্রটির আলোচ্য বৈশাখ (১৩৮০) সংখ্যা-খানি শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষ প্রতিষ্ঠান-টির পক্ষ থেকে সাধক ঋষির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ-রূপে প্রকাশিত। বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতির স্থান, শ্রীবাসুদেব-অরবিন্দ সংবাদ, শ্রীঅরবিন্দ দর্শন, শ্রীঅরবিন্দের বেদধ্যান প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি রচনার অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দের অনুগামী ভক্তজন ছাড়াও সাধারণ সাহিত্যরসিক পাঠকদেরও ভাল লাগবে।

টেনিস-কন্যা ক্রিস এভার্ট

মার্কিন মুলুকের অষ্টাদশী টেনিস-কন্যা ক্রিস এভার্ট। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশ্ব টেনিসের সাড়া জাগানো নাম। বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে ওর টেনিস ক্ষেত্রে আবির্ভাব। মাত্র ১৬ বছর বয়সে প্রধানত ওর একক কৃতিত্বে ব্রিটেনকে হারিয়ে আমেরিকার উইটম্যান কাপ জয়। ১৭ বছর বয়সে প্রথম উইম্বলডনে এসেই সেমি-ফাইনালে খেলার কৃতিত্ব। এবার ১৮ বছর বয়সে উইম্বলডনে রানার্সের সম্মান। এই তিন বছরের মধ্যে পৃথিবীর ছোট বড় নানা প্রতিযোগিতায় ওর সাড়া বিক্রম। প্রথম সারির প্রায় সবাইকেই ক্রিস এভার্টের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

১৯৭১-এর কথাই ধরা থাক। ক্লিভল্যাণ্ডে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে উইটম্যান কাপের ফাইনাল খেলা। টেনিস সম্রাজ্ঞী বিলি জিন কিং, রোজমেরী ক্যাসালস এবং ন্যান্সি গুন্টার টেনিসের অন্তর্দ্বন্দ্বে আমেরিকা দল থেকে দূরে সরে রইলেন। জুলি হেলডম্যানও পায়ে চোট পেয়ে খেলতে পারলেন না। সুতরাং আমেরিকার টেনিস সম্মান ইজ্জত বাঁচাবার প্রধান দায়িত্ব পড়ল ক্রিস এভার্টের উপর। কিন্তু ব্রিটেন রীতিমত শক্তিশালী দল, সে দলে ভার্জিনিয়া ওয়েড এবং উইনি শ-এর মত টেনিস প্রতিভা রয়েছে। সবাই ধরে নিল গত ৪৬ বছরের মধ্যে ব্রিটেন যে সম্মান অর্জন করতে পারেনি এবার সেই সম্মান অর্জন করতে যাচ্ছে। [illegible] মার্কিন মুলুকের মাটিতে মার্কিন মেয়েদের পরাজিত করতে পেরেছে। টেনিস ইতিহাসে ৪৬ বছর আগে, ১৯২৫ সালে মাত্র একবারই ব্রিটেনের মেয়েরা সে সম্মান অর্জন করেছিল। এবার অর্জন করতে যাচ্ছে—সব বিশেষজ্ঞের ধারণা। কিন্তু ষোলো বছরের ওই মেয়েটি টেনিস বিশেষজ্ঞদের সে ধারণা পাল্টে দিয়েছিল ওর র‍্যাকেটের যাদুতে। উইনি শ এবং ভার্জিনিয়া ওয়েড দুজনকেই হার স্বীকার করতে হয়েছিল ক্রিসের কাছে। আমেরিকা ৪—৩ জয়ে আবার উইটম্যান কাপ দখলে রেখেছিল।

এবং যেভাবে ক্রিস ক্লিভল্যাণ্ডের হ্যারল্ড টি ক্লার্ক স্টেডিয়ামের সিনথেটিক কারপেট সারফেসের উপর র‍্যাকেটের প্রচণ্ড ঘায়ে টেনিস বলের বিস্ফোরণ চালিয়ে ব্রিটেনের এক নম্বর মেয়ে ভার্জিনিয়া ওয়েডকে ৬—১ ও ৬—১ গেমে পরাজিত করেছিল মেয়েদের টেনিসে তার তুলনা কম। অথচ বলতে গেলে ক্রিসের জীবনের ওটাই ছিল প্রথম বড় প্রতিযোগিতা। অপরদিকে ক্রিসের চেয়ে ১০ বছরের বড় ভার্জিনিয়া ওয়েড বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। সেই খেলার পরই টেনিস লিখিয়েরা ক্রিসের গায়ে কল্পনার তুলিতে একটি কথা লিখে দিয়ে-ছিলেন—'লিটল মো' অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মৌরিন কনোলী।

ওই খেলার সুবাদেই ১৯৭২-এর উইম্বলডনে ক্রিসকে নিয়ে সোরগোল উঠল। নাম হল বিস্ময় বালিকা। হ্যাঁ, বিস্ময়ই সৃষ্টি করেছিল ক্রিস প্রথম সারির টেনিস কন্যাদের পরাজিত করে। ভাগ্য একটু সহায় থাকলে হয়ত উইম্বলডনে প্রথম আবির্ভাবে ফাইনালেও খেলতে পারত। পারেনি। সেমি

দু' হাতে র‍্যাকেট ধরে ক্রিস এভার্টের বল মারার ভঙ্গি

ফাইনালে হেরে গিয়েছিল আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার ইভন গুলাগংয়ের সঙ্গে তিন সেটে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উইম্বলডন শেষে সবাই স্বীকার করেছিলেন ক্রিস এভার্ট ও গুলাগংয়ের সেমি ফাইনাল খেলাটিই ১৯৭২-এর উইম্বলডনের সবচেয়ে সংগ্রামী ও স্মরণীয় খেলা।

১৯৭৩-এর ভূমিকা কি? ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মার্গারেট কোর্টের কাছে এবং ইতালীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হারার পর উইম্বলডনের ফাইন্যালেও স্বদেশীয় বিলি জিন কিংয়ের কাছে পরাজয়। কিছুটা দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। কেননা মার্গারেট, গুলাগং, বিলি জিন সবাইকেই ক্রিসের কাছে আগে হার স্বীকার করতে হয়েছিল এবং এবারের এক নম্বর বাছাই মার্গারেটকে সেমি-ফাইনালে হারিয়েই ক্রিস ফাইনালে উঠেছিল। শুধু মার্গারেট কেন, কোয়ার্টার ফাইনালে পাঁচ নম্বর বাছাই মার্কিন মুলুকের আর এক টেনিস পটিয়সী রোজমেরী ক্যাসালসও হেরে গিয়েছিল ক্রিস এভার্টের কাছে।

ক্রিসের একটা দুঃখ, নামী মেয়েরা সবাই নাকি ওর বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে খেলে অল্পবয়সী মেয়ের কাছে হেরে গিয়ে গৌরব ম্লান হবার আশঙ্কায়। কিন্তু নামী মেয়েদের সঙ্গে ক্রিসের সংগ্রাম দেখেই দর্শকদের সুখ। ওর হাতের প্রচণ্ড পাসিং শট দেখে দর্শকের সৌন্দর্যের শিহরণ। বেস লাইন থেকে ব্যাক হ্যাণ্ড এবং ফোর হ্যাণ্ডের মারে ও প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে তোলে। ক্লিফ ড্রিসডেলের মত দু'হাতে র‍্যাকেট ধরে এমনভাবে প্রতিপক্ষের নাগাল এড়িয়ে পাসিং শট মারে যে বল পড়ে ঠিকরে বেরিয়ে যায় কোর্টের বাইরে। বেস লাইন থেকে মারা এভার্টের দ্রুতগতি মাটিঘেষা স্ট্রোকে বিপক্ষ যতক্ষণ ভুল না করে বা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে না পড়ে ততক্ষণ কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে র‍্যালি চালাবারও ক্ষমতা ধরে ক্রিস।

ক্রিস এভার্টের শিরায় শিরায়ও টেনিসের শোণিত প্রবাহিত। বাবা একজন নামকরা টেনিস-কোচ। এক কাকা হিউস্টনে পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়। আর এক কাকাও টেনিস খেলে পয়সা রোজগার করেন।

এভার্টরা পাঁচ ভাইবোন। ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলে ওদের তিন কামরা বিশিষ্ট ছোট বাড়িটি সব সময় টেনিসের আলোচনায় মুখর থাকে। পাঁচ ভাইবোনেরই টেনিসে সুন্দর হাত এবং আমেরিকার টেনিসে পরিচিত নাম। বাবা জেমস এভার্টের মতে ছোট বোন জিন, যার বয়স এখন পনেরো, সে ১২।১৩ বছরে যতখানি এগিয়ে গিয়েছে ক্রিসও নাকি ওই বয়সে ততখানি এগোতে পারেনি। টেনিসে জিনেরও স্বর্ণ সম্ভাবনা। বড় ভাই ড্রু (১৯) ফ্লোরিডার সিডেড খেলোয়াড়, ছোট জন (১২) জাতীয় বয়েজ টুর্নামেন্টে বেশ নাম করেছে।

বাড়িতে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা। রাত ১০টার মধ্যে বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে, ভোরে শয্যা ত্যাগ করে কোর্টে যেতে হবে অনুশীলনের জন্য। স্কুল ছুটির পর আবার দু ঘণ্টা অনুশীলন। ক্রিসের মা কোলেট এভার্টও ওদের টেনিস চক্রের সদাসঙ্গী। সাধে কি আর টেনিস ক্ষেত্রে ওদের এতখানি অগ্রগতি? এভার্টদের নিয়ে আমেরিকার এত গর্ব? মার্কিন পত্র পত্রিকাতেও পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে—ক্রিস-এর মত টেনিস কন্যা পাওয়া আমেরিকার পক্ষে ভাগ্যের কথা।

—মুকুল

খেলোয়াড়দের অনসিক দক্ষতা।

খেলাটি ড্র হয়ে গেছে তাতে সবাই খুশি। ইডেনে আসর বসেছিল বলেই কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী দর্শক খেলাটি দেখার সুযোগ পেয়েছে। এর আগে কোন ফুটবল খেলায়, এমন কি ইডেনের ফুটবল খেলাতেও ৭০/৭৫ হাজার দর্শক সমাগম হয়নি। বিশাল জনতার ফ্রেমে আঁটা ইডেন ক্রিকেট মাঠের সবুজ ঘাসের উপর ফুটবল খেলার দৃশ্যও এক সৌন্দর্যের ছবি। এক দলের আংশিক ব্যর্থতা এবং আর এক পক্ষের বাড়তি বিক্রম সত্ত্বেও বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং উল্কাবর্ষী দিক দিয়ে খেলাটি দর্শকদের নিরাশ করেনি।

১৯৭৩-এর উইম্বলডন

বাংলাদেশ ভিয়ার পেশাদার খেলোয়াড়ের উপর আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের শাস্তিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর প্রথম সারির শতু খেলোয়াড় সমেত মোট ৭৩জন পেশাদার খেলোয়াড়ের উইম্বলডন বয়কট, বাছাই তালিকা তৈরী হবার পর আবার নতুন করে বাছাই তালিকা তৈরী, একজন নতুন খেলোয়াড়ের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ এবং মহিলাদের উইম্বলডনে টেনিস সম্রাজ্ঞী বিলি জিন কিং-এর নতুন রেকর্ড প্রভৃতি নানা কারণে ১৯৭৩-এর উইম্বলডন সম্পর্কে টেনিস রসিকদের মিশ্র অনুভূতি। ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকেও এবারের উইম্বলডন স্মরণীয় হয়ে আছে সর্বাধিক খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে এবং ভারত চ্যাম্পিয়ন বিজয় অমৃতরাজের পরাক্রমে। প্রথম সারির পেশাদার খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করলে কি হত বলা শক্ত। কিন্তু যা হয়েছে তাতে বলা যেতে পারে রামনাথন কৃষ্ণনের পর কোন বার ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাফল্যের সম্ভাবনায় এতখানি উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়নি যেমন হয়েছে এবার।

আমাদের খেলোয়াড়দের কথা সংক্ষেপে পরে আলোচনা করছি। তার আগে চ্যাম্পিয়নদের কথা সেরে নিই।

উইম্বলডনের নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ার জান কোডেস ফাইনালে রাশিয়ার অ্যালেকস মেট্রেভেলিকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করে। মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন মার্কিন ঘরনী বিলি জিন কিং ফাইনালে স্বদেশীয় অষ্টাদশী ক্রিস এভার্টের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে।

বলা বাহুল্য, এর আগে ৭ বার ফাইনাল খেলে যিনি চারবার বিজয়িনীর সম্মান পেয়েছেন সেই বিলি জিন কিং তাঁর অষ্টম ফাইনালে জয়ের ফলে মোট পাঁচবার বিজয়িনী হয়ে যুদ্ধোত্তর উইম্বলডনে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। উইম্বলডনের ৮৭

পাচবারের উইম্বলডন বিজয়িনী বিলি জিন কিং

বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, আমেরিকার হেলেন উইলস মুডি মোট ৮ বার, শার্লি উডস ৫ বার এবং ফ্রান্সের সুজান লাংলেন ৬ বার উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ন হলেও যুদ্ধের পর কোন মেয়ে বা পুরুষ খেলোয়াড় পাঁচবার উইম্বলডন জয়ের সম্মান পাননি।

শুধু পাঁচবার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়নই নন, বিলি জিন কিং এবার নিয়ে দুবার পেলেন ত্রিমুকুট জয়ের সম্মানও। ১৯৬৭তে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে তিনি মেয়েদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসের বিজয়ীর পুরস্কারের ভাগীদার হয়েছিলেন। এবারও হলেন। এক অনন্য রেকর্ড।

প্রতি বছরই উইম্বলডন একজন নায়ককে খুঁজে পায়। এবারও পেয়েছে। অংশগ্রহণকারী তিনজন পেশাদার খেলোয়াড়ের অন্যতম, গতবারের রানার্স ও এবারের শীর্ষ বাছাই ইলি নাস্তাসেকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করে এবারের নায়ক হয়েছে আমেরিকার কলেজ চ্যাম্পিয়ন একুশ বছর বয়সী অ্যালেক্স মেয়ার। কোয়ার্টার ফাইনালে ৮ নম্বর বাছাই পশ্চিম জার্মানীর জুর্গেন ফ্যাসবেণ্ডারকেও মেরে দেয়। কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

ভারতের বিজয় অমৃতরাজও নায়ক হয়ে উঠতে পারত যদি ভাগ্য একটু সহায় থাকত। দুই নম্বর বাছাই এবং দুবারের ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ন জান কোডেসের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে পাঁচ সেট পর্যন্ত তীব্র সংগ্রাম করে বিজয় হেরে যায়। মীমাংসা-সূচক পঞ্চম সেটে বিজয়ই এগিয়ে গিয়েছিল ৫—৪ গেমে। ম্যাচ জেতার সুবর্ণ সুযোগও এসেছিল তার সামনে। কিন্তু একটু ভুল এবং একটু অভিজ্ঞতার অভাবে বিজয় রামনাথন কৃষ্ণনের পর ভারতের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলডনের সেমি ফাইনালে উঠতে পারল না। ভারতের কিছুটা দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। জয়দীপকেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হয়েছে ওই কোডেসের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভারতেরই খেলোয়াড় আনন্দ অমৃতরাজের সঙ্গে প্রথম রাউণ্ডে সুইডেনের বিস্ময় বালক, ৬ নম্বর বাছাই বরন বরগের মুখোমুখি হওয় ও বর্ষীয়ান খেলোয়াড় প্রেমজিত লালের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। তবু বিজয় অমৃতরাজ যেভাবে ৭ নম্বর বাছাই অস্ট্রেলিয়ার জাওয়েন ডিব্লিকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়ে কোয়ার্টার
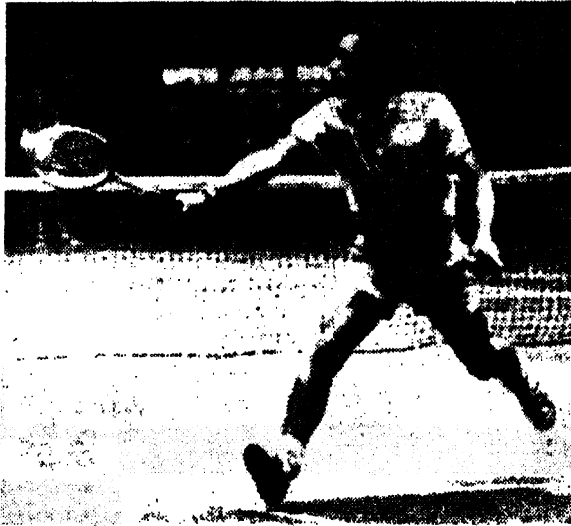
উইম্বলডনের নতুন চ্যাম্পিয়ন জাস কোডেস

ফাইনালে কোডেসের কাছে হেরেছে এবং জয়দীপ-প্রেমজিত জুড়ি ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছে এক নম্বর জুড়ি ইল নাস্তাসে ও জিম কনরসের কাছে তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

ফাইনাল খেলাগুলির ফল নীচে দেওয়া হল :

পুরুষদের সিঙ্গলস—চেকোস্লোভাকিয়ার জান কোডেস ৬—১, ৯—৮, ৬—৩ গেমে রাশিয়ার অ্যালেক্স মেত্রেভেলিকে, মহিলাদের সিঙ্গলস—আমেরিকার বিলি জিন কিং ৬—০ ও ৭—৫ গেমে স্বদেশের ক্রিস এভার্টকে, পুরুষদের ডাবলস—রুমানিয়ার ইল নাস্তাসে ও আমেরিকার জিম কনরস ৩—৬, ৬—৩, ৬—৪, ৮—৯ ও ৬—১ গেমে অস্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রেজার ও জন কুপারকে, মহিলাদের ডাবলস—আমেরিকার বিলি জিন কিং ও রোজমেরী ক্যাসালস ৭—৫ ও ৭—৫ গেমে ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া দার ও নেদারল্যান্ডসের বেটি স্টোভকে, মিক্সড ডাবলস—অস্ট্রেলিয়ার আওয়েন ডেভিডসন ও আমেরিকার বিলি জিন কিং ৬—৩ ও ৬—২ গেমে মেক্সিকোর রাউল র‍্যামিরেজ ও আমেরিকার জ্যানেট নিউবেরীকে পরাজিত করে।

ইংলণ্ডের বাবার

তিন-টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে ২—০ জয়ে হারিয়ে ইংলণ্ড আবার বাবার পেল। ইংলণ্ডের সঙ্গে সবসুদ্ধ ৪৫টি টেস্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি টেস্টও নিউজিল্যান্ড এ পর্যন্ত জিততে পারল না। আশার সম্ভাবনা এবং প্রতিশ্রুতি নিয়েই নিউজিল্যান্ড এবার ইংলণ্ড সফরে এসেছিল। তাদের দলটি সত্যিই ছিল শক্তিশালী। কিন্তু এবারও তাদের জয়ের সাধ অপূর্ণ থেকে গেছে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে ৩৮ রানে হেরেছে। লর্ডস-এর দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিত থেকে গেছে নিউজিল্যান্ডেরই ব্যাটের চমকের মাধ্যমে। হেডিংলে টেস্টে রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে হেরেছে ইনিংস ও এক রানে।

লীডসের হেডিংলে মাঠে টসে জয়ী হয়ে নিউজিল্যান্ডই প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায়। ২৪ রানের মাথায় আর্নল্ড ও ওল্ডের মারাত্মক বোলিংয়ে পর পর তিনটি উইকেট পড়ে যাবার পর প্রধানত বার্জেস ও পোলার্ডের দৃঢ়তায় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের ৯ উইকেটে ২৬২ রান ওঠে। দ্বিতীয় দিন ২৭৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। লাঞ্চ বিরতির সময় পর্যন্ত ইংল্যান্ড অ্যামিসের উইকেট হারিয়ে ৭০ রান তোলে। তারপর বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ওইদিন আর খেলা হয় না। তৃতীয় দিন ইংলণ্ড দেখায় ব্যাটের দাপট। ইংলণ্ডের এক নম্বর ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কট, সব দেশের বিরুদ্ধেই যার সেঞ্চুরি আছে এবং শুধু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে যার সেঞ্চুরি ছিল না, সে ১১৫ রানের একটি রাজকীয় সেঞ্চুরি করে কাট, ড্রাইভ ও হুক-এর প্রদর্শনীর মাধ্যমে। কিথ ফ্লেচারের ৮১ এবং অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থের ৬৫ রানের মধ্যেও সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। ৬ উইকেটে ৩৩৭ রান তুলে ইংল্যান্ড তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের সকালে ৪১৯ রানে ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হবার পর প্রথম ইনিংসে ১৪৩ রানের ঘাটতি নিয়ে দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিং শুরু করে নিউজিল্যান্ড ১ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। অর্থাৎ তখনো তাদের ৫ রানের ঘাটতি। সুতরাং নিউজিল্যান্ড ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পাবে কি না এই প্রশ্নই বড় হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে।

পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলার আর একটু আকর্ষণও ছিল নিউজিল্যান্ডের গ্লেন টার্নারের একটি বিশ্ব রেকর্ডের সম্ভাবনায়। আর্নল্ড, ওল্ড ও স্নোর পেস বলের বিরুদ্ধে আর সবাই ব্যর্থ হলেও ওপেনিং ব্যাটসম্যান টার্নার 'একা কুম্ভের নকল গড় রক্ষার' সংগ্রামের মত ব্যাট বলের সংগ্রামে ৮০ রান করে অপরাজিত ছিল এবং একটি বিশ্ব রেকর্ডের সমীপবর্তী হয়েছিল। কেননা টার্নার অস্ট্রেলিয়ার বিল উডফুল এবং ইংল্যান্ডের লেন হাটন ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে সর্বাধিক দুবার করে সারা ইনিংসে নট আউট থেকেছে। তিনবার কেউই থাকতে পারেনি। সুতরাং টার্নার শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকলে নতুন রেকর্ডের অধিকারী হত। কিন্তু টার্নার পারেনি। পঞ্চম দিন ২৪ মিনিট খেলা চলার পর নিজেই আউট হয়ে বিশ্ব রেকর্ড থেকে বঞ্চিত হয়েছে, নিউজিল্যান্ডকেও ইনিংস হার থেকে বাঁচাতে পারেনি। উল্লেখ্য, যে গ্লেন টার্নার ছিল নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের প্রধান স্তম্ভ এবং যে পৃথিবীর সপ্তম খেলোয়াড় হিসাবে মে মাসের মধ্যে ইংলণ্ড মরসুমে হাজার রান পূর্ণ করে ক্রিকেট বিশ্বে বেশ একটু আলোড়ন এনেছিল, প্রথম দুটি টেস্টের তিন ইনিংসে সে ২৫ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। অদৃষ্টের পরিহাস, যে টেস্টে টার্নারের ব্যাটে রান এল সেই টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে হারতে হল শোচনীয়ভাবে ইনিংসে।

এই সিরিজের একটি উল্লেখ করার মত ঘটনা, ইংল্যান্ডের স্পিন বোলাররা একটিও উইকেট পায়নি, পেস বোলাররাই বাজী মাত করেছে। শেষ টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর।

নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংস—২৭৬ (মার্ক বার্জেস ৮৭, ভিক পোলার্ড ৬২, কেন ওয়াডসওয়ার্থ ৩৪; ক্রিস ওল্ড ৭১ রানে ৪ উইঃ, জিওফ আর্নল্ড ৫৭ রানে ৩ উইঃ, জন স্নো ৫২ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—৪১৯ (জিওফ বয়কট ১১৫, কিথ ফ্লেচার ৮১, রে ইলিংওয়ার্থ ৬৫, ক্রিস ওল্ড ৩৪; কলিঞ্জ ৭৪ রানে ৫ উইঃ, বেভ কংডন ৫৪ রানে ২ উইঃ, ব্রুস টেলর ১১১ রানে ২ উইকেট।)

নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস—১৪২ (গ্লেন টার্নার ৮১; জিওফ আর্নল্ড ২৭ রানে ৫ উইঃ, জন স্নো ৩৮ রানে ২ উইঃ, ক্রিস ওল্ড ৩২ রানে ২ উইকেট।)

একলব্য

দেখা গিয়েছিল। কনভেনশন-এর বাইরে নতুন কিছু একটা করার সংপ্রয়াস দেখা যাচ্ছিল। সে আন্দোলন ছিল অল্পস্থায়ী। একটি দশক পেরোতে না পেরোতেই আবার গতানুগতিকতার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হতে লাগল। এখন সাধারণভাবে বাংলা ছবিতে আর্টের দৈন্য অনেক বেশি প্রকট। নতুন আঙ্গিক ও বক্তব্যের ছবি হয় অতি সামান্য। সারা বছরে একটা কী দুটো, কখনও তাও নয়। এই রকম একটি পরিবেশে সত্যজিৎ রায় ছবি তৈরির কাজে নিমগ্ন। শ্রীরায়ের ছবি ছাড়া আর কী ভারতীয় ছবি আছে বিদেশের সমালোচকরা বোধ হয় এখন তার খোঁজও করেন না। ওঁরা শ্রী রায়ের ছবির সঙ্গেই বিশেষ পরিচিত। শ্রীরায়কে ঘিরে ফরাসী নুভেল ভাগ-এর মতোই এক আন্দোলন এই কলকাতায় গড়ে উঠতে পারত। পরিবেশও তৈরি হয়েছিল। ফিলম সোসায়েটি আন্দোলন পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকেই রূপ নিতে থাকে। এখন এই আন্দোলন

"একদা" (পরিচালনা : সমীর রায়) ছবিতে রীতা ভাদুড়ি ও ভাস্কর চৌধুরী

দেশে শক্তিশালী। নতুন সিনেমার মুভমেন্ট-এর জন্য ফিলম সোসায়েটি কর্মধারার প্রসার অপরিহার্য। কলকাতায় সব শর্তই পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু কিছুই হল না। এই ব্যর্থতার কারণগুলি খুঁজে দেখা যেতে পারে।

* * *

এক বিশেষ মানসিকতাই সকল ব্যর্থতার জন্য দায়ী। সত্যজিৎ রায় যে নিজেকে সকল সম্ভাব্য আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন তা নয়। শ্রীরায়ের চলচ্চিত্রকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন হল না। একাধিক উত্তরসূরীকে শ্রীরায় নিশ্চয়ই প্রভাবান্বিত করেছেন। তাঁরাও চলচ্চিত্রশিল্পে তেমন ঠাঁই পেলেন না। তাঁদের আপসহীনতাকে ব্যবসায়ী মহল ঔদ্ধত্য বলে ভাবেন। টিকিটঘরে যে পরিচালক বা শিল্পীর বিশেষ কদর চলচ্চিত্রশিল্প তাঁদেরই অনুগামী, তাঁদেরই সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত রাখতে চান। সত্যজিৎ রায় বা অন্য যাঁরা ভিন্ন ধরনের ছবি করেছেন তাঁদের চলচ্চিত্রকর্ম থেকে ইনডাসট্রি কোন প্রকার প্রেরণা বা শিক্ষা আহরণ করতে রাজি নন। ব্যবসায়ী মহলের বক্তব্য, সত্যজিৎ রায় বিদেশের জন্য ছবি করুন, অন্যরা জাতীয় পুরস্কারের জন্য ছবি বানাতে থাকুন, কিন্তু ইনডাসট্রি বাঁচানর জন্য টিকিটঘরের আনুকূল্য পেতেই হবে। ইনডাসট্রি কিসে বাঁচে সে-সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান সীমিত। তাঁদের ধারণা শতবার ভুল প্রমাণিত হলেও তাঁরা আত্মসমালোচনায় আগ্রহী নন। বড় শিল্পকর্মের সঠিক মূল্যায়ণের অভাব থেকেই এই মনোবৃত্তির জন্ম। এবং সেই হেতু সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রকর্ম দ্বারা সাধারণভাবে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প প্রভাবান্বিত হতে পারল না। আবার এই মনোবৃত্তির জন্যই বুঝি ব্যক্তিগতভাবেও শ্রীরায়কে যথোপযুক্ত অভিনন্দন জানাবার উৎসাহও এই চলচ্চিত্রশিল্পে তেমন দেখা যাচ্ছে না। সত্যজিৎ রায়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতিতে এখানকার চলচ্চিত্র-শিল্পের সকলেই গর্বিত সন্দেহ নেই। তবু আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন জানাবার অন্য একটা তাৎপর্য আছে। সেই পথের পাঁচালির আমল থেকে কতবারই তো শ্রীরায় বিদেশ থেকে জয়মাল্য নিয়ে ফিরে এসেছেন। সাংবাদিকরা তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে যতবার সংবর্ধনা জানিয়েছেন চলচ্চিত্রলোককে সে-তুলনায় কিছুটা নিষ্ক্রিয় দেখা গেছে। সম্প্রতি তিনি যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট উপাধিতে সম্মানিত হলেন সেটি সমস্ত চলচ্চিত্রশিল্পের এবং এই শিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের প্রত্যেকেরই সম্মান। এর আগে কোন চলচ্চিত্রকার এত বড় সম্মান পাননি। এই স্বীকৃতিতে চলচ্চিত্রকেই মর্যাদা দেওয়া হল। অথচ শ্রীরায়কে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানাবার কোন তোড়জোড় কলকাতার চলচ্চিত্রলোকে দেখা গেল না। সত্যজিৎ রায়ের জন্যই বিদেশে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের এত মর্যাদা। এই সত্যটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই তো শিল্পী-সংসদের পুণ্ডী-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সৎকাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সংবর্ধিত ব্যক্তিদের তালিকায় সত্যজিৎ রায়ের নাম দেখা গেল না।

পুরস্কারবিজয়ীদের নিয়ে তথ্যচিত্র

"জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী" নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন পরিচালক শুভেন্দু ঘোষ। ১২০০ ফুটের এই তথ্যচিত্রে সরকার অথবা সরকারী সংস্থা কর্তৃক সম্মানিত কিছু ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরস্কৃতদের মধ্যে আছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারবিজয়ী সত্যজিৎ রায়, সাহিত্য আকাদমির পুরস্কারপ্রাপ্ত সন্তোষকুমার ঘোষ, রাজ্য সরকারের পুরস্কারে সম্মানিত শোলা-শিল্পী অনন্ত মালাকার, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুটবল খেলোয়াড় নয়ীম; এ ছাড়া রয়েছেন কৃতী শিক্ষক, শিক্ষিকা, শ্রমিক, কারুশিল্পী এবং সাহসিকতার জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত এক কিশোরী। সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর সকলেই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ছবিতে এসেছেন। প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্নের উত্তর ওঁরা দ্বিধাহীনভাবেই দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের

রেকরড

নজরুল গীতি

বাংলা কাব্যসংগীতে নজরুল-গীতি একটি বড় শাখা। শুধু সুর শুনে নজরুলের গান চিনে নেওয়া যদিও কঠিন—সর্বাগ্রে জানা দরকার গানটি কার রচনা—তবু, নজরুল-গীতির গায়কি প্রায় আলাদাভাবেই চিহ্নিত। অবশ্য সমসাময়িক গীতিকারের গানকেও নজরুল-গীতি বলে ভুল করা হয়। সুর তো নয়ই গায়কিও এ ক্ষেত্রে নজরুলের গানকে সব সময় আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে না। নজরুল-জয়ন্তী উপলক্ষে এবং অন্য সময়েও কি গ্রামোফোন কোমপানি কবির গানের রেকরড বের করছেন বেশ কিছুকাল যাবত। এবারেও কোমপানি কিছু নজরুল-গীতির রেকরড বের করেছেন। এর ফলে নজরুলের গানের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। নজরুলের গান অজস্র বা অসংখ্য নয়। তার মধ্যে কবির জনপ্রিয় প্রেমের গানগুলির রেকরড আগেই বেরিয়েছে। আধুনিক গানের বিশিষ্ট শিল্পীরা গেয়েছেন।

ইদানীং নজরুলের গানের জন্য কয়েকজন শিল্পী বিশেষভাবে চিহ্নিত। রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পীর তালিকা যেমন মোটামুটি আলাদা, তেমনি নজরুলের গানের জন্য পৃথক শিল্পীগোষ্ঠীর প্রয়োজন আছে কি?

এই প্রশ্নের মীমাংসা এখন হবার নয়, তবে এই নতুন শিল্পীদলের পুরোভাগে আছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মানবেন্দ্রর গাওয়া বারোটি গানের এল-পি রেকরড নজরুলগীতির অনুরাগীদের প্রাপ্তি বলে মনে হবে। নজরুলের গান তিনি যথেষ্ট তালিম নিয়েছেন। সুনামও পেয়েছেন প্রচুর।

নজরুলের গান অনেকের মতে, যদি গায়কিপ্রধানই হয় তবে তার একটি নিখুঁত রূপ যে মানবেন্দ্রর গানে মেলে তাতে কোন সংশয় নেই। তাঁর এল-পি রেকরডের গানগুলির (পরো পরো চৈতালি সাঁঝে/আসলো যখন ফুলের ফাগুনে/পলাশ ফুলের মৌ পিয়ে/সখি বল ওকে চলে যেতে বলো/পায়ে যে বিঁধছে কাঁটা/ডেকে ডেকে কেন সখি/সহসা কি গেল বাধালো/আলগা করো গো খোঁপার বাঁধন/কাজরি গাহিয়া এসো/হায় আঙিনায়/এত কথা কিগো কহিতে জানে/সাথীহারা উদাসী ভৈরবী) মধ্যে কোনটি বেশি ভাল লেগেছে বলা কঠিন, শিল্পীর কণ্ঠে এখন নজরুলের গান মাত্রই সতেজ ও চিত্তাকর্ষক।

নজরুলের গানের আর একজন প্রায় অপরিহার্য শিল্পী এখন অনুপ ঘোষাল। ভক্ত মুক্তাকে ও ডেকে তিনি ঈ-পি রেকরডে চারখানি (অন্ধকার মহা আর সংগীতে/কত রাত পোহায়/সাজিয়াছ যোগী/বাঁসরী বিজনে) গান গেয়েছেন। শেষের গানটি বিশেষভাবে ভাল লাগে। অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় কিছুদিন হল নজরুল-গীতিতেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছেন। ঈ-পি রেকরডে তাঁর এবারের চারটি গান (কে বিদেশী মন উদাসী/দিতে এলে ফুল/রুম ঝুম রুম ঝুম/স্বপনে এসো নিরজনে) আগের চেয়ে বেশি সপ্রাণ। ফিরদৌসী রহমানের কণ্ঠেও চারটি গান (আসবে কবে তুমি ফিরে/চোখ মুছিলে জল মোছে না/পেয়ালা কেন দিতে আনিলে/গানগুলি মোর আহত পাখির সম)। নজরুল-গীতির আসরে শ্রোতারা শিল্পীকে সাদরে জানাবেন।

অধীর বাগচি (জনম জনম গেল/তুমি নাই পারিলে), পূরবী দত্ত (চৈতালি চাঁদিনী রাতে/সই ভাল করে), মীরা দাশগুপ্ত (চম্পা পারুল যূথি/মুখে কেন নাহি বল), নীতীশ দত্তরায় (এলো ওই পূর্ণ শশী/পলাশ ফুলের গেলাস), শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায় (কেমন করে বাজাও বল/নিশি ভোর হল জাগিয়া) এবং গীতশ্রী শেফালী ঘোষের (বরষা ঐ এল/প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না) গানে নিষ্ঠাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অধীর বাগচির জনম জনম গেল (বাগেশ্রী রাগাশ্রিত) এবং শেফালী ঘোষের "বরষা ঐ এল" চমৎকার। পূরবী দত্ত, ও মীরা দাশগুপ্তের গান শুনে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রোতারা সহজেই আশান্বিত হবেন।

"যদুবংশ" (পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী) ছবিতে অপর্ণা সেন ফটো—দেশ

অন্য রেকরড

সম্প্রতি চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এইচ-এম-ভি রেকরডে সুকান্ত ভট্টাচার্যের "আঠার বছর বয়স কী দুঃসহ" গেয়েছেন। শিল্পীর গান শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করবে। শিল্পী গানে আবেগ সঞ্চার করতে পেরেছেন। সুর দিয়েছেন অজয় দাস।

এইচ এম ভি রেকরডে পূর্ণেন্দু রায় নিজের কথা ও সুরে দুটি আধুনিক গান (কেন জানি না/শুনি গো শুনি) গেয়েছেন। শিল্পী প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন।

ডানাভাঙা পাখি

(পথিক দল)

লোভ পাপ পাপে মৃত্যু—এই প্রবাদ বাক্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ডানাভাঙা পাখি-র কাহিনী। সমাজের নীচুতলা থেকে উপরতলায় ওঠার আশা এবং সেই আশা-ভঙ্গের কাহিনী এই নাটকের বক্তব্য। নাটকের আদ্যন্ত মেলোড্রামার চড়া পর্দায় বাঁধা। শিল্পীরা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেননি। সংলাপও ভাল করে মুখস্থ হয়নি সকলের। অভিনয়ে কিছুটা দক্ষতা দেখিয়েছেন দেবেন দাশগুপ্ত। আর সকলের অভিনয় মোটামুটি এক রকম। পরিচালক (কেষ্ট দাশগুপ্ত) শিল্পীদের আরও কিছুটা তৈরী করে নিয়ে মঞ্চে নামালে ভাল করতেন। বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ-পরিকল্পনায় তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে না। চিত্ত সরকারের আলোকসম্পাত প্রথানুগ। তবে শেষ দৃশ্যের ফ্রিজটুকু তিনি দক্ষতার সঙ্গে ধরেছেন। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে ঝড়ের এফেকট দর্শকের ভাল লাগে। এখানে নাট্য-পরিচালকেরও কৃতিত্ব আছে।

নাট্য-সমালোচক

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

'বাজপাখিগুলো আমায় গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে'

'উড়ে চলল দূর আকাশে---- দুঃস্বপ্নের মত।'

একটি মেয়ের কাহিনী ---
বাজপাখিগুলো আমায় নিয়ে ক্রমশঃ দূর আকাশে উড়ে যাচ্ছে ...এর বেশী আমার মনে নেই।
11/26

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম, আমি গাড়িটার পাশেই বসে আছি ...কিন্তু গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।
??

সবটাই কি তবে আমার স্বপ্ন?
আপনি গাড়ি-অ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন। বাকীটা মনে হয় দুঃস্বপ্ন।
তোমার গাড়িটা কোথায়?

ঐ যে আমার গাড়ি।
চলুন, আপনাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিই। আর, আপনি কি একটা লিফ্‌ট চান?
না। ধন্যবাদ।

আমার কিন্তু একটুও কেটে-ছড়ে যায় নি।
তবু একবার ডাক্তার দেখানো ভাল।
বিদায়।

মেয়েটির কিন্তু একটু-ও আঘাত লাগেনি যদি না মাথার ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে --
বাঁচাও
?

পৌর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার মিলিটারির হাতে—এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। কলকাতা করপোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে ৬ জন মিলিটারি অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার মধ্যে তিনজনকে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে মেজর জেনারেলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। মিলিটারি অফিসারদের হাতে যে সব পৌর বিভাগের ভার দেওয়া হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে আছে : আবর্জনা, কেন্দ্রীয় গুদাম, স্টোর বিভাগ ও জল সরবরাহ প্রভৃতি। করপোরেশনের বিভিন্ন দফতরের কাজ-কর্মে অবনতি ঘটায় মিলিটারির সাহায্য নিতে হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র জানান। বিশেষ করে আবর্জনা অপসারণ ও মোটর ভেহিকলস ও কেন্দ্রীয় গুদামের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। এমন কি করপোরেশনের একজন মুখ্য ইঞ্জিনিয়ারসহ দশ-বারজন পদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ১৯৭২ সনে করপোরেশন দ্বিতীয়বার বাতিল করা হয়। প্রথম বাতিল করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে। গত [illegible] পনের মাসের মধ্যে করপোরেশনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতিই ঘটেছে। করপোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিটিতে করপোরেশনের সংগ্রাম কমিটির চারজন প্রতিনিধিকে নেওয়ার পরেও কাজকর্মে তেমন কোন উন্নতি দেখা যায়নি।

দেশী সংবাদ

২ জুলাই—কংগ্রেস সম্পর্কে সি পি আই-এর স্ট্র্যাটেজি পাল্টাচ্ছে। একেকটি বামপন্থী দলের ধারণা, সি পি আই নেতৃত্ব ঠেকে শিখছেন। কেননা সি পি আই নেতৃত্বের একাংশের কংগ্রেস সম্পর্কে মোহ কাটছে। মোটা-মোটিভাবে সি পি আই-এর প্রস্তাবিত [illegible] সম্পর্কে প্রায় সব বামপন্থী দলই সমর্থন জানিয়েছেন।

[illegible] ভারতে [illegible] চালের অভাব। তাই ভারত সরকার পশ্চিম-বঙ্গকে জুলাই-[illegible] এই [illegible] হাজার টনের বেশী চাল সরবরাহ করতে পারবেন না। অর্থাৎ প্রতি মাসে [illegible] হাজার টন। [illegible] এই ঘাটতি [illegible] কেন্দ্র প্রতি মাসে গম [illegible] বেশ কম দেবেন।

৩ জুলাই—কলকাতা [illegible] কমিশনারদের কাঁচিপুরের মাধ্যমে গত তিন মাসে ২.২ কোটি টাকা মূল্যের চিনি খালাস করা হচ্ছে না। এর ফলে বাজারে কৃত্রিম চিনির দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। চিনির দরও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বৈঠকে রাজি। ভারত-পাক বৈঠকের প্রস্তাব করে পাকিস্তান যে চিঠি দিয়েছিল সুইস দূতাবাসের মাধ্যমে, ভারত থেকে তার জবাব গেল পিন্ডির কাছে। নিয়ম অনুযায়ী এবার বৈঠকের স্থান নির্বাচনের পালা পাকিস্তানের।

৪ জুলাই—পশ্চিমবঙ্গে ধান চালের সংগ্রহ মার খাচ্ছে। অথচ এই কাজের জন্য এক সি আই-এর চাঁদার [illegible] টাকা পড়ে আছে সমবায় সমিতিগুলি কাজে লাগাচ্ছেন না বলে অভি-যোগ। এদিকে মার খাচ্ছে গমের সংগ্রহও। সম-বায় দফতর নাকি বলছেন, ধান চালের সংগ্রহ-মূল্য নিচু বেঁধে দেওয়ার ফলেই সংগ্রহে বাধা হচ্ছে।

আজ সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে নকশাল যুবকদের অভিযোগ শোনেন। তাঁরা শ্রীনারায়ণকে জেলে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, [illegible], চিকিৎসা, ওষুধ সরবরাহ নিয়ে কিছু অভিযোগ করেছেন বলে জানা যায়।

৫ জুলাই—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য দফতরের ভূমি সংক্রান্ত দুর্নীতির ব্যাপারে [illegible] [illegible] [illegible] খাদ্য দফতরের পদস্থ অফিসার শ্রী পি কে সেন-[illegible] গ্রেফতার করে। এর পর খাদ্য-মন্ত্রী তাঁকে সাসপেন্ড করেন।

[illegible] জুলাই থেকে কলকাতায় বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় চালের মাথাপিছু সাপ্তাহিক পরিমাণ ১৫০ গ্রাম হিসাবে কমানো হচ্ছে। অবশ্য আগামী সপ্তাহ থেকে গমের সাপ্তাহিক মাথাপিছু ৫০ গ্রাম বাড়ানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৬ জুলাই—রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য দফতরের জন্যও দু-একটি পদে মিলিটারি অফিসারের সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ মিলিটারি অফিসারকে রাজ্যের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল নীলরতনের পরিচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে গত সপ্তাহে খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র যখন পদত্যাগ করে-ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তখনই তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে অত্যন্ত ভুল করেছেন। ৩০ জুনই [illegible], খাদ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন।

৭ জুলাই—[illegible] [illegible] মোটর রেল স্টেশনে চোরাচালানকারীদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষের সময় পুলিস গুলি চালালে [illegible] নিহত হন। দুজন সরকারী সাব-ইন্সপেক্টর সহ বারোজন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় মোট ৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সি পি আই-এর [illegible] সম্পাদক [illegible] খবর রাও জানান, মূল্যবৃদ্ধি এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মজুতদারির বিরুদ্ধে তাঁর দল গণ-প্রচার ও গণ-আন্দোলনে নামছে। দলের শ্রমিক [illegible] কৃষকদের গণ-সংগঠনগুলির [illegible] মজুতদারবিরোধী অভিযান চালানোর [illegible] এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৮ জুলাই—আসন্ন পূজার [illegible] বেড়াতে যাবার জন্য পূর্ব রেলের [illegible] সমস্ত টিকিট ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। [illegible] শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ টিকিটের [illegible] চোরা-কারবার ও কাউন্টারের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। [illegible] টিকিটের চোরাকারবারের [illegible] [illegible] সমস্ত কমিটি [illegible] তদন্তের রিপোর্টের সূত্রে এই তথ্য জানা যায়।

বিদেশী সংবাদ

২ জুলাই—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকালে ইসলামাবাদে [illegible] পরিষদের সামনে [illegible] বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন, যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে আনুন—এই [illegible]। [illegible] রেডিও এই খবর প্রচার করেছে।

৩ জুলাই — ভারত ও বাংলাদেশের [illegible] [illegible] মন্ত্রী [illegible] এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁদের এই বৈঠকের পরে [illegible] দেশ নতুন [illegible] চুক্তির কাঠামো [illegible] একমত হন। চুক্তির মেয়াদ তিন বছর।

৪ জুলাই—[illegible] এক খবরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] এখানে [illegible] ঠিক হয়। ১৯২৬ সালে তাঁরা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

৫ জুলাই — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজের সমালোচনা করেন এবং [illegible] সরকারী [illegible] [illegible] [illegible] বিচার [illegible]। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

৬ জুলাই — প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ঘোষণা করেছেন, সমস্ত পাক যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এই ঘোষণা করেন।

৭ জুলাই—ওয়াকিফহাল মহলের খবর: আগামী কিছুদিনের মধ্যে চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় রকমের পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। তার মধ্যে একটা বিষয় হল, এতদিন পর লিন পিয়াও সম্পর্কিত নথিপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করা হতে পারে।

৮ জুলাই—উত্তর জাপানের দুটি জেলায় গরুর দুধে তেজস্ক্রিয় আইওডিনের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এটা চীনের সর্বশেষ পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলেই ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা থাকলে বিপদ ঘটতে পারে, তার চেয়ে অনেক নিচেই রয়েছে।

যতই করুন
না কেন
আপনার পায়খানা
এমন ঝকঝকে
পরিষ্কার হবে না—
রাত্রে
ছিটিয়ে দিন
সামান্য
স্যানিফ্রেশ
সব বিশ্রী দাগ
উঠে যাবে
আপনার
পায়খানা
ঝকঝকে
পরিষ্কার
থাকবে—বিনা
মেহনতেই!
PERFUMED
Sani
Fresh
LAVATORY CLEAN
CLEANS!
DEODORISES!
DISINFECTS!
আপনার পরিবারের
সকলের স্বাস্থ্য
সুরক্ষিত থাকবে।
বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক
BALSARA
CHAITRA-BLS-8 BEN

Cover Printed by Ananda Offset Private Ltd.—Calcutta - 54.